# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

( ১৩২৪ বৈশাখ হইতে আশ্বিন )

[প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ ]    ভারতী কার্য্যালয়,    [ বার্ষিক মূল্য ৩।৶০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৪ সালের

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

## ( বৈশাখ—আশ্বিন )

# চিত্র সূচী

# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ ] ভারতী কার্য্যালয়, [ বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৪ সালের

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

## ( বৈশাখ—আশ্বিন )

# চিত্র সূচী



পূজারিণী

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

# ভারতী

৪১শ বর্ষ ]　　　　বৈশাখ, ১৩২৪　　　　[ ১ম সংখ্যা

## ইচ্ছার মুক্তি এবং আত্মার মুক্তি

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অর্থ যদি হয় ঈসা-মহাত্মার স্বাভিপ্রেত ধর্ম্ম, তবে সেই এ-দেশীয় ধাঁচার ভাগবত ধর্ম্ম ঈসা-মহাত্মার মর্ত্ত্য জীবনের অবসান-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসান প্রাপ্ত হইয়া "আহ্ হ্ হ্" বলিয়া বাঁচিয়াছে! এ খ্রীষ্টধর্ম্ম—অর্থাৎ ভাগবত খ্রীষ্টধর্ম্ম—পাশ্চাত্য ভূগোল-খণ্ডে ভুল-ক্রমেও একটিবার চরণ-ধূলি প্রদান করেও নাই, আর, কস্মিন্ কালেও করিবে-যে তাহার কোনোও লক্ষণ ঘুণাক্ষরেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম এ-যাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান, ইহার সহিত ঈসা-মহাত্মাকে জড়াইলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধুনাতন কালের না-পারে-এমন-কাজ-নাই-গোচের খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে ছিল পাষণ্ড-চূড়ামণি Constantine-সম্রাটের রাজধর্ম্ম *; তাহার পরে তাহা হইয়াছিল মহা-প্রতাপশালী পোপদিগের একাধিপত্য-ধর্ম্ম; এক্ষণে তাহা হইয়া উঠিয়াছে বিষম একটা বিট্‌কাল ধর্ম্ম—সারা পৃথিবীময়

---

* বলিলাম "পাষণ্ড-চূড়ামণি"। এই বিকট বিশেষণটিকে কেহ যদি মনে করেন—লেখকের একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা, তবে, বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন সুবিদ্বান্ পুরাতত্ত্ব-সমালোচক কী বলিতেছেন শ্রবণ করুন্ঃ—

"The church claims Constantine as the first Christian Emperor,......Just about the time when the first Church-Council met at Nicæa, he put to death his eldest son, Crispus, on a mere suspicion of treason; and on his own death bed, immediately after his baptism by Eusebius, he dictated an order to another son to execute six members of his family whom he suspected of a conspiracy to poison him.

Barclay Lewis Day
(Author of "Our heritage of Thought")

"সামাল্ সামাল্" ধ্বনি উত্থাপন-কারী সভ্যতাভিমান-ধর্ম্ম! এই সভ্যতাভিমান-ধর্ম্মের প্রধান পুরুষার্থ হ'চ্চে Freedom of will। এ দেশীয় ঋষিমনীষীদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান পুরুষার্থ = Freedom of আত্মা। কিনা আত্মার মুক্তি। ইহা বলা বাহুল্য যে, আত্মা = মস্তক; Will = হস্তপদ। হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করে, তবে তাহা হস্তপদের freedom খুবই—কিন্তু মস্তকের তাহা সর্ব্বনাশ! Will-এর Freedom = আত্মার সর্ব্বনাশ। পক্ষান্তরে হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনে পরিচালিত হয়, তাহাতে মস্তকেরও freedom হয়, আর সেই সঙ্গে হস্তপদের ন্যায্য freedomও বজায় থাকে। তবেই হইতেছে যে, Willএর সংযম = আত্মার Freedom। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছেও তাই; বলা হইয়াছে—"বিজ্ঞান-সারথি র্যস্ত মনপ্রগ্রহবান্নরঃ সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।" বিজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মনোরজ্জু (অর্থাৎ ইচ্ছা) যাঁহার বশীভূত তিনি সংসারের পার-স্বরূপ বিষ্ণুর পরম ধাম প্রাপ্ত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, ইচ্ছার সংযম = আত্মার মুক্তি; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ইচ্ছার মুক্তি (freedom) = আত্মার বন্ধন।

আত্মার freedom কাহাকে বলে তাহার নমুনা যদি দেখিতে চাও, তবে পূর্ব্বাহ্ণেই আমি বলিয়া খালাস হইতেছি যে, তাহার নমুনা দেখানো আমার সাধ্যের অতীত। সাধ্যাতীত তাহা আমার এইজন্য—যেহেতু দেশীয় ধাঁচার সাধু মহাত্মাদিগের সংখ্যা এক্ষণে অত্যন্ত বিরল। দেশীয় প্রকৃতির সাধু পুরুষ আমি যে একেবারেই চক্ষে দেখি নাই তাহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে; আমি কেবল বলিতে চাই এই যে, দেশীয়-ধাঁচার সাধুমহাত্মা দুজন-একজন যাঁহাদিগকে আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্রের ছবি আঁকিয়া দেখাইতে আমি নিতান্তই অপারগ; তা ছাড়া—অনেক কষ্টে যদি তাহার একটা অস্ফুট আলেখ্য আমি আঁকিয়া দেখাইও বা, তবে তাহা এক্ষণকার কালের বিলাতী-চস্‌মাধারী দিশী সমজদার-দিগের পছন্দ না হইবারই কথা!

Freedom of Will কাহাকে বলে তাহার যদি নমুনা দেখিতে চাও তবে অতি সহজে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহা দেখানো নিতান্তই একটা বাহুল্য কার্য্য; কেননা তাহা ফলেন পরিচীয়তে! ইচ্ছাকে জ্ঞানধর্ম্মের বশীভূত করিলে তাহার ফল হয় যেমন আত্মার মুক্তি; তেম্নি, জ্ঞানধর্ম্মের বন্ধন হইতে ইচ্ছাকে মুক্তি প্রদান করিলে (freedom দিলে) তাহার ফল হয় স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারের নমুনা দেখাইতে গেলে ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে, অতএব তাহাতে কাজ নাই—এইখানেই ইতি করা যা'ক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# মাতু

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা,—এমন কুয়াশা এ-শীতে একদিনও হয়নি ;—জলস্থল-আকাশ দুধে-গোলা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে ; যেদিকে দেখি, মনে হচ্ছে যেন নাকের সাম্‌নে প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে,—কোথাও একটু বস্‌বার স্থান নেই। সাতটা-পঞ্চাশে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে গেল তবু আজ সহযাত্রী কারুর দেখা নেই। জাহাজের সারেং কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচ-রঙা গলাবন্ধ আর লক্ষ্ণৌ ছিটের ময়লা একখানা বালাপোশ জড়িয়ে একটা মেছুনির ঝুড়ি থেকে বেছে-বেছে ভালো মাছগুলি লালরঙের একটা বাল্‌তিতে নিজের জন্যে তুলছে। জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস ;—যেন ডানার ভিতরে মুখগুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভার-কোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ-করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে—গাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনে কুয়াশার ভিতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে—'মা' !

বড়বাজারের এই ঘাটটা—যেখানে সূর্য্যোদয়ের আগে থেকে সূর্য্যাস্তের অনেক পরেও কর্ম্মকোলাহলের বিরাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁপু থামিয়ে কুয়াশার ভিতরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কি-রকম নিঝুম তা বুঝতেই পারছো। এরি মধ্যে কচি-গলার সেই 'মা' শব্দ—সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল, তা কি আর বলতে হবে! আমি যেন ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখলুম—ঠিক আমাদের ফার্ষ্টক্লাসের ডেকের দিকে মুখ-করে দুখানা বড়-বড় দোতালা জাহাজ দুটো প্রকাণ্ড গোল বারাণ্ডা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আধখানা বার হয়েছে ; একটা বারাণ্ডার নীচে বড়-বড় ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে—'মাতু' আর একটায়—'কুয়িস্তান'। শেষের জাহাজখানায় লোক দেখলেম না ; কিন্তু 'মাতু' বলে যে জাহাজ তার ওই বারাণ্ডার নীচে, যেখানে জাহাজের রান্নাঘর, সেখানে দেখছি, ঝক্‌ঝকে কতকগুলো তামার ডেক্‌চির কাছে বসে নীল পাজামা-পরা একটা ছোকরা-খালাসি রং-করা একটা পাখীর খাঁচা বেশ-করে জল দিয়ে-দিয়ে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে যতবার পড়ছে, ততবারই খাঁচার পাখী সে মা মা বলে চীৎকার করে উঠছে ; আর সেই ছোকরা খালাসি তাকে কথ্য এবং অকথ্য ভাষায় গাল পেড়ে চলেছে।

পাখী-পোষবার সখ আমার চিরদিনই আছে—তার উপর পড়া-পাখী—আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের আর পাখীর রঙ্গটা দেখে নিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে অবিন আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বল্লে—"পাখীটা

ভালো-করে দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।”

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অবিন আমাকে আবার বল্লে—“এই ঠাণ্ডায় কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের এ জাহাজ সাড়ে-ন’টার আগে ঘাট ছেড়ে নড়ছে না। চল, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরামে তামাক খাওয়া খাবে আর গল্পগুজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ, আলাপ করে খুসি হবে, আর ঐ ‘মাতু’ জাহাজখানার মতো অমন জাঁকালো জাহাজ আর নেই,—আগাগোড়া গিল্টি আর আয়না দিয়ে মোড়া। ওর ক্যাবিন্‌গুলো দেখবার জিনিষ।”

আমি অবিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড জেটি আর পাটের গোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ তো নয় যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাস্‌ছে! এক-একটা ডেক্ যেন এক-একটা কন্‌গ্রেসের প্যাণ্ডাল—এদিক থেকে ওদিকে নজর চলে না। পিতলের চাদর আর রবার-সিট্ দিয়ে মোড়া দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আমরা দৈত্যপুরীর সাতমহলের মতো সোনা আর স্ফটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসি এসে বল্লে—“মীর সাহেব আপনাদের ছেলাম দিয়েছেন।”

আমি অবিনের সঙ্গে মীর-সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলেম—এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন; পাশে এক ডাবা পানের খিলি। তাঁর পিছনে খোলা জানলার কাচের ভিতর দিয়ে পাটের গোডাউনের টিনের ছাদের একটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তুরমত আদর-আপ্যায়নের পর মীর-সাহেব অবিনের দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—“এবার অনেক দিন পরে এ অঞ্চলে এলেম;—সেই দুবছর পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই!”

অবিন আমাকে দেখিয়ে বল্লে—“এই বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলেম; এঁর বড় পাখীর সখ; এঁর জন্যে সিঙাপুর থেকে এবার একটা কাকাতুয়া এনে দিতে হবে। যাহোক এবার আপনার সফরের গল্পটা বলুন।”—বলেই অবিন খপ্ করে মীর-সাহেবের বিনা অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-খাবা পান তুলে নিয়ে দুটো নিজের গালে, আর গোটা-চারেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চোখ বুজে সোজা-হয়ে বেশ জমিয়ে বসল। আমি পান কটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছি দেখে মীর-সাহেব বল্লেন—“পান খান্, না হলে গল্প জম্‌বে না”—বলেই মীর-সাহেব সুরু কল্লেন—“এদিকে সিঙাপুর, হংকং—ওদিকে সেকেন্দ্রা আর কুস্তুনতুনিয়া এইটুকুর মধ্যে কত ঘাটেই না আমার জাহাজ ভিড়লো! দিনে-রাতে সুদিনে-দুর্দ্দিনে আলোতে-অন্ধকারে এই পঁচাশী বৎসর কত নদীতেই না পাড়ি দিলুম, কত দরিয়াই না পার হলুম! কিন্তু এই ভাগীরথী—এ আমার মনকে কেমন যে টানে তা আমি বোঝাতে পারবো না। এই গঙ্গাতীরেই আমার জন্ম, আর এই বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার কবর এই মাটিতে, কি দরিয়ার অগাধ জলের নীচে, খোদাতালা ঠিক

করেছেন তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মন চায় যে এই নদীর ধারে যেন আমার শেষ-যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। কাল-বোশেখির ঝড়ের আগে-আগে তুফান ঠেলে যখনি যেখানে আমি জাহাজ চালিয়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি—একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সবুজ শেওলায়-ছাওয়া, আমার নিজের কবরের ছবিটি আমার মনে জেগেছে। ঘরের ছবিটি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। এখানেই আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল কিন্তু সে কেমন ছিল, নদীর এপারে ছিল কি ওপারে, তা আমার কিছু মনে পড়েনা। ঘরে আমার কেইবা ছিল—ভাই-বোন কাউকে মনে নেই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর রূপ—আর কিছু না। এইটুকু আমার খুব ছেলেবেলার স্মৃতি, বোধ হয় যখন মায়ের কোলে মানুষ হচ্ছিলেম তখনকার।

এরপর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট করে আমি দেখতে পাই। তখন আমার বয়স কত বলতে পারিনে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে মা মা বলে চীৎকার করে কাঁদছি। পরণে আমার একটুকরো কাপড় নেই; মুঠোর মধ্যে আমার ছুটো টাকা। টাকা ছুটো রেলের টিকিট কেনবার জন্যে--এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার পর এক সন্ন্যাসী—তার মাথায় জটা, গায়ে ছাই, কটা-কটা দাড়িগোঁপ—সে আমাকে এসে বল্লে—বেটা রোতা কাহে? আমি তাকে কেঁদে বল্লেম—আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এস, আমি দিল্লী যাব। সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কিনা শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার টাকা-ছুটো দিয়ে দিলেম, আর তাঁর হাত-ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তারপর কি হল মনে পড়েনা। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই—এইটুকু ছাড়া।

এর পরে একদিন নতুন কাপড় পোরে, দিল্লী যাব বলে, লোটা-কম্বল পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ছাদের নীচে কাঠগড়া দেওয়া একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার চারিদিকে স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক;—কেউ বসে, কেউ আগা-গোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার ছুটো লোহার থামের মাঝ দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঠিক এমনি-একখানা বড় জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগ্‌লো। সেটা এত বড় যে মনে হলনা সে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবার হাত-পা, বুক-পিট টিপে-টুপে দেখে বড়-একখানা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে লোক গোরুর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—যা বেটা দিল্লী! বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই ফিরে দেখলেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেছে। দিল্লী যাবার উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ

আনন্দে দুলছিল, সন্ন্যাসীকে লুকুতে দেখে হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে পারিনে, হঠাৎ একসময় জলের হুস্ হুস্ শব্দ শুনে চম্‌কে দেখি জাহাজ চলেছে;—আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোরা-সাপের পিঠের মত দেখাচ্ছে। একটা সাদা টুপি, খয়েরী কোটপরা কালো সাহেব এসে আমাকে জাহাজের একদিকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে। সেখানে একদল মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে বুক-চাপড়ে—কেউ বেটার নাম কোরে, কেউ বাপ বোলে, কেউ ভাইরে বোলে কাঁদতে লাগল। সাহেব তাদের এক ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই সব সহযাত্রীর কথায়-বার্ত্তায় জানলুম এখানা কুলীর জাহাজ। কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে কুলী কাকে বলে বুঝতেম না। সেই নদীর জল, আকাশের আলো, দূরে দূরে তীরের বন, বালির চড়ার উপরে সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখতে দেখতে কদিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

তারপর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে মানুষের মেরুদণ্ড মানুষ হয়ে কেমন-করে যে তিলে-তিলে মুচড়ে ভাঙে তা দেখেছি, মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাবুকের চোটে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কি-কোরে যে মানুষ ভার-বাহী জীবের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে-পোড়ে পরের বোঝা টান্‌তে-টান্‌তে শেষ-একদিন তপ্ত বালির উপরে মুখ-গুঁজড়ে বুক-ফেটে মরে—তাও দেখেছি; কিন্তু তবু ঘর মনে হলে এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে দুঃখও অনেক, সুখও অশেষ। মায়ের সন্ধানে এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দেখে আমার কি যে কান্না প্রাণের ভিতরে গুম্‌রে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না। আবার যেদিন এক-এক-দল ছেলেহারা মা আনারসের কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে তাদের কাদা-মাখা রোগা হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধোরে দুপুরের রোদে-পোড়া মাটির উপরে চোখের জল ফেলতো, যখন কোনো-কোনো দিন রাঙা সাড়ি, গালার চুড়ি-পরা ছোট এক-একটা কালো মেয়ে চায়ের পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাই-বোলে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো, তখনকার সুখ—সে তো বর্ণনা করা যায় না! তার পর বসন্তকালে যখন ফুলে-ফলে, পাখীর গানে, সোনার রোদে, সবুজ পাতায় বাগানের চারিদিকের বন ভরে উঠেছে, তখন কাজের অবসরে যখন এক-একবার চেয়ে দেখেছি তখনি যে আমার মাকে না দেখে আমি থাকতে পারিনি। ষাট-বছরের মধ্যে আমার শরীর-মন একদিনের জন্যে অবসন্ন হতে দিইনি। এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল না, কিন্তু আমার মা যিনি, তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। এইজন্যে বাগানের সাহেব মালিক আমায় ভালোবেসেছিল আর মরবার সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লিখে দিয়ে গেল। তার আর-কেউ ছিল না। সে ভালোবাসবার মধ্যে একমাত্র বাগানের কাজকে এবং সেই কাজ চালাতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সাহেব ভুল বুঝেছিল। আমি বাগানখানাকে

ভালোবেসেছিলেম—তার কেয়ারীকরা সাজানো চায়ের গাছগুলোর জন্যে নয়—ওই কাঁটা গাছের বেড়ার ধারে-ধারে যে স্নেহ, ভালো বাসার লতাগুলো জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছিল তারি জন্য। ওই বনের গাছ যেখানে ঝুঁকে পোড়ে মায়ের মতো পথের ধূলোকে চুম্বন দিত, সেই ছায়াশীতল বন-পথগুলির জন্য আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলেম—ষাট বছর ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে, বাগানের যিনি মালিক, তিনি নিজের কবর নিজেই বানিয়ে গিয়েছিলেন—কালো পাথরের ছুঁচোলো একটা পালিস-করা থাম, তার গায়ে সোনার অক্ষরে বড়-বড়-করে তাঁর নাম আর জন্মের তারিখ। তারি গায়ে তাঁর মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের কাজ বন্ধ কল্লুম।

শেষকুলীর দল মাদোল বাজাতে-বাজাতে বন্দরের দিকে দেশের জাহাজ—ঘরমুখো জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার চাঁদ নীরব বাগান, নিঝুম বনের গায়ে চমৎকার আলো ফেলেছে। আমি ঘরে আলো নিভিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় মাথার উপরে কচিগলায় কে ডেকে গেল—মা, মা, মা! তার পর ছায়ার মতো একটা কে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল,—মনে হল একটি ছোট ছেলে। আমি লাঠি-হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের ধারে যেখানে একটা গুহা—যেখানে অন্ধকার মুখ মেলিয়ে রয়েছে—সেইখানে সেই ছোকরার দেখা পেলুম। সে একজন কুলী। আমি তাকে শুধোলুম—সবাই গেল তুই যে এখানে? সে বল্লে—মা পালিয়েছে, তাকে ছেড়ে আমি যাই কেমন করে? আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি কোথায় তার মা, এমন সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে বল্লে—মীর-সাহেব, ওই যে মা! অন্ধকারে একটা ফুলের ডাল গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম,—আর কিছু না। ছেলেটা অকথ্য ভাষায় তার মাকে উদ্দেশ-করে গাল-পাড়ছে শুনে আমি যখন অবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময় একটা কালো পাখী উড়ে এসে তার কাঁধে বসল—"

মীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বল্লেম—"গোল-বারাণ্ডার নীচে সকাল-বেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখেছি।"

মীরসাহেব হেসে বল্লেন—"সে আমারি সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পাখীটাকে দুই মুঠোর ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুমু খাচ্ছে আর গাল পাড়ছে; আর পাখীটাও বলছে—মা, মা মা! এমন সময় বন্দর থেকে শুনলেম কুলীর জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বল্লুম—জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন করে দেশে যাবি? ছেলেটা খানিক আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বল্লে—দেশ তো আমার নেই।

—তবে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলি?

—যেখানে সবাই চলেছে।

আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। মীর-সাহেব, আপনার দেশ কোথায়—এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, দেশ নেই। সে

এখনো জানে এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের দেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।”

আমি মীর-সাহেবকে বল্লুম—“ছেলেটা পাখীকে অমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখীটা কেড়ে নিয়ে ধমকে দেন না কেন? আহা পাখী যে এমন সুন্দর মা বলে ডাকে এ আমার কখনো শোনা ছিল না।”

মীর-সাহেব বল্লেন—“বাবুজী, ওই ছেলেটারই কচি গলার ‘মা’ সুর, পাখীটা সেই চা-বাগানের বড়দুঃখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে,—ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।”

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্ত্তা পোরে ছুটে এসে আমাদের বল্লে—“আপনাদের জাহাজ এখনি ছাড়বে, শীঘ্র যান্—কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠেছে।”

‘মাতু’ জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম মীর-সাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীর বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠচে। ফিরে এসে যখন আবার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল তখন মীর-সাহেবের জাহাজ যেখানে ছিল সেখানে মস্ত-একটা ফাঁক দেখলুম। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুলীর দল পাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মালখানার দিকে চলেছে; আর একটা সোলার টুপি-মাথায় সাহেব ছড়ি-হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বসন্তসেনা

“অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্ত
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা॥”

উজ্জয়িনী নগরীর বণিক চারুদত্ত ও তাঁহার গুণানুরক্তা বসন্তলক্ষ্মীর ন্যায় রূপশালিনী বসন্তসেনার কথা সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠকের অবিদিত নাই। “মৃচ্ছকটিক” হইতেই প্রথমে বসন্তসেনার কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীর নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। তাহার পর ভাসের “চারুদত্ত” নাটক গ্রন্থ ভিন্ন চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যান যে জৈন-সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে এ কথা বোধ হয় অতি অল্প-লোকেই বিদিত আছেন। জৈনসাহিত্যে প্রচলিত বহু উপাখ্যানই রূপান্তরিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া জৈন-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদকরূপে জৈনসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা, অশোকবনে রাবণ ও সীতা প্রভৃতি চিত্রসম্বলিত জৈন পুঁথিগুলির পৃষ্ঠা

প্রচলিত রামায়ণের কাহিনী ভিন্ন অন্য কোনও কাহিনী-সম্বলিত পুঁথি অবলোকন করিতেছি। পুঁথি পাঠ করিলেও এই সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হয়, যে ইহাকে পৃথক কাহিনী বলিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তবে জৈন লেখকগণ সকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির মধ্যে জৈনরচিত মহাকাব্যও আছে। সেগুলির মধ্যেও একটি না একটি সর্গে জৈনধর্ম্মের সারতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুরাণের মত জৈনদেরও বহু পুরাণ আছে। তাহাতেও সুপরিচিত পৌরাণিক বহু উপাখ্যান স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনকল্পে যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। জৈনলেখকরচিত চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যানেও এইরূপ জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইয়াছে।

জিনসেনাচার্য্য রচিত হরিবংশ-পুরাণ নামক সংস্কৃত ছন্দে লিখিত একখানি সুবৃহৎ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের একবিংশতিতম সর্গে চারুদত্তের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। "হরিবংশপুরাণে"র সহিত মহাভারতের অন্তর্গত "খিল হরিবংশে"র নাম-সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করিবেন। এই হরিবংশপুরাণের সহিত খিল হরিবংশের কাহিনীরও অনেক সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণ-বলদেবের কাহিনী, যদুবংশধ্বংস প্রভৃতি বহু কাহিনী উভয়ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জৈনগ্রন্থে কাহিনীগুলি কিছু ভিন্নপ্রকারের। এই সকল কাহিনী ভিন্ন অন্যান্য বহু উপাখ্যান জৈন হরিবংশপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কেবল জৈনধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি কিম্বদন্তীমূলক প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যান এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতীয় জৈনসিদ্ধান্ত-প্রকাশিনী সংস্থা জৈনহরিবংশ-পুরাণ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মুদ্রণের জন্য তাঁহারা তিনখানি পুঁথি মিলাইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, অপরখানি সোলাপুর হইতে প্রাপ্ত ও শেষোক্তটি তালপত্রে কর্ণাট-দেশীয় লিপিতে লিখিত। এই তিনখানি পুঁথি মিলাইয়া যে পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি গৃহীত হইল। এ যাবৎ এ অংশগুলি কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। বন্ধুবর শ্রীপান্নালাল বাকলী বালজী পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রদান করাতে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সেইজন্য এই অবসরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, চারুদত্ত-চরিত্র নামক স্বতন্ত্র জৈন গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। হিন্দী ভাষায় পদ্যে লিখিত ঐ বিষয়ক একখানি মুদ্রিত পুস্তক পান্নালালজীর নিকট আছে। কিন্তু এই গ্রন্থোক্ত উপাখ্যান জৈনহরিবংশপুরাণ হইতেই গৃহীত। সুতরাং হরিবংশপুরাণের উপাখ্যানের আলোচনা করিলেই জৈনসাহিত্যে রূপা-

ন্তরিত বসন্তসেনার কাহিনী আমরা অবগত হইতে পারিব।

হরিবংশপুরাণের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দুই এক স্থলে তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে।

"আসীৎ কলিঙ্গসেনাঽত্র গণিকা গণনায়িকা।
সুতা বসন্তসেনাঽস্যা বসন্তশ্রীরিব প্রিয়া॥"
[ হরিবংশপুরাণ। ২১ সর্গ ৪১ শ্লোক ]

কলিঙ্গসেনার দুহিতা বসন্তসেনা। মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক "বসন্তশোভেব বসন্তসেনা" বলিয়া বসন্তশোভার সহিত বসন্তসেনার রূপের তুলনা করিয়াছেন। জিনসেনও বসন্তসেনার রূপবর্ণনে সেই উপমাই ব্যবহার করিয়াছেন।

এই বসন্তসেনা নৃত্যগীতাদি বিবিধ কলায় পারদর্শিনী ছিলেন। নবযৌবন-সমন্বিতা হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১)

মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত উজ্জয়িনীর অধিবাসী, কিন্তু জিনসেন চারুদত্তকে চম্পার অধিবাসী করিয়াছেন। জিনসেনের কাহিনীতে বৈশ্যবংশীয় মহা ধনশালী ভানুদত্ত চারুদত্তের পিতা ও সুভদ্রা চারুদত্তের মাতা। যৌবনাগমে মাতুল সর্ব্বার্থের ঔরসে সুমিত্রার গর্ভে জাতা মিত্রবতীর সহিত চারুদত্তের বিবাহ হয়। কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চায় চারুদত্ত এত নিমগ্ন ছিলেন যে নিজ পত্নীর প্রতিও তাঁহার আসক্তি জন্মিতে পারে নাই। শাস্ত্রে অনুরাগ অন্য বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার আসক্তির প্রতিরোধক। চারুদত্তের পিতৃব্য রুদ্রদত্ত বহু ব্যসনে আসক্ত ও কামুক ব্যবহারে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। চারুদত্তের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে রুদ্রদত্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (২)

রুদ্রদত্ত চারুদত্তকে বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

এই অভিপ্রায়ে রুদ্রদত্ত একদিন সভ্য-জনপূর্ণ নৃত্যমণ্ডপে চারুদত্তকে লইয়া গেলেন, সেখানে বসন্তসেনার নৃত্য করিবার কথা ছিল। (৩)

---

(১) "কন্যাসৌ নৃত্যগীতাদিকলাকৌশলশালিনী।
সৌরূপস্য পরা কোটির্যৌবনস্য নবোন্নতিঃ॥" (হ—পু ২১।৪২)

(২) "আসীদত্রৈব বৈশ্যেশ শ্চম্পায়াং সুমহাধনঃ।
ভানুদত্ত ইতি খ্যাতঃ সুভদ্রা তস্য ভামিনী॥...
ঊঢ়া চ যৌবনস্থেন নাম্না মিত্রবতী ময়া।
সর্ব্বার্থস্য সুমিত্রায়াং মাতুলস্য তনূভবা॥
শাস্ত্রব্যসনিনো মেহ ভূন্নাস্যস্ত্রীবিষয়েঽপি ধীঃ।
শাস্ত্রব্যসনমন্যেষাং ব্যসনানাং হি বাধকম্॥
রুদ্রদত্তঃ পিতৃব্যো মে বহুব্যসনসক্তধীঃ।
সম্যাক্ যোজিতো মাত্রা কামুকব্যবহারবিৎ॥" (হ-পু ২১।৫, ৩৮—৪০)

(৩) "নৃত্যারম্ভেহ ন্যদা তস্যা রুদ্রদত্তেন সঙ্গতঃ।
সসাহিত্যজনাকীর্ণে স্থিতোঽহং নৃত্যমণ্ডপে॥" (হ—পু ২১।৪৩)

বসন্তসেনা সূচীনৃত্য (৪) আরম্ভ করিলেন।

এই নৃত্য-সময়ে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার প্রথম পরিচয় হইল। উভয়েই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যায় সুচতুর। নৃত্য-গীত-ভঙ্গীর দ্বারাই উভয়ে আপন-আপন কলা-বিদ্যায় অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বসন্তসেনা অঞ্জলি দ্বারা বিকাশের পূর্ব্বাবস্থায় জাতি-কুসুম মুকুলের অভিনয় করিলেন। তাহাতে কয়েকজন সভ্য সাধুবাদ দিলে চারুদত্ত বিকাশ-কালজ্ঞ মালাকরের ইঙ্গিত করিলেন। বসন্তসেনা অঙ্গুষ্ঠ অভিনয় করিলে চারুদত্ত নখরঞ্জনকারী নাপিতের ইঙ্গিত করিলেন। সুবিজ্ঞ সভ্য-গণ তাহাতে প্রশংসাবাদ করিলেন। পরে বসন্তসেনা কুক্ষিদেশের ভঙ্গীক্রমে গো ও মক্ষিকার অভিনয় করিলে সভ্যগণ সাধুবাদ দিলেন। তাহাতে চারুদত্ত গো-পালের ইঙ্গিত করিলেন। তখন বসন্তসেনা প্রীতা হইয়া হাবভাব দ্বারা মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিজের অঙ্গুলি-শব্দ দ্বারা চারুদত্তকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তাহার পর বসন্তসেনা সমগ্র লোকের সমক্ষে অনুরাগ-বশে চারুদত্তের সম্মুখে আসিয়া মনোহর নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৫)

জিনসেন চারুদত্তকে সচ্চরিত্র ও জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছেন। চারুদত্তের উপা-খ্যানের মধ্য দিয়া জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন তাঁহার উদ্দেশ্য। কাজেই তিনি যখন চারুদত্তের চরিত্র অঙ্কিত করিলেন তখন প্রথম হইতেই চারুদত্ত শাস্ত্রানুরাগী ও স্ত্রীবিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন ইহাই দেখাইলেন।

---

(৪) "হরিবংশপুরাণে"র হিন্দী অনুবাদে সূচী নৃত্যের অর্থ করা হইয়াছে "ছুঁচের উপর নাচ"। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। সূচী একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীর নৃত্য। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে উহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য জান্বূর্দ্ধং প্রসারয়েৎ।
পাতয়েচ্চাগ্রযোগেন সা সূচী পরিকীর্ত্তিতা ॥"

(নাট্যশাস্ত্রম্। ১০ম অধ্যায়ঃ। শ্লোকাঃ ৩২—৩৩

(৫) "সূচিনাটকসূচ্যগ্রে সা জাতিমুকুলাঞ্জলিম্।
ব্যক্তিরৎ প্রবিকাশাৎ প্রাক্ প্রাপ্তেষু মুকুলেষু চ ॥
সুষ্ঠুকারে প্রযুক্তেঽস্যা কৈশ্চিৎ সাহিত্যবর্ত্তিভিঃ।
ময়া বিকাশকালজ্ঞ মালাকারস্য যোজিতে ॥
তস্যা দত্তে বুধৈস্তস্মিন্নঙ্গুষ্ঠৈঽ ভিনয়ে কৃতে।
নাপিতস্য ময়া দত্তে নখমণ্ডলশোধিনঃ ॥
কুক্ষের্গোমক্ষিকায়াশ্চ ব্যুদাসাভিনয়ে কৃতে।
পূর্ব্ববৎ তৈঃ কৃতে প্রাপ্তগোপালস্য ময়া পুনঃ ॥
হাবভাববিবেকস্য ব্যঞ্জিকা সা চ সম্প্রতি।
সুষ্ঠুকারমদাৎ প্রীতা স্বাঙ্গুলিস্ফোটকারিনী ॥
ততঃ সর্ব্বস্য লোকস্য পশ্যতো মম সম্মুখম্।
ননাট নাটকং হারি সানুরাগবশা চ সা ॥ (হ—পু।২১। ৪৪—৪৯)

অন্যের কৌশলে তাঁহার মতিভ্রংশ হইল, জিনসেন ইহাই প্রকটিত করিতে সচেষ্ট।

মৃচ্ছকটিকে কিন্তু সে ভাব নাই। মৃচ্ছকটিকে যে যুগের চিত্র বিদ্যমান তাহাতে নাগরিকগণের বারাঙ্গনার সহিত প্রণয় দুষনীয় ছিল না। থাকিলে বসন্তসেনা আসিয়া চারুদত্তের গৃহে রাত্রি যাপন করিতে পারিতেন না। নাটকশেষে চারুদত্ত-পত্নী ধূতা বসন্তসেনাকে 'ভগিনী' সম্বোধন করিতেন না। রাজা আর্য্যকও বসন্ত-সেনাকে 'বধূ' আখ্যা দিতে পারিতেন না।

কাজেই শূদ্রক বিনা সঙ্কোচে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার অনুরাগ-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এ অনুরাগ যে সামাজিক হিসাবে নিন্দনীয় বা নৈতিক হিসাবে দুষ্ট তাহার কিছুমাত্র আভাস নাটকের কোনস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় দূত হইয়া বসন্তসেনার গৃহে যাইতেছে। সেখানে পানাহার করিতে কেহ তাহাকে অনুরোধ করে নাই বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করি-তেছে। প্রকাশ্যেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনা পরস্পরের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু জিনসেন যে সময় হরিবংশপুরাণ রচনা করিলেন তখন সামাজিক অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। বারাঙ্গনা-গৃহে গমন, বারাঙ্গনার সহিত প্রণয় সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জিনসেনের কাহিনীতে চারুদত্ত সচ্চরিত্র হইয়াও মাতুল রুদ্রদত্তের কৌশলে বসন্তসেনার মোহে পড়িলেন এই বৃত্তান্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এরূপ বর্ণনার আরও একটি কারণ আছে। জৈনধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তিত। নিজপত্নী ব্যতীত অন্য রমণীতে অনুরাগ ত ঘৃণিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেই, অধিকন্তু নিজপত্নী বিষয়েও অত্যাসক্তি সর্ব্বত্র বারিত হইয়াছে। জিনসেন জৈনধর্ম্মতত্ত্বের প্রকটনকল্পেই হরিবংশপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাই বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের অনুরাগ তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উভয়ের অনুরাগোৎপত্তি, ও পরস্পরের সহিত বক্ষ্যমাণ ব্যবহারও জিনসেন এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

নৃত্যাবসানে বসন্তসেনা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও তথায় কাতরভাবে মাতার নিকট এইরূপে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন :—"মা ! এ জীবনে চারুদত্ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি প্রার্থনা করি না। তুমি চারুদত্তের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও।"

তাহার মাতা কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চারুদত্তের সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার জন্য দান-মানাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া রুদ্রদত্তকে নিযুক্ত করিলেন। রুদ্রদত্ত একদিন এক কৌশল করিলেন। চারু-দত্তকে লইয়া পথে যাইতে যাইতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি হস্তী উত্তেজিত করিয়া তাহাদের পীড়নাশঙ্কাতেই যেন ব্যস্ত হইয়া চারুদত্তকে লইয়া বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই কলিঙ্গসেনাকে

সঙ্কেত করা ছিল। তিনি উভয়কে স্বাগত বাক্যে আহ্বান করিয়া আসনদান প্রভৃতি অভ্যর্থনা করিলেন। (৬)

তথায় রুদ্রদত্ত কলিঙ্গসেনার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীড়ায় রুদ্রদত্ত নিজ উত্তরীয় পণ রাখিয়াছিলেন। কলিঙ্গসেনা সেই উত্তরীয় জিতিয়া লইলেন। তখন চারুদত্ত রুদ্রদত্তকে সরাইয়া নিজে কলিঙ্গসেনার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দ্যূতক্রীড়ানিপুণ বসন্তসেনা নিজ মাতাকে সরাইয়া চারুদত্তের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চারুদত্ত অত্যন্ত পিপাসিত হইলেন। তখন যাহাতে মতিভ্রংশ হয় এইরূপ সুগন্ধি শীতল সলিল চারুদত্তকে পান করিতে দেওয়া হইল। অতি ঘনিষ্ঠ আলাপে বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের অনুরাগ উৎপন্ন হইলে কলিঙ্গসেনা চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার পাণিগ্রহণ করাইলেন। (৭)

প্রাচীনকালে এইরূপ প্রথা ছিল। বাৎস্যায়ন-রচিত কামসূত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা একরূপ চুক্তিবদ্ধ মিলন। একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বারাঙ্গনাদের এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

এই অনুরাগোৎপত্তির বর্ণনাতেও চারুদত্তকে কৌশলে পানীয় পান করাইয়া মোহিত করা হইল এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এ অনুরাগ যে কেবল মোহমাত্র,

---

(৬) "উপসংহৃতনৃত্যা চ নিজপ্রাসাদবর্ত্তিনী।
স্বমাত্রেহ কথয়দ্ভাবমিতি সা কন্যকাতুরা॥
ইহ জন্মনি মে মাতশ্চারুদত্তাৎ পরস্য ন।
সঙ্কল্পস্তেন তেনায়ং মাং যোজয়িতুমর্হসি॥
মাতা জ্ঞাত্বা সুতাচিত্তং চারুদত্তস্য যোজনে।
দানমানাদিনাভ্যর্চ্য রুদ্রদত্তমযোজয়ৎ॥
তেন চাহমুপায়েন পৃষ্ঠতশ্চাগ্রতঃ পথি।
গজৌ প্রযোজ্য তদ্বেশ্মাবেশ্ম জাতু প্রবেশিতঃ॥
কৃতসঙ্কেতয়া পূর্ব্বং কৃতঃ কালিঙ্গসেনয়া।
স্বাগতাসনদানাদ্যৈরুপচারোহত্র চাবয়োঃ॥ (হ—পু।২১।৫০—৪৪)

(৭) "দ্যূতে তত্রোত্তরীয়ঞ্চ রৌদ্রদত্তং জিতং তয়া।
ততোহহমুদ্ধতো রত্তমপসার্য্য তমেতয়া॥
বসন্তসেনয়া দ্যূতাদপসার্য্য স্বমাতরম্।
কৃতা দুরোদরক্রীড়া ময়া সহ বিদগ্ধয়া॥
আসক্তশ্চ চিরং তত্র পারিতোহতিপিপাসিতঃ।
মতিমোহনযোগেন বাসিতং শিশিরোদকম্॥
অতিবিশ্রব্ধতত্তস্যামনুরাগে মমোদ্গতে।
কর গ্রহণমেতস্যা জনন্যা কারিতোহস্ম্যহম্॥ (হ—পু।২১।৫৫—৫৮

তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জিনসেন এ স্থলেও সতর্কতা অবলম্বনে অনবহিত নহেন।

গজতাড়না মৃচ্ছকটিকেও আছে। তবে সেখানে ব্যাপারটা অন্যরূপ। বসন্তসেনার ভৃত্য কর্ণপূরক একটা উন্মত্ত গজের আক্রমণ হইতে একজন পরিব্রাজককে রক্ষা করাতে চারুদত্ত তাহাকে নিজ উত্তরীয় পুরস্কার দেন। এই উত্তরীয় একবার বসন্তসেনাকে দাসী ভাবিয়া চারুদত্ত ধরিতে দিয়াছিলেন। কর্ণপূরককে পুরস্কৃত করিয়া বসন্তসেনা চারুদত্ত-প্রদত্ত উত্তরীয় তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

জিনসেনও একটি উত্তরীয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তবে এ প্রসঙ্গ অন্যরূপ।

দ্যূতক্রীড়া মৃচ্ছকটিকেও আছে। তবে ক্রীড়ক সেখানে অন্য লোক। কিন্তু চারুদত্ত যে দ্যূতক্রীড়া করিতেন তাহার উল্লেখ মৃচ্ছকটিকেও পাওয়া যায়। বসন্তসেনার অলঙ্কার অপহৃত হইলে চারুদত্ত মিথ্যা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দ্যূতক্রীড়ায় সেগুলি পণ করিয়া হারিয়াছেন। এজন্য বসন্তসেনা পরে রঙ্গ করিয়া চারুদত্তকে 'জুয়ারী' বলিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়া প্রাচীনকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। জিনসেন কিন্তু এ ক্রীড়ার সমর্থন করিতে পারেন না। তাই তিনি অনিষ্টকর দ্যূতক্রীড়ায় রত হওয়াতে চারুদত্তের মতিভ্রংশ হইল এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

তাহার পর দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া চারুদত্ত বসন্তসেনার গৃহে বাস করিলেন। পিতা, মাতা, পত্নী মিত্রবতী সকলকে ভুলিয়া গেলেন; অন্য কার্য্যের ত কথাই নাই। দুর্জ্জন কর্তৃক সজ্জন যেমন আচ্ছন্ন হন পূজনীয় ব্যক্তিগণের সেবাদ্বারা চারুদত্তের যে সকল গুণরাশি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, রমণী-সেবায় উপজিত দোষ দ্বারা সে সকল সেইরূপই আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কলিঙ্গসেনার গৃহে চারুদত্তের ষোড়শ কোটী স্বর্ণ প্রবিষ্ট হইল। শেষে চারুদত্ত-পত্নী মিত্রবতীর অলঙ্কারও তথায় গেল। তাহা দেখিয়া মন্ত্রনিপুণা কলিঙ্গসেনা একান্তে বসন্তসেনাকে বলিলেন, "বাছা! তোমার ভালর জন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে গুরুর বাক্যামৃতরূপ মন্ত্র সদা অভ্যাস করে, সে কখন অনর্থে পড়ে না। তুমি জান, আমাদের জীবিকা কি জঘন্য। যে অর্থশালী, সেই আমাদের প্রিয়। অর্থহীন ব্যক্তি রসহীন ইক্ষু বা অলঙ্কারের ন্যায় আমাদের ঘৃণ্য। চারুদত্তের পত্নী নিজের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি করুণাবশে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। সুতরাং এই গৃহীতসার চারুদত্তকে পরিত্যাগ কর। রসপূর্ণ নব ইক্ষুর ন্যায় ধনবান অন্য পুরুষের ভজনা কর। (৮)

বসন্তসেনার কর্ণে যেন শেলাঘাত হইল। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে

---

(৮) "বসতা তত্র বর্ষাণি ময়া দ্বাদশ বিস্মৃতৌ।
পিতরৌ মিত্রবত্যাখ্যা কার্য্যেষন্যেষু কা কথা॥
বৃদ্ধসেবাবিবৃদ্ধা মে গুণাগুরুণিসেবয়া।
দোষৈরুপচিতৈশ্ছন্নাঃ সজ্জনা ইব দুর্জ্জনৈঃ॥

বলিলেন, "মা! তুমি কি বলিলে? আমি বহুদিনসেবিত কৌমার-পতি চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া কুবেরকেও চাহি না। অন্যের ত কথাই নাই। নাথ চারুদত্তের বিহনে প্রাণবিয়োগ হইবে। মা! যদি আমার জীবন তোমার প্রিয় হয়, তাহা হইলে আর এরূপ কথা বলিও না। চারুদত্তের গৃহ হইতে আগত কোটি কোটি সুবর্ণে তোমার গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। নারীজাতি বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞ। কলা বিদ্যার পারগামী, অতিশয় রূপবান্, সদ্ধর্ম্মের অনুশীলনকারী, দাতা সেই চারুদত্তকে আমি কিরূপে ত্যাগ করিব?" (৯)

মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত বটে কিন্তু সে অনুরাগ তাঁহার পত্নীকে ভুলাইতে পারে নাই। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের সহিত যখন বসন্তসেনার সাক্ষাৎ, তখন চারুদত্ত দরিদ্র। সুতরাং ঐ অবস্থায় চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ চারুদত্তের গুণবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিতে হইবে। জিনসেনের উপাখ্যানে বসন্তসেনার গৃহে চারুদত্তের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আগত হইল। পত্নীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত

---

স্বর্ণষোড়শকোটীষু প্রবিষ্টাসু নিজং গৃহম্।
দৃষ্ট্বা কালিঙ্গসেনান্তে মিত্রবত্যা বিভূষণম্॥
জগৌ বসন্তসেনাং তামেকান্তে মন্ত্র কোবিদা।
সুহিতৈর্হিতমাভাষে কর্ণে মদ্বচনং কুরু॥
গুরুবাক্যামৃতং মন্ত্রং সদাভ্যস্যতি যো জনঃ।
তমনর্থ গৃহাদ্দূরাৎ ঢৌকতে ন কদাচন॥
জানাস্যেব জঘন্যা নো বৃত্তির্যদ্বিত্তবান্ প্রিয়ঃ।
হেয়ঃ পীলিতসারঃ স্যাদিক্ষ্বালিকক্তবন্নরঃ॥
তন্মূলগ্রমলঙ্কারঃ চারুদত্তস্য ভার্য্যয়া।
প্রেষিতং প্রেষ্যাকারুণ্যাদ্ ব্যসর্জয়মহং পুনঃ॥
তদস্য পীতসারস্য কুরু তাবদ্বিমোক্ষনম্।
সারবন্তং নরং ত্বস্যং নবেক্ষুমিব ভক্ষয়॥ (হ—পু।২১।৫৯—৬৬)

(৯) "শঙ্কুনেব ততঃ কর্ণে তাড়িতা সাহ তিপীড়িতা।
জগাদ মাতরং মাতঃ কিমিদং গদিতং ত্বয়া॥
কৌমারং পতিমুজ্ঝিত্বা চারুদত্তং চিরোষিতং।
কুবেরেণাপি মে কার্য্যং নেশ্বরেণ পরেন কিম্॥
প্রাণৈরপি হি মে নাথশ্চারুদত্তো বিযোজকৈঃ।
নৈবং বোচঃ পুনর্মাতর্যদি মে জীবিতং প্রিয়ম্॥
পূরিতং কোটিশো দ্রব্যৈর্গৃহং তে তদ্গৃহাগতৈঃ।
তথাপি তজ্জিহাসাভূদকৃতজ্ঞা হি যোষিতঃ॥
কলাপারমিতস্যাস্য রূপাতিশয়যোগিণঃ।
সদ্ধর্ম্মদর্শিনো মেহ স্য স্যাত্ত্যাগস্ত্যাগিনঃ কৃতঃ॥" (হ—পু।২১।৬৭—৭১)

শেষে আসিয়াছিল। ইহা হইতে বসন্তসেনার জননীর ধনলোভ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে চারুদত্ত-পত্নীর অলঙ্কার প্রত্যর্পণে কলিঙ্গসেনার কিছু উদারতা প্রকটিত।

নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ জিনসেনের কাহিনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। এই অনুরাগই বসন্তসেনার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। মৃচ্ছকটিকে রাজশ্যালক সংস্থানক দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার প্রেরণ করিয়া শকট পাঠাইলে বসন্তসেনার মাতা বসন্তসেনাকে সংস্থানকের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে বসন্তসেনা মাতাকে জানাইয়া ছিলেন "যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে আর কথনও এরূপ আজ্ঞা করিবেন না।" (১০) জিনসেনের উপাখ্যানেও বসন্তসেনার ঠিক এইরূপ উক্তি বিদ্যমান। বারাঙ্গনা হইলেও প্রণয়ীর প্রতি গাঢ় অনুরাগ, অর্থের প্রতি নিস্পৃহতা উভয়ত্রই সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা যখন চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন কলিঙ্গসেনা বুঝিলেন যে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার মতেই মত দিয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপবেশন, শয়ন, স্নান, ভোজন সকল সময়েই উভয়কে একত্র দেখিয়া একদিন যোগ দ্বারা উভয়কে নিদ্রিত করাইয়া রাত্রিকালে চারুদত্তকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (১১)

চারুদত্ত তাহার পর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা নাই। তাঁহার মাতা ও পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন চারুদত্ত অর্থোপার্জ্জন অভিলাষে পত্নীর অলঙ্কার মূলধন করিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে উশীরাবর্ত্ত দেশে গমন করিলেন। (১২)

ইহার পর চারুদত্তের বহুবর্ষব্যাপী ক্লেশ, অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতির কাহিনী জিনসেন কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বাণিজ্যে প্রবৃত্ত চারুদত্ত যে সকল অদ্ভুত বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার সহিত আরব্য উপন্যাস বর্ণিত সিন্ধবাদ নাবিকের বিপদ্ উপমিত হইতে পারে। চারুদত্তের দুই একটি বিপদের

(১০) "জই মং জী অন্তীং ইচ্ছসি, তা এব্বং ণ পুণো অত্তাত্র আণ্ণাবিদব্বা।" (মৃচ্ছকটিকম্। চতুর্থোঽঙ্কঃ)

(১১) "অত্যাসক্তামিতি জ্ঞাত্বা কৃত্বা তদনুবর্ত্তনম্।
চিন্তয়ন্তী স্থিতোপায়মাবয়োঃ সা বিযোজনে॥
আসনে শয়নে স্নানে ভোজনে চাপি যুক্তয়োঃ।
যোগেনাযুজ্য নৌ নিদ্রামহং রাত্রৌ বহিষ্কৃতঃ॥" (হ—পু।২১।৭২—৭৩)

(১২) "নিদ্রাপায়ে গৃহং গত্বা ভর্ত্তৃনিষ্ক্রান্তদুঃখিনীম্।
অপশ্যং মাতরং দুঃখী ভার্য্যাঞ্চ কৃতরোদনীম্॥
ততঃ কৃততদাশ্বাসঃ প্রিয়ালঙ্কারহস্তকঃ।
উশীরাবর্ত্তমায়াতো মাতুলেন বণিজ্যয়া॥" (হ—পু।২১।৭৪—৭৫)

কাহিনী সিন্ধবাদের দুই একটি কাহিনীর সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল বসন্তসেনা চরিত্রের আলোচনা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কিন্তু চারুদত্ত যখন বহুবর্ষ পরে প্রভূত ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন তখন যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন—বসন্তসেনা তাঁহার গৃহে। শুনিলেন যে তাঁহার বিদেশ গমনের পর হইতেই বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে। জিনসেন দুইটি পংক্তিতে মাত্র এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) বসন্তসেনা চারুদত্তবিরহে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইলেও একমনে নিজের জীবন এই সেবাব্রতেই উৎসর্গ করিয়াছে, এ কথা এই দুই পংক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। জিনসেন শেষটা বসন্তসেনার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। জিনসেন যেরূপভাবে কলিঙ্গসেনার বারাঙ্গনাসুলভ অর্থপ্রিয়তা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তসেনার উপরও আমাদের হয়ত সন্দেহ হইতে পারিত যে, সে-ও বুঝি প্রথমে অর্থলোভেই চারুদত্তের অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু জিনসেন দেখাইয়াছেন যে নৃত্যকালে চারুদত্তের কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাই বসন্তসেনার অনুরাগোদ্দীপন করিয়াছিল, অর্থলোভের সহিত এই অনুরাগের কিছুমাত্র সংযোগ নাই। নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অবিচল আসক্তি হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে প্রণয়ীর প্রবাসে, বহুবর্ষব্যাপী অদর্শনে, প্রণয়ী জীবিত আছে কি না তাহাও যখন সন্দেহের স্থল, তখন তরুণ যৌবনে সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া, জগতে একমাত্র আপনার বলিয়া পরিচিত মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর গৃহে পরিচর্য্যাবৃত্তি অবলম্বন করাতে বসন্তসেনার চরিত্র জিনসেনের তুলিকাতেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এই অনুরাগ-প্রাবল্যে, নিষ্ঠাবাহুল্যে মোহিত হইয়া জিনসেন লিখিয়া গিয়াছেন, চারুদত্ত প্রীত হইয়া বসন্তসেনাকে গ্রহণ করিলেন। বসন্তসেনা নিশ্চয়ই তখন চারুদত্তের পরিবারভুক্তা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মৃচ্ছকটিকে ও জিনসেনের উপাখ্যানে দুইটি বিষয় অবিকল একই দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তসেনার গাঢ় অনুরাগ ও আসক্তি ও শেষে চারুদত্ত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া তাঁহার পরিবারমধ্যে স্থান-লাভ ইহা উভয়ত্রই বর্ণিত হইয়াছে। তবে মৃচ্ছকটিকে অতি নিপুণ তুলিকায় বসন্তসেনার অনুরাগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। চারুদত্তের চিত্রদর্শন ও উত্তরীয়-স্পর্শে সন্তোষ, চারুদত্তের ভৃত্যের প্রতি স্নেহ, চারুদত্তের পুত্রকে আপনার করিতে নিজের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত ঘটনার দ্বারা শূদ্রক বসন্তসেনার অনুরাগ ফুটাইয়া

(১৩) "তাং শুশ্রূষকরীং শ্বশ্রাং মদনুবৃতসংগতাম্।
শ্রুত্বা বসন্তসেনাঞ্চ প্রীতঃ স্বীকৃতবানহম্॥" (হ—পু।২১।৭৬)

তুলিয়াছেন। কিন্তু জিনসেন সে প্রয়াস পান নাই। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য অন্য-রূপ। বসন্তসেনার প্রণয়-কাহিনী মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রধান বস্তু। কাজেই এই বস্তুকে জীবন্তভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে উপ-স্থাপিত করিবার জন্য চরিত্রগুলির যেরূপ উন্মেষ প্রয়োজন তাহাতে শূদ্রক বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জিনসেন নিজ উপা-খ্যানে এ অংশ বিশদভাবে দেখাইতে অভিলাষী ছিলেন না। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাহা চারুদত্তের ক্লেশবহুল বিদেশে যাপিত জীবনের ঘটনা-গুলি দ্বারা সাধিত হইয়াছে। চারুদত্তের বিদেশ-গমনের হেতু উল্লেখ করিবার জন্যই বসন্তসেনার কাহিনী প্রারম্ভে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু যে অল্পপরিসরে জিনসেন বসন্তসেনার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই যতদূর সম্ভব তিনি বসন্ত-সেনার গাঢ় অনুরাগের পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা চরিত্রে সদ্‌গুণের উল্লেখ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি অতি অল্পস্থলেই আছে। প্রাচীন কিম্বদন্তীতে বোধ হয় বসন্তসেনা চরিত্রের এই বিশেষত্ব প্রচলিত ছিল—গল্পটি আমূল কাল্পনিক না হইতেও পারে। এই কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া পরে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। সুখের বিষয় তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি বসন্তসেনার দিকে। শূদ্রক মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার যে অনুপম আলেখ্য বিন্যাস করিয়াছেন, জিনসেন হরিবংশ-পুরাণ মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও সে চিত্রে কলঙ্করেখা পাত করিতে উদ্যত হন নাই। জিনসেনের ন্যায় জৈনাচার্য্যের পক্ষে ইহা কম উদারতার পরিচায়ক নহে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

---

# আলেয়ার আলো

## সূত্রপাত

### এক

বাদলার ভিজে, স্যাঁত্‌সেতে দিন। সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টি ধরিয়া আকাশটা একটু পরিষ্কার হইয়াছে। এই সুযোগে মোহনলাল আর হরেন্দ্রনাথ বিকালের বেড়ানো শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

মোহন আর হরেন, দুজনে সমবয়সী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মোহনকে দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহার রং ফরসা, মুখচোখ মানানসই, একহারা ছিপছিপে চেহারা, কোমল কণ্ঠ, বিনীত ভাব-ভঙ্গী। কিন্তু হরেনের চেহারা ঠিক তাহার বিপরীত। লম্বায় সে ছয়ফুট, মস্ত চওড়া তাহার দেহ, চ্যাটালো বুক, গায়ের পেশীগুলা যেন লোহা-দিয়া বাঁধানো।

সে পা ফেলে জোরে-জোরে, কথা কয় জোরে-জোরে, হঠাৎ হাসিলে কাছের লোক চম্‌কাইয়া উঠে।

মোহন ধনীর সন্তান; তাহার পিতা কলিকাতায় একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, সেও ডাক্তারী পড়িতেছে। হরেন তাহার সহপাঠী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে।... ...

রাস্তার চট্‌চটে কাদায় জুতা বসিয়া যাইতেছিল; মোহন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ-দিকিন হরেন, এ না-জল না-স্থল,—জলচর কি স্থলচর কোনপ্রকার জীবের পক্ষেই রাস্তার এই অবস্থাটা—"

"—আরামপ্রদ নয়। কিন্তু গাড়ী-চর জীব, যাঁরা গরিবকে দশহাত তফাতে রাখতে চান, তাঁদের সুবিধের জন্যেই জগতে কর্দ্দমের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার কর্দ্দমাক্ত পথে যখন ঘর্ঘর-রবে তাঁদের মোটরের সুদর্শন-চক্র ঘুরতে থাকে, তখন কাদা ছিট্‌কোবার আগেই বিশ্রী গরিব-বেচারীরা মানে-মানে আপনা থেকেই তফাতে ছিট্‌কে পড়ে! আরে মলো, কি আপদ! মোহন, সর—সর—!"

বলিতে-বলিতেই একখানা গাড়ী তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু অল্পদূর গিয়াই থামিয়া পড়িল।

গাড়ীর চাকায় কাদা ছিট্‌কাইয়া দুইবন্ধুর জামাকাপড় চিত্রবিচিত্র করিয়া দিল। মোহন নীরবে গা-হইতে কাদার ছোপ যতটা সম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল; হরেন কিন্তু মহা ক্ষাপ্পা হইয়া গাড়ী এবং তাহার চালক ও আরোহীর উদ্দেশে অনেকগুলা শক্ত অভিশাপ বর্ষণ না-করিয়া থামিতে পারিল না।

হঠাৎ কে ডাকিল, "ও মশাই, শুনছেন! বলি, ও মশাই!"

দুজনেই মাথা তুলিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া এক শ্বেতকেশ বৃদ্ধ হাত-নাড়িয়া তাহাদিগকেই ডাকিতেছেন।

মোহন বলিল, "কি হে, আমাদের ডাকে যে!"

হরেন চটিয়া বলিল, "চুলোয় যাক গে!"

মোহন বলিল, "আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি!"

মোহন গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র ভিতর হইতে বুড়ালোকটি বাহিরে নামিয়া আসিলেন; বলিলেন, "মশাই, ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি! গাড়ীখানা তীরের মত কোথা দিয়ে যে কোথায় এসে পড়ল, কিচ্ছু ঠাহর করতে পারছি না!"

লোকটির রকম-সকম দেখিয়া মোহন বুঝিল, ইনি কলিকাতার বাসিন্দা নন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি দরকার?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এখানে পরশুদিন এসে একখানা বাড়ী ভাড়া করে গিয়েছিলুম, আর আজকে সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং—বুঝতেই পারছেন?"

মোহন বলিল, "রাস্তার নাম আপনার মনে আছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, তা আর মনে নেই? হরিবাবুর গলি।"

মোহন বলিল, "ওঃ! বুঝেছি।"—সে বৃদ্ধকে কোন্‌দিক দিয়া যাইতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল।

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য,

কিছু বুঝলুম না। সুতরাং—বুঝতেই পারছেন ?”

মোহন, বৃদ্ধের কথা কহিবার ধরণ দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “কি ?”

—“অর্থাৎ, আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। আপনি গাড়ীর উপরে দয়া করে উঠে বসুন !”

মোহন একটু ইতস্তত করিতেছিল, হঠাৎ গাড়ীর ভিতরে তাহার চোখ পড়িল। অন্ধকারের মধ্য হইতে মৌন মিনতি-ভরা দুখানি উজ্জ্বল নয়নের মধুর দৃষ্টি তাহার পানে স্থির হইয়া আছে !

মোহন বলিল, “হরেন, তুমি এগিয়ে যাও—এঁদের পৌঁছে দিয়ে আমি যাচ্ছি !”

হরেন তাহার গা-টিপিয়া চুপিচুপি বলিল, “শিভাল্‌রির সুযোগ পেলে ছেড়ো না হে !”

মোহন চোখ রাঙ্গাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—“চুপ !”

বৃদ্ধকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া মোহন গাড়ীর চাল হইতে নামিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! এ ত খুব সোজা পথ দেখচি ! অথচ আমি কিছুতেই চিনতে পারছিলুম না।”

মোহন বলিল, “আপনি বুঝি কলকাতায় থাকেন না ?”

—“না। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক।”

—“আপনাদের দেশ ?”

—“আমাদের দেশ হচ্ছে—”

গাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে বিরক্ত স্বরে কে বলিল, “বাবা—”

বৃদ্ধ থতমত খাইয়া থামিয়া গেলেন—দেশের নাম বলিতে-বলিতে আর বলিলেন না।

মোহন দুটি কথা বুঝিল। প্রথম, গাড়ীর ভিতরে যিনি আছেন, তিনি বৃদ্ধের কন্যা। দ্বিতীয়, দেশের নাম বলিতে এঁদের যখন আপত্তি, তখন ভিতরে কিছু রহস্য আছে।

গাড়ী হইতে বৃদ্ধের কন্যা নামিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আসবাব-পত্র নামানো হইতেছে, এমনসময় ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল।

মোহন বলিল, “আচ্ছা মশাই, নমস্কার !”—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীমুখো হইল।

বৃদ্ধ খপ্‌ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য। ছাতা নেই—এ বৃষ্টিতে যাবেন কি করে !”

মোহন বলিল, “এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও ত ভিজতে হবে ?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “বাঃ, ভিজবেন কেন, আমার বাড়ীর ভিতরে আসুন না ! আমাদের জন্যেই ত আপনি এই বিপদে পড়লেন ! সুতরাং—”

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মোহনকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ ডাকিলেন, “ওমা সরমা, এদিকে একটা লণ্ঠন দিয়ে যা ত !”

একটি হারিকেন ল্যাম্প হাতে করিয়া বৃদ্ধের কন্যা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে-আসিতে বলিল, “বাবা, সে ভদ্রলোকটি চলে গেছেন ?—ওমা—”

পিতার সঙ্গে মোহনকে বাড়ীর ভিতরে

দেখিয়া আলোটা মাটির উপরে ভুম্-করিয়া বসাইয়া দিয়া সরমা একছুটে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

কিন্তু মোহনের সাবধানী চোখ, চকিতের মধ্যেই সরমাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল—এ যে উদ্দীপ্ত চপলা! এমন রূপ ত সহজে চোখে পড়ে না!

বৃদ্ধ, মোহনের কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন, "এখানে খাবারের দোকান কোথায় আছে বল্‌তে পারেন? আজ ত আর রান্না চড়বে না, কিনে খেতে হবে; সুতরাং—"

উপকার করিবার এমন সুযোগ হাতে পাইয়া মোহন তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনাদের একটা ছাতা আমাকে দিন না—আমি খাবার-দাবার সব এনে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ কুণ্ঠিতভাবে আরো-দুচারবার না না করিয়া শেষে একটি ছাতা আনিয়া দিলেন।

মোহন ছাতা লইয়া চলিয়া গেল।

সরমা বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা, ভদ্রলোকের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে! এই বৃষ্টি মাথায় করে আমাদের জন্যে উনি খাবার আনতে গেলেন!"

—"কি করব মা, উনি যে শুনলেন না!"

—"পয়সা দিয়েছেন ত?"

—"ওই যাঃ!—কি আশ্চর্য্য!"—মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া অত্যন্ত অপরাধীর মত বৃদ্ধ মাথা চুলকাইতে সুরু করিলেন।

সরমা হাসিয়া বলিল, "দিন-কে-দিন তুমি যেন কী হচ্ছ! তোমার ছেলেমানুষী আর গেল না। যাহোক, উনি ফিরে এলে হিসেব করে পয়সাগুলো দিয়ে-দিও!"—তার পর একটু থামিয়া কি-ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমাদের ত একটা ঝীয়ের দরকার হবে, ওঁকে বললে হয় না? উনি আমাদের এ উপকারটুকুও করে দেবেন বোধ হয়।"

—"আচ্ছা মা, বলে দেখব।"

এমনি-সব কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় খাবারের চাঙ্গারি হাতে-করিয়া মোহন আসিয়া হাজির হইল।

## দুই

ভোরবেলা। বৈঠকখানার জানলার কাছে বসিয়া মোহন, বর্ষণক্লান্ত নীল-নির্মেঘ আকাশের দিকে আনমনে চাহিয়াছিল। পৃথিবীতে আমাদের চোখের সুমুখ দিয়া নিত্য নূতন লোকের মুখ চলিয়া যায়; তাহারই মধ্যে আকস্মিক বিস্ময়ের মত মাঝে-মাঝে এমন এক-একটি সুন্দর মুখ আমাদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে যে, সেই মুহূর্ত্তের দেখা আমরা আর সহজে ভুলিতে পারি না। মোহনও কাল পথের মাঝে এমনি একখানি মুখ দেখিয়াছে, সে মুখের মোহিনী-শক্তিতে এখনো সে অভিভূত হইয়া আছে!

এমনসময়ে হরেন বাহির হইতে ডাকিল, "মোহন আছ হে!"

—"আছি। ভিতরে এস।"

হরেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর!"

—"তারপর মানে?"

—"এও ব্যাখ্যা করতে হবে? তারপর—অর্থাৎ, কালকের ব্যাপারটা!"

মোহন একটু হাসিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

হরেন মুরুব্বিয়ানা চালে মোহনের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "বাহাদুর, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভদ্রলোকের নাম জেনেছ?

—"মুরারি-বাবু।"

—"জাতি?"

—"আমাদেরই।"

—"সুসংবাদ! অতঃপর প্রাণপণে সুন্দরীর হৃদয়-দুর্গ অবরোধ কর—আত্ম-সমর্পণ না করলে কিছুতেই ছাড়বে না।"

মোহন কোন জবাব দিল না। একটা সিগারেট ধরাইয়া আস্তে-আস্তে টানিতে লাগিল।

হরেন বলিল, "বেশ ভাল করে দেখে এসেছ ত, নায়িকার কপালে সিঁদুর নেই? ঐ একফোঁটা সিঁদুরের উপরেই কিন্তু সমস্ত নির্ভর করছে!"

—"না, সে আমি দেখেছি।"

—"মোহন, ওঠ—জাগ! জীবনে সুযোগ দু-বার আসে-না। অনূঢ়া তরুণীর হৃদয়টা হচ্ছে শিরোনামা-হীন প্রেমপত্রের মতন। একটু চেষ্টা করলেই এ পত্রের শিরোনামায় তোমার নাম বসে যেতে পারে!"

—"কিন্তু তুমি যে এখন থেকেই কাল-নেমির লঙ্কাভাগ সুরু করে দিলে হে! কোথাও কিছু নেই, একেবারে বিবাহ! আর, আমি যে বিবাহ করব, তাই বা তোমাকে কে বল্‌লে?"

—"আরে রাখ, রাখ! বয়স যখন চব্বিশ, প্রাণ তখন শুক্‌নো খড়ের গাদার মতন। কাছে আগুন আন্‌লে আর কি বাঁচোয়া আছে? যৌবনলাভ করে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু ফুটলেই সে সব-চেয়ে যে অজ্ঞানের কাজ করে, তার নাম হচ্ছে, বিবাহ!"

—"সবতাতেই তোমার হাসি-তামাসা?"

—"হ্যাঁ। বন্ধু, মাতৃগর্ভ ত্যাগ করেই আমরা যে কান্না সুরু করি, সে কান্না মরণের আগে আর থামে না। এর মধ্যে যখনি অবকাশ পাবে, প্রাণপণে হেসে নেবে। হাসি হচ্ছে জীবনের সার, মানুষের প্রাণ!"

—"হাসি-তামাসা বরং সওয়া যায়—কিন্তু অসময়ে দার্শনিকতার লেক্‌চার—এ একেবারে অসহ! তুমি থাম।"

—"আমি থামলে, তোমাকে সুরু করতে হয় যে। একঘরে দুজনে চুপচাপ বসে থাকা, দার্শনিকের লেক্‌চারের চেয়েও আরো-বেশী অসহ।"

—"বসে থাকবারই বা সময় কৈ! ঝীকে বলে দিয়েছি, সে এখনি একটা লোক নিয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে আমাকে মুরারিবাবুর বাড়ী যেতে হবে।"

—"সেক্ষেত্রে, আমার পক্ষে চট্‌পট্ উঠে পড়াই হচ্ছে উচিত কার্য্য।

—"তা কেন, তুমিও চলনা—মুরারি-বাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসবে।"

—"এখানে আলাপ মানে বিলাপ।"

—"কেন?"

"বন্ধু, একটিমাত্র রসগোল্লা দুটি বালকের হাতে দিলে কাড়াকাড়ি হয়; একটিমাত্র রমণীও দুটি যুবকের ভাগে পড়লে

কাড়াকাড়ি, আড়াআড়ি এবং ছাড়াছাড়ি অনিবার্য্য। অতএব, বিদায়!"

মোহন যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল, তখন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আপনমনে এস্রাজ বাজাইতেছিলেন।

মোহনের গলা পাইয়া তিনি তখনি বাজনা থামাইলেন। তারপর অত্যন্ত স্নেহভরে আল্‌তো ভাবে এস্রাজটিকে তক্তাপোষের উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, আমি আপনারই অপেক্ষায় ছিলুম।"

মোহন সঙ্গের দাসীকে দেখাইয়া বলিল, "এই স্ত্রীলোকটি আপনার বাড়ীতে কাজ করবে, এ-কে সব বুঝিয়ে দিন।"

—"কি আশ্চর্য্য! আপনি একেবারে সঙ্গে করেই লোক নিয়ে এসেছেন? ভগবান আপনাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, নৈলে আমাদের কি মুস্কিলেই যে পড়তে হোত!"

মোহনকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া, মুরারিবাবু দাসীকে লইয়া ভিতরে গেলেন।

মোহন দেখিল, ঘরের ভিতরে একটি এস্রাজ, একখানি বেহালা ও একটি পাখোয়াজ রহিয়াছে। যন্ত্রগুলি যে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, তাহাদের চাকচিক্য দেখিলে সেটা বুঝিতে দেরি হয় না। মোহন জানিতে পারিল, মুরারিবাবুর গান-বাজনার বেশ সখ আছে। ইহাতে তাহারও মন ভারি খুসী হইয়া উঠিল; কারণ সেও ছেলেবেলা হইতে গান-বাজনা ভালবাসে—আপনার স্বাভাবিক সুকণ্ঠকে চর্চ্চায় দ্বারা সে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

মুরারিবাবু ঘরে আসিয়া ঢুকিলে, মোহন যন্ত্রগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনার দেখছি বাজ্‌না-টাজ্‌নাও আসে।"

মুরারিবাবু বসিয়া দুলিতে-দুলিতে বলিলেন, "সামান্য। দুনিয়ার হের-ফেরে মনটা যখন দমে যায়, তখন ঐ এস্রাজের সঙ্গে আমি আমার প্রাণের কথা কই—ও সুধু আমার দুঃখের দোসর নয়,—সুখের সময়ও ও আমার একমাত্র প্রাণের সখা!"

মোহন বলিল, "আপনি কি এখানে একলা থাকবেন, না আর কেউ আসবেন?"

মুরারিবাবু জানলা দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া একটু ভারি গলায় বলিলেন, "কে আর আসবে, কে আর আমার আছে? আপন বলতে যারা ছিল, তাদের সবাইকে একে একে চিতায় তুলে দিয়েছি, এখন আছে সুধু ঐ মেয়েটি—তা ও অভাগীর থাকা না থাকা দুই সমান!"

—"কেন?"

—"সরমা বিধবা।"

মোহন অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল; এতক্ষণ সে মনে মনে যে রঙ্গিন ছবি আঁকিতেছিল, কে যেন তাহার উপরে হঠাৎ এক-ধ্যাবড়া কালি ঢালিয়া দিল। অত্যন্ত দমিয়া গিয়া হেঁটমাথায় সে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

মুরারিবাবুও স্তব্ধভাবে বসিয়া-বসিয়া আপনার দীর্ঘ দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

খানিক পরে মোহন কথা কহিল।

দুঃখিতভাবে বলিল, "আহা, এত অল্পবয়সে বিধবা!"

তাহার সমবেদনায় গলিয়া গিয়া মুরারিবাবু বলিলেন, "বাবা, এ বুড়োর বুক ভেঙ্গে গেছে। আজ যদি আমি যাই, কাল ওর দশা কি হবে,—আমি তাই ভাবি। আমার সরমাকে কে দেখ্‌বে? সমাজ সুধু শাস্তি দিতেই জানে, দয়া করা তার ধর্ম্ম নয়!"

মোহন বলিল, "কেন, আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে কি কেউ নেই?"

—"সে না-থাকারই মধ্যে। জামাইয়ের দুই ভাই আছেন, কিন্তু জামাই যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন-ই ভায়ে ভায়ে সদ্ভাব ছিল না, সুতরাং—" মুরারিবাবু হঠাৎ কি-ভাবিয়া থামিয়া গেলেন,—মোহন সেটা বুঝিয়াও কোন কথা কহিল না।

খানিক পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুরারিবাবু অন্যমনস্কভাবে এস্রাজটি কোলের উপরে তুলিয়া লইলেন। ছড়ির দু-একটি টানে এস্রাজের তারে-তারে যে করুণ সুরের রিঞ্জিনী ফুটিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়াই সুরজ্ঞ মোহন বুঝিল, বাজনায় এঁর অসাধারণ হাত!

এস্রাজ যেন কথা কহিতেছে,—সুরের কান্নার সঙ্গে বাদকের প্রাণের আবেগও যেন ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে! হঠাৎ বাজনা থামাইয়া মুরারিবাবু বলিলেন, "মশাই, বুড়োর বক্‌বকানিতে কিছু মনে করবেন না। মনের দুঃখ হাসি-খুসিতে চেপে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না—মুখ ঠেলে আপনি বেরিয়ে পড়ে।"

—"মুরারিবাবু, আপনার দুঃখে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। এতে আমার বিরক্ত হবার কি আছে? অন্যের দুঃখে যে বিরক্ত হয়, তাকে মানুষ বলে মনে করা চলে না;—মানুষ, মানুষের কাছ থেকে যদি একটু সমবেদনাও না পায়, তাহলে সংসারে আর অরণ্যে তফাৎ কি?"

—"আপনার মত প্রাণ ত সকলের নয় মোহনবাবু! আমার ব্যথার ব্যথী হওয়া দূরের কথা, অনেকেই আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ত্রুটি করে-নি"—বলিতে-বলিতে আবার হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া মুরারিবাবু কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আবার আমি নিজের কথাই পাঁচকাহন করছি! ছোকরারা এইজন্যেই বুড়োদের দূর থেকে নমস্কার করে!"

মোহন বুঝিতে পারিতেছিল যে, মুরারিবাবু তাহার কাছ হইতে কোন-একটা কথা চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় মুরারিবাবু যখন তাঁহার দেশের নাম বলিতে যাইতেছিলেন, তখনও তাঁহার কন্যা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন! এইসব নানাকারণে মুরারিবাবুর কথা জানিবার জন্য মোহনের মনে কেমন-একটা কৌতূহল হইতেছিল। কিন্তু এ অন্যায় কৌতূহলকে দমন করিয়া সে বলিল, "আমি কিন্তু আপনাকে কাছ থেকেই নমস্কার করে আজকের মতন বিদায় হচ্ছি।"

নমস্কার করিয়া মোহন উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুরারিবাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! বড্ড ভুলে গেছি মোহনবাবু, বড্ড ভুলে গেছি!"

—"কি ?"

—"আপনার বিদায়ী নমস্কার ত এখনি নেওয়া হতে পারে না মশাই !"

—"কেন ?"

—"সরমা বলে দিয়েছে, আপনাকে সামান্য-কিছু জলযোগ করতে !"

—"জলযোগ ? এ-সব গোলযোগ কেন মুরারিবাবু ?"

—"কাল আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আজ যদি আমাদের কষ্ট দিয়ে আপনি তার শোধ তুলতে চান, তাহলে যেতে পারেন।"

মোহন একটু হাসিয়া আবার বসিল। মুরারিবাবু খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "সরমা একলাটি খাবার তৈরি করছে; একটু দেরি হতে পারে। এটুকু সময় চুপ করে বসে থেকে কি হবে ? সুতরাং—!" বলিয়া, তিনি এস্রাজের তারে আবার ছড়ির টান লাগাইয়া দিলেন; সুরের মূর্চ্ছনা, তান ও গিট্‌কিরির ভিতর দিয়া সিন্ধুভৈরবীর মধুর আলাপ মোহনের প্রাণটাকে একেবারে মাত্ করিয়া তুলিল।

## তিন

সেদিন মুরারিবাবুর বাড়ীতে জলযোগ করিতে বসিয়া, মোহনের মনে যে দুঃখ-মিশ্রিত আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, আজও সে তা ভুলে নাই। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সরমা তাহাকে পরিবেষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পিছনে এলানো কালো কেশের রাশি, চাঁপাফুলের মতন গায়ের ফুট্‌-ফুটে রং, নত নেত্রের শান্ত দৃষ্টির আভাস—কাপড়ের আবরণে এ-সব কিছুই ঢাকা পড়ে নাই! আর, সেই যে দুখানি ছোট ছোট ননীর মত নরম হাত—যে হাতদুটি খাবারের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়াছিল, সে হাত-দুখানিও কি সুডৌল, কি সুশ্রী! সেই নধর হাতের ফুলের পাপড়ির মত নুয়ে-পড়া আঙ্গুলগুলি, আঙ্গুলের ধারে-ধারে গোলাপী রঙ্গের নখগুলি, এ সমস্তই মোহনের মনে একেবারে ছবির মত গাঁথিয়া গিয়াছে। সামনে ডাক্তারী বই খোলা রহিয়াছে, ছাপার হরফ আড়াল করিয়া সেদিনকার ছবি মোহনের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে! ইহার মধ্যে হরেন আসিয়া কখন্ যে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—মোহন তাহা একটুও টের্ পায় নাই। হরেন কৌতুকভরে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সুর-করিয়া বলিল—

'কে যোগেন্দ্র, যোগাসনে,
ঢুলুঢুলু দুনয়নে,—
কাহারে ধেয়াও ?'

"হ্যাঁ হে মোহন,—শুনতে পাচ্ছ কি ? না, তোমার তপোভঙ্গের জন্যে আবার মদনের সন্ধানে যাত্রা করতে হবে ?"

সচকিতে ফিরিয়া মোহন দেখিল, হরেন। হাসিয়া বলিল, "এই যে, তোমায় আমি দেখতেই পাই-নি।"

—"দেখতে যে পাবেনা, এ ত ধরা কথা !"

—"কেন, কেন ?"

—"কারণ, কিউপিড যে অন্ধ ! তুমি এখন তাঁরই মন্ত্রশিষ্য কি না !"

—"ভাই, ভগবান যে চোখ দিয়েছেন, তা সুমুখ ছাড়া পিছনদিকে ব্যবহার করা অসম্ভব। তুমি আছ পিছনদিকে, কাজেই তোমাকে দেখতে না পাওয়া আমার পক্ষে কিছুই অন্যায় হয়-নি।"

—"তোমার যুক্তি অকাট্য। যাক্ সে কথা। বলত, এ ক-দিন তোমাকে দেখিনি কেন? কলেজেও যাও-নি, ব্যাপার কি?"

—"শরীরটা তেমন ভাল ছিলনা।"

—"তারপর, ওদিককার খবর কি? আশাজনক?"

মোহন তিক্তস্বরে বলিল, "ভাই, ও-সব কথা আর ভেবে কাজ নেই।"

—"কেন?"

—"সরমা বিধবা।" মোহন সমস্ত খুলিয়া বলিল।

হরেন স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর বলিল, "যাক্‌গে, কি আর হবে! বিবাহের আগে মানুষ, মানুষই থাকে; কিন্তু বিবাহের পরে সে কেবলমাত্র 'স্ত্রীর স্বামী'তে পরিণত হয়। এ দুর্ভাগ্য থেকে তুমি বেঁচে গেছ হে!"

মোহন নিরুত্তর হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

খানিক পরে কি ভাবিয়া হরেন বলিল, "আচ্ছা, মুরারিবাবু কোন্ শ্রেণীর লোক বলতে পার?"

—"তোমার কথার মানে?"

—"তিনি গোঁড়া হিন্দু, না নব্যতন্ত্রের লোক?"

—"সেটা আমি ঠিক করে বলতে পারব না। তবে, এই অল্প আলাপেই তাঁর মেয়ে আমার সামনে বেরিয়েছিলেন—অবশ্য, ঘোমটায় মুখ ঢেকে।"

—"এতে কিছুই বোঝা গেল না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতাকে ঘোমটার ঢাক্‌নীতেই অক্ষুণ্ণ রেখে নিশ্চিন্ত থাকেন। দেখ মোহন, তুমি মুরারিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। দেখা যাক, তিনি কোন্ মতের লোক।"

—"তাতে লাভ?"

—"মুরারিবাবু নব্যতন্ত্রের লোক হলে এখনো তুমি আশা করতে পার।"

"—কি-রকম?"

—"হিন্দুসমাজে এখন বিধবা-বিবাহ অচল নয়।"

—"সে কি!"

—"হ্যাঁ। তোমার মাথার উপর তোমাকে বাধা দেয়, এমন কেউ নেই। অনেকের পক্ষে যা অসম্ভব, তোমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব।"

মোহন আনমনে ভাবিতে লাগিল—কিছুই বলিল না।

হরেন বলিল,—"মুরারিবাবু যদি একেলে মতের লোক নাও হন, তাহলেও তুমি তাঁর অন্ধ পিতৃস্নেহের উপর নির্ভর করতে পার। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর মেয়ের কি হবে, সে ভাবনা তাঁর পক্ষে যতটা গুরুতর, বিধবা-বিবাহের ভাবনা ততটা নয়।"

—"কিন্তু—কিন্তু, বিধবাবিবাহের ফল কি ভাল হবে?"

—"কেন হবে না?"

এমনি কথাবার্ত্তা হইতেছে, হঠাৎ

বাহির হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে কে ডাকিল, "বাবু ঘরে আছেন ?"

মোহন বলিল, "কে ?"

—"আমি মুরারিবাবুদের ঝী।"

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ভিতরে এস।"

একটি স্ত্রীলোক উদ্বিগ্নমুখে ব্যস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে আসিল। মোহন চিনিল—সেই-ই ইহাকে সঙ্গে করিয়া মুরারিবাবুর বাড়ীতে কাজ করিতে লইয়া গিয়াছিল।

মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ঝী ?"

—"কি-জানি বাবু, কে একটা লোক মদ খেয়ে এসেছে, তার সঙ্গে আর-একটা গুণ্ডার মত লোক, বাবু তাদের যেতে বললেও নড়চে না। তাই দিদিমণি আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।" সে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিল।

মোহন তাড়াতাড়ি কাগজখানা তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিল। পরিষ্কার, ছোট ছোট অক্ষরে সুধু লেখা আছে—

"বড় বিপদ। দয়া করে আসুন।"

মোহন বিস্মিতভাবে হরেনের মুখের দিকে চাহিল।

হরেন তখনই জুতা পরিতে-পরিতে বলিল, "হাঁ-করে চেয়ে দেখছ কি! চল, চল, আমিও সঙ্গে যাব।"

মোহন তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় হরেন ঘরের কোন্ হইতে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া গেল।

## চার

দুই বন্ধুতে যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা। মুরারিবাবুর বৈঠকখানার ভিতরে অচেনা গলায় কে বলিতেছিল, "আপনি আমার কথায় কেন যে রাজি হচ্চেন না, তা ত বুঝতে পারচি না।"

—"কি আশ্চর্য্য! বাপ কখনও এমন কথায় রাজি হতে পারে ?"—এ মুরারিবাবুর গলা।

—"আচ্ছা, আপনি ত বুড়ো হয়েচেন, কখন্ আছেন কখন্ নেই, আপনি যখন থাকবেন না তখন আপনার মেয়েকে ত ঘর ছেড়ে পথেই দাঁড়াতে হবে ?"

—"তখন ভগবান আছেন!"

ভগবানের নামে ঘরের ভিতর হইতে আর-একজন কে ব্যঙ্গভরে কর্কশস্বরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহন ও হরেন আর দাঁড়াইল না—একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। একদিকে মুরারিবাবু শান্তমুখে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন,—আর-একদিকে আর-দুজন লোক। একজনের চেহারা সৌখীন ভদ্রলোকের মত; আর-একজন যেন সাক্ষাৎ সয়তান।

আচম্কা মোহন ও হরেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহারা দুজনেই দাঁড়াইয়া উঠিল। ভদ্রবেশী লোকটি বিস্মিত ও বিরক্ত ভাবে বলিল, "কে আপনারা ?"

হরেন হাতের লাঠিগাছটা ঠক্-ঠক্ শব্দে মেঝের উপর ঠুকিতে-ঠুকিতে আগাইয়া গেল; জোর-গলায় পরিষ্কার স্বরে বলিল,

"আপনারাও যা, আমরাও তাই। অর্থাৎ —এককথায় বলতে গেলে, মনুষ্য!"

—"এখানে কেন?"

—"তাতে কি মহাশয়ের আপত্তি আছে?"—বলিতে-বলিতে হরেন একেবারে তাহার সামনে বুক ফুলাইয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

হরেনের সেই ছয়ফুট বিশাল দেহ ও সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখিয়া লোকটা থতমত খাইয়া দু পা পিছাইয়া গেল।

হরেন ফিরিয়া মুরারিবাবুকে বলিল, "আপনারই নাম বোধহয় মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু হতভম্বের মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন অত্যন্ত উদ্ভট একটা স্বপ্ন দেখিতেছেন!

—"এঁরা কি আপনার চেনা লোক?"

মুরারিবাবু ভয়ে-ভয়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এঁরা জোর করে আমার বাড়ীতে ঢুকেছেন।"

—"সেক্ষেত্রে আমাদেরও উচিত হচ্ছে এঁদের আবার জোর করেই বাইরে বার করে দেওয়া।"

গুণ্ডার মত লোকটা এতক্ষণ সামনের দিকে হুমড়ি খাইয়া, বাঘের মত চোখ পাকাইয়া বসিয়াছিল। হরেনের কথা শুনিবামাত্র সে তড়াক্ করিয়া একলাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কী, জোর করে বার করে দেবে?"

হরেন স্থির স্বরে বলিল, "বাবাজী, আগে আমার কথা শোন, তার পর যত-খুসী লাফালাফি কোরো। প্রথমত, আমি আজ আট বৎসর রোজ নিয়মমত কুস্তী লড়ে আসছি। দ্বিতীয়ত, আমি দুহাতে দু-মণ করে চারমণ জিনিষ অনায়াসে তুলতে পারি। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে, তুমি কি তা পরখ করতে চাও?"—বলিয়া হরেন, শান্ত ভাবে অথচ তাচ্ছীল্যের সহিত জামার আস্তীন গুটাইতে লাগিল।

লোকটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে-করিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হরেনের হাতের স্ফীত ও দৃঢ় মাংসপেশীর দিকে চাহিয়া রহিল। হরেন বলিল, "মোহন, লাঠিগাছটা তুমি নিয়ে বেশ করে বাগিয়ে ধর ত! আমি এদের দুজনকে দুহাতে ধরে দেয়ালের সঙ্গে চেপে রাখব, আর তুমি লাঠিগাছটা এদের দেহের উপর আচ্ছা-করে ঠুকে দেখবে, লাঠিটা আগে ভাঙ্গে, না এদের হাড়গোড়গুলো আগে গুঁড়ো হয়,"—তারপর আগন্তুকদের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "মহাশয়গণ, আমার বক্তব্য আপনাদের কর্ণগোচর হয়েছে, আশা করি। এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে আর-একবার আপনাদের সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা থাকতে চান, না যেতে চান?"

হরেনের কথাবার্ত্তা কহিবার ধরণ-ধারণ দেখিয়া লোকদুটি দস্তুরমত ভড়্কাইয়া গেল। তারপর দু-একবার এ-উহার মুখের পানে চাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহারা আস্তে-আস্তে শুষ্কমুখে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

একটু পরেই রাস্তা হইতে শোনা গেল, "আচ্ছা বাবা, এক পোষে শীত পালায় না —আমরাও ছাড়ব না, দেখে নেব!"

হরেনও জানলায় মুখ বাড়াইয়া তাহাদের

শুনাইয়া বলিল, "তোমরা ছাড় না ছাড়, এটা ঠিক জেনো যে ফের এ-মুখো হলে আমরাই আর তোমাদের ছাড়ব না, টুঁটি ধরে পুলিশে পাঠাব। এ মগের মুল্লুক নয়, এ কলকাতা!"

বাহির হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মুরারিবাবু এতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন উঠিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "মশাইরা, আপনাদের আর কি বলব—আপনাদের জন্যেই আজ আমি মানে-মানে বেঁচে গেলুম!"

মোহন বলিল, "এরা কে মুরারিবাবু?"

—"এরা সয়তান, এদের জন্যেই আজ আমি দেশছাড়া। কিন্তু এখানেও এরা আমাকে খুঁজে বার করেছে।"

—"মুরারিবাবু, আপনি আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না, আমাদের দিয়ে আপনার কোন অপকার হবে না। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এরা কেন আপনার পিছনে লেগেছে, আর কেনই-বা আপনি দেশ ছেড়েছেন?"

মুরারিবাবু খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কাছে আমি ঋণী—আপনারা যে আমার বন্ধু, তাও আমি জানি। আমি আর কিছুই লুকোবো না, সমস্তই বলব। কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্য থাকবে কি?"

—"নিশ্চয়। আপনি বলুন।"

## পাঁচ

মুরারিবাবু যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই:—

"আমার দেশ শান্তিপুরে।

সরমা যখন চার-বছরের, তখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সে আজ ষোলবছরের কথা।

সরমা আমার বৃদ্ধবয়সের সন্তান—তাই বড় আদরের। বিশেষ, সে ছাড়া আমার আর কোন সন্তানও হয়-নি।

এই মা-হারা মেয়েটিকে আমি একলা সারা প্রাণ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি। পৈত্রিক সামান্য যা-কিছু পেয়েছি, তাইতেই যেমন তেমন করে আমার সংসার চালিয়ে এসেছি। বড়মানুষী করতে পারি না বটে, কিন্তু না-খেয়ে মরবার ভয়ও নেই।

সরমা আমার রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত। আমি তাকে লেখাপড়া শেখাতেও ত্রুটি করি-নি। ঘরকর্ণার কাজ সে নিজে-নিজেই সমস্ত শিখেছে; রান্নায় তার এমনি হাত যে, দ্রৌপদীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।

আমার এই একমাত্র সন্তান যাতে সৎ-ঘরে, সৎপাত্রে পড়ে সে চেষ্টা করতেও আমি কিছু কসুর করি-নি। অনেক দেখে-শুনে, আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্যয় করে, সরমাকে আমি এক বনেদী ঘরের পাশ-করা ছেলের হাতে সঁপে দি। আমার জামাইয়ের নাম সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

কিন্তু বিবাহের কিছু দিন পরেই জানা গেল, সুরেন্দ্র লম্পট, মাতাল,—আর সব-চেয়ে যা খারাপ—সে আমার সোনার প্রতিমা সরমার উপর অত্যাচার করে।

বিবাহের বছর-দুই পরেই সরমার শ্বশুর মারা যান। তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই

বিষয় নিয়ে সুরেন আর তার ভায়েদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মোকদ্দমা সুরু হোল। মোকদ্দমায় অনেক টাকা নষ্ট হয়, বাকী যা থাকে, সুরেনের বদ্‌খেয়ালীতে তাও উড়ে যায়।

বিবাহের পর সরমা মোটে বছরখানেক শ্বশুরঘর করেছিল। তারপর থেকে সে আমার কাছেই আছে। সুরেন যতদিন বেঁচেছিল, স্ত্রীকে নিয়ে যাবার নাম করে-নি। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করে বারকতক টাকা চেয়ে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল—কিন্তু, আমি কোন জবাব দিই-নি। কেননা, তার খাঁই মেটাতে পারি, এমন সঙ্গতি আমার ছিল না।

এর পর কিছুদিন সুরেনের আর কোন খোঁজখবর পাই-নি। শ্রীরামপুরের বাস্তু-ভিটে বিক্রী করে সে কলকাতায় চলে যায়। কোথায় থাকত, কেউ জানত না। খোঁজ করেও তার সন্ধান পাই-নি। স্বামীকে চেনবার সুযোগ সরমার ভাগ্যে ঘটে-নি, স্বামীর স্মৃতিও তার পক্ষে সুখস্মৃতি ছিল না। আমি তার মনকে শান্ত রাখবার জন্যে তাকে এস্রাজ ও বেহালা বাজাতে শিখাতুম। ঘরকন্নার কাজ, রান্নাবান্না, লেখাপড়া আর বাজনা নিয়েই এ ক-বছর সে কাটিয়েছে।

বছরখানেক আগে হঠাৎ কাশীধাম থেকে এক পত্র পাই। সুরেনের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কাশীতে থাকতেন। চিঠি লিখেছিলেন তিনিই। সেই চিঠি পড়ে জানলুম, সুরেন মাতাল অবস্থায় গঙ্গায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। সরলার স্বামীর নাম

এর মধ্যে আর-এক হাঙ্গাম বাধল। আমাদের পাড়ার এক ধনী জমিদারের কুদৃষ্টি সরমার উপর পড়ল। সেই পাষণ্ডই তার এক সঙ্গীর সঙ্গে আজ এখানে এসেছিল। এই নির্দ্দয় লোকটা আমার—আমি বাপ—আমার কাছেই সরমার সম্বন্ধে কুপ্রস্তাব করে—এত বড় তার বুকের পাটা! প্রথম-প্রথম সে কাকুতিমিনতি করত, তারপর ক্রমেই আমার উপর অত্যাচার সুরু হোল। আমি গরীব, সে ধনী। কি করি, পাড়া-পড়্‌শীর আশ্রয় নিলুম। কিন্তু পাড়া-পড়্‌শীরা লোককে একঘরে করতে জানে, বিপদে ফেল্‌তে জানে—বিপদে সাহায্য করতে জানে না। ধনীর সাতখুন মাপ্! দুঃখের কথা বলব-কি,—যে গরীব, সেও দুষ্ট ধনীর পক্ষেই দাঁড়ায় আর-এক গরীবকে পায়ে থেঁৎলাতে! শেষে আমার উপরে অত্যাচার এমন বাড়ল যে, আমার পক্ষে দেশে তিষ্ঠান দায় হয়ে উঠ্‌ল। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন চুপি-চুপি দেশ ছেড়ে চলে এলুম। কিন্তু দেশত্যাগী হয়েও শান্তি নেই, এখানেও আমার পিছনে দেখছি, ছায়ার মত শনি লেগে আছে।

জানিনা ভগবানের কি ইচ্ছা, এ-বয়সে আমাকে তিনি আরো কত শাস্তি দিতে চান!"

## ছয়

মুরারিবাবু তাঁহার কাহিনী বলিয়া চিন্তিত মুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোহন আর হরেনও কিছু বলিল না।

থাকা হরেনের ধাতে কিছুতেই বরদাস্ত হইত না। সকলের আগে সেই-ই মৌন ভঙ্গ করিল। তক্তাপোষের উপরে জোরে ঘুষি মারিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! রাস্কেলদুটোকে হাতে-পেয়েও অমনি-অমনি ছেড়ে দিলুম! একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল যে!"

মুরারিবাবু দুশ্চিন্তায় এমনি বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন যে, এতক্ষণ হরেনের প্রতি তাঁর লক্ষ্যই হয় নাই। এখন হরেন কথা কওয়াতে হঠাৎ তাঁহার হুঁস্ হইল। তিনি লজ্জিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি অযাচিত ভাবে আমাদের এতবড় উপকারটা করলেন, আর এতক্ষণেও আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-নি! সুতরাং—"

—"সুতরাং, নিজের ঢাক আমি নিজেই বাজাব। আমি হচ্ছি শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, মেডিকেল কলেজের ষ্টুডেণ্ট, শ্রীযুক্ত মোহনলাল মজুমদার বি-এ আমার বন্ধু। আর-কিছু জানতে চান?"

—"হরেনবাবু, আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না।"

—"কেন পারবেন না— আলবৎ পারবেন! ঐ যে বল্লেন, রন্ধনে আপনার কন্যা দ্রৌপদীর মত, তার পরিচয় আমি যেদিন পাব, সেইদিনই কৃতজ্ঞতার ঋণ থেকে আপনাকে মুক্তি দেব!"

মুরারিবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এত সহজে যদি ধারশোধ হয়, তাহলে এখনি আমি সে বন্দোবস্ত করছি!" তিনি আস্তে-আস্তে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

মোহন মুখভার করিয়া বলিল, "অসভ্য! পেটুক! এ-সব কথার আর যেন সময় পেলেন না!"

হরেন দুষ্টামির হাসি হাসিয়া চুপিচুপি বলিল, "তোমার মুখে শুনেছি, দ্রৌপদী স্বহস্তে পরিবেষণ করেন। আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে চাই! আমার লক্ষ্য তাঁর প্রতি—ভোজনটা উপলক্ষ্য! বুঝলে মূর্খ?"

মুরারিবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সরমা আপনার কথা ও-ঘর থেকে শুনতে পেয়েছিল হরেনবাবু! সুতরাং—"

—"সুতরাং আপনি প্রস্তাব দাখিল করবার আগেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে গেছে—কেমন, এইত? শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।"

প্রথম আলাপেই পরিচয় জমাইয়া তুলিতে হরেন একেবারে অদ্বিতীয়। সুধু তাই নয়, আসর জমকাইবার ক্ষমতাও তাহার অদ্ভুত ছিল—গভীর ও তরল যে কোন বিষয়ের আলোচনাই হউক না কেন—সমানভাবে সে সব-তাতেই যোগ দিতে পারিত। এইজন্য যে তাহার সহিত একদিন ভাল-করিয়া মিশিত, তাহারই হৃদয়ের মধ্যে হরেন একটি চিরদিনের আসন দখল করিয়া লইত।

আজও সে মুরারিবাবুর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ তুলিল। তাহার মত্‌লোব্ ছিল, মুরারিবাবু কোন্ মতের লোক, কোনরকমে সেটা জানিয়া লওয়া। সে এমন কৌশলে নানা কথার মধ্য দিয়া আপন উদ্দেশ্যে গিয়া পৌঁছিল যে, সরলপ্রাণ মুরারিবাবু কিছুই সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

কথায়-কথায় হরেন বলিল,—"আমাদের সমাজের বিধবাদের কথা আপনি ভেবে

দেখেছেন কি? আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি, দেবী। তাই মনে করি ঐ পাষাণ-প্রতিমা দেবীর মত তাঁরাও বুঝি পাষাণে তৈরি। তাঁরা যে মানুষ, তাঁদের যে রক্ত-মাংসের শরীর—পৃথিবীর এই আলো-বাতাস যে তাঁদের দেহ মনের উপর সাড়া জাগায়, এখানকার হর্ষ-শোকের তুফান যে তাঁদের প্রাণকেও দোলা দেয়, এ-কথা আমরা স্বীকার করতেই চাই না। দেবী বলে একটা আদর্শ আমরা মনের মধ্যে খাড়া রেখেছি। অথচ ঐ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে বিরোধ, তাকে ত মানতে চাই না! আদর্শের ঠাটটুকু বজায় রাখবার জন্যে যাঁকে আদর্শের আসনে বসিয়ে বলি, তাঁর পূজা করছি, তখন তাঁকে ত পূজা করা হয় না—তাঁর প্রতি যে অত্যাচার করা হয়! দেবীতে আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু মানবীকে দেবী বলে কপট ভক্তি প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।”

মুরারিবাবু বাধো-বাধো স্বরে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, “কিন্তু—সমাজ—সমাজ—”

হরেন যথার্থ আন্তরিকতার সহিত দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, “সমাজ! সমাজ অমানুষকে শাসন করতে পারে, কিন্তু নির্দ্দোষকে সে পায়ে থেঁৎলাতে পারে না, মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে সে বঞ্চিত রাখতে পারে না! বিধবারা সমাজের কাছে কি দোষে দোষী?”

—“হিন্দুরা বলে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।”

—“ভাবের ঘরে চুরি করবেন না মুরারিবাবু! যুক্তির ঝুলি যখন রিক্ত হয়ে যায়, নির্ব্বোধকে ফাঁকি দেবার জন্যে বিধি-সংহিতা তখন বলে—‘এ কর্ম্মফল!’ বিধবারা সমাজে কোন দোষে দোষী নয়। কিন্তু, তারা যে অবলা রমণী, তারা যে পুরুষের ক্রীতদাসী—কাজেই স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অত্যাচার তাদের মাথা পেতে সহ্য করতে হবেই-হবে! পুরুষ হলে সেও একশোটি বিবাহ করতে পারত, শত ব্যভিচারেও তাকে পাপ স্পর্শ করতে পারত না। এ ত হিন্দুত্ব নয়,—জরাগ্রস্ত সমাজকে এখানে সুধু শিখণ্ডীর মত সুমুখে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার পিছনে লুকানো আছে—পুরুষের স্বেচ্ছাচার! এ স্বেচ্ছাচার যিনি মাথা পেতে নেবেন, এই লক্ষ লক্ষ অকাল-বিধবার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস দ্রবীভূত অগ্নির মত তাঁকে দগ্ধ করুক! মুরারিবাবু, আপনি মনকে খালি চোখ ঠেরে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা কি পারবেন?—আপনি যে পিতা!”

মুরারিবাবু আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না; আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ, আমি যে পিতা! কিন্তু যে স্নেহ আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে, সমাজের বুকে ত সে স্নেহ নেই হরেনবাবু! আমার চঞ্চলতাকে সমাজ ত ক্ষমা করবে না!”

হরেন উত্তেজিত ভাবে কহিল, “সমাজ ত ক্ষমা করবে না জানিই। সেইজন্যেই ত আমাদের—নবীনদের নূতন-করে সমাজ গড়তে হবে। প্রাচীনতার গোলামী করে আমরা চিরদিন কেবল প্রাচীন হয়েই থাকব না। আমরা যে নবীন, তার পরিচয় দিতে হবে আমাদের নবীন সমাজ তৈরি করে।

নবীনতা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে ত বলতে হয় আমরা মরেছি। কিন্তু আমরা মরব না মুরারিবাবু, আমরা মরব না—মরব না!"

হরেন যে সুধু নিজের বন্ধুর সুবিধার জন্যই এতখানি বাক্যব্যয় করিল, তা নয়; সে যাহা বলিল, সেটা তাহার খাঁটি প্রাণের কথা। তাই তাহার সেই আবেগ ও উত্তেজনা মুরারিবাবুর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, সেখানেও একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিল। হরেনের প্রতি কথার মধ্যেই তিনি যেন আপন নিভৃত প্রাণেরই কাতর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—সে যেন কি-এক মন্ত্রশক্তিতে তাঁহারই কুণ্ঠিত মনের ভিতরকার গোপনতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

মুরারিবাবু এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না—হেঁটমুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। ... ...

অনেকক্ষণ পরে তিনি মাথা তুলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন; তাহার পর উঠিয়া, হরেনকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই বয়সে আপনি এমন জ্ঞানীর মত চমৎকার কথা কইতে শিখলেন কি করে?"

সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, হরেন কিছুতেই অপ্রস্তুত হইবার পাত্র ছিল না; সেও অমনি হাসিয়া পাল্টা জবাব দিল, "আমি যে বাঙ্গালী, মুরারিবাবু! কাজে আমাদের অপটুতা আছে বলেই বাক্যপটু হয়ে আমরা সেটুকু পূরিয়ে নি!"

মুরারিবাবু বলিলেন, "আপনারা মাঝে মাঝে এখানে এলে আমরা সুখী হব।"

—"হ্যাঁ, আমাকে আর মোহনকে মাঝে-মাঝে আপনাদের খবরাখবর নিতে হবে বৈকি! নইলে আপনার দেশের ভদ্র-লোক-দুটি আপনাকে একলা দেখলে আবার উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন।"

মুরারিবাবুর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। মোহন এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া ছিল। এখন সময় বুঝিয়া সে বলিল, "মুরারিবাবু, আমার বাড়ীর পাশে আমার একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া আছে। আপনি যদি সেখানে উঠে যান, তাহলে আর কোন ভয় থাকে না।"

মুরারিবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বলতে হয়! সে ত খুব ভাল কথা মোহনবাবু! আমার মত অসহায় লোকের পক্ষে আপনার মত প্রতিবাসী পাওয়াত ভাগ্যের কথা! বিশেষ, তারা যখন এ বাড়ী চিনে গেছে, তখন আবার কখন্ যে এসে পড়বে তার ত কিছু ঠিক নেই!"

মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া হরেন বলিল, "কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি মশাই! মাঝে-মাঝে আমরা দ্রৌপদী-ঠাকরুণের হেঁসেলে গিয়ে উৎপাত করতে পারি!"

মুরারিবাবু উচ্চহাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "তথাস্তু!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান

( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

চিরাগত প্রথা-অনুসারে ব্রাহ্মণ উপবাস-ব্রত পালন করেন, ধর্ম্মোৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান করেন। পুরাকালের ৪০টি সংস্কারের মধ্যে, এক্ষণে কতকগুলি সংস্কারমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুত্রের নামকরণ। জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইলে পর, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়;—প্রায়ই কোন দেবতার নামানুসারে নাম রাখা হয়। বিবাহের বাক্‌দান। উপবীত গ্রহণ। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদিগের ন্যায় আজকাল বেনিয়া ও কায়স্থেরা—এমন-কি কোন কোন অস্পৃশ্য জাতের লোকও উপবীত ধারণ করে।

সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহই সর্ব্বপ্রধান। কি ধনবান, কি দরিদ্র সকলকেই সন্তানের বিবাহ উপলক্ষে উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়—নচেৎ মান থাকে না।

কোন ধনশালী ব্রাহ্মণের উদ্যান—বসন্তকালের কোন এক উজ্জ্বল নিশা। গাছে গাছে কাগজের লণ্ঠন মালার মতো ঝুলান হইয়াছে। বাড়ীর সকল মুখ-ভাগের উপরেই রঙ্গিন গেলাসের 'ল্যাম্প'। বিচিত্র রঙের আলোক-প্রতিবিম্বের মধ্য দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া জনতা চলিয়াছে: প্যাঁচালো পাগ্‌ড়ী; শুভ্র, পীত, লাল রঙের পরিচ্ছদ; স্কন্ধ ও হস্তপদাদি নগ্ন, গায়ের রং ঘোর বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বৃহৎ দালান, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মাতুরের উপর মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে দুই-তিনটি নর্ত্তকী:—উহাদের চওড়া-ভাঁজওয়ালা লম্বা পেশোয়াজ, দৃষ্টি-আকর্ষক ফ্যাট্‌ফেটে রং—বিশেষতঃ লাল। মুখে রং, চোখে সুর্ম্মা, কাণে বড় বড় কাণবালা, নাকে নথ। অতি ধীরগতিতে পদক্ষেপ করিতে করিতে, একঘেয়ে সুরে গায়িতে গায়িতে, উহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অভিনয় করিতেছে।

তাহার পর, মশালের আলোয়, জনতার রাস্তা দিয়া, ঘোড়-সওয়ার, ফীটেন গাড়ি, পাল্কী-গাড়ী, সুন্দর পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শত সহস্র নরনারীর সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্বের উপর উপবিষ্ট—বর (বয়স দশ বৎসর হয় কিনা সন্দেহ, কখন-কখন তাহারও কম):—জরির পরিচ্ছদ, রত্নখচিত মুকুট; হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরের রত্নহার। বরের বাহুর দ্বারা পরিধৃত—একটি ছোট্ট 'কনে', পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু, অবগুণ্ঠিত; হল্‌দে কিম্বা লাল রঙের একটা বড় শাল দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। উহাদের মাথার উপর একটা বেগ্‌নী রঙের ছত্র; রৌপ্যনির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা উহাদিগকে বাতাস করা হইতেছে। এই বর-যাত্রার দল, কন্যাকে লইয়া কন্যার শ্বশুরবাড়ীতে উপনীত হইল। ইহার পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বিবাহের অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বহু-সংখ্যক ও অতীব জটিল। একজন ব্রাহ্মণ একখণ্ড কাপড় দিয়া বর-কনের পরিচ্ছদ

বাঁধিয়া দেয়; কাপড়ের নীচে, বর-কনে পরস্পরের সহিত হাতে হাত মিলায়। উহাদের মুখ লাল দাগে চিহ্নিত করা হয়। উহাদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়। একজন ব্রাহ্মণ, তাহাদের গ্রীবাদেশে একটা দড়ি রাখিয়া দেয়। বর, দুধের ভিতর হাত ডুবাইয়া হাত ভিজায়। অন্য অনুষ্ঠান মন্ত্রপাঠের সহিত সম্পাদিত হয়। তথাপি উহার কোনটাতেই সাংস্কারিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। আরো বিলম্বে, বাড়ীর সম্মানার্থে বরের গৃহে একটা গুরুতর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে, অল্পবয়স্ক বর আবার লেখা-পড়ায় প্রবৃত্ত হয়। কন্যা শ্বশুরবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হয়। যোগ্য বয়স হইলে, উহাদিগকে একত্র সম্মিলিত করা হয়। উহাদের নিত্য-নিয়মিত দৈনন্দিন কাজ সমান চলিতে থাকে—কোন পরিবর্তন হয় না। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র, ছাত্রদশাতেই 'ছেলের বাপ'।

সন্তানের বিবাহে, পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত এবং সন্তানেরা পিতামাতার শ্রাদ্ধে, সর্ব্বস্বান্ত হয়। কোন কোন শ্রাদ্ধে কয়েক লক্ষ, এমন-কি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, শুনা যায়।

মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে হিন্দুর বিশ্বাস এইরূপ:—শরীর মৃত হয়, কিন্তু আত্মা জীবিত থাকে; অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটি সূক্ষ্মশরীর দ্বারা আত্মা সমাচ্ছাদিত। সন্তান-প্রদত্ত পিণ্ডান্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই সূক্ষ্মশরীর বাড়িতে থাকে, এবং ক্রমে একটি মধ্যবর্ত্তী শরীরে পরিণত হয়; পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত আত্মা এই শরীর ধারণ করে। এই মধ্যবর্ত্তী শরীরের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা অনেক স্বর্গলোকে গিয়া পুণ্যের পুরস্কার লাভ করে, পাপী হইলে, তাহাকে সেই সব নরকে টানিয়া লইয়া যায়—যেখানে নির্দ্দয় যমরাজার রাজত্ব। পাপীর ভ্রমণ-পথটা বড়ই ভীষণ। কখন-বা সৌরদগ্ধ মরুভূমি, কখন-বা কণ্টকাকীর্ণ হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত সর্প-সমাকুল বন-জঙ্গল। অসিরূপ শাখা-সমন্বিত মহারণ্য। খাড়া পর্ব্বতের ধার। শূল ও ক্ষুর-সমাচ্ছন্ন যাত্রা-পথ। ঝটিকাময় আকাশ; ভীষণাকার শকুনী-গৃধিনীরা উড়িয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের কৃষ্ণ পক্ষচ্ছায়ায় আকাশ আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; আকাশের নিম্নে শতশত যোজন বিস্তৃত এক নদী গর্জ্জন করিতে করিতে, কলকল শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। একটা রক্তের নদী। শবদেহ ও ভগ্নাবশেষ জিনিসে পরিপূর্ণ। নক্র, মকর, হাঙ্গর, কুম্ভীর-সমাকীর্ণ। উহার তটদেশে, হাজার-হাজার নারকী,—কোটরে-ঢোকা চোখ, বাঁকা মোচ্ড়ান বাহু। তৃষ্ণায় দগ্ধ হইয়া, অবনত হইয়া উহারা অঞ্জলি অঞ্জলি রক্ত পান করিতেছে; আবার ঐ রক্তই উহা-দিগের শরীর ক্ষয় করিতেছে, কুরিয়া কুরিয়া গ্রাস করিতেছে; তখন হতাশ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিতেছে; সুনীল তরঙ্গরাজি,—নরক-উৎক্ষিপ্ত জিনিসের ন্যায় উহাদিগকে গুটাইয়া লইয়া যাইতেছে।

এই শাস্তিগুলি আত্মার উদ্ধারের একমাত্র উপায়:—ব্রাহ্মণদিগকে জীবিত আত্মীয়দিগের

অর্থদান। এমন-কি দৈত্য-দানবেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রকে আদেশরূপে মানিয়া থাকে। ইহারই দরুণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকলাপের এত জটিলতা ও মৃতদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও উৎসর্গক্রিয়া—অর্থাৎ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। (১)

কোন ব্যক্তির মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে অমনি তাহার আত্মীয়েরা গঙ্গা বা কোন পবিত্র নদীর তীরে তাহাকে স্থাপন করে। মৃত্যু হইলে, তাহার দেহকে স্নান করায়, তাহাকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেয়, পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, চন্দন-কাষ্ঠের আগুনে দগ্ধ করে। স্বজাতের লোকেরা শবকে বহন করিয়া দাহ-স্থানে লইয়া যায়। তুলসীপত্র চন্দন ও পলাশ-কাষ্ঠে চিতা রচিত হয়। শবের বক্ষের উপর চারিটা চাউলের পিষ্টক রাখিয়া শবকে একটা মঞ্চের উপর প্রসারিত করা হয়। অগ্নিশিখা উর্দ্ধে উত্থিত হয়। বাহকের দল বলিয়া উঠেঃ—"পূষণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যেন সুদীর্ঘ পথ দিয়া, তোমাকে তোমার পিতৃপুরুষদিগের নিকট লইয়া যান" (ঋগ্বেদ X, ১৭, ৩)। শব অর্দ্ধদগ্ধ হইলে পর, যাহাতে আত্মাপুরুষ সহজে বাহির হইতে পারে, মুক্তির পথে ব্যাঘাত না হয় এইজন্য মাথার খুলিটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

শবদাহের চারিদিন পরে, মৃতের আত্মীয়েরা অস্থিগুলি জড়ো করিয়া একটা ঘটের মধ্যে স্থাপন করে ও সেই ঘটকে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে। আবার চারি দিন পরে, সেই ঘটকে মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হয়; ভস্ম ও দেহাবশেষগুলি কোন নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপের যথাবৎ

---

(১) সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দেবলোককে "স্বর্গ" বলে। বিষ্ণুর দেব-লোককে "বৈকুণ্ঠ", কৃষ্ণের দেব-লোককে "গোলোক", শিবের দেব-লোককে "কৈলাস" বলে। এই সকল স্বর্গলোক দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত। মোক্ষের চারি ধাপ যথাঃ—দেবতার নিজ আবাসস্থানে বাস করাকে "সালোক্য", দেবতার অব্যবহিত নৈকট্য লাভ করাকে "সামীপ্য", দেবতার স্বরূপকে নিজ আত্মার মধ্যে আত্মসাৎ করাকে "সারূপ্য" এবং দেবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়াকে "সাযুজ্য" বলে।

২১ টা নরক। প্রত্যেক নরকে পৃথক পৃথক শাস্তি; কোন শাস্তিই অনন্ত নহে; আত্মা বিশোধিত হইলেই আবার তাহার পুনর্জন্মের পালা আরম্ভ হয়। যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নরকের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে তাহার নাম "গরুড়-পুরাণ"।

পুণ্যবানদিগের আত্মা ব্রহ্ম-রন্ধ্র দিয়া এবং পাপীদিগের আত্মা পাকস্থলীর রন্ধ্র দিয়া বাহির হয়।

ভীষণ যম-দূত-বৃন্দ। "যম-দূত"। নরকের শাস্তিঃ—"যাতন"। যমের লিপি-পুস্তকে, প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। "চিত্রগুপ্ত" (কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, নরকের লিপিকরের নাম)।

সাধুদিগের শব দাহ করা হয় না, সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় বলিয়া, তাহাদের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কোন নগরের সহিত নগরের মরীচিকার যে পার্থক্য, একজন তাপসের দেহের সহিত অজ্ঞ দেহের সেইরূপ পার্থক্য।

মৃতের উদ্দেশে চীনজাতীয়দিগের অনুষ্ঠানের ন্যায়,—জীবিতদিগের কল্যাণ-সাধনই শ্রাদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপে, "বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ" সৌভাগ্যদান করে, "পুষ্টি-অর্থ" স্বাস্থ্য দান করে, "যাত্রার্থ" সুযাত্রা আনয়ন করে, ইত্যাদি।

অনুসরণ—ইহাই প্রাচীনতন্ত্রী ব্রাহ্মণের জীবন-যাত্রা-প্রণালী। কিন্তু অধুনা খুব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও এই সকল নিয়ম কতটা মানিয়া চলে ?

বিবিধ ব্যবসায়-অবলম্বী ব্রাহ্মণেরা রাজপুতেরা, বেনিয়ারা—ইহাদের মধ্যে কেহ এ-প্রথা, কেহ ও-প্রথা অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্রপাঠ করা, ধ্যান-ধারণা করা—তাহারা এ-সব করিবার সময় পায় না। কাজ-কর্ম্মে, আমোদ-আহ্লাদে, সংসার-চিন্তায় তাহারা নিমগ্ন। ইংরাজের দৃষ্টান্ত, স্কুল, মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তক, ইংরাজ-শাসন—এই সমস্ত প্রাচীন দেবতাদিগের সম্বন্ধে সংশয় উৎপাদন করিবার বহুপূর্ব্বেই, এবং প্রাচীন রীতিনীতি-গুলি যে অত্যন্ত হাস্যজনক এইরূপ ধারণা জন্মাইবার বহুপূর্ব্বেই—হিন্দু-সভ্যতার অধঃ-পতন, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাব, সমাজের পরিবর্ত্তন এই সমস্ত হিন্দুদের অনেক ধারণা ও অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# রূপসী

## নাটিকা

### পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন ... মান্দার দুর্গাধিপতি
রূপসী ... নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
আর্য্যধন ... নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
দেবল, কহ্লন ... নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ
বরাট ... মোগল-সেনাপতি

### প্রথম অঙ্ক

#### প্রথম দৃশ্য

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

[ নিরঞ্জন, দেবল ও কহ্লন মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে—মুক্ত বাতায়নের বাহিরে মান্দার গ্রামের অনেকখানি দেখা যাইতেছে। ]

নিরঞ্জন

না, আর কোন আশা দেখছি না। চারিধারে শত্রুসৈন্য! আমাদের সাহায্য করবার জন্য বুঁদেলা থেকে যে সৈন্য এল, তারা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে গ্রামে পৌঁছুতে পারলে না! বুঁদেলার সেনা মান্দারের ওধারে অলস হয়ে বসে আছে। উপায় নেই! নীলপাহাড়ের ধার বেয়ে যে শীর্ণ পথ পড়ে আছে, সেখানেও শত্রুরা সজাগ পাহারা দিচ্ছে; আমাদের আর কোন আশা নেই! পরিত্যক্ত উপায়-হীন আমরা—খেয়ালী শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখচি না। আর এই শত্রু এখন তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য সব-চেয়ে কঠিন ভীষণ অভিসন্ধি আঁটছে—নিশ্চয়, তাতে

কোন সন্দেহ নেই! বুঁদেলা শুধু সৈন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছে—এ কথা বুঝছে না যে, আহার না পেয়ে মান্দারের এত বড় বাহিনী শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করবে! অথচ এরা কি বিপুল বিক্রমে এতদিন যুদ্ধ করে এসেছে—তিনমাসের অবিশ্রাম যুদ্ধে শত্রু তাদের একতিলও হঠাতে পারেনি! ধৈর্য্য তাদের অসীম, বীর্য্যের তুলনা নেই, স্বার্থত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কেউ কখনো পৃথিবীতে দেখিয়েছে কি না, জানি না! কিন্তু আজ আর অন্ন নেই—শত্রু এমন ব্যূহ রচনা করেছে যে নিরন্ন উপবাসী সৈন্য তাদের হঠিয়ে আজ আর অন্নচেষ্টায় বেরুতে পারছে না—এমন অবস্থায় ক'দিন লড়া যায়? মান্দারের কোন আশা নেই! ভিতরের এ খবর শত্রু যদি একবার জানতে পারে তাহলে মান্দারের প্রাচীর আপনা-হতে তাদের গতির সম্মুখে মাথা হেঁট করে নুয়ে দাঁড়াবে, গড়ের দ্বার তাদের উদ্যত পদাঘাতের আশঙ্কায় আপনাকে মুক্ত করে দেবে—

দেবল

আমার তূণ আজ শূন্য! একটিও তীর নেই—একটা বন্যপশু এসে আক্রমণ করলে তাকে হঠাবারও সাধ্য নেই!

কহ্লন

আমার সৈন্যেরা আহার-অভাবে ধূলার উপর লুটিয়ে পড়েছে—তার উপর একটুকরো বারুদ অবধি পড়ে নেই—

দেবল

ওদিকে বরাটের কামান এখনো সঘন গর্জ্জন করছে। অস্ত্র নেই, আহার নেই—কিসের বলে শত্রুকে আর হঠিয়ে রাখা যায়?

কহ্লন

অথচ সন্ধির আশা—

দেবল

সন্ধি! ও নাম মুখে উচ্চারণ করলে বরাট উচ্চ হাস্য করে উঠবে! তার প্রতিহিংসা-বৃত্তি বাজের চেয়েও ভীষণ! তার নিষ্ঠুরতা সীমা মানে না!

নিরঞ্জন

তবু অন্নহীন মান্দারের মুখ চেয়ে, অপমান জেনেও আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে বরাটের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের অবস্থার পরিচয়ও তাঁকে প্রকাশ করে বলতে বলেছি। এখনো ত তিনি ফিরলেন না—

দেবল

এক সপ্তাহ আমাদের কামান স্তব্ধ রয়েছে—ধনু থেকে তীর ছোটেনি—দুর্গের স্থানে স্থানে রন্ধ্র হয়েছে—তবুও বরাট এসে দুর্গ অধিকার করছে না! দারুণ হত্যার আদেশ দিচ্ছে না! এতে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে—সে কি সাহস হারিয়েছে, না, সে এ স্তব্ধতাকে আসন্ন প্রলয়ের সূচনা মনে করে স্থির হয়ে আছে?

কহ্লন

হয়ত সম্রাটের আদেশ পায়নি বলে বরাট স্থির হয়ে বসে আছে। দিল্লীর মোগল-শক্তিকে এতখানি মেনে চলে বরাট! সম্রাটের আদেশের জন্য এতখানি সপ্রতিভ সে—অথচ শিশু বা নারীকে তোপে ওড়াতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই! অদ্ভুত-চরিত্র এই বরাট—একটা হেঁয়ালির রূপান্তর বলেই আমার মনে হয়!

দেবর্ষি

এই বরাটের জন্ম, শুনেছি, অতি ছোট একটা বংশে। শুধু দৈহিক শক্তি আর দুঃসাহসের জোরেই সে আজ মোগল বাহিনীর অধ্যক্ষ, মোগল সম্রাটের ডান হাত। শুনেছি, তার চরিত্র অতি বদ—সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, খেয়ালী—

নিরঞ্জন

কিন্তু নিমকহারাম নয়। সে মোগলের নিমক খেয়েছে এবং সে নিমকের মর্য্যাদা রাখতে জানের তোয়াক্কা মোটেই রাখে না।

কহ্লন

হতভাগ্য মান্দার! আজ এ অবস্থায় তার হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায়ও নেই—!

নিরঞ্জন

তবুও সবুর কর। সকলেই আমরা এমন কাপুরুষ নই যে, তুচ্ছ দুটি অন্নের জন্য শত্রুর কাছে মাথা নুয়ে দাঁড়াব—! সেইজন্যই বলি, একবার প্রচার কর, যারা জানের মায়া করে না, অন্নের জন্য নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়—তারা একবার আমাদের সঙ্গে মিশে জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক, এসে—একবার আমাদের শেষ শক্তি নিয়ে যুঝে দেখি—সমস্ত দেশের অন্ন লুঠে আনি— না পারি ত, শত্রুর তপ্ত নিশ্বাসে উবে যাই! প্রাণ একবার যাবার—সে যাবেই, তা শত্রুর ঘৃণার-দেওয়া দু মুঠো অন্নের জোরে এ প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে বরং একবার রুখে উঠে দেখি, এস—যদি মরি, শত্রুর ঈর্ষাকুল বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়ে মরব—

[ আর্য্যধনের প্রবেশ ]

এই যে পিতা! খবর কি? আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন! মোগল ভৃত্যের অস্ত্রচিহ্ন আপনার গায়ে দেখছি না যে! তারা আপনাকে বন্দী করলে না? আপনি ফিরে এলেন? তারা ছেড়ে দিলে—কোন অত্যাচার করলে না?

আর্য্যধন

না, পুত্র, কোন অত্যাচার করেনি তারা। দেখলুম, তারা বর্ব্বর নয়, তারাও মানুষ। আমায় যথেষ্ট সম্মান করেছে, তারা। বরাট নতজানু হয়ে প্রণাম করলে...জানো পুত্র, বরাটের শিবিরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল?

নিরঞ্জন

মোগল সম্রাটের—

আর্য্যধন

না। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য। এত-বড় দার্শনিক ভারতে এ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছেন কি না, সন্দেহ। দর্শনের সুগভীর জটিল তর্ক এমন সহজ কথায় অল্পসময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন যে শুনে সামান্য একটা প্রহরী অবধি মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আত্মার কথা—অর্থাৎ,

নিরঞ্জন

থাক্ পিতা—দর্শনের কথা শোনবার এখন অবসর নেই আমাদের। এত-বড় সৈন্যের দল একটু আহারের জন্য অধীর উন্মুখ হয়ে আছে—তাদের আহারের কোন উপায় হল কি না, তারা তাই জানতে পেলে মুগ্ধ হয়ে যাবে—আত্মার সংবাদ তারা চায় না—

আর্য্যধন

কিন্তু এই আত্মা অবিনশ্বর—

নিরঞ্জন

সে অবিনশ্বরত্ব দর্শনের পাতায় আঁটা থাকুক! এখানে ত্রিশহাজার লোক অন্নাভাবে মরতে বসেছে—অবিনশ্বর আত্মা তাদের নশ্বর দেহে এতটুকু ভরসা দিতে পারবে না—মুহূর্ত্ত বিলম্ব তাদের সহ্য হচ্ছে না! অন্নের কি সংস্থান হল, আপনি তাই বলুন। বরাট কি চায়? আমাদের শির—না, হিন্দু নারীর নারীত্ব? বলুন—ঐ শুনুন, নীচে বুভুক্ষু সৈন্যের উন্মত্ত চীৎকার—চেয়ে দেখুন, তারা ঐ কঠিন কর্কশ শিলা-লগ্ন তৃণগুচ্ছ খাবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করছে—

আর্য্যধন

আমি ভুলে গেছলুম, পুত্র—বসন্তের এই স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য্য, পাখীর এই কলগান, ঐ নির্ম্মল-নীল আকাশ—এসবের মধ্যে আমি ভুলে গেছলুম, যে প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধ চলেছে—মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যে বাঁধন, তা কেটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য দু'দিকে দু'দল সৈন্য শুধু হিংসায় ফুঁসছে আর অস্ত্র শানাচ্ছে! মানুষের বুকে যে অমল শুভ্র আনন্দ শতদলের মত ফুটে উঠেছে, তাকে রক্তে রাঙা করে দেবার জন্য তোমরা সকলে মিলে শুধু অবসর খুঁজছ! না, ঠিক বলেছ—ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যের ঐ আর্ত্ত চীৎকার··· শোনো তবে···আমায় যে জন্য পাঠিয়েছিলে—তার কি করে এসেছি, শোনো—ত্রিশ হাজার প্রজার জন্য আমি জীবনের আশ্বাস বয়ে এনেছি। কিন্তু—না, সে ত তুচ্ছ একজন—একজনের দুঃখ! ত্রিশহাজারের সুখের সামনে—কিছুই নয় সে! একদিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ—আর একদিকে একজনের বুক-ভাঙ্গা যাতনা—শোনো পুত্র—কিন্তু সে কথা শুনলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে—হয়ত এক-নিমেষে প্রাণহীন পাষাণ-স্তূপে পরিণত হবে—বুঝে দেখ, পুত্র—শুনতে পারবে? সে শক্তি তোমার—কিন্তু মনে রেখো, ওদিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

(বিরক্ত চিত্তে) দেবল, কহ্লন, তোমরা অন্তরালে যাও—

আর্য্যধন

না, না, থাকো—তুমি, আমি, দেবল, কহ্লন, সকলেই ত এই ত্রিশ হাজার নর-নারীর অন্তর্গত। তবে! সমস্ত নগর এসে এখানে সমবেত হোক্—যেখানে রাজ্যের যত ক্ষুধার্ত্ত জীবন-ভিখারী হতভাগা আছে, সকলকে ডেকে এনে এখানে দাঁড় করাও—সকলের সুমুখে চীৎকার করে আমি বলি, ওরে দুর্ভাগা, জীবন-কামীর দল, আমি তোদের জীবন দান করব—প্রকাণ্ড আশ্বাস বয়ে এনেছি—

নিরঞ্জন

আমরা তিন জন এই ত্রিশ হাজারেরই প্রতিনিধি—বলুন, পিতা, কি সংবাদ, যত কঠিন হোক, আমরা অকম্পিত চিত্তে তা শুনব, ভীত হব না।

আর্য্যধন

তবে তাই হোক! বরাটকে দেখলুম—তার যে ছবি এখানে বসে তোমরা এঁকেছো, তা ঠিক নয়—তার বিপরীতই দেখলুম! তোমাদের আঁকা ছবি থেকে আমি ভেবেছিলুম, গিয়ে বরাটকে দেখব, একটা

উচ্ছৃঙ্খল, বর্ব্বর, রক্তপিপাসু দানব—যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত সে, ভদ্রতার কোন ধার ধারে না—শ্রদ্ধা, প্রীতি, মায়া, মমতাহীন এক দুর্বৃত্ত—

নিরঞ্জন

সে মোগলের দাস—

আর্য্যধন

কিন্তু ভদ্র; নিমকহারাম নয়—নিমকের সে মর্য্যাদা রাখে! শান্ত, গম্ভীর, বিনীত মূর্ত্তি! —আমার শুভ্র শির দেখে নতজানু হয়ে সে প্রণাম করলে—আতিথ্যে এতটুকু ত্রুটি রাখেনি—তবু আমি তার শত্রু—

নিরঞ্জন

বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিভ্রম হয়েছে—তাই এ সঙীন সময়েও শত্রুর স্তুতি করতে ইতস্তত করছেন না! ওদিকে ত্রিশ হাজার নর-নারী ক্ষুধার্ত্ত; বিপন্ন—

আর্য্যধন

তবে শোনো পুত্র—মান্দার ধ্বংস করাই মোগলের উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার বরাটের উপর। বরাট বীর—সে চায় যুদ্ধ করে মান্দার দখল করতে—কিন্তু মোগল চায়, কৌশলে! তাই বরাটের অনুপস্থিতিতে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুলতব খাঁর কৌশলে মান্দার অতর্কিতে অবরুদ্ধ। তিন মাস মুলতবের লোক শুধু নজর রেখে এসেছে—বাহির থেকে এতটুকু খাবার কি রসদ যেন মান্দারে না আসে! তাই তোমরা মান্দার থেকে যখন হাজার তোপ দেগেছ—মোগল তখন শুধু পাঁচটা জবাব দিয়েছে—তোমরা তখন মোগলের উদ্দেশ্য বোঝনি। তার পর তোমাদের যখন গোলাগুলি ফুরিয়ে গেছে, আহার-অভাবে তোমরা বিপন্ন নির্জীব, তখনই মুলতব খাঁ তোমাদের গড় দখলের জন্য উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বরাট এ-সব জানতে পেরে তা করতে দেয়নি! মুলতব খাঁ তাই দিল্লীশ্বরের আদেশ প্রার্থনা করেছে, বরাটও মুলতবের নামে নালিশ করেছে যে, তার অধীনস্থ মুলতব খাঁ বরাটের মর্য্যাদা রাখেনি, বীরত্বের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ করেছে! বরাট চায়, মান্দারকে যুদ্ধে জয় করে—খাদ্যাভাবে শীর্ণ মৃত শব মাড়িয়ে সে মান্দারে প্রবেশ করতে চায় না।

নিরঞ্জন

উদার অনুগ্রহ তার! কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

দেবল

থাকতে পারে কি! উদ্দেশ্য আছেই—

কহ্লন

খুব গভীর মতলব আছে—না হলে বিধর্ম্মীর দাস হবে কেন সে?

আর্য্যধন

তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। মহত্ত্বকে সন্দেহ করলে নিজের অধঃপতনেরই পরিচয় দেওয়া হয়!

নিরঞ্জন

যাক—তার পর—

আর্য্যধন

আমার মুখে মান্দারের সংবাদ শুনে বরাট বিস্মিত হল—অস্ত্র-শস্ত্র আর প্রচুর আহার এখনি সে পাঠাতে প্রস্তুত—সম্রাটের আদেশেরও অপেক্ষা করবে না সে!

নিরঞ্জন

ইস্—এত মহৎ! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে—

দেবল

গভীর উদ্দেশ্য! বাদশার আদেশ নেবে না? তাহলে তার নিমকের মর্য্যাদা থাকে কৈ?

আর্য্যধন

উপায় নেই! বাদশার কাছ থেকে সে আদেশ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে, এধারে এ হতভাগা ক্ষুধার্ত্তদের প্রাণ থাকবে না যে! বাদশার কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে সে প্রস্তুত! আপাততঃ তিনশ' গাড়ী ভরে আহার আর অস্ত্রশস্ত্র সে পাঠাতে চায়—

নিরঞ্জন

আশ্চর্য্য!

আর্য্যধন

কিন্তু—

নিরঞ্জন

কিন্তু কেন?

আর্য্যধন

এইবার প্রস্তুত হও পুত্র,—খুব কঠিন কথা শুনতে হবে! এই উপকার সে করবে, কিন্তু তার মূল্য চায়—

নিরঞ্জন

তাই বলুন পিতা, মূল্য চায়! এবারে তার মহত্ব আর উদারতার রহস্যটুকু বোঝা গেল! বলুন, কত মূল্য, কি মূল্য চায় সে?

আর্য্যধন

সে চায়, কিশোরী রূপসী তার শিবিরে গিয়ে আজ রাত্রি যাপন করে—

নিরঞ্জন

কিশোরী রূপসী!

আর্য্যধন

আমার পুত্রবধূ—

নিরঞ্জন

পিতা—( অস্ত্র তুলিতে উদ্যত )

আর্য্যধন

পুত্র—

নিরঞ্জন

আপনি পিতা—

আর্য্যধন

হাঁ, বৎস, আমি তোমার পিতা, পুত্রের গর্ব্বে গর্ব্বিত পিতা আমি! আর তুমি আমার পুত্র, একমাত্র পুত্র, আমার মাতৃহারা পুত্র—বড় আদরের ধন!

নিরঞ্জন

এ কি কথা! মান্দারে সহস্র রূপসী নারী আছে—

আর্য্যধন

তাদের সে চায় না! বিচিত্র খেয়াল তার! কিন্তু মনে রেখো পুত্র, মান্দারের স্বাধীনতা, মনে রেখো ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

যাক, মান্দার রসাতলে যাক্! ত্রিশ হাজার নর-নারীর প্রাণও ভস্মীভূত হোক—! রূপসী, আমার স্ত্রী, আমার সহধর্ম্মিণী—

আর্য্যধন

তুমি ত প্রাণ দিয়েও মান্দারকে রক্ষা করতে চাও—

নিরঞ্জন

তাই রূপসীকেও তার মান, আর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে?

আর্য্যধন

রূপসী তোমার সহধর্ম্মিণী—

নিরঞ্জন

আমি তার স্বামী! কিন্তু মান্দার আমার কে? আমি মান্দার চাই না।

আর্য্যধন

কিন্তু এই সঙিন মুহূর্ত্তে মান্দারকে তুমি ত্যাগ করবে? যখন মান্দার আজ—

নিরঞ্জন

নিজের প্রাণ দিয়েও যদি মান্দারকে রাখতে পারতুম, রাখতুম, কিন্তু ধর্ম্ম—

আর্য্যধন

মান্দার তোমার দেশ! এই মান্দারকে তুমি মোগলের পায়ে ফেলে দেবে পুত্র! যে মান্দার তোমার মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়েছে—

নিরঞ্জন

না, মান্দার আমার কেউ নয়—মান্দার জড় মাটি কিন্তু রূপসী আমার—

আর্য্যধন

তবু এই জড় মান্দার আজ তোমারই মুখ চেয়ে আছে, পুত্র—

নিরঞ্জন

তবে কি মান্দার চায়, তার জন্য আমার ধর্ম্ম, আমার পত্নীর মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, নারীত্ব সব আমি বিসর্জ্জন দেব! বলুন, মান্দার তাতে সুখী হবে? মান্দার মুখ ফুটে তবু বলবে—হাঁ, দাও, তোমার ধর্ম্ম, তোমার পত্নীর ধর্ম্ম, সব দিয়ে আমায় রক্ষা কর—

আর্য্যধন

যদি সে বলে, একদিকে একজনের ধর্ম্ম, মান, সুখ, আর-এক দিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ? ভেবে দেখ পুত্র—

নিরঞ্জন

অসম্ভব! ঢের ভেবেছি! না, তা হতে পারে না, মান্দার যদি এত নীচ হয়, এমনি হেয় উপায়ে আপনাকে সে রক্ষা করতে চায় ত আমি তাকে এতটুকু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই! তাছাড়া আমার নিজের উপরই নিজের অধিকার আছে; রূপসীকে আমি কোন্ মুখে বলব, দাও, আমার সাধের মান্দারের জন্য তুমি তোমার নারীত্বকে বলি দাও! দিয়ে পতির কীর্ত্তি উজ্জ্বল কর, সতী!

আর্য্যধন

আর যদি রূপসী বলে, আমি মান্দারকে রক্ষা করব!

নিরঞ্জন

রূপসী বলবে! ঐ পণে? পিতা, আপনি বাতুল হয়েছেন! রূপসীকে আমি জানিনা? রূপসী আমার স্ত্রী—তার মন—

আর্য্যধন

রূপসী আমার মা! আমিও তাকে জানি, পুত্র। জানি, কত উচ্চ, কত মহৎ তার প্রাণ—

নিরঞ্জন

একে মহত্ত্ব বলে না, পিতা, এ কাপুরুষতা—দারুণ ক্লৈব্যের নামান্তর—

আর্য্যধন

আর রূপসী যদি বলে, ত্রিশহাজার নর-নারীর প্রাণের জন্য, মান্দারকে রক্ষা করবার জন্য এ মূল্য সে দিতে প্রস্তুত—

নিরঞ্জন

( উচ্চ স্বরে ) পিতা, আমি যোদ্ধা হলেও মানুষ; আমারও সহ্য করবার একটা সীমা

আছে, পিতৃ-হত্যার অপরাধে অপরাধী করবেন না—

আর্য্যধন

একবার রাজা রামচন্দ্রের কথা মনে কর, পুত্র,—প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি আপনার প্রাণ-অংশ ছিন্ন করেছিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করেছিলেন—

নিরঞ্জন

রামচন্দ্রের মহত্ব রামচন্দ্রেরই থাক্‌, পিতা! আমি সামান্য মানুষ, অত উচ্চ আদর্শ সহ্য করতে পারব না।

আর্য্যধন

প্রকৃতিস্থ হও, পুত্র! রূপসী এ মূল্য দিতে চায়—

নিরঞ্জন

চায়?

আর্য্যধন

হাঁ, চায়।

নিরঞ্জন

সে তবে সব শুনেছে? কে তাকে এ কথা বললে?

আর্য্যধন

আমি বলেছি।

নিরঞ্জন

আপনি!...নাঃ··· থাক্‌! শুনে সে কি বললে? সে বললে, সে বরাটের শিবিরে যাবে?

আর্য্যধন

না—

নিরঞ্জন

তবে—তবে?

আর্য্যধন

মুখে সে কোন কথা বলেনি। এ কথা শুনে মুখ তার পাণ্ডু হয়ে গেল— সমস্ত অবয়বে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এল! সে নীরবে সে স্থান ত্যাগ করলে—

নিরঞ্জন

সরলা—বালিকা রূপসী! কিন্তু শুনুন পিতা, এ মূল্য দিয়ে মান্দারকে রক্ষা করা হবে না—মান্দার যদি তবুও তাই চায়, তবে তার সে স্পর্দ্ধার শাস্তিও আমি দিতে জানি, এ কথা মনে রাখবেন! এই নীচ মান্দারকে তাহলে নিজের হাতে আমি ধ্বংস করব! যে মান্দারকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, নিজের হাতে এমন করে যে মান্দারকে সাজিয়ে তুলেছি—সেই মান্দারকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দেব। দেবল, কহ্লন, আমার এই বাতুল পিতাকে বন্দী কর! সতর্ক থেকো—ক্ষিপ্ত মান্দার যেন তাঁকে না দেখে, এ প্রস্তাব মান্দারের কানে না ওঠে!

আর্য্যধন

মান্দার সব শুনেছে, পুত্র। মান্দার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছে, সতীর সতীত্বের মূল্যে সে প্রাণ কিনতে চায় না—রূপসীকেও তারা সে কথা বলেছে—

নিরঞ্জন

এই ত আমার মান্দারের যোগ্য কথা! কিন্তু আমার অসাক্ষাতে এতখানি গোপন ষড়যন্ত্র, গোপন পরামর্শ চলেছে, আশ্চর্য্য! অকৃতজ্ঞ মান্দার আমার অসাক্ষাতে এ-সবের আলোচনা শেষ করে ফেলেছে—! অথচ এই মান্দারের মঙ্গলই আমি চিরদিন করে এসেছি, কখনো কোন অনিষ্ট করিনি— আমার কাছে

কি তার জন্য মান্দারের এতটুকুও ঋণ নেই? প্রাণটা কি এতই বড়—সেটা কি এতই রাখবার যোগ্য যে, এই জঘন্য—(বাহিরে কোলাহল) ও কিসের কোলাহল?

দেবল

ক্ষুধার্ত্ত মান্দারের চীৎকার—

নিরঞ্জন

সব আলোচনা শেষ করেও মান্দার আবার ও কি চায়?

আর্য্যধন

তারা আমার মার কাছে দরবার করতে এসেছে—নির্জীব মান্দার আমার মার পায়ে তাদের ভক্তি জানাতে এসেছে—

নিরঞ্জন

কি স্পর্দ্ধা! নারীতে আর বৃদ্ধেতে মিলে মান্দারকে চালাচ্ছে! কেন, আমি কি মরেছি? অকৃতজ্ঞ মান্দার, এমনি হীন কৌশলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে তুই আজ ছিনিয়ে নিতে চাস? বুঝেছি, এ ষড়যন্ত্র—চারিধারে ভীষণ ষড়যন্ত্র—বেড়াপাকে আমায় ঘিরতে চায়!...দেবল, বন্ধু, আমার পিতাকে বন্দী কর—এ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে এই বাতুল বৃদ্ধ—তাকে বন্দী কর! তারপর অকৃতজ্ঞ মান্দারকে আমি একবার দেখতে চাই!

[উন্মত্তভাবে বাহির হইয়া গেল]

(ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ

আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ এই যে, সমাজের নানা লক্ষণ মিলাইয়া তাহার কোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা এদেশের ও বিদেশের লেখকদলের একটা পেশা ও নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হবহাউস্, বোসাংকোয়ে এচ, জি, ওয়েল্‌স্, ওয়েব, বেলক, ডিকিন্‌সন্ প্রভৃতি ইংরেজ লেখক; রবীন্দ্র, রামেন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, প্রভৃতি বাঙালী লেখক এই কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছেন। ইহা প্রমাণের জন্য আধুনিক ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যের রকমারী-পরিমাণের চেষ্টা যদি করা যায়, তবে ocialistic literature অর্থাৎ সামাজিক প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাট্যাদি সাহিত্যের পরিমাণ আর আর সব শ্রেণীর সাহিত্যের পরিমাণকে ছাপাইয়া উঠে।

কেন? অবশ্য ইহার সোজা উত্তর সমাজ জিনিসটা মানুষকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে উত্তরও "এহ বাহ্য আগে কহ আর"। পূর্ব্বকালেই সমাজ মানুষের মনকে এমন নাড়া দেয় নাই কেন, আর এখনই বা সমাজ জিনিসটা মানুষের কাছে সবার বাড়া হইয়া উঠিল কেন?

আমরা যাহাকে আধুনিক যুগ বলিয়া থাকি, ইউরোপে তাহা বড়জোর চারি শত বৎসরের যুগ,; আর এদেশে তাহা একশত বৎসরের বা তারও কিছু কম সময়ের যুগ। ইউরোপে

এই চারিশত বৎসরের আগে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিগ্রহের কাঠখড়, রূপ ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যাহা ছিল তাহা অনেক কালের বনিয়াদের উপর খাতিরজমা হইয়া ছিল। কেহই তাহার অদল বদল আশঙ্কা করে নাই। বিশেষতঃ ইউরোপীয় মধ্যযুগের সেই পুরোহিত তন্ত্র—Holy Mother Church—কোন কালেই এই সনাতন বিগ্রহের জায়গায় যে নূতন দেবতার আমদানি হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যে heretic বা পাষণ্ড সে রকমের দুঃস্বপ্ন কচিৎ দেখিয়া সে কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া তাহাকে শুধু গ্রামছাড়া বা দেশ-ছাড়া নয়, একেবারে ইহলোক-ছাড়া করিবার জন্য চর্চ্চের অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছু-মাত্রই ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়া এবং যন্ত্র-তন্ত্র কতকগুলা উদ্ভাবিত হইয়া প্রায় রাতারাতি সমাজ ও রাষ্ট্র, একেবারে ওলোট্‌পালোট্ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে ধর্ম্মেরও সনাতন ব্যবস্থার প্রাণসংশয় অবস্থা হইয়া উঠিল। ইউরোপে এই পরিবর্ত্তনটা একেবারেই আকস্মিক। মিডিভ্যাল বা মধ্যযুগীয় ইউরোপ এবং মডার্ণ বা আধুনিক ইউরোপ এক গোত্রের নয়—পরস্পরের মধ্যে কৌলিক যোগ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের খোল শুধু নয়, নলচে পর্য্যন্ত এমনি বদল হইয়াছে যে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক দুই ইউরোপীয় সমাজ—একেরই উত্তর সংস্করণ যে অন্যটা—এ কথা বলার উপায় নাই। সুতরাং এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটা ইউরোপ সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই; কারণ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঢেউ খাইতেছে বলিয়া তাহার ব্যবস্থা সব গুলাইয়া যাইতেছে। এই কারণেই বোধ হয় তাহার সাহিত্যের মধ্যেও তাহার সমাজের রূপটাই বড় হইয়া উঠিতেছে। এ শুধু ইংলণ্ডে নয়, সমগ্র ইউরোপে। নরওয়ে সুইডেনে ইব্‌সেন, ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গ; জর্ম্মাণীতে হাউপ্‌টম্যান, সুডারম্যান; ফ্রান্সে ব্রিয়ে, মেটারলিঙ্ক; ইতালীতে ডানান্‌জিয়ো; রাশিয়াতে শেকফ, এন্‌ড্রিভ; ইংলণ্ডে বার্ণাড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, সামাজিক নাট্য রচিয়া ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমনি এক ধরণের নাট্য-এপিডেমিক সমস্ত ইউরোপে ছাইয়া-যাওয়ার মত দৃশ্য এ যুগের পূর্ব্বে আর কোন যুগেই হয় নাই—তা সে সব যুগে শেক্‌সপীয়র, বা গ্যয়টে জন্মান্ না কেন।

কিন্তু বাংলাদেশেও হঠাৎ এই সামাজিক সাহিত্যের চাষ সুরু হইল কেন? তার কারণ, আমাদেরও এই এক শতাব্দীর মধ্যে সমাজে ভাঙা-চোরা ত বড় কম হয় নাই। ইংরেজ-শাসন ও শিক্ষা আসিয়া এই সমাজকে প্রথম একচোট ভাঙিয়াছে। ইংরেজের এই নব শিক্ষায় গ্রাম্য সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতায় পরিণত করিয়া গ্রাম-গুলিকে উৎসন্ন ও সহরগুলিকে প্রসন্ন করিয়াছে। তার ফলে আমাদের ভদ্র শিক্ষিত সাধারণের দেশের সঙ্গে নাড়ীর যে যোগটুকু ছিল সেটা কাটিয়া গেছে এবং এই সংকীর্ণ শিক্ষিত দল আর বিস্তীর্ণ অশিক্ষিত জনসংঘের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা পাকা প্রাচীর দাঁড়াইয়া গেছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের বদলই চাই আর সমাজতন্ত্রেরই বদলই চাই—এই গণতন্ত্রকে বাদ্ দিয়া কোন তন্ত্রেরই আবাদ সম্ভব হইবে না। "এমন মানব জমীন্ রইল পতিত আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা!" কিন্তু কেমন করিয়া যে আবাদ করা যায় তাহাইতো সমস্যা! রবীন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন—স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠিত কর, পল্লী সংস্কার করিতে সুরু কর। সে জন্য স্বেচ্ছাসেবকদলের তলব পড়িয়াছিল—কিন্তু এমন স্বেচ্ছাসেবক ক'জন পাওয়া যায়? তারপর এই রকম বিন্দু বিন্দু জলসংগ্রহে কি আর কঠিন ভুঁই চাষ করা চলে? যাই হোক্ এ সমস্যা এখনও মস্ত বড় সমস্যা হইয়া আছে। ইহারি অচল পাহাড়ে ঠেকিয়া সমাজসংস্কারের সচল চেষ্টা চুরমার হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে যে সমাজ সংস্কৃত সমাজ বলিয়া গর্ব্ব করে, এই অগণ্য প্রাকৃত অসংস্কৃত সংঘের সঙ্গে তার যোগ হয় নাই বলিয়া তাহা আজ জীর্ণপ্রায়, শীর্ণগতি, মুমূর্ষুপ্রায়। যে যুগে নাড়াবুনেরা কাস্তে ভাঙিয়া করতাল তৈরি করিয়া কীর্ত্তনে হইয়াছিল, এ যুগের ভদ্র সমাজের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদিগকে ত ধরিল না। এ যুগের শিক্ষাও ধরিল না, এযুগের সাহিত্যও ধরিল না। তার কারণ, নীচ হইতে উপরের দিকে এ সমস্তের উৎপত্তি ও গতিটা নয়, গতিটা—উপর হইতে নীচের দিকে। এইবার স্বায়ত্ত শাসনের কল্পতরীও এই পাহাড়ের গায়েই চুরমার হইতে পারে, একথাও আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

তারপর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের বিস্তর সংস্কারের বদল হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায় হইতে বিবেকানন্দের কাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাটাকে একবার অনুধাবন করিলে এ কথা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংরক্ষকদিগের আদর্শ ও প্রণালীগত প্রভেদ যেমনি থাকুক, এই হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত করার ব্যাপারে ইঁহাদের মধ্যে অভেদ। সেই এক একটা পরিবর্ত্তনের অভিঘাত সমাজের চিত্তে ও চেতনায় এক এক রকমের প্রতিঘাত জাগাইয়াছে। লজ্জাবতী লতার সাড়ার লিপি আচার্য্য জগদীশের যন্ত্রে যেমন ধরা পড়ে, তেম্‌নি সমাজের সেই সব সাড়ার লিপি সাহিত্যে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যেমন দেবেন্দ্রনাথের কালে অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের tradition-ভাঙা rationalismএর, যুক্তিবাদের সাহিত্য। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালে বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রের nationalismএর সাহিত্য, traditionalismএর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার সাহিত্য। Reason এবং tradition এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ধাক্কার সাড়া সাহিত্যে দুই প্রকারে দেখা দিয়াছে। এখন আবার রবীন্দ্র বলেন tradition ভাঙিয়া বাহির হইতে; রামেন্দ্র প্রভৃতি বলেন tradition ও reason এর সমন্বয় সাধন করিতে।

অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, সেই জাতীয়তার যুগেই বঙ্কিম যে রোমাণ্টিক হাওয়াটা বাংলায় বহাইয়াছিলেন, যে সব রোমাণ্টিক চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 'ট্রাডিশন্'-রক্ষক অক্ষয় সরকার মহাশয় বা চন্দ্রনাথ বসুর মনঃপূত হয় নাই। কারণ, সমাজকে তাহাও ঘা দিয়াছিল এবং ঘা দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। সুতরাং সমাজই যে সব সময়ে সাহিত্যকে জাগায় তাহা নয়, সাহিত্যও সমাজের মধ্যে নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া দেয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। একের ক্রিয়া অন্যে প্রতিক্রিয়া জাগায়। সাহিত্যের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমাজে দেখি; আবার সমাজের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে দেখি। মনে করুন, বঙ্কিম যদি রোমাণ্টিক সাহিত্য সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলা সাহিত্যের পরিসর কতটুকু থাকিত? তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনা-শক্তির দ্বারা যে সব নূতন আদর্শ (types) ও যে সব নূতন প্রকৃতি (temperaments) গড়িয়াছেন, সেগুলি এখন সমাজের বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন তাই রোমাণ্টিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ শেষ না হইলেও 'রিয়ালিষ্টিক' বা বাস্তব সাহিত্য-পর্ব্বের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্কটের পর জর্জ্জ এলিয়টের মত, হুগোর পরে বাল্জাকের মত, বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকগণ দেখা দিয়াছেন। তবে স্কট ও হুগো যেমন চিরকাল নূতন, বঙ্কিমের নূতনত্ব ও মোহও তেমনি ঘুচিবার নয়।

তার পর রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের মত ধর্ম্মসংস্কারক নহেন বটে, কিন্তু রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চেয়েও তাঁহারা ধর্ম্মের সংস্কারকে বেশি বই কম ঘা দেন নাই। খৃষ্টানের চর্চ্চেও তাঁহাদের ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, মুসলমানের মসজিদেও হইয়াছে। কোন ধর্ম্মমত, কোন ধর্ম্মসাধনাই তাঁহাদের অনাদরনীয় হয় নাই। নিরাকার ঈশ্বর যেমন তাঁদের সম্ভজনীয়, চিদাকার ঈশ্বরও তেমনিই। বিজয়কৃষ্ণ কুলগুরু ত্যাগ করাইলেন; তাঁহার মন্ত্রগ্রাহী শিষ্যদের মণ্ডলীতে পংক্তিভোজন থাকিলনা; জগন্নাথধামের মত তাঁহার আশ্রমে ছত্রিশ জাতকে তিনি এক মিলনসূত্রে বাঁধিলেন। এ গুলিও ধর্ম্মসংস্কার। বিবেকানন্দ 'ছুঁত-মার্গে'র প্রতিবাদ করিলেন; 'অস্পৃশ্য' জাতির লোককে নারায়ণ বলিলেন ও সেই নর-নারায়ণের পূজায় দেশকে উদ্বোধিত করিলেন। ইহাও ধর্ম্মসংস্কার নয় কি?

ধর্ম্মের এই উদারতা হিন্দুর চিরকালের বিশেষত্ব বলিলে চলিবে না। এ কালে ইহা বিশেষভাবে আমাদের সমাজকে নাড়া দিয়াছে ও এখনও ভিতরে ভিতরে দিতেছে। বঙ্কিমের রোমাণ্টিক সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যও সমাজকে আর এক দিক হইতে নাড়া দিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ব কালের সমাজে আর এ কালের সমাজে বিস্তর প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে কালের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন; অন্য দিকে ভাবের পরিবর্ত্তন, আদর্শের পরিবর্ত্তন, পরিপ্রেক্ষণ-তত্ত্বের (perspective) পরিবর্ত্তন। আর

এই পরিবর্ত্তনও এমনি আকস্মিক যে সেই আকস্মিকতার জন্যই বাংলাদেশে সামাজিক সাহিত্যের পরিমাণ অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যকে হীনমান করিয়া দিয়াছে। বাংলার চিরকেলে গার্হস্থ্য উপন্যাস এখন সামাজিক উপন্যাস হইয়া উঠিতেছে।—রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে-বাইরে; প্রভাতকুমারের নবীন সন্ন্যাসী; শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন, বড় দিদি, প্রভৃতি; চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্রোতের ফুল—উদাহরণ। ছোট গল্পেও প্রভাত, শরৎ, চারু, মণিলাল, প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিকেই গল্পের মধ্যে ফলাইয়া তুলিতেছেন। সামাজিক নাট্য জিনিসটা বাংলায় এখনো আসে নাই—শুধু 'অচলায়তন' ও 'দেবোত্তর' দুইটি মাত্র এই শ্রেণীর নাট্য দেখিয়াছি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

---

# পরম ক্ষণ

আজ্ বেসুরা একতারাতে তার জুড়িনু বুক ছিঁড়ে',
মন-নদীতে প্রতিধ্বনির ছড় টানিনু শেষ মীড়ে।
স্বপ্ন ছিল, ধ্যান ছিল যা, রূপ ধরে তা দেয় দেখা—
একলা পথের যাত্রী তবু, আজ্ তো আমি নই একা!
মন্ত্র পড়ে অরুণ আলো আকাশ-ভাষার ইঙ্গিতে—
নবীন গ্রহের আঘাত পেয়ে, মন উতলা কোন্ গীতে!

নদীর বালি, বনের আলি, গিরির জটায় সূর্য্যোদয়,
সুদূর দরীর নির্জ্জনতা গৌরবে গায় আলোর জয়।
হাওয়ার গানের চাইতে মধুর গান গেয়ে কে যায় চলে'?
বন-লতিকার ফুল-মেখলা এলিয়ে পড়ে তার কোলে।
দূর জনমের লক্ষ যুগের মিলন-ভরা আব্ছায়া,
আধেক-গাওয়া গানের কলি, ভুলিয়ে দিল সব মায়া।
রৈবে কে আর বন্দী হ'য়ে এই গ্রহেরি পিঞ্জরে?
ক্ষুদ্র আমার মানস-শঙ্খ সাগর-সুরে যায় ভরে'!
অদৃষ্টে আজ বিশ্বাসিনু, নিত্য ধ্রুব সত্য সে,
মগ্ন হ'ল সন্দেহ সব আনন্দেরি প্রেম-রসে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায়।

# রং-ছুট

স্বামী আমায় ভালোবাসেননা এ-কথা বল্লে আমি জানি কেউ বিশ্বাস করবেনা। সবাই বলে আমি ভাগ্যিমানী—এমন রূপবান, গুণবান স্বামী কজনের হয়! সত্যি, তিনি গুণবানও বটে, রূপবানও বটে—এ কথা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করবে,—আমি তাতে না বলিনা। আমি শুধু বলি—বলি কেন বলচি?—এ পর্য্যন্ত ত মুখ-ফুটে বলিনি—আমি মনে-মনে জানি তিনি আমায় ভালো বাসেননা। এ-কথা নিয়ে তর্ক করতে গেলে আমি হেরে যাবো। কারণ তিনি যে আমায় ভালোবাসেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পদে-পদে দিচ্চেন। সেই সব দৃষ্টান্ত ধরে দিলে আমার কিছু বলবার আর মুখ থাকবে না। সচরাচর অভাব বলতে আমরা যা বুঝি তেমন কোনো অভাব ত তিনি আমার রাখেন নি;—রাণীর ঐশ্বর্য্য আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। লোকে বলে এ-সবই ত ভালোবাসার চিহ্ন! তা হতে পারে। কিন্তু তবু আমার মন স্বীকার করেনা যে তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি। তবে কি পেলে ভালোবাসা পাওয়া হয়? তার উত্তরও আমি জানিনা—আমি শুধু জানি তাঁর ভালোবাসা আমি পাইনি!

সই সেদিন দুঃখ-করে বলছিল যে সে বড় অভাগিনী। কারণ তার স্বামী ভারি গরীব। গায়ে দু-খানা গয়না পরা, ভালো দুটি খাওয়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকার সাধ এজন্মে তার মিটলনা। শুনে আমার ইচ্ছে হতে লাগল আমার এই গয়নার লোহার সিন্দুকটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! সত্যি বলতে কি, ঐ গয়নাগুলো দিন-দিন যেন পাথরের মতন ভারি হয়ে আমার বুকে চেপে বসছে। ওর ত ক্ষয় নেই, বরং বেড়েই চলেছে;—উপলক্ষ্যে, বিনা-উপলক্ষ্যে স্বামীর উপহার পেয়েই চলেছি। এক-এক-সময় ভাবি তিনি এত উপহার আমায় কেন দিচ্চেন? দিয়ে যে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে এমন ত কিছু মনে হয় না—দেওয়ার ভিতর যে একটা আবেগ আছে তাও ত দেখতে পাইনা। এ যেন দেওয়ার একটা প্রথাকে শুধু মেনে চলা মাত্র। এ-বাড়ির বৌদের গয়নার তালিকা একেবারে ডাকসাইটে। শুনেছি আমার শাশুড়ি এবং তাঁর শাশুড়ির গয়না এখনো যা মালখানায় জমা আছে তাতে হীরে-জহরত ও সোনারূপোর ছোট-খাটো মনুমেণ্ট তৈরি হতে পারে। আমি কোনো-দিন স্বামীর কাছে গয়না চাইনি—আর চাইবার ফাঁকই বা কোথায়! কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যদি ঐ চাইবার অবকাশটুকু দিতেন, আমি খুসি হতুম।

আমার সইয়ের হাতে দুগাছি বেলোয়ারি কাঁচের চুড়ি। আমি জানি এক জোড়া সোনার বালার জন্যে সে প্রতিদিন তার স্বামীকে উত্যক্ত করে;—এক-এক-দিন তুমুল ঝগড়াও হয়। হয় ত ঐ সোনার

বালা কোনো দিনই সে পাবেনা—চির দিন তার মনে খেদ থেকে যাবে ঐ টুকুর জন্যে। কেন-জানিনা আমার কিন্তু সোনা ছেড়ে ঐ খেদটুকুরই উপর ভারি লোভ হয়।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসে সই আমার কাছে কাঁদতে থাকে। আমি তাকে কখনো প্রবোধ দিইনা। সে হয় ত মনে ভাবে আমি পাষাণী! নয় ত ঠাউরে নেয় আমার অভাব নেই বলে আমি অভাবের দুঃখ বুঝিনা। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তার ঐ চোখের জলে আমি ভারি একটি আনন্দ পাই। মনে হয় ঐ কান্নার জল পেয়ে তাদের প্রেম-লতিকাটি বাড়ন্ত হয়ে উঠছে,—নিশ্চয় এমন দিন আসবে যখন সেটি পুষ্পে-পল্লবে নিবিড় হয়ে তাদের যুগল-মূর্ত্তিকে কুঞ্জের মত ঘিরে থাকবে! বেচারা জানেনা ঐ কান্নার জল দিয়ে সে কাকে সিঞ্চন করচে। আমি অমন কাঁদতে পেলে বর্ত্তে যেতুম। অবশ্য আমিও কাঁদি—কিন্তু আমার চারিদিকে যে মরুভূমি! আমার চোখের জল গড়িয়ে তার উপরেই পড়চে!

সইয়ের দুঃখ কিসের? সে তার স্বামীকে পেয়েছে। মুখে না বলে বেড়ালেও, তার সমস্তটা তা জানান দেয়;—তার কান্নায়, তার রাগে, তার অভিমানে, তার আনন্দে আর ত কিছু নেই—আছে কেবল তার স্বামী। তবু সে বলে তার সুখ নেই। আমি ত তার সুখের অন্ত দেখতে পাইনা। আমি জানি আমার ভাগ্যকে সে হিংসা করে; কিন্তু আমি যে তার সৌভাগ্যের হিংসা করে থাকি সে তা জানেনা!

আমি একদিন সইকে বল্লুম, সই গয়নার জন্যে তুমি এত দুঃখ কর কেন? এই ত আমার এত গয়না—সুখ আমার কৈ!

সই কপালের দিকে চোখ তুলে বল্লে, ওমা বোলোনা! তোমার আবার সুখের অভাব বোন্! তুমি হলে রাজরাণী!

আমি বল্লুম, রাজরাণী হলে কি দুঃখ থাকেনা?

সে বল্লে, সে হচ্ছে সৌখীন দুঃখ। বেশি মিষ্টিতে মুখ মেরে দেয় না?—তেমনি আর কি!

আমার যে দুঃখ আছে সইকে তা বোঝাতে পারলুম না। শুধু সই কেন, এ-জগতে কাউকে বোঝাতে পারব কি-না সন্দেহ। কারণ বাইরে সুখের সকল ঠাটই যে আমার বজায় আছে। আমার মনের দুঃখ আমার অন্তর্যামীই জানেন। আমি তাঁরই পায়ে আমার সকল দুঃখ নিবেদন করে জানাই—কাউকে কিছু বলিনা।

আমার স্বামীকে লোকে বলে স্ত্রৈণ। তিনি আমায় রাশ-রাশ উপহার এনে দেন বলেই বোধ হয় এই কথাটা উঠেছে। হায়রে আমার কপাল!

আমার স্বামী স্ত্রৈণ—একথা সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যি নয় এই জন্যে যে তিনি কোনো দিন আমার কথা-মতো চলেননি, কারণ আমি তাঁকে কখনো কোনো আদেশ করিনি; মিথ্যে নয় এই জন্যে যে তিনি কখনো আমার অবাধ্য হননি, কারণ তাঁকে আমি বাধ্য করবার চেষ্টাই করিনি। তিনি যদি কোনোদিন আমায় শাসন করতেন,

তাহলে শাসন কাকে বলে তাঁকে টের পাইয়ে দিতুম। তিনি যদি আমায় বাধ্য করবার চেষ্টা করতেন তাহ'লে মনের আশ-মিটিয়ে তাঁকে আমার বাধ্য করে নিতুম—ছাড়তুম না! কিন্তু তা ত হলনা। ছেলে-বেলায় পুঁতুল নিয়ে যা-খুসি-তাই করেছি—মেরেছি ধরেছি আদর করেছি, কোনো বাধা পাইনি, তাইতে অপ্রতিহত খেলার সখ একেবারে মিটে গেছে, এখন বোধ হয় তাই ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা খেলতে না পেয়ে তৃপ্তি হচ্ছেনা। মনে-মনে ভাবি চিরকালটা কি সেই পুঁতুল-খেলাই খেলতে হবে! তোমরা আমার অপরাধ নিয়োনা—সত্যি বলতে কি, এক-একসময়ে স্বামীকে আমার একটি প্রকাণ্ড পুঁতুল ছাড়া আর-কিচ্ছু মনে হয় না। এ-কথা বল্লুম বলে মনে কোরোনা স্বামীর প্রতি আমার অভক্তি আছে। স্বামীকে আমি দেবতার মতন ভক্তি করি। আমার বাপের বাড়ির ঠাকুর-ঘরে সেই প্রকাণ্ড বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মাথা আপনি যেমন নুয়ে আসত, স্বামীকে দেখেও ঠিক তেমনি হয়। স্বামী যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ান, তখন আমাদের সেই পাথরের ঠাকুরটিকে আমার মনে পড়ে। ছেলেবেলায় ঠাকুরের কাছে যেতে বুক ছম্-ছম্ করত—দূর থেকে প্রণাম করে পালাতুম; আমার স্বামী-দেবতাটিকেও তেমনি দূর থেকে মনে-মনে প্রণাম করি—তাঁর কাছটিতে যাওয়া ঘটল না। দেবতারা স্বর্গে থাকেন, মানুষের সঙ্গে তাঁদের অনেক তফাৎ। স্বামী আমার মনের মন্দিরে সেই দেবতা হয়েই রইলেন—তাঁকে নিয়ে খেলা করা আমার হলনা। স্বামীকে দেবতার আসন থেকে নামিয়ে মর্ত্ত্যলোকের মানুষ করে ফেল্লে তাঁকে অপমান করা হয় কি-না জানিনা, কিন্তু স্বামীকে মানুষ-রূপে পাবার জন্যে প্রাণের যে একটা কান্না আছে, তার সুর ভিতর থেকে অনবরত শুনচি। ওগো আমার দেবতা, আমার অপরাধ নিয়োনা। তোমাকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা ত করছি; তাতে হয় ত পরকালে আমার অক্ষয় স্বর্গ-লোকের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আমার ইহকালের মর্ত্ত্যলোকের দিন কাটে কেমন করে! অক্ষয় স্বর্গ আমি চাই না, তুমি আমার এই মর্ত্ত্যটিকে ক্ষণিকের জন্যেও স্বর্গ কোরে তোলো! শুধু আমার পূজা নয়—আমাকেও হাত ধরে নাও!

সই তার স্বামীকে ভক্তি করে। কিন্তু তবু তার সঙ্গে ঝগড়া করতে, তাকে গালাগাল দিতে, অপমান করতে ছাড়ে না। তার স্বামী নিশ্চয় তাকে উস্কে দেয়, নইলে সে যখন সহজ-অবস্থায় থাকে স্বামীর নিন্দা তার মুখে কখনো শুনিনি; বরং আর-কেউ নিন্দা করলে সে ফোঁস-করে ওঠে—অসহ্য হলে উঠে চলে যায়। স্বামীকে অপমান-করা, গালগাল-দেওয়া যে মস্ত বাহাদুরী তা আমি বলছি না, কিন্তু স্বামী যেখানে মানুষের রূপ-ধরে খেলা করেন এবং খেলান সে হয় ত বড় দেউল নয়, নাটমন্দির মাত্র, কিন্তু তারও চূড়া স্বর্গের দিকেই ঠেলে উঠেছে।

আমার স্বামী এমন কেন? তাঁর ত

কোনো দোষ নেই, তবে কেন তিনি এমন? আমার মনে হয়, তাঁর হৃদয়-দেউলে ভালোবাসার প্রদীপটি স্থান পায়নি। সমস্তটা অন্ধকার থেকে গেছে। সেখানে দীপদান—আমি অভাগীও পারিনি—পারিনি! সে দুর্ভাগ্য আমার স্বীকার করি কিন্তু আমি ভাবি আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কেমন আছেন? আমার হাতে দীপ জ্বলেনি বলে আমার অসহ্য দুঃখ আছে মানি, কিন্তু এ পরিপূর্ণ অন্ধকার যে আরো ভয়ঙ্কর। যদি অন্য পূজারিণীর হাতের দীপ সেখানে জ্বলে, সে যে এর চেয়ে শত-গুণে ভালো।

তোমরা আমার দোষ দেবে—আমি কেন সে মণিপ্রদীপ জ্বালতে পারিনি। কিন্তু কেমন করে পারব? আমি যে সে-দেউলে প্রবেশের পথই পেলুম না। সেখানে যে গায়ের জোরে যাওয়া যায় না—দ্বার খোলবার কোনো মন্ত্রও নেই। যার দেউল সে নিজে না খুলে দিলে তার সকল আট-ঘাট একেবারে নিরেট হয়ে থাকে। নিতান্তই আমার অদৃষ্ট! তাই হতভাগী আমি কাউকে কিছু বলতে পারিনা। স্বামী যদি আমায় বঞ্চিত করতেন, সে বঞ্চনার দুঃখও ত আমি পেতুম—কিন্তু এ যে কিছুই পেলুম না।

অথচ স্বামী আমার কৃপণ, নিষ্ঠুর নন। তাঁর শরীরে দয়ামায়া আছে এবং সব-চেয়ে বেশি করে আছে তাঁর কর্ত্তব্যবোধ। এই জন্যেই লোকের কাছে তাঁর এত সুখ্যাতি। কর্ত্তব্যের খাতায় জমাখরচের হিসেবটি তিনি এমন পরিষ্কার করে রেখে চলেন যে কোথাও ভুলভ্রান্তি ঘটতে পায় না। আমার পাওনা তিনি হিসাব-মতো কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর হাতের এই দাতব্যটা আমার সব-চেয়ে বুকে বাজে। আমার মনে হয় কর্ত্তব্য যেন একটা রাক্ষস! সে আমার স্বামীকে মায়া-পাশে অচেতন করে রেখে আমার মন-ভোলাবার জন্যে নানা রকম ফাঁদ পাতছে—আমাকে তার প্রেয়সী করে নেবে। ওগো, আমি তার মোহে ভুলতে পারব না,—এই ঘৃণ্য কুলটাবৃত্তি আমার দ্বারা হবেনা—ঐ রাক্ষসের দান গ্রহণ করে আমার অন্তরের সতী-সাধ্বীকে কলঙ্কিত করতে পারব না। ওগো আমার স্বামী, তুমি কোথায়? তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের হাত থেকে আমায় বাঁচাও—আমার সতীত্ব রক্ষা কর।

স্বামীর এই কর্ত্তব্যের দান গ্রহণ করতে আমার মন বিমুখ হয়ে ওঠে—আমি মনে-মনে প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করি—এ কি তিনি দেখতে পান না! তা যদি দেখতেন, তাতে তাঁর মনে যদি দুঃখ হত, রাগ হত, অভিমান হত—সেও যে আমার মাথার মণি হয়ে থাকত!

সই সে দিন কাঁদতে-কাঁদতে এসে বল্লে যে তার স্বামী তাকে মেরেছে। কপালে তার রক্তের দাগ। দেখে আমার মন যে কী খুসি হল বলতে পারিনা। আমি দেখলুম তার কপালের সেই দাগ তার মাথার সিঁদুর একেবারে ম্লান করে দিয়েছে। কে যেন একখানা প্রকাণ্ড চুনি-বসানো সিঁথি আদর করে তার কপাল ঝেঁপে পরিয়ে দিয়েছে। আমি বল্লুম, সই তুমি গয়নার

দুঃখ কর, আজ তুমি যে-গয়না পেয়েছ আমার রাজরাণীর ভাণ্ডার উজাড় করে ফেল্লেও অমন-একখানি পাবেনা। সই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। হয় ত ভাবলে আমি পাগল হয়েছি। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার সেই অপরূপ অলঙ্কারের দিকে, লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম।

গয়নার উপরে লোভের জন্য মনে-মনে সইকে কত ঘৃণা করেছি—তার হয়ে লজ্জা বোধ করেছি; কিন্তু একদিন দেখি তার এই লোভ হঠাৎ এক ঘূর্ণির হাওয়ায় উড়ে গেল—তার জন্যে কিছুমাত্র ক্ষোভ করলে না। আমি আশ্চর্য্য হলুম। তার চার-গাছি মাত্র সোনার চুড়ি ছিল। সেগুলি সে অতি-যত্নে আঁকড়ে রেখেছিল। সর্ব্বদাই বাক্স-বন্ধ থাকত—কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য না হলে তারা হাতে উঠতে পেত না। তারপর স্বামীর অসুখ হতে যখন ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই, তখন সই হাসিমুখে চুড়ি চারগাছা বার করে দিলে—দুঃখের কথা মনেই এল না—বরং সেগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে কৃতার্থ বোধ করলে। সইয়ের চারগাছি মাত্র চুড়ি ছিল তাও গেল—আর আমার গয়নার শেষ নেই! সিন্দুক খুলে বসে আমি অবাক হয়ে ভাবি—এ ত গয়না নয়—এ যেন জগতের যত ব্যর্থতার জঞ্জাল আমার সিন্দুকে এসে ঠাসা হয়ে জমেছে। সইয়ের সামান্য চুড়ি চারগাছি বিকিয়ে গিয়েও অমূল্য হয়ে রইল—আর আমার এই অমূল্য হীরে-জহরতগুলোর কোনো দামই উঠল না।

আমি শুনেছি আমার এই গয়না দেখে অনেক মা কামনা করেন যে তাঁদের মেয়ে যেন আমার মতন সৌভাগ্যবতী হয়। শুনে আমার গা শিউরে উঠে! আমি মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারিনা—মনে-মনে বলে উঠি, হে ভগবান আমার এই সৌভাগ্য থেকে এই অভাগিনীদের রক্ষা কর।

আমার মনে পড়ে স্বামীর সঙ্গে যেদিন আমার গাঁট-ছড়া বাঁধা হয়। সেদিন সে কত উলু-ধ্বনি—কত শঙ্খ-ধ্বনি! সেই শব্দে আমার বুকের কপাটখানা থর-থর করে কাঁপছিল। দেখলুম গায়ে লাল চেলির জোড়, গলায় সাদা ফুলের গোড়ে, মাথায় সাদা জরির টোপর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী! এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তির দিকে ছেলেমানুষ আমি অবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম। তাঁকে আমার তখন ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না—যেন কার হাতে-গড়া একটা প্রতিমূর্ত্তি—যেন চিত্রপটের ছবি। আমি কৌতূহলী হয়ে বার-বার সেই ছবির দিকে চেয়েছি—কেবলই বিস্ময় হয়েছে। ছবি আমরা দেখি, ছবি আমাদের দেখছে কি-না, এ প্রশ্ন যেমন মনেই ওঠে না, তেমনি তিনি আমাকে দেখছেন কিনা, কেমন-করে দেখছেন এ কথা তখন একবারও মনে হয়নি। এখন কিন্তু জানবার ভারি ইচ্ছে হয়।

স্বামী যখন প্রথম আমার ঘরে এলেন, আমার তখন বাপের বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছিল। তিনি এসে আমার চোখ-মুছিয়ে দিলেন, আমার সঙ্গে খেলা করতে

বসে গেলেন। তার পরেও যখন কেঁদেছি, আমার চোখ-মুছিয়ে দিয়েছেন, নানা-রকম খেল্‌না এনে আমার মন ভুলিয়েছেন। সে আমার বেশ লাগত। তারপর ক্রমে ক্রমে শ্বশুর-বাড়ী আমার কাছে যেমন সহজ হয়ে আসতে লাগল, চোখের জল যেমন দিনে-দিনে শুকিয়ে এল, আমার চোখের উপরে তাঁর হাতের সেই স্পর্শটিও ধীরে ধীরে খসে যেতে লাগল। এ যেন ঠিক পোষ-মানানো। পোষ-মানানো শেষ হয়ে গেলে পোষ-মানাবার মন্ত্রের আর দরকার রইল না—তখন শুধু যা বরাদ্দ, যা বাঁধা-খোরাক তাই রইল।

বিয়ের পর ঐ কটা দিন আমার স্বপ্নের মতো কেটেছে। তার পর কেমন-করে ধীরে ধীরে সেই স্বপ্নরাজ্য থেকে এই দিবালোকের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এসে পৌঁছলুম তার সূক্ষ্ম সূত্র আমি খুঁজে পাই না;—সে স্বপ্নরাজ্য থেকে যে বাইরে ঠিকরে পড়েছি শুধু তাই জানি। হঠাৎ একদিন চম্‌কে উঠে দেখলুম এই বাড়ির আসবাব-গুলোর মতোই আমি এক-কোণে পড়ে আছি। প্রয়োজনের সামগ্রী, ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করবার একটা সজীব আসবাব—আর কিছু নয়।

কিন্তু কেন এমন হল? স্বামীকে আমার দোষ দেব কোথা থেকে আমি খুঁজে পাই না—তিনি ত অন্যায় কিছু করেন নি। নতুন জিনিষ পুরোনো হয়ে এলে তার উপর থেকে টান আপনিই কমে আসে—আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই হয়েছে। তিনি জবরদস্তি করে ত কিছু করেন নি। আমি যে তাঁর চোখে পুরানো হয়ে গেলুম! আমার রূপ নব-নব ঊষায় যে আলোতে সৌন্দর্য্যের একটি-একটি দল মেলে দেবে, সে আলো আমার ভাগ্যে এসে পৌঁছবার আগেই আমি ঝরে পড়লুম। তবে দোষ দেব কার?

একই সময়ে আমি আর সই শ্বশুর-ঘর করতে আসি। একই হাওয়ায় আমরা তখন দুই-সখীতে হেলছিলুম, দুলছিলুম। আমরা দুজনে বসে চুপি-চুপি কেবল স্বামীর কথাই কইতুম—গানের গুঞ্জনের মতন। সেই গানের সুর ক্রমে ক্রমে আমার গলায় ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ একদিন একেবারে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সইয়ের দেখি সেই সুরের ভিতর দিন-দিন নব-নব বেগ ও বিচিত্র লীলা খেলে উঠছে। তার গানে এখনো ক্লান্তি আসেনি, আর আমার সুর কবে হারিয়ে গেছে! আমি মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনি, সে তন্ময় হয়ে গেয়ে যায়, আমার সুর যে বন্ধ হয়ে গেছে তা ধরবারও তার অবসর নেই।

সই তার স্বামীর ছোট্ট ঘরটি একেবারে জুড়ে বসতে পেলে, আর এত বড় বাড়ীতে আমি কোথায় হারিয়ে রইলুম। সই আমায় বলে, কি ভাগ্যি তোমার! ভারে-ভারে তোমার পায়ে পূজার উপহার আসছে,—তুমি রাজরাজেশ্বরীর আসনে বসে আছ! শুনে আমি মনে-মনে হাসি। হায় রে, এ উপহার কি আমার? এ তারই জন্যে যে এ-বাড়ির বড়-বৌ নাম পেয়েছে। এ বাড়ির বড়-বৌয়ের যে মর্য্যাদা এ সব

উপহার উপঢৌকন তারই রত্নবেদীর সামনে স্তূপীকৃত হচ্ছে। আমার সঙ্গে ঐ বড়-বৌয়ের যে প্রভেদ তা আমি বোঝাবো কেমন করে? ওগো, আমি তোমাদের বড়-বৌ হতে চাই না। তোমরা এই সিংহাসনে আর-কাউকে বসিয়ে সকাল-সন্ধ্যা তার আরতি কর, আমার তাতে ক্ষোভ নেই—আমাকে শুধু আমার স্বামীর হৃদয়-মন্দিরে দাসী করে রেখে দাও!

সইয়ের কথা শুনে-শুনে এক-এক-সময় ভাবি, সত্যি আমার মতন ভাগ্যিমানী কে? এমন রাজার মত স্বামী আমার, এমন স্নেহময়ী শাশুড়ি আমার! সত্যি, শাশুড়ি কোনোদিন আমার শাশুড়ি হননি—চিরদিন আমার মা। সেই প্রথম-দিন বরণ করে ঘরে তুলে তিনি আমার মুখে-চোখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন—সে স্পর্শ আমি এখনো ভুলতে পারিনি। নিজের পেটের মেয়ের চেয়েও যেন তিনি আমায় বেশি-করে দেখলেন। তাঁর রাজার ঘরের বড়-বৌ আমি—আমি কি তাঁর কম আদরের! তিনি আমায় এত স্নেহ করেন যে মনে হয় একটু উঠে-নড়তে আমার কষ্ট হবে ভেবে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি আমাকে নিজের মেয়ের মতন দেখেন বটে কিন্তু তিনিও কি ভুলতে পেরেছেন যে আমি এ বাড়ির বড়বৌ মাত্র? তিনি নিজে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসে যে-সব ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন, পাছে তার একটা থেকেও ভুলক্রমে আমি বঞ্চিত হয়ে যাই এর জন্যে সর্ব্বদাই সাবধান হয়ে আছেন। কড়ায়-গণ্ডায় আমি সব মিলিয়ে পাচ্ছি কি-না তা হিসেব করে দেখবার জন্যে তিনি মধ্যে-মধ্যে দপ্তরখানা থেকে পুরোনো হিসেবের খাতা তলব করে পাঠান। এ বাড়ির বৌয়ের প্রাপ্যের ফর্দ্দ একেবারে বাঁধা হয়ে গেছে। মা আমার নিশ্চিন্ত আছেন যে আমার সেই বাঁধা-বরাদ্দের কোথাও ফাঁক পড়ছে না,—কিন্তু যে-জিনিষের হিসেব হয় না—যার অঙ্ক এ পর্য্যন্ত জগতের কোনো খাতায় পড়েনি, তার কোনো গরমিল হচ্ছে কি-না সে খবর কি রাখেন?

আমাকে যখন সাধ-দেবার সময় এল, বাপের বাড়ি থেকে মা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন আমার কি কি জিনিষ চাই। স্বামীর ঘরে আমার কোনো জিনিষেরই অভাব নেই বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ ঠাসা হয়ে আছে, তবু মায়ের ঐ চিঠিখানি পেয়ে মনে হল আমার বিস্তর জিনিষের দরকার—আমি একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ লিখে ফেল্লুম। এখানে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকারই হল না। শাশুড়ি তাঁর সাধের সময় যে-সব সামগ্রী পেয়েছিলেন তার ফর্দ্দ মিলিয়ে আমার জন্যে জিনিষের ফরমাশ দিলেন। কি একটা জিনিষ তখন দুষ্প্রাপ্য বলে সংগ্রহ হল না; তার জন্যে শাশুড়ি ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা পেলেন না। তাঁর সে আপশোসের কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেননি। আমি সেই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ না পেয়ে কোনো খেদ করলুম না দেখে তিনি আমার সুখ্যাতি করতে লাগলেন, বল্লেন—কী লক্ষ্মী বৌ আমার! তারপর আমার স্বামীকে ডেকে বল্লেন—ঐ দামের চেয়ে বেশি

দামের কোনো জিনিষ দিয়ে আমার ক্ষতি যেন পূরণ করে দেওয়া হয়। মায়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করে স্বামী আমার হাতে এক বহুমূল্য উপহার এনে দিলেন। আমার সাধ দেওয়া শেষ হল।—হায়রে আমার সাধ!

মাগো, তুমি আমার অপরাধ নিয়ো না। তোমার স্নেহের দানও আমি মন-খুলে নিতে পারচি না। তুমি যাকে এসব দিচ্চ সে আমি নই—আমি নই! সে তোমার ছেলের প্রেয়সী! যেদিন সে সৌভাগ্য হবে, সেদিন তোমার এই দান আমি মাথায় করে নেব—এখন ওসব তোলা থাক!

খুকী বোধ হয় আমার মনের দুঃখ বোঝে। আমি যখন একলা চুপ-করে বসে থাকি, সে কোথা-থেকে ছুটে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে-পোড়ে আমার গলা-ধরে এমন আদর করতে থাকে যে আমার সব দুঃখ ঘুলিয়ে যায়। সে কেমন-এক-রকম-করে চায় যাতে আমার বোধ হয় আমার মনের সমস্ত অলিগলির ভিতর তার চোখের আলো গিয়ে পড়েছে—যেন তার ঐ কচি নরম হাত আমার বেদনার উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে যাচ্ছে। ও কচি মেয়ে আমার মনের দুঃখ টের পেলে কেমন করে? এক-এক-সময় সে আমার বুকের উপর কান পেতে চুপটি করে পড়ে থাকে—মনে হয় যেন কি শুনছে! নিশ্চয় ও যাদুমন্ত্র শিখেছে, নইলে থেকে-থেকে আমার চোখের উপর থেকে পৃথিবীর রং কি-করে এমন বদলে দেয়!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একা চুপটি করে বসেছিলুম, মনে হচ্ছিল আমার বুকের ভিতরকার অন্ধকারের ছায়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আজকের সন্ধ্যাকে ঘনীভূত করে তুলছে। সমস্ত পৃথিবীটা অল্পে অল্পে ঝাপসা হয়ে আমার চোখের উপর থেকে মুছে আসছিল—চারিদিকে কেবল অন্ধকারময় বিরাট শূন্যতা জেগে উঠছিল। আমি ক্রমে ক্রমে সেই শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ খুকী তার বাপকে এনে ঘরে হাজির করলে। তিনি বল্লেন—"তুমি আমায় ডাকছিলে?" আমি চমকে বলে ফেল্লুম—"হ্যাঁ।" কিন্তু কৈ আমি ত তাঁকে ডেকে পাঠাইনি—তবে কেন বল্লুম হ্যাঁ। আমি হতভম্ব হয়ে রইলুম। তিনি বল্লেন—"আমার বাইরে যাবার দরকার ছিল, খুকী কিছুতেই ছাড়লেনা, বল্লে আসতেই হবে। কি দরকার বলত?" দরকার? কৈ দরকার ত কিছুরই নেই! আমি কি উত্তর দেব জানিনা, খুকী আমায় রক্ষা করলে। সে আমার জবাবের সময় না দিয়েই বলে উঠল—"বাবা, তুমি সেই গল্পটা মাকে বল!" "দুষ্টু মেয়ে!"—বলে একবার চোখ-রাঙিয়ে তিনি বসলেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি কখনো ঘরে আসেন না, আজ অনেকক্ষণ রইলেন। খুকী এমনি-করে মাঝে-মাঝে তার বাপকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসে, তিনি দেখি মনের খুসিতেই আসেন—সে আমার বেশ লাগে। কিন্তু আমি ভাবি তিনি কার টানে আসেন?

খুকীর দরদে শুধু স্বামীর কাছে কেন, বাড়ীর সকলের কাছেই আমার আবার নতুন-করে আদর বেড়েছে। খুকীকে যখন কোলে পেলুম তখন স্বামীর ব্যবহার দেখে আমার

একবার মনে হয়েছিল তাঁর সেই হৃদয়-দেউলে যেন একটু আলোর আভা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে আমার ভুল—সে-অন্ধকার তেমনি কঠিন অটুট আছে। আমি খুকীর মা হয়েছি বলে আমার একটা বেশী আদর পাওনা হয়েছে মাত্র। ওগো এ সংসারে শুধু কি এমনি-করে দেনা-পাওনার হিসেবই চলবে?

খুকী এসে তার মা ও বাপকে নিয়ে নতুন এক খেলা খেলাচ্ছে। সে খেলার প্রধান হচ্ছে সে নিজে—আমরা তুজন খেলার ঘুঁটিমাত্র। খেলার ঝোঁকে তুই ঘুঁটি যেমন একএকবার এক-ঘরে এসে বসে, তেমনিধারা মধ্যে মধ্যে আমাদের তুজনের মিলন ঘটে, কিন্তু তারপর আবার যে যার নিজের কোটরে প্রবেশ করি।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

---

# আর্টে প্রেম

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'!—সুতরাং শিল্পীদের পক্ষেও এ জগৎজোড়া ফাঁদ এড়াইয়া চলা শক্ত কথা। পৃথিবীর সকল জাতির ললিত কলাই তাই প্রেমের পেলব স্পর্শে কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

জাগতিক শিল্পে তুটি বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যায়;—ধর্ম্ম আর প্রেমের ছবি। আগেকার শিল্পীরা ধর্ম্মকেই একান্ত ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, লিওনার্ডো ডা ভিন্সি, টিসিয়ান, দোনাতেলো, বোটিশেলী প্রভৃতি শিল্পীরা ধর্ম্মের শত শত চিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাইবেলের একই বিষয় লইয়া তখনকার ছোট-বড় অসংখ্য শিল্পী এতটা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, দেখিলে অবাক মানিতে হয়; আর্টের এতটা ধর্ম্মপ্রাণতার আসল কারণ হইতেছে এই যে, সে যুগের খৃষ্টিয় চার্চ্চগুলিই প্রধানত শিল্পীদের পালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মের নিরাপদ ছায়ায় ঠাঁই না পাইলে সেকালের আর্ট কখনো টিকিয়া থাকিতে পারিত না। রোমের পোপদের নেক-নজর পাইয়াছিলেন বলিয়াই র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি অনেক ওস্তাদ-শিল্পী এত-বেশী নাম করিয়া গিয়াছেন। এই-সব সুবিধার জন্য শিল্পীরা প্রথম হইতেই তখন আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক পাতাইতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু, অনেকসময়ে এই সম্পর্কটা যে জোর-করিয়া পাতানো হইত, তাহারও ঢের প্রমাণ আছে। শিল্পের মধ্যে নিছক ধর্ম্মের প্রকাশ ক্রমে একটা বাঁধা গৎ হইয়া দাঁড়ানোতে আর্টিষ্টের অনুভূতিও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই প্রাণের টানে আর ধর্ম্মের ছবি আঁকিতেন না; আঁকিতেন, দস্তুর বলিয়া। ফলে আর্টের স্বাধীনতা, বিচিত্রতা ও ভাবুকতা



প্রেমালাপ
( Boucherএর আঁকা ছবি হইতে )

কমিয়া আসিয়াছিল। অমন্ যে বিখ্যাত চিত্রকর টিসিয়ান, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসে যাঁহার জোড়া মিলিত না, চল্‌তি রীতির নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া তিনিও কলালক্ষ্মীর মান রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্রের পাত্র-পাত্রীরা ধার্ম্মিক বটে; কিন্তু সমালোচকের মতে তাহারা প্রাণহীন। (He painted many "Assumptions," but although so much of his work was devoted to sacred subjects it is curiously lacking in soul, even when perfect in detail of colour and workmanship.) বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর Boucherও প্রথম জীবনে অন্যের দেখাদেখি ধর্ম্মকে চিত্রবস্তু করিতে গিয়া-ছিলেন। সে-সময়ে তিনি যে দু-চারখানি ধর্ম্মমূলক ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব বিশেষত্ব বা ভাবের ছাপ্ কিছুই ছিল না। তিনি নিজের প্রাণে ধর্ম্মকে অনুভব করেন নাই,—লোকে যেমনটি চায়, বাজারে যে ধরণের ধর্ম্মের ছবি বেশী বিক্রী হয়, তিনি হুবহু ঠিক সেই রকমেরই ছবি, দস্তুর বজায় রাখিয়া আঁকিয়াছিলেন। সুতরাং সে অনুকরণে কি আর্ট, আর কি ধর্ম্ম—এ-দুয়ের কোনটিই বিকাশ লাভ করে নাই। কিন্তু ভিতরে প্রতিভার প্রদীপ থাকিলে পথ চিনিতে দেরি লাগে না। প্রতিভাবান



প্রণয়ী

( মার্কাস ষ্টোনের আঁকা ছবি হইতে )

Boucher শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিয়া ধর্ম্মমূলক ছবি-আঁকা ছাড়িয়া—যেদিকে তাঁহার প্রাণের টান, সেই—প্রেমকে অবলম্বন করিলেন। ফলে অল্পদিনের ভিতরেই দেশ-বিদেশে তাঁহার নাম রটিয়া গেল।

একজন প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক বলিয়াছেন, "A man's art is the revelation of his soul's appetites, the confession of what he has felt most intensely, set his heart upon most keenly." এই কথাগুলি না বুঝার দরুণই শিল্পজগতে আমরা আজ এত ভাব-হীন ও প্রাণহীন ম্যাডোনার মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এ-সব ছবি দেখিয়া না-হয় ভক্তি না-হয় তৃপ্তি;—এরা শুধু মৌন ভাষায় শিল্পীদের কলঙ্ক ঘোষণা করে!



ভালোবাসো ?
( সি, হেগ-উডের আঁকা ছবি হইতে )

"All the world loves a lover"—তাই প্রেমের ছবি দেখিতে আমরা এত ভালবাসি। জগতে প্রেমের মত পুরাণো ও শতবার আলোচিত এবং নিত্য-অনুভূত বিষয় আর নাই; কিন্তু পুরাণো হইলেও এই "পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে" সাহিত্য ও শিল্পের আসর যুড়িয়া আছে। যাঁহারা ভারিক্কে মেজাজের লোক, সাহিত্য ও শিল্পে প্রেমকে দেখিলেই তাঁহারা চটিয়া অস্থির হন; তাচ্ছীল্য করিয়া বলেন, 'এ যে ছেলেমানুষী খেলা'! কিন্তু হায়রে মানুষের চপল মন! মুখের কথায় সে ত বোঝ মানে না, মাথার চুল পাকিলেও সে ত এ খেলা ভুলিতে পারে না! বসন্তের একটু বাতাসে, নয়নের একটু ঠারে-ঠোরে, আঁচলের একটু স্পর্শে জরা-নত দেহের তলে-তলেও তাই অজর প্রাণ সকল শাসন ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিতে চায়! প্রেমের দেবতা বেশ ভাল-রকমেই বোঝেন, মানুষের এ মানা মুখের মানা—এ হৃদয়ের বিদ্রোহ নহে; তাই



গান-শেষে

( ই, ব্লেয়ার লেটনের আঁকা ছবি হইতে )

তাঁহার লীলা আদিপ্রভাত হইতে আজ-পর্য্যন্ত সমানই চলিয়াছে। আর, যতদিন মানুষের জীবনে এই প্রেমের সাড়া পাওয়া যাইবে, ততদিন গম্ভীরের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শিল্পী গড়িবেন প্রেমের প্রতিমা এবং কবি রচিবেন প্রেমের পূজা-মন্ত্র! জীবনের সঙ্গে যাহার চিরসম্পর্ক, কবি ও শিল্পী কি তাহাকে প্রাণ থাকিতে ত্যাগ করিতে পারেন! তাই কবি চণ্ডীদাস একেবারে কবুল-জবাব দিয়া বসিয়াছেন—

"পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে!"

তাঁহার রাধাও স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়াছেন—

"সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা!"

প্রেম কি? দুটি আত্মার পরস্পরের সহিত মিলন-আকাঙ্ক্ষা। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে বুঝা যায়, সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এই আকাঙ্ক্ষার উৎস। আমাদের প্রাচীন কবি বলিয়াছেন, "মন কি কারো রূপে ভোলে?" কিন্তু, মন যে রূপেই ভোলে এবং রূপই যে প্রেমের প্রথম ধাপ, এ সত্য ত আমরা নিত্যই জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি! দুনিয়ার পনেরোআনা লোকই বাহিরের রূপের মধ্যে প্রেমের প্রথম সাড়া পায়, বাকি একআনা লোকের প্রেমের সঙ্গে যদি বাহিরের রূপের সম্পর্ক নাই-বা থাকে, তবে মানস-সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সেখানে আছেই আছে। দেহের রূপ বা মনের রূপ—যেদিক দিয়াই দেখি, প্রেমের ঘুম ভাঙ্গায় রূপের সোনার কাঠি। যৌবন সুন্দর বলিয়াই প্রেমের মধুরসের ভিয়ান হয় যৌবনবয়সে।

শিল্পী রূপের পূজারী। প্রেমের সম্ভোগে রূপের সার্থকতা, শিল্পী তাই প্রেমের ছবি লইয়া এমন মাতিয়া উঠেন। তিনি যে প্রেমের মূর্ত্তি আঁকেন বা গড়েন, তাহার মধ্যে আমরা শিল্পীর সম্ভোগলিপ্সা দেখি না, তাঁহার সৌন্দর্য্যপূজার পরিচয়ই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। এই যে সব সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী কামিনী প্রেমালাপে বিভোর হইয়া আছে, ইহাদের যৌবনপুষ্পিত দেহে দেহে, ইহাদের মোহন সাজসজ্জায়, মধুর ভাবে-ভঙ্গীতে, ইহাদের আবেগভরা মিলনোচ্ছ্বাসে আমরা দেখি, শিল্পীর আদর্শ-সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস! সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ নানা ভাবে দেখানো যায়। এমন-কি, আর্টিষ্ট যে কুৎসিতকেও ত্যাগ করেন না, তাঁহার হাতে পড়িয়া কুশ্রীও যে আর্টের গুণে সুশ্রী হইয়া উঠে, এ কথাও ত সবাই জানেন! কিন্তু সৌন্দর্য্য যখন যৌবরাজ্যের প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন তাহার যথার্থ মহিমা বুঝাইবার জন্য শিল্প-সমালোচকের টিপ্পনীর কোন দরকার করে না; অন্য-কোন ভাবের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইলে, জনসাধারণ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শিল্পীকে গালাগালি দেয়; কিন্তু প্রেম-ভাবে যখন সৌন্দর্য্যের আত্মপ্রকাশ, তখন কাহারও তাহা বুঝিতে দেরি হয় না এবং শিল্পীর গুণপনা তখন সহজেই সকলকে মোহিত করে। কেননা, প্রাসাদে, কুটীরে, হাটেমাঠেবাটে—সর্ব্বত্রই প্রেমের অবাধগতি। এমন অনেক ভাব আছে পণ্ডিত ও মূর্খ

সমানভাবে যাহাদের বুঝিতে পারে না। কিন্তু প্রেমে এ বালাই নাই, সে যে ছাড়পত্র পাইয়াছে, তার জোরে সে সকল প্রাণের ভিতরেই অনায়াসে ঢুকিতে পারে। কম-বেশী পরিমাণে সকল শ্রেণীর সকল মানুষই প্রেমের স্বোয়াদ পাইয়াছে, তাই চিত্রার্পিত প্রেমভাবে সকল হৃদয়েই সাড়া পড়িয়া যায়;—প্রণয়ীর ঐ চোখ-মুখ, ঐ হাসি-লজ্জা, ঐ মান-অভিমান, ঐ চুম্বন-আলিঙ্গন—এ-সবের যথার্থ অর্থবোধে কাহারও ক্ষণ-বিলম্ব হয় না! এইজন্য যে-সকল শিল্পী প্রেম লইয়া বেশী কারবার করিয়াছেন, তাঁহারা আর-সকলের চাইতে অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।



প্রিয়ের উদ্দেশে

( অ্যাবি অ্যান্টেসনের আঁকা ছবি হইতে )

জগতে যদি প্রেম না থাকিত, তাহা-হইলে বেশীর ভাগ কবি ও শিল্পী নিশ্চয়ই মাঠে মারা যাইতেন! ভাগ্যে প্রেমের রেওয়াজ উঠিয়া যায় নাই, শিল্পী ও কবিরা তাই বাঁচিয়া আছেন। বিখ্যাত প্রেমের চিত্রকর মার্কাস্ ষ্টোন বলিয়াছেন, প্রেম আছে তাই আমি বেকারের দলে গিয়ে পড়িনি; নইলে আমাকে একটি : পয়সার জন্যে

লোকের দোরে দোরে হাত পেতে ঘুরে মরতে হোত!

হেগ্-উর্ড নামে আর-একজন নামজাদা পটুয়া বলিতেছেন, আমি ভালবাসি প্রেমমূলক ছবি; লোকে যখন দোসরহারা ও বয়সে-বুড়ো হয়, সে-সব ছবি তখন কালো জীবনে আলোর রেখাপাত করে।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে যে-সব ছবি আঁকা হইয়াছে, প্রেমসম্পর্কীয় সমস্ত চিত্র-ভাণ্ডারের মধ্যে গুণ্‌তিতে তাহাই সব-চেয়ে বেশী। তারপর কবি ও ঔপন্যাসিকদের কাব্য এবং কথাগ্রন্থ অবলম্বনেও অনেক পট আঁকা হইয়াছে। সেক্‌স্‌পিয়ারের অমর প্রেমিক-প্রেমিকা রোমিও এবং জুলিয়েটের মধুর প্রেম-কথা যে কত চিত্রকরকে ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না; ভারতীয় চিত্রকরেরাও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-লীলা লইয়া এমনি মাতিয়া আছেন।

ভারতের প্রাচীন চিত্রে প্রেমকে যে কত ভাবে ও কত রূপে দেখিয়াছি, তার আর হিসাব হয় না। বিরহের ছবি, মিলনের ছবি, মানের ছবি! প্রেম হচ্ছে সুন্দর যৌবনের সুন্দরতর স্বপ্ন,—সে-সব ছবিও তাই স্বপ্নের মতই মধুর লাবণ্যে সমুজ্জ্বল! তাহাদের মধ্যে রূপোল্লাস আছে, রসালস আছে, অনুরাগ, বিরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্যও আছে। প্রথমবৎসরের "প্রাচ্য চিত্রকলা-প্রদর্শনী"তে অভিসারের একখানি প্রাচীন পট দেখিয়াছিলাম, তাহার অপূর্ব্বতা আজও ভুলিতে পারি নাই।

"অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কতশত কোটি শবদ, জীউ কাঁপ।"—

ইহারই মধ্যে গভীর রাত্রে আঁধার পথে একাকিনী অভিসারিকা কান্তদর্শনে চলিয়াছে। বনের গাছে গাছে অগ্নিরূপিনী সাপিনীর মত চঞ্চলা চপলার লীলা,—আর তাহারই ক্ষণিক প্রভায় ভয়ত্রস্তা কামিনী, চারিদিকে অন্ধকারের চেয়েও ভয়ানক, নানা বিভীষিকার মিথ্যা মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে! ইহাই সেই ছবিখানির বিষয়। আর-কোন চিত্রকরের পটে, অভিসারের এমন নিখুঁত ভাবের আভাস আমরা দেখি নাই—এ ছবিখানি প্রাচীন ভারতীয় কলার একটি masterpiece! সুধু ছবিতে নয়, এদেশে সেকালের ভাস্কর্য্যের নমুনা যেখানে-যেখানে বিদ্যমান, সেখানেই শিলা-পটে প্রেমের দৃশ্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। আমাদের সেকালকার শিল্প একান্ত ভাবে ধর্ম্মের দায়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে; এমন-কি, দেবালয় ছাড়া শিল্পীদের আর-কোন কলা-ভবন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরং চিত্রকরেরা স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু ভাস্করদের হাত দেবতার তুষ্টি-সাধনের জন্য একেবারে যোড়া ছিল।—হাজার হোক্ শিল্পীরা ত মানুষ বটে! তাই গম্ভীর দেবতার পাষাণ-নেত্রের কঠিন দৃষ্টিও শিল্পীদের তরল চিত্তের চপলতা নিবারণ করিতে পারিত না। জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর ও কণারক প্রভৃতি দেবমন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় ভাস্করদের মানুষী চপলতার এমনি শত-শত নিদর্শন বর্ত্তমান। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিকেতনে চুম্বন ও আলিঙ্গনের এত ছড়াছড়ি দেখিলে বেশ বুঝা যায়,



নব-দম্পতী
( লর্ড লেটনের আঁকা ছবি হইতে )

শিল্পীরা দেবতার ডাক্ শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনাদের প্রাণের ডাকেও তাহারা সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই!

য়ুরোপের আধুনিক প্রেম-শিল্পীদের চিত্র-মালায় একটি বিশেষত্ব বিশেষ-করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। অনেক চিত্রকর তাঁহাদের চিত্রলিখিত পাত্র-পাত্রীদের দেহে প্রাচীন কালের ঢিলা পোষাক দিয়াছেন। যাঁহারা প্রাচীন পোষাকের ভক্ত নন, তাঁহারাও একেবারে একেলে কাপড়ের উপরে হাড়ে-হাড়ে চটা! বাস্তবিক, পাশ্চাত্য দেশের একালকার কাপড়-চোপড়ে এমন একটা কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা আছে যে, তাহার ভিতরে পড়িলে পেলব প্রেমের সরস কাব্য যেন একেবারে নীরস গদ্যে পরিণত হইয়া যায়; সে পোষাকের চাপে যৌবনের মাধুর্য্য ও দেহের সৌন্দর্য্যও যেন আড়ষ্ট হইয়া হাঁপাইয়া উঠে! এইজন্যই বোধহয় একালের জামা-কাপড় শিল্পীদের পটে স্থানলাভ করে নাই।

এ সংসারে প্রেম, আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র' বিশ্ব রচনা করিয়া লইয়াছে। সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখের বাহিরে প্রেমিকের মনোজগতে প্রেমজনিত সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের মান-অভিমান এবং বিরহ-মিলন প্রভৃতি প্রেমিকের প্রাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ঢেউ বহাইয়া দেয়; প্রেমে যেমন "ক্ষণেক হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ", এই হাসি এই কান্না, এই আলো এই ছায়া,—তেমন বিপরীত ভাবের খেলা সাধারণ জীবনে ঘটিতে দেখি হয়। এইজন্যই মানুষের একঘেয়ে জীবনে যখন প্রেমের বাঁশী বাজিয়া উঠে, তখন কিছুদিনের তরে সে সব-ভুলিয়া একেবারে মাতিয়া যায়। কিন্তু সংসারের দস্তুরমত, প্রেমের উপর হইতেও ক্রমে নবীনতার আবরণ খসিয়া পড়ে। তবে, এর মধ্যেই যৌবনের নবীন প্রেম আমাদের স্মৃতির পরতে-পরতে যে ছবি খুদিয়া রাখিয়া যায়, তাহার মধুরতা আমরা সারাজীবনের মধ্যে আর ভুলিতে পারি না। তাই নূতন প্রেমিকের আবেগ ও উপভোগ-স্পৃহা খোয়াইয়া প্রাচীন বয়সেও আমরা যখন কোন ভাল আর্টিষ্টের আঁকা প্রেমের আলেখ্য দেখি, তখন তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের প্রণয়-স্মৃতির শিখা আবার নূতন-করিয়া উস্কাইয়া দেয়,—তখন আমরা আবার প্রেমের স্বতন্ত্র বিশ্বে গিয়া পড়ি। এই দুর্লভ শক্তি আছে বলিয়াই প্রেমের কাব্য এবং প্রেমের চিত্র আমাদের সমগ্র জীবনে পুরাণো হইলেও "নিতুই নব" হইয়া থাকে!

কিন্তু অন্যদিকে, প্রেমের ভাবটা খুব সাধারণ বলিয়াই চিত্রকরদের কাজ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সাধারণ, সকলেই যাহা অনেকবার দেখিয়াছে, যাহার সমস্ত রস সকলেই ভোগ করিয়াছে, তাহাকে নূতন রূপে, নূতন রসে অপূর্ব্ব করিয়া নূতন ভাবে দেখানো বড় যে-সে শিল্পীর কাজ নয়! শিল্পজগতে প্রেম-চিত্রের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে, তাহার মধ্যে গেলে দেখা যাইবে, এ ভাণ্ডারে রাবিশ আছে ঝুড়ী ঝুড়ী! কেবল যে শিল্পেই এই ব্যাপার, তাও নয়; সাহিত্যেও আমরা নিত্য যে



দোলনায়
( পি, এ, কটের আঁকা ছবি হইতে )



চুম্বন
( রোদাঁর গড়া মূর্ত্তি হইতে )

অগুন্তি প্রেমের 'কাব্যি' এবং গল্প পড়িয়া মরিতেছি, তাহাদের ভিতরেও আসলে কয়টি পড়িবার যোগ্য ?

কথা হইতেছে কি,—যাহা সাধারণ, তাহাকে আর্টের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা একপক্ষে যেমন সহজ, অন্যপক্ষে তেমনি কঠিন। আনাড়ি যাহাকে সোজা ভাবে, তাহাকে লইয়াই গুণীর ভাবনার অবধি থাকে না। হাল্‌কা প্রাণে যে প্রেমের ছবি আঁকিতে বসে, সে মনে করে, যুবক যুবতী, আলিঙ্গন আর চুম্বন দেখাইতে পারিলেই বুঝি প্রেমের ছবি আঁকা হইয়া গেল! এইজন্যই অধিকাংশ প্রেমের ছবি হয় কুৎসিত কাম-চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, নয়

তাহা এতটা বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দিকে আর ফিরিয়া তাকাইতে সাধ যায় না। কিন্তু যাঁহারা পাকা পটুয়া, তাঁহারা এই বহু-ব্যবহৃত প্রেমকে, পাত্র-পাত্রীর চোখ মুখের ভিতর দিয়া এমন নূতন আকারে ফুটাইয়া তুলেন যে, পুরাতনকে তখন আর পুরাতন বলিয়াই মনে হইবে না।—নূতন ভাব ও নূতন ভঙ্গীর ইঙ্গিতে তাহার সাধারণত্ব তখন অসাধারণত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। 'প্রেমের ছবি আঁকিবই' বলিয়া পণ করিয়া, বা সাধারণে প্রেমের ছবি ভালবাসে বলিয়া তাহাদের মন যোগাইবার জন্য, আঁকিতে বসিলে ত চলিবে না। আর্টিষ্টের মনের বীণায় প্রেমের যে নরম সুরটি বাজে, ছবির রঙ্গে-রঙ্গে তাঁহাকে সেই সুর সেই রাগিনীর আসল মাধুরীটুকু ফলাইয়া তুলিতে হইবে, আপনার প্রাণ-সায়রের রসমন্থন করিয়া তাঁহাকে চিত্রের রস যোগাইতে হইবে। আমরা যখন কোন ভাল ছবি দেখিয়া তারিফ্ করিয়া বলি 'বাঃ, এ ছবিখানির প্রাণ আছে!'—তখন বুঝিতে হইবে, এখানে যে প্রাণের কথা হইতেছে, তাহা ছবির প্রাণ নয়—তাহা চিত্রকরের প্রাণ! সকল চিত্রই তুচ্ছ হইয়া থাকিবে—চিত্রকরের আত্মপ্রাণের আভাসে যদি-না তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠে! হেটো শিল্পীরা সে যাদু-মন্ত্রটি জানে না—যাহার গুণে অঙ্কিত বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কনকারীর প্রাণের যোগসাধন হইয়া যায়; কারণ, তাহাদের মধ্যে ত সে অনুভূতি নাই! প্রেম-চিত্রে অনেকে যে অক্ষম, এই অনুভূতির অভাবও তাহার আর-একটি কারণ।

সমালোচকে বলেন, "Any momentary action is apt to be tiresome to the onlooker when passed into endless perpetuity." এখন, ছবিতে সচরাচর চুম্বন, আলিঙ্গন, হাসি ও অশ্রু প্রভৃতির দ্বারাই প্রেম-ভাব প্রকাশ করা হয়; অথচ এগুলি হচ্ছে 'momentary action' বা 'ক্ষণিক ক্রিয়া'। সুতরাং বাস্তব জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াগুলি ললিতকলায় যদি চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, তবে দু-চারদিন পরেই তাহারা আমাদের চক্ষুকে পীড়া দিতে সুরু করিবে। দীর্ঘ কাল দেখিতেছি, অথচ চিত্রলিখিত চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রভৃতিতে অরুচি ধরিয়া যায় নাই, এমন ছবি খুব কমই আছে; দু-চারজন ভাল শিল্পী ছাড়া বেশীরভাগ লোকই এদিকে কৃতকার্য্য হন নাই। অনেক চতুর শিল্পী এ-সব ফ্যাঁসাদ্ এড়াইয়া চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন,—তাঁহারা পাত্র-পাত্রীর ভাব-ভঙ্গীর দ্বারাই প্রেমের আভাস দিয়াছেন। এই-সব নানান কারণের জন্যই বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ললিত কলায় প্রেমের ছবিই বেশী দেখা যায় বটে, কিন্তু এই বাহুল্যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রেমের ভাল ছবি গুণ্‌তিতে বড়ই অল্প—কেননা, তেমন ছবি আঁকিতে হইলে যথার্থ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# সেকালের গৃহস্থালী

গৃহস্থালীর কথা বলিতে গেলে গৃহ ও গৃহিণী দুইয়েরই উল্লেখ প্রয়োজন। তবে গৃহের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে বলিয়া গৃহ হইতেই কথা আরম্ভ করা ভাল। ইহাতে প্রবন্ধের বনিয়াদ পাকা হউক না হউক, গৃহস্থগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে।

## গৃহাদি

গরুড় পুরাণে দেখিতে পাই (বঙ্গবাসী-সংস্করণ, অধ্যায় ৪৬; শ্লোক ১৩-১৭) বাস্তর সম্মুখে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-নির্গম-পথ, ঈশান কোণে পট্টবস্ত্র-যুক্ত গন্ধ-পুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋত কোণে সমিধ কুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা এবং দক্ষিণে মনোরম অতিথিশালা থাকিবে, এইরূপই ছিল গৃহের ব্যবস্থা। এই শেষোক্ত গৃহে শয্যা, আসন, পাদুকা, অগ্নি, দীপ ও যোগ্য ভৃত্য রাখা হইত। গৃহগুলির আশে পাশে যে ফাঁকা জায়গা পড়িয়া থাকিত, তাহা সজল কদলী বৃক্ষ (সজলৈঃ কদলী-গৃহৈঃ) ও পঞ্চবর্ণ কুসুম দ্বারা সুশোভিত করা হইত। বৃহৎ সংহিতা ও অগ্নিপুরাণে এই সকল গৃহের সংস্থান একই দিকে দেখানো হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেখিতে পাই (House Building & Sanitation in Ancient India—Journal of B & O Research Society, Vol II. Pt. II. P. 145) পাকশালা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং শয়নঘর—দক্ষিণদিকে। অগ্নিপুরাণের মতে (১) অস্ত্রশালা (২) এবং বৃহৎ সংহিতার মতে তৈজসাদি রক্ষার ঘর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ভোজন-শালা পশ্চিমে, শয্যাগার—উত্তর-পশ্চিমে, ধনাগার—উত্তর দিকে, দেব-গৃহ—উত্তর-পূর্ব্বে এবং শ্রীগৃহ বা উত্তম-রূপে সজ্জিত বৈঠকখানা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত থাকিত। ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝার তালিকায় গোশালা, কাষ্ঠাদি-রক্ষার গৃহ, জলাগার প্রভৃতি কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় গৃহের উল্লেখ নাই, তবে মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে একজন অবস্থাপন্ন আর্য্য গৃহস্থের আট-দশ-খানি ঘরের আবশ্যক হইত। বাস্তুভূমি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা গোভিল গৃহ্য সূত্রে বর্ণিত আছে। ৪ প্রপাঠক; ৭ কাণ্ডিকা।

---

(১) মিলিন্দ প্রশ্নের প্রথমাংশে পুরাণাদির উল্লেখ আছে। Vincent Smith মহোদয়ের মতে এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৩০০ অব্দে রচিত। পুরাণাদি তৎপূর্ব্বে রচিত বলিয়াই বোধ হয়।

(২) অস্ত্রশালায় কি কি অস্ত্র সাধারণতঃ রক্ষিত হইত, তাহা অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়; যথা—কুঠার, কুদ্দাল, চক্র, ত্রিশূল, বর্শা, মুদ্গর, মুষল যন্ত্র প্রভৃতি ও আমাদিগের সেই সনাতন বংশ-যষ্টি। ভল্ল তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের নামও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

## বাস্তুমণ্ডল

গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত ভূমি সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ উচ্চ হইবে যে বর্ষার জলপ্লাবনে কদাচ ডুবিয়া না যায়। বাস্তুর অবস্থান এরূপ হইবে যে জল পূর্ব্ব বা উত্তরদিক দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। বাস্তুমণ্ডলের উপর কণ্টক গুল্ম, এবং শ্বেত রসস্রাবী বা কটু আস্বাদযুক্ত কোনও বৃক্ষাদি থাকিবে না। নিকটে বালুময় মরুভূমি বা জলাভূমি থাকা উচিত নয়। মৃত্তিকা একবর্ণ, ঘন-সংসক্ত (compact) এবং অনতিশুষ্ক হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা-যুক্ত স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবেন। যাহারা দেহে পবিত্রতার দীপ্তি কামনা করে, তাহারা দর্ভসংযুক্ত স্থানে বাস করিবে; যাহারা শক্তি কামনা করে তাহারা বাসের জন্য দীর্ঘ তৃণযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিবে, এবং যাহারা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রার্থনা করে, তাহারা কোমল তৃণ-সংযুক্ত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। গৃহের আকৃতি ইষ্টকের ন্যায় চতুষ্কোণ বা দ্বীপের ন্যায় বৃত্তাকার হইবে।

যাহারা যশঃ কামনা করে তাহারা পূর্ব্বদিকে গৃহদ্বার নির্ম্মাণ করিবে। যাহারা পুত্র-কন্যা ও গবাদি প্রার্থনা করে, তাহাদের গৃহ উত্তর-দ্বারী হইবে এবং যাহারা সকল প্রকার কাম্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহারা দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। পশ্চিম দিকে গৃহদ্বার নির্ম্মাণ সেকালে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ একালেও চলিত দেখা যায়;—

"দক্ষিণমুখো ঘরের রাজা
পূর্ব্বদিক তার প্রজা।
পশ্চিম-মুখের মুখে ছাই
উত্তর-মুখের খাজনা নাই॥"

গৃহের নিকট বৃক্ষাদি থাকা যে অস্বাস্থ্য-জনক তাহা প্রাচীন কালেও অবিদিত ছিল না। গৃহের পূর্ব্বে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ, (পাকুড়), পশ্চিমে ন্যগ্রোধ এবং উত্তরে উদুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষাদি রাখা অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

## প্রবেশ-নির্গম-পথ

গরুড় পুরাণের পূর্ব্বোল্লিখিত অধ্যায়ে আরও দেখিতে পাই যে বাস্তুভিটার চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মিত হইত। এই প্রাকার ঊর্দ্ধে প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত হওয়া উচিত এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। সাধারণতঃ গৃহের দুইটি করিয়া প্রবেশ-দ্বার থাকিত। সদরের গমনাগমনের পথ পূর্ব্বদিকে ও খিড়কির পথ দক্ষিণ দিকে। এই খিড়কির রাস্তা দিয়াই সকল প্রকার আবর্জ্জনা বাহিরে ফেলা হইত। যমের দক্ষিণ দ্বারের যেরূপ ভীষণ কল্পনা এখনও লোক-সমাজে প্রচলিত দেখি, তাহা যে সেকালের গৃহের দক্ষিণ দ্বারের অবস্থা-দৃষ্টে উদ্ভূত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

কাঠ-চেলাই ও অনাবশ্যক দ্রব্যাদি রাখার জন্য খিড়কির সন্নিহিত স্থানই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক গৃহের সান্নিধ্যেই কূপ বা জলাশয়-খননের ব্যবস্থা

ছিল। কামসূত্রে লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে বাস্তু-মণ্ডলের বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অবস্থাপন্ন দ্বিজাতিগণের বসতবাটীর আদর্শ চিত্র (model plan) বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন জাতি বা পেশা অনুসারে আবাস-গৃহের আয়তনেরও তারতম্য লক্ষিত হইত। বৃহৎসংহিতায় দেখা যায় যে পাঁচখানি ঘর ও মধ্যে উঠান থাকিলেই চলিয়া যাইত।

## প্রমোদ বা বিরাম-গৃহ

নাগরক (young gallants) এবং সৌখীন ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাস-গৃহ অবশ্য বিভিন্ন-প্রথায় নির্ম্মিত হইত। এইরূপ প্রমোদ বা বিরাম-গৃহের বর্ণনাও আমরা বাৎস্যায়ন হইতে অবগত হই। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘর ত থাকিতই তা ছাড়া দুইটি শয়নঘর থাকিত। শয়ন-ঘরের সজ্জাদিরও বর্ণনা আছে। (৩) পালঙ্কের উপর ধোপদোস্ত চাদর পাতা; দুইটি বালিশ, একটি পায়ের, অপরটি মাথার দিকে। মাথার নিকটে টেবিলের ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি সামগ্রী থাকিত; তাহার উপর পুস্তক (৪), গন্ধ-দ্রব্য, পূজা-দ্রব্যাদি এবং একটি সৌগন্ধিক পুটিকায় সম্ভবতঃ লোধ্রচূর্ণাদি অঙ্গরাগের উপকরণ রক্ষিত হইত। পতদগ্রহ বা পিকদানীরও ব্যবহার ছিল; তাহা ছাড়া বসিবার টুল, চেয়ার প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠাসনেরও যে ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণের যুগেও এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ "পীঠ" স্বর্ণ হস্তিদন্তাদিতে খচিত হইয়া ব্যবহৃত হইত। (রাজকুমার বসুর রামায়ণ-কাহিনী; পৃ ৯০০) গৃহের দেওয়ালে বাদ্যযন্ত্রাদি (৫) টাঙ্গানো থাকিত। চিত্রফলক ও চিত্রকর্ম্মাদির উপযোগী তুলিকা রঙেরও ব্যবস্থা থাকিত। অন্তঃপুরিকাগণও যে চিত্রশিল্পের অনুশীলন করিতেন তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে জানা যায়। জিনিষ-পত্র খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

(৩) বাহ্যে চ বাসগৃহে সুশ্লক্ষ্মমুভয়োপধানং মধ্যে বিনতং শুক্লোত্তরচ্ছদং শয়নীয়ং স্যাৎ। প্রতিশয্যিকাচ। তস্য শিরোভাগে কূর্চ্চস্থানম্ বেদিকাচ। তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মাল্যং সিক্থ করণ্ডকং (মোমের দ্বারা বিধৃত) সৌগন্ধিক-পুটিকা মাতুলুঙ্গত্বচস্তাম্বুলানি চ স্যুঃ। ভূমৌ পতদগ্রহ। নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলকম্ বর্ত্তিকাসমুদ্গকঃ (চিত্রকর্ম্মোপযোগী তুলিকা রঙ প্রভৃতি) যঃ কশ্চিতপুস্তকঃ ...ভূমৌ বৃত্তাস্তরণং সমস্তকং (বসিবার চেয়ার প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠাসন) ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি (ক্রীড়া পক্ষীর পিঞ্জরাদি...স্বাস্তীর্ণা পেঙ্খা দোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সপ্রচ্ছায়া।

—কামসূত্র—মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ।

(৪) অগ্নিপুরাণে পুস্তক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ অনেকেই পুস্তকাদি লেখাইয়া শাস্ত্রমতে তাহা প্রতিষ্ঠা করাইয়া রথে বা হস্তি-পৃষ্ঠে নগর-প্রদক্ষিণ করাইতেন। এই সকল পুস্তক দেবালয়ে বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করা হইত। মুদ্রাযন্ত্রের অবর্ত্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পুস্তকাদির অভাব এইরূপেই মোচন করার ব্যবস্থা ছিল। পুস্তকাদি লিখন-প্রসঙ্গে সুবর্ণময়ী লেখনী ও রৌপ্য মস্যাধারের উল্লেখ দেখা যায়।

(৫) সন্ধ্যার পর গীতবাদ্যাদি-প্রসঙ্গের কথা কামসূত্রেই লিখিত আছে।

রাখা হইত। বিছানার চাদর তিন দিন অন্তর বদলাইবার নিয়ম ছিল। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চিত্রশিল্পের সরঞ্জামটুকু বাদ দিলে আধুনিক কালের পল্লী-নিবাসী সৌখীন লোকের বৈঠকখানা হইতে সেকালের বৈঠকখানার বড়-বিশেষ তফাত ছিল না; কেবল বহিঃস্থিত রজ্জু-বিলম্বিত দোলনার উল্লেখে মনে পড়ে যে আধুনিক যুগের সাহসিকাগণ আর দোলনায় দোল খাওয়া অভ্যাস করেন না। তবে পল্লী-গ্রামের ইতর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ-দিগকে এখনও মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে নাগর-দোলায় চড়িয়া আমোদ করিতে দেখা যায়।

## বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহ

সেকালের গৃহ বলিলেই যে পর্ণশালা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। অবস্থা ও প্রয়োজন-ভেদে গৃহাদি প্রস্তর, ইষ্টক, অপক্ব ইষ্টক, কাষ্ঠ, বংশ ও বস্ত্র প্রভৃতিতে নির্ম্মিত হইত। প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ "মন্দির," ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ "বাস্তু" ও বস্ত্র-গৃহ "বিজয়" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। ( J. B. O. R. S. Vol. II. Pt II. P. 140 )

## শৌচাদির ব্যবস্থা

খাদির গৃহ্য সূত্রে (৬) দেখা যায় যে আঁস্তাকুড় ও পাইখানাতেও "বলি" (৭) ( Bali-offerings ) দেওয়ার নিয়ম ছিল। ( Khadira Grihya Sutra—Sacred Books of the East Series P. 38. ) সুতরাং বাড়ীর নিকটে বা কিছুদূরে পাইখানাও যে থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ রোগী, বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি-গণের জন্যই ইহার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে বল্মীক, শ্মশান, কর্ষিত ক্ষেত্র এবং গোচারণ মাঠে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন-সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয় লোকালয়ের সন্নিহিত জঙ্গল প্রভৃতিই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

## প্রাতঃকৃত্য

গৃহস্থ উষাকালে শয্যাত্যাগ করিতেন;—যখন পূর্ব্বদিক সবে রাঙ্গাইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সন্ধ্যা-আহ্নিকাদির সময় ও নিয়ম পূর্ব্ব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং এ সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মনুসংহিতায় দেখা যায় যে শৌচাদি, স্নান, দন্তমার্জ্জন, চক্ষে অঞ্জন-প্রলেপ ও পূজাদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সারিয়া লইতে হইত।

(৬) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সূত্রাদি খৃঃ পূঃ ছয় শতাব্দী হইতে দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

(৭) "বলি" দেওয়ার প্রথা এখন আর বড় প্রচলিত নাই; কিন্তু নবান্নের সময় অদ্যাপি স্থানে স্থানে কাককে নবান্ন ছড়াইয়া "কাক বলি" দেওয়ার নিয়ম আছে। এ বলিও সেইরূপ ছিল। সেকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বলিপূজা দ্বারের চৌকাটের নিকট দেওয়া হইত। বরুণের উদ্দেশ্যে বলি জলপূর্ণ পাত্র বা কলসীর নিকট ( উদধানে ) দেওয়া হইত। এমন কি ছাদের উপর বিচরণকারী প্রেতাত্মারাও বাদ পড়িত না। ( বিষ্ণুসংহিতা ৬৭ অধ্যায় )

বিষ্ণুসংহিতার মতে পূর্ব্বদিকে যখন উষার রক্তিম ছটা সূচিত হয়, সেই সময়েই স্নানাদি সারিয়া লওয়া কর্ত্তব্য (বিষ্ণু ৫৪, ৯)।

স্নানের জন্য স্রোতস্বিনী নদীর জলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর নির্ঝরের জল, তদভাবে পুষ্করিণী বা কূপের বদ্ধ জল। (বিষ্ণুসংহিতা ৫৪ অধ্যায় ১৪—১৭)। "গর্ত্ত" বা আট মাইলের কম লম্বা কোন স্বাভাবিক হ্রদে স্নানও অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইত না।

করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণী, বিল্ব, অপামার্গ উদুম্বর, মালতী প্রভৃতির কোমল শাখা দন্তকাষ্ঠের জন্য ব্যবহৃত হইত। দাঁতন এক বিঘতের অধিক লম্বা হইত না। পূর্ণিমা, প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে দাঁতন ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (হারীত সংহিতা শ্লোক ৫,৬) পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া দাঁতন করিতে হইত। (বিষ্ণু সংহিতা chap. lxi)

## প্রসাধন ও ক্ষৌরকর্ম্ম

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান, কেশাদি-মার্জ্জনা, শ্মশ্রু ও নখ সংস্কার সম্বন্ধে উপদেশ দেখিতে পাই (chap. I, 131)। হিরণ্যকেশীর গৃহ্যসূত্রে পাঠ-সমাপনান্তে ছাত্রের স্নান-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে অবগাহনের পূর্ব্বে স্নানের জন্য ব্যবহার্য্য চূর্ণ অঙ্গে মর্দ্দন করিবে এবং উদুম্বরের দন্ত কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিবে। সুতরাং তৈলের পরিবর্ত্তে Shampooing powder শ্রেণীর কোনও চূর্ণ যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত তাহা বুঝা যায়। কামসূত্রে নিত্যস্নান, সুবাসিত তৈলমর্দ্দন, ফেনক বা তরল সাবানের ন্যায় কোনও দ্রব্যের দ্বারা প্রতি তৃতীয় দিনে অঙ্গের সন্ধিস্থল প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং সাত দিন অন্তর নখ ফেলা ক্ষৌরী হওয়া প্রভৃতি নিয়মের উল্লেখ আছে। হারীত সংহিতায় কিন্তু দেখিতে পাই, মাত্র মৃত্তিকায় অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া স্নানের ব্যবস্থা। বোধ হয় শেষোক্ত ব্যবস্থা নিষ্ঠাবান শাস্ত্রানু-ধ্যায়ী ব্রাহ্মণের জন্য; এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা নাগরক শ্রেণীর যুবকগণের জন্য (৮)। এইসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত যে সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামসূত্র কিছু একই সময়ে রচিত হয় নাই, সুতরাং বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার যে যথাযথ মিলিয়া যাইবে এমন ভরসা করা যায় না। হিরণ্যকেশীর গৃহ্যসূত্রে দেখা যায়, ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য উদুম্বর কাষ্ঠের ক্ষুর ব্যবহার করা হইত। এই গ্রন্থে ক্ষুর কুঠারের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম প্রশ্ন ও ৩য় পটলে মাথা মুড়াইবার ও দাড়ি কামাইবার সময় নাপিতের প্রতি যে উক্তিটি দেখা যায় তাহা বড়ই কৌতুক-প্রদ :—"হে ক্ষৌরকর্ম্মরত নরসুন্দর, তুমি আমার কেশ ও শ্মশ্রু তোমার ক্ষতজনক সুগঠিত অস্ত্রের দ্বারা কামাইয়া ফেল—দেখিও তাহাতে যেন আমার মুখের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু প্রাণের হানি না ঘটে।" আনাড়ি ক্ষৌর-কারকে এরূপ অনুরোধ আজিকালকার দিনেও যে মধ্যে মধ্যে না করিতে হয়

(৮) সংহিতাদি গ্রন্থে বর্ণিত গার্হস্থ্য চিত্র যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এমন নহে। প্রথমে দাড়ি পরে বগল কামানো হইত। তাহার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বশেষে নখ ফেলা হইত। সেকালে ক্ষৌরকর্ম্মের বোধ হয় এইরূপই বিধি ছিল। (Grihya-Sutra of Hiranyakesin. Ed. MaxM. P 164)

## পরিচ্ছন্নতা

ভারতবর্ষের লোকেরা আদিকাল হইতেই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। হারীত সংহিতায় লিখিত আছে যে স্নানের পর অপরিচ্ছন্ন বা দুর্গন্ধ বস্ত্র কদাচ ধারণ করিবে না। কূর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাই অপরিষ্কার বস্ত্র-পরিহিতা (মলদ্বাসসা) স্ত্রীলোকের হস্তে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ইচ্ছামত অপর কেহ গ্রহণ করিলে যে নানারূপ সংক্রামক পীড়াদি জন্মিতে পারে তাহাও প্রাচীন কালে মনীষীগণের অবিদিত ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যে রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। (অধ্যায় ১ শ্লোক ১৮০) পশমী বা রেশমী কাপড়—কলার ক্ষার, মৃত্তিকা, গোমূত্র ও জল দিয়া কাচিয়া লওয়া হইত। অংশু পট্ট বিল্বফল-সহযোগে এবং কম্বলাদি—গোমূত্র ও জল দিয়া পরিস্কৃত করিবার নিয়ম ছিল। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে মালিকের অনুমতি-ব্যতিরেকে বিছানা-তোষক যানাদি এমন কি পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। অপরের জুতা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। গঙ্গাজলের antithesis স্বরূপ কূপজল (কুবজল) এখনও পল্লীগ্রামে অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। (৯)

## বেশভূষা

স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিবার নিয়ম ছিল। স্ত্রীলোকেরা পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত একখানি উত্তরীয় বা ওড়না ব্যবহার করিতেন। তুলা (১০), রেশম, পশম প্রভৃতি ছাড়া তৃণ ও বল্কল দ্বারাও পরিধেয় রচিত হইত। আশ্রম ও সম্প্রদায়-ভেদে অজিনেরও ব্যবহার ছিল।

চিত্র-হরিণ, কৃষ্ণসার এবং ছাগ এই তিন প্রকার পশুচর্ম্ম ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। দীক্ষাগ্রহণ-কালে বর্ণানুসারে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। গোভিল গৃহ্য সূত্রে দেখা যায় (২ প্রপাঠক ১০ কাণ্ডিকা)

(৯) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সেকালে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল দেখিতে পাই জলাশয়ে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ এবং কূপে নামিয়া স্নানাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে নিষেধ দেখা যায় (কূর্ম্মপুরাণ ১৭ অধ্যায়, বঙ্গবাসী-সংস্করণ)। রাজপথে, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে ও চতুষ্পথ বা চৌমাথায় মলত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল উশনঃসংহিতা (১ম অধ্যায়)। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই পথে আবর্জ্জনাদি ফেলিলে এক পণের অষ্টমাংশ জরিমানা হইত। কাদা বা ময়লা জল জমাইয়া রাখিলে পণের চতুর্থাংশ এবং রাজপথে এইরূপ করিয়া গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মাইলে ইহার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হইত। জলাশয়ে তীর্থস্থানে বা রাজকীয় গৃহাদিতে মলত্যাগ করিলে এক পণ বা তদূর্দ্ধ জরিমানা হওয়ার নিয়ম ছিল। তবে ঔষধ-ব্যবহার নিবন্ধন বা রোগবশতঃ এরূপ ঘটিলে কোনও শাস্তি হইত না।

(১০) পরাশর সংহিতায় রেশম-বস্ত্রাদির উল্লেখ আছে। পাট, পশম, রেশম ও কার্পাস-নির্ম্মিত

ব্রাহ্মণ-কুমারগণ কার্পাশ বস্ত্র, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, মুঞ্জ তৃণের কটিবন্ধ এবং পর্ণ কাষ্ঠের দণ্ড বা যষ্টি ব্যবহার করিতেন; ক্ষত্রিয়-দিগকে "চিতাল" হরিণের চর্ম্ম, শণ-নির্ম্মিত বস্ত্র, কাশ-নির্ম্মিত কটিবন্ধ এবং বিল্ব কাষ্ঠের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। বৈশ্যগণ যথা-ক্রমে ছাগচর্ম্ম, পশমনির্ম্মিত বস্ত্র, তাম্বলের কটিবন্ধ এবং অশ্বত্থের যষ্টি ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া আর্য্যদিগের মধ্যে চর্ম্ম এবং তৃণ (কুশ) নির্ম্মিত পাদুকার যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। রামচন্দ্র ভরতকে কুশ-নির্ম্মিত পাদুকা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু মহাশয়ের রামায়ণ-কাহিনীতে (পৃঃ ৮৯৯) কাচ-পাদুকার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বিলাতি উপকথা-বর্ণিত Cinderellaর "গ্লাস স্লিপারে"র কথাই আমাদের মনে পড়ে। (১১) নীল বা গাঢ় নীলবস্ত্র কাব্য-গ্রন্থাদিতে অভিসারিকাগণের প্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে স্নানের পর ব্যবহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল; তবে রাত্রি-বাসের জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দিগের পক্ষে এইরূপ নীল বস্ত্র ব্যবহার করা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রকারগণ নীলের উপর কেন এত বিরূপ ছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আপস্তম্ব সংহিতায় ব্যবস্থা দেখিতে পাই (৬ অধ্যায় শ্লোক ১—১০) ব্রাহ্মণ জাতি নীল রঙের বস্ত্র ধারণ করিলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইবে। এমন কি অজ্ঞাতসারে নীল ক্ষেতের উপর দিয়া যাতায়াত করিলেও এইরূপ উপবাস করিবার বিধি আছে। পরাশর সংহিতায় নীল ক্ষেত্রে উৎপন্ন তণ্ডুলের অন্ন দ্বিজাতির ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১২)

বিদেশে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে যষ্টি বা বংশদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করার বিধি ছিল। (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার (১৪) এই উক্তি হইতে মনে হয় যে তখনও বোধ হয় পিত্তল

---

(১১) Arian (আরিয়ান) বলিয়াছেন ভারতবর্ষে শ্বেতচর্ম্মনির্ম্মিত বিনামার ব্যবহার ছিল। উড়িষ্যায় এরূপ জুতা অদ্যাপি নির্ম্মিত হয়—Sarkar's Positive Back-ground of Hindu Sociology (p 26)

(১২) পুরাকালে "নীল মামদোর" অত্যাচার ছিল কি না জানি না; কিন্তু শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দেশে দেখিতে পাই যে ক্ষেত্রে নীল বপন করিলে বারো বৎসর সে ক্ষেত্র অশুদ্ধ থাকে। নীল আবাদে ভূমি বড়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এই কারণে কিম্বা পাছে নীলের আবাদ অধিক লাভজনক বলিয়া লোকে শস্যের আবাদে অযত্ন করে, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিধি গঠিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা বড়ই কঠিন।

(১৩) পণ্ডিতবর শ্যাম শাস্ত্রী কয়েকটি প্রাচীন শব্দের অর্থের তারতম্য লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা অশোকের কালের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন।

(১৪) কুণ্ডল হিন্দুর কর্ণবেধ-সংস্কার-জ্ঞাপক বাহ্য চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এরূপ পদ ও অবস্থার পরিচায়ক অলঙ্কার, ভিন্ন স্থানে যাইবার সময় ব্যবহার করার প্রথাটি এক হিসাবে ভাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেকালে অপরিচিত স্থানে গমন করা বড় নিরাপদ ছিল না। এখন সন্দেহজনক ভাবে দ্রব্যাদি লইয়া গেলে বা লুক্কায়িত থাকিবার চেষ্টা করিলে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কলিকাতা

লোটার প্রচলন হয় নাই। অধীতযুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রকুমার কিরূপ বেশ-ভূষা করিত তাহা উত্তররামচরিত হইতে জানা যায়—

ভস্মস্তোম পবিত্র লাঞ্ছনমুরো
ধত্তে ত্বচং রৌরবীং
মৌর্ব্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ
মঞ্জিষ্ঠিকম্
পাণৌ কার্ম্মুকমক্ষসূত্র বলয়ং দণ্ডং
তথা পৈপ্পলম্
( চতুর্থ অঙ্ক—শ্লোক ২০ )

তূণীর দুইটি দুলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুচ্ছ।
করিছে পরশ শায়কগুলির কঙ্কপাতার পুচ্ছ॥
পূত লাঞ্ছনে চিহ্নিত হৃদি যাগের ভস্মপুঞ্জে।
রুরুর চর্ম্ম স্কন্ধে ফিরিছে আশ্রমবনকুঞ্জে॥
মৌর্ব্বী-মেখলা দৃঢ়নিবদ্ধ রাঙা অধোবাসখণ্ড।
করে শরাসন অক্ষমালিকা আর পিপ্পলদণ্ড॥
( শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-কৃত অনুবাদ )

বিবস্ত্র হইয়া স্নান করা বা ঘুমানো ( ১৫ ) নিষিদ্ধ ছিল, এবং গৌতম সংহিতায় আরও দেখিতে পাই ( chap IX ) যে, দিবসে মস্তক আবৃত করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত নহে এবং রাত্রে অনাবৃত মস্তকে বহির্ভ্রমণ নিষিদ্ধ। দিবসে খালি মাথায় থাকিয়া "লঙ্গা শির" বাঙ্গালী যে রীতিমত শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে, এ কথা মনে করিলে আমাদের আর দুঃখ-লজ্জা করিবার কারণ থাকে না।

রামায়ণে সীতার বিবাহকালীন পরিচ্ছদাদি-বর্ণনায় রেশম ও পশম-নির্ম্মিত বস্ত্রের এবং সলোম চর্ম্মাদির ( Furs ) উল্লেখ আছে। ( Sarkar's Positive Background of Hindu Sociology. Page 260 ) প্রাচীনকালে পুরুষেও যথেষ্ট অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতেন; কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে কেয়ূর, মণিবন্ধে বলয়। পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের মধ্যে কুণ্ডল বীরবৌলীর এখনও চলন আছে, হারের বদলে নিষ্ক বা মুদ্রার মালার ব্যবহার এখনও চলিতেছে এবং মাড়োয়ারীগণ বাল-যুবা-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে অনেকেই হাতে সোনার "তাগা" ধারণ করিয়া থাকেন। গৃহ্যসূত্রে কণ্ঠীর ন্যায় আর একটি জিনিষের চলন দেখিতে পাই,—বদরী বা চন্দন কাষ্ঠের ক্ষুদ্র বর্ত্তুল ছিদ্র করিয়া ছিদ্রস্থলে সুবর্ণ সংবদ্ধ করিয়া গলদেশে ধারণ করা। ( Grihya Sutra—Hiranyakeshi P.

---

পুলিশ আইনের ৫৪-ক ধারা বা কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে loitering charge-এ ধৃত করা হইয়া থাকে; সেকালেও সেইরূপ অজ্ঞাত-কুলশীল, আত্মগোপন-সচেষ্ট, সংহারক-যন্ত্রসহিত পথশ্রমে অতিশ্রান্ত বা অতি-নিদ্রালু ব্যক্তিকে শুধু নগররক্ষী নহে—যে-কেহ সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার করিতে পারিত ( অর্থশাস্ত্র ৩৬ অধ্যায় ১৪৪ )। আরও দেখা যায় ঘা ও পুঁযস্রাবী ক্ষত-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে রাজপথে দেখিলে তাহাদিগকেও আটক করার নিয়ম ছিল। ইহাও কলিকাতা পুলিশ আইনের অপর একটি ধারার কতকটা অনুরূপ। (Sec. 70. Act IV of 1866)

( ১৫ ) ইউরোপখণ্ডে এরূপ বিধি-নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। Charles Reade—ইউরোপের মধ্যযুগের চিত্রে Cloister and the Hearth গ্রন্থের নায়কের মুখে 'naked bed' পরম আরামের জিনিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

166. Ed Maxmuller) শুক্রনীতিতে অপরের রত্নালঙ্কারাদি ব্যবহার "ছল" বা সামাজিক অপরাধ বলিয়া বর্ণিত আছে।

## অঙ্গরাগ ও সুগন্ধি দ্রব্য

স্থগর নামক সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ (গোভিল ৪ প্রপা ২ কা), চন্দনকাষ্ঠের চূর্ণমিশ্রিত প্রলেপ এবং কুঙ্কুমাদি ব্যবহারের প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অঙ্গে কুঙ্কুম-চূর্ণ মর্দ্দন করা হইত। (মনু ৪র্থ অধ্যায় ১ ১শ্লোক) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও নিষেধ দেখা যায় না। মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায় ২৫০ শ্লোকে লিখিত আছে, অযাচিতভাবে কেহ শয্যাদ্রব্য, গৃহ, কুশ, সুগন্ধিদ্রব্য, জল ও ফুল প্রভৃতি দান করিলে কদাচ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। লোধ্রচূর্ণ বোধ হয় অনেকটা Face Powderএর কাজ করিত। "ফেনক" ও স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য চূর্ণের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষে অঞ্জনের ন্যায় ব্যবহারের জন্য গৃহ্য-সূত্রে হিমালয় হইতে আনীত ত্রিককুড-লব্ধ প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (আপস্তম্ভ Ed. Max. M. P. 108)। ধূপ, সর্জ্জরস (ধুনা) প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কেশবাসের জন্যও অগুরুর ধূপ ব্যবহৃত হইত।

## তৈজসাদি

ধর্ম্মশাস্ত্রে অশুদ্ধি মোচন-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই (পরাশর-সংহিতা ষষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক ২৪ ২৮) যে কাংস্য, রৌপ্য, লৌহ, সীসক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় ধাতব পাত্রের উল্লেখ নাই বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত সংহিতাদির মধ্যে ঐ গ্রন্থকেই প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। অস্থি, শৃঙ্গ ও দন্ত (হস্তিদন্ত ?) নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ছিল এবং বংশ-নির্ম্মিত (চেটাই প্রভৃতি) দ্রব্য এবং মুঞ্জ বা বিঁড়েও (pitcher seats made of rush) ব্যবহৃত হইত। লৌহ-পাত্র একস্থান হইতে আর একস্থানে সরাইয়া রাখিলেই শুদ্ধ হইত। সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য, দন্ত, ও অস্থিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও মণিরত্ন প্রভৃতি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইত। প্রস্তরময় পাত্রাদির সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি ছিল। কাংস্য পাত্র কখনও বা ছাই দিয়া মাজিয়া কখনও বা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কখনও বা কিছুদিন মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। মোড়া চেটাই প্রভৃতি অশুদ্ধ হইলে জলে ধুইয়া লওয়া হইত। মৃৎপাত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইত। পীঠী, বৃত্তাস্তরণ, সমস্তক প্রভৃতি কাষ্ঠাসনের ব্যবহার পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় খাটের উল্লেখ দেখা যায়। পশমনির্ম্মিত বালিস ব্যবহার করা হইত। (১৬) কম্বল প্রস্তুত করার জন্য গুজরাটের আভীদিগের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। সুতরাং কম্বলও শয্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। বিছানা রৌদ্রে দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। লোহিত বা পীত বর্ণ আস্তরণাদি বোধ হয় রঙ উঠিয়া যাইবে বলিয়া "কাচা" হইত না, কেবল রৌদ্রে দেওয়া

(১৬) Vide B. Sarkar's Positive Background of Hindu Sociology p. 260.

হইত। রামায়ণে চর্ম্মাবৃত শয়নীয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। (১৭) অপরাপর গৃহস্থালীর দ্রব্যের মধ্যে চমস (milking vessel) কুলা, ঝুড়ি, চালন, সম্মার্জ্জনী, কুট্টক যন্ত্র, (ঢেঁকি ?) উদূখল, ঘরট্ট বা রোচনী (জাঁতা) ও অস্ত্রে শাণ দিবার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রে কোষ্ঠাগার-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাক্স প্রভৃতির এবং রামায়ণে "কাজ" বা ছাগচর্ম্মাবৃত পেটকের উল্লেখ আছে। (১৮) ধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞীয় পাত্রাদির মধ্যে শ্রুক, স্রুব, স্ফ্য, চমস, চরুস্থালী অজ্যাস্থালী, মেক্ষণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। শ্রুক্=খদির বা পলাশাদি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হাতার ন্যায় দ্রব্য; যজ্ঞাগ্নিতে হবি ঢালিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। স্রুবও একপ্রকার যজ্ঞীয় হাতা-বিশেষ। স্ফ্য একপ্রকার যজ্ঞীয় পাত্র; উহা বজ্রনামেও অভিহিত হইত। (Jajnavalkya chap. I. P. 31 Ed. M. N. Dutta), মেক্ষণ=ঘৃত রাখিবার পাত্র বিশেষ।

## খাদ্যাদি ও পানীয়

মনুসংহিতা (৫ম অধ্যায়), যজ্ঞবল্ক্য ও কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিধি-নিষেধাদির উল্লেখ আছে। মৎস্যের মধ্যে পাঠীন অর্থাৎ বোয়ালি, রাজীব, সিংহাস্য (১৯ শকুল (শোল) এবং বৃহৎ শল্কযুক্ত মৎস্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের সময়ে যে শুষ্ক মৎস্যাদিও ভক্ষণ করা হইত তাহা অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়। সজারু, স্বর্ণগোধিকা, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং খরগোশের মাংস গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল না। উষ্ট্রের মাংস মুসলমানগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। মনুসংহিতাতেও ইহা অখাদ্য বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। গৃহপালিত মুরগী, হংসাদির ন্যায় যুক্তপদবিশিষ্ট পক্ষী এবং কপোত পারাবত টিট্টিভ প্রভৃতি ভোজন করা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু ময়ূর তিত্তির কপিঞ্জল (চাতক) প্রভৃতির মাংস দূষ্য আহার বলিয়া বিবেচিত হইত না (কূর্ম্ম পুরাণ ১৭ অধ্যায়)। শাক-সবজীর মধ্যে

---

(১৭) রাম উৎকৃষ্ট-চর্ম্মরূপ শয্যাস্তরণ ব্যবহার করিতেন ("অজিনোত্তর সংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে")।
অযোধ্যা—৮০—৪

রাবণের বিলাস-গৃহে রাম অবিক-চর্ম্মে আবৃত মনোহর শয্যা দর্শন করিয়াছিলেন।
(পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিন সংবৃতম্)

সুন্দরকাণ্ড—১০—৬

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রচিত প্রবন্ধ, সাহিত্য—বৈশাখ ১৩২৩। মহাভারতের যজ্ঞপর্ব্বেও বহুবিধ চর্ম্মের উল্লেখ আছে। এই সকল চর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল।

(১৮) বেদান্ততীর্থ মহাশয় অযোধ্যাকাণ্ড ৫৫।১৭ শ্লোকে বর্ণিত "কঠিন কাজে"র যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে উহা আধুনিক ছোট suit-caseএর মত কিছু হওয়াই সম্ভব। কারণ Hand-bagএর পার্শ্বদেশ সাধারণতঃ নমনীয় (flnible) দেখা যায়।

(১৯) কেহ কেহ বলেন শকুল ও সিংহাস্য একই জাতীয় মৎস্য। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র (Patala Sec. 3 Ed. Maxm.)

বার্ত্তাকু, কদলী, লাউ (অলাবু), কুমড়া, শীম, ওল, কাঁকুর, পালং শাক, দমনক (দোনা-artemisia Indica), আলুক, মূলক, রাজমাষ (বর্ব্বট), পিণ্ডমূল (গর্জ্জর), তণ্ডুলীয় (নটেশাক), কালশাক, স্বয়ংগুপ্তা (কচু) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পানিফল) প্রভৃতি সুখাদ্য ফল-মূল শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে দান করা হইত। মাতুলুঙ্গ (বাতাবিলেবু), পিয়াজ, লশুন, শালগম, পাতালফোড় (mushroom or truffles) প্রভৃতির আবাদের সময় বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া এগুলি নিষিদ্ধ খাদ্যের পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। (২০) ধর্ম্মশাস্ত্রে গল্‌দা চিংড়ি দ্বিজাতির ব্যবহারের উপযোগী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। (যাজ্ঞবল্ক্য Chap. I. Ed. M. N. Dutta) মৃগ, মেষ ও ছাগ মাংস বোধ হয় কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না। বাদ্ধ্রীণস বা সাদা বুড়া খাসীর মাংসেও (২১) সেকালের লোকের বিশেষ আপত্তি ছিল না। গৃহ্য সূত্রের যুগে বিবাহাদি সময়ে গোমাংস আহারেরও উল্লেখ দেখা যায়। (আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র Patala I, Sec. 3, Ed. Max M.) অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে লাজা (খই) শক্তু (ছাতু) শষ্কুলী (২২) কৃসর (তিল ও তণ্ডুলে প্রস্তুত অন্ন) পুরোডাশ (রুটির ন্যায় যজ্ঞীয় খাদ্য) সংযাব (গোধূম চূর্ণ, গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃত-সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য) পায়সান্ন পূরিক, অপূপ (বড়ার ন্যায় খাদ্য) পিষ্টক এবং তিলচূর্ণ ও শর্করা মিশ্রিত মোদকাদির উল্লেখ দেখা যায়। ভর্জ্জিত যব দধির সহিত গ্রহণ করা হইত। (Gobhila Ed. MaxM. P. 78) (২৩) দধি ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধির সহিত ব্যবহার করা হইত। যবমণ্ড বা যবাগু ও তক্র (ঘোল) প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। মৃচ্ছকটিক অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ কবি ভাস প্রণীত চারুদত্ত নাটকের প্রারম্ভে দেখিতে পাই "কি 'প্রাতরাশ' আছে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঘৃত দধি তণ্ডুল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। (ঘিদং গুলং দহিং তণ্ডুলা অ অত্থি) সম্ভবতঃ এই সকল দ্রব্যাদির সহযোগে সে সময়ে "প্রাতরাশ" প্রস্তুত হইত। আমলক যেরূপ গায়ে মাখার নিয়ম ছিল সেইরূপ অন্নমণ্ড প্রভৃতির সহিতও গ্রহণ করা হইত, কি কি দ্রব্য ভিক্ষা স্বরূপ প্রদত্ত হইত (২৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহারও পরিচয় পাই।

---

(২০) লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলাণ্ডু কবকানিচ (মনু, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৫)

(২১) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত; Schlegelএর মতে খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে এবং Sir Wm. Jones এর মতে খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে রচিত। Wilson কিন্তু ইঁহাদের মত গ্রহণ না করিয়া মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের রচনা-কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া মনে করেন।

(২২) শষ্কুলী—ভিতরে পুর-দেওয়া কচুরী প্রভৃতির ন্যায় খাদ্যদ্রব্য।

(২৩) ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্। নাগকেশরসংযুক্তং চতুর্জাতকমুচ্যতে॥

(২৪) মুগের সহিতও আমলক ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের "নমুদ্গৈরামলকৈ-র্বিনা" প্রভৃতি বচনে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ভৈক্ষ্যং যবাগু, তক্রং পয়ঃ বা যাবকমেবচ
ফলমূলং বিপকং বা পিণ্যাকং (২৫)
শক্তিতোঽপি বা॥
(শ্লোক, ১৬)

একপ্রস্থ পরিমাণ অন্ন একচতুর্থ প্রস্থ সূপ এবং সূপের একচতুর্থ পরিমাণ তৈল ও ঘৃত আর্য্য পুরুষগণের আহারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। [এক কুড়ুম্বের চারিগুণ এক প্রস্থ, আর এক প্রস্থের চারিগুণ এক আঢ়ক। এক আঢ়ক প্রায় ২৫/৮ পাঁইট বা আন্দাজ ৫২½ আউন্স (Avoirdupois) হইবে। J. R. A. S. April 1915. p. 227]

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির একচতুর্থাংশ কম করিয়া লইলেই স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার বলিয়া অনুমিত হইত। স্ত্রীলোকদিগের আহারের অর্দ্ধাংশ বালক বালিকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। "অবর" বা নিম্নজাতীয় পুরুষগণের জন্য আর্য্য পুরুষগণের ন্যায় সমপরিমাণ সূপ এবং সূপের অর্দ্ধ পরিমাণ তৈলমাত্র নির্দ্ধারিত ছিল। বিশ পল পরিমাণ মাংস পাক করিতে হইলে অর্দ্ধ কুটুম্ব তৈল, একপল লবণ, একপল শর্করা, অর্দ্ধপ্রস্থ দধি এবং দুই ধারণ ঝালমশলাদি ব্যবহার করা হইত। (২৬) শাকাদি (শাকসব্জী ও শুষ্ক মৎস্য) একত্রে পাক করিতে হইলে ইহার দেড়গুণ এবং শুধু শুষ্ক মৎস্য পাক করিতে হইলে ইহার দুইগুণ তৈল-মশলা ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্য-পানাদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ থাকিলেও কৌটিল্যের যুগে—খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে—(২৭) যে উহা প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থশাস্ত্রে (২য় অধ্যায়, ২৫, ২৬; এবং চতুর্থ অধ্যায় ১৩) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সুরাপান ও মাংসাহারের উল্লেখ আছে। সম্বর্ত্ত সংহিতায় গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই তিনেরই ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (শ্লোক, ১১৫) নিষিদ্ধ সুরা পান করিলে উত্তপ্ত সুরা পান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। রামায়ণে মৈরেয় সুরার উল্লেখ আছে। (২৮) কৌটিল্য মৈরেয় ব্যতীত, মেদক, প্রসন্ন, আসব ও মধু প্রভৃতি সুরার তালিকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "পাষাণের কথা" গ্রন্থে পুরাকালে নাগরিকগণের 'কাদম্ব'-প্রীতির বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে কাদম্ব সুরার উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কোনও বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে (কৃত্যেষু) ব্যক্তিবিশেষ বা কোনও পরিবার বা

(২৫) পিণ্যাকং = তিলকল্কং

(২৬) Shama Sastry's ArthaSastra p. 116, 117.

(২৭) অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকালে লিখিত। মনু ও পরাশর এ উভয়েরই ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৮) মধু—দ্রাক্ষা হইতে এবং আসব কপিত্থ (কৎবেল) ও শর্করা-সহযোগে প্রস্তুত হইত। মৈরেয় ... উপকরণ ব্যবহৃত হইত। (অর্থশাস্ত্র ২৫ অধ্যায়)

গোষ্ঠীকে শ্বেত সুরা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। ব্যারাম-পীড়ার জন্য অরিষ্ট বা কবিরাজী আসবাদি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তাৎকালীন আবকারী বিভাগের কোনও নিষেধ ছিল বলিয়া দেখা যায় না। মেলা (সমাজ) ও পর্ব্বোপলক্ষে চার দিনের জন্য মদ্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। সুরাপান অল্লাধিক প্রচলিত থাকিলেও আমাদিগের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলই যে সাধারণতঃ পান করা হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলস প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তন্মধ্যে জল উঠাইয়া সেই জল পান করা হইত ("বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ch. xv sl 6)। উৎপল, পাটলি প্রভৃতি ফুলের দ্বারা পানীয় জল সুবাসিত করা হইত। আধুনিক কালেও কেতকী (কেয়া) ও কনকচাঁপা বা মুচকুন্দ ফুল (Pterospermum acerifolium) প্রভৃতির দ্বারা পানীয় জল সুগন্ধি করিয়া লওয়া হয়।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

শ্রীগুরুদাস সরকার।

---

# দাঁতের ব্যথা

( রুশ-লেখক আন্তন শেখভ হইতে )

দাঁতের ব্যথায় কর্ত্তা বেজায় কাবু এবং কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন! দাঁতের গোড়ায় তিনি চুরুটের ছাই গুঁজিয়াছেন, আফিমের তেত রস মাখাইয়াছেন, এমন-কি টার্পেনটাইন ও কেরোসিন তেল ঢালিতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নাই; কিন্তু হা হতোঽস্মি! এ-সব চিকিৎসায় তাঁর উপকার ত হইতেছেই না—বরং অপকার হইতেছে বেশী! গিন্নী হইতে সুরু করিয়া আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে ও চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল, সবাই একটা-না-একটা 'অব্যর্থ' টাট্‌কা-টোটকার ব্যবস্থা দিয়াছে—কিন্তু দাঁতের গোড়া যে-কে সেই! কর্ত্তার মুখ ক্রমেই ফুলিয়া ঢোল হইবার গতিক আর-কি!

শেষটা কর্ত্তার পেয়ারের চাকর হরি আসিয়া যোড়হাতে বলিল, "হুজুর! আমার সন্ধানে একটি গুণী লোক আছে, দাঁতের ব্যথা সারাতে সে ওস্তাদ। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে সে খালি একটু থুথু ফেলবে আর আপনার ব্যথা বিলকুল সেরে যাবে!"

—"কোথায় থাকে সে?"

—"আমার দেশের কাছে। দাঁতের চিকিচ্ছে করেই তারা সাতপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে-বসে খেয়ে আসচে! দুরদেশ থেকে যে-সব রোগী তাকে ডাকে, বাড়ীতে বসে-বসেই সে তাদের রোগ আরাম করে দেয়!"

—"বাড়ীতে বসে-বসেই?"

—"হ্যাঁ হুজুর, বাড়ীতে বসে-বসেই!

চিঠিতে সে অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্র ঝাড়ে কিনা! আপনি তাকেই চিঠি লিখুন!"

—"তোর মাথা আর মুণ্ডু! বেটা গাঁজাখোর!"

—"হুজুর, পেত্যয় না হয় একবার পরখ করেই দেখুন না কেন! এ যে-সে মন্ত্র নয়—একেবারে অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্র!"

'অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্রে'র কথা শুনিয়া গিন্নী গলিয়া গিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একবার দেখতে দোষটা কি? কিসে কী হয়,কে বলতে পারে!"

দাঁতের গোড়াটা আবার কট্‌কট্‌ করিয়া উঠিল। সেই কট্‌কটানি সুরু হইবামাত্র কর্ত্তার যত আপত্তি, যত অবিশ্বাস, সমস্তই কর্পূরের মত উবিয়া গেল! দায়ে-পড়িয়া বাগ্‌ মানিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা, রাজি! নিয়ে আয় কাগজ—নিয়ে আয় কলম! উঃ! গেলুম যে—আর পারিনা! ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য—কে তোর দেশে আছে? বল্‌ তার নাম! তাকেই আমি চিঠি লিখব!"—কর্ত্তা কাগজের উপরে একেবারে কলম বাগাইয়া বসিলেন।

হরি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তার নাম কাক-পক্ষী কে না জানে? তার নাম—তার নাম—"

—"তার নাম কি?"

—"তার নাম—তার নাম—শ্রীযুক্ত বাবু—তার নাম! কি মুস্কিল! নামটা মনে আসচে না যে! একটু সবুর করুন—এখনি বলচি!" হরি শিবনেত্র হইয়া কড়ি-কাঠের দিকে তাকাইয়া নাম ভাবিতে লাগিল; কর্ত্তা আর গিন্নী হাঁ-করিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—"কি রে, মনে হোল? ভাল করে ভাব্‌।"

"একটু সবুর করুন! তার নাম—তার নাম, কি মুস্কিল! মনে পড়চে না যে! বনমালী? উঁহু! বনমালী নয়! কেদার? না কেদারও নয়!"

—"তবে?"

—"একটু সবুর করুন। তার নাম—ওর-নাম-কি—তার নাম—হুঁ, হয়েচে, হয়েচে!"

—"কি, কি, বলে ফ্যাল্‌ বাবা, বলে ফ্যাল্‌!"

—"কি জানেন হুজুর, তার নামের সঙ্গে ঘোড়ার মতন একটা নামও আছে!"

—"ঘোড়ার মতন নাম—অশ্বিনী বুঝি?"

—"উঁহু, গর্দ্দভ মানে কি কর্ত্তা!"

—"গর্দ্দভ মানে তুই! বেটা মুখ্যু! কোথায় ঘোড়া আর কোথায় গাধা!—শোন্‌, অশ্বিনীকুমার নয় ত!"

—"উঁহু!"

—"অশ্বসেন, অশ্বেন্দ্র, অশ্বভূষণ?"

—"উঁহু!"

—"তবে কি?"

—"একটু সবুর করুন! ঘোড়া—ঘোড়া—ঘোড়া, হুঁ, তার নামে ঘোড়ার মতন নাম আছে!

—"অশ্বত্থামা?"

—"উঁহু!"

—"তবে আমি চিঠি লিখব কাকে? ভাল করে ভাব্‌—ভাল করে ভাব্‌!"

—"একটু সবুর করুন। ঘোড়া—ঘোড়া—ওর-নাম-কি—ঘোড়া—"

গিন্নী বলিলেন, "অশ্বমেধ ?"

—"উঁহু !"

গিন্নী গালে হাত দিয়া আরো-খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "অশ্বগন্ধা নয় ত !"

—"উঁহু ! নামটা আমি ভুলে গেছি !"

কর্ত্তা চটিয়া লাল হইয়া বলিলেন, "নামই যখন জানিস্ না, তখন চালাকি করতে এসেচিস্ কেন ? বেরো এখান থেকে !"

হরি ভাবিতে-ভাবিতে আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল।

কর্ত্তা ফুলো গালে ফেট্টি বাঁধিয়া চারিদিকে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন ;—"ওঃ ! ওঃ ! বাপ্ রে বাপ্ ! চোখে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না গিন্নী, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না !"

হরি বাগানে বসিয়া আকাশ-পানে মুখ তুলিয়া নাম ভাবিতেছিল, এমনসময় কর্ত্তা আবার তাহাকে তলব করিলেন। হরি যাইবামাত্র কর্ত্তা কাত্‌রাইতে-কাত্‌রাইতে বলিলেন, "ওরে বাবা হরিনাথ, নামটা মনে পড়ল কি রে বাবা ?"

"—একটু সবুর করুন কর্ত্তা !"

"—তার নাম কি অশ্বতর ? অশ্বত্থ ? তাও নয় ? অশ্বপাল ?"

—"উঁহু !"

কর্ত্তা আরো-বেশী দমিয়া গিয়া গালের উপর আর এক ফের্‌তা ফ্লানেল জড়াইলেন।

বাড়ীর সবাই মিলিয়া নাম ভাবিতে লাগিয়া গেল। গালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কর্ত্তা, তাঁর পাশে বসিয়া গিন্নী, পান সাজিতে-সাজিতে দাসী, রাঁধিতে-রাঁধিতে বামুনঠাকুর, ফুলগাছে জল দিতে-দিতে মালী,—সকলেই ভাবিতেছে ঘোড়ার নাম ! কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, যে আসল নামটি বলিতে পারিবে সে দশ টাকা বখ্‌শীস্ পাইবে।

খোকাবাবুর বড় সাধ একটি কাঠের ঘোড়া ও ঘুড়ি-লাটাই কেনেন ; এই সুযোগে যদি সেগুলি কেনা হইয়া যায়, তাই ভাবিয়া তিনিও হরির কাছে গিয়া বলিলেন, "তার নাম কি ঘোড়সওয়ার ? অশ্বারোহী ? ঘোড়ার গাড়ী ?"... ... ...

সন্ধ্যা হইল। কিন্তু আসল নাম কাহারও মনে পড়িল না—সুতরাং চিঠিও পাঠানো হইল না। কর্ত্তা বিছানায় পড়িয়া কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করিতে-করিতেই সারারাত কাটাইয়া দিলেন,—ঘুম যেন সে তল্লাট ছাড়িয়া চম্পট দিয়াছে ! সকাল হইতে-না-হইতে তিনি চাকরদের ঘরে গিয়া হাজির হইয়া বলিলেন, "ওরে হরে ! তার নাম কি তুরগ ?—নয় ? তুরঙ্গ—তুরঙ্গম—হয়—টাট্টু—পক্ষীরাজ ? তাও নয় ?"

—"উঁহু !"—বলিয়া কাঁচুমাচু মুখে হরি ফোঁশ্-করিয়া একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

—"তবে বোধহয় ঘোড়ার নামের সঙ্গে এ নামের কোন সম্পর্ক নেই !"

—"আছে কর্ত্তা, আছে ! আমার বেশ মনে পড়চে তার নামে ঘোড়ার নামের মত একটা কিছু আছেই-আছে ! সেইটে মনে পড়লেই তার নামটাও মনে পড়বে !"

—"বাবা হরি, ভাব্ রে বাবা, ভাল করে ভাব্ ! বাপ্ রে বাপ্—প্রাণ যে যায় !"... ... ...

পরদিন প্রভাতেও যখন নাম বাহির হইল না, কর্ত্তা তখন বে-কায়দায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, "যা থাকে কপালে, এ দাঁত আমি তুলিয়ে ফেলব। দাঁত বাঁচাতে গিয়ে শেষটা কি প্রাণটা খুইয়ে বস্‌ব? দূর হোক, কাজ নেই এমন হতচ্ছাড়া দাঁতে!"

তখনি ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি সাঁড়াশি দিয়া অম্লানবদনে পট্-পট্ করিয়া দু-দুটো দাঁত গোড়াসুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন। দাঁত তুলাইয়া কর্ত্তাও কিছু ঠাণ্ডা হইলেন।

ডাক্তার ভিজিট লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সদর দরজা যুড়িয়া দাঁড়াইয়া হরি আপন মনে বিড়্‌বিড়্ করিয়া বলিতেছিল—"ঘোড়া—ঘোড়া—ওর-নাম-কি, ঘোড়ার মতন নাম—"

পিছন হইতে ডাক্তার হরিকে দুচারবার ডাকিলেন, কিন্তু ভাবনাবিভোর হরি সাড়া-শব্দ কিছুই দিল না।

আস্তে-আস্তে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বিরক্ত স্বরে ডাক্তার বলিলেন, "কে হে বাপু তুমি? ঘটোৎকচের মত পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সরে দাঁড়াও!"

হরি বিদ্যুতের মত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্লেন—কি বল্লেন—ঘটোৎকচ? ঘট—ঘট—ঘোটক—ওর-নাম-কি ঘোটক! অ্যাঁ!—হয়েচে, হয়েচে!" বলিতে-বলিতে সে প্রাণপণে বাড়ীর ভিতরে ছুটিল।

অবাক ডাক্তার একেবারে থ!

কর্ত্তার সুমুখে গিয়া হরি হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আহ্লাদে-আটখানা হইয়া বলিল, "হয়েচে হুজুর, তার নাম মনে হয়েচে! ঘনরাম ঘটক—তার নাম ঘনরাম ঘটক!"

কর্ত্তা ঘুসি পাকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া গজ্‌রাইয়া উঠিলেন, "বেটা ঢেঁকি-অবতার! তোর ঘোড়ার মত নামের নিকুচি করেচে! সে নাম আমি জানতে চাইনা—আমার সামনে থেকে তুই দূর হ পাড়াগেঁয়ে ভূত, দূর হ!"

শ্রীমতী রেণু রায়।

---

# "সুপ্তিতে ফিরিয়া এল জাগরণ"

আজি আকাশের চোখে পড়িল পলক,
সহসা নিভিল তাই প্রখর আলোক!
নয়ন পল্লব ছায়া ছেয়ে দিল ধীরে,
ঘন নীল নীলিমায় শ্যাম ধরণীরে!
চির জাগ্রতের এল তন্দ্রার আবেশ,
পবন নিস্পন্দ হয়, কাকলি নিঃশেষ,
অরণ্যে স্তম্ভিত তরু, নিঃশব্দে ত্বরায়
আঁধারের যবনিকা নামিল ধরায়!

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চেতনা সঞ্চার,
আকাশ চমকি আঁখি খুলিল আবার
উদ্দীপ্ত প্রভায় দিল দিগন্ত ঝলসি;
আঁধারের যবনিকা পড়ে গেল খসি!
ঊর্দ্ধশ্বাস পবনের নিশ্বাস-আবেগে
অরণ্য উদ্যত শাখা দ্রুত ওঠে জেগে,
ভগ্ন নীড় ফেলে পাখী চলিল উড়িয়া
দূর দুরাশার গানে ভুবন ভরিয়া।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

# গান

( বাউলের সুর )

এই ত ভালো লেগেছিল
আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া—
এই ত আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোট মেয়ে ধুলায় বসে
খেলার ডালি একলা সাজায়।
সাম্‌নে চেয়ে এই যা দেখি
চোখে আমার বীণা বাজায়।

দূরে যাবার খেয়াল হলে
সবাই মোরে ঘিরে থামায়।
গাঁয়ের আকাশ, সজ্‌নে ফুলের
হাত-ছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি ভাই কাছের সুধা
লাগ্‌ল না তাই দূরের ক্ষুধা,
এই যে এ সব ছোটোখাটো
পাইনি এদের কূল কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা
আজো আমার হয় নি সারা।

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি,
মাঠের সুরে আমার সাধন।
মনকে আমার বেঁধেছে রে
এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নূতন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে।
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি
ওদের কচি গলার সুরে।

"লাগ্‌লো ভালো মন ভুলালো"
এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই,
দিনে রাতে সময় কোথা
কাজের কথা তাই ত এড়াই।
মজেছে মন, মজ্‌ল আঁখি,
মিথ্যা আমায় ডাকাডাকি,
ওদের আছে অনেক আশা
করুক্‌ ওরা অনেক জড়,
আমি যেন গেয়ে বেড়াই,
চাইনে হতে আরো বড়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# মাসকাবারী

## বৈষ্ণব কবিতা ও "রূপান্তর"-বাদ

কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব-কবিতার রসমাধুর্য্য তাঁহার 'বাংলার গীতি কবিতা' শীর্ষক অভিভাষণ প্রবন্ধে যে ভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা কাব্য-রসজ্ঞমাত্রেরই উপভোগ্য হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্মগত লীলাতত্ত্ব ও তাহার রচনার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার "আলোচনা" ও "সমালোচনা" প্রভৃতি পুস্তকে যথেষ্ট গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব কবিতার বহুল প্রচারের জন্য তিনি ও তাঁহার বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'পদরত্নাবলী' নাম দিয়া এক চয়ন-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। এ কথার এইজন্য অবতারণা করিতেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সেই সকল আলোচনার সহিত কবি চিত্তরঞ্জনের এই রসপূর্ণ আলোচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধিকা সম্বন্ধে যে সকল তুলনামূলক আলোচনা রবিবাবু করিয়াছিলেন, চিত্তবাবুও তাঁহার নিজের ভাবে ও ভাষায় তদনুরূপ আলোচনাই উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্তবাবু সম্ভবতঃ রবিবাবুর সেই বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত আলোচনাগুলি পড়েন নাই, কারণ তাঁর লেখায় যে আবেগ, যে রস-তন্ময়তা প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারি অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তিনি যদি পাঠ করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অন্যত্র দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব রসলীলাতত্ত্বের অনেক রকমের ব্যাখ্যা আছে; চিত্তবাবুর 'রূপান্তর'-বাদের ব্যাখ্যা তাঁহার স্বকীয় হইলেও তাহাকে খাঁটি বৈষ্ণব ব্যাখ্যা বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবু এ ব্যাখ্যা নূতন বলিয়াই ইহাকে গ্রহণে কোন বাধা নাই; কারণ বৈষ্ণব কবিতা যদি রূপক হয়, তবে যিনি যেভাবে খুসী তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু ঐ রূপক বলিয়াই বৈষ্ণব কবিতাকে গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠরূপ বলিতে আপত্তি হয়। প্রাণ এবং গানের মাঝখানে রূপকের আবরণটা একটা মস্ত ব্যবধানের মত দাঁড়ায়। অবশ্য চণ্ডীদাসের কাছে সে ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিনের তিরস্করণীর মত থাকিলেও তাঁহার প্রাণে গানে অভেদ হইয়াছে। তবু বৈষ্ণবদের conventional পূর্ব্বরাগ, বিরহ, মাথুর, খণ্ডিতা, মান ইত্যাদি কোটাগুলির কোটরে তাঁর গানগুলি পড়ায় সেই গানের ভিতর হইতে চণ্ডীদাসের vision বা কবি-মানস এবং তাঁহার কবিজীবনের evolution বা বিবর্ত্ত-বিলাস সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্রভাবে দেখিবার উপায় নাই। শেলিকে বা ব্রাউনিংকে যেমন স্তরে স্তরে অথচ সমগ্রভাবে দেখা যায়, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাস, কোন পদকর্ত্তাকেই সেভাবে দেখা যায় না।

তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; কিন্তু সে তটস্থ লক্ষণের মত পাওয়া; ব্যক্তিত্বের স্বরূপ লক্ষণ পাওয়া শক্ত।

রূপক কাব্য এই জন্য কোথাও ব্যক্তিত্বের কাব্য হয় নাই। মধ্যযুগের ইউরোপে খৃষ্টান-ধর্ম্মের রূপক আশ্রয় করিয়া বহু মরমী কবি গান বাঁধিয়াছিলেন; পারস্য দেশে সুফী ধর্ম্মের রূপক আশ্রয় করিয়াও বহু কবির রচনা আছে। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সে সকল রচনা কোন কোন অংশে তুলনীয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ঐ রূপকের জন্যই গানের উৎস সরাসরি ব্যক্তিত্বের প্রাণ হইতে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই—একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

এই যে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহাই ত তাহার প্রমাণ। যাহা প্রাণ হইতে গানে স্বতোচ্ছ্বসিত, তাহা আপনিই আপনার ব্যাখ্যাতা। কিন্তু রূপকাশ্রয়ী যে গান, রূপকের ব্যাখ্যানুসারে তাহার ব্যাখ্যা।

এইবার ব্যাখ্যার কথাই বলি। বৈষ্ণব তত্ত্বে বলে যে, পরম- পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; বিশ্ব-লীলায় তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা এবং অসংখ্য গোপী প্রভৃতি তাঁহারি সেই লীলার অঙ্গ, তাঁহারি সৃষ্টি-রাসমণ্ডলের অন্তর্গত। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব এই লীলাকাণ্ডটিকে নিজের "জীবনের অনুভূতির" সঙ্গে একেবারেই মিলাইয়া দেখিতে পারেন না। রাধিকা বা গোপীর অনুভূতি যে তাঁহারি অনুভূতির রূপান্তর, এমন ভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমায় আনাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ সমস্তই transcendent রাজ্যের ব্যাপার; ভক্ত শুধু তাহার দর্শক মাত্র। বড়জোর তিনি গোপীর মত হইবার কামনা করিতে পারেন। সুতরাং এ ব্যাখ্যায় "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"। রূপে রূপে বিলাসের পর প্রতি রূপেই এক অখণ্ড অনন্ত রূপের প্রতিরূপ দেখার যে তত্ত্ব চিত্তবাবু আবেগ সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ব্যাখ্যা। এ তত্ত্বকে রবিবাবুর কাব্যের তত্ত্ব বলিলে ক্ষতি হয় না; বরং স্বচ্ছন্দে তাহা বলা যাইতে পারে। এবং রবিবাবু স্বয়ং সে কথা বহু স্থানে বলিয়াছেন তাহা বারান্তরে পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতেও পারে। "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—রূপের সেই অসীম রূপান্তরের দিক্‌টি তাঁর কাব্যেরই মর্ম্মগত দিক্। দৃষ্টান্ত—'মানসসুন্দরী'; 'অনন্ত প্রেম'। একটিতে সৌন্দর্য্যের রূপান্তর, অন্যটিতে প্রেমের রূপান্তর পাই। চিত্তবাবু একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে আমি ইহা সাধ্যমত দেখাইয়াছি। "রূপে রূপে বিলাস করিতে করিতে" যে "আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে" সেই পরম রূপের ক্ষণিক ঝল্‌সানো (flash) রবিবাবুর অধ্যাত্ম গীতের সাধনার ধন; বৈষ্ণবের নয়। কারণ বৈষ্ণবের আসল রূপ শাশ্বত গোলোকধামের বৈকুণ্ঠবিহারী। তিনি অখিলরসামৃত মূর্ত্তি। "জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়", এ কথা আধুনিক জীবনবাদী বলিবে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদী বলিবে কি? বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে বরং বলা

যায় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর (transfiguration) হইয়াছে অতীন্দ্রিয়তায়। বৈষ্ণব কবিতার খোসাটা erotic বা ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ, শাঁসটা Spiritual বা অতীন্দ্রিয় রসপূর্ণ। এ রূপান্তরের কথা চিত্তবাবু অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য রূপান্তর-রূপের অনন্ত রূপে রূপান্তর—বৈষ্ণব কবিতায় নাই।

ফুলের মধ্যে যে "জন্মজন্মান্তরের কাহিনী" লুক্কায়িত, "ফুল ত শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের যে মহাপ্রাণ তাহারি প্রাণ-কণিকা"—এ হেন রূপান্তরের কথা কি বৈষ্ণব কবির? বরং Tennysonএর Flower in the crannied wall, Blakeএর To see a world in a grain of sand, রবীন্দ্রনাথের "তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ" প্রভৃতি কবিতায় এই সান্তের মধ্যে অনন্তের বার্ত্তা প্রচারিত। 'সান্তের মধ্যে অনন্ত'—এ তত্ত্বের সঙ্গেই বৈষ্ণব কবিতার রসতত্ত্বের সম্বন্ধ বিরল। কারণ, অনন্ত সে তত্ত্বে সান্ত। তিনি গোপাল, গোপীবল্লভ। সেই সান্তের অপর্য্যাপ্ত মাধুর্য্যরস বৈষ্ণব কবির জন্য ব্রজধামে সঞ্চিত। ভগবান যেখানে আপন ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর বৈষ্ণব সেখানে তাঁহাকে চায় নাই, যেখানে তিনি ছোট, যেখানে তিনি সখা, পতি, বৎস, সেইখানেই তাঁহাকে কামনা করিয়াছে। সেইখানেই তাঁহার নিত্য রাসমণ্ডল, তাঁহার নিত্য রাসলীলা। বৃন্দাবনলীলায় তাই ভগবানকে প্রভু বলিয়া কোথাও সম্বোধন নাই; এমনকি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও পূজা করা নাই। সেইজন্যই বাল্য ও কৈশোর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে সাঙ্গ করিতে হইয়াছে। বৃন্দাবনে তিনি কাহারও বড় নন্, তিনি সকলের ছোট। তিনি ছোট অর্থে তিনিই ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল। মা যশোদার কাছে আদর কাড়িবার জন্য ব্যাকুল; সখা রাখালদের সঙ্গে ধেনু চরাইবার জন্য ব্যাকুল; গোপীদের সঙ্গে রঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল; রাধিকার পায়ে ধরিয়া মান ভাঙাইবার জন্য ব্যাকুল।

সৌন্দর্য্যের রূপান্তর বা প্রেমের রূপান্তর সম্বন্ধে চিত্তবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই রবিবাবুর কাব্যের কথা। তবে প্রেমের যে ব্যাকুলতা বলে 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল' বা 'নিমিখে শতেক যুগ মানি' তাহাতে এ রূপান্তরবাদের সমর্থন হয় না। সেই ব্যাকুলতাই প্রেমের ধর্ম্ম—তাহাতেই প্রেমের তৃপ্তির মধ্যেও চির অতৃপ্তি, অতৃপ্তিতেও চির তৃপ্তি। বিরহে মিলন, মিলনে বিরহ। 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।

আসল কথা, বৈষ্ণব কবিতাটা আগেকার জিনিস, তাহার তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী কালের জিনিস। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি যদি কোন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা মনে রাখিয়া কাব্য রচনা করিতেন, তবে তাহা অমন সহজ, সরল, প্রাণস্পর্শী হইতেই পারিত না। তাহা আড়ষ্ট কবিতা হইত। তবু বৃন্দাবনলীলার যে কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের প্রাণের কথা ঐ কাহিনীর

বিবৃতিতে পুরা ফুটিতে পারে নাই। একমাত্র চণ্ডীদাসে তবু কতকটা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছে, বিদ্যাপতিতেও আংশিক ভাবে ফুটিয়াছে। তাহার পর হইতে ক্রমাগত ঐ formটাকে পদকর্ত্তারা ব্যবহার করিয়া করিয়া তাহাকে যখন প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনই পদরচনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কারণ, শেষাশেষি তাহা আর প্রাণ হইতে স্বতোচ্ছ্বসিত না হইয়া প্রথা হইতেই কেবলি পুনরাবৃত্ত হইতেছিল।

বৈষ্ণব কবিতায় ফিরিয়া যাওয়া আর সম্ভব কি?—কালের, আদর্শের, সমাজের, জীবনের, সকল দিকেই নানা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দুটি একটি বাৎসল্য বা মধুর রসের খেলায় সমস্ত জীবনের পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমান জীবনের রস আরও বিচিত্র, আরও গভীর। 'মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ' তাহা নিতান্ত সরল জিনিস নয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যেরও অন্ত পাই না, মানবপ্রকৃতির রহস্যেরও অন্ত পাই না। দুয়ের যোগও বিচিত্র যোগ, সেই যোগের স্ফূর্ত্তিও বিচিত্র উপায়েই হইতে পারে। এ কথা চিত্তবাবুই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং 'সমগ্র জীবনের অনুভূতি' বলিতে যতখানি বুঝায়, তাহা বৈষ্ণব কাব্যের রূপান্তর ঘটাইলেও ঐ দিক্ হইতে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে 'রূপান্তর'-তত্ত্ব চিত্ত বাবু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কবিজনোচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও 'ধারকরা' এইজন্য বলি যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে এ রচনা তাঁহার কলম দিয়া বাহির হইত না। কোন অশিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণব তাঁহার এ সকল কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতেই পারিবেন না। তবে 'পাশ্চাত্য শিক্ষার' পরে এত কটাক্ষ কেন?

## স্বামী বিবেকানন্দ

ফাল্গুনের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভক্তির সহিত স্বামীজির "চরিতামৃত" পরিবেষণ করিয়াছেন; যুক্তির সহিত তাঁহার চরিত ও কার্য্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মাগণ সম্বন্ধে গিরিজাবাবু যদি এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তবে তিনি যে একজন স্বভাবভক্ত ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ঘটিত না। কিন্তু ইংরাজীতে একটা প্রবাদ-বচন আছে যে, কোন জাতি-বিশেষকে গায়ে আঁচড় কাটিলেই তাহার ভিন্ন জাতীয়ত্ব ধরা পড়িয়া যায়। গিরিজা বাবুর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ বাদে অন্য কোন মহাপুরুষের চরিতের আঁচড় লাগিলেই তাঁহার ভক্তির মাধুর্য্য যুক্তির চাতুর্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। "চৈত্রে"র নারায়ণে প্রকাশিত তাঁহার "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধ তার সাক্ষী।

"স্বামী বিবেকানন্দে"র চরিতালোচনায় গিরিজাবাবু গোড়াতেই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মানিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য বা রাজা রামমোহন রায় যেমন এক এক যুগ-

সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া যুগ-সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়াছিলেন ও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য সকল ভক্তই নিজ নিজ ভক্তিভাজন সম্বন্ধে এই সকল দাবী করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযোগ্য দাবীর সেরা প্রমাণ তাহারা জানে গায়ের জোর। যুক্তিপন্থী গিরিজা বাবু অবশ্য সে প্রমাণ আশ্রয় করিবেন না বলিয়া আশা করি, কারণ তাহা হইলে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা শক্ত হইবে।

যাহাই হোক্ গিরিজাবাবু বিবেকানন্দের আবির্ভাব সময়ে হিন্দু জাতির ও পাশ্চাত্য জাতির অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যে-কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত আরম্ভ করিবার মত উপযুক্ত উপক্রমণিকা হইয়াছে বটে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার ভাষায়, "যখন আমরা সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই···সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম" তখন বিবেকানন্দ "আবির্ভূত" হইয়া কি করিলেন? গিরিজাবাবু বলেন, তিনি "সংস্কার-যুগের প্রতিবাদ" করিয়া ও তাহার নানা দোষ দেখাইয়া "প্রতিক্রিয়ামূলক এক সমন্বয় যুগের (!) সূচনা" করিয়া গেলেন। সেই সমন্বয়গুলি কি কি তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। "সমন্বয়" শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অবিরোধ'; অর্থাৎ অভিধানকার বলিতে চান্ যে সম্ পূর্ব্বক অন্বয় বলিতে কেহ যেন বিষম্ পূর্ব্বক অন্বয় না বুঝেন, এক কথায় খিচুড়ি না বুঝেন। গিরিজাবাবুর দাবী অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিমা-পূজার 'সমন্বয়' করিয়াছেন; এটাকে আমরা 'বিষমন্বয়' বলি, কারণ শাস্ত্রকারদের মত-হিসাবেই সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপের সঙ্গে সিঁড়ির সর্ব্ব উচ্চ ধাপের ঠিক সমন্বয় বা অবিরোধ হয়, এটা বলা যায় না। তারপর, বিবেকানন্দ স্বামী বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকারের সঙ্গে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অনুভূতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, এই তাঁর দ্বিতীয় সমন্বয়। যিনি সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর দাঁড়ান, তিনি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা কেমন করিয়া হুবহু মানিতে পারেন তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রের সবই অভ্রান্ত বা সবই ভ্রান্ত, এই দুই মতের কোন মতই প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যেখানে 'অপরোক্ষানুভূতি'র বাক্য আছে তাহাই তাহার নিত্য অংশ; কিন্তু যে মহাত্মার নিজের 'সাক্ষাৎ অনুভূতি' হয় নাই, তিনি সেই নিত্য অংশগুলি আবিষ্কারই বা করিবেন কি উপায়ে, তাহার বিচারই বা করিবেন কি করিয়া? সুতরাং সাক্ষাৎ অনুভূতিই শাস্ত্রবিচারের কষ্টিপাথর হইলে শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে কি?

গিরিজাবাবু বলেন যে, সামাজিক ব্যাপারে স্বামীজি পতিত ও অন্ত্যজ জাতিকে উদ্ধার করিবার প্রস্তাব করিলেও জাতিভেদের সমর্থন ও অসবর্ণ বিবাহের অসমর্থন করিয়াছেন। জন্মগত যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের দেশে দাঁড়াইয়া গেছে, তাহাতে যে যেখানে স্থান পাইয়াছে তাহার সেই স্থানই যে কায়েম। যে নীচে পড়িয়াছে, সে নীচেই থাকিবে;

যে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সে চিরকাল তাহাই থাকিবে। সুতরাং যে ভিত্তির উপর এই উচ্চ-নীচের ব্যবধান জিনিষটা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তি সমানই থাকিবে অথচ ব্যবধানটা দূর হইবে—ইহা কেবল আরব্য উপন্যাসের রাজ্যেই সম্ভব হইতে পারে। গিরিজাবাবুর উক্তি অনুসারে জাতিভেদের সমর্থনের সঙ্গে পতিত জাতির উদ্ধারের সমন্বয় যদি বিবেকানন্দ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এক খিচুড়ি হইয়াছে।

আমরা ভরসা করি বিবেকানন্দের ভক্তদল এই সকল উল্টা দাবী করিতে গিয়া খাবি খাইবার ইচ্ছা মোটেই করেন না। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য ধারণায় পৌছান অসম্ভব হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষত্ব কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে দুটো চারটে কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সংস্কার যুগের পরই প্রতিক্রিয়ার যুগ সর্ব্বত্রই স্বভাবতই দেখা দেয়। ইউরোপের ইতিহাসে Reformation যুগের সঙ্গে সঙ্গেই Counter-Reformation যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল—এই দুই দিক্, মানব সমাজে হয় যুগপৎ একই সময়ে একই অবস্থায়, নয় এক যুগ অন্তে অন্য যুগে অন্য অবস্থায় দেখা দিবেই। বাংলা দেশের ইতিহাসেও কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কারের যুগের পর যখন হিন্দু সমাজের ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখনই বিবেকানন্দ সেই যুগের যুগসারথি হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতএব, দেশের নিকট তাঁহার প্রধান দান—গিরিজাবাবু-কথিত তাঁহার সমন্বয় নয়; তাঁহার অপূর্ব্ব অগ্নিময় দেশপ্রীতি। তিনি কিছুরই সমন্বয় করেন নাই; তিনি সমস্তই সমর্থন করিয়াছেন। দেশের কিছুই বর্জ্জন করিতে তাঁহার মন চাহে নাই, দেশের সমস্তই স্বীকার করিবার জন্য তাঁর মন একান্ত উৎসুক ছিল। দেশকে এমন একান্ত ভাবে এমন নিবিড় ভাবে এমন সত্যভাবে তাঁহার মত এ যুগে আর কেহই ভালবাসিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রীতির তিনিই ভগীরথ—এই নূতন ভাবগঙ্গার ধারা তিনিই প্রবাহিত করিয়াছেন।

সেইজন্য তিনি তাঁহার সমন্বয় সাধনের জন্য নয়, তাঁহার "দরিদ্র নারায়ণ-সেবা"র জন্যই আজও দেশের মধ্যে একটি অজেয় শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণে'র সেবার জন্য বোধনের জন্য, তিনি সমস্ত দেশের পৌরুষ ও মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সেই তাঁহার "উদ্বোধন"—সেই ত তাঁহার "প্রবুদ্ধ ভারতের" কল্পনা।

বৃহৎ প্রতিভার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্ববিরোধ থাকে—কারণ অনেক সময় এই বড় রকমের স্ববিরোধেই বড় প্রতিভার পরিচয় হয়। অজ্ঞ লোকে ইহা বুঝে না। এই জন্য মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—"self-consistency is the

hobgoblin of little minds"। কবি হুইট্‌ম্যানের একটি ছত্রে আছে—"I am large: therefore I carry contradictions"। এই জীবনের মধ্যে পদে পদেই স্বতোবিরোধ রহিয়াছে—কোন বিষয়ে গভীরতার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে প্রসরতার দিকে ততটা পরিমাণ দৃষ্টি পড়ে না; আবার বৈচিত্র্যের দিকে বেশি অগ্রসর হইলে ঐক্যের দিকে সে পরিমাণে মনোযোগ যায় না। দেশবোধ ও বিশ্ববোধ এ দুয়ের মধ্যে যে এক জায়গায় একটা বিরোধ আছে, সেটার তাড়াতাড়ি রফা তাঁরাই করিতে উদ্যত হন্ যাঁদের এ দুয়ের কোন বোধই হয় নাই। বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বোধই ছিল অথচ অবিরুদ্ধ ভাবে ছিল না। তাঁহার ভিতরকার বিশ্ব-মানুষটি তাঁহাকে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল; তাঁহার ভিতরকার স্বাদেশিক মানুষটি তাঁহাকে জাতিভেদ সমর্থন করাইয়াছিল। জাতিভেদের দোষ কেহ দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষের কোন্ institutionটা perfect? জাতিভেদের বদলে আমাকে 'better substitute' দাও। তখন তাঁহার মনেও হয় নাই যে ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণ' উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি সমাজে কোন দিন উচ্চতর অধিকারের দাবী করে, তবে এ উত্তরে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। অবশ্য তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসে জাতিধর্ম্ম নাই। কিন্তু ছয় কোটি অস্পৃশ্য লোক ত সকলেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া দণ্ডী হইতে পারেনা?

## জন্মের হার

"জন্মের হার" সম্বন্ধে জানুয়ারীর এডিনবরা রিভিউতে ডিন অব্ সেন্টপল্‌স্, ইন্‌জ্ সাহেব, এক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের ইতিবৃত্ত ঘাঁটিয়া প্রত্যেক দেশে জন্মের হার কি কি কারণে বাড়ে কমে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে এ আলোচনার বিশেষ মূল্য আছে; কারণ আমাদের বাংলাদেশে জন্মের হার কমিতেছে, সুতরাং আমরা dying race মরণমুখে পতিত জাতি—বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে।

ইন্‌জ্ বলেন, প্রাচীন কালের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমতঃ যে সব শিকারী জাত ঘর বাঁধিয়া বসতি করে নাই তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। কারণ ছেলে কাঁধে করিয়া মেয়েরা স্বামীদের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইলে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়েনা, তাদের রক্ষাও হয় না। মধ্য এশিয়ার তৃণ-ভূমিতে nomad-শ্রেণীর জাতের মধ্যে বরং জন্মের হার খুব বেশি ছিল। এইজন্য পূর্ব্বকালে বারুদ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মাঝে মাঝে এই সব অসভ্য জাতির আক্রমণে পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলা অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তারপর, বড় বড় নদীতীরে যে সব কৃষি-প্রধান সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল, যেমন ইজিপ্‌টে বা ব্যাবিলোনিয়ায়,—সেখানে জন্মের হারও যেমন বেশি, মৃত্যুর হারও তেমনি বেশি। লোকসংখ্যা সেখানে

অপরিমিত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল; এতটা বাড়ের জন্যই অতটা ছাড় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসে কোন কালেই লোক-সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা; তবে রসদের অভাবে বসতের বদলের জন্য গ্রীকরা উপনিবেশ বিস্তারে মন দিয়াছিল। সেও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত; তারপর আর নয়। তারপরে গ্রীক্ নাগরিক ষ্টেটগুলির মধ্যে ঐ ছোটখাট আয়তনের ভিতরেই পূর্ণতা লাভ করিবার একটা আদর্শ আসে, 'self-sufficient life'-এর আদর্শ আসে। গ্রীকরা মনে করিয়াছিল যে, একটা নাগরিক ষ্টেটে বড় জোর বিশ কি ত্রিশ হাজার নাগরিক থাকিবে, তাহাদের যাহা কিছু অভাব তাহা তাহারাই মিটাইয়া লইবে। (রবিবাবুর পল্লীসমাজের আদর্শের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই কি?) অতবড় জ্ঞানী যে প্লেটো, তিনিও তাঁহার 'Laws' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্ নগর সমুদ্রের খুব কাছে না হওয়াই ভাল, কারণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেই যত রাজ্যের বিদেশী বণিক ও দোকানদার জুটিয়া নাগরিকদের বেণে-স্বভাববিশিষ্ট করিয়া তুলিবে। কেবল এথেনীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যে সেরা রাষ্ট্রনৈতিক ইসোক্রাটিস্ এই রকমের ছোটখাট নাগরিক ষ্টেটে সন্তুষ্ট থাকিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাজ্য-বিস্তার করিয়া ষ্টেটগুলা ক্রমশঃ আরও বলশালী ও সমৃদ্ধিশালী হয়। অবশ্য গ্রীক-দের মধ্যে দীর্ঘায়ু ও সুস্থ সবল মানুষ যত বেশি পরিমাণে দেখা যাইত, এমন আর প্রাচীনকালে অন্য কোন দেশে দেখা যায় নাই। প্রাচীন রোমানদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। তবু এক সময়ে গ্রীক ও রোমান জাতি যে একেবারেই পৃথিবী হইতে বিলোপ পাইল, তাহার কারণ কি! হঠাৎ ইহাদের মধ্যে জন্মের হার কমিয়া গেল কেন? গ্রীকদের মধ্যে শিশুহত্যা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; বিকলাঙ্গ শিশুপুত্রকে তাহারা মারিয়া ফেলিত, শিশুকন্যাকেও তাহারা পালন করিতে নারাজ ছিল। তারপর যুদ্ধবিগ্রহ সদাই বিদ্যমান ছিল, এও আর একটা কারণ বটে। তবে এ সকল কারণ এত প্রবল নয়, যাহার জন্য গ্রীক ও রোমান জাতির একেবারে ধ্বংস হইতে পারে। অবশ্য ধ্বংসের আর একটা বড় কারণ, দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসায়। দাসদের দ্বারা সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করাইব এবং নিজেরা তাহার ফলভোগ করিব—এ ব্যবস্থায় একটা জাতির শক্তিকে ক্রমশঃ হীন ও দুর্ব্বল করিয়া আনে। কিন্তু ইন্জ্ সাহেব বলেন যে, এ সকল কারণের চেয়েও গ্রীক্ ও রোমান জাতির ধ্বংসের অন্য বড় কারণ ছিল। তিনি বলেন, একটা জাতির যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশা না থাকে, তবে বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধেও তার উদ্যম-উৎসাহ স্বভাবতই কমিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে সে আর কোমর বাঁধিয়া লাগেনা, সে অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়—অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে বলিয়া সকল বিষয়েই সে একেবারে গা ছাড়িয়া দেয়। তখন সুস্থ সবল সন্তান রাখিয়া যাইবার ইচ্ছাও তাহার থাকে না; সন্তান জিনিসটাই তাহার কাছে ভার ও দায়স্বরূপ হইয়া উঠে। রোমান্

সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পূর্ব্বে রোমানদের মধ্যে এইরূপ একটা নৈরাশ্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছিল। সেই নৈরাশ্য ও অবসাদই গ্রীক ও রোমান জাতির মৃত্যুর কারণ।

গ্রীক ও রোমান জাতির মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ইন্‌জ্‌ যাহা বলিতেছেন তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিবার কথা আছে। নৈরাশ্য, অবসাদ, অদৃষ্টবাদ, সন্ন্যাসের আদর্শ—আমাদের মধ্যেও পুরা মাত্রায় প্রবল। রোমানদের মধ্যে সন্ন্যাস, eremitism প্রভৃতি শেষ-দশায় বেজায় দেখা দিয়াছিল। বাংলাদেশেও সন্ন্যাসী-স্বামী-সম্প্রদায় বাংলাদেশের একচেটে স্বামী হইয়া বসিয়াছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে আশা ও উৎসাহ প্রবল, না নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ প্রবল ?—ভাবিয়া দেখা উচিত।

গ্রীক ও রোমানের মত পরবর্ত্তী যুগে স্পেন আর একটা উদাহরণ। স্পেনের যেমন হু হু করিয়া উন্নতি হইয়াছিল, তেমনই দ্রুতবেগে অবনতি দেখা দিল। কারণ তাহার উন্নতিটা ছিল শুধু কেবল ব্যবসা বাণিজ্যে এবং পরজাতির শাসন ও শোষণে—সুতরাং তাহার পরমায়ু বেশি দিনের মত হইল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে জন্মের হার ও লোকসংখ্যা যত বাড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় জগতের ইতিহাসের কোথাও কোন যুগেই হয় নাই। যন্ত্রতন্ত্রের আবিষ্কারে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে, দেশ বিদেশে বাণিজ্যের প্রসারে দেখিতে দেখিতে এক শতাব্দীর মধ্যে লোকসংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গেল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের জনসংখ্যা ছিল ৪,৮০০,০০০—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হইল, ৬,৫০০,০০০। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইল, ৩২,৫৩০,০০০।

কিন্তু এখন যাঁহারা ইউরোপীয় জাতিদের জন্মের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যান্‌, তাঁহারা দেখিতে পান্‌ যে, খুব উন্নত জাতিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিদের মধ্যেই জন্মের হার অধিক। অবশ্য উন্নত জাতিদের মধ্যেও জন্মের হার সম্বন্ধে অনুপাতের যথেষ্ট তারতম্য আছে। তারপর জন্মের হার ও মৃত্যুর হার সম্বন্ধে তুলনা করিয়া তাঁরা দেখেন যে, যে-দেশের মৃত্যুর হার কম আর যে দেশের জন্মের হার বেশি তাহাদের মধ্যে আসলে তফাৎ খুব কম।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ব্লু বুক হইতে একটা তালিকা লেখক উদ্ধার করিয়াছেন এইরূপ :—

| | জন্ম | মৃত্যু | মোটবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য | ২৩·৯ | ১৩·৮ | ১০·১ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ২৮·৭ | ১১·২ | ১৭·৫ |
| অষ্ট্রীয়া | ৩১·৩ | ২০·৫ | ১০·৮ |
| বেল্‌জিয়াম | ২২·৯ | ১৩·৪ | ৬·৫ |
| ফ্রান্স | ১৯·০ | ১৭·৫ | ১·৫ |
| জার্ম্মাণি | ২৮·৬ | ১৭·৩ | ১১·৩ |
| ইটালী | ৩২·৪ | ১৮·২ | ১৪·২ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ২৬·৫ | ৮·৯ | ১৭·৬ |
| নরওয়ে | ২৫·৪ | ১৩·৪ | ১২·০ |
| রাশিয়া | ৪৪·০ | ২৮·৯ | ১৫·১ |

রাশিয়ার জন্মের হার সব চেয়ে বেশি অথচ অনুপাতে মৃত্যুর হারও কম নয় ; এবং অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের জন্মের হার কম হইলেও মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম বলিয়া

আসলে মোট বৃদ্ধির হার তাহাদেরি বেশি। ভারতবর্ষের জন্মমৃত্যুর হার লেখক দেন্ নাই; কিন্তু আমরা জানি যে ভারতবর্ষের মৃত্যুর হার রুশের চেয়েও বেশি। চীনেও তাই।

ইংলণ্ড সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন যে, সবচেয়ে বেশি জন্মের হার খনির মজুর ও slum-বাসীদের মধ্যে। ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক-দের মধ্যে জন্মের হার অত্যন্ত কম। ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার অত্যন্ত কম—কারণ তাহারা অনেকেই বিবাহ করিতে চায় না। এই সব কারণে বিখ্যাত Havelock Ellis তাঁহার "The Task of social Hygiene" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সব নিম্ন শ্রেণীর রুগ্ন ভগ্ন, অশিক্ষিত কুশিক্ষিত লোকদের বংশবৃদ্ধি হওয়া ও ভদ্রবংশীয়দের বংশক্ষয় হওয়া কোন জাতির পক্ষে একটা দুর্লক্ষণ। জর্ম্মানীতেও এই অবস্থা। আমেরিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আমেরিকানদের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছে। বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি? মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষিত ও সভ্য তো নয়?

দক্ষিণ আমেরিকায় স্লাভ ও ইতালীয়ান-দের মধ্যে বংশবৃদ্ধি ব্রিটিশ-আমেরিকান-দের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ সুসভ্য হইলেই সে যে টি'কিয়া থাকিবে তাহার কোন মানে নাই। জীবন-সংগ্রামে জীবনযাত্রার সরলতার ও নূতনতার আদর্শকে বজায় রাখিয়া যে সব জাতি চলিতে পারে, হয় ত তাহারাই যোগ্যতম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন কাফ্রি সামান্য আয়ে বড়লোকের মত থাকিতে পারে, কিন্তু বিলাসী ইংরেজের পক্ষে ২০০ পাউণ্ড আয়ও অত্যন্ত অল্প বলিয়া মনে হয়। আমরা দরিদ্রজাতি বলিয়া মনে করি আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সরল, কিন্তু আমাদের হিন্দুদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আধুনিক সভ্যতা আমাদের যত পাইয়া বসিয়াছে, এমন মুসলমানদের নয়।

তার মানে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ-পরতা, স্বচ্ছন্দপ্রিয়তা, বিলাস এবং পাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সভ্যতার উপরের চিকণ-চাকণ যতই মনোরম হউক্ না কেন, ভিতরে মৃত্যুর ঘুণ ধরিয়া তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিতে থাকে। বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় দেশসমূহে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। ধনের সঙ্গে দারিদ্র্যের অসামঞ্জস্য অন্য কোন দেশেই এত বেশি নয়। সুতরাং ক্যাপিট্যালের সঙ্গে শ্রমের বিবাদ সে দেশে ঘরাও বিবাদের মত নিত্য লাগিয়াই আছে। মেয়েরা পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রামে পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতে গিয়াছে বলিয়া তাহাদের গৃহধর্ম্ম, তাহাদের সন্তান-পালন একবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। গর্ভপাতের তালিকা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যুক্ত-রাজ্য ২,০০০,০০০ শিশুজন্ম বন্ধ করা হয়। জর্ম্মানীতে সংখ্যা ৪০০,০০০।

ইন্‌জ্‌ সাহেব মনে করেন যে, দুই উপায়ে এই ক্ষয় নিবারণের চেষ্টা হইতে পারে:—(১) প্লেটোর আদর্শ অনুযায়ী নিজের মধ্যে নিজে সংহত-সংবৃত হইয়া কোন জাতি নিজের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে।

তিনি বলেন ফ্রান্স এই আদর্শের দিকে মনোযোগ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিপদ হইতেছে এই যে, যুদ্ধ বাধিলে তখন এইরূপ ছোটখাট আয়োজনে জয়ী হইবার সম্ভাবনা বিরল হইয়া পড়ে। সুতরাং (২) দ্বিতীয় উপায় এই যে, নানা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আত্মবিস্তারের দ্বারা সেই সেই স্থানে বরাবর একটা নূতনত্ব ও সজীবত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। যেমন ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়াতে বৎসর বৎসর যে সব অধিবেশী যায়, যদি সেই সব যাত্রীরা যোগ্য কি অযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ ও নিরূপণের চেষ্টা করা যায় ও সুযোগ্য লোকদিগকেই সেখানে পাঠাইয়া সেখানকার সভ্যতাকে সকল দিক্ হইতে সুস্থ সবল ও কল্যাণ-প্রদ করিয়া তোলা যায়, তবে যে পরিমাণে এই কাজে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে সেই পরিমাণে ব্রিটেনের ক্ষয় নিবারিত হইবে। সেখানে যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ যথাযথ পরিমাণে যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু এ উপায় যেন ইংলণ্ড-জর্ম্মানী সম্বন্ধে সম্ভব হইল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ উপায় কি খাটে? আমরা উপনিবেশ করিব কোথায়? আমাদের পক্ষে এখন প্রথমোক্ত ব্যবস্থাই বোধহয় সমীচীন। তবে দুই ব্যবস্থাই পাশাপাশি কাজ না করিলে লোকক্ষয় কোন জাতিই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেনা।

আমাদের এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে জাতিকে বাঁচিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যবস্থা চাই। হয় সংহত ভাবে পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে, নয় ব্যাপক ভাবে উপনিবেশ গড়িতে হইবে।

## কর্ম্মপ্রেরণা

"সবুজপত্র", "মানসী" ও "প্রবাসী" এই তিনটি কাগজে "লোকশিক্ষা," "কর্ম্মযোগ" ও "দেশের সেবা" এই তিনটি প্রবন্ধের আলোচনা-রীতি ভিন্ন হইলেও, আলোচ্য নীতি একই। তিনটি প্রবন্ধেরই বক্তব্য হচ্চে, কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আমাদের দেশে জাগানো প্রয়োজন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের দেশের মন যে আর নিশ্চেতন নয়, এটা একটা সুলক্ষণ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

"সবুজপত্রে" বরদাবাবু "লোকশিক্ষা" সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাক্-চাতুরী ও লিপি-কারিকুরী দেখান্ নাই; একেবারে তাঁর বিষয়ের মর্ম্মস্থানে তীরের মত সোজা গিয়া ঘা দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, "লোকমত" জিনিসটা আমাদের মধ্যে নাই, কারণ লোকসাধারণ থাকিলে তবে ত লোকমত থাকিবে? তিনি তাই লিখিয়াছেন,—

"মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভিতরে দু একটির বুদ্ধির যতই ধার থাক্ না কেন—জনসংঘের সহানুভূতির ভার তার পেছনে না থাকাতে, তাতে মোটেই কিছু কাটছে না। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের প্রয়াস, আকাশে রাজপুরী নির্ম্মাণের চেষ্টার সামিল।"

কিন্তু এদেশে জনসাধারণ জাগে নাই কেন? তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"সমাজের বড় বড় দায়িত্বগুলো যদি নিঃশেষে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত না থাক্‌ত; আর তাঁরা যদি সুদীর্ঘকাল ধ'রে তাঁদের এই নেতৃত্বভার বহন করিবার সুযোগ না পেতেন; তাহলে আমাদের জনসাধারণের এমনধারা লুপ্তজ্ঞান এবং সুপ্তিমগ্ন হবার অবসর বোধ হয় জুটত না।"

প্রবন্ধের শেষে বরদাবাবু দেখাইয়াছেন যে, জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি ছিল না দায় ছিল না বলিয়া কর্ম্মে তাহারা সাড়া দেয় নাই; ভক্তিতে, ধর্ম্মে সাড়া দিয়াছে। তার সাক্ষী শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলাদেশের ভক্তির আন্দোলন। বরদাবাবু সেই ধর্ম্মপ্রবণতার সঙ্গে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জুড়িয়া দিলে জনসাধারণকে জনসংঘ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্বাস করেন।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টা। যে সব ধর্ম্ম religions of law, বিধিবিধানমূলক, তাহারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কর্ম্মের জালে মানুষকে অহর্নিশি ঘিরিয়া রাখে। সেমেটিক্ ধর্ম্মে ইহার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু যে সব ধর্ম্ম religions of redemption, ভক্তিমূলক, সেখানে কর্ম্মটাই বন্ধন; সেখানে শুধু স্বেদ কম্প পুলক মূর্চ্ছাদির ব্যাপার, নানা রকম mystical experiences, নানা রসের সম্বন্ধে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে কর্ম্মে লইয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে অংশে ইহুদীয় সে অংশে তাহা বিধিবিধানমূলক; যে অংশে শুধুই খৃষ্টীয় ও অন্যান্য জাতির সাধনার সঙ্গে অন্বিত, সে অংশে তাহা ভক্তিমূলক। খৃষ্টানধর্ম্মে তাই ভক্তি ও কর্ম্মের যে সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে তাহা অন্য কোন ভক্তিধর্ম্মে দেখা যায় নাই। চৈতন্যের ধর্ম্মে ভক্তিপ্রবণতার সঙ্গে কর্ম্মপ্রবৃত্তির সংযোজন কেমন করিয়া হয়, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের দেশে আমরা বহুকাল ধরিয়া abstraction লইয়া কারবার করিয়াছি। জ্ঞানের চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বেদান্তে; ভক্তির চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বৈষ্ণব ধর্ম্মে। এখন চাই জীবনের কারবার।

অর্থাৎ আমরা এখনো মধ্যযুগে আছি; বর্ত্তমান যুগে পৌছিতে আমাদের অনেক দেরী। আমাদের শিক্ষিত সাধারণ এখন ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা লইয়া পড়িয়াছেন—ইহাতেই প্রমাণ যে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে আর ধরিয়া নাই। আর অশিক্ষিত সাধারণ ধর্ম্মের চেয়ে ধর্ম্মের খোলস লইয়াই বেশি আছে; সেটা ছাড়াইতে গেলে তার বদলে তাহাদিগকে আর কোন সত্যবস্তু দেওয়া দরকার। অবশ্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুয়ের মধ্যে কোন কোন মানুষ দেখা দেন্ যাঁরা বাউল ধরণের লোক—তাঁরা গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে মানুষ। চিরকালই সব দেশে এই শ্রেণীর মানুষ থাকিবেন। ইঁহারাই seers। তবে আমাদের দেশে তাঁরা সম্প্রদায় পাকাইয়া তোলেন, এই হয় অনিষ্ট। একদল লোক কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া তাঁদের তল্পী বয়; তারা রসের স্বাদ পায় না, খাদ্ লইয়াই মাতামাতি করে।

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁর "কর্ম্মযোগ" প্রবন্ধে এই কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। "ভক্তিযোগে"র গ্রন্থকার বলিয়া তিনি খ্যাত; তাঁরই পক্ষে তাই "কর্ম্মযোগ" লিখিতে আরম্ভ করা ঠিক্ উপযুক্তই হইয়াছে। "ভারতের পতনের সূত্র" তিনি দেখাইয়াছেন এইরূপ:—

"এই ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ কর্ম্মদ্বারা গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং দেখিলেন যে এই 'সুজলা সুফলা' ভূমিতে এরূপ পর্য্যাপ্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন কর্ম্মের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য উপস্থিত হইল। শরীর-যাত্রা এই দেশে অনায়াসসাধ্য বলিয়া তাহা অনাদরের বিষয় হইল; এবং শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ সংশ্লিষ্ট তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। জীবিকাবিধায়ী বহির্ম্মুখ কর্ম্ম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল; কিন্তু তাহাই অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইলে বাহিরের মঙ্গল যেরূপ সংসাধিত হয়, অন্তরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলও তেমনি সাধিত হইয়া থাকে—ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। সুতরাং অগ্রণীগণ কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, মাত্র জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের পরমসাধ্য নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত না হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইহাই ভারতের পতনের সূত্র। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং যাঁহারা সংসারী রহিলেন, জগতের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদিগের স্বকীয় মঙ্গল কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তাহা ভুলিয়া, ঘোর বিষয়ী ও স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই দলই মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "প্রবাসী"তে "দেশের সেবা" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে দেশটুকুর মধ্যে মানুষের প্রীতি বদ্ধ না হইলেও, বিশ্বমানবে তাহা ব্যাপ্ত হইলেও, সেবার ক্ষেত্র দেশেই আবদ্ধ থাকে। তবে সেবার আদর্শ ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে। এ কথাটির মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। অশ্বিনীবাবুও তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"আজ জগতের সীমান্ত—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় যান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় দ্বারা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক, নানাবিধ বিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ।"

নরেশবাবুও লিখিতেছেন,—

"সমুদয় মানব জাতি যে এক মহাদেশ ও মহাসমাজ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেশাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অপূর্ব্ব বিধানে আমাদের সেই মহাসমাজে আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।"

দেশাত্মবোধের দিনে, বিশ্ববোধের প্রতি-ক্রিয়ার দিনে, এ সকল কথা আমাদের মনে হঠাৎ চমক উপস্থিত করে। কথাগুলো পুরাণো হইলেও এ কালের হিসাবে নূতন। কিন্তু দেশ-প্রেমের আদর্শ যেমনি বদ্‌লাক্ না কেন, দেশের সেবার ক্ষেত্রের বদল হয়না নরেশবাবু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চান্। দেশের সেবার সঙ্গে মানব-সমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই।

সেবা বলিতে তিনি শুধু জনহিত-সাধন বুঝেন নাই। কারণ তিনি লিখিয়া-ছেন: "আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।" অর্থাৎ তাঁর মতে সমাজ-বোধে পূর্ণ হইয়া সেই বোধের প্রকাশস্বরূপ যাহা কিছু করা যায় তাহাই সমাজের সেবা হইয়া দাঁড়ায়। দেশের মধ্যে এই সমাজ-বোধ (social consciousness) জিনিসটা জাগাইতে পারিলেই "লোকশিক্ষা"র সমস্যারও সমাধান হয়, ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের বিরোধও ঘুচিয়া যায় এবং দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধেও দ্বন্দ্ব থাকেনা। কারণ সমাজবোধের পরিণতিই বিশ্ববোধে; সুতরাং তাহার গতিই সেই দিকে।

## আমাদের শিক্ষা।

ফাল্গুনের সবুজপত্রে "আমাদের শিক্ষা" নাম দিয়া সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকলেরি ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতির একেবারে তলায় নিমজ্জিত সব চেয়ে বড় সমস্যাটির ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে পাঠকদের চেতনার কূলে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সুতরাং শিক্ষার ফল সমাজে কেমন করিয়া ফলানো যাইতে পারে, তাহাই যে শিক্ষার সব চেয়ে বড় সমস্যা—এই সহজ কথাটা অধিকাংশ লোকেরই মনে থাকেনা। মনে না থাকিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নাই। দুটি মাত্র কথা তিনি বলিয়াছেন:—(১) শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই; কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন যে, সে সম্বন্ধে কোন জাতিই সন্তুষ্ট হইতে পারেনা, কারণ শিক্ষা জিনিসটাই experiment মাত্র। তবু (২) অসন্তোষের বড় কারণটাও তিনি ধরিয়াছেন:—"আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নব শিক্ষা আজও সম্পূর্ণ খাপ খায়নি।" এই দ্বিতীয় কথাটাই আসল কথা। অসন্তোষের মূল এইখানেই। আমাদের শিক্ষার উপর আমাদের সমাজের কোন দাবী নাই—আমাদের শিক্ষার চাবি সমাজের কোন কুলুপেই লাগেনা। ইউরোপে সকল দেশেই, ধীরেই হোক্ আর দ্রুত-বেগেই হোক্, শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত রচিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে তা মোটেই হয় নাই!

কিন্তু কেন আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার বনিবনাও হইতেছেনা, এ প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পাদক যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহার শিক্ষা-সমস্যার পূর্ব্ব-মীমাংসার পর ঠিক উত্তর-মীমাংসা হয় নাই। তিনি প্রশ্নটাকে যথেষ্ট ঘাঁটান নাই, তাই তাহাকে মিটানও নাই।

একথা তিনি পরিষ্কার স্বীকার করিয়াছেন যে,—

"এ কালের স্কুল কালেজ দেশের মাটিতে গজায় নি, আকাশ থেকে পড়েছে।"

তবু তার পরেই তিনি বলিতেছেন,

এই শিক্ষা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়বে কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। কেননা তা মূলত বিদেশী। এ সন্দেহ অবশ্য অকারণ। যে শিক্ষার বলে নব ইউরোপের বুদ্ধি ও চরিত্র গ'ড়ে উঠেছে তা আদিতে সম্পূর্ণ বিদেশী ছিল।...... মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।"

এসব কথা কেহ অস্বীকার করে বলিয়া ত শুনি নাই। ইংরাজী শিক্ষা আমরা পাইতেছি বলিয়াই যে কোথাও কোথাও ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা মোটেই সত্য নয়। বিশ্বসভ্যতার সকল শিক্ষাই আমাদের পক্ষে দরকার, কোন শিক্ষাই বাদ দিবার নয়—এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কোন বিদেশী শিক্ষাকে দেশীয় আধারের ভিতর দিয়া ছাড়া আত্মসাৎ করা যায় কি? বাংলায় জন্মিয়া বাংলার—ভারতবর্ষের—সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনা ও শিখিনা, অথচ ইংলণ্ডের

সব জ্ঞাতব্য কথা মুখস্থ করিয়া একজামিন পাস করিতেছি, এমনতর শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি, ও হৃদয়বৃত্তি সবই ক্রমশ ভোঁতা হইতে থাকে, কারণ মানুষটাই যে তোতা হইয়া বসে। শিক্ষার এ হেন অভিনব পদ্ধতি আর কোন সভ্যদেশে কখনো চলিয়াছিল কি? আমাদের বাঙালী তথাকথিত-শিক্ষিত-সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে যে আজও যথেষ্ট পরিমাণে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিতেছেননা, তাঁদের বাংলা লেখার অনভ্যাসই তার প্রধান কারণ নয়; প্রধান কারণ বরং এই যে তাঁরা বাংলার নিজস্ব culture সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্মবৈচিত্র্য, সমাজ-গঠন, বাংলার নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, বাংলার জনসাধারণ ও তাহাদের সুখদুঃখ ভাব-অভাব—ইহার কোনটাই তাঁদের জানা নাই। সুতরাং তাঁরা যা কিছু লেখেন তার বারোআনাই শেখাবুলি এবং বাকী চার আনা বিদ্যের চুলোচুলি, অর্থাৎ নিরর্থক কলহ।

অন্ততঃ বাংলাভাষার ভিতর দিয়া বিদেশী শিক্ষাটা দিবার চেষ্টা হইলে ইহার চেয়ে ঢের ভাল ফল হইত। তখন বাংলার নিজস্ব কাল্‌চারটা কি, হয়ত তাহার তলব পড়িত। অন্ততপক্ষে বাঙালী ছাত্রের মন ও কল্পনা শৈশব হইতে উপবাসী থাকিত না, কিছু খোরাক পাইত। তোতাবৃত্তি এমনতর বৃদ্ধি পাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী যেমন তাহার অপূর্ব্ব ছোট গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি রচিয়াছে, তেমনি সাহিত্যের অন্যান্য নানা-দিক—দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি তখন বাংলা ভাষায় গড়িয়া উঠিত ও তাহার দ্বারা রস-সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। বাঙালী যে সাহিত্যটুকু রচিয়াছে তাহা আজ দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে, শুধু বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহার জন্য কোন স্থান নাই বলিলেই হয়। ছাত্ররা শেলী, কীট্‌স্, টেনিসন পড়িবে অথচ তাঁহাদের চেয়ে ঢের বড় কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবেনা। স্কট পড়িবে, বঙ্কিম পড়িবেনা। প্রমথবাবু এ সকল কথা ভালরূপেই জানেন, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তাঁর দরদ বড় বেশি দেখিতে পাই—কারণ তিনি এ সব কথা পষ্টাপষ্টি না বলিয়া লিখিয়াছেন—

"এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ত সেদিন হয়েছে।...সুতরাং আমরা যে এই নবশিক্ষাকে একেবারে আপনার ক'রে নিতে পারিনি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সত্যকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিষ্ঠাই হয় নাই—আমেরিকার ফ্রেমে-গাঁথিয়া-তোলা বাড়ীর মত একেবারে গোটা গুম্বজ-খিলান-সমেত ঝুপ করিয়া রাতারাতি আমাদের মাটীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বসানো হইয়াছে। তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আবার সেই সব চলিষ্ণু বাড়ীর মত অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া যায়। শিক্ষা ভিৎ হইতে সুরু হইয়া ক্রমশ উপরে ওঠে—গোড়াকার শিক্ষা পাকা হইলে পর তবে ত উচ্চশিক্ষার পত্তন হইতে পারে। আমাদের মনের হাঁড়িতে চাল, জল সবই তৈরি আছে কিন্তু নীচে শিক্ষার আগুন না দিয়া উপর হইতে ক্রমাগত তাপ দিবার প্রবল

চেষ্টা সুরু হইল ; সে আগুন ধরিবে কেমন করিয়া ? দেশের জনসাধারণ পাইবে না প্রাথমিক শিক্ষা, শুধু উপরের শ্রেণীর শতকরা ৩।৪ জন লোক সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পাইয়া সভ্যতার মহোচ্চ শিখরে উঠিবে—এসব দিবাস্বপ্নের কোন মূল্য আছে কি ? এ অঘটন-ঘটনে মায়া বা যাদুবিদ্যাও পটীয়সী নয়। সুতরাং প্রমথ বাবু যে লিখিয়াছেন,

"আমাদের শিক্ষার উপর একদল ইংরাজ এই কারণ নারাজ যে তার ফলে আমরা এদেশের প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বদল চাই আর আমাদের গুরুজনদের মধ্যে একদল এই কারণে নারাজ যে, আমরা এদেশের প্রচলিত সমাজতন্ত্রের বদল চাই।"

সে সব অদল-বদলের দাবী যদিবা উপস্থিত মুলতুবী থাকে, তবে তা খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, জনকয়েকের রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন এবং জনকয়েকের দ্বারা সমাজের ভিত্তির নাশন খুব সুবিধার ব্যাপার নয়। স্বায়ত্ত-শাসনের পরীক্ষাটা ভাগ্যক্রমে হয় নাই, অন্য পরীক্ষা হইয়া গেছে। তাহাতে সমস্ত সমাজের বন্ধ-দশা ত ঘুচেই নাই বরং তাহার কবন্ধ দশা হইয়াছে। তার মত বিভীষিকা আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রমথ বাবু শিক্ষা সম্বন্ধে public opinion এর সৃষ্টি করিতে চান্, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যে শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে পাব্লিকের "কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই।" কোন পাবলিকেরই কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকেনা—তবে পাব্লিকের পাল কোন্দিকের বাতাসে নড়ে তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। কি উচ্চ শিক্ষা, কি নিম্ন শিক্ষা কোন শিক্ষাই আমাদের পুরাদস্তুর হইতেছে না—এই হাওয়াতেই এখন এদেশের পাব্লিকের পাল চঞ্চল। শিক্ষা সম্বন্ধে 'অভিমান' দূরে থাকুক্, শিক্ষা যে আমরা ঠিকমত পাইতেছিনা—এই বোধটাই ও তজ্জন্য ক্রোধটাই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে দিনদিনই প্রবলতর হইতেছে। প্রমথ বাবু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে কেউ কেউ চান "বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্যবিদ্যালয়ে পরিণত করতে"। অথচ তিনিই লিখিতেছেন "সমাজ চায় যে সামাজিক মানব একাধারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হবে।" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ামুখস্থের শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে আছে অথচ একই সঙ্গে টেক্‌নিকেল শিক্ষার কোন আয়োজনই নাই এটা যে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা তাহা প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় উক্তির কোটেশান হইতেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহার ঠাট্টাটা ঠিক লাগসই রকমের হয় নাই। শুধু বৈশ্যবিদ্যালয় ত কেহ চায় না ; তবে বৈশ্যবৃত্তির দরকার পনেরোআনা লোকেরই আছে, কারণ ব্রাহ্মণবৃত্তির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষাত্রবৃত্তির স্থান সম্প্রতি বাঙালী পল্টন তৈরির ব্যাপারে যদি কিছু হয়। অবশ্য শূদ্রবৃত্তির জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না—সমস্ত জাতটাই তাহাতে দীক্ষিত হইয়া আছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

# সমালোচনা

**মূর্চ্ছনা।** শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি নামে 'কবিতা-গ্রন্থ', ভিতরে ছাই ও পাঁশ. তবে ইহার বিশেষত্ব এইটুকু যে, ইহার ললাটে অপরের ভূমিকা নাই!

**হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা।** শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বি, এ প্রণীত। জিলা ঢাকা, রায়পুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্য—একাদশ সর্গে রচিত। লেখক দীর্ঘ ভূমিকায় বিস্তর গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু কেন অধঃপতিত হইলেন? মুসলমান কেন এদেশে আসিলেন? আসা কি আকস্মিক হইয়াছে, অথবা কোন গম্ভীর কারণে ঘটিয়াছে? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের সমাধানের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি"। কাব্যখানিতে আমরা কোন বিশেষত্ব বা কবিত্ব দেখিলাম না।

**খুকুর কথা।** স্বর্গীয়া চারুবালা দেবী ও দিদিমা লিখিত। ময়মনসিংহ, জামালপুর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। খুকু—লেখিকা স্বর্গীয়া চারুবালার শিশু পুত্র; প্রবাসিনী লেখিকা শিশুর সম্বন্ধে যে-সব কথা আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিতে লিখিতেন—সেই সকল চিঠি হইতেই এই 'খুকুর কথা'র সৃষ্টি। উনিশ বৎসর বয়সে লেখিকা খুকুকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লেখিকার আত্মীয়-স্বজনের কাছে এ গ্রন্থের মূল্য আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

**তাপসী।** শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য কাগজের মলাট এক টাকা, কাপড়ের বাইণ্ডিং পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থে—মীরাবাই, সংঘমিত্রা, রাবেয়া, সেন্ট টেরেসা, সেন্ট এলিজাবেথ, সেন্ট কাথেরিণ, মাদাম গেঁয়ো, কুমারী কব, রাণী শরৎসুন্দরী ও দেবী অঘোর-কামিনী—স্বদেশের ও বিদেশের এই দশজন ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-চরিত সংগৃহীত হইয়াছে। ধারাবাহিকতা সর্ব্বত্র বজায় না থাকিলেও রচনা চলন-সই; এবং এ জীবন-আখ্যায়িকাগুলি বালক-বালিকাদিগকে পড়িতে দিলে তাহারা উপদেশ ও আনন্দ লাভ করিবে।

**বীরভূম-বিবরণ।** প্রথম খণ্ড। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি" হইতে প্রকাশিত ও কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন;—ভূমিকাটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। তবে প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ ইতিহাস নহে; "বীরভূমের কয়েকটি পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনীমাত্র।" ইহাতে হেতমপুর, ভদ্রপুর, সুপুর, ভাণ্ডীরবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি জোফ্‌লাই, কেন্দুবিল্ব ও শ্যামারূপার গড়ের (ত্রিষষ্টি, গড় বা ঢেকুর) কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীগুলি বঙ্গদেশের এক অংশের প্রাচীন কীর্ত্তি-কথা; ঐতিহাসিকের কাছে সেগুলির মূল্য যথেষ্ট আছে—গ্রন্থে বহু চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

---

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



আলেকজান্দারের মৃত্যু

# ভারতী

৪১শ বর্ষ ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ [ ২য় সংখ্যা

## গুরুজী

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুনেছি তিনি মহা সাধুপুরুষ এবং জাতিস্মর। আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভার-কোটটার উপরে আজ-কালের স্বামীজীর ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রূপো-বাঁধা শুয়োরের দাঁতের ছড়ি আর পায়ে ফ্লানেলের পেণ্টা-লুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুটটায় আমাকে ফকির কি ফিকিরবাজ পুলিসের সি-আই-ডি অথবা আর-কিছু দেখাচ্ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারিনে; তবে আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেরুয়ার আভা পড়েছিল এবং আমি গান-বাজনা না করে খুব গম্ভীর হয়ে বসে থাকায় জাহাজে তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে-থেকে কটাক্ষপাত করছে এটা আমি বেশ বুঝছিলেম। বুড়ো গোলোকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন মনঃসংযোগ দিয়ে জুটের বাজার-দরের কলমটা আগাগোড়া মুখস্থ করছিলেন সেটা জানতে আমায় অধিক কষ্ট পেতে হয়নি।

যাই হোক অন্যদিনের মতো সেদিনও নিয়মিত উত্তরপাড়ায় এসে জাহাজ ভিড়লো। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছক্কড় গাড়িতে ধূলো এবং ঝাঁকানি খেতে-খেতে আধক্রোশ-টাক্ গিয়ে রাজাদের একটা বাগান-বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি, ঘোড়া, মায় গাড়োয়ান আমরা দুজনে খানার ভিতরে উল্টে পড়লেম। একখানা মোটরগাড়ি একরাশ ধূলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের

চলন্ত ধূলোর মধ্যে আরো গোটা-কতক ইংরিজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাকে চাকা-ভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁতটা খুলে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগ্‌লা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধূলো যথাসম্ভব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে যেমন ফিট্-ফাট্ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনি আছে;—তার কালো কোটের একটি ভাঁজও এদিক-ওদিক হয়নি এবং তার বুকের মাঝে ফুটন্ত গোলাপ-ফুলটি থেকে একটি পাঁপ্‌ড়িও ঝরে পড়েনি। অবিন লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে বেশী বই কম হবে না, অথচ ঐ ছক্কড় গাড়িটার খাঁচা-কল থেকে কি-করে এমন সাফ্ বেরিয়ে গেল তা জানিনে; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধূলো-মাখা গেরুয়া পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সাম্‌লে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়না দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না;—ব্রহ্মতেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের ফুঁপিটা সাপের ফনার মতো আর উন্নত হয়ে রইল না—বাঁ-কানের উপরে লট্‌কে পড়ল; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্য্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধূলো মেখে নিলেও, মন তার নিজের গেরুয়া রংটুকু আর বজায় রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে সেই রাজার বাড়িতে সাধু-দর্শনে প্রবেশ কল্লেম যখন মন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রং-ওঠা লোহার শিক-দেওয়া একটা ফটকের মাঝ দিয়ে ইটের খাদরী-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারাণ্ডার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে, রাস্তাটায় এককালে লাল সুরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় সবুজ শেওলার ছোপ ধরেছে। রাস্তার ধারে ধারে পুরোনো গোটাকতক পাটা-ঝাউ এবং এখানে-ওখানে মাটীর পরী রাখবার গোটা দুচার ইটের পিল্পে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের শিক্‌গুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ীর পিছন পর্য্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুকনো গাঁদা ফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির দুধারে সিংহি বসবার দুটো বড় চাতাল। একটার উপর থেকে সিংহি অনেক কাল পালিয়েছে—সেখানে একটা ছেঁড়া মাদুর রোদে শুকচ্ছে; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ-খিঁচিয়ে এখনো এক পশুরাজ ভোম্বলদাস তার খসে-পড়া ল্যাজের সরু শিক্‌টা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্যে উঁচিয়ে বসে আছে—।

আমরা সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে মোটামোটা তিনটে থাম-দেওয়া বারাণ্ডা পেরিয়ে এক বড় ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল, অনেকখানি ধূলো আর খুব জম্‌কালো একটা চিনে-মাটির ফুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ফুলদানটার একটা হাতোল আর খানিকটা কানা ভাঙা; আর তার গায়ে বড়-বড় গোলাপ-ফুল প্রজাপতি আঁকা। ঘরের ঝাড় ক'টা ময়লা গেলাপ দিয়ে মোড়া—আগে লাল, এখন কালো সালুমোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়খড়ি ছিল; এখন ফিকে হতে-হতে দাঁড়িয়েছে প্রায় গঙ্গামৃত্তিকার রং। ঘরের পাশের দেওয়ালগুলোতে একটা-করে আয়না, একটা-করে মেমের ছবি,—ছবির কোনটার কাপড়-পরা, কোনটা নয়। মাঝের দুই বড় দেওয়ালে একদিকে একটা বড় ঘড়ি, আর-একদিকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধা জরীর তাজ-মাথায় এক সুপুরুষের চেহারা,—মনে হচ্ছে যেন সামনের দেওয়ালে সেই অনেক দিনের বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটা-দুটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

অবিন ঘরে ঢুকেই বাঁকা-পায়া গোল-পিট পাঁচ-রঙা ফুল-কাটা ছিট্-মোড়া একখানা চৌকিতে ধপাস্ করে বসে পড়ল। দুজনে প্রায় এক কোয়াটার বসে আছি; অবিনের মুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে—একটা উড়ে ঘরের একটেরে, যেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে-ধরা টিনের কৌটো থেকে দোক্তার পাতা একটা একটা বার করে রোদে মেলিয়ে দিচ্ছিল সেইখানে আস্তে আস্তে গিয়ে বল্লুম—সাধু কোথায় রে? উড়েটা ঘাড় না উঠিয়েই, সাধু এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করেই আবার নিজের কাজে মন দিলে। আমি আবার বল্লুম—ওরে সাধু কোথায়? তাঁকে একবার খবর দে না!

দাসো একবার পানের দাগধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচ্‌কে বল্লে—সাধু? আমিই তো সাধু!

আমার আর রাগ বরদাস্ত হলনা; আমি আমার ভাঙা ছড়িগাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আজ ভেঙে যাব বলে উঁচিয়েছি আর অবিন ডাকলে—ওহে এদিকে। ফিরে দেখি যাঁকে দেখবার জন্যে আসা তিনি দাঁড়িয়ে। চোখা-চোখি হবামাত্র তিনি একটু-খানি হেসে কবীরের এই পরথটা সুর করে আউড়ে নিলেন—

মন ন রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে যোগী কপড়া।

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন; আর কথাগুলো আমাকেই বলা হল এই ভেবে আমি একটু বিস্মিত একটু ভীত আর একটু লজ্জিত হয়েই তাঁর পায়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন—ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধূলো নিয়ে ফেল্লেন, এটাতো ভালো হল না!

ইনি যবন! বিস্ময়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে ঘৃণার উদয় না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাতলা ঠোঁট খুব চেপে এবং বড়-বড় চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি নিয়ে আমার মুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল; সে যদি আগে বলতো তো যবনের পদধূলি—কথাটা মনে আসবামাত্রই সাধু একেবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোই কহে
আদেস
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল ঢুঁর ফিরে চঁহু
দেশ।

আমার বেশটার উপরে এই ঠেস্—সেটা যিনি কল্লেন তিনিও যে ভেকধারী কেউ নন এটা তাঁর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবীর উপরে কাশ্মীরি শাল এবং তার নীচে লুঙ্গী ফ্যাসানে পরা নূতন ধোয়া থান ধুতি দেখে কিছুতেই আমি ভাবতে পারলেম না। এমন সাধু আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে-সময়ে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি। আমি একটু চেঁচিয়েই অবিনকে বল্লেম—চল হে জাহাজ আবার না ছেড়ে দেয়। সাধু-দর্শন হল; চল এখন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এতক্ষণে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন—এই এত-ক্ষণে আপনি আমায় যথার্থ চিনেছেন। আসুন একটু চা আর গোটা-দুই মুরগীর ডিম না খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না।

বলা বাহুল্য যবনের পদধূলিতে ঘৃণা থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে আমার কোন আক্রোশ ছিল না। জেলের জল শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাদ দেব এমন মূর্খ আমি ছিলেম না, বা জেল-খানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মনুর মতে নিষিদ্ধ হলেও জেলের তেল অথবা সেই তেলে ভাজা সহরের ছত্রিশ-জাতের পদধূলি মাখানো গরম ফুলুরি যে অনাদরের সামগ্রী এটা স্বীকার করতে আমি একেবারেই নারাজ ছিলেম। তার পর সদ্য ধোপ-দেওয়া সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন অতি বিশুদ্ধ তামার কোশা কমণ্ডলু তাম্রকুণ্ডুতে টাটকা-পাড়া মুরগীর সাদা ডিম এবং তার চেয়েও পবিষ্কার এবং সাদা পাউরুটি, ঘরের গোরুর দুধ, লিপ্‌টনের চা-পানি—কলের জলের, গঙ্গা জলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও আমায় ইতস্তত করতে হল না।

ফকিরটির ভিতরে ফক্‌রেমি কোথাও ছিল না। দেখলেম তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখীর খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া বসনটা টুকরো টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা এবং পৈতের সুতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক্; লক্ষ্মীর ঘটটা উল্টে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন। বৈরেগীদের যা-কিছু ভণ্ডামি, ও গোঁড়ামির যত-কিছু আসবাব, সবগুলোকে তিনি এমন-এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়ে-ছেন যে সেগুলোর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ না হয়ে হাসি পাবেই পাবে। মনুসংহিতায়, বাই-বেলে, কোরাণে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধ কাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারিদিকে এমন-একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের অবতারণী করে রেখেছেন যে মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার মনে হল যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস জোর করে আমার বুকের কপাটদুখানা খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধু পুরুষের দিকে চাইলেম তখন তাঁকে গুরু এবং বন্ধু এই দুই ছাড়া আমি আরকিছু মনে করতে পাল্লুম না। আমি গুণগুণ

করে গাইতে লাগলুম—"আরে ইন্ দুহু রাহ না পাঙ্গি, হিঁন্দুকী হিংদ বাঙ্গি দেখী, তুর্কণকী তুর্কাঙ্গি।

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা তুলে নিয়ে বন্ধু আমার, গুরু আমার, তিনি গানের শেষ-চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—"কহেঁ কবীর :সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হবৈ যাঙ্গি"। তার পর তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই চল্লো ;—আমি গাই, তিনি জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন সুস্বরও ছিল না, আর বীণা বাজাতে তেমন দক্ষতা জন্মজন্মান্তরেও লাভ করব কি না তাও জানিনে।

সে-বেলার ষ্টীমার অনেকক্ষণ ঘাট পেরিয়ে আপনার ঠিকানায় যাত্রী নিয়ে পৌঁছে গেছে—তখন তিনি বীণা রেখে বল্লেন—চল এখন স্নান করে কিছু খাওয়া যাক্। আমি গঙ্গার দিকে চাইতেই তিনি বল্লেন—না ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপ-জলের ফোয়ারা! কি বিপুল শুভ্রতার ঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে স্নানে নামলেম! যখন আমি এই কথা ভাবছি তখন একটা দাসী—তেমন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি—সোনার একটা পাখীর খাঁচা এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। পাখীর গা-টা বাউলদের শততালি কাঁথাখানার মতো নানা রঙে বিচিত্র। পাখীটা খাঁচার তলায় বসে ধুঁকছে। আর তার রোগা পালক-ওঠা গলাটা থেকে গোপীযন্ত্রের শব্দের মতো গুব্ গুব্ একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখীটাকে খাঁচা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আচ্ছাকরে গোলাপজলের ফোয়ারায় চুবিয়ে দাসীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপরে বসিয়ে দিলেন। পাখীর ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলি বদ রং-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জ্জীব পাখীটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কসের মতো পাতলা গেরুয়ারক্ত সেই রুমালখানার সাদা রং মলিন করে দিচ্ছে আর মূর্ত্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছেন—এ দৃশ্যটা আমার কল্পনারও অতীত। আমার অন্তর বাহির একটা বীভৎস বিস্ময়ে এই লোকটার সঙ্গে আরো বেশী-করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্খায় টলমল করে উঠল। এই দেখলেম এঁকে মহাপুরুষ, আবার এই দেখছি ঘোর নৃশংস, মৃত্যুর মতো নির্ম্মম। এ রহস্যের ব্যূহভেদ একমাত্র অবিনই করতে পারবে জেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে বল্লে—আমি পারবো না, ইচ্ছা হয় তুমি ওঁকে শুধোও!

আমার আর ভোজনে সুখ হল না, শয়নে শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপাদেয় রকমেই আমাদের পান ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবিনটা দিব্বি সেগুলো উপ-ভোগ কল্লে এবং বেলা চারটের সময় ফিরতি ষ্টীমার ধরার জন্যে ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার এস্থানটা থেকে কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি অবিনের ঠিক পাল্টা জবাব দিলেম—আমি যাবো তুনা ; তোমার ইচ্ছা হয় মি যাও! কত

আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগেনি ; কিন্তু ওই যে বলেছি যাবো না, অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং দেখতে-দেখতে সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওভারকোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোলো —নিমন্ত্রণ পেয়েছ নাকি ! আমি গম্ভীর হয়ে বল্লেম—'হুঁ'। অবিনের কৌতুহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল ; সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে—এই-খানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছো ? একি সম্ভব !—অসম্ভব কেনইবা হবে ?—অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচে ছিল আমি তাকে ভোগাচ্ছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বল্লে—অসম্ভব ; কেননা আমার পক্ষে সেটা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি !—বলেই অবিন ওভারকোট পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বল্লেন—যা এতদিন অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব হোক ; কি বলেন ?

আমাদের আর দুবার করে অনুরোধ করতে হল না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেম তখন তাঁর হাতে হাতির দাঁতের রং একটা পাখী দেখলেম। সেটা পায়রা কি ঘুঘু কিছু বোঝা গেল না ; আর তাঁর পাশে যেন পাথরে গড়া একটি সুন্দর ছেলে।

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধব্‌ধবে রাত আমি দেখিনি। তার মাঝে একটা শ্বেত-পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরণে তার সেই নেভিব্লু চায়নাকোট, আমার সেই গেরুয়া অলষ্টর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত সাদা তা পূর্ব্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা ফেণার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেত পদ্মের মত দেখা যাচ্ছে! আজ কি সাদার মধ্যেই এসে আমরা ডুব দিলুম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ঝরিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতা সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। এরি মাঝে তিনি আস্তে আস্তে তাঁর ইতিহাস সুরু কল্লেন—পূর্ব্বজন্মে যাগ-যজ্ঞ দানসাগর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণভোজন ও কুমারী দানে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেবার পুণ্যে আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক আর শিবলোকে বাস করে শেষে অমরা-বতীতে ইন্দ্রত্ব পদ দখল করে বসলেম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরযৌবন নিয়ে কি আনন্দ, কি বিলাসের মধ্যেই যে বাস কচ্ছিলেম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে মোগল বাদসাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে যাও সেখানকার তুলনায় সেগুলো কি তুচ্ছ ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই ;—মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্য্যের সুখের লালসার মত্ততার অফুরন্ত পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ভরপুর রয়েছে। অতৃপ্তির শিখা সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো দিনরাত জলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্ব্বশী রম্ভা

ত্রিলোত্তমাকে আহুতি দিয়ে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি সেই সময়ে ইন্দ্রানীর উপরে আমার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাপ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ পুণ্যফল একটা বিরাট অজগরের মতো উত্তপ্ত নিশ্বাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইন্দ্রের ইন্দ্রানীকে আমার দুই বাহুর মধ্যে এনে উপস্থিত কল্লে। সেই রাত্রি—সেই সুনীল আকাশের বাসর-ঘরে প্রমোদের বীণার ঝঙ্কারে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিশ্বাসের করুণ সুর ডুবে গেল—অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ-প্রমোদ-রজনী, আমার চির যৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান কল্লেম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইন্দ্র-দেবের অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার বৎসরের শ্রান্তি আর অবসাদ প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে। ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেম। তিনি আমাকে একগাছা হরিনামের মালা দিয়ে বল্লেন,—তুমি নিজের কর্ম্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারি ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ; হরিনাম কর আবার এখানে তোমার স্থান হবে। স্বর্গ যে কি ভয়ঙ্কর স্থান তা আমার জানতে বাকি ছিল না। অমর অক্ষৃপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলেম। তিনি তাঁর মানসপুত্রদের লেখা খান-কতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেই মতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে। আমি সেখান থেকেও হতাশ হয়ে দেবাদি-দেবের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন কল্লেম। তিনি বল্লেন তুমি কারো কথা শুনো না, স্বর্গলাভের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের ফটক পেরিয়ে বেশী দূর যেতে হবে না; আমার দূতেরা ঝুঁটি ধরে এখানে তোমায় ফিরিয়ে আনবে। আমি তখন জগৎ-জননীর পা জড়িয়ে ধল্লেম। মা আমাকে কৃপা করে তিন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বল্লেন—পৃথিবীতে এই তিন জন তোমার বন্ধু থাকবে এদের চিনে নিও, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে, না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়। আমি বিষ্ণুর জপমালা, ব্রহ্মার ঘেরণ্ডসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুঁটুলি টেনে ফেলে সেই কপোততিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধল্লেম। একটি নীল, একটি গেরুয়া, একটি সাদা। দেখতে দেখতে সপ্তস্বর্গ রাম-ধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলেম। সেই তিনটি কপোতী হচ্ছেন—

অবিন অমনি ফস্-করে বলে উঠলো—বস্ গুরুজী, আর না, গল্পের ভিতর মোরালিটি ও নীতি-কথা এসে মিশছে, রক্ষে করুন! এই নীলকোট আমি—আপনার যৌবনের ইয়ার—আমিই হচ্ছি সেই নীল কপোত; মাঝে দুদণ্ডের মতো এই গেরুয়া কপোত আমার বন্ধু,—এ আপনার দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার

গোলাপজলের ফোয়ারার পিচ্‌কিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য গেরুয়া রক্ত বমন করে স্বর্গলাভও কল্লে; তবে এখন আপনার পাশে শিশুবেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ওঁকে নিয়েই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দগ্ধাবেন না।

শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয় মহাপুরুষের চোখদুটো অবিনের এই ধৃষ্টতায় ঝক ঝক্ করে জ্বলে উঠল্। তিনি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাপের মতো বাঁকা একখানা ছোরা বার করে অবিনের দিকে এগিয়ে চল্লেন। আমি চীৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে যাব কিন্তু কথা সরলনা;—সেই ছেলেটা এসে আমার গলা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, সেই সাদা পাখীটা ঝট-পট করে ডানা ঝাপ্‌টে মাথার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অবিন তার দুই ঘুসো-বাগিয়ে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেবলি বলছে—গল্পে নীতিকথা অসহ্য!—তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান কল্লেন। আমি চম্‌কে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেম জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি; অবিন আমার মুখে কেবলি জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে; আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটা ভিজে পটি লাগানো। এই সময় আমাদের এক উকিল সহযাত্রী অবিনকে প্রশ্ন করলেন—গাড়িটা যে-মটোরের ধাক্কায় উল্টে গেল আপনি তার নম্বরটা নিলেন না কেন? এঁর মাথায় যে-রকম চোট লেগেছে তাতে নালিশ চলতো।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# ইউসুফের প্রতি জুলেখা

( জামি হইতে )

বিধাতা তোমায় দেছেন, দেবতা,
গুল্-ভাতি যাহা কপোলে ফুটে।
নিখিল পাগল তব মহিমায়
ক্রীতদাস হয়ে চরণে লুটে।
তোমার ললাটে যে জ্যোতি উজলে
চন্দ্রমা তাহে হয়েছে ম্লান,
তোমার আঁখির ভ্রূযুগ হেরিয়া
মদন ত্যজেছে ধনুর্ব্বাণ।

উপাসনারত বয়ান তোমার
দেবতা তাহাতে করিছে বাস,
ভক্তে বাঁধিতে তোমার শীর্ষে
কুঞ্চিত কালো কেশের ফাঁস।
তোমার পিধানে বসন ভূষণে
তব অঙ্গের রশ্মি লাগে,
শুভ্র লোহিত কুসুমের রাশি
ফুটে তাহে যেন ত্রিদিব-বাগে।

তোমার অধরে মধুর হাসিটি
চারু কোরকের বিকাশ সম,
রাঙা গোলাপের বরাঙ্গ বচন
তব পদকোণ রম্যতম।
তুমি আছ বলি সর্ব্বংসহা
সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমার বিরহে এ ধরণী বুঝি
অতলে ডুবিবে ভূধর-ভারে।
তুলে ধর মোরে কৃপা কর প্রিয়
হৃদয়বন্ধু করুণা কর,
সকল জড়তা সব বন্ধন
সব ব্যথাসহ নিরাশা হর,
দীর্ঘ শ্মশানে হৃদয় শোষণে
ব্যাকুল গোষণে—অশ্রু ধায়
অশনি-আহত বৃক্ষের মত
হৃদয় আমার বিদরি যায়।
হৃদয় ক্ষতের স্নিগ্ধ প্রলেপে
জুড়াও আমার হৃদয় জ্বালা
দুলাও বন্ধু—দুলাও কণ্ঠে
তোমার বাহুর রতন-মালা।
যুগযুগ মোর হৃদয় দহেছে
হৃদয় হয়েছে সাহারা যেন,
খোস-বাগানের খুস্‌বু তোমার
তার মাঝে তুমি বহালে কেন?
বহাইলে যদি ঝলসিত হৃদি—
—কুট্যুলে ঢাল' জীবন-সুধা
চির অনশন শোষণ দূরিয়া
মিটাও বন্ধু হৃদয়-ক্ষুধা।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

# আলেয়ার আলো

সাত

## সরমার কথা

নতুন বাড়ীতে গিয়ে নামতেই দেখি, দরজার কাছে হাসিমুখে মোহনবাবু দাঁড়িয়ে। তিনি বাবাকে নমস্কার করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়ে, একপাশে সরে গেলেন। … …বাবা আর তিনি গাড়ী থেকে জিনিষপত্তর নামাতে লাগলেন, আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

ছোট্টখাট্টো দিব্যি বাড়ীখানি। উপরে চারটি, নীচে চারটি ঘর। আমরা আগে যে বাড়ীখানিতে ছিলুম, সেখানি কিন্তু এর চেয়েও ছোট আর পুরাণো। অথচ, এর ভাড়া দশ টাকা আর তার ছিল কুড়ি। একটু আশ্চর্য্য হলুম। তাই ত, ভাড়ার এত তফাৎ হয় কি? আমাদের জন্যে মোহন বাবু নিশ্চয় তাঁর বাড়ীর ভাড়া কম-করে ধরেছেন! আমাদের উপর তাঁর এতটা দরদ কেন?… …কে-জানে!

দক্ষিণমুখো ঘরদুখানি আমার ভারি পছন্দ হোল। এর একখানিতে থাকবেন বাবা, আর-একখানিতে আমি। তাড়াতাড়িতে যতটা পারলুম, ঘর-দুখানা গুছিয়ে-গাছিয়ে নিলুম।

আমার ঘরের সামনেই বারান্দা।

বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, আমাদের বাড়ীর গা-ঘেঁসেই মোহনবাবুর বাড়ী। তার পিছনে একটি ছোট বাগান, তার মাঝখানে একটি পুকুর, সেটিও ছোট। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফুলের ভুরভুরে গন্ধ ভেসে আসছিল;—দেশ ছেড়ে পর্য্যন্ত এমন মিঠে ফুলের গন্ধ একদিনও পাইনি, এমন তাজা সবুজ রং একদিনও চোখে পড়ে-নি—আজ যেন প্রাণে একটু শান্তি এল। ফুলের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে আপনাআপনি দেশের ছবি জেগে উঠল:—আমাদের সেই অগোছালো, কিন্তু ফলে-ফুলে পাখীর ডাকে ভরা, জামালকোটার বাতাড়ে ঘেরা, বাতাসে চঞ্চল সবুজ বাগানখানি; তার একদিকে গরু চরাবার বাথান—সেখানে রোজ দুপুরে বটতলায় বসে, তরল রোদে ধোয়া ধূ-ধূ মাঠের পানে তাকিয়ে, রাখালের ছেলে ঘুঘুর কাঁদুনীর সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে অলস রাগিণী ধরত; আর এক দিকে সারি সারি কচুঝোঁপ ও স্যাওড়াগাছের পরে, আইরি ক্ষেতের পরে গঙ্গার দুধের মত ধারাটি চরে চরে হাত বুলিয়ে আয়না এঁকে বনের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে গেছে!... ...দেশের ভিজে মাটির সেই সোঁদা গন্ধটুকু পর্য্যন্ত আমি ভুলিনি-গো, ভুলতে পারি-নি।

মাগো, এই ধুলোভরা কাদাভরা ধোঁয়া-ভরা কলকাতায় দেশের ঘর-দোর ছেড়ে লোকে যে কি সুখে এসে থাকে, তা লোকেই জানে! কলকাতার নামে সকল-কার মুখ-দিয়ে যেন লাল পড়ে! আমি কিন্তু কলকাতার পায়ে গড় করছি—এই ক-দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি সব যা-তা নানানখানা ভাবছি, এমন সময় বাবা উপরে এলেন। বললেন, "সরো, কেমন বাড়ী?"

—"হ্যাঁ, দিব্যি বাড়ী বাবা!"

—"অথচ, ভাড়া এত কম!"

—"দ্যাখ বাবা, আমার বোধহয় মোহনবাবু আমাদের কাছ থেকে কম ভাড়া নিচ্ছেন।"

—হ্যাঁ সরো, আমারও তাই মনে হচ্ছে। মোহন ছেলেটি বেশ—না?"

—"হ্যাঁ, তিনি খুব ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের এ-রকম পদে-পদে ঋণী হওয়াটা ত ভাল নয় বাবা!"

কিন্তু, কেবা শোনে কার কথা! হঠাৎ মোহনবাবুদের বাগানখানি দেখতে পেয়ে বাবার আনন্দ আর ধরে না! তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে তারিফ করে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এই ইঁটের কোটরে বাগান—গোবরে গোলাপফুল! আঃ, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! দ্যাখ্ সরো, দ্যাখ্, কেমন সব ফুল ফুটেছে, কেমন চমৎকার গন্ধ আসছে! সুতরাং—"

বাবার এই "সুতরাং" কখন্, কোথায় কোন্ অর্থে বসে, আমার আর তা জানতে বাকি ছিল না। বুঝলুম, এখন তিনি এখানেই অন্তত ঘণ্টাদুয়েকের জন্যে আস্তানা গাড়বেন। কাজেকাজেই বাবাকে সেখানে একলা বসিয়ে রেখে আমি গেরস্থালীর কাজে গেলুম।

সন্ধ্যার পরে কাজকর্ম্ম চুকিয়ে আমার ঘরে ঢুকলুম।

আজকে ভারি গুমোট্, ঘরে ঢুকে দম যেন আঁটকে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি জানলা-দরজাগুলো খুলে দিলুম। মোহনবাবুদের বাড়ীর দিকে যে জানলাটা ছিল, সেটা খুলতেই একটা আলোর ঢেউ এসে আমার চোখ-মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জানলা দিয়ে মোহনবাবুদের বাড়ীর একটি ঘর দেখা গেল। সে ঘরে বিজলীর আলো জল্‌ছে। একদিকে চক্‌চকে বইএ-ভরা ছুটি আলমারী; তার সুমুখেই একটি সবুজ বনাত-মোড়া টেবিল। মোহনবাবু সেই টেবিলের সামনে একখানা বইএর উপর একমনে ঝুঁকে রয়েছেন। বিজ্‌লীর আলো তাঁর মুখে পড়াতে তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মোহনবাবুর স্বভাবটি যেমন নম্র ও শান্ত, তাঁর মুখখানিও তেমনি সুশ্রী! ডাগর চোখ, টানা নাক, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো।... ...

মোহনবাবু পড়তে-পড়তে একবার মুখ তুললেন। পাছে দেখে ফেলেন—সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলুম।...

মোহনবাবুকে ভাললোক বলে মনে হয়... ...কিন্তু না, পুরুষদের এত-শীঘ্র বোঝা ভার। জীবনে বেশী পুরুষের সংশ্রবে আসি-নি বটে, কিন্তু যাদের ভাল করে চিনতে পেরেছি, তাদের দানব বলতে পারি —দেবতা নয়!

আমার স্বামী,—বাইরে-থেকে দেখলে তাঁর ভিতরে কেউ কোন খুঁৎ বার করতে পারত না; তিনি সুশ্রী, বিদ্বান, ভাল ঘরে তাঁর জন্ম; কিন্তু তাঁর মনের ভিতরটা! বলতে নেই—আজ তিনি পরলোকে, কিন্তু এখনো তাঁকে ভাবলে প্রাণ আমার আঁৎকে ওঠে! রমণীর পক্ষে স্বামীনিন্দা মহাপাপ—কিন্তু অত্যাচারকে যে অভাগীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে-না, ঋষিরা তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা করে গেছেন? এই-যে আমার কপালে স্বামীর নির্দ্দয় পদচিহ্ন চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, এ ক্ষত কি নারীর গৌরবের নিশানা? এ শুষ্ক ক্ষতে হাত দিয়ে কি আমাকে বলতে হবে, 'স্বামী, তোমার এ স্মৃতিচিহ্নকে আমি পূজা করি!'—এ স্মৃতি কি পবিত্র?

... ...রোজ রাতে তাঁর আশায় পথ-চেয়ে জেগে থাকতুম। কিন্তু তাঁর এলমেল টল্‌মলে পদশব্দ শুনলেই আমার বুকটা গুড়্‌-গুড়্ করে উঠত! হপ্তায় পাঁচ-ছ দিন তিনি ত বাইরে-বাইরেই রাত কাটাতেন; যেদিন অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরতেন, সেদিনও তাঁকে সহজ মানুষের মত আমার প্রাণের কাছটিতে পেতুম না। মদ খেয়ে বাড়ীতে এসে অকারণে কোনদিন আমায় গাল দিতেন, কোন দিন চুলের মুঠি ধরে মারতেন। কোন দিন বা এসেই বেহুঁস হয়ে পড়তেন;—সারারাত শিয়রে বসে আমি তাঁকে পাখার বাতাস করতুম, মাথায় জলের ঝাপটা দিতুম; আর নিজের মনের ভিতরে গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদতুম।

এম্‌নি করে শ্বশুরবাড়ীতে আমার দিন কাটছিল।

ছেলেবেলায় 'স্বামীসুখ' বলে যে কথাটি

শুনতুম, যার জন্যে রোজ সকালে মাটির শিবের মাথায় বেলপাতা দিয়ে গঙ্গাজল ঢাল্‌তুম, এই কি সেই 'স্বামীসুখ'?—পাড়ার সমবয়সীরা যখন আমাকে স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করত, তখন মুখ ফুটে আমি তাঁর নিন্দা করতে পারতুম না; তাদের স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলেও তারা বোধ হয় প্রাণের কথা খুলে বলত না; কারণ, তাদের কারুর কারুর মুখ দেখেই বুঝতুম যে, পতিনিন্দা করে তারাও আপনাদের সতীত্ব-গৌরব খর্ব্ব করতে চায় না। বাঙলা দেশের চির-সহিষ্ণু সতীরা শাস্ত্রকে পদে পদে মেনে চলে কিনা, তাই ত তারা এমন অটল মৌনব্রত গ্রহণ করেছে! আমাদের বলা হয় 'অবলা'—কিন্তু আমরা কি অবলা? পুরুষের মুখ চেয়ে যে রমণীরা হৃদয়ের বিদ্রোহকে এমন করে দমন করতে পারে, তারা কি অবলা?

কিন্তু আ আমার পোড়কপাল, এ 'মৌনব্রত' আমার ধাতে ত সইল না! শাস্ত্রের নিষেধ, ধর্ম্মের শাসন, নরকের ভয়, এ সবই আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে—আমি যে পাপিষ্ঠা, আমি যে ব্রত ভঙ্গ করেছি!… …সে রাত আমি কখনো ভুলব না। সেদিনও অনেক রাতে তিনি মদ খেয়ে এসেছিলেন। ঘরে ঢুকেই চুলের মুঠি ধরে তিনি আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামালেন—ঘুমুচ্ছিলুম, এই আমার অপরাধ! চুল ধরে টানাতে আমি 'উহু' বলে কেঁদে উঠলুম; আমার কান্না শুনে তাঁর আরো রাগ হোল। বললেন, "কী, আবার ছিঁচ্‌কান্না?"—বলেই তিনি আমার পেটে জোরে এক লাথি মারলেন। দু-হাতে পেট চেপে যাতনাভরে আমি ভুঁয়ে বসে পড়লুম।

তিনি বললেন, "ওঠ্‌! আলমারি থেকে একটা গেলাস বার করে দে!"

জানি না, সেদিন আমার মন কেন বেঁকে দাঁড়াল! একালের নভেলের আদর্শ সতীর মত স্বামীর পায়ের ধুলো আমি সেদিন মাথা পেতে নিতে পারলুম না! গোঁ-ধরে স্পষ্ট জবাব দিলুম, "উঠব না!"

তিনি গর্জ্জে বললেন, "কী! উঠবি-নে?"

—"না, কি করতে পার, কর!"—সে দিন যে মরতে অত ভরসা আমার কি-করে হয়েছিল, আজও তা ভালরকমে বুঝি-নি।

আমার কথায় রেগে তিনি পাগলের মত হয়ে উঠলেন। "তবে রে"—বলে খুব কুৎসিত ভাষায় আমায় যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে তিনি ফের আমাকে লাথি মারলেন।

সে নিষ্ঠুর পদাঘাত আমার প্রাণের মধ্যে সেই সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে তুললে, যে নারীত্ব অন্যায় অত্যাচারকে স্তব্ধ হয়ে সহ্য করতে পারে না! স্বামী আবার পা তুললেন,—কিন্তু সে পা আমাকে স্পর্শ করবার আগেই আমি বিদ্যুতের মত উঠে দাঁড়ালুম! তারপর আগু-পিছু কিছু না ভেবেই, টেবিলের উপর থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে বললুম, "ফের যদি তুমি আমার গায়ে হাত তোল, তবে এই আলো দিয়ে—"বলেই রাগে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেই কাঁচের বড় ল্যাম্পটা মাথার উপর তুললুম।

তিনি ভয়ে-ভয়ে আমার পানে অবাক হয়ে

তাকাতে তাকাতে এক-পা এক-পা করে পিছন হটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইভাবে সেইখানে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।... ...ক্রমেই আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এল। ল্যাম্পটা হাত থেকে খসে মাটির উপর পড়ে ঝন্‌ঝনিয়ে চুর্‌মার হয়ে গেল।

খাটের ধারে ছুটে গিয়ে বালিসে মুখ গুঁজ্‌ড়ে কাঁদতে লাগলুম—একদিন সেই ঘরে সেই বিছানাতেই শুয়ে, ফুলশয্যার ফুলের স্বপনে আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম।

সে দুঃখের রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে পুইয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ীতে সেই আমার শেষ রাত, স্বামীর বিছানায় শুয়ে সেই আমার শেষ কান্না!

পরদিন স্বামীর হুকুমে আমি বাপের বাড়ী ফিরে এলুম। বাবা আমাকে একটিও কটু কথা বললেন না, বরং আদর করে কোলে টেনে নিলেন। সমস্ত শুনে স্নেহভরে আমার মাথায় একখানি হাত রেখে বললেন, "বেশ করেছ মা! পুরুষ যদি সবল বলে দুর্ব্বল নারীর উপর অত্যাচার করে, নারী তাহলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না কেন? যে পূজার অযোগ্য, তাকে পূজা করলে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা থাকবে না।"

স্বামীকে আর-কখনো দেখি-নি, আর-কখনো দেখবও না। স্বামী-মানুষটির কথা ভাবলে এখনো মনে ভয়ের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু আসে না বটে, কিন্তু তবু, তবু... ...স্বামী-নামটি কি মিষ্টি!... ...

এখন মনে হয়, আমার বিবাহের জীবন একটি অনেক দিন আগে-দেখা স্বপ্নের মতন আবছায়া। এই এতবড় পৃথিবীটা, এই বিচিত্র সংসার, এই আশা-আকাঙ্ক্ষার ঢেউ—এ সমস্তই আমার জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি তা মনে করতেও পারি-না—মনে করলে বাঁচব কেমন করে? থেকে-থেকে আমি ভাবি, অতীতের দুঃস্বপ্ন নিয়ে বর্ত্তমান যেখানে ভবিষ্যতের পদশব্দে দাঁড়াবে, আমার জন্যে সেখানে নবজীবনের আনন্দ-সায়র নূতন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ে উথলে উথলে উঠ্‌ছে!

## আট

## মোহনের কথা

মুরারিবাবু আমার বাগান দেখে ভারি খুসী হয়েছেন।

বাড়ীর পিছনদিকে খানিকটা খোলা জমি বুনো ঘাস আর বিছুটির জঙ্গলে ভরে অমনি-অমনি পড়ে নষ্ট হচ্ছিল; মাঝখানে যে পুরাণো পানা-ভর্‌তি পুকুরটা ছিল, অব্যবহারে তারও এমনি হাল হয়েছিল যে, দুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় তিষ্ঠোয়, কার সাধ্য!

জমিটা পরিষ্কার আর পুকুরটার সংস্কার করে আমি এই বাগানখানি মনের মত করে গড়েছি। ভাল ভাল দামী ফুল-গাছ, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, পুরাণো গ্রীক আর্টের নকল-মূর্ত্তি প্রভৃতির জন্যে আমার খরচ হয়-নি বড় কম। কিন্তু খরচ করতে দরদ করি-নি বলেই আমার এ সাধের বাগানখানি ছোট হলেও শ্রী-ছাঁদে অনেক নামজাদা প্রকাণ্ড বাগানের তুলনায় নেহাৎ খাটো হবে না। আর, সুধু খরচ

করলেই ত হয় না—সেই সঙ্গে রুচিও চাই। এই উদ্যান-রচনা নিয়ে আমার আর হরেনের অনেক সময় কল্পনায়-জল্পনায় কেটে গেছে; কোথায় কোন্‌টি রাখলে দেখতে মানান-সৈ বা বেখাপ্পা হয়, তা-নিয়ে দুজনে অনেক মাথা খাটিয়েছি, অনেক তর্ক করেছি।

যত্নের জিনিষকে ভাল বললে মনে আনন্দ হয়। মুরারিবাবুর মুখে আমার বাগানের সুখ্যাতি শুনে আমি পুলকিত হয়ে বললুম, "আপনি ইচ্ছা করলে, যখন-খুসী আমার বাগানে আসতে পারেন। আপনার বাড়ী থেকে আমার বাগানে আসবার পথও আছে, সেটা আমি খুলিয়ে দেব অখন।"

মুরারিবাবু বালকের মত আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, "দেবেন? সত্যি?"

—"কেন দেব না? এ বাগান আপনারই মনে করবেন—ফুল তুলতে ইচ্ছে হয় ফুল তুলবেন—কোন সঙ্কোচ করবেন না।"

—"কি আশ্চর্য্য! ফুল তুললে আপনি চটে যাবেন না?"

—কেন? বাগানে এত ফুল ফোটে, আপনি দু-হাত ভরে নিলেও আমার ক্ষতি হবে না।"

আমার কথা শুনে মুরারিবাবুর ফূর্ত্তি দেখে কে! এই সদানন্দ খোলা-প্রাণ বৃদ্ধের ভাবে-ভোলা মনটি যতই দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। যে বয়সে লোকে স্বার্থভরা সংসারের হাড়হদ্দ বুঝে নেয়, পদেপদে ঠকে দুঃখ-শোকে ভুগে সাবধানী ও কঠিন হয়ে ওঠে, সে বয়সেও যাঁদের প্রাণ এমন শিশুর মতন সাদা থাকে, তাঁরাই ত যথার্থ খাঁটি মানুষ!

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বাগানের দিক থেকে কার ভৈরবীতে-বাঁধা বেহালার তরল রাগিণী, ভোরের আলোর সঙ্গে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। বুঝলুম, এ আর কারুর নয়, মুরারিবাবুর বেহালা! শুয়ে-শুয়ে একমনে অনেকক্ষণ ধরে শুনলুম, সুরের লীলায় সুরের জোয়ারে প্রাণ যেন কানায়-কানায় ভরে উঠল!

শয্যাত্যাগ করে হাত-মুখ ধুয়ে যখন বাগানের ভিতরে গেলুম, মুরারিবাবুর বেহালা তখনো তালে তালে বাজছে। পুকুরের ধারে মার্ব্বেলের বেদীতে বেহালাখানা বাঁকিয়ে ধরে বৃদ্ধ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, তাঁর কর্পূরের মত সাদা, দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে থর্‌থরিয়ে উঠছে, তাঁর সুরে-বিভোর মুখখানি বুকের পরে নুয়ে পড়েছে,—তিনি যেন তখন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীকে ভুলে গেছেন। যতক্ষণ না বাজনা থামল, আমি তফাতে দাঁড়িয়ে প্রভাতী রাগিণীর সেই বিচিত্র উল্লাস প্রাণ-ভরে কাণ-ভরে পান করতে লাগলুম।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে মুরারিবাবু বাজনা থামালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম।

মুরারিবাবু স্মিতমুখে বললেন, "আমার বাজনায় আপনি বিরক্ত হন-নি ত?"

—"বিরক্ত! আপনার বাজনা আমার আজকের ভোরবেলাটিকে সার্থক করে তুলেছে।"

—"হাতে কোন কাজ ছিল না, তাই

কি আর করি, বেহালাখানা কাঁধে করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।"—বলে, মুরারিবাবু বেহালার তন্ত্রীগুলির উপরে একবার আঙুল চালিয়ে দিলেন,—তারা একসঙ্গে বিচিত্র কোমল রিক্তিনীতে আর্ত্তনাদ করে উঠল,—সে যেন সুরের বিদ্যুৎ!

আমি বললুম, "মুরারিবাবু, আপনার কাছে আমার একটি আর্‌জি আছে।"

মুরারিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে আপনার আরজি? বলুন, বলুন!"

—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলতে পারি।"

—"কি আশ্চর্য্য! বলুন, বলুন!"

—"আমি আপনার কাছে এস্রাজ শিখতে চাই, এতে আপনার কোন কষ্ট হবে-না ত?

মুরারিবাবু ত হো-হো করে হেসেই আকুল! অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, "রক্ষে পাই! এই আপনার আরজি? এতে আবার কষ্ট—অ্যাঃ!—এতে আবার কষ্ট কি, এ ত আনন্দের কথা!"

এমন সময় হরেন এসে হাজির।

মুরারিবাবু খুব খুসী হয়ে বলে উঠলেন, "আরে আসুন, আসুন হরেনবাবু!"

হরেন ধুপ্ করে হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবীর বোতামগুলো খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে, "আনন্দের কথা কি হচ্ছিল মুরারিবাবু? সে আনন্দে কি আমিও ভাগ বসাতে পারব না?"

মুরারিবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "অবশ্য, অবশ্য! আনন্দের কথাটা কি জানেন, আমাদের মোহনবাবুর সাধ হয়েছে উনি এস্রাজ শিখবেন। আপনিও কি শিখতে চান?"

হরেন দুই চোখ বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠল, "ওরে বাস্ রে, সঙ্গীত-চর্চ্চা! এ জন্মে ত নয়ই, আসচে জন্মে পারি ত দ্যাখা যাবে!"

মুরারিবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন! মানুষ যে সঙ্গীত-চর্চ্চায় ভয় পেতে পারে, এটা যেন তাঁর ধারণার অতীত ছিল! তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! সঙ্গীতের মত বিদ্যা কি আর আছে? সুতরাং—"

হরেন প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "এর মধ্যে সুতরাং টুতরাং কিচ্ছু নেই মুরারিবাবু! ছেলেবেলায় একবার আমার ওস্তাদ রেখে গান শেখবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ঝাড়া একবৎসর ধরে সা-রে-গা-মা সেধেও যখন ষড়জ রেখাব ও গান্ধার প্রভৃতির মধ্যে তফাৎ কোথায় সেটা ধরতে পারলুম না, আমার ওস্তাদজী তখন মাইনে নিয়েও আর আমাকে গান শেখাতে রাজি হলেন না। কাজে-কাজেই সেইদিন থেকে আমি গান-বাজনা শুনতে ভালবাসি, কিন্তু গাইতে বা বাজাতে চাই না। আমি চিনি খেতে চাই, কিন্তু চিনির পুতুল হোতে চাই না।"

আমি বললুম, "আপনি হরেনকে এখনো চেনেন-নি মুরারিবাবু, ও মহা ষণ্ডামার্কা! ও চায় গায়ের জোরে বীণাপাণিকে বশীভূত করতে! ধরুন, আপনি ওকে বেহালায়

সুর বাঁধতে দিলেন। কিন্তু ও হয়ত সুর বাঁধতে বসে বেহালার সমস্ত কাণগুলো এক সঙ্গে চেপে ধরে চড়্‌চড়্ করে এমনি মোচড় লাগিয়ে দেবে যে, সে বেহালার মধ্যে আর-কোন পদার্থ থাকবে না!"

—"মোহন আমাকে যথার্থরূপে চিনেছে মুরারিবাবু, সুতরাং ওর কথার প্রতিবাদ করতে চাইনা। অক্ষম ঔপন্যাসিক যেমন ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ায়, গায়ক হোতে না পেরে আমিও তেমনি পালোয়ান হয়ে পড়েছি! বুঝেছেন মুরারিবাবু, ও গান-বাজনা আমার কর্ম্ম নয়। মোহন গাইতে জানে, বাজনাটাও যদি আপনার দৌলতে শিখে নিতে পারে, শিখুক।"

—"বটে, বটে! মোহনবাবু গাইতে জানেন?—সুতরাং—" মুরারিবাবু মহা-উৎসাহে আমার দিকে ফিরে একেবারে বেহালা বাগিয়ে বসলেন।

আমি অনেক আপত্তি করলুম, কিন্তু সে সব আপত্তি বৃদ্ধের প্রবল উৎসাহের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে গেল! অগত্যা আমি বাধ্য হয়ে একটি গান ধরলুম; মুরারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে বাজাতে লাগলেন।

গান শেষ হলে, মুরারিবাবু উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর গান থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত রাখছিলেন? মা সরোকে গিয়ে বলতে হবে ত, সে যে গান শুনতে বড় ভালবাসে!"

এই সুরসিক বৃদ্ধকে নিয়ে আজ প্রভাতটি যে কোথা দিয়ে চমৎকার কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলুম না।

সে পূর্ণিমার রাত।

ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলুম, হাস্‌না-হানার গন্ধ মেখে দখিনা বাতাস এসে সারা ঘর মাৎ করে দিলে।

চেয়ারখানা জানলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়লুম,—এমন সুন্দর চাঁদনী রাত! এ রাত্রি উপভোগ করবার—ঘুমিয়ে কাটাবার নয়! জ্যোৎস্না যখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিয়রের কাছটিতে এসে সত্য-স্বপনের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তাকে খানিকটা না দেখে যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, সে হয় অন্ধ নয় গণ্ডমুর্খ!

আমার নিরিবিলি বাগানখানিকে দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ছবির মত—দখিনায় টল্‌মলে গাছের পাতায় ঝল্‌মলে আলো, তলায় ঘুমন্ত ছায়া; পুকুরের থর্‌থরে জলে, মার্ব্বেলের ধব্‌ধবে ঘাটের কোলে-কোলে ঢেউয়ের আসা-যাওয়া আর ছল্‌ছলানি কাণাকাণির সঙ্গে আলো-ছায়ার ছিনিমিনি খেলা চলেছে!

ঘাসে-ভরা একটুখানি খোলা জমির মাঝখানে ভেনাসের একটি মর্ম্মর প্রতিমা বসিয়ে দিয়েছি। এ ভেনাস হচ্ছেন গ্রীকদের রতিদেবী, আলো-আঁধারে আজ্‌কে রাতে তাঁর শুভ্র মর্ম্মর-শ্রীটুকুও যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে!

এ পাষাণী প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে, ও কে? ভাল করে দ্যাখবার জন্যে সামনে আরো ঝুঁকে পড়্‌লুম,—এ যে রমণী! মুরারিবাবুর মেয়ে, সরমা!

সরমার মুখের একদিকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, তার মাথার চুলগুলি খোঁপার বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে এঁকে-বেঁকে বুক-

পিঠ-কাঁধের উপর এলিয়ে পড়েছে, তার নরম দেহখানিকে জড়িয়ে কাপড়খানি ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পায়ের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। হাতে তার আঁচল, আঁচলে একরাশ ফুল—গুটিকত ফুল আঁচল উপ্‌ছে মাটিতে ঝরে পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই জ্যোৎস্না-প্রোজ্জ্বল স্তব্ধ রাত্রে যেন কঠিন পাষাণ ভেদ করে ভেনাসের পেলব আত্মা মূর্ত্তি ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে;—আর তারই দুখানি নধর চরণের মধুর স্পর্শ পেয়ে পুলকাঞ্চিত ধরণী আজ ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে!

সরমা ভেনাসের মূর্ত্তিটিকে অবাক মুখে দেখতে লাগল; তারপর সেই মূর্ত্তিটির গায়ে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।... ...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে আঁচল থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে একবার সে নাকের কাছে ধরলে··· ···তারপর, তার সেই চুম্বনাস্পদ ওষ্ঠাধর নত করে ফুলের পাপ্‌ড়ির উপর একটি আদরের চুম্বন দান করলে!...ফুলটি তার হাত থেকে খসে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—সেই সোহাগ-মাখা এক চুম্বনেই কি তার পুষ্প-জীবনের সার্থক অবসান?··· ···আরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, সরমা আস্তে আস্তে নিজের বাড়ীর পথে চলে গেল,—যেখান দিয়ে গেল সেখানটি আলো করে', যেখান থেকে গেল সেখানটি আঁধার করে'! তাকে হারিয়ে বাগানভরা জ্যোৎস্নার দীপ্তি যেন পরিম্লান হয়ে পড়ল।

সে রাতে আমার ঘরখানাকে মনে হোল যেন, বিজন বন। আমার একাকীত্ব এমন গভীর ভাবে আর কোনদিন ত অনুভব করি-নি!

উপন্যাসে 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' হোতে দেখলে সমালোচকরা যৎপরোনাস্তি চমকে ওঠেন। আমার বিশ্বাস, এই সমালোচকদের প্রথম দৃষ্টি এমন একটা-কিছুর উপর পড়েছিল, যা ক্ষণকাল দেখলেই চিরকাল চক্ষু বুঁজে থাকতে ইচ্ছে করে। সমালোচকরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন, তার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে নায়ক-নায়িকার প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ে চিত্তবিপ্লবের অগুন্তি কাহিনী!

প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে প্রেম না হোক, লোকে মুগ্ধ আর লুব্ধ হয়ে ওঠে বৈকি! সেই মোহ, সেই লোভই হচ্ছে প্রেমের প্রথম ধাপ এবং এই প্রথম ধাপে যে না উঠতে পারে প্রেম হচ্ছে তার কাছে, বামনের চাঁদ!

সরমা প্রথম দিন থেকেই আমাকে আকর্ষণ করছে, অথচ আমার জীবন-পথে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত অতিথি! আগে যাকে ভেবেছিলুম সুলভ, এখন তাকে দুর্ল্ভ জেনেও আমার এ বাঁকা মনকে ত সোজা করতে পারছি না; এ মন এখন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতন, এর বল্গাকে আল্গা করা এখন আমার সাধ্যের বাইরে।... ...সরমা একদিনেই আমার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে।

কিন্তু, জানিনা এ পরিবর্ত্তনের পরিণাম কোথায়? আগুন ত ডাকে না, পোকা-মাকড় যে যেচে এসে পুড়ে মরে। পতঙ্গ আসে,

রঙ্গ করে' সঙ্গ চায়—কিন্তু অগ্নি যে নির্ব্বিকার! তার রূপের তাপে পিয়াসীর বুক পুড়ে খাক্ হয়ে যায়—আগুণের শিখা একটু কাঁপে, কিন্তু নেবে না।

সরমা কি আগুণ, আমি কি পতঙ্গ? না, সে হবে নদী আর আমি হব, সাগর? সেইখানে বসে-বসে অনেক ভাবলুম, কিন্তু সে ভাবনা দ্রৌপদীর সাড়ীর মত—তার আরম্ভ আছে, প্রান্ত নাই; যত নাড়াচাড়া করি, তত বেড়ে যায়।

যৌবনের মত্ততা হচ্ছে বসন্তের ফুলের মতন; নিদাঘ এলেই খর রোদের ঝাঁঝে সে বেরঙা হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আমার এই মাদকতাও কি তেমনি ক্ষণিক? একি সুধু চোখের নেশা,—প্রাণের তৃষা নয়?... ...

ক্রমে মাথাটা ভারি হয়ে উঠ্‌ল, কাতরভাবে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম।... ...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্নেও দেখলুম, সরমাকে।

নয়

## মুরারিবাবুর কথা

কি আশ্চর্য্য! এই মোহন-ছেলেটিকে ভাল করে যতই দেখচি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি; এর মধ্যে সত্যই পদার্থ আছে।

মোহনের ইচ্ছা, আমি তাকে এস্রাজ শিখাই, আর তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু গুরুদক্ষিণা নি।

আমি আপত্তি করাতে সে বললে, "মুরারিবাবু, এতে আপনার লজ্জিত হবার কিছু ত নেই! আপনি মিছিমিছি আমার জন্যে কেন সময় নষ্ট করবেন?"

আমার কোন আপত্তি টিকল না। শেষটা এই ঠিক হোল যে, আমি তার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেব-না বটে, তবে যে বাড়ীতে আছি, সে বাড়ীর ভাড়াও তাকে একপয়সা দেব না। যদিও হাতে-করে টাকা নেবার চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পেলুম, তবুও হরে-দরে সেই হাঁটু-জলই রয়ে গেল! যাক্, এ বন্দোবস্তটা তবু মন্দের ভাল!

মোহন আর-একটা রফা করে নিলে, এখন থেকে সে যখন আমার শিষ্যই হোল, তখন আমার পক্ষে তাকে 'বাবু' বা 'আপনি' বলে ডাকাটা অশোভন হবে। সুতরাং—

আজকাল দিনগুলি কাটছে বেশ। রোজ বিকালে হরেনবাবু এসে যখন আসর জাঁকিয়ে বসেন, তখন সময় যেন হাওয়ার আগে কোথা দিয়ে উড়ে যায়। হরেনবাবু ঠিক একটি মূর্ত্তিমন্ত আনন্দের ঝড়ের মতন; যেখান দিয়ে যান, দুঃখ-তাপ যেন তাঁর হাসির তোড়ে শুষ্ক পাতার মত উড়ে যায়!

হরেনবাবুকেও আমার খুব মনে ধরেছে। এই যুবাটির ভিতরে প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে। বাইরের চেহারার মত এঁর ভিতরের মনটাও মস্ত ডাগর। প্রথম দিনেই ইনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সেদিনকার মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি আজ পর্য্যন্তও ভুলতে পারি-নি। বিধবার দুঃখ নিয়ে বাস্তবিকই তিনি অনেক ভেবেছেন।

কিন্তু বিবাহ দিলেই যে দুঃখ ঘুচবে, তাও ত নয়! সধবা হোক, বিধবা হোক, কু-বিবাহ কি ভয়ানক! তার চেয়ে চির-

কুমারী থাকা ভাল—তার চেয়ে চির-বিধবা থাকাও ভাল! সরমারও ত বিবাহ হয়েছিল, সধবা থাকলে আজ হয়ত সে বেঁচেই থাকত না! তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বৈধব্য ত তার পক্ষে শাপে বর!

দেশে আজকাল বিধবা-বিবাহ নিয়ে নতুন করে আন্দোলন জেগে উঠেছে। আসল যুক্তি-তর্কের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিক থেকে যাচাই করে দেখলে বলতে হয় যে, প্রাচীন ও নবীনের এই বিরোধে নবীনেরাই জয়লাভ করেছেন। তবে যে বিধবা-বিবাহ দেশব্যাপী হতে পারছে না, এর আসল কারণ হচ্ছে, অনভ্যাস। শত শত বৎসর ধরে আমরা যে আদর্শ নকল করতে অভ্যস্থ হয়েছি, দু-দশ বৎসরের আন্দোলনে সে অভ্যাস ছাড়তে পারা শক্ত কথা। মানুষ যে অভ্যাসের গোলাম! শরীরের অনিষ্ট হচ্ছে জেনেও, মরণের ভয় আছে জেনেও নেশাখোর যেমন নেশা ছাড়তে পারে না, এও তেমনি। ব্যক্তি-বিশেষের এই দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষেও খাটে; কেননা সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বলে ব্যক্তির সাধারণ গুণ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

হরেনবাবুর সঙ্গে সেদিন এই কথাই হচ্ছিল।

হরেনবাবু বললেন, "এর মধ্যে আরো-একটা কথা আছে মুরারিবাবু! বিধবাদের যাঁরা অভিভাবক, উচ্চ আদর্শের মোহে তাঁরা অন্ধ। সংসারের লোভ, ভোগ ও পাপে অটল থেকে বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করবেন, এ-বড় উচ্চ আদর্শ। আমি বলি যাঁরা স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে আদর্শ-জীবন লাভ করে' নারীত্বকে দেবীত্বে তুলতে পারেন, তাঁরা দেবী হোন—সে ত ভাল কথা। কিন্তু অনেক বিধবাই,—যে বয়সে তাঁদের ভোগের স্পৃহা মেটে-নি, যখন তাঁরা জীবনকে ভাল করে' চেনেন-নি—তখনই স্বামীকে হারিয়েছেন। নারীত্ব লাভ করবার আগে যে সব অজ্ঞান অভাগা বালিকা স্বামীহারা হয়, তাদের ঘাড়ে মাকালফলের ঝুড়ীর মত ফাঁকা ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপিয়ে কী লাভ? ব্রহ্মচর্য্যের গুরুত্ব তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে, না বুঝেই গ্রহণ করে। ফলে তাদের দেবীত্ব অর্জ্জন করা ত হয়ই না, উল্টে অনেক সময় নারীত্বও বর্জ্জন করতে হয়। সমাজের বাইরে ঐ যে অগণ্য পতিতা পড়ে রয়েছে, খোঁজ করলে জানবেন, ওদের পতনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারের প্রবৃত্তি নয়—হয় স্বামীর অত্যাচার, নয় ত বৈধব্যের যন্ত্রণা!"

কথাগুলি খুব খাঁটি। তর্ক করে' এ সত্যকে মুখে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি বটে, কিন্তু মনে-মনে ত অস্বীকার করতে পারি না। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম।

হরেনবাবু এই বলে তাঁর কথা শেষ করলেন, "জানবেন, আদর্শ জিনিষটা বড় বিষম। মানুষের অপূর্ণতার মূলাধার হচ্ছে, যত-সব কল্পিত আদর্শ। কারণ, যা সাধারণ তা-নিয়ে ত আদর্শ গড়া হয় না, আদর্শ তখনি উচ্চ হয় যখন সে অসাধারণ। উচ্চ আদর্শ হচ্ছে হিমালয়ের 'গৌরীশঙ্করে'র

মত, তফাৎ থেকে দেখতে লাগে ভাল —কিন্তু তার কাছে ঘেঁসা সামান্ত মানুষের সাধ্যাতীত। আর দুনিয়ার সাড়ে তিন ভাগ মানুষই যখন 'সামান্তে'র দলে, তখন বাকি অর্দ্ধভাগ 'অসামান্ত' লোকের মুখ চেয়ে ত আর-সকলকে জবাই করা চলে না!"

কি আশ্চর্য্য! এই তরুণ যুবার জ্ঞান ও কথা কইবার চমৎকার ভঙ্গী যে অনেক পক্ককেশ মহামহোপাধ্যায়কে লজ্জা দিতে পারে! এ-সব সত্য ত তাঁদের মাথায় ঢোকে না! তাঁরা শাস্ত্রের বাঁধা বুলি ছাড়া এক পাও নড়েন না, অথচ তাঁদের দেশেই প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতরা বলে গেছেন, 'যুক্তির সাহায্য না নিয়ে কেবল শাস্ত্রের বিধান-অনুসারে কখনো কর্ত্তব্য-নির্ণয় করবে না,—তাতে ধর্ম্মহানি হয়'।

হরেনবাবু যেদিক দিয়ে কথাটা তুলেছেন, সেদিক থেকে আমার কিছুই আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু আমার মনে খট্‌কা লেগে আছে অন্য জায়গায়। আমি বললুম, "হরেনবাবু, বিবাহ হলেই যে বিধবার জীবন সফল হয়ে উঠবে, তাও ত নয়! সরমার বিবাহের কি ফল হয়েছিল, শুনেছেন ত? সুতরাং—"

—"শুনেছি। কিন্তু আপনি গোড়াতেই একটা ভুল করছেন। অমঙ্গলই বিবাহের স্বাভাবিক পরিণাম নয়—সংসারে মঙ্গল আনাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি যদি ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনার মেয়ের বিবাহ দিতেন, তাহলে হয়ত তিনি অমন কুচরিত্র স্বামীর হাতে পড়তেন না।"

—"প্রথম বারে যা পারি-নি, এবারেও হয়ত তা পারব-না। তাই ইচ্ছে থাক্‌লেও সরমার আবার বিয়ে দিতে আমি ভয় পাই।"

—"ভয় পেলে ত চলবে-না মুরারিবাবু! আপনার কর্ত্তব্য আপনি করে যান। মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে—ভবিষ্যৎ দেখে নয়; ভবিষ্যৎকে দেখা গেলে বিশ্বের ধারা বদ্‌লে যেত। আপনি ভবিষ্যৎ চোখে দেখতে না পেলেও ভেবে দেখতে ত পারেন!"

—"ভবিষ্যৎ ভেবে যা দেখছি হরেন-বাবু, তাতে আমার হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি আজ চোখ বুঁজি, তাহলে সরমা কাল কোথায় থাকবে? সে বিধবা, সে সংসারকে চেনে না, সে একাকী; তার বয়স অল্প—আর এই পৃথিবী প্রলোভনে ভরা! ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার!"

—"এ-ক্ষেত্রে আপনার মেয়েকে আপনি কি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-পালন করাতে চান?"

—"কি আশ্চর্য্য! সে যে অসম্ভব!"

—"তবে?"

—"মনের মত পাত্র পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তার আবার বিবাহ দিতে চাই।"

—"তাহলে এইবেলা থেকে পাত্র সন্ধান করুন।"

—"কিন্তু সুপাত্র কোথায় পাব?"

—"সেইটেই ত দেখা দরকার! ধরুন, আমাদের মোহন। এইরকম একটি পাত্র দেখুন। আপনার মেয়ে সুখে থাকবেন।" —এই বলে হরেনবাবু হঠাৎ কথা বন্ধ করে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মোহনের মত পাত্র! কি আশ্চর্য্য! বিদ্যায় চরিত্রে ধনে মানে এমনধারা সুপাত্র

আর কোথায় আছে, যে সমাজের ভয় না রেখে, বিধবাবিবাহ করবে? হরেনবাবু যা বললেন, সেটা যে কত-বড় অসম্ভব ব্যাপার, তা বোধহয় তিনি ভেবে-চিন্তে দেখেন-নি।

কিন্তু, আর দেরি করলেও ত চলবে না। দিনে দিনে দিন চলে যাচ্ছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, দেহ নুয়ে পড়ছে—হঠাৎ কবে পরকালের ডাক আসতে পারে, কে জানে? আজও সময় আছে, আজ না বুঝলে হয়ত কাল অসময় এসে পড়বে। ঐ নির্ম্মল ফুলের মত পবিত্র সরমা, আজও সে দেবপূজার উপযুক্ত,—কিন্তু কাল?... ...আজ যা দেবতার যোগ্য, কাল হয়ত তা দানবের ভোগ্য হবে!... আজ আলো, কাল অন্ধকার!

... ...তবে, হ্যাঁ—একটা কথা! আমি নিজে ত এত ভাবছি, কিন্তু সরমার দিক থেকে কিছু ভেবেছি কি? তার মন কোন্‌দিকে? সে কী চায়? একটা আদর্শের শূন্যতা তার সমস্ত জীবন পূর্ণ করে তুলতে পারবে ·· ...কি পারবে না?

প্রথম বিবাহের সময় তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার দরকার হয়-নি, তখন সে বালিকামাত্র—নিজের ভাল-মন্দ কিছুই বুঝত না। কিন্তু এখন সে বালিকাও নয়, নাবালিকাও নয়। এখন সে আপনাকে চিনতে পেরেছে, আপনার চরিত্র বুঝেছে, আপনার ভবিষ্যৎ বুঝেছে। এখন সকলের আগে তার মত নেওয়া দরকার। সে যদি বলে 'না'—আমিও তাহলে জোর করে ত বলতে পারব না, 'হাঁ'।

অকূল-পাথার ভাবছি, এমন সময়ে পিছন থেকে দুখানি নরম হাতে কে আমার গলা জরিয়ে ধরলে। এ আর কেউ নয়—আমার প্রাণপুতলী সরো-রাণী!

সরমা আদর করে আমার মাথার উপর তার মুখখানি কাত্ করে রেখে বললে, "হ্যাঁ বাবা, এমন করে বসে-বসে কি ভাবছ বল দেখি!"

আমি দু-হাতে তার মুখখানি ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে আনলুম। বললুম, "কি ভাবছি, শুনবি মা?"

সরমা আশ্চর্য্য হয়ে তার বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল—কিছু বললে না।

হায়রে কপাল, এই ডাগর-ডাগর ঢল্‌ঢলে চোখদুটিতে এখনো যে শিশুত্বের ভাব মাখানো!... ...

এই সরল চোখে আমার সরমা কি কুটিল সংসারের অন্ধকার দেখতে পেয়েছে? তা কি সম্ভব?

সংসারের আনন্দ যে সুধার মত পান করছে, তাকে আমি পিতা হয়ে কোন্‌-প্রাণে বল্‌ব যে, এ সুধা নয়—এ বিষ! তার যেটুকু সুখ আছে, সেটুকুও ঘুচিয়ে দেব কেমন করে?

সরমা বল্‌লে, "চুপ করে রইলে কেন? কি ভাবছ, কৈ বললে না ত বাবা!"

ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তোর কথাই ভাবছিলুম মা!"

সরমার মুখের ভাব অম্‌নি বদ্‌লে গেল, তার চোখের আলো নিবে গেল—তার প্রাণের ভিতরে ভবিষ্যতের যে আঁধার

দিনে দিনে জমে উঠ্‌চে, তারই আভাসে যেন তার আলো-করা মুখখানি কালো হয়ে গেল! থতমত খেয়ে থেমে-থেমে সে বললে, "আমার—আমার কথা!"

—"না—না—আমি কিছু ভাবি-নি মা, কিছু ভাবি-নি"—বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলুম! হা ভগবান, এ কথা কি মুখ ফুটে তাকে বলা যায়! (ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# সেকালের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

## আহারের সময় ও ভোজন-বিধি

সেকালের গৃহস্থেরা অনেকেই পর্ণশালায় বাস করিতেন বলিয়া অগ্নি-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। (১) গ্রীষ্মকালে তখন দিবাভাগকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইত। ইহার মধ্য-দুই-অংশে রন্ধনাদি নিষিদ্ধ ছিল। বেলা ৯।১০ ঘটিকার মধ্যেই রন্ধনাদি শেষ হইত বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিত, তাহাকে এক পণের অষ্টমাংশ জরিমানা দিতে হইত—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে গৃহস্বামী দ্বিপ্রহরেও বাটীর বাহিরে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তবে কামসূত্রে দেখা যায় "মহানস (রন্ধন-শালা) সুগুপ্ত হইবে", সুতরাং বাটীর বাহিরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রন্ধনাদির ব্যবস্থা ছিল না।

অতিথি-আগন্তুকের জন্য গো-দোহন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। শিশু, পিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা নারী (২) বৃদ্ধ, গর্ভিনী, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কুমারী (৩) অতিথি ও ভৃত্যগণকে অগ্রে ভোজন করাইয়া তাহার পর স্বামী, স্ত্রী,—গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রী—

(১) সেকালে কিছু যন্ত্রচালিত দ্রুতগামী দমকলের ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থকেই অগ্নিদাহ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান থাকিতে হইত। পাঁচটি জলপূর্ণ পাত্র (পঞ্চ ঘটীনম্) এক একটি কুম্ভ দ্রোণ (সুবৃহৎ কাষ্ঠময় জলাধার) চিমটা ও চর্ম্মথলি (মশক) এবং একখানি করিয়া মই, সূর্প (কুলা) ও ধাতুময় আঁকড়া সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে গৃহস্থকে অর্দ্ধ পণ করিয়া জরিমানা দিতে হইত।

(২) সেকালে আর্য্যগণের সহৃদয়তার অভাব ছিল না। বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখা যায়। রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ বা বর (bride-groom) প্রভৃতিকে যেমন পথ ছাড়িয়া দিতে হইত, সেইরূপ, বৃদ্ধ, ভারবাহী, স্ত্রীলোক বা রুগ্ন ব্যক্তিকেও পথ ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ১১৭)

(৩) অতিথি-সেবাও সেকালের গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অতিথি আসিলে জাতি-নির্ব্বিশেষে তাহাকে সাধ্যমত খাদ্যাদি দিতে হইত। কোন অনাহূত অতিথি রাত্রিকালে আসিয়া উপস্থিত

ইঁহারা ভোজন করিতেন (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় শ্লোক ১০৫)। বিশ্বদেবের পূজা হইবার পূর্ব্বেও ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। মনুসংহিতায় আছে যে অতিথি, বৃদ্ধ, শিশু এবং দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট রাখিলে গৃহস্বামীর পারলৌকিক মঙ্গল হয়। স্বামী-পরিত্যক্তা পিতৃগৃহবাসিনী নারীগণকে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করাইবার নিয়মটি বড় সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ইহা অনুসৃত হইলে এই সকল মন্দভাগিনী আশ্রিতাগণের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে না এবং গৃহে অশান্তি ঘটিবার আশঙ্কাও অল্প থাকে। স্ত্রীর সহিত একত্রে বা উচ্চাসনে বসিয়া বা বহু লোকের সম্মুখে আহার নিষিদ্ধ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যে একবস্ত্রে আহার, বা দণ্ডায়মান হইয়া আহার সম্বন্ধেও নিষেধ দেখা যায় (৪) বহুজন যেখানে অন্নদান করে, সেস্থানে অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ, এইরূপ একটি শ্লোক কূর্ম্ম পুরাণেও দেখিতে পাই (বিংশ অধ্যায় বঙ্গবাসী সংস্করণ)। স্বামীর সহিত একত্রে বা তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীলোকেরা এখনও আহার করেন না; তবে স্বামীর আহারের সময় নিকটে বসিয়া ব্যজনাদি করা এখন আর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্ত্রীর সম্মুখে আহার করাও যে নিষিদ্ধ, তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৩১)। প্রাচীন ইহুদি শাস্ত্রেও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসিয়া আহার সম্বন্ধে নিষেধ দেখা যায়; (৫) কিন্তু সাধারণতঃ ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, (que les hommes et les femmes soient séparés dans les festins á cause de la chaleur du sang et de l'animation du bon vin) তাহা আমাদের দেশে খাটে বলিয়া মনে হয় না। খাদির গৃহ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, রন্ধনাদি সমাপ্ত হইবার পর স্ত্রী পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে আহারের জন্য স্বামীকে "ইহা প্রস্তুত" বলিয়া আহ্বান করিবেন এবং স্বামী প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর নিম্ন স্বরে "কোন অনটন না ঘটে" এই কথা বলিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলি-পূজাদির ব্যবস্থা করিবেন। সাহেবদের মত জুতা পায়ে দিয়া বা মুসলমানের মত বিছানায় বসিয়া আহার ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। (পরাশর, ৬ অধ্যায়)। কেহ কেহ বলেন, আধুনিক জৈন মাড়োয়ারী-দিগের ন্যায় ত্রিপদিকের উপর থালা

---

হইলেও তাহাকে জল, ভূ, তৃণ ও মিষ্ট কথার দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইত (মনুসংহিতা)। অতিথির সন্তোষ-বিধানের জন্য গৃহীকে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইত। অতিথি সন্তুষ্ট হইলে গৃহী ইন্দ্র লোকে গমন করে, মনুসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এমন কি অতিথির অনুমতি-ব্যতিরেকে বেদপাঠও নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) ইহার অর্থ "হোটেল" প্রভৃতিতে খাওয়া নিষেধ, এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

(৫) That the men and the women be seated separate in the feast because of the heat of the blood and the animation due to good wine. Erckmann chatrian তাঁহার

রাখিয়া খাওয়া আচার-বিরুদ্ধ ছিল না। আমার জনৈক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু "হরিভক্তি-বিলাসে" এরূপ ত্রিপদিক বা low tripod standএর উল্লেখ পাইয়াছেন। উষ্ণ অন্ন ব্যতীত ঠাণ্ডা বা বাসি দ্রব্য ভোজন শাস্ত্রানুমোদিত নহে; বিশেষতঃ স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অগর্হিত ভোজ্য এবং যজ্ঞাবশেষ খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যুসিত হইলেও কিঞ্চিৎ হবি সংযুক্ত করিয়া আহার করা চলিত। যব বা গোধূম চূর্ণ হইতে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি এবং সকল প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বাসি হইলেও খাওয়া নিষেধ ছিল না (মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়—২৪, ২৫)। পূর্ব্ব দিনে প্রস্তুত বাসি মিষ্টান্ন টকিয়া গেলে আর তাহা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না। কাক প্রভৃতি পক্ষী চঞ্চু স্পর্শ করিলে বা কুকুরে মুখ দিলে সে ভাত আর খাওয়া হইত না; তবে বিড়ালের বা ভেকের স্পর্শে কোন দোষ ঘটিত না। স্পর্শ-দোষ-সম্বন্ধে এতখানি সতর্ক থাকিলেও সেকালের গৃহস্থেরা বৃথা অন্ন অপব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। দ্রোণ বা আঢ়ক পরিমাণ অন্নে কুকুরে বা কাকে মুখ দিলে বা গবাদিতে ঘ্রাণ লইলে তাহার সমস্তই পরিত্যক্ত হইত না, কেবল যেখানে মুখ দিয়াছে সেই স্থানের চারিটি ভাত ফেলিয়া দিলেই চলিত। অবশিষ্ট অন্নের উপর অল্পজলে সোনা ধুইয়া সেই জল ছিটাইয়া গরম করিয়া লইলেই পুনরায় তাহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল না। (পরাশর সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৭, ৬৯, ৭০)। অন্নের সহিত মাছি বা কোন পতঙ্গ পাওয়া গেলে সে অন্নও বর্জ্জিত হইত না। জলে ধুইয়া ভস্ম স্পর্শ করাইয়া পুনরায় তাহা আহার করা চলিত (ঐ, ৬২)।

## ধূমপান

ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা চরক সংহিতা (সূত্র স্থান অধ্যায় ৫) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন (J. B. O. R. S. Vol. II. Part, p. 147) যে দিবসে দুইবার ধূমপান করার নিয়ম ছিল। কুলার্ণব তন্ত্রে তাম্রকূট, অহিফেন, ধুস্তুর প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি দ্রব্যের অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত কাদম্বরী গ্রন্থে রাজার ধূমপান-প্রসঙ্গে যে পরিপীত ধূমবর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়, ডাক্তার গঙ্গানাথের মতে তাহা চরক-সংহিতোক্ত উপকরণেই প্রস্তুত হইত। ইহাতে বত্রিশ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু তাম্রকূট বা অহিফেনাদির কোনরূপ সংস্রব থাকিত না। ধূমবর্ত্তি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল হইত; আকৃতিতে অনেকটা "সিগার"-এর মত। একপ্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া অপর প্রান্ত মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া ঠিক আধুনিক উপায়েই ধূমপান করা হইত। দুর্ব্বল ও ক্লান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল।

## গৃহস্থালী ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য

শুধু গৃহ অথবা তৈজসাদি এবং বেশভূষা ও আহার-পানের কথা বলিলেই গৃহস্থালীর কথা শেষ হয় না। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে সেকালের সংসার-যাত্রার প্রণালী

সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা করাও কঠিন হইয়া উঠে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (শ্লোক ৮৩—৮৪) যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকেরা সংসারের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিবে, গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে নিপুণা হইবে, খরচ-পত্র সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হইবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিবে এবং ভর্ত্তৃতৎপরা হইবে; স্বামীর অনুপস্থিতিতে ক্রীড়াদি, শরীর-সংস্কার, সমাজোৎসব-দর্শন (witnessing of social festivities) হাস্য-পরিহাস ও পরগৃহে গমন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। পতি-প্রিয়-হিতে-যুক্তা রমণী ইহ লোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করেন, এ কথাও পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ কামসূত্রেও বিস্তারিতভাবে ভার্য্যাধিকরণ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যথাকালে তাহার আলোচনা করিব।

## প্রাচীন সাহিত্যে গৃহস্থালীর চিত্র

গৃহস্থালীর ভার, বোধ হয়, জগতের আদি কাল হইতেই মহিলাগণের উপর ন্যস্ত। ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে উহা অন্যূন ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। (৬) আজকাল পাশ্চাত্য দেশে গার্হস্থ্য নীতি বা রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলে মহিলা বিদ্যালয় হইতে যেরূপ ডিপ্লোমা, পদক ( medal ) প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, সেকালে সেরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও গৃহস্থালী-কর্ম্মে নিপুণা রমণীর সুখ্যাতির অভাব ছিল না। ঋগ্বেদের একজন ঋষি (৭) নিজের পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছেন, "আমি স্তোতা, আমার পুত্র চিকিৎসক এবং আমার কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জন করেন।" (১১২ সূ ৩ ঋক)। সাংসারিক কার্য্যে কন্যাটি বিশেষ গুণান্বিতা না হইলে চিকিৎসক ভ্রাতার সহিত একত্রে তাহার উল্লেখ হইত কি না সন্দেহ! ঋগ্বেদের তুলনায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৮) রচিত দশ-কুমার চরিত আধুনিক হইলেও নিতান্ত আজি-কালিকার গ্রন্থ নয়। এই কথা-গ্রন্থে গোমিনী-উপাখ্যান নামক গল্পে প্রাচীন গৃহস্থালীর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আজ কাল এই পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের কৃপায় আমরা সংরক্ষণ-নীতি বা অনাবশ্যক ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা করিতেছি, আর্য্য ললনাগণের দৃষ্টি সেদিকে বহু পূর্ব্বেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। উপাখ্যানটির সারাংশ এইরূপ। দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী (বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরম্) নগরবাসী শক্তিকুমার নামক এক বণিক-পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ করিবার জন্য এক গুণবতী কন্যার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। নির্ব্বাচিতা কন্যার গৃহস্থালী-কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ

(৬) "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থে গুহ মহাশয় Hermann Jacobi'র এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৭) সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

(৮) Weber Ed. 1812. p. 213 footnote. A. A. Macdonell Sanskrit Literature, p. 336.

হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি একটি সুন্দর পরীক্ষা-বিধি স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র এক প্রস্থ বা আঢ়কের চতুর্থাংশ পরিমাণ শালি-ধান্য দিবেন, কন্যাকে তাহাতেই পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইতে হইবে। তিনি আর কিছু দিবেন না, কন্যাও আর কিছু লইতে পারিবেন না। অনেক সন্ধানের পর শক্তিকুমার "ন হ্রস্বা নাতি দীর্ঘা নাতিকৃশা" কাঞ্চন-বিরল-ভূষণা সুস্থদেহা এক কন্যার দর্শন লাভ করিলেন। এই কুমারী যে বয়সে নিতান্ত বালিকা ছিলেন না, তাহা গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কন্যা কিরূপে নালী-পৃষ্ঠে মৃদু সংঘট্টনের দ্বারা তণ্ডুল বাহির করিয়াছিলেন এবং পরে উহা সুর্প শোধিত ও প্রক্ষালিত করিয়া কিরূপে সেই ধান্যের তুষাদি-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে ইন্ধন, স্থালী (মৃৎপাত্র) ও সরাবাদি ('সরা' প্রভৃতি) ধাত্রী-সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া রন্ধনাদি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অনাবশ্যক-বোধে তুষ-কুঁড়া প্রভৃতি যে সকল (bye-products) দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা যথাকার্য্যে নিয়োজিত হইলে যে গৃহস্থের বিশেষ "সাশ্রয়" হওয়া সম্ভব, গল্পটিতে এই নীতিই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তুষাদির পরিবর্ত্তে ইন্ধন এবং সেই ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত অঙ্গারের পরিবর্ত্তে শাক, ঘৃত তৈল, দধি, আমলক, চিঞ্চাফল (তেঁতুল) প্রভৃতি সংগ্রহ করা এই মহার্ঘ্যতার দিনে সম্ভব নয় বটে কিন্তু তের-চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বেও যে কতকাংশে সম্ভব ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আমরা এই উপাখ্যান-পাঠে আরও জানিতে পারি যে গৃহস্থগণ নিজ-নিজ আঙিনায় দুই-এক ঝাড় কদলী বৃক্ষ রোপণ করিতেন এবং কদলী পত্রেই বোধ হয় অনেক সময় থালা বাসন প্রভৃতির কাজ সারিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ প্রত্যূষে বা ভোর রাত্রেই পাতা কাটিয়া রাখার নিয়ম ছিল। রন্ধনের পূর্ব্বে চুল্লী পূজা করিতে হইত। পল্লীগ্রামে মোদকগণ এখনও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ার করিবার সময় প্রথমে খোলায় সামান্য-কিছু ভাজিয়া লইয়া চুল্লী মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভাতের ফেন বা অন্নমণ্ডও পরিত্যক্ত হইত। তাহা "সলবণ সম্ভার দত্তাঙ্গার ধূপবাসশ্চ সম্পাদ্য... উৎপলগন্ধী কৃত্বা" মৃৎসরাবে বা মাটির সরায় পরিবেষণ করা হইত। এইরূপ অন্নমণ্ডপানে "মন প্রহৃষ্ট" "সকল গাত্র সংক্লিন্ন" এবং "অধ্ব ক্লম" বা পথশ্রান্তি নিবারিত হয়, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শুনিতে পাই, মান্দ্রাজ অঞ্চলে এইরূপ অন্নমণ্ড পান করার প্রথা স্থানে স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। অন্ন "দর্বী" বা হাতার সাহায্যে পরিবেষণ করা হইত। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শিল্পীর সংরক্ষণশীলতা-গুণে এই দর্বী অন্নপূর্ণা দেবীর হস্তে এখনও বিরাজ করিতেছে। অগুরুর ধূপ যে কেবল যোষিৎগণের কেশবাসের জন্যই ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে; পানীয় প্রভৃতি সুগন্ধি করার জন্য "অভিনব পাটলা কুসুম" (Bignonia Suaveolens) বা উৎফুল্লোৎপলের ন্যায় ইহারও ব্যবহার ছিল দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৌদ্ধ-জাতক কাহিনীতে বর্ণিত মৃত মুষিক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিয়া ধনী হওয়ার

ন্যায় এই গল্পটিও অর্থ-সঞ্চয় বা সাংসারিক ব্যয়-সঙ্কোচের এক উৎকট দৃষ্টান্ত মাত্র। এ শ্রেণীর কোন প্রাচীন কাহিনীই যে বিশেষ বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিবেন না এবং প্রাচীন কথা-গ্রন্থাদিতেও অতিশয়োক্তির বিশেষ অভাব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বিপরীত ভ্রমে পতিত হওয়াও উচিত নয়। তখন এক টাকা মণের মৃদঙ্গার বা অক্রেয় জ্বালানি কাঠের ব্যবহার ছিল না বলিয়া যে লোকে পোড়া কয়লা কুড়াইয়া রাখিত না, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ধান্য সুলভ হইলেই কি পল্লীগ্রামের লোক 'তুষ কুঁড়া' ফেলিয়া দিয়া থাকে? সেকালের গৃহলক্ষ্মীগণ এ সকল দ্রব্যাদির অপচয়-নিবারণ সম্বন্ধে যে রীতিমত উপদেশ পাইতেন, তাহা আমরা বাৎস্যায়ন হইতে জানিতে পারি।

## বাৎস্যায়নের কাল

বাৎস্যায়নের কামসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি হইতে "বাৎস্যায়ন, মল্লনাথ কুটিল-শ্চনকাত্মজঃ" প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৌটিল্য,চাণক্য ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি (৯)। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী কৌটিল্যের "আন্বীক্ষিকী স্থাপনা" (2nd. chap.) এবং বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য হইতে দুইটি বিশেষ সাদৃশ্য-যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সাহিত্য, মাঘ ১৩২৩, পৃঃ ৬৭২, ৬৭৩) চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে দেহত্যাগ করেন। অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩২১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে (১০) বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করিলে কামসূত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। হেমচন্দ্রের অভিধান সম্ভবতঃ ১০৮৮—১১৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালের অনেক পরবর্ত্তী কেহ কেহ শ্লোকটিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। শ্যামশাস্ত্রী কামসূত্র হইতে অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি তুল্যপদ (Parallel passages) সঙ্কলন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাৎস্যায়ন ঐ পদগুলি অর্থশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন গ্রন্থকারেরও অভাব নাই যাঁহারা নিজের লেখা নিজেরাই উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। সুতরাং বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য যে প্রকৃতই অভিন্ন নহেন, তাহা শুধু এই প্রমাণ হইতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু কৌটিল্য ও বাৎস্যায়নের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি আছে যাহা এখনও খণ্ডিত হয় নাই। কামসূত্রে অন্ধ্

(৯) See his Introductory essay to Kumar N. N. Law's Studies in Ancient Hindu Polity p. XI.

(১০) Shama Shastry's Artha-sastra—Introduction p. VI

রাজ কুন্তল শাতকর্ণির উল্লেখ আছে। (১১) কুন্তল শাতকর্ণি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩৫ অব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। Vincent Smith তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে বাৎস্যায়ন, ও খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার কৌটিল্য যে একই ব্যক্তি ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। জর্ম্মান ভাষায় কামসূত্রের ব্যাখ্যাকার R. Schmidt এ সম্বন্ধে নিজ গ্রন্থে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই, কেবল এ পুস্তক কালিদাসের ও পঞ্চতন্ত্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এই কথামাত্র বলিয়াছেন। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন ( vide M. M. H. P. Shastri's article, J. B. O. R. S. part I. vol. II )। দণ্ডী—অর্থশাস্ত্র বিষ্ণুগুপ্তের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য বা চাণক্যেরই অপর নাম। পঞ্চতন্ত্রে শালিহোত্রের সহিত বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্যের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে খুসরু আনাসির ওয়ানের রাজত্বকালে পেলেভী ( প্রাচীন পারসিক ) ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ শতাব্দীতে রচিত দশকুমার চরিতের যে ইহা বহুপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

## কামসূত্রে গৃহস্থালীর উপদেশ

কামসূত্রের ভার্য্যাধিকরণে গৃহস্থালী ও সংসার-ধর্ম্মসম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তাহা কিছুকাল পূর্ব্বেও হিন্দুকুলবধূগণ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। পতির শয্যা-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ—বোধ হয় কিছু দিনের মধ্যেই বাতিল হইয়া পড়িবে। এই একটি অধ্যায়ে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ফর্দ্দ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য নয়। মূলে ও যশোধরের জয়মঙ্গল টীকায়—যাহা বিবৃত আছে, নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

## পরিত্যক্ত বা উৎবৃত্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার

গৃহিণীর কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে প্রথমেই সুতা কাটা, শিকা তৈয়ারী, পাশ বল্কল সংগ্রহ ( বৃক্ষ বা উদ্ভিদজাত তন্তু হইতে পশু বন্ধনের জন্য দড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ) আচাম মণ্ড, তুষকণা, কুটি ও অঙ্গার প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে, তুষকণা, কুটি, অঙ্গার কিছুই পরিত্যক্ত হইত না (১২)। ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা প্রভৃতিও

---

( ১১ ) কর্ত্তর্য্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহা দেবীং মলয়বতীং।২৭। সম্প্রয়োগাধিকরণং—কামসূত্র (Ed. Mahesh Ghandra Pal.)

( ১২ ) মনুসংহিতায় তুলার বীজ ও তুষের উপর দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত আছে (Manu IV—78) এ নিষেধউক্তি অপচয়-নিবারণ-উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালে তুলার বীজ হইতে তৈল ও খইল প্রস্তুত করার ন্যায় সেকালে উহার কোনও ব্যবহারিক

কুক্কুটাদির জন্য ব্যবহার হইত। (কুক্কুটাদিযু—বন্য কুক্কুট কি না, টীকাকার তাহা বলেন নাই)। অঙ্গার প্রভৃতি লৌহ ভাণ্ডকরণাদির জন্য ব্যবহৃত হইত সুতরাং বৃথা নষ্ট না হইয়া উহা কর্ম্মকার শালাতেই পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। আচাম মণ্ড প্রভৃতিতে বোধ হয় কাঁজী আমানির ন্যায় কোনরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া দাসী-দিগের পানের জন্য রাখা হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও লিখিত আছে, অঙ্গার ও তুষাদি লৌহ গলাইবার জন্য ও "ভিত্তিলিপ্য" বা চুণের ভাটার জন্য (for iron smelting and lime-kiln) ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ভুষি ও কণিকা—দাস, মজুর ও পাচকদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। (Ed. Sham Sastry Chap XV. 97) জীর্ণ বস্ত্রও পরিত্যক্ত হইত না; শুদ্ধ ও রঞ্জিত করিয়া ভৃত্যাদিগকে প্রদত্ত হইত।

## গৃহস্থালীর উপকরণাদি-সংগ্রহ

লবণ, স্নেহ (ঘৃতাদি), গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দুর্ল্ভ বলিয়া লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। মৃৎপাত্র কাষ্ঠ ও চর্ম্ম ভাণ্ড (১৩) প্রভৃতি গৃহিণীকে যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিতে হইত। সকল সময়ে বোধ হয় সকল জাতীয় তৈজস সহজে মিলিত না, সুতরাং কখন কোনটি সুলভে পাওয়া যাইবে সেদিকে দৃষ্টি রাখা গৃহ-স্বামিনীর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এখনও পল্লীবধূগণ ভিন্ন-স্থান হইতে আনীত উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এ-ছাড়া সেকালের গৃহিণীকে আরও কতকগুলি কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইত।

## ফুল ও সব্জী বাগান

গৃহ-প্রাঙ্গণে আদ্রকাদি 'হরিত' ও পালঙ্কাদি শাক অল্প-বিস্তর আবাদ করা হইত। এ ছাড়া জীরক (জীরা), শর্ষপ (শরিষা) প্রভৃতি মসলার এবং বোধ হয় বাটীর বালক-বালিকাদিগের ব্যবহারের জন্য ইক্ষু লাগাইবারও ব্যবস্থা ছিল। মূলক (মূলা) আলুক (বোধ হয় চুপড়ি আলু) পালঙ্কী (পালং শাক) দমনক (দোনাশাক) আম্রাতক (আমরুল), বার্ত্তাকু, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, সূরণ (১৪) (ওল) স্বয়ংগুপ্তা (কচু প্রভৃতি) এবং শূকনাসা (সীম) ও পলাণ্ডু প্রভৃতি ঔষধির যথাকালে বীজগ্রহণ ও বীজ বপন করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর ব্যতীত অনেক স্থানেই এই সকল শাক-সব্জী গৃহ-প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। পালংশাক

---

প্রয়োগ ছিল কি না জানা যায় না তবে বীজগুলি পদদলিত হইলে পাছে বপনের অযোগ্য হয় ইহাও এ নিষেধের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

(১৩) পূর্ব্বে দৈনিক ব্যবহার্য্য চর্ম্ম পাত্রাদি দৃতি (মশক) চর্ম্মপুট ও চর্ম্মকরণ্ড নামে অভিহিত হইত। রঞ্জন-ক্রিয়ার দ্বারা দৃতির শুদ্ধি-বিধান হইত। সেকালে চর্ম্মকরণ্ড বা চর্ম্মপুট-ধৃত জল শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৩৯৬

(১৪) হিন্দুস্থানীরা ওলকে এখনও "সূরণ" বলে।

আদা, ওল কুমড়া, লাউ, সীম প্রভৃতি তরকারীর আবাদ পল্লীসীমন্তিনীগণ অনেকস্থলে নিজেরাই করিয়া থাকেন। বপন-কালে বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট সব্জীর বীজ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া থাকে। যে দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে দেবী স্বয়ং "শাকম্ভরী" বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা ('শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি'—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১১,৪৬-৪৯) সে দেশের শক্তি-স্বরূপিণী রমণীগণ শাক হরিতাদি উৎপাদনে যে যত্নবতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কেবল শাক-সব্জী বলিয়া নহে, মল্লিকা, জাতি, নবমল্লিকা, টগর, জবা, উষির প্রভৃতির ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে সেকালেও শুধু বস্তুতন্ত্রের উপর ভর দিয়া সৌন্দর্য্য তন্ত্রের অমর্য্যাদা করা হইত না।

## সুরাকুম্ভী

এখন যেরূপ প্রতীচ্য দেশে অনেক মধ্যবিত্ত ও ধনী গৃহস্থ নিজগৃহে cellar বা পাতাল-ঘরের ভিতর মদ্য রাখিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও সুরা বা আসব কুম্ভী বোধ হয় এইরূপ "প্রচ্ছন্ন" ভাবেই রক্ষিত হইত। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে প্রাচীন-কালে প্রচলিত মধু, সীধু বা কাদম্বর এবং মৈরেয় প্রভৃতি সুরার উল্লেখ করা হইয়াছে।

## কৃষি ও গো-সেবা

গো-সেবা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু পুরন্ধ্রীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কামসূত্রের এই অধ্যায়ে পীতাবশেষ দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। এখনও অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুগ্ধ হইয়া থাকে। কোন কারণে সমস্ত দুগ্ধ ব্যবহারে না আসিলে অদ্যাপিও অন্তঃপুরিকাগণ দধি ও ঘৃতাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কৃষি ও পশুপালনের ভারও ভার্য্যার উপরই কতকটা ন্যস্ত থাকিত। কর্ষণ-বপনাদি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ না করিতে পারিলে অদ্যাপিও অনেক ভদ্রবংশীয় চাষী গৃহস্থের স্ত্রী-কন্যা কৃষাণ মাহিন্দারদিগের দ্বারা এ সকল বিষয়ের রীতিমত সংবাদ লইয়া থাকেন।

## পশুশালা

সেকালের অনেক গৃহস্থই বোধ হয় সখ করিয়া গো-মহিষ ব্যতীত অন্যান্য বন্য ও গৃহ-পালিত পশু এবং নানা জাতীয় পক্ষী নিজ নিজ গৃহে বা পশ্বালয়ে রাখিতে ভাল বাসিতেন। এ প্রসঙ্গে কামসূত্রে মেষ, কুক্কুট, লাব শুক, শারিকা, পরভৃত (কোকিল) বানর মৃগ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এখনও অনেক ধনী-গৃহে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সকল 'কৃষ্ণের' জীবের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে গৃহিণীকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইত। (১৫) দৈনিক আয়-ব্যয়ের "পিণ্ডীকরণ" বা মবলক্ করার ভার গৃহস্বামিনীর উপরই অর্পিত ছিল, সুতরাং তিনিই প্রাণ

(১৫) সংহিতোক্ত প্রায়শ্চিত্ত-বিধি দেখিয়া মনে হয়, পশুপক্ষীগুলি সযত্নেই রক্ষিত হইত। হংস, রাজহংস, ময়ুর, লাবক, কপিঞ্জল প্রভৃতি বিনষ্ট করিলে দিন-রাত্রি উপবাস দিতে হইত। শুক ও পারাবত

নিজ হাতে সব খরচ-পত্র করিতেন বলিয়া বোধ হয়। যে economic independence বা অর্থব্যয়-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার জন্য সেদিন পর্য্যন্ত Suffragette দলভুক্ত স্ত্রীলোকেরা গোলযোগ বাধাইয়াছে তাহা পুরাকাল হইতেই ভারতীয় স্ত্রীগণের কতক পরিমাণে নিজস্ব ছিল বলিয়াই মনে হয়।

## দাস-দাসী

ভৃত্যগণের সহিত প্রভু ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধটি বেশ মধুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। আজকাল অনেক শিক্ষিত নর-নারী করুণ-রসাত্মক নভেল, গল্প প্রভৃতি লিখিয়া দীন-দুঃখীগণের প্রতি দয়া মমতা শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজেদের আহারের সুব্যবস্থা হইলে চাকর-বাকরে কি খাইল না খাইল তাহার বড় খোঁজ রাখেন না। প্রাচীন ইংলণ্ডে যেমন লেডি Hlaf-dige বা অন্নদাত্রী (giver of the bread) ছিলেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষে ভৃত্যাদিগের ভরণ-পোষণ এবং বেতন প্রভৃতির ভার গৃহিণীগণের উপরই অর্পিত ছিল। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, দাসগণকে নিজের ছায়ার মত দেখিবে। ("ছায়াস্বো দাস বর্গশ্চ" Manu Ed. M. N. Dutta. Chap IV—185)। স্নেহের পাশে স্পর্শ-দোষাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধও অটুট থাকিতে পারে নাই, তাই মনু সংহিতায় দেখিতে পাই যে শূদ্রগণের মধ্যে "কুলমিত্রের",—যে তাঁহার জমি আবাদ করে—এরূপ ব্যক্তির, দাসের, গো-রক্ষকের ও নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থালী-সংক্রান্ত কার্য্যাদির পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে মন্থর চক্রনেমির ন্যায় এই সকল বিরক্তিকর কর্ত্তব্যের একঘেয়ে পরিবর্ত্তন গৃহস্থ বধূগণের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্লেশকর ঠেকিত। তাঁহারা স্বহস্তে যে

---

মারিলে সারা দিন উপবাস করার নিয়ম ছিল। কোকিল মারিলে দিবসে উপবাস করিয়া রাত্রে আহারের বিধি ছিল। শারিকা মারিয়া ফেলিলে সকালে সন্ধ্যার জলে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিতে হইত। বিড়াল, বেজী প্রভৃতি মারিলে ব্রাহ্মণকে "কৃশর" ভক্ষণ করাইয়া লৌহ যষ্টি দান করিতে হইত এবং শশ কচ্ছপ প্রভৃতি মারিলে এক দিন শুধু বেগুন খাইয়া কাটাইতে হইত। রুরু মৃগহত্যা করিলে ক্ষেত্রে অনুৎপন্ন (বোধ হয় নীবার প্রভৃতি) শস্য খাইয়া দিন-রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত। পরাশর সংহিতা অধ্যায় ৬) অর্থশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ে (Ed. Shma Sastry p. 117) পশুশালায় রক্ষিত বন্য ও গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীগণকে কি পরিমাণ আহার দেওয়া হইত তাহা বর্ণিত আছে। বলীবর্দ্দ প্রভৃতির জন্য এক দ্রোণ পরিমাণ মাষকলাই অন্যান্য খাদ্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত ১০ আঢ়ক পরিমাণ ভুষি বা সহস্র পল খইল দেওয়ার নিয়ম ছিল। উষ্ট্র ও মহিষাদির জন্য ইহার দুইগুণ পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। গর্দ্দভও ক্ষুদ্র জাতীয় হরিণের জন্য অর্দ্ধ আঢ়ক এবং বৃহদাকার হরিণাদির জন্য এক আঢ়ক খাদ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছাগ, মেষ ও বরাহ প্রভৃতির জন্য এক আঢ়ক বা অর্দ্ধ আঢ়ক পরিমাণ শস্য ও ভুষি প্রভৃতি দেওয়া হইত। কুকুরের জন্য এক প্রস্থ অন্ন এবং হংস, ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর প্রভৃতির জন্য অর্দ্ধ প্রস্থ অন্নের ব্যবস্থা ছিল।

গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন, তাহা নহে। অবস্থা-ভেদে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী দাস-দাসী নিযুক্ত থাকিত। আধুনিক কালে ইংলণ্ডীয় সমাজে ধনী ও ভদ্র বংশীয়া মহিলাগণের মধ্যে যেরূপ Lady's maid রাখার প্রথা আছে সে কালেও সেইরূপ রূপদাসী ( tire-women ) প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা ছিল। অবসর সময়ে ইহারা ধাতব বা কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, মহিষ বা মৃগশৃঙ্গ বিনির্ম্মিত প্রসাধনী ( চিরুণী ) এবং ধাতুনির্ম্মিত ও "রসাঢ্য" ( পারদ সংযুক্ত ) দর্পণ প্রভৃতির সাহায্যে ("যুক্তিকল্পতরু") কেশাদি সংস্কার এবং অঙ্গে লোধ্র, কুঙ্কুম, যষ্টিমধু যব তণ্ডুল প্রভৃতি একত্র পেষণসঞ্জাত কান্তিবর্দ্ধক প্রলেপ ( Vide Garura Purana chap c c Ed. M. N. Dutta p. 63 for the recipt of this cosmetique ) মর্দ্দন ও অন্যান্য অঙ্গরাগাদি প্রয়োগ করিয়া গৃহ-স্বামিনীর বেশ-ভূষা সম্পাদন করিয়া দিত। (১৬) স্বামী গৃহে অনুপস্থিত না থাকিলে বধূগণ "বিবাহে-আবাহে" উৎসবে, সমাজে, দেবালয় প্রভৃতি স্থানে গুরুজনের অনুমতি লইয়া আত্মীয়-আত্মীয়াগণের সহিত যাতায়াত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, রূপজীবাগণ রাজ শুদ্ধান্তে গমন করিয়া নৃত্য-গীতাদির দ্বারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে তুষ্ট করিত। মধ্য-বিত্ত সংসারে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তাহা জানা যায় না; তবে যতদূর দেখা যায়, ইলেক্‌ট্রিক বাতি, জলের কল, গ্যাস প্রভৃতি না থাকিলেও সেকালের নর-নারী ঘর-বাড়ী ও গৃহস্থালী লইয়া নিতান্ত অসুখে কাল কাটাইতেন না! এই সকল ঘরকন্নার তুচ্ছ ব্যাপারেও প্রাচীন কালের মনীষীগণের নিকট হইতে যে এখনও আমাদের শিখিবার অনেক আছে ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার "ধার-করা পালক" পরিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

(১৬) যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে প্রসাধনী ও দর্পণ নয়টি রাজোপকরণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেশ-ভেদে ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির দশা-ভেদে বিভিন্ন দ্রব্যে নির্ম্মিত 'প্রসাধনী' ব্যবহার করা হইত। দর্পণ দৈবী, মানুষ ও রাক্ষস এই তিন প্রকারের ছিল। ইহার মধ্যে মানুষ দর্পণ বিলাসোপকরণ-রূপে, দৈবী দর্পণ পর্ব্বাদি উপলক্ষে এবং রাক্ষস দর্পণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইত। এই সকল দর্পণ স্বর্ণ. রৌপ্য, লৌহ, সীসক, অষ্টধাতু প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত হইত। গত ফাল্গুন মাসের সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। মানুষের সমান উচ্চদর্পণকে পৌরুষ দর্পণ বলা হইত। চারি অঙ্গুলি প্রমাণ লম্বা ও ঐ পরিমাণ চৌড়া 'বিজয়'দর্পণ সকলের পক্ষে সুখপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

# সাহিত্যের গোড়ার কথা

পৃথিবীতে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের নানাদিকে বৈষম্য আছে। কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য আছে, যেমন আর্য্যের সঙ্গে সেমেটিক বা মঙ্গোলিয়ান জাতের বৈষম্য, তা নয়—একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যেও নানা বৈষম্য দেখা যায়, যেমন পশ্চিম দেশীয় আর্য্যজাতির মধ্যে অ্যাংলোস্যাক্সনের সঙ্গে কেল্ট বা স্লাভের পার্থক্য নানাদিকেই রহিয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থানের বৈচিত্র্যের জন্য প্রথম বিস্তর পার্থক্য দেখা দেয় এবং সেই বৈচিত্র্যের দরুণ ও অন্যান্য নানা কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠন ও রীতি নীতির পার্থক্যও দাঁড়ায়; ক্রমে পার্থক্যগুলা জমিতে জমিতে এক একটা জাতের আকৃতি-প্রকৃতি এমনি দানা বাঁধিয়া বসে যে হয়ত অন্যজাতের সঙ্গে তার মূলতঃ কোন বৈষম্য না থাকিলেও স্থূলতঃ এত বৈষম্য হয় যে দুটো জাতকে এক জাত বলিয়া প্রমাণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

জাতিগত এই সকল বৈষম্য সাহিত্যের মধ্যেও ভেদ রচনা করে কিনা, সেইটেই প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু তা যে করে না তার প্রধান প্রমাণ এই যে, যে-কোন জাতের সাহিত্যের রস সকল জাতের লোকেরাই আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করে। সাহিত্যের যজ্ঞে জাতবিচার নাই, এ যজ্ঞে বিশ্বের নিমন্ত্রণ। ইংরাজ বা ফরাসী বা রুশ সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা চীন বা জাপানের লোকের উপভোগ্য নয়, অথবা চীন বা জাপানের সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা ফরাসী বা রুশের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। সাহিত্য এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ভেদের চেয়ে অভেদের কথাটাই বেশি করিয়া প্রকাশ পায়, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বমানুষের অনুভূতিকে অনুভব করিয়া বিশ্বমানুষের জন্যই সেই আশ্চর্য্য অনুভূতিকে কতই ছলাকলার সাহায্যে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করে।

অথচ সাহিত্যকে একটা সার্ব্বজাতিক বস্তু বলিলে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার যেন কোন রকমের সম্বন্ধ নাই, এমন কথা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সব রকমের জাতীয়-বিশেষত্ব-মুছিয়া-ফেলা সার্ব্বজাতিক ভাষা বা শিল্প বা ধর্ম্ম বা সাহিত্য যে কেমন-তর অদ্ভুত বস্তু হয় তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। তার না থাকে কোন রং, না থাকে কোন রস; তাহা রক্তমাংসহীন একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন সার্ব্বজাতিক 'এস্পেরাণ্টো' ভাষায় হয়ত ব্যবসাবাণিজ্যের কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সে ভাষায় সাহিত্যের ফুল কখনই ফুটিবে না। তেমনি সার্ব্বজাতিক ধর্ম্ম, ধর্ম্মের সাধন ও অনুষ্ঠানাদি বর্জ্জিত হইয়া,—সুতরাং ধর্ম্মের আসল রূপবর্জ্জিত হইয়া,—এমন একটা শুক্‌নো জিনিষ হইয়া দাঁড়ায় যে তাতে কোন সাধকের কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না। তেমনি সার্ব্বজাতিক শিল্প বা সঙ্গীত-

সবদেশের বিশিষ্ট মানস রূপলোকটিকে ও তার নানা স্ফুট-অস্ফুট চেতন-অর্দ্ধচেতন সঙ্গতি-বন্ধনকে মুছিয়া ফেলিয়া এমন একটা আকাশ-কুসুম-জাতীয় পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, যার না আছে রূপ, না আছে গন্ধ। সার্ব্বজাতিক সাহিত্যেরও সেই একই দশা।

এতো আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে, হিন্দুর ছেলে ইংরাজের প্রেমের নভেল পড়িয়া রস পায়, ইংরাজের ছেলে হিন্দুর ঘরের লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকার কথা পড়িয়া রস পায়। কিন্তু সার্ব্বজাতিক সাহিত্য তৈরি করার ফরমাস হইলে এমন একটা সার্ব্বজাতিক সমাজের কথা ভাবিতে হয়, যেখানে এসব বৈষম্য নাই। তার মানে, কেবল মায়ের-ছেলের বা বন্ধুর-বন্ধুর নিতান্ত সাধারণ স্নেহপ্রীতির কথা ছাড়া অন্য কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধের কথা পাড়াই সে ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়; কেননা ঐ সব স্নেহপ্রীতির ধরণধারণ সব দেশেই মোটের উপর প্রায় সমান। অথচ দেশে দেশে ঐ সব সম্বন্ধেরই ভিতরে যে সকল বৈচিত্র্য আছে, সার্ব্বজাতিক সাহিত্য রচনার খাতিরে তাহা ভুলিতে হয়, এবং ঐ সকল সম্বন্ধের কেবলমাত্র অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাদহীন অবিশিষ্ট দিক্‌টিকেই প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং সে প্রকাশ করাও যা, না করাও তা। সাহিত্য চায় নব নব বিস্ময়, চির-পরিচিতেরই মধ্যে অপরিচিতের, চির-রহস্যের সন্ধান। সেই জন্য বিশেষ লইয়াই তার কারবার, নির্ব্বিশেষ লইয়া নয়। বিশেষের মধ্যেই সে বিশ্বকে দেখে। বিশেষ ছাড়িয়া বিশ্বের কোন অস্তিত্বকে সে মানে না।

এই সার্ব্বজাতিক সাহিত্যের উল্টাদিকে, এক এক জাত যে নিজের বিশেষ বিশেষ মূল আশ্রয় করিয়া বিশ্বমানবের ভাবের আকাশে সাহিত্যের ফুল ধরাইবে, তাও সাহিত্য চায় না। সাহিত্য আরও বিশেষের দিকে যায়। জাত জিনিষটা অনেকগুলা ব্যক্তিকে তাল পাকাইয়া একটা সমষ্টি। নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া এই সমষ্টি গড়ার কাজ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলে, তারপর একরকম দাঁড়াইয়া যায়। জাত কেন, প্রত্যেক জাতের আধার বা অবলম্বন সমাজ জিনিষটাও এই ভাবেই গড়িয়া উঠে। তাও এক জাত বা দশ জাত লইয়া তৈরি হইতে পারে। জাত বলিতেও এমন কিছু বোঝায় না যে তাকে স্বতন্ত্র একটি জাতই হইতে হইবে। অনেক জাতের সম্মিশ্রণেও জাত তৈরি হয়। ইংরাজ, হিন্দু, আমেরিকান, চীন—এ সব জাতই নানা জাতের মিশ্রণে উৎপন্ন। কিন্তু প্রত্যেক জাতের সমাজের কাজ বা রাষ্ট্রের কাজ ঐ সমষ্টি-বোধটাকে গড়া, ব্যক্তিকে ঐ সমষ্টির মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের কাজ ঠিক্ এর উল্টা। সাহিত্য ঐ সমষ্টির জট হইতে ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া তার অনন্ত বিশেষত্বকে খুলিয়া খুলিয়া দেখায়। তার কাছে এক একটা মানুষই যেন এক একটা বিশ্ব। সাহিত্যে সমাজের ঐ শ্রেণীবোধ বা group-consciousness কাজে লাগে না; ব্যক্তি-বোধই তার সন্ধান ও আবিষ্কারের বিষয়। কোন দুটা মানুষকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া দেখা চলে না; দুটা মানুষের মধ্যে অসীম বৈচিত্র্য। এর জগতের সঙ্গে ওর

জগতের অনন্ত পার্থক্য। সেই পার্থক্য সেই বৈচিত্র্যের আবিষ্কারেই সাহিত্যের আনন্দ। সাহিত্যে তাই যে যত বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করিতে পারে, সে ততই মানুষের ভাবলোক ও আনন্দলোকের পরিধিকে বিস্তীর্ণতর করিয়া দেয়।

অথচ শুধু বিশেষ লইয়া যদি সাহিত্যের কারবার হয়, তবেত এক দেশের সাহিত্য বা এক জাতের সাহিত্য অন্য দেশের অন্য জাতের লোকের কাছে দুর্ব্বোধ ও দুরধিগম্য হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা হয় না। কেননা, সাহিত্য বিশেষকেই বিশ্ব করিয়া দেখায়, সেই কারণেই সাহিত্যযজ্ঞে বিশ্বের নিমন্ত্রণ হয়। সাহিত্যে "Truth is beauty, beauty truth"। যে-বিশেষের সৌন্দর্য্যকে সে উদ্‌ঘাটন করে, সে সৌন্দর্য্যকে সে একটি অমর অক্ষয় সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখে। বিজ্ঞানে নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন যে, যে আকর্ষণের নিয়মে আপেল ফল মাটিতে পড়ে, সেই আকর্ষণের নিয়মেই সূর্য্য গ্রহকে আকর্ষণ করে, সে নিয়ম বিশ্বনিয়ম—তেমনি সাহিত্যে সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেই মানুষের মধ্যে যখন কোন বিশেষ রহস্যকে আবিষ্কার করেন, তখন অনুভব করেন এবং অনুভব করান যে, সেই বিশেষ রহস্য বিশ্বমানব-প্রকৃতিরই ভিতরকার রহস্য, কোন বিশিষ্ট জাতের মানুষের প্রকৃতির রহস্য মাত্র নয়। তা যদি না হইত, তবে ত সাহিত্য পড়িয়া সকল কালের সকল দেশের লোক এমন আনন্দ পাইতেই পারিত না।

সমষ্টি-বোধ জিনিষটা তবে কি সাহিত্যে কোথাও প্রকাশ পায় নাই বা পাইতে পারে না? সমাজ বা রাষ্ট্র বা বিশ্বমানব কত কালের ইতিহাসের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার" ভিতর দিয়া কত আশ্চর্য্য অভিনব লীলায় বিচিত্র ও বিপুলায়তন হইয়া চলিয়াছে, ইহার যে একটা বিশাল অনুভূতি, সাহিত্যে কি তাহা প্রকাশ খুঁজিবে না? নিশ্চয়ই খুঁজিবে। কারণ ব্যক্তিবোধের মধ্যেই ত এই বড় বোধটি রহিয়াছে। কিন্তু এই বোধ কোন সংকীর্ণ জাতীয়তার বোধ নয়, তা যদি হয় তবেই তাহা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে রডিয়াড্ কিপ্লিং ও ওয়াল্ট হুইটম্যান এই দুই জনের নাম করা যাইতে পারে। কিপ্লিং তাঁর কাব্যে ইংলণ্ডের স্বাজাত্যাভিমান, সাম্রাজ্যাভিমানকে ব্যক্ত করিয়া এক সময়ে শুধু ইংরেজের নয়, জার্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাজাত্যাভিমানী জাতের মনোহরণ করিয়াছিলেন। এই যে এক ধরণের রাষ্ট্রবোধ এটা বিশ্ববোধের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। আমাদের মধ্যে যাঁরা "হিন্দু সাহিত্যের" গরিমা করেন, তাঁদেরও সেই হিন্দুত্ববোধ বিশ্ববোধের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু হুইট্‌ম্যান আমেরিকার গণতন্ত্র-বোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবী মহামানব-সঙ্গীতির যে অমূর্ত্ত স্বপ্নকে তাঁর কাব্যে মূর্ত্তরূপ দিয়াছেন, তাতে বিশ্ববোধ ত কোন জায়গায় ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ তাঁর সেই En masse, সেই Democracyর মধ্যে প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশের স্থান আছে।

"One's self I sing, a simple
separate person
Yet utter the word Democratic,
the word En masse."

সমাজ বা স্বাজাত্য-বোধকে সজ্ঞান ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টায় যে জাতীয় সাহিত্য গড়ে, তা ছাড়া সকল দেশেই সকল জাতের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে লোকসাহিত্য বলিয়া একটা বস্তু গড়িয়া ওঠে। legends, folk-lores, chronicles, sagas, fables, প্রভৃতি বিস্তর সাহিত্য এই পর্য্যায়-ভুক্ত। এ সাহিত্য ঠিক্ বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পায় না, অথচ এর যে একটা রং ও রস আছে, তাও অবহেলার জিনিস নয়। ইউরোপে মধ্যযুগে troubadour সাহিত্য এই শ্রেণীর সাহিত্য ছিল। gaelic বা celtic সাহিত্যও এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমাদের দেশেও কবিওয়ালাদের গান, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে।

কালিদাসের কালে 'উদয়ন-কথা' সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে চল ছিল, মেঘদূত পড়িয়া তাহা জানা যায়। পৃথিবীতে এ শ্রেণীর সাহিত্য পরিমাণে বড় কম নয়। এ সাহিত্য খুবই ঘোরো রকমের। সেইজন্য যদি কোন সাহিত্যকে ঠিক্ 'জাতীয় সাহিত্য' নাম দিতে হয়, তবে এই ধরণের সাহিত্যই সেই নাম পাইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়।

স্বাদেশিক ব্যক্তি এই সাহিত্যের উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক সময় খুবই চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনি যখন এই সব লোকসাহিত্যকে উদ্ধার করিতে চান বিশ্বলোকে, তখন অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের লৌকিক অংশগুলি তাঁর হাতে অলৌকিকত্বে 'রূপান্তর' পায়। বৈষ্ণব সাহিত্য এক সময়ে এদেশে এমনি করিয়াই রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে এরিয়ষ্টো প্রভৃতি যে বড় কবি হইয়াছিলেন সেও এমনিতর প্রণালীতে। বর্ত্তমান celtic revivalএর কবিরা এমনি করিয়াই পুরানো কেল্টিক কবিতার মদের বোতলে নূতন ভাবমদিরা ঢালিতেছেন—পুরানোকে নূতনে রূপান্তরিত করিয়া লইতেছেন। gaelic legendগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া Fiona Macleod ছদ্ম নাম দিয়া আধুনিক কবি Dream Tales, Spiritual Tales প্রভৃতি যে সকল অপূর্ব্ব গল্পকাব্য রচিয়াছেন, তাও তাদের গেলিকত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাংলা দেশে কবি চিত্তরঞ্জন দাশ বৈষ্ণব কবিতা ও কবিওয়ালাদের গানকে এম্‌নি করিয়া রূপান্তরিত করিতে চান্। এ বিষয়ে পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

তবু যেমন করিয়াই রূপান্তরিত করা যাক্, এ ধরণের ঘোরো লোকসাহিত্য কোন দিনই বড় সাহিত্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। গ্যয়টের "ফাউষ্ট" মধ্যযুগীয় legend বা লৌকিক কথা আশ্রয়ে লিখিত বটে, কিন্তু তার ভিতরে মানব প্রকৃতির যে দিক্‌টি গ্যয়টে আবিষ্কার করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা চিরন্তন মানব-প্রকৃতির একটা সত্য দিক্। সেই কারণে ফাউষ্টের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্যয়টের পূর্ব্বে অনেক নাট্যকার নাট্য তৈরি করিলেও গ্যয়টের নাট্য তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাট্যাবলীতে সেইরূপ চিরন্তন মানবপ্রকৃতির নানা বিচিত্র দিক্‌কে অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। হ্যাম্‌লেট কোন এক কালের মানুষ নয়—তার সংশয়-দ্বিধা, তার

ভিতরকার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির প্রবল বিরোধ ও বিচ্ছেদ এবং সেই বিচ্ছেদজনিত তার মানসিক অশান্তি, তার জীবনের সুগভীর ট্র্যাজেডি, ইহা চিরকাল সব মানুষেরই মধ্যে বিচিত্র আকারে দেখা দিয়া থাকে। আমাদেরি জীবনের কোন না কোন পর্ব্বে আমরা হ্যাম্‌লেট্ বা ফাউষ্টের অবস্থার ভিতর দিয়া যাই। আমরা যখন কোন বড় আদর্শকে বুঝি অথচ তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না, দুর্ব্বল ইচ্ছা বারম্বার যখন আমাদিগকে দিক্‌ভ্রান্ত করে, তখন জীবনের মধ্যে যে ট্রাজেডি ঘনায়, তাহা হ্যাম্‌লেটেরই ট্র্যাজেডি। আমাদের ভিতর-কার নানা প্রবৃত্তিকে যখন ক্ষুধিত ও অপরিতৃপ্ত রাখিয়া আমরা কেবল মাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনটাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করি, তখন সেই সব suppressed instincts, সেই সব রুদ্ধ অন্ধ প্রবৃত্তি কোথা হইতে জীবনের ভিত্তি-মূলে ছিদ্র করিয়া এতদিনকার সমস্ত নির্ম্মাণটাকে একেবারে ধুলায় শয়ান করিয়া দেয়। সেই যে পাপের মধ্যে রুদ্ধ প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত দুর্ব্বার মুক্তি, সেই যে জীবনের ঘোরতর ট্র্যাজেডি—তাহাই ফাউষ্টের ট্র্যাজেডি এবং তাহাতেই ফাউষ্টের মুক্তি। এ সমস্তই চিরকালের মানুষের জিনিস, মানুষের বৃহৎ জীবনের ভিতরকার জিনিস। দান্তে, গ্যয়টে, শেক্‌স্‌পীয়র, ব্রাউনিং—এইজন্য কোন বিশেষ দেশে বা বিশেষ কালে আবদ্ধ হন্ নাই। সর্ব্বকালের সর্ব্বমানুষের তাঁরা। লোক-সাহিত্যকে রূপান্তরিত করিলেও তাহা এমনতর সর্ব্বকালের জিনিস হয় না। জীবনের কতটুকু অংশকে তাহা প্রকাশ করে? তার রূপ অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া তার রূপকও অত্যন্ত সংকীর্ণ। আর বড় সাহিত্যের রূপ বড় বলিয়া, তাহা সমগ্র জীবনের রূপ বলিয়া তার রূপক চিরকালের রূপক। প্রতি মানুষ নিজের নিজের জীবনে সেই রূপকের মোড়ক খোলে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করে। শেক্‌সপীয়র, দান্তে, গ্যয়টে, ব্রাউনিংএর সব বড় বড় রচনাই এহেন রূপক—জীবনে জীবনে তার তত্ত্বব্যাখ্যা, জীবনে জীবনে তার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন।

তাই যদি হয়, যদি জীবনের ভিতর হইতেই বড় সাহিত্যকে পড়িতে হয়, তবে সমাজভেদে যে সাহিত্যভেদ হয়, তার কি করিবে? ইউরোপীয় প্রণয় কবিতা তবে হিন্দুর ছেলে জীবনের ভিতর হইতে কেমন করিয়া পড়িবে? কেন, প্রেম জিনিসটা কি ইউরোপীয়েরই একচেটিয়া, হিন্দু কোর্টশিপ্ করিয়া বিবাহ করে না বলিয়া তার কি প্রেম হইতে পারে না? একথা অবশ্যই মানি যে, আমাদের দেশে সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে প্রেমের বিনিময় হইতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের স্বাধীন নির্ব্বাচন নাই বলিয়া প্রেমের ক্ষেত্র এ দেশে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেইজন্য খাঁটি প্রেমের কবিতাও এদেশে বিরল। পুরাকালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ জিনিসটা প্রচলিত না থাকিলে কালিদাসের "শকুন্তলা" লেখা সম্ভবই হইত না। তবু, সংস্কৃত সাহিত্যে মানব প্রেমের প্রকাশ কতটুকু

হইয়াছে? কামের বর্ণনার পরিমাণ প্রেমের বর্ণনার পরিমাণের চেয়ে ঢের বড়। নারীর রূপ লইয়া সংস্কৃত কবি যতটা ব্যস্ত, নারীর মন লইয়া ততটা নয়। নারী শুধু রূপের জন্য পুরুষের উপভোগ্যা, এই ভাবটাই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবল। তার পর সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কাব্য আছে, তাতেও এই লালসার দিক্‌ই প্রবল। সুস্থভাবে যেখানেই প্রেমের মত এত বড় একটা মানব বৃত্তির চরিতার্থতা হয় না, চরিতার্থতার বাধা হয়, সেখানে তাহা অসুস্থ বিকারে প্রকাশ পাইতে বাধ্য। বাঙালীর "বিদ্যাসুন্দর" সেই অসুস্থ বিকারের কাব্য। বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যেও সেই বিকারের দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি মেলে, এবং তার কারণও ঐ একই। তবে বৈষ্ণব কাব্যকে আধ্যাত্মিক করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাকে লৌকিক দিক্ হইতে বড় একটা দেখি না। কিন্তু গোড়াতে তাহা যে একেবারেই হুবহু আধ্যাত্মিক ছিল এমন আমার ত মনে হয় না। বিদ্যাপতির মধ্যে যে সব লালসার দগদগে বর্ণনা পাই, তাহা তিনি আধ্যাত্মিক অর্থে মোটেই লেখেন নাই। একমাত্র চণ্ডীদাস ও কতক পরিমাণে বলরাম দাস ভিন্ন আর কোন কবিই "love's rare universe" প্রেমের অপূর্ব্ব জগতের খবর পান নাই। "পিরীতি-নগরে"র স্বপ্ন সেই মহাকবিই দেখিয়াছিলেন—যে পিরীতিতে, "কামগন্ধ নাহি"। বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের যুগেও আমাদের গল্পে উপন্যাসে কাব্যে প্রেমের ছড়াছড়ি হইলেও তার বারো আনাই যে "বস্তুতন্ত্রহীন" তার একমাত্র কারণ, প্রেমবস্তুর সাক্ষাৎকারই আমাদের হয় নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের নকল করিয়া আমরা অধিকাংশ প্রেমের কবিতা লিখি, প্রেমের নভেল লিখি। গোবিন্দলাল-রোহিণী, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী, মহেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি যে সকল প্রেমের চিত্র বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন তার নায়িকারা সবই বিধবা; কেননা সমাজে ঐ এক জায়গায় স্বাধীন প্রেমের একটুখানি সামান্য সুযোগ আছে বলিয়া ঐ চিত্রটাই সাহিত্যে এত বড় করিয়া এবং এত বারেবারে দেখা দিয়াছে। তার কারণ, যৌন প্রবৃত্তির ক্রমাগত নিরোধ, sex-suppression, আমাদের চিরকেলে শিক্ষা ও অভ্যাস বলিয়া অসুস্থ ইন্দ্রিয়বিকার (abnormal sexuality) আমাদের সাহিত্যে ক্রমাগতই নানা আকারে দেখা দিয়াছে ও দিবে। বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত দুর্ব্বল ভাবাতিশয্যের (sentimentality) একটা মস্ত কারণই তাই—তার প্রেমের সুস্থভাবে স্ফূর্ত্তিসাধন হইবার কোন সুযোগ নাই। সেইজন্য ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সেই ভাবাতিশয্য 'দশা' পাইতে থাকে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা কল্পনার ভিতর হইতে নানা বিকারের সৃষ্টি করিতে থাকে।

তবে কি ইউরোপীয় সমাজের হুবহু নকল করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই? নকল করার কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ এক দেশের সমাজের রীতি-

নীতি উৎপাটন করিয়া অন্যদেশের মাটিতে কখনই তাকে বসানো যায় না। আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ও বনিবনাও করিয়া ক্রমশ যে সামাজিক গঠনটি দাঁড়াইয়া গেছে, যে সব রীতি নীতি আচার ব্যবহার দাঁড়াইয়া গেছে, তাহাদেরি উপযোগী ও অনুযায়ী করিয়া ধীরে ধীরে নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন ভিন্ন সমাজসংস্কারের অন্য কোন প্রশস্ত উপায় হইতে পারে না। প্রেম সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের স্বাধীন নির্ব্বাচন আমাদের দেশে কোন কালে যে ছিল না, একথা তো বলা চলে না। ছিল—ইহা যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমান কালেই বা না থাকিবে কেন? অবরোধ-প্রথা ভারতবর্ষের চির-কালের প্রথা নয়, যে বিবাহ-রীতিপদ্ধতি এখন প্রচলিত তাও ভারতবর্ষের চিরকালের বিবাহ-রীতিপদ্ধতি নয়। অতএব, অবরোধ প্রথা যদি তিরোহিত হয়, স্বাধীন নির্ব্বাচনের প্রথা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই যে ইউরোপীয় সমাজের নকল ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণ নাই এমন কথা মনে করিবার কোন হেতুই আমি দেখিতে পাইতেছি না।

একথা জানিতে ও মানিতে হইবে যে, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যের ক্রিয়া সমাজে দেখা দেয়, সমাজের ক্রিয়া সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। যে কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ইংলণ্ডের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা individual libertyর উপর তার বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার সমাজে কি রাষ্ট্রে বরাবর ছিল কি? যে আকারে এখন তাহা দেখা দিয়াছে তার জন্য ইংলণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্র কি ইংলণ্ডের সাহিত্যের কাছে কিছুমাত্র ঋণী নয়? socialism বা labour emancipation—প্রভৃতি আন্দোলনের মূলেও তার সাহিত্য রহিয়াছে। কার্লাইল্‌, রাস্কিন প্রভৃতির সাহিত্যই তার প্রমাণ। অত বড় যে ফরাসী বিপ্লব, তার মূলেও ছিল ভল্‌-টেয়ার, রুশো প্রভৃতির সাহিত্য। সেইজন্য আইরিশ কবি ওশেনেসি যে জোর করিয়া কবিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "we are the movers and shakers of the world forever it seems" আমরা চিরকাল জগৎকে নাড়া দিয়া থাকি—তা খুবই সত্য। সাহিত্যের জন্যই সমাজে নানা আন্দোলন দেখা যায়, নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, আবার সমাজের জন্যও সাহিত্যের প্রকাশ কখনো বা সংকীর্ণ ও বিকৃত হয়, কখনো বা ব্যাপ্ত ও প্রবল হয়।

বাংলা দেশে এই অল্প কালের মধ্যেই ত দেখিতে পাইতেছি যে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিক চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে সে সকল চিত্র ও চরিত্র কোন কালেই বাস্তব আকার লাভ করিত না। বঙ্কিমের পূর্ব্বে মাইকেল যদি পয়ারের বেড়ি ভাঙার মত তাঁর কাব্যে conventionএর বেড়িগুলি না খুলিয়া ফেলিতেন, তবে তাঁরই কালে বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাসগুলিই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমের ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, গোবিন্দলাল, এ সব একসময়ে-অবাস্তব রোমান্টিক চরিত্র এখন এদেশে আধুনিক সময়ে বাস্তব হইয়া গেছে।

এগুলি আর ত কাল্পনিক চরিত্র নয়। এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন types নূতন প্রকৃতি আমাদের সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রাণবান্ হইয়া উঠিতেছে। এই পরিবর্ত্তন শনৈঃ শনৈঃ—অথচ গোপনে, অলক্ষিত ভাবে—ঘটিতেছে বলিয়াই সমাজ-রক্ষকের দল সময়ে সময়ে এই অভিনব সাহিত্যকে খেদাইবার জন্ত নানা 'মোহমুদ্গর' উত্তোলন করেন, তবুত মোহ ছুটে না। এমন প্রস্তাবও কথনও কথনও কোন কোন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে,এই সকল আধুনিক উপন্যাস নাট্য হিন্দু মেয়েদের অপাঠ্য। অতএব তাহাদিগকে এ সকল পড়িতে না দিয়া শুধু সীতা সাবিত্রীর কথা পড়িতে দেওয়া হোক্। প্রস্তাবকারীদের ভয় এই যে, এই সকল আধুনিক উপন্যাস পড়িলে মেয়েদের প্রকৃতির যে বদল হইবে তাতে সমাজব্যবস্থার ওলোটপালোট্ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে মেয়েদের সাহিত্য পড়ানো বন্ধ করার প্রস্তাবই তাঁদের করা উচিত। কেননা, মহাভারত পড়িলেও মেয়েদের মন ঠিক্ হিন্দুর আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার ছাঁচে না গড়িতেও পারে। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। তার পর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এক কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ দুচারিখানি বই ছাড়া মেয়েদের পাঠ্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব কাব্য পড়িলে বা ভারত-চন্দ্র পড়িলে তাদের যত অনিষ্ট হইতে পারে আধুনিক নাটক নভেল পড়িলে কি তত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যাঁরা এ সব কথা লইয়া আলোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন না যে, জীবনের গতিকে রোধ করিবার সাধ্য কোন সমাজব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থাকারের হাতে নাই। যে জীবনের স্রোতের তোড়ে এই নূতন সাহিত্য এদেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সমাজের অনেক বাঁধনকে ভাঙিবেই, অনেক বাঁধা কূলকে ভাসাইবেই। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের চেয়েও তার কাজ অনেক বেশি-দূরগামী ও গভীরগামী। তাকে রোধ করিবার প্রস্তাব যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না যে তাঁরা অসম্ভবের বিরুদ্ধেই লড়িবার প্রস্তাব করেন।

সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের কোন্‌খানে যোগ আছে আর কোন্ খানে যোগ নাই, তাহা আলোচনা করা গেল। সাহিত্য জাতীয়তাকে মুছিয়া সার্ব্বজাতিক হয় না, আবার কেবল মাত্র জাতীয়তা-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াও প্রকাশ পায় না। সাহিত্য কেবলি বিশেষকে আবিষ্কার করে এবং সেই বিশেষের মধ্যেই বিশ্বকে দর্শন করে। সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ-বোধ ও বিশ্ববোধ দুয়েরি সমাবেশ। সেই হিসাবেই সাহিত্য সার্ব্বজাতিক বস্তু হয়। সেই বিশেষ-বোধের জন্য সাহিত্য সমাজেও নব নব আন্দোলন উপস্থিত করে। সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর পড়ে; আবার সমাজের প্রভাবও সাহিত্যের উপর পড়ে। সমাজ সংকীর্ণ হইলে বা বিকৃত হইলে সেই সংকীর্ণতা বা বিকার সাহিত্যকেও আক্রমণ করে; সমাজ স্বাধীন ও সুস্থ হইলে তার সেই স্বাধীনতার স্বাস্থ্য সাহিত্যকে নব নব সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ করিয়া রাখে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

# মুসলমান সমাজ

( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি মুসলমান-পরিবার। হিন্দু আইনের বিরুদ্ধ মুসলমান আইন। মূলসূত্রের মধ্যে মুসলমান-আইন, প্রাচীন আরব-আইনই রহিয়া গিয়াছে। সুস্পষ্টতা ও সুনির্দ্দিষ্টতা সম্বন্ধে, আরব-জাতি ব্যবস্থা-প্রণয়ণে যে বিশেষ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহা হিন্দুজাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহার পর, উহারা ইহুদি ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রাচীন গ্রীশ, পারস্য, রোম, বৈজানসিয়া এবং য়ুরোপীয় নবীন জাতি সমুহের প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়। কিন্তু একটি অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহাদের আইন হিন্দুদের ন্যায়, রীতি-নীতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই; উহাদের আইন কতকটা আরবীয় ও কতকটা য়ুরোপীয়, কাজেই ভারতীয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। যাহারা উৎপত্তি-সূত্রে হিন্দু—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরেও হিন্দু রহিয়া গেল। তুর্ক, মোগল, আফ্গান প্রভৃতি অন্য মুসলমানেরা শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক দেশীয় লোকের দৃষ্টান্ত ও আব্-হাওয়ার বশীভূত হইয়া পড়িল। আইন ও লোকপ্রকৃতির বিরোধ বশতঃ উহা হইতে দুইটি পরিণাম-ফল উৎপন্ন হইল: আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবহার এবং মুসলমান-সমাজের অবনতি।

মুসলমান-আইনের স্থূল রেখাগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—আরবদিগের পিতৃ-তন্ত্র-পরিবার-পদ্ধতির স্মৃতি প্রায় কিছুই রহিল না।

সাবালকত্বের বয়স ষোল বৎসর নির্দ্ধারিত হইল। নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতার উপর, উপরিতন পিতৃ-বংশীয়ের উপর অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হইল। কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি-দিগের অবর্ত্তমানেই, মাতা এবং উপরিতন মাতৃ-বংশের লোকেরা উক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার পায়। কিন্তু মাতা পুনর্বিবাহিতা না হইলে, স্বীয় নাবালক পুত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন এবং বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বীয় কন্যার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন। (১)

হিন্দু-আইনের ন্যায় মুসলমান-আইন, অবিভক্ত পারিবারিক স্বত্বাধিকার স্বীকার করে না। এইরূপে দেখা যায়, মুসল-মানেরা সভ্যতার আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে। মুসলমান-আইন দানপত্র-বর্জ্জিত ও দানপত্র-সমন্বিত উভয়প্রকার উত্তরাধিকারই স্বীকার করে। তবে কিনা, দানপত্র-

---

(১) বালক, "সাবি" নামে এবং নাবালক যুবক "মূরাহিক" নামে অভিহিত হয়। ১৬ হইতে ৩৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মুসলমানের পদবী "শাব", ৩৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত "কোহল", তাহার পর মুসলমান, "শেখ" উপাধিতে ভূষিত হয়। তা ছাড়া, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক হিন্দু-জাত এই "শেখ" পদবী গ্রহণ করে। ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারে ২৭, ৬৪৪, ৯৯৩ "শেখ" গণনাভুক্ত হইয়াছে।

সূত্রে কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলে, দানপত্র-বিরহিত উত্তরাধিকারী, সম্পত্তির এক তৃতীয় অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের আইনে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম নাই। কন্যা-দিগের অংশ, পুত্রদিগের অংশের অর্দ্ধেক। কোন মৃত পুত্রের সন্তানেরা স্বীয় পিতৃব্য-দিগের অধিকার-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। মৃত পুত্রের নিকট-আত্মীয়েরা, সন্তানেরা, পত্নী—ইহাঁরা পরবর্ত্তী ভাবী উত্তরাধিকারী।

হিন্দু-আইনের বিপরীতে মুসলমান আইনে, যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহসম্বন্ধীয় চুক্তির সিদ্ধতার পক্ষে, পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছার স্বাধীনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী কন্যা, স্বাধীনভাবে স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করে; অপ্রাপ্ত-বয়স্কা যুবতী কন্যা স্বীয় পিতা অথবা গুরুর সম্মতি গ্রহণ করে; পিতা, অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন; কন্যা যোগ্য বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই বাগ্‌দান হইলে তবেই তাহা সিদ্ধ হয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা, মুসলমান-আইনকে হিন্দু-আইন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে স্থাপন করিয়াছে। এবং হিন্দু-আইনে "অন্ত-র্বিবাহের" যে নিয়ম আছে, মুসলমান-আইন সে সকল নিয়মও স্বীকার করে না!

কেবল মুসলমান-আইনে,—মাতার সহিত, মাতামহীর সহিত, দুহিতার সহিত, পুত্রবধূর সহিত, দৌহিত্রীর সহিত, সহোদরা ভগিনীর সহিত, খুড়ীর সহিত, স্বীয় ধাত্রীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলমান কোন বিধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে পারে—যদি সেই বিধর্ম্মী ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয় (ভারতবর্ষে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগকেও বিবাহ করে)। ইসলামধর্ম্ম মুসলমানকে চারটী ধর্ম্মপত্নী ও অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপপত্নী গ্রহণ করিতে সম্মতি দেয়। বিবাহ-ভঙ্গে কোন বাধা নাই। কিন্তু যে পত্নীকে স্বীয় পতি তিন বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাকে সেই পতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না—যদি তৃতীয় বারের প্রত্যাখ্যানের পর সে আর কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানেরা অনুষ্ঠানপ্রিয় নহে; তাহাদের মতে, বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র; সেই চুক্তির দ্বারা উত্তর-বংশীয়দের বৈধতা সম্পাদিত হয়। মৃতদিগকে বিনা-আড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়। একটি সাদাসিধা প্রস্তর-খণ্ডই মৃতের সমাধি-মন্দির। কিন্তু হিন্দুদের দৃষ্টান্তে অনেক মুসলমানই আজ কাল বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানে আড়ম্বরপ্রিয় ও অতিব্যয়শীল হইয়া উঠিয়াছে।

* *
*

ভারতীয় মুসলমানদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা:—সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণকে যেমন আমি হিন্দুর মূল-আদর্শ রূপে ধরিয়াছি, সেইরূপ বহু শতাব্দী হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আরব পরিবারের বা মোগল পরিবারের কোন সম্ভ্রান্ত সামন্ত শ্রেণীর ব্যক্তিকে মুসলমান জাতির মূল-আদর্শ রূপে গ্রহণ করিব। দৃষ্টান্ত যথা:—হৈদরাবাদের নবাব। উক্ত ধনশালী, পরাক্রান্ত নবাব প্রাসাদে বাস করেন। প্রাসাদটি

প্রাকার-পরিবেষ্টিত এবং বৃহৎ বেষ্টনীর মধ্যে বহুসংখ্যক মণ্ডপ-গৃহ অধিষ্ঠিত। বৃহত্ত্ব ও ধ্বংসদশা এই দুয়ের মিশ্রণই মুসলমান প্রাসাদের পরিচায়ক লক্ষণ। সামন্তরাজ-সুলভ অনুচরবর্গ:—অধীন জায়গীরদার, সৈন্য, ভৃত্য, বাজপাখী-রক্ষক, কুকুর ও শিকারী চিতার তত্ত্বাবধায়ক। কতকগুলি হাতী। কয়েক শত ঘোড়া। বিচিত্র প্রকারের পরিচ্ছদধারী সৈনিক ও ভৃত্য:—হিন্দু, আরব, মোগল, য়ুরোপীয়। আরবেরা আড়ম্বরময় আতিথ্যের অনুরাগী। বড় বড় দালান-ঘরে, অভিজাতবর্গ, সাধারণ জনসমূহ, ভিক্ষুকের দল, মাদুরের উপর অথবা উচ্চ গদির উপর, পা-দুমড়াইয়া বসিয়া আছে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার খাদ্য দেওয়া হইতেছে; কাফি দেওয়া হইতেছে, হুকা দেওয়া হইতেছে। গৃহকর্ত্তা আসিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইনি প্রায় শ্মশ্রুহীন কোন যুবক, অথবা দীর্ঘ-শুভ্র-শ্মশ্রুধারী কোন শেখ। প্রকৃত মুসলমান-সুলভ প্রশান্ত ভাব ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাতে আছে। গোলাকার পাগড়ী, শস্ত্রসমন্বিত শিকারের পরিচ্ছদ। ধীরে ধীরে কথা কহেন, ইহাঁর আদব-কায়দা সম্ভ্রান্তজনসুলভ। এই গর্ব্বিত ধরণের আদব-কায়দা সকল মুসলমানই আরবদের নিকট হইতে শিখিয়াছে।

ইহারা যথানিয়ম নমাজ করে;—কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাব উহাদের খুবই কম। উহারা শাস্ত্রবিহিত উপবাসের নিয়ম পালন করে; দিবাভাগে সুরাপান করিতে বিরত হয়, কিন্তু রাত্রিকালে স্বেচ্ছাসুখে সুরাপান করে (২)। অন্দর-মহলে বহু রমণী, কিন্তু তথায় গার্হস্থ্য জীবন আদৌ নাই:—বিবাহিত পুত্রেরা পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কাজ-কর্ম্ম:—কোন স্বাধীন রাজার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী হইলে এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন কাজ করে, অধীন জাইগীরদার-দিগকে অভ্যর্থনা করে। মোটের উপর, ইহারা অলস, নৈষ্কর্ম্য-ক্লান্ত, আড়ম্বরময় জীবন যাপন করে।

অল্প মুসলমানই ধনবান ও প্রভাবশালী; মুসলমানের না-আছে মনের নমনীয়তা, না-আছে নূতন-সভ্যতার সহিত আপনাকে উপযোগী করিবার ইচ্ছা। তাহার অন্তরাত্মাটা সৈনিকের অন্তরাত্মা; শান্তির দেশে সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না; সেনানায়কের কাজে সে অভ্যস্ত; যে দেশে কোন বিধর্ম্মী সেনা-নায়ক, সে দেশকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না।

মালাবারী নামক একজন পার্সী, গুজরাটস্থ মুসলমান আমীর-ওমরাও-দিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—মুসলমানেরা সুরাটের এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত গুজরাটের প্রভু ছিল। কিন্তু এক্ষণে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শ্রেণীর হিসাবে সম্ভবতঃ তাহারা যার-পর-নাই দরিদ্র। উহাদের অভিজাতবর্গ লক্ষ্যশূন্য উচ্চাভিলাষ-বিরহিত জীবন-যাপন করে। এই সব লোক স্বকীয়

(২) এই স্থলে, সুরাটের মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। বিদেশী সমালোচক মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন সাধারণ ভারতীয় মুসলমান-সমাজের সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না। —অনুবাদক।

কুল-গর্ব্বের চাপেই নিষ্পেষিত ; এবং উহারা অনাহারে মরিবে, তবু ভিক্ষা করিবে না। উহারা "সৌভাগ্যের আঁচল ধরিবার" জন্য সততই প্রস্তুত। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাহাদের নিকট কখনই আসে না। শূন্যগর্ভ ভোগসুখ ও অলস ক্রিয়া-কর্ম্ম লইয়াই তাহাদের নৈতিক জীবন গঠিত এবং তাহাদের যাহা-কিছু ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা "রাজা-রাজা" খেলাতেই নিঃশেষিত হয়। সেই "পুরাতন সুখের দিনের" জন্য তাহারা ক্রমাগত আক্ষেপ করে, এবং তাহারা হতাশ হইয়াও তবু আশা ছাড়িতে চাহে না, এবং সুদিনের জন্য আশা করিয়া-করিয়া আশ্চর্য্য ধৈর্য্য-সহকারে জীবন কাটাইয়া দেয়। সময় কাটে না দেখিয়া অনেকে ইন্দ্রিয়-সুখের হাতে আপনাদিগকে একেবারে সমর্পন করে। এইরূপ "নির্ব্বোধের স্বর্গে" থাকিয়া উহারা নাচে, গানে, পানাহারে সময় অতিবাহিত করে। ভাল কাজের কথায় উহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বেচারা! বন্ধুর হিসাবে দেখিয়াছি উহারা খাঁটি বন্ধু। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই হীন দারিদ্র্যপঙ্কে নিমজ্জিত ; এবং বাহিরে একটা মান-সম্ভ্রমের ভড়ং রাখিবার জন্য (যাহা উহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়) গৃহকর্ত্তার অতীব মমতাময়ী পত্নী ও ভক্তিমতী দুহিতা বাধ্য হইয়া গৃহকর্ত্তার জন্য যে আত্মত্যাগ স্বীকার করে গৃহকর্ত্তা তাহাতে অনুমোদন করেন। কোন কাজকে কর্ত্তব্য বলিয়া এইরূপ ভুল করিলে অবশ্য মার্জ্জনা করা যাইতে পারে—(এইরূপ আচরণ খুবই সীমাবদ্ধ) ; এইরূপ ভ্রান্ত আচরণ রমণীর পক্ষে প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এই আচরণে পতি কিংবা পিতার যে অংশ আছে তাহা না ঘৃণা করিয়া থাকা যায় না। তাহারা হাড়পাকা বহুবিবাহ-ভক্ত, সুতরাং এ বিষয়টা তাহাদের চক্ষে আদৌ গুরুতর বলিয়াই ঠেকে না।" (৩)

এই চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনার্থ, শ্রীযুক্ত মালাবারি, একজন হিন্দু কার্য্যাধক্ষের স্মৃতি-কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন:—একজন আদর্শ-ভৃত্য—তাহার প্রভু আমীর-ওমরাও-দিগের এত ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল যে দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাহার নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রভু দুইজন:—এক যুবক "মীর," আর এক রূপলাবণ্যবতী বুদ্ধিমতী রমণী। পিতার সহিত মনান্তর হওয়ায়, মীর সর্ব্বদাই পিতার মৃত্যুর কামনা করিতে লাগিল ; মনে করিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার ধন-সম্পত্তি পাইলে, মীর স্বকীয় ঋণ পরিশোধ করিবে; কিন্তু পিতার মৃত্যু হইল না, সে মুস্কিলে পড়িল। কষ্টের সীমা চূড়ান্ত মাত্রায় উঠিল, উত্তরাধিকারী পুত্র নিজেই পীড়িত হইয়া পড়িল। মুসলমান হাকিম তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এবং মোল্লাও অষ্টপ্রহর তাহার আরোগ্যের জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার বাপ-মা ব্যতিব্যস্ত ও সংশয়াকুল চিত্তে তাহার চারিপার্শ্বে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। মাতা তাহার শেষ-অঙ্গুরীয়টি—তাঁহার স্বামীর বিবাহ-যৌতুকের অঙ্গুরীয়টি

পর্য্যন্ত আমাকে বিক্রয়ার্থ দিলেন। কিন্তু কোন পার্থিব শক্তিই পুত্রটিকে রক্ষা করিতে পারিল না—পুত্রের মৃত্যু হইল।

এই নিদারুণ সময়ে, গৃহিণী কামরা হইতে বাহির হইয়া দরজার কাছে আসিলেন ( আমরা যত কর্ম্মচারী দরজার বাহিরে জড়ো হইয়াছিলাম )।

তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে আমি দেখিলাম। তিনি তখন নিদ্রার পরিচ্ছদ পরিয়া ছিলেন; তাঁহার রূপলাবণ্য বাস্তবিকই দেবোপম। এবং সম্প্রতি তিনি যে কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন সেই-সব কষ্ট-যন্ত্রণা তাঁহার শ্রী-সৌন্দর্য্যকে এমন এক প্রশান্ত পবিত্র গাম্ভীর্য্যের দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিল যে অতি-বড় উদ্ধত লোকও তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি অবনত মস্তকে তাঁহাকে সেলাম করিলাম। নানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তায় আকুলচিত্ত হইয়া আমি তখন কাঁপিতেছিলাম। তিনি গর্ব্বভরে আমার পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে কিছু অর্থ দিতে পারি কি না। আমি আমার অসামর্থ্য নিবেদন করিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিব বলিয়াও অঙ্গীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন;—"দেখ, নয়ানচাঁদ, তোমাকে তোমার মনিবের মান বাঁচাতে হবে, তাই বলচি তুমি ওর বাপের বাড়ী যেও না। তুমি ভদ্র-রকমে আমার ছেলের গোর দিবার ব্যবস্থা কর, এমন কোন জিনিস কি অবশিষ্ট নেই যা তুমি বিক্রী করতে পার? কিছুই কি নেই? কিছুই কি নেই?" আমার নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তিনি দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি টাকা আনিবার জন্য বাহির হইলাম। আমার হাতে টাকা ছিল না, টাকা ধারও পাইলাম না। এক যদি মীরের নিকট হইতে পাওয়া যায়, সেই একমাত্র সম্ভাবনা। আমি মীরের নিকট গেলাম, তাঁহাকে পৌত্রের মৃত্যুসংবাদ দিলাম। তিনি তখন নিজেই রোগশয্যায় মুমূর্ষু। কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই একশো টাকা আমাকে দিবার জন্য ভৃত্যবর্গকে হুকুম করিলেন।"...তাহার পর, উত্তরাধিকার-সূত্রে বৃদ্ধদিগের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবার জন্য তাঁহার উপর কিরূপ ভার দেওয়া হইয়াছিল, সেই কথা ঐ হিন্দু কার্য্যাধ্যক্ষ আবার বলিতে লাগিলেন:—সেই ভৃত্যের এমনি সততা যে, প্রভূত ধনসম্পত্তির মধ্যে তাহার মনিবেরা ৪০০০৲ টাকা মাত্র পাইয়াছিল। এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎসামান্য পেনসান্ পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আর ঐ ভৃত্য এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত; এখন সে ধনশালা, মান্যগণ্য ব্যক্তি; এখন পাছে মান খোয়াইতে হয় এই ভয়ে মনিবদিগকে সে একটা সেলামও করে না। শ্রীযুক্ত মালাবারি আরও এই কথা বলেন:—

"সাধারণ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বাক্যব্যয় না করাই ভাল। উহারা বৃথা গর্ব্বে পূর্ণ, উহাদের জাঁক-জমক ও জারীজুরীর অন্ত নাই। সত্য কথা উহাদের গলায় যেন আটকাইয়া যায়। সম্রান্ত মুসলমানদিগের

ন্যায় উহারাও কাজ-করাটা হেয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহাদের বিপরীতে, সাধারণ মুসলমানেরা ভিক্ষা করে, টাকা ধার করে, চুরী করে—এমন-কি আনন্দের সহিত এই সব কাজ করিয়া থাকে। উহাদের জীবনের একমাত্র কাজঃ—মদিরা ও প্রমদা। অনেকেই দিনে নিদ্রা যায় ও রাত্রে সুরাপানে প্রমত্ত হয়। এই সকল দুর্ব্যসন সত্তেও, অনেক মুসলমানের কতকগুলি সদ্‌গুণও আছে। এমন বন্ধু, এমন ভৃত্য আর কোথাও মেলে না। যদি উহাদের সহিত তুমি সদয় ব্যবহার কর,—তোমার জন্য উহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিবে।" (৪)

*
* *

অতএব দেখা যায়, একদিকে যেমন হিন্দুসমাজ বহুশতাব্দীকালসহকারে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উচ্চে অধিষ্ঠিত হইলেও মুসলমান-সমাজ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোন সমাজের উন্নতির গতিরোধ হইলেই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। মুসলমান-সমাজের উচ্ছেদেই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রসারে সুবিধা হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# রূপসী

## পাত্র ও পাত্রী

| | | |
|---|---|---|
| নিরঞ্জন | ... | মান্দার-দুর্গাধিপতি |
| আর্য্যধন | ... | নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা |
| রূপসী | ... | নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী |
| বরাট | ... | মোগল-সেনাপতি |
| মহম্মদ | ... | বাদশাহ-পুত্র |
| ভানু | ... | বরাটের বিশ্বস্ত অনুচর |

## প্রথম অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

মান্দার দুর্গের উপরিতলস্থ চত্বর;
নিম্নে মান্দারের মুক্ত প্রান্তর।
ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীর আর্ত্ত কোলাহল
শুনা যাইতেছে।

নিরঞ্জন ও আর্য্যধন

নিরঞ্জন

মান্দারের মাঠ-পথ পঙ্গপালের মত মানুষে ছেয়ে গেছে।

আর্য্যধন

ক্ষুধার জ্বালায় সব মাটী আঁকড়ে পড়ে প্রাণ দিচ্ছে। মা কোল থেকে ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলছে, স্বামী স্ত্রীর টুঁটি টিপে ধরছে! অসহ্য দৃশ্য!

নিরঞ্জন

তুচ্ছ প্রাণের জন্য মায়া-মমতা, স্নেহ-দয়া অকাতরে সব বিসর্জ্জন দিচ্ছে! একবার ভাবছে না—

---

(৪) Gujrat and Gujratis : Mahomedans.

আর্য্যধন

ভাববার অবসর নেই, পুত্র। মৃত্যুর বাঁশী বেজে উঠেছে—সে বাঁশীর সুরে মানুষ পাগল হয়ে যায়, তার কোন জ্ঞান থাকে না!

নিরঞ্জন

এই উন্মাদ প্রাণীর দলকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত, দেখছি—

আর্য্যধন

ঐ যে একদল লোক দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিরঞ্জন

চালাও তোপ! দেবল—

আর্য্যধন

স্থির হও, পুত্র। তুমিও উন্মাদ হয়ো না। কি বলে, শোনো।

নিরঞ্জন

বাতুলের প্রলাপ শুনতে হবে?

আর্য্যধন

ঐ শোনো অভাগাদের আর্ত্তনাদ।

[ একদল লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—“এক টুকরো রুটি দাও—” “চাই না দেশ—” “ভাঙ্গো কেল্লা”, “প্রাণ গেল—”, “খাবার দাও গো, খাবার”, “বাঁচাও মা” ]

নিরঞ্জন

এদের স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি! ক্ষিপ্ত হয়ে এরা যে এই দুর্গের দিকে ছুটে আসছে, এ স্পর্দ্ধা এদের প্রাণে আপনিই জাগিয়েছেন, পিতা! এর জন্য ক্ষমা করা—

আর্য্যধন

ক্ষমা করো না, পুত্র! আমায় বন্দী কর, হত্যা কর! তুমি যদি আজ আমি হতে পুত্র!··· পুত্রের হাতে-গড়া এই সোনার দেশ, পুত্রের প্রাণ-দিয়ে-জাগিয়ে-তোলা এই অসংখ্য নর-নারী—নিরঞ্জন, গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠছে!

[ নিম্নে চীৎকার—“মার কাছে আমরা দরবার করতে এসেছি। তুমিই শুধু আমাদের বাঁচাতে পারো, মা—জননী গো, বাঁচাও, অন্ন দিয়ে বাঁচাও, আমাদের।” ]

শুনছ? এক উপায়, শুধু এক উপায় আছে, পুত্র!

নিরঞ্জন

কাপুরুষ, বৃদ্ধ, তুমি আমার পিতা! শাস্ত্র বলে, পিতাকে ভক্তি কর, ভালবাস! সে এই পিতা! পুত্রের জীবনের সমস্ত আলো বিদ্রূপের ফুৎকারে যে নিবিয়ে দিতে চায়, পুত্রের পুণ্যময় শুভ্র জীবনে কলঙ্কের কালি যে লেপে দিতে চায়, সেই পিতা! ওঃ, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! এর চেয়ে রাক্ষসকে শ্রদ্ধা করা সহজ, নির্ম্মম ঘাতককেও বোধ হয় ভালবাসতে পারি!... আশ্চর্য্য! এই পিতাকে দেবতার মত এতদিন ভক্তি করে এসেছি, এঁরই আদর্শে নিজেকে গড়বার চেষ্টা করেছি!

আর্য্যধন

ভুল করেছ, পুত্র। কিন্তু শোনো, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। মায়া, মমতা, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, তোমার চোখে যে মূর্ত্তিতে ধরা দিচ্ছে, আমার বহুকালের জীর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমি আজ তাদের অন্য মূর্ত্তি দেখছি। আমার মনের মধ্যে এখন কি স্রোত যে বয়ে চলেছে—কত মিথ্যা সংস্কার, মায়ার জঞ্জাল, সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর তার জায়গায় কি আলো, কি সত্য জীবন্ত হয়ে জেগে উঠছে, তা যদি তুমি দেখতে, পুত্র—

নিরঞ্জন

চুপ!—রূপসী এদিকে আসছে!

আর্য্যধন

আমার মা। এসো মা—

( রূপসীর প্রবেশ )

রূপসী

পিতা, এ আর্ত্ত চীৎকার আর আমার সহ্য হয় না। আমি যাব। যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি আমি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন —বৃদ্ধ দধীচি নিজের অস্থি দান করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, আমি সামান্য নারী,—আমার কোন শক্তি নেই—বড় দুর্ব্বল আমি—

আর্য্যধন

তুমি শক্তিময়ী সতী, অন্নপূর্ণা, এই ক্ষুধার্ত্তদের মুখে অন্ন তুলে দাও। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, মা, কীর্ত্তিমান স্বামীর কীর্ত্তি তুমি উজ্জ্বল কর! আমারও জীবন সার্থক হোক্!

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কি বলছ তুমি? কোথায় যাবে?—কিসের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ তুমি?…আমি তোমার চোখের পানে চেয়ে আছি—কি দেখছি, জানো? ঐ চোখে তোমার কি নির্ম্মল সরল দৃষ্টি—শান্ত, উজ্জ্বল বিভা!…..নির্ব্বোধ মূঢ়ের দল—মাটীর কীট এরা, মাটীতে মিশিয়ে দেওয়াই এদের যোগ্য শাস্তি। মিথ্যা মোহে ভুলে এই মাটীর কীটগুলোকে আমি মানুষ করব ভেবেছিলুম! আমার এই তরুণ জীবনের জ্বলন্ত উৎসাহ দিয়ে আমি আকাশে প্রাসাদ গড়তে উদ্যত হয়েছিলুম! স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্নে ভেসে বেড়িয়েছি…আর না, এবার জেগেছি—আর মিথ্যা নয়, মোহ নয়, এবার কঠিন সত্যকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরেছি! এই সব অকৃতজ্ঞ পশু…এদের সুখের জন্য নিজের আরাম, বিলাস, সব ত্যাগ করেছিলুম! অন্যায় করেছিলুম! সেই অন্যায়ের আজ প্রায়শ্চিত্ত করব—এই সব অধম পশুগুলোকে পৃথিবীতে ছেড়ে রাখলে মনুষ্যত্ব এখানে লোপ পাবে—পশুত্বই প্রবল হয়ে উঠবে! তার অবসর দেওয়া হবে না! তোপের মুখে আজই এদের উড়িয়ে দেব। একটি তোপ—রূপসী, শুধু একটি তোপের ওয়াস্তা!

রূপসী

এ কি বলছ তুমি? মাটী চষে বেড়াত এরা—মনুষ্যত্ব, বীর্য্য, মহত্ব, কিছুই জানত না; আজ এদের প্রাণে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে—এই মরু-প্রান্তরে এমন সোনার দেশের প্রতিষ্ঠা করে, আজ—

নিরঞ্জন

একটি ফুৎকারেই উড়িয়ে দেব! ভুল, ভুল করেছিলুম! আর নয়, নীচতাকে বাড়তে দিতে পারি না!

আর্য্যধন

মা, তোমার অন্ধ স্বামীকে দৃষ্টি দান কর—আশীর্ব্বাদ করি, তার দেশের মুখ উজ্জ্বল কর! ( প্রস্থান )

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

কি বলছিলে, রূপসী? এখন বল, এ-যা শুনছিলুম এতক্ষণ, এই অস্পষ্ট আভাষ—এ

সত্য নয়—স্বপ্ন,—শুধু একটা দুঃস্বপ্ন এ? বল—

রূপসী

অনুমতি দাও, নাথ।

নিরঞ্জন

অনুমতি! কিসের অনুমতি চাচ্ছ, রূপসী?...তুমি বুঝতে পেরেছ? বল, স্পষ্ট করে বল, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে, যেন কিসের একটা ঝড় বয়ে চলেছে, উদ্দাম ঝড়।

রূপসী

আজ রাত্রে আমি বরাটের শিবিরে যাব।

নিরঞ্জন।

তুমি তাকে হত্যা করতে চাও? তাই ত, এ কথা আমার মনে হয় নি—রূপসী! কিন্তু...তখনি যে ভয়ঙ্কর গোল হবে!...তুমি কি করে ফিরে আসবে? ক্ষিপ্ত পশুর দল—মান্দারের সে শক্তি কৈ? সে পশুর গ্রাস থেকে তোমায় উদ্ধার করবে, তেমন লোক-বল মান্দারের দেখচি না ত! তবে—? ...বিষ? হাঁ, কিন্তু তেমন বিষ—পেয়েছ কি? খুব তীব্র জ্বালাময় বিষ—নীরবে যা—

রূপসী

কিন্তু এ হত্যায় তোমার মান্দার ত রক্ষা পাবে না, নাথ! মান্দার অন্ন চায়, তাকে অন্ন যোগাতে হবে।

নিরঞ্জন

পাপিষ্ঠা, সত্যই তবে তুমি অভিসারে যেতে চাও?

রূপসী

তিরস্কার করছ! কর,—কিন্তু অনুমতি দাও—

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

তুমি বরাটকে ভালবাস?

রূপসী

আমি তাকে চোখেও দেখিনি কখনো—

নিরঞ্জন

তার শৌর্য্যের কাহিনী শুনে তবে মুগ্ধ হয়েছ?

রূপসী

বিশ্বাস কর, নাথ, রূপসী চিরদিন তোমারই শৌর্য্য-কাহিনী শুনে এসেছে।

নিরঞ্জন

তবে শোন, বরাট তরুণ যুবা—সুপুরুষ! শৌর্য্যও তার অসীম—বিধর্ম্মী হয়েও সে মোগলের ডান হাত!

রূপসী

ও-সব শোনবার প্রয়োজন দেখি না, নাথ—

নিরঞ্জন

রূপসী,—না, ও-সব বাতুলের মন্ত্র ভুলে যাও, তুমি। এস, আমরা পালিয়ে যাই দুজনে! যেখানে হোক, লোকালয় ছেড়ে সুদূর বনে চলে যাই, চল। মানুষ বড় নীচ, বড় হিংস্র, বড় পাষাণ—পরের সুখ সে সহ্য করতে পারে না—তার ঈর্ষ্যা হয়! কাজ নেই আমাদের এমন

লোকালয়ে থেকে। চল, গাছের ছায়ায়-ঘেরা শ্যামল কুঞ্জে বসে তুজনে প্রেমালাপ করব, তুজনে তুজনের কাণে প্রাণের গান অজস্র শুনিয়ে যাব!…এতদিন তোমার পানে ফিরে চাইনি,—রণোন্মাদনায় তোমার এই নব-বিকশিত যৌবনকে উপেক্ষা করে এসেছি। তার জন্য অভিমান করো না, প্রিয়ে। এখনও সময় আছে; বেশী বিলম্ব হয় নি! যৌবন এখনো পালিয়ে যায়নি—চল, সে সমস্ত অবহেলা-ত্রুটি প্রাণ দিয়ে শোধ করব। এখানে বাহিরের তুচ্ছ কোলাহল অনেক শুনেছি, মানুষ অনেক দেখেছি। আর নয়—বড় শ্রান্ত হয়েছি, রূপসী—চল! এখানে কি সুখ? সুখ পাইনি! সুখ নেই! শুধু নেশায় মেতেছিলুম! এখানে নিত্য দ্বন্দ্ব—নিত্য হিংসার গর্জ্জন—নিত্যই অহঙ্কারের আস্ফালন!…চলে এসো, অভিমান করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

রূপসী

অভিমান! কিসের অভিমান নাথ? কোনদিনই ত অভিমান করিনি, আমি! তুমি কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছিলে, আমি গৃহের কোণে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখছিলুম! গর্ব্বে আমার ছোট্ট মনটুকু ভরে উঠছিল। তাই ত আমি আজ এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছি! মনে আমার আজ কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ নেই! তোমার সাধের মান্দার—সেই মান্দারের কোন কাজ যদি করতে পারি—

নিরঞ্জন

না, রূপসী, কিছু করতে হবে না। আর কাজ নেই কিছু করে! এস আমার

রূপসী

কিন্তু এখন যে যাবার উপায় নেই—কর্ত্তব্যকে এমনভাবে তুমি বলি দেবে?

নিরঞ্জন

কর্ত্তব্য! কিসের কর্ত্তব্য, কার উপর কর্ত্তব্য, রূপসী?

রূপসী

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নাথ। সময় যায়। ঐ দেখ, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—এতগুলো নর-নারীর প্রাণ তোমার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েছে শুধু—তাদের রক্ষা কর!

নিরঞ্জন

রূপসী, তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার? এ-সব কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না—?

রূপসী

বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাথ। আমি বড় তুর্ব্বল, তুমি আমায় শক্তি দাও। এ বড় কঠিন কাজ নাথ, জানি, কিন্তু তবু এ যে করতেই হবে। দাও, অনুমতি দাও—

নিরঞ্জন

অনুমতি! অনুমতি দেওয়া এতই সহজ ভাবো, নারী? তুমি বুঝছ না? এত দিন আমার বুকের মধ্যে থেকে, আমার সকল চিন্তা, সকল স্বপ্ন, সকল আশা তন্ন তন্ন করে দেখে বুঝেও আমার দিকে চেয়ে অম্লান বদনে তুমি বলছ, অনুমতি দাও!… আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে—তোমারও যাচ্ছে, বলছ—এ যদি সত্য হয়, তবে কেন আর এ নিষ্ঠুর আঘাত করছ, রূপসী?

[ নিম্নে কোলাহল—"মাগো, বাঁচাও—দয়া

রূপসী

ঐ, ঐ শোনো অভাগাদের করুণ কাতর আর্ত্তনাদ! না, আমার সহ্য হচ্ছে না। দাও, অনুমতি দাও, এ-ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই!

নিরঞ্জন

কোন উপায় নেই—তাই এই বর্ব্বর কুৎসিত প্রস্তাবকে মাথায় তুলে নিতে হবে? এত বড় অধর্ম্মকে আশ্রয় করে নীচ কতকগুলো পশুর প্রাণ বাঁচাতে হবে? ওঃ, ভগবান—না, ভগবান নেই, না হলে এ কুৎসিত কথা সে দুর্বৃত্তের মুখ থেকে বেরুবার আগে তার মাথায় বাজ পড়েনি? এত বড় অধর্ম্ম বিজয়-গর্ব্বে নিজের কাজ হাসিল করে যাবে?... না, কখনো না। আমি থাকতে কখনো তা হতে দেব না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সব আজ সমূলে ধ্বংস করব! এই সব হতভাগা কাপুরুষের দল—পা দিয়ে চেপে এদের মেরে ফেলব। কহ্লন, বন্ধু, দাগো তোপ—

রূপসী

স্থির হও—(হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(সবলে হাত ছাড়াইয়া) না, ছেড়ে দাও, রূপসী—মিথ্যা এ অভিনয়ের প্রয়োজন নেই!···আর এই সব বর্ব্বরের দল—এদের কারো কি ঘরে নারী নেই? স্ত্রী নেই, ভগ্নী নেই, মা নেই—যে, নারীর নারীত্বের মূল্যে সব জীবন কিনতে অনায়াসে উদ্যত হয়েছে? এদের তুমি বাঁচাতে বল, রূপসী—? এদের নিশ্বাসে বাতাস কলুষিত হয়, মনুষ্যত্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়—···ঐ দেখ, তোমার নিজের পানে একবার চেয়ে দেখ, এদের নিশ্বাসে তুমি পাষাণ হয়ে গেছ! তোমার দৃষ্টি অকম্পিত, চোখে এক ফোঁটা জল নেই!··· উঃ, এই কি পৃথিবী? আমার চারিধারে শুধু ভীষণ মরু ধূ-ধূ করছে—মায়া নেই, মমতা নেই, কিছুই নেই, শুধু হিংসার জ্বলন্ত ক্ষুধা—প্রচণ্ড বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা... (সহসা দুইহাতে রূপসীর হাত চাপিয়া ধরিয়া) রূপসী, একদিন ত তুমি আমায় স্বর্গ-সুখ দিয়েছিলে—তবে, আজ—

রূপসী

নাথ (হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(হাত ছাড়াইয়া) না, আর নয়, ঐ কোমল হাতের স্পর্শে আর আমি ভুলছি না। পিতার কথাই ঠিক। তিনিই তোমায় ঠিক চিনেছিলেন! পাষাণী তুমি! আমি যৌবন-মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে ছিলুম—তোমায় চিনিনি, জানিনি!... থাক্, আর কেন? তুমি যেতে পারো—তোমায়-আমায় কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যা আর অনুমতির দোহাই দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা কেন করছ? তুমি যাও—

রূপসী

না, মুখ ফিরিয়ো না। চেয়ে দেখ নাথ, আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ! ভুল বুঝো না—তোমার মান্দার—প্রাণের মান্দার—আমার সে যে কি—কতখানি সে আমার বুকে—(অশ্রু-মার্জ্জনা করিল)

নিরঞ্জন

আর মায়া নয়, রূপসী। আমি দুর্ব্বল নই, উন্মাদ হইনি—বেশ স্থির হয়ে আছি! চোখের জলে এখন আর গলব না—

তোমার কোন ভয় নেই, তুমি যাও। ভেবো না, নারী, নির্ব্বোধের মত নিজেকে আমি হত্যা করব! তেমন মতিভ্রম হয়নি আমার। কেন? একটা নারী—তার লাবণ্য-ভরা প্রলোভন-ঘেরা দেহের জন্য? হাঁ, দেহ শুধু! মন—? কোথায় মন—নারীর আবার মন? কবির কল্পনা সে!···শুধু নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে—এতদিন এই তুচ্ছ খেলনা নিয়ে খেলা করেছি। যাও, যাও রূপসী—অভিসারিকা নারী, অভিসারে যাও—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

বৃথা চেষ্টা, রূপসী। নদীর যে স্রোত চলে যায়, তাকে আর ফেরানো যায় না। যা গেল, তা আর ফিরবে না! ভ্রূ-বিলাসে নিরঞ্জন আর ভুলচে না—

রূপসী

বড় ভুল বুঝছ তুমি! কি করব? আমায় যেতেই হবে। ফিরে এসে তোমায় বোঝাব, নাথ—[ স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল ]

নিরঞ্জন

ফিরে এসে!... ঐ মুখ নিয়ে আবার তুমি ফিরবে? সে সাধ আছে? বেশ, ফিরো... সে এক চমৎকার দৃশ্য হবে। আমিও যোগ্য বেশে সজ্জিত থাকব,—তখন আর এক নূতন অঙ্কের অভিনয় সুরু হবে—দেখবার কৌতূহল হয় বটে!

রূপসী

আসি নাথ। আশীর্ব্বাদ কর—না, কোন প্রার্থনা নিয়ে যাব না, শুধু ঐ পায়ের ধূলো!

( নিরঞ্জনের পদধূলি লইতে গেল; নিরঞ্জন পা সরাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল )

বড় ভুল বুঝলে নাথ! যদি আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখতে!

( ধীরে ধীরে প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

মোগল-শিবিরের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

বরাট ও ভানু।

ভানু

দিল্লী থেকে এই পত্র এসেছে। বাদশাজাদাও এসেছেন; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বরাট

( পত্র-গ্রহণান্তে ) বড় জরুরি খবর আছে, বল।

ভানু

বাদশাজাদা শিবিরে অপেক্ষা করছেন।

বরাট

অপেক্ষা করছেন! এ যে খোদ বাদশার পাঞ্জার ছাপ দেখচি। হাতের লেখা—বাদশাজাদা নিজের হাতে লিখেছেন। মহম্মদেরই কাজ সব। ( পত্র-পাঠান্তে ) আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। মোগল মুলতব খাঁ মান্দার দখল করতে চেয়েছিল, হিন্দু আমি তাকে বাধা দিছি; পরিশ্রান্ত শত্রুকে বল-সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ দিয়ে আমি অলস হয়ে বসে আছি; তাই আদেশ হয়েছে, ফৌজের ভার বাদশাজাদার হাতে দিয়ে আমায় দিল্লী ফিরে গিয়ে আমার আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।...এ গভীর ষড়যন্ত্র

ভানু, অতি নীচ চক্রান্ত!... ভেবেছে, ভয়ে কম্পিত হয়ে নতশিরে গিয়ে আমি সেখানে দাঁড়াব,—একটা হীন অপরাধীর মত!... ভুল বুঝেছে! এতদিনেও মোগল আমায় চেনেনি, দেখচি।

ভানু

বাদশাজাদা দেখা করতে চান—

বরাট

ও! মহম্মদ নিজে এসেছে! আর কারো হাতে চিঠি পাঠাতে ভরসা পায়নি! ভেবেছে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় চমকে দেবে! গর্দ্দভ! তা বেশ! এই মুখোমুখি দেখায় অনেক জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে, মোগল আমার সঠিক পরিচয় পাবে! এই কাপুরুষ মহম্মদ—

ভানু

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—

বরাট

তাইত! আর্য্যধন এখনো ফেরেনি—না? তাহলে আমার প্রস্তাবে ওরা সম্মত! নাহলে বৃদ্ধ ফিরে আসত।... সীমানায় আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরী খাড়া আছে ত? তাকে বলে রেখেছ, এক নারী আমার শিবিরে আসতে চাইলে, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়, সসম্মানে যেন এখানে নিয়ে আসে?

ভানু

লালসিং আর গুজ্জারি সীমানার প্রান্তে পাহারা দিচ্ছে। আপনার আদেশ তাদের জানিয়েছি।

বরাট

লালাসিং আর গুজ্জারি! তারা আমার জন্য জান্ দিতে পারে, জানি, তবু তুমিও যাও ভানু, অলক্ষ্যে থেকে এই নারীকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আর রসদের গাড়ী তৈরী আছে—যা-যা বলেছি? সে নারী শিবিরে পা দেবামাত্র যেন ঐ সব গাড়ী মান্দারে যায়—খুব হুঁসিয়ার প্রহরী সঙ্গে দিয়ো। তারা যেন কোন রকম অভদ্রতা সেখানে না করে। অত্যাচার হলেও নীরবে সব সহ্য করবে, এমন লোক সঙ্গে দিয়ো।... ঐ যে দূরে মান্দার দুর্গের উপর নক্ষত্রের মত একটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে, না? সন্ধ্যার অন্ধকারে তারার মতই ঐ জ্বল্ জ্বল্ করছে? হাঁ, ঠিক। সম্মতির সঙ্কেত!... এই ক্ষণটুকুর জন্য কত দিন থেকে যে প্রতীক্ষা করে আছি! আমার কৈশোরের স্বপ্ন সফল হবে,—এ কি সম্ভব! উচ্ছৃঙ্খল জীব তার অবলম্বন পাবে?... ভানু, তুমি যাও, মহম্মদকে আমার সেলাম দাও গে—আর বলবীরকে আমার শিবিরের বাহিরেই সতর্ক থাকতে বলে দিয়ো—

( ভানুর প্রস্থান )

মোগল ভেবেছে, চোখ রাঙিয়ে বরাটের সব সঙ্কল্প ভেস্তে দেবে! বড় বুদ্ধিমান মোগল, আর বরাটকে সে ভেবেছে, একটা নির্ব্বোধ বালক!

( মহম্মদের প্রবেশ )

আসুন শাহজাদা, সেলাম!

মহম্মদ

সেলাম!

বরাট

আসতে আপনার কোন কষ্ট হয়-নি, শাহজাদা?

মহম্মদ

না। সেনাপতি, ঐ দূরে মান্দার দুর্গের উপর একটা আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের ফৌজ ও আলো দেখে চঞ্চল হয়েছে। আপনি জানেন, হঠাৎ ও আলো কেন দেখা যাচ্ছে?

বরাট

আপনার কি মনে হয়, ও কোন সঙ্কেত?

মহম্মদ

নিশ্চয়! আরও বিশ্বাস হচ্ছে, ও আলোর সঙ্গে মোগল সেনাপতিরও কোন সম্পর্ক আছে! সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

বরাট

বলুন, আমিও শোনবার জন্য প্রস্তুত।

মহম্মদ

বরাট—

বরাট

'সেনাপতি' বলবেন, শাহজাদা। এ রণ-ক্ষেত্র, শাহজাদার মজলিস নয়। এ সব্ আদব-কায়দা মেনে চলবেন, শাহজাদা।

মহম্মদ

সেনাপতি বরাট, আপনি বাদশার পত্র পড়েছেন? তাঁর আদেশ জানেন?

বরাট

হঠাৎ আমায় এতটা নির্ব্বোধ ঠাওরাচ্ছেন কেন, শাহজাদা! আমি লেখা-পড়া জানি এবং আমার নামের পত্র আমি নিজেই পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারি। এ পত্র আমি পড়েছি, এবং পড়ে বুঝেছি, এ একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে। আরও বুঝেছি, সে চক্রান্তের মূলে আছেন, আপনি।

মহম্মদ

আমি?

বরাট

হাঁ, আপনি।

মহম্মদ

কিন্তু মুলতব খাঁ গিয়ে বাদশার দরবারে গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র মান্দার যখন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার গোলা-বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে, খাদ্যের অভাবে মান্দার একেবারে নির্জ্জীব, তখনই ত মান্দার-অধিকারের সুন্দর সুযোগ—আপনি সে সুযোগ উপেক্ষা করে দিব্য অলস হয়ে বসে আছেন! এই কি মোগল-সেনাপতির যোগ্য কাজ? নিমকের—

বরাট

সাবধান হয়ে কথা বলবেন, শাহজাদা। বালকের চাপল্যেরও একটা সীমা আছে! এ যুদ্ধে সেনাপতি আমি, মুলতব নয়, আপনিও নন। আর আমার উপর সে বিশ্বাস না থাকলে এত বড় মোগল-বাহিনীর ভার বাদশা আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না! আমার জায়গায় মুলতবকেই তিনি সেনাপতি করে পাঠাতেন।

মহম্মদ

বাদশা ভুল করেছিলেন, তখন আপনাকে চিনতে পারেন নি—এখন চিনেছেন। আপনি যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক—

বরাট

বাসনা সংযত করো, বালক। আমারও রক্ত-মাংসের শরীর। আমি বৃদ্ধ নহি, রক্ত আমার সহজেই গরম হয়ে ওঠে—

মহম্মদ

চোখ-রাঙানিতে ভয় করি না, সেনাপতি। মনে রাখবেন, আমি ভাবী মোগল-সম্রাট।

বরাট

আর আপনিও মনে রাখবেন যে মোগল সাম্রাজ্য আমার একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাসেই আমি উড়িয়ে দিতে পারি!

মহম্মদ

এ উত্তম, সেনাপতি—

বরাট

বালক, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার লজ্জা হচ্ছে! কিন্তু শোন, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই মুলতবের কথায় এতখানি নৃত্য করে উঠেছ! মুলতব্বের সঙ্গে তোমার যে চিঠি-পত্র চলেছে, জেনো, সে সব আমার হাতে পড়েছে। মোগল আমায় ঈর্ষ্যা করে! আমার সাহস, আমার বীরত্বে সে ভীত, তাই সে আমায় বাধা দিতে চায়। মোগলের ভয় হয়, কি জানি, আমার এ সাহস পাছে কোনদিন দিল্লীর বাদশাহী-তখ্‌তের দিকে আমায় চালিত করে! ··· চমকে উঠবেন না, শাহজাদা—
—আমি মোগলকে চিনি। সে একজন বিধর্ম্মীকে বড় হতে দিতে চায় না,—এ আমি জানি! কিন্তু মনে রাখবেন, শাহজাদা, মোগল বরাটকে বড় করেনি, বরাটই মোগলকে প্রকাণ্ড বিস্তৃত করে দিয়েছে। দিল্লীর তখ্‌তের দিকে কোনদিন যদি বরাটের লক্ষ্য থাকত, তাহলে বালক মহম্মদ আজ আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেত না, জানবেন, সে আমার পাদুকা সাফ করতে পেলেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করত!

মহম্মদ

এত স্পর্দ্ধা! (সহসা তরবারি টানিয়া বরাটকে আঘাত করিল; বরাট চকিতে সে আক্রমণ হঠাইতে গেলে তাহার চোখের নীচে একটা চোট্‌ লাগিল ও রক্ত-ধারা বহিল)

বরাট

(সবলে মহম্মদের তরবারি কাড়িয়া লইয়া) এ আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না, আমি। বীর মোগল—(মহম্মদকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, তরবারি উঠাইল) এখন—?

মহম্মদ

আমায় মেরে ফেল বরাট, আমি এ ঘৃণ্য জীবন নিয়ে আর একদণ্ড বাঁচতে চাই না।

বরাট

বরাট বীর—কাপুরুষ নয়। সে হিন্দু, মোগল নয়। করতল-গত শত্রুকে সে হাসি-মুখে মাপ করতে পারে! (মহম্মদকে ছাড়িয়া) উঠে দাঁড়াও, মহম্মদ। যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সাধ থাকে, তাহলে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করো। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব। ·· কিন্তু শোনো মহম্মদ,—যদি বাদশাহী করবার বাসনা থাকে, তবে মনকে বড় কর—নীচ, হীন, জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ো না; খল, হিংস্র পরিজনের চাটুবাদে আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না। বাদশাহী মন নিয়ে বাদশাহীর কামনা করো। ··· শোন মহম্মদ, বরাট নিমকের মর্য্যাদা রাখে—সে বিশ্বাস-ঘাতক নয়। আমি যদি আজও অবসর পেয়ে মান্দার অধিকার না করে থাকি ত জেনো, তার মধ্যে আমার গভীর উদ্দেশ্য আছে—জেনে রেখো, বরাট মুখে যে কথা দেয়, কাজেও তা করে! কোন প্রলোভনে কথার খেলাপ করে না সে। সেই সঙ্গে

আরো মনে রেখো, বরাট প্রকাণ্ড দুঃসাহসী যোদ্ধা হলেও সে মানুষ!

মহম্মদ

আবার হেঁয়ালির জাল বুনে চলেছ!

বরাট

সময়ে সব বুঝতে পারবে—একটু ধৈর্য্য রেখো শুধু।

মহম্মদ

তাহলে বাদশার কাছে যে কৈফিয়ৎ তলব হয়েছে—

বরাট

সে কৈফিয়ৎ বরাট দেবে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—বালক। আর সেই সঙ্গে এই কাটা দাগও অনেক কথা বলবে। (মহম্মদ গমনোদ্যত)... যেয়ো না, দাঁড়াও। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ড নিতে হবে, শাহজাদা। আপাততঃ যুদ্ধ-শেষ না হওয়া অবধি আপনি আমার বন্দী। কুকব—(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) তুমি আর জহর শাহজাদার জন্য দায়ী। শাহজাদা আমার বন্দী—আমার আদেশ-ছাড়া তিনি বন্দীশালা ত্যাগ করতে পাবেন না। বুঝলে—? এই আমার আদেশ।

মহম্মদ

এতদূর!

বরাট

এ অতি লঘু দণ্ড, শাহজাদা! আপনি বালক, তাই আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট হবে, মনে করি।

(মহম্মদ ও কুকবের প্রস্থান)

উদ্ধত বালক! এই ঔদ্ধত্যই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে! এই সন্দেহই মোগলকে টিঁকে থাকতে দেবে না, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই নীচতা, এই হীন চক্রান্ত—

(ভানুর প্রবেশ)

ভানু

আপনি শাহজাদাকে বন্দী করেছেন?

বরাট

হাঁ। বালকের ঔদ্ধত্যকে একটু সিধা করতে চাই।

ভানু

কিন্তু এতে বিপদ ডেকে আনচেন যে—

বরাট

বিপদ!...ভানু, বিপদকে যদি বরাট ভয় করত, তাহলে আজ পৃথিবীতে বরাটের চিহ্নও থাকত না। যাক্—আজ এখন আর অন্য কথা নয়—ওদিককার খপর কি, ভানু? সে আসছে? ...সারা জীবন ধরে এই ক্ষণটুকুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। কখনো ভাবিনি, এ ক্ষণটুকু সত্য হয়ে ফুটবে!...ভানু—(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ) ও কি—বন্দুকের আওয়াজ কেন? যাও, যাও, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না ত?

ভানু

না, ও আমাদের বন্দুক! এ কি—আপনার চোখের নীচে রক্ত যে!

বরাট

মহম্মদ আঘাত করেছে!

ভানু

মহম্মদ?

বরাট

হাঁ, অতর্কিত আঘাত! তাকে ক্ষমা করেছি—নাহলে বাদশা এতক্ষণে পুত্রহীন

হতেন।...ঐ যে আলো দেখা যায়—কাছেই। ভানু, সে এসেছে—

ভানু

এক নারীর অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বরাট

সে এসেছে। ভানু যাও, সসম্মানে তাকে আমার শিবিরে নিয়ে এসো। দেখো, যেন কোন রকম অমর্য্যাদা না হয়!

( ভানুর প্রস্থান ; বরাটের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ) ক্রমশ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এ-পারে ছিল চওড়া রেলপথ, ও-পারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেল-পথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্দ্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ও ত গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলা দেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা মুখের বুলির পথ, আর একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই-একজন সাহসিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, পথ এক-মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু-ভাষার পক্ষে তাঁহারা যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা-ভাষায় আর যাই হোক্, সাধুতার চর্চ্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমার যে কি মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়া-ছিলাম চারিদিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিত কালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা যে এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রকৃত বাংলা-ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে

আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশী। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গোরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহঙ্কার। মনে আছে বহুকাল পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালীর শিক্ষা বাংলা-ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালী আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয়,তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তাহার অহঙ্কার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এ-পক্ষে বা ও পক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু সবুজপত্র-সম্পাদকের বুদ্ধি না কি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেক দিন হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাষাসম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন কি, রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহঙ্কার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহঙ্কারটা যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পংক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত। পদ্য-রচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোদিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে-বাঁধন নূপুরের মত, তাহা বেড়ির মত নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

"ক্ষণিকা"য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা-ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ-ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টুঘোড়ার মত কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য "ক্ষণিকা"য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন,

কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

যাই হোক্ এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই :—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা-ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন-একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞ-কর্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়া-পেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তাহার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত-বাংলা বাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে প্রয়োজন-মত সংস্কৃত-ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত-ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালীর ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্য্যন্ত বাংলা-গদ্য, সংস্কৃত-ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে-সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া সুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার সুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তাহার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তাহার কারণ আছে। যে-গদ্যে বাঙালী কথাবার্ত্তা কয়, সে-গদ্য বাঙালীর মনো-বিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালী যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তাহার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালী যে ইতিপূর্ব্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তার চেয়ে বড়-কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা-ভাষায় মনন করা বা মতপ্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ-চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ-চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সব-চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত-বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিতপ্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। "প্রার্থনা" সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ "চাওয়া"। "প্রার্থিত" ও "প্রার্থনীয়" শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক "চায়িত" "চাওনীয়" বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্য-পদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এপর্য্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার তদ্ধিত-প্রত্যয় পর্য্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সাম্‌লাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ-তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তভিটার মাঝ-খানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটি-গাড়ি হয়, আবার অপর-পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুস্কিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক পা চলিবার জো নেই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে-পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে-পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশী। পথটাই যেখানে

দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা-অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে-দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে হাওয়ার কথা, সে-দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদেব চোখ-টিপিয়া ইসারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানীদের ঠিক এই বিপদ। চীন ভাষার শাসন জাপানী ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত-জাপানী প্রাকৃত বাংলার মত; নূতন প্রয়োজনের ফরমাস জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে-শক্তি প্রাচীন চীন ভাষার আছে। এই চীন ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানী ভাষাকে চলিতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানী-সাহিত্যের বড়ই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটা একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া, সেখানে ফসলের দুর্দিন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা অসম্ভব শক্তির সদ্ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিত-মশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত-বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মত বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ-কথা বলিবার হেতু কি? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে-ঘরে মুখে-মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্ব্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্ব্বে সাধুভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেই জন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহঙ্কারে ঘা লাগিলেই সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে

লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের পুত্র বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা, চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য-সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসঙ্গতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে-মাঝে মুখ-বাড়াইতে সুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয় কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্ত্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে-অংশটা লইয়া বিশেষ ভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। "হইবে"র জায়গায় "হবে", "হইতেছে"র জায়গায় "হচ্চে" ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনেরা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির থর্ব্বতাকে তারা মানের থর্ব্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে আপদ গেছে। এক-সময়ে ছাপার বহিতে "হয়েন" লেখা চলিত, এখন "হন" লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। "হইবা" "করিবা"র আকার গেল, "হইবেক" "করিবেক"-এর ক খসিল, "করহ" "চলহ"র হ কোথায়? এখন "নহে"র জায়গায় "নয়" লিখিলে কেহ বড় লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা "কেহ" লিখি, তেমনি একসময়ে ছাপার বইয়েও "তিনি"র বদলে "তেঁহ" লিখিত। একসময়ে "আমারদিগের" শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন "আমাদের" লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম "সেহ" এখন সেখানে লিখি "সেও" অথচ পণ্ডিতের ভয়ে "কেহ"কে "কেও" অথবা "কেউ" লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক "করিহ" শব্দটাকে "করিয়ো" লিখিতে সঙ্কোচ করি না, কিন্তু তার বেশী আর-একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই ত আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা "যাইয়াছি" "যাইল" কথা চালাইয়া দিলেন

তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। "যা" ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই চলে, যথা, যাই, যাও, যায়। আর, "যাইতে" শব্দের যোগে যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে যেমন, "যাচ্চি" "যাচ্ছিল" ইত্যাদি। কিন্তু "যেল" "যেয়েছি" "যেয়েছিলুম" পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি "গেল" "গিয়েছি" "গিয়েছিলুম"। তার পরে পণ্ডিতেরা "এবং" বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত-বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দব্যবহারের যে মিল আছে তাও ত দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত "অপর" শব্দের আত্মজ যে "আর" শব্দ, সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলায় "ও" বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি "and" শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে—কিন্তু কখনও বলি না "আমি ও তুমি যাব।" সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি "বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।" যদি ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি "বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।" এর মধ্যে "এবং" কিম্বা "ও" কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা-ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মৎলব এই যে, পণ্ডিতমশায় যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলা-রীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃত-রীতিকে লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ করি? "মনোসাধে" আমাদের লজ্জা কিসের? "সাবধানী" বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং "আশ্চর্য্য হইলাম" বলিলে পণ্ডিতমশায় "আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন" কি কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই —যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম-অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে-ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্ত্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশী আর তাহার নড়িবার হুকুম নাই।

সবুজপত্র-সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা-বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলিন্যের নির্ম্মম শাসন ভেদ করিবেন

এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুসিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুসিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো-একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে "গেনু" "করনু" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং "ভেয়ের বে" (ভাইয়ের বিয়ে) "চেলের দাম" (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বল—তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভা-বলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ-কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজ-নৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিমে

দেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলা দেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাসে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত পা বুক পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপন খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলা দেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলা দেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে-তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশী। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই

অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্ত্তমানে এই চল্‌তি ভাষায় লেখা, পুঁথির ভাষায় লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই এই জন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ওঠে। সবুজপত্র-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করিয়া দেয় তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই কানে হাত দিয়া দেশ ছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্য্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যাহারা বহন করিয়া আনে তাহারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তাহারও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিন তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্য স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূর পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চিরপ্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তাহার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তাহার বিলাসিতা তাহার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে অবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, সেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা লাটিন এবং রাজভাষা ফরাসীর একটা কৌলীন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তাহার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে, আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে।

এমন কি, বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্ণার্ড্ শ, ওয়েল্‌স্, বেনেট, চেস্‌টরটন্, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হাল্‌কা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে সাহিত্য পদার্থ টি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট— এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে "পয়লা সামাল্‌না মুস্কিল হ্যায়" স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# মাসকাবারি

## চিত্তরঞ্জনের "বাঙ্গলার কথা"

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ সম্প্রতি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সেই অভিভাষণের নাম দিয়াছেন "বাঙ্গলার কথা"; কারণ অভিভাষণে তিনি বাংলার জাতিত্বের বিশিষ্ট রূপ, বিশ্বজাতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ, বাংলার পল্লীর প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, বাংলার কৃষি-বাণিজ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার সাবেক ও হাল ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এবং বাংলার সামাজিক জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিলে তাহার উন্নতি হইতে পারে, এতগুলি বিষয়ের অবতারণা ও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর পুস্তিকার নামটি বেশ সঙ্গত নামই হইয়াছে; বস্তুত বাংলার সমস্ত কথাই এই পুস্তিকাটিতে আলোচিত হইয়াছে বটে।

আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রসভা "রাজনৈতিক আন্দোলন" হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে এবং সেই আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখাই তাহাদের মুখ্য কাজ। প্রজার স্বত্ব ও স্বাধীনতার দাবী রাজার কাছে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জানাইবার জন্যই প্রধানত এই সকল রাষ্ট্রসভার আয়োজন। ইহাদের পিছনে রাজ্যচালনার কোন দায়িত্ব নাই; এই সকল সভার সহিত দেশের অশিক্ষিত সাধারণের কোন যোগ নাই, যোগ স্থাপনের জন্য কোন উদ্যোগ বা উদ্বেগও নাই। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতী রাজনীতি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার চাহিয়া থাকেন; তাঁদের সেই চাওয়াটাকে তারস্বরে গাওয়াই কন্‌গ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব এই উদ্দেশ্যের প্রতি যে ব্যক্তির সহানুভূতি আছে, তাঁরই পক্ষে এই

* সবুজ পত্র হইতে।

সকল রাষ্ট্রসভার কাজে যোগদান করা স্বাভাবিক; যাঁর সহানুভূতি নাই এ সব সভার কাজে তাঁর যোগ দিবার কোন প্রয়োজনও নাই।

চিত্তরঞ্জনবাবু কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান্ নন্, তাঁর অভিভাষণে তাহা পরিষ্কার ভাষায় জানিতে দিয়াছেন। যথা:—

"আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে?......আমাদের কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য শ্রেণীভুক্ত?"

"আজ যে আমরা Industrialism Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি,...কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধার করা Indian Nation তৈয়ারী করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি।"

প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির মুখে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এই ব্যঙ্গোক্তি নিতান্তই অশোভন হইয়াছে।

কন্‌গ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বাবু যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র নূতন নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এ সকল কথার যথেষ্ট আবৃত্তি হইয়া গেছে, কন্‌গ্রেসের নীতিকে তখন ভিক্ষুকের নীতি (mendicant policy) বলিয়া একদল স্বাদেশিক প্রচুর অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেরও বিশ বছর পূর্ব্বে রবিবাবু তাঁর লেখায় ও গানে এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

"মিছে,
কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা
চোখে নাই কারো নীর
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ
আপনি করিনে আপনার কাজ
পরের 'পরে অভিমান।"

এবং স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে "স্বদেশী সমাজ" প্রভৃতি বক্তৃতায় এই "ধার-করা নেশন" তৈরির বিপদ সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমাজের সমস্ত কল্যাণভার দেশবাসীদের স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চিরন্তন ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিতে হইবে—এই কথাই রবিবাবু পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তবু, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়া রবিবাবু তাঁর অভিভাষণে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে কোন অশোভন বা অসঙ্গত উক্তি প্রকাশ করেন নাই। সেই বক্তৃতায় তাঁর একটি উক্তিতে তিনি কন্‌গ্রেসের স্বভাব সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার অভাব সম্বন্ধেও তেমনিই সুনিপুণভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেই উক্তিটি এই:—
"কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশঃ পরিস্ফুট আকার

ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য।" অথচ দেশের ইচ্ছা-শক্তিকে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত করিবার লক্ষ্যটাকে এই সকল রাষ্ট্রসভা যে চোখের সাম্‌নে রাখেন নাই, তাহা রবিবাবু বেশ জানিতেন। তবু সেই লক্ষ্যের দিকেই এই সকল সভার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে, এই ভরসাটুকুকে খোলসা করিয়া বলার জন্য তিনি এই সকল সভার দায়িত্বকে খুব বড় করিয়া ধরিবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বাবু প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হইয়া শুধু যে সেই সম্মিলনীর প্রতিই অবজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তা নয়, সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোহিত ও নেতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অযথা নিন্দাবাদ করিয়া সভাপতির পদের অবমাননা করিয়াছেন। অথচ মজা এই যে, তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটির গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ভাব ও স্থানে স্থানে ভাষাও তিনি রবিবাবুর প্রবন্ধাদি হইতে, জ্ঞাতসারে হোক্ বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক্, গ্রহণ করিয়াছেন। কতকটা অজ্ঞাতসারে বলিলাম এইজন্য যে, আধুনিক অনেক লেখকেরই মত চিত্তরঞ্জন বাবুও রবীন্দ্রনাথের নিকট সর্ব্ববিষয়েই ঋণী, তাহা তাঁহার যে-কোন রচনা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। সুতরাং লিখিবার বেলায় তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন না হইতেও পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও একেবারে অচেতন হইবার কোন কারণ পাই না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও কাজের প্রস্তাবগুলি কালের হিসাবে এখনও এতটা পুরাণো হইয়া দাঁড়ায় নাই যে তাহাকে সত্যসত্যই পুরাণের মত বা traditionএর মত যে খুসি সেই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী যখন এ দেশে নানালোকের মুখে মুখে চলিয়া গেল, তখন কালক্রমে তাঁদেরি কথার উনিশ বিশ করিয়া বাংলা দেশে বিস্তর পদকর্ত্তা দেখা দিয়াছিলেন। কোন বড় জিনিষ একবার চলিয়া গেলে তখন লোকে এমনিতর অজ্ঞাতসারেই তাহার নকল করিয়া থাকে বা তাহার আবৃত্তি করিয়া থাকে—সেটা অনেক সময়ে তার অপব্যবহার হইলেও তার একরকমের ব্যবহার ত বটে এবং তাতেই তার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আর পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে চিত্তরঞ্জন বাবুর মত যদি প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌-ফারেন্সের কোন ভাবী সভাপতি রবিবাবুর উক্তির পুনরুক্তি করিতেন, তবে পুনরুক্তির অভিযোগ হইতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিত, কেননা এটা তখন বেশ বুঝা যাইত যে দেশের হাড়ে হাড়ে এই উক্তিগুলার ভাব ঢুকিয়া গেছে। সুতরাং কবির সেই কথাটা তখন সত্য হইত যে—

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ"।

কিন্তু এত শীঘ্র শীঘ্র এই কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের এত লোকের স্তুতিবাদ

ও অপবাদের স্রোতের মুখে রবিবাবুর স্বদেশ সম্বন্ধীয় কথাগুলা যে পুরাণ-কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং যে কেহ আজ সে গুলিকে নিজের মত ব্যবহার করিতে পারিবে —এটা কোন ক্রমেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রবিবাবুর কোন কথাই এবং কোন আলোচনাই দেশ বিনা-প্রতিবাদে গ্রহণ করে নাই। বিশেষতঃ, দেশ সম্বন্ধে তিনি যা কিছু কাজের কথা বলিয়াছেন, কবি হওয়ার দরুণ সবটাই লোকে তাঁরই জল্পনা-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের দেশে কল্পনার সঙ্গে কাজের কোন কালে বিশেষ প্রণয় নাই বলিয়া তাদের মধ্যে পরিণয় ঘটানোর যে উদ্যোগ রবিবাবু করিয়াছিলেন, তাতে লোকের পরিহাসটাই জাগিয়াছে। সুতরাং এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরই কথাগুলা চিত্তরঞ্জনবাবু কতকটা অজ্ঞাতসারে লইলেও, খুব বড় কৌঁসিলির কৌশলের জোরেও পুনরাবৃত্তি-দোষ তথৈব "নকল পাণ্ডিত্যের" দোষ হইতে তাঁকে মুক্ত করিবার কোন উপায় দেখিনা।

রবীন্দ্রনাথের কণিকায় আছে :—

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

চিত্ত বাবুর এই অভিভাষণ সম্বন্ধে সেই কথাটাই দিব্য খাটে দেখিতেছি। কেননা, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রবিবাবুর সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি করিয়া খামখা অপ্রয়োজনে এবং "অকারণ পুলকে" তিনি তাঁর "মহা-সভার সভাপতির আসন" হইতে এক-জায়গায় রবিবাবুর আমেরিকার এক বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়া এমন একটা বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়িলেন যেটা লক্ষ্যের কাছ দিয়াও গেলনা, উল্টা ফিরিয়া আসিয়া তাঁর সেই আসনটাকেই কলঙ্কের মত বিদ্ধ করিয়া রহিয়া গেল। তাঁর লক্ষ্য—রবিবাবুর আমেরিকার কোন বক্তৃতা—কোন্ বক্তৃতা তাহা বোধহয় তিনিও জানেননা। কারণ, তিনি নাম করেন নাই। আমাদের বোধ হয় তিনি, The Cult of Nationalism, বক্তৃতাটির কথাই বলিয়াছেন। তার পর তিনি কবুল করিয়াছেন সে বক্তৃতা তিনি পড়েন নাই এবং "হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি।" তিনি পড়িয়াছেন সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকান কাগজের দুএকটা টুকরা যাহা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। টুক্‌রাগুলিতে সেই বক্তৃতার বিবরণ ছিল এবং এক আধটা অংশও উদ্ধৃত ছিল। সেই অংশগুলি হইতে পুরা বক্তৃতাটা সম্বন্ধে কোন লোকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না, কষ্টকল্পিত ধারণা হইতে পারে বটে। আমেরিকান কাগজগুলিই একবাক্যে সকলে স্বীকার করিয়াছে যে, Cult of Nationalism বক্তৃতাটির সার কথা উদ্ধার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তারা যে যা বুঝিয়াছে, সেই অনুসারে কাগজে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন কাগজ একেবারেই ভুল বুঝিয়া বসিয়াছে দেখা যায়। বক্তৃতা দিলেন একজন, সেই বক্তৃতা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন আর দশজন, তাঁদের বিচিত্র মন্তব্যের আবার টুক্‌রাগুলা এখানকার কাগজে উদ্ধৃত দেখিয়া সেই নানা পত্রবায়ুবীজিত টুক্‌রাগুলার

আলোড়নে বঙ্গীয় প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের নূতন সভাপতির আসন হঠাৎ এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বক্তৃতার প্রতিবিম্ব এবং তস্য প্রতিবিম্বের ছায়ার বিরুদ্ধে অনেক খানি মসীলেপনের কীর্ত্তি-অর্জ্জনের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! আমেরিকায় রবিবাবু বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আগে ছাপাই হোক্, তার পর তার সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলে বলা যাইতে পারিত। ইতিমধ্যে মহাসভা এবং সভাপতির আসন পূরাদস্তুর বজায় থাকিত, কোনটাই ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল না। রবিবাবুর সেই বক্তৃতার সঙ্গে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের কার্য্যতালিকার কিম্বা চিত্তবাবুর কাজের কথার এমন কিছু যোগ ছিল না যে বক্তৃতাটা না পড়িয়াই তাহার প্রতিবাদ করা অত্যন্ত জরুরি দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, সেই বক্তৃতায় রবিবাবু যাহা বলেন নাই তাহাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া অবাধে চালানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় nationalism সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা "স্যার রবীন্দ্রনাথ" হইবার বহু পূর্ব্বেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ক্রমাগতই বলিয়াছিলেন, সেটা বোধহয় চিত্তরঞ্জন বাবু জানেন না। আমেরিকার বক্তৃতায় তিনি আসলে নূতন কোন কথাই বলেন নাই, তবে খুব জোরের সহিত নূতন ও বড় দিক্ হইতে সেই পুরাণো কথাই বলিয়াছেন বটে। আর চিত্তরঞ্জন বাবুও সেই পুরাণো কথাই অবিকল রবিবাবুরই ভাবে ও ভাষায় পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া রবিবাবুরই অস্ত্রে রবিবাবুকে আঘাত করিবার জন্য বিস্তর অনস্তিতন্ত্রতার ঘটা ও আত্মগরিমার ছটা প্রকাশ করিয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণে তিনি লিখিতেছেন :—

"ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব ইংরেজিতে যাহাকে "Nation Idea" বলে ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। (?) প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার, ব্যবহার, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান প্রদান চলিয়াছে এবং আদান প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটী অনেকদিনকার, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ—

এবার আমেরিকার এই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটী কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভার সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়?"

"এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ"—এই "এখন" কথাটার উপর ঠেস দেওয়ার ভিতরে বেশ একটা নীচতার আরোপ ( insinuation ) রহিয়াছে, যেটা ভদ্রোচিত নয় বলিয়া তাহার জবাব দেওয়াও ভদ্রোচিত হয় না। রবিবাবুকে সরকার নাইট করার পর হইতে তাঁহার জাতীয়তা হঠাৎ রাতারাতি বিশ্বভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত হইল, সুতরাং তিনি জাতীয়তাকে গালমন্দ দিয়া পশ্চিমের কাছে বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন, "নকল পাণ্ডিত্য" দেখাইতেছেন, এই সব দোষারোপের যে কোন ভিত্তি নাই তার প্রমাণ ঐ বক্তৃতাটিই,—'The Cult of Nationalism'ই। চিত্তরঞ্জনবাবু কি একবার খোঁজ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কেন ঐ বক্তৃতাটি এদেশের কোন কাগজে কোথাও প্রকাশিত হইল না? অথচ আমেরিকার সহরে সহরে ঐ বক্তৃতাটি লইয়া একটা তুমুল হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল কেন? ঐ বক্তৃতায় রবিবাবু যে অসামান্য তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের লোকের পক্ষে সুদুর্লভ—বিশেষতঃ কোন পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে। তাঁর সেই বক্তৃতাটি কোথাও সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতেছি না, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তবে তাহার মোট কথাটা রবিবাবু ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শনেই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে অতি সুন্দররূপে বলিয়াছিলেন; সেই প্রবন্ধের কতক অংশ এবং cult of nationalism প্রবন্ধের কতকাংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "কোন বিশিষ্টজাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই" এ সকল কথা তিনি যে কোন কালেই বলেন নাই এবং এখনও বলিতেছেন না, তাহা দুই প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা যাইবে:—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ( ১৩০৮ সাল )

"য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

"ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মত বিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

* * *

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম্ম আছে, তেমনি জাতিধর্ম্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, তাহা মানব সাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

* * *

"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতি লাভ করে যে, ধর্ম্মের সীমানাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।"

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।"

* * *

"হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্ম আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

"নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশন্যাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।...এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দম্‌দম্‌ বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব।"

**চিত্তরঞ্জন বাবু কি জানেন না যে, "নৈবেদ্যের"—"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘমাঝে অস্ত গেল," প্রভৃতি স্বদেশ সম্বন্ধীয় কবিতায় এবং 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'চীনেম্যানের চিঠি', 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়', 'সমস্যা', 'ততঃ কিম্‌', প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে রবিবাবু এই কথাই পুনঃপুনঃ নানা দিক্‌ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর ইউরোপীয় জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমাদের জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা সে জায়গায় কখনই হইবে না? জাতি তুলিয়া দিতে তখনও তিনি বলেন নাই, এখনও বলিতেছেন না। জাতি মাত্রকেই যে "নেশন"-রূপ ধারণ করিতেই হইবে, ইহাতেই তাঁহার আপত্তি। কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আর এক নাম যদি "নেশন" হয়, তবে তাহাকে এমন উগ্র ও প্রবল হইয়া উঠিতে দেওয়া উচিত নয়, যাহাতে তাহা জাতির ভিতরকার মহৎ ও কল্যাণপ্রদ সৃজনীশক্তিগুলিকে (creative impulses) চাপা দিয়া মানুষগুলাকে যন্ত্রের সামিল করিয়া তুলিতে পারে। ইউরোপীয় peopleরা nation-রূপ খুব বেশীদিন ধারণ করে নাই—এই রূপ ধারণ করার জন্য তাহাদের প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে তাহাই বিবেচ্য।

The cult of Nationalismএর মোট কথার সঙ্গে আর রবিবাবুর বহুপূর্ব্বে লিখিত প্রবন্ধ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার" মোট কথার সঙ্গে যে বিশেষ পার্থক্য নাই তাহা দেখাইবার জন্য The cult of Nationalism হইতেও ঐ রাষ্ট্রে

ও সমাজের পার্থক্য বিচার সম্বন্ধে দু'একটা অংশ উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তিনি বলিতেছেন :—

"*The nation is a whole people organised for a mechanical purpose. Society has no such purpose—it is an end in itself; it is the natural human relationship which enables men to develop toward their aspirations. But the political side is narrower—it is for self-preservation only; it trades upon the greed and fear of men.*

"*When this selfish force becomes all powerful at the cost of the higher social life, then it is an evil day for humanity. When the father becomes a gambler and loses his regard for his family, then he becomes an automaton and not a man. When society turns into an organization for greed and power there are few crimes it cannot commit, for power is the end of a machine and a machine has no morals.*"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিত্তরঞ্জন বাবু nationalism সম্বন্ধে রবিবাবু কি বলিয়াছেন তাহা না জানিয়াই কতগুলা কাল্পনিক আপত্তি খাড়া করিয়া তাহার পোষণার্থে এবং রবিবাবুকে দূষণার্থে বিস্তর উপপত্তি রবিবাবুর লেখা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর সমস্ত লেখার সব আইডিয়াগুলার জন্য তিনি যে রবিবাবুর কাছে কি পরিমাণে ঋণী তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের তাহা জানা উচিত। সেই জন্য তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর কথা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। পর পর দুজনের লেখার উদ্ধৃতাংশ পড়িলে "নকল পণ্ডিত" যে কে তাহা বুঝিতে পাঠকবর্গের তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইবে না। রবির চেয়ে "বালির তাপ" যে বেশি তাহাও মধ্যে মধ্যে বুঝা যাইবে।

চিত্তরঞ্জন—"মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব।...শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না," ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ—"মনে করি আমাদের পোলিটিক্যাল কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল বালকের ডিবেটিং ক্লাব—গবর্মেণ্ট যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল।... দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করি না।" "সফলতার সদুপায়"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।... জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।"

রবীন্দ্রনাথ—"ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতি বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার কি সামগ্রী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা-লাভ করে।—" "স্বদেশী সমাজ"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমরাও···নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের

শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম।... তিনি (রামমোহন রায়) যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই।"

রবীন্দ্রনাথ—"আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।...রামমোহন রায় নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন।" "পূর্ব্ব ও পশ্চিম"—"সমাজ"।

চিত্তরঞ্জন—"যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।"

"ও আমার দেশের মাটী
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!"—
গান ও কাব্যগ্রন্থ।

চিত্তরঞ্জন—"প্রাণের যে বন্যা সে ত অঙ্কশাস্ত্র মানে না"—

রবীন্দ্রনাথ—"মনুষ্য সমাজ সাধারণতঃ হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে সেখানে যেন ভেল্কী লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময় দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা একদিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়।" "চিঠি পত্র"—"সমাজ।"

চিত্তরঞ্জন—"ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধন ...এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে হয়ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না।"

রবীন্দ্রনাথ—"বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ... ... এই উৎপাতে ... আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল।" "স্বদেশী সমাজ"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব,...তাহা হইলে আমি বলি এ মিলন একেবারে অসম্ভব।... কেহ কেহ বলেন যে এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইংরাজ লইবে...। খাঁটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া?...কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ—"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার

প্রয়োজন দেখি না··· ...বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই—"নববর্ষ।"—"স্বদেশ"। "বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ তাহার পশ্চাতে সুচির কালের ইতিহাস নাই —তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, শিকড় ছিন্ন"— "নববর্ষ"। "স্বদেশ"

"সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্।...... এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায়— আবশ্যক হইলেও, ইহার কোন এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীর-তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।— "সমাজ ভেদ," "স্বদেশ।"

"ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃত-কার্য্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ বিধি ব্যবস্থা যত ভালই হোক্ না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে।··· ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্য্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষ লাভের আশা করিতে পারিব।... অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতা নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, একথা আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে। "দেশীয় রাজ্য" "স্বদেশ।"

চিত্তরঞ্জন—"জাতিত্ব মরেনা—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ—"বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে,—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।"—"সমাজভেদ"—"স্বদেশ।"

চিত্তরঞ্জন—"পল্লী-সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।.. ...স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম-সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ—"সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটী হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রাম্যসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন

বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।... ... গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।"... ... "নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করিতে হইবে।" পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সবল করিতে হইবে।... Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিলনা ও আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতেই পারেনা...আজ যে আমরা Industrialism Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি···কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nation তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্‌দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার আজ দুইশত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে...? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লিতে পল্লিতে বারমাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, সুখদুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই!"

রবীন্দ্রনাথ—"এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ (বিলাতের) আমাদের দেশেও যে উত্তাল উঠিয়াছে সে কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ।·· আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদ্‌লায় নাই। এ সমাজ বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট।... অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক।··· প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন... ... দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নানপানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে দেশ বারোমাসে তেরো পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে।" —"বিলাসের ফাঁস", "সমাজ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন তাহা এই মিল ফ্যাক্টরীতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ—"সহরে ধনী মহাজনের

কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন।"—পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ—"সমূহ"

চিত্তরঞ্জন—"সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তিসম্পন্ন হয় কিন্তু অন্যান্য স্থানে অবসাদ অন্ধকার!"

রবীন্দ্রনাথ—"যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্য্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না"—"বিলাসের ফাঁস"—"সমাজ।"

চিত্তরঞ্জন—"আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই তাহা একটা ধার করা জিনিস, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাব-ধর্ম্মের যোগ দেখিতে পাই না।··· এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না···আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কসিতাম।···এখন স্কুলের নিম্নশ্রেণী হইতে রুলকরা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে না কি লেখা পড়া হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ—"য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে।··· যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক তাহা নির্জ্জীব।···যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে শ্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল।—"শিক্ষাসমস্যা"—"শিক্ষা।"

চিত্তরঞ্জন—"এই শিক্ষার ফলে...আমরা মানুষ হই নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্থ করা কথাগুলো তোতার মত আওড়াইয়া যাই"।

রবীন্দ্রনাথ—"যাহা কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে, যেন আমরাই কথা বলিতেছি।—"জাতীয় বিদ্যালয়"—"শিক্ষা।"

চিত্তরঞ্জন—"আমি আজ বাঙ্গালীর মহা-সভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্ত্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া দিতে না পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভাব ধর্ম্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া না দিতে পারিলে···আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

রবীন্দ্রনাথ—"ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে।...আমরা যাহা পৃথিবীকে দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না।···এতদিন আমরা ইস্কুল কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহা আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে...মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোন মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না।···

যেমন করিয়াই হউক্ শিক্ষার দ্বারা আমরা পূর্ণ পরিণত আমরাই হইব।"—"জাতীয় বিদ্যালয়" "শিক্ষা"

চিত্তরঞ্জন—"পল্লী বা গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"—( এখানে পল্লী-সমাজের সমস্ত আইডিয়াটি যাহা চিত্তরঞ্জন ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে সম্পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন; বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধার করিলাম না—যাঁহার ইচ্ছা হয়, মিলাইয়া পড়িবেন। )

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবন যাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।""

রবীন্দ্রনাথ—"আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্য দ্বারা আবদ্ধ।... জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেনা—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকেরই উপরে আশ্চর্য্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।"—"স্বদেশী সমাজ"—"সমুহ"

চিত্তরঞ্জন—"সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লীসমাজ গুলি এই কেন্দ্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ—"কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে।... এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে।" পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চিত্তরঞ্জন বাবু দেশের প্রতি প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশের সেবায় সকল প্রকার "অভিমান" ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন।) তিনি লিখিতেছেন:—"অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ!... আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক!" ইত্যাদি। অন্যকে মাথা নোয়াইবার উপদেশ দিবার আগে যাঁর কাছে তিনি এত বিষয়ে এত ঋণী তাঁর কাছে নিজের মাথাটা নত করিতে হয়, আততায়ীকে হাতের ছুরি জন্মের মত ফেলিয়া দিবার উপদেশ দিবার আগে নিজের হাতের ছুরিটা ফেলা আবশ্যক হয়—শুধু এই কথাটুকু চিত্তরঞ্জন বাবুকে স্মরণ করিতে বলি। তাঁর দেশভক্তি যে অকৃত্রিম তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; তাঁহার মত উদারহৃদয় দানশীল সকল-শুভকার্য্যে-উৎসাহী ব্যক্তি আজ বাংলা দেশে দুর্লভ। হিন্দুর পক্ষে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বা হিন্দু-মুসলমানের ভেদটা ভোলা যত কঠিন, তার চেয়ে ব্যক্তিগত সামান্য খিটিমিটি ও বিরুদ্ধ ভাবগুলো ভোলা ঢের সহজ। চিত্তরঞ্জন বাবুর দেশভক্তি দেশের যিনি শ্রেষ্ঠ সন্তান ও গৌরবের বস্তু, তাঁকে তাঁর যোগ্য সমাদর দিতে কুণ্ঠিত হয় কেন?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

# মিশরের আর্ট

কোন দেশের আর্টকে ভাল-করিয়া বুঝিতে হইলে আগে দেখা দরকার, সে দেশের প্রকৃতি ও মতি-গতি কিরূপ। এক দেশের আর্টে যদি অন্যদেশীয় আদর্শ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর নকল দেখা যায়, তবে সেটা সুখ্যাতির না হইয়া নিন্দার কথাই হইয়া দাঁড়ায়। কেননা এক-এক দেশের আর্ট এক-একরূপ নিজস্ব সৌন্দর্য্যে ও বিশিষ্ট মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে; ঐ নিজস্ব ও বিশিষ্টতাই নকল বা খাঁটি আর্ট চিনিবার যথার্থ নিকষ। ভারতবাসী যদি য়ুরোপীয় আর্টকে ভালরকম নকল করিতেও পারে, তবে তাহাতে ভারতের প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাইবে না, য়ুরোপের ভাবের ছাপও পড়িবে না; কারণ, নকলে আসলের রস ফোটানো দায়। ফলে এ-ধরণের নকলিয়ার এ-কূল ও-কূল দুকূলই মাটি হইয়া যায়। কোকিলের ডাক ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে লাগিলেও কেউ ত নূতনতার খাতিরে তাহাকে বলে না, 'কোকিল, তুমি বুলবুলির মত শীষ দাও!' যার যা স্বাভাবিক রূপ, তাতেই তাকে মানায় ভাল।*

এইজন্যই এক দেশের আর্টকে যাহারা অন্য কোন দেশের তুলনায় খাটো করিতে উদ্যত হয়, আনাড়ি ভিন্ন আর-কোন নামে তাহাদের ডাকা যায় না। য়ুরোপীয় নিসর্গ-চিত্রে যেমন ভারতের তালীকুঞ্জ বেখাপ্পা দেখায়, কোন ভারতীয় পটেও তেমনি য়ুরোপের কোন-কিছু মানানসৈ হইবে না। য়ুরোপের আর্ট য়ুরোপের মতন, ভারতের আর্ট ভারতের মতন, জাপানের আর্ট জাপানের মতন। এদের একের সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না। ঐ দেশগুলিতে আর্টের এক-একটি দিক ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং মিশরীয় আর্টের যে-সকল লক্ষণ আমরা দেখাইব, সেগুলির সঙ্গে কেউ যেন অন্য কোনদেশীয় আর্টের তুলনার কথা না তুলেন।

মিশরীয় আর্ট সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইবে। প্রথম:—শিল্পনৈপুণ্য। মিশর যখন সভ্যতায় আর-সকলকার অগ্রণী ছিল, তখন কারিকরিতে অন্য কোন জাতি তাহার

* The only bad art is that which is mechanical, where the impulse to give expression has decayed, and it is reduced to mere copying of styles and motives which do not belong to its actual condition. An age of copying is the only despicable age. It is but a confusion of thought, therefore, to try to pit the art of one country against that of another. * * * To understand any art we must first begin by grasping its conditions, and feeling the contrasts, the necessities, the atmosphere, which underlie the whole terms of expression.—The Arts and Crafts of Ancient Egypt. By W. M. Flinders Petrie.

শিল্পীদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়ঃ—আর্টের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব। মিশরীয় শিল্পীরা চল্‌তি রীতির বেড়ীতে এমনি বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাদের কারুকার্য্যের মধ্যে স্বাধীনতার লীলা একরকম ছিল না বলিলেই হয়। এই স্বাধীনতার অভাবের দরুণ মিশরীয় শিল্পীরা উচ্চতর সৌন্দর্য্যলোকে উঠিতে পারেন নাই। মিশরীয় ললিত কলায় সৌন্দর্য্যের মোহন বিকাশ আছে বটে,—কিন্তু সে বিকাশ পূর্ণবিকাশ নয়—তাহা অসম্পূর্ণ।

মিশরবাসীরা আপনাদের বাসগৃহগুলিকে একটু আলাদা চোখে দেখিতেন। জীবিত-কালে তাঁহারা যে-সব ঘর-বাড়ীতে থাকিতেন সেগুলিকে তাঁহারা ঠিক ঘর বলিয়া ধরিতেন না—অনেকটা পথ বলিয়া ভাবিতেন; তাঁহাদের ধারণা ছিল, অনন্ত আত্মার চিরকালের বাসভবন হইতেছে সমাধি-মন্দির। মিশর-বাসীদের প্রাণে প্রাণে ঐ ধারণা এতটা শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল যে, মিশরীয় শিল্পের যে-সকল নমুনা দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই সমাধি-গৃহ হইতে সংগৃহীত। বাঘ-ভাল্লুকের মৃতদেহকে শিকারীরা যেমন নষ্ট হইতে দেয় না, মানুষের মৃতদেহকেও মিসরবাসীরা তেমনি ধ্বংস হইতে দিত না; কৌশলে দ্রব্যগুণে তাহারা শবদেহ চিরস্থায়ী করিয়া, পাথরের পুতুলের মত কফিনের মধ্যে সাজাইয়া রাখিত। এবং মৃতের তৃপ্তিবিধানের জন্য সমাধিগৃহের মধ্যে ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি খুদিয়া যাইত, পটুয়া আসিয়া ছবি আঁকিয়া যাইত! মিশরের সমাধি-মন্দিরের দেবতা হচ্ছেন মৃত মানব,—তাঁহার আত্মা সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বিরাম-পুলক উপভোগ করে।

ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্ব হইতেই (৮০০০—৫০০০ খৃঃ-পূঃ) মিশরবাসীরা মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন; কিন্তু সে সব মূর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় চেনাই দায় যে, সেগুলি শিব কি বানর! তাছাড়া তখনকার হাতের কাজে আর্টের সম্পর্কও ছিল বড় অল্প। মিশরীয় শিল্পীর সামনে তখন কোন আদর্শ না থাকার দরুণ, শিল্পের মধ্যে উন্নতি বা অবনতির লক্ষণও বড়-একটা পাওয়া যাইত না।

মিশরীয় আর্টে জাগরণের প্রথম সাড়া পাওয়া যায় খৃঃ-পূঃ ৫৫০০ বৎসরে। আর্টের মধ্যে তখন এমন-একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিল যে, তাহার পুরাণো রূপের খোলষ একেবারে খসিয়া পড়িল। দেশের রাজাদের আশ্রয়ে মিশরের আর্ট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নব-তন্ত্রের শিল্পীরা নূতন তেজে, নূতন রূপে ও নূতন জীবনে পুরাতন প্রাণহীন আর্টকে জীবন্ত ও পূরন্ত করিয়া তুলিলেন। মিশরের সর্ব্বত্র যে বিখ্যাত চিত্রাক্ষর (Hieroglyphic writing) দেখা যায়, এই নবযুগেই তাহার সূত্রপাত। চিত্রাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই মিশরে ইতিহাসের সৃষ্টি।

নবযুগের শিল্পীরা যে সত্য-সন্ধানী ছিলেন, শারীর-বিজ্ঞানে (Anatomy) অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া সেটা তাঁহারা ভালরকমেই প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রকৃতিকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতেন না, গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সরলতা ছিল তাঁহাদের

কার্য্যের মূলমন্ত্র। বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যুগের নবজাগ্রৎ ললিত কলার মধ্যে যতটা সত্য ও যথার্থতা ছিল, মিশরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের শিল্পেও আর-কখনো ততটা শ্রী-ছাঁদ দেখা যায় নাই।

আর্টিষ্ট যখন প্রকৃতির অন্দরমহলে ঢুকিতে পারেন, প্রকৃতির সকল গোপন কথা যখন বুঝিতে পারেন, তখন তিনি স্বধু আর্টের জন্যই আর্টের চর্চ্চা করেন, তখন তিনি স্বধু রূপের রসেই বিভোর হইয়া থাকেন, সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দেখানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না। আর্টিষ্টের প্রাণ যখন এই অবস্থায় গিয়া উঠিতে পারে তাঁহার প্রথম শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হয়। মিশরের শিল্পীরাও সৌন্দর্য্যভক্ত হইয়া শিল্প-জগতে সার সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিল। এর আগে মিশরের শিল্পীরা নানান্ উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চ্চা করিত, সৌন্দর্য্যেই যে আর্টের চরম সার্থকতা, সেটা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত না,—মিশরের আর্টও তাই নগণ্য এবং প্রাণশূন্য হইয়া সৌন্দর্য্য-লোকের বন্ধদুয়ারের বাহিরে পড়িয়াছিল।

পিরামিড-যুগে (খৃঃ-পূঃ ৪৭০০—৪০০০) মিশর-শিল্পে নব নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়। মিশর আজও যেজন্য বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে এই যুগেই সেই অতুল্য পিরামিড-শিল্পের সূত্রপাত। স্বধু স্থাপত্য বলিয়া নয়, মিশরীয় ভাস্কর্য্যের যে-সকল চমৎকার নমুনা আজ-পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, তাহার বেশীর ভাগই এই সময়ে তৈয়ারি হয়। তা-ছাড়া এ যুগের চিত্রকলাও অনেকটা নিখুঁত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই পিরামিড-যুগে মিশরের ভাস্করেরা রাজা-রাজড়া ও রাজকীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদের যে মূর্ত্তিগুলি গড়িয়াছিল, তার চেয়ে ভাল প্রতিমূর্ত্তি মিশরে পরবর্ত্তী যুগেও আর গঠিত নাই। পরযুগের শিল্প হয়ত এ-যুগের চেয়ে সূক্ষ্ম, শ্রীমৎ ও প্রাণরঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তেজে, স্ফূর্ত্তিতে ও ভাবে-ভঙ্গীতে এই পিরামিড-যুগের আর্ট অগ্রগণ্য।

এর পরে মিশর-শিল্পে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর-কখনো আসে নাই।

মিশরের ভাস্করেরা ধাতু, পাথর, কাঠ, হাতীর দাঁত ও মাটি প্রভৃতি নানা জিনিষ দিয়া বিবিধ মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সমস্ত মূর্ত্তিই বুঝি একছাঁচে ঢালা। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই তাহাদের ভিতরকার তফাৎটা ধরা পড়িয়া



১ম চিত্র—কেরাণী

যায়। প্রাচীন সম্রাটদের আমলে যে-সকল মূর্ত্তি গড়া হইত, সেগুলি অনেকটা স্বাভাবিক, খর্ব্ব ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ঐ সময়কার "কেরাণী"র যে মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে, মানব-দেহ গঠনে তাহার নির্ম্মাতার যে কতটা নিপুণতা তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর আদেশে কেরাণী শ্রুতিলিখন লিখিতে বসিয়াছে, মূর্ত্তির এ ভঙ্গীটি শিল্পী বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তিটির মুখে শিল্পী যদি প্রাণের ছাপ আর-একটু বেশী



২য় চিত্র—নগরাধ্যক্ষ

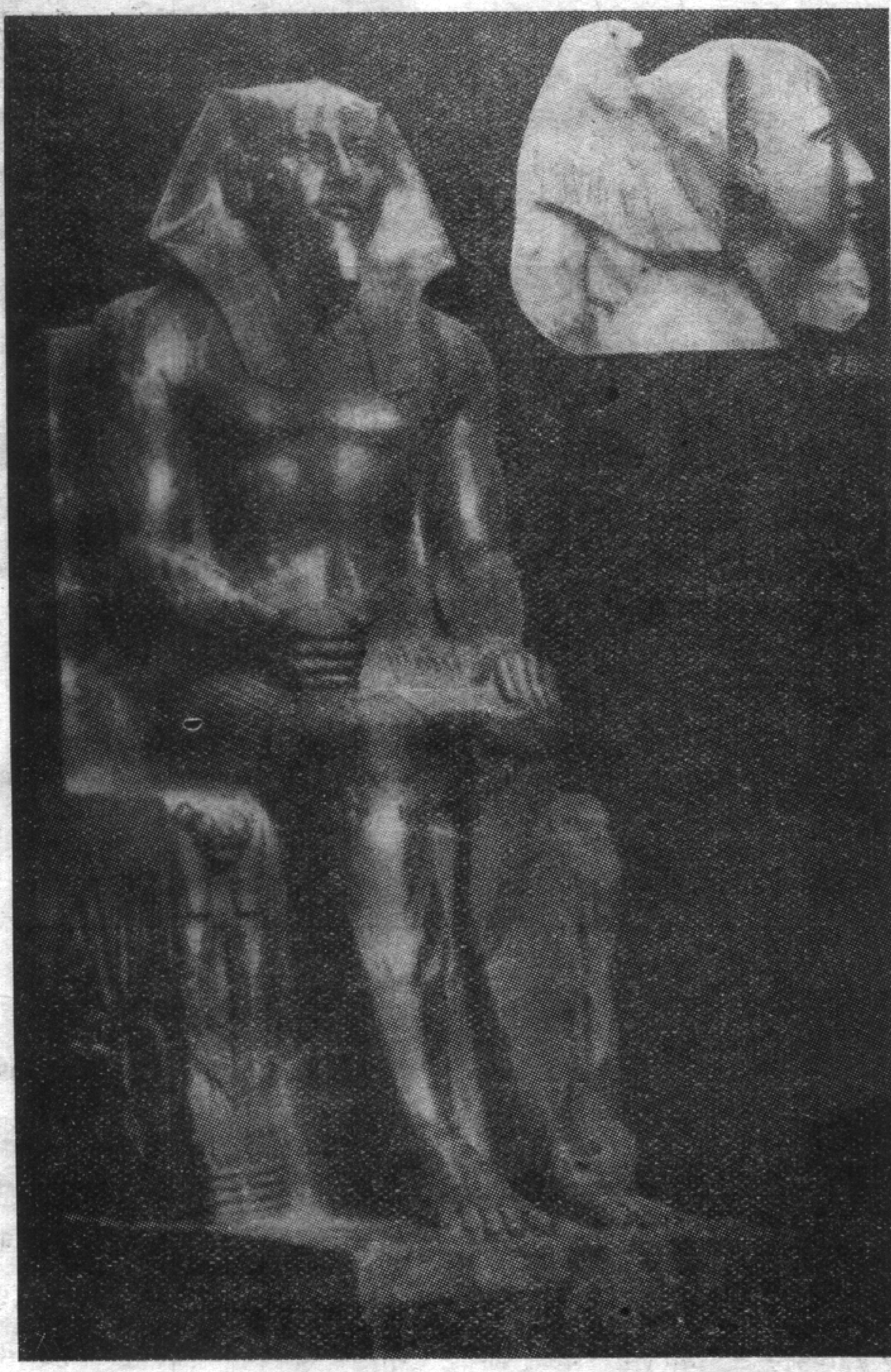


৩য় চিত্র—রমণী-মূর্ত্তি

করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এটি শিল্পের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইত।

এই প্রাচীন যুগের আরো-কয়েকটি বিখ্যাত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্র) "নগরাধ্যক্ষে"র মূর্ত্তিটি কাঠের তৈয়ারি। ইহার ঠোঁট ও চিবুক বেশ স্বভাবসঙ্গত; চোখের আকারও ভাল, কিন্তু তামার উপরে কাঁচ ও পাথরের তারা বসাইয়া চোখের স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রে যে রমণী-মূর্ত্তিটি দেখা যাইতেছে, তাহার ভগ্নদশার মধ্য হইতেও রূপের আলো ছাই-চাপা আগুনের মত স্বপ্রকাশ। ইহার সুডৌল মুখের ফের ও দেহের মধুর ভঙ্গিটি অতি চমৎকার। একালের কোন শিল্পীও যদি এ মূর্ত্তিটি গড়িতেন, তবে তাঁহার খাতির নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইত! রাজা খাফ্‌রার প্রতিমূর্ত্তি মিশরের আর্টের একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। এ মূর্ত্তিতে রাজোচিত মহিমা এতটা স্পষ্ট যে, তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্রাজ্যের মধ্যযুগে শিল্পীরা একটু বেশী লম্বাটে মূর্ত্তি গড়িত; মূর্ত্তির গড়নে আর তেমন দৃঢ়তার ভাব থাকিত না। শিল্পীরা তখন একটা তরল সৌন্দর্য্যকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।



৪র্থ চিত্র—রাজা খাফ্‌রা

নব সাম্রাজ্যে এই তরল সৌন্দর্য্যের ভাবটা আরো-বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে মিশর দেশে এক নবতন্ত্রের শিল্পী আত্ম-প্রকাশ করিলেন; তাঁহারা গতযুগের চল্‌তি রীতি ছাড়িয়া এক-পা নড়িতেন না; কারিকরিতে তাঁহাদের হাত যেমন পাকা ছিল, ভাব জাহির করিতে তাঁহারা ছিলেন তেমনি কাঁচা।

Saite যুগে (Saisএর ফ্যারোয়াদের রাজত্বে), ৭২০—৫২৫ খৃঃ-পূঃ বৎসরে মিশর-শিল্পে আবার প্রাচীন যুগের প্রভাব আসিয়া পড়ে। মিশর-শিল্পে ইহা রেনেসাঁসের

যুগ। এ-সময়ে মিশরবাসীরা আপনাদের জাতীয় শিল্প হইতে সকলরকম বিজাতীয় প্রভাব দূর করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। Saite যুগের মিশরীয় আর্টের আদর্শ



৫ম চিত্র—একটি মূর্ত্তির মুখ

কিরূপ ছিল, পঞ্চম চিত্রের মূর্ত্তিটি দেখিলেই তাহা জানা যাইবে।

নানাযুগের নানা আদর্শের কলাবিদ মিশরের ললিত কলার ছাঁচ ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছিল। সে-সমস্ত কথা এখানে সবিস্তারে বলা চলিবে না। তবে মিশরের ভাস্করদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা এখানে কিছু-কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময়ে যখন নিখুঁত বাস্তবতার দরকার, মিশরীয় কলাবিদরা তখন আপনাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ও শিক্ষিত হস্তের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন। মিশরের সমাধিমন্দিরে একসময়ে শবাধারের উপরে মৃত ব্যক্তির প্লাষ্টারের প্রতিকৃতি রাখা হইত। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম চিত্রে এই শ্রেণীর কয়েকটি মুখ দেওয়া হইল। ষষ্ঠ চিত্রে এক-জন সতর্ক ও গম্ভীর লোকের মুখ। সপ্তম



৬ষ্ঠ চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ

চিত্রের মুখটি যেমন মোহনীয় ভাবে-ভরা, তাহার ওষ্ঠাধরের মৃদুমৃদু হাসির লীলা ও কপোলের রেখাগুলিও তেমনি চমৎকার;—এ মুখখানিতে মৃতের ব্যক্তিত্ব যতদূর ফুটিবার, ফুটিয়াছে। শবাধারের মধ্যে রক্ষিত মৃতদেহের মুখাকৃতির সঙ্গে এই মৃৎনির্ম্মিত মুখগুলির সাদৃশ্য যে কতটা ছিল, সপ্তম চিত্র দেখিলে তাহা স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝা যাইবে। শিল্পী যে মানুষটিকে দেখিয়া প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন, সেই বহুযুগপূর্ব্বে মৃত লোকটির মাংসহীন করোটি ( Skull ) শবাধার হইতে বাহির করিয়া, শিল্পীর গঠিত মুখের সামনে রাখিয়া যে ফটো তোলা হইয়াছে, অষ্টম চিত্র তাহারই প্রতিলিপি। ছবিতে বৃহত্তর যে বহিঃরেখা ( Outline ) দেখা যাইতেছে, সেইটিই শিল্পীর গড়া মুখ; মধ্যের গাঢ়তর রেখাটি হইতেছে মড়ার মাথার। আসল মুখ ও নকল প্রতিকৃতিতে যে কতটা সাদৃশ্য আছে, একটু ভাল করিয়া দেখিলেই



৭ম চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ



৮ম চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ ও মড়ার মাথা

তাহা ধরা পড়িবে। হাজার হাজার বছর আগে শিল্পী যখন এই মুখটি গড়িয়াছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সুদূর ভবিষ্যতের কৌতূহলী সমালোচক আসলের সঙ্গে নকলকে এমন ভাবে মিলাইয়া তাঁহার শক্তির পরখ করিবে।

মিশরীয় ভাস্কর্য্য সময়-বিশেষে কতটা স্বভাবের অনুগমন করিত, নবম চিত্রে আমরা তাহার আর-একটি প্রমাণ দিলাম। এই ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তির মুখটি দেখিলে আমরা বুঝি যে, সেই অতীত যুগের প্রতিভাবান ভাস্করের নিপুণ হাতে পড়িয়া অমন শক্ত পাথরও ভিজে মাটির মত নরম হইয়া উঠিয়াছিল! কেমন সহজে তিনি এই মূর্ত্তিটি গড়িয়াছিলেন! বিজয়গর্ব্বিত ভাস্করের প্রাণের আনন্দই যেন এই অত্যন্ত-জীবন্ত প্রতিমার মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরীয় ভাস্কর্য্যের অধিকাংশ মূর্ত্তি—মানুষের প্রতি যেন সহানুভূতি দেখাইতে নারাজ! সাধারণ মানুষের মুখে সুখ-দুঃখের, হাসি-অশ্রুর যে বিচিত্র আলোক-ছায়ার লীলা দেখা যায়, মিশরের শিল্পী আর্টে তাহার প্রকাশ খুব কমই দেখাইয়াছে।

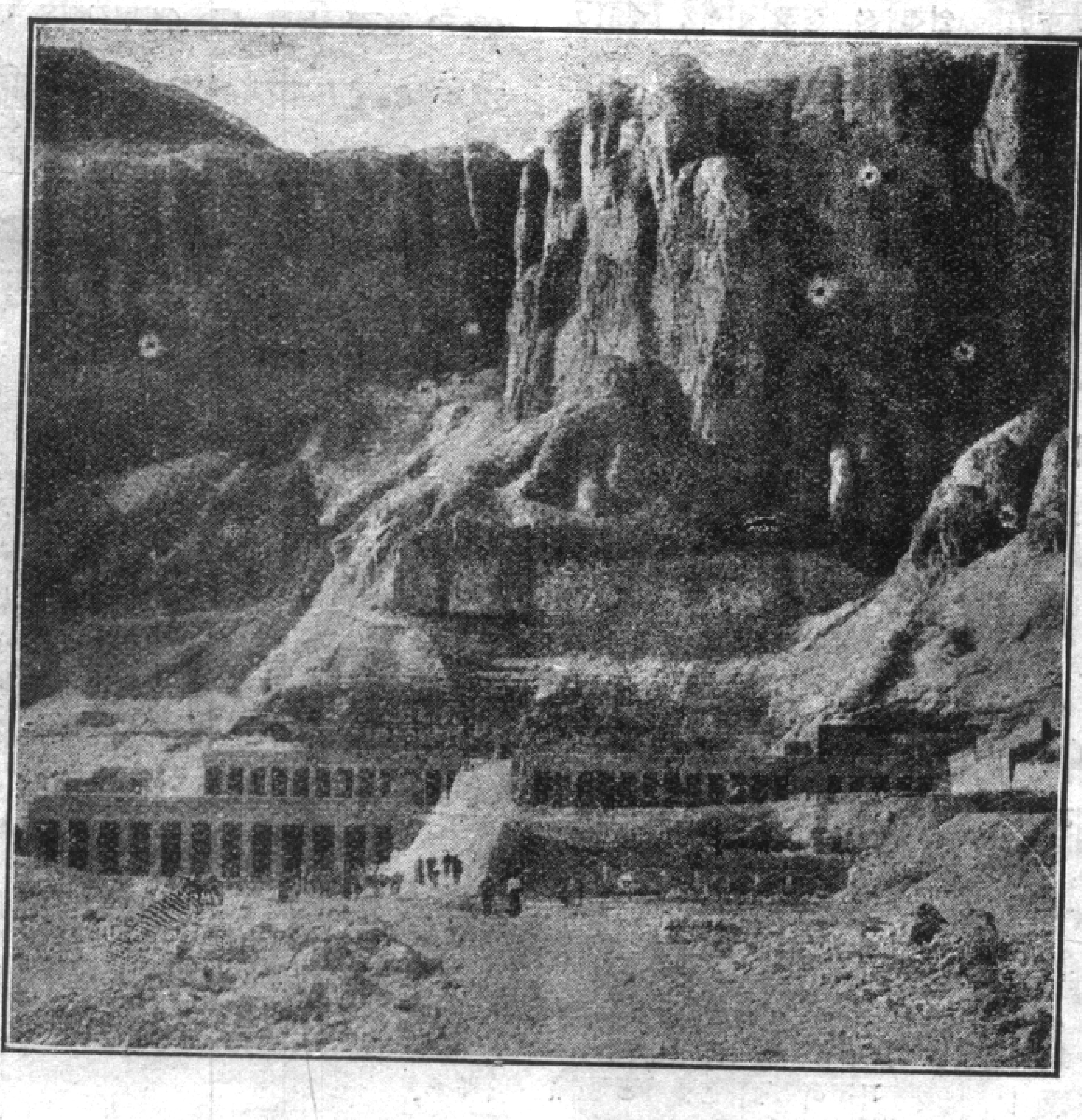


৯ম চিত্র—ভগ্নমূর্ত্তির মুখ

শিল্পীর মূর্ত্তি কখনো কথা কহে না বটে; কিন্তু তবু, অন্যান্য দেশের ভাস্কর্য্যে, প্রতিমার মুখে তাহার নীরবতার মধ্য হইতেই বাণীর যে আভাস ফুটিয়া উঠে, মিশরীয় ভাস্কর্য্যে তাহা

বড়-একটা চোখে পড়ে না। মিশরীয় ভাস্কর যে-সকল মূর্ত্তি গড়িয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা যেন পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর কেহই নহে! চারিদিকে অত্যন্ত-গভীর একটা রহস্যের লুকোচুরী লইয়া, তাহারাও যেন এক-একটি মূর্ত্তিমন্ত রহস্যের মত বিরাজ করিতেছে! রহস্য-লোকের এ-সকল গম্ভীর মূর্ত্তি দেবতার মতই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বিকার! বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহাদের যেন কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই! মিশরীয় ভাস্কর্য্যের এই প্রধান ও সাধারণ লক্ষণটি, চতুর্থ চিত্রে রাজা খাফ্‌রার মূর্ত্তিতে বিশেষরূপে প্রস্ফুট হইয়াছে। ইহারা যেন অনাদি অতীতের অমর মূর্ত্তি—পৃথিবীর কত ভাবের ঢেউ ইহাদের পাষাণ পদতলে প্রহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাদের শিলা-নেত্রের স্থিরদৃষ্টির উপর দিয়াই কত মহামানব, কত মহাসাম্রাজ্য অনন্ত জীবন-সাগরে ফেনার মত বিলীন হইয়া গিয়াছে, তবু ইহারা একটুও চপল হয় নাই, একটিও কথা কহে নাই! বর্ত্তমানের তটে দাঁড়াইয়া নশ্বর মানব আমরা,—আমাদের তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,—



১০ম চিত্র—থিব্‌সের মন্দির

তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন !
তুমি তারে কোথা লও !
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও !"

মিশরীয় আর্টের প্রধান ধর্ম্ম হইতেছে, স্থায়ীত্ব। মিশরের প্রকৃতির মধ্যেও সর্ব্বত্র এই স্থায়ীত্বের ভাব দেখা যায়। এখানকার সুকঠিন গ্রেনাইট প্রস্তর যেমন চিরস্থায়ী, অতি-দুর্ব্বল গাছ-গাছড়াগুলিও তেমনি ঋতুর শুষ্কতার জন্য সহজে নষ্ট হয় না। এমন স্থিতিশীল প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া, মিশরবাসীর অন্তঃপ্রকৃতিও ক্ষণিক কোন-কিছুর ধারণা করিতে পারিত না। তাহাদের হাতের গড়া পিরামিড ও গ্রেনাইট প্রস্তরের সমাধি-মন্দিরগুলি ( দশম চিত্র দেখুন ) তাই দৃঢ়তায় কালজয়ী, প্রকাণ্ড স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট দেবালয় যুগ-যুগ ধরিয়া সমানভাবে তাই আকাশের শূন্যতার অনেকখানি পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষ মরিলে তাহার প্রাণহীন দেহকে সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিতে আমরা শশব্যস্ত হইয়া উঠি ; কিন্তু মিশরবাসীরা সে দেহকে চিরস্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিত। কাল-সাগরের ক্ষণভঙ্গুর বালুকা-বেলায় দাঁড়াইয়া, জগতের আর কোন জাতি নশ্বরতার বিরুদ্ধে এমন প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই—লয়কর্ত্তার তর্জ্জনী-শাসনকে এমন ভাবে উড়াইয়া দিতে পারে নাই !

মিশরের ভাস্কররা চল্‌তি রীতির মায়া এড়াইতে পারিতেন না, এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই সকল রীতির ভিতরে অনেকগুলি এত সাধারণ যে, দর্শকের উপভোগে তাহারা বাধা দেয়। প্রথম ঃ—চলন্ত বা অচল, বসা বা দাঁড়ানো—সকল মূর্ত্তিই সামনের দিকে ফিরিয়া থাকে। তাহারা সকলেই সরল ভঙ্গীতে আছে—কেউ ডাইনে বা বাঁয়ে একটু হেলেও না দুলেও না। দ্বিতীয় ঃ—সচল-অচল সকল মূর্ত্তি একেবারে পায়ের চেটোর উপর ভর দিয়া থাকে ; এমন মূর্ত্তি দুর্লভ, যাহার এক পা সম্পূর্ণভাবে মাটির উপরে, আর এক পা আল্‌গোছে মাটিকে ছুঁইয়া আছে। পুরুষমূর্ত্তিগুলি সচরাচর সচল এবং তাহাদের বাঁ পা-খানিই আগে আগানো ; কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই অচল, তাহাদের পা-দুটি এ-ওর সঙ্গে যুড়িয়া মিলিয়া থাকে।

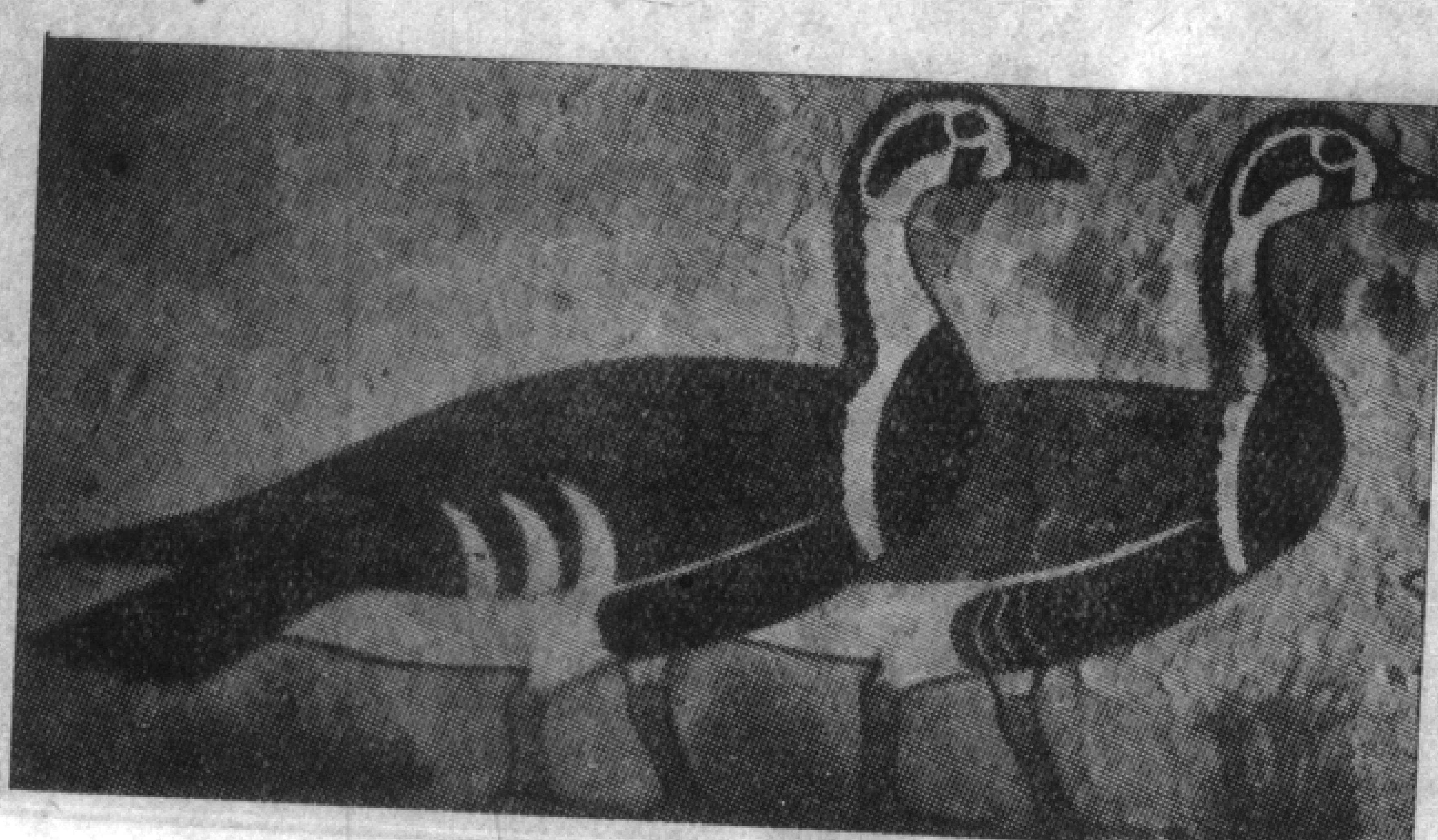
মিশরের আর্টিষ্ট এই-সব বাঁধা গতের এতটা ভক্ত ছিল যে, শেষাশেষি যখন তাহারা গ্রীক ও রোম্যান প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনো আপনাদের মুদ্রাদোষ ছাড়িতে পারে নাই। তাহাদের হাতের তৈয়ারি,—দেহের গড়ন-হিসাবে স্বভাবসঙ্গত—অনেক মূর্ত্তিও ঐ-সব উদ্ভটতার জন্য অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের মত দেশের আর্টেও পুরাকালের কতকগুলি অসম্পূর্ণতা শেষ-বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। সভ্যতা যত উন্নত হয় মানুষের চিত্তও তত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হইয়া উঠে। মিশর-শিল্পের ঐতিহাসিক কালেও পৌরাণিক এবং প্রাথমিক যুগের অপূর্ণতা থাকিত না—সেখানকার শিল্পীরা যদি পুরাতনের সংকীর্ণতা বর্জ্জন করিয়া নূতনের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিত। কিন্তু, মিশরদেশে তা হয় নাই। তাই ঐতিহাসিক কালের প্রথম মুখে সেখানে

ললিত কলার যতটা উন্নতি হইয়াছিল, শেষমুখে আর ততটা হইল না ;—বেশীর ভাগ, নব-যুগের 'সাত নকলে' প্রাচীন যুগের 'আসলও খাস্তা' হইয়া পড়িল।

ভাস্কর্য্য অপেক্ষা স্থাপত্য-কার্য্যেই মিশর-বাসীরা দক্ষতা দেখাইয়াছিল বেশী। প্রাচীন মিশরের পিরামিড, মন্দির ও স্ফিংস্ দেখিয়া পৃথিবীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সকল সভ্য জাতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। মিশরের স্থাপত্য-শিল্প এতটা প্রসিদ্ধ ও সকলকার এতটা পরিচিত যে, এখানে তাহার আলোচনা দরকার মনে করি না।

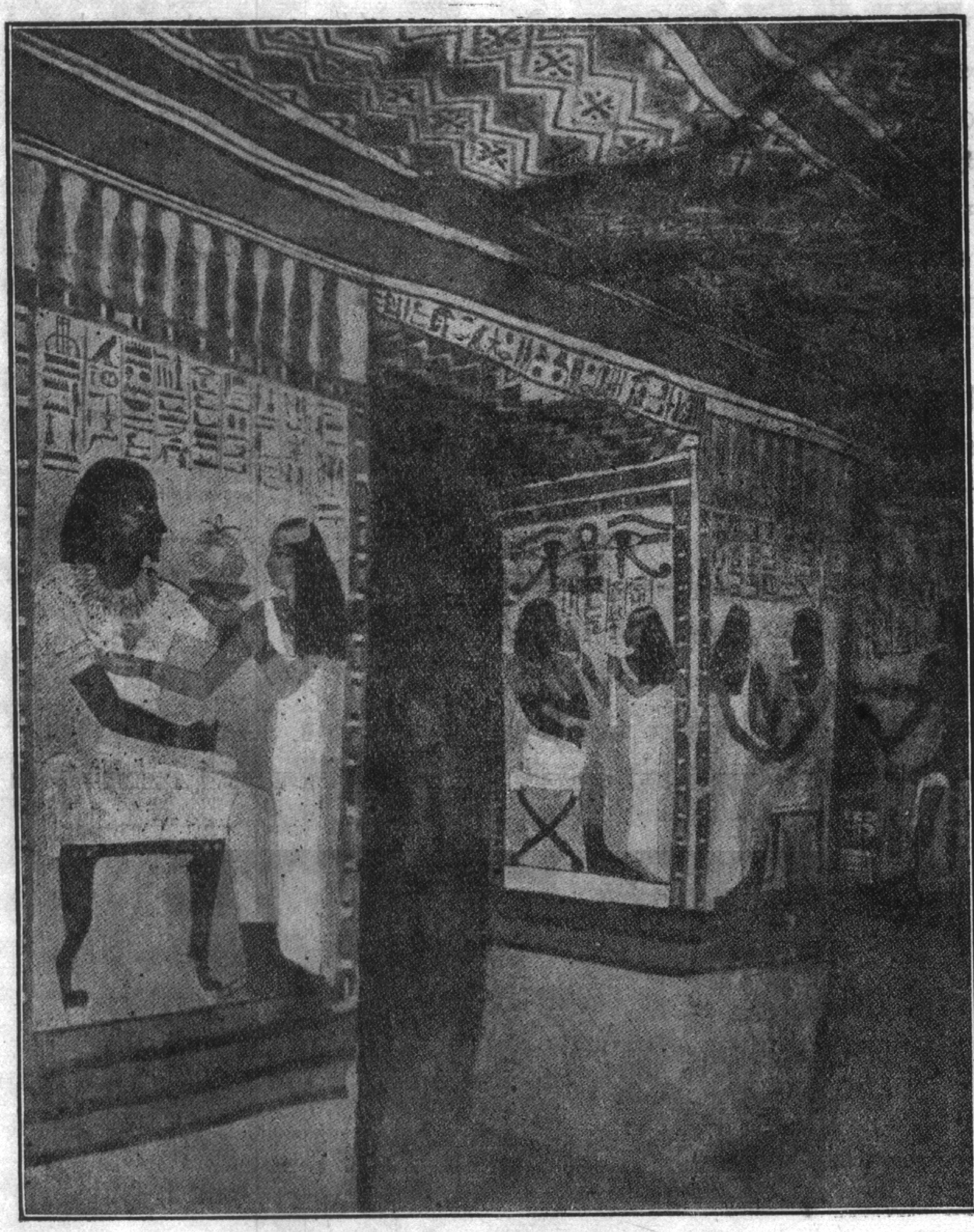
মিশরে চিত্র-শিল্পেরও চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মত চিত্র-শিল্প বেশীদিন স্থায়ী হয় না বলিয়া, মিশরীয় চিত্রের অখণ্ড সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ এখন আর নাই। তবে, মিশরের স্থাপত্য —এমন-কি ভাস্কর্য্যের আদর্শও, যতটা উন্নত হইয়াছিল, তাহার চিত্রশিল্প যে ততটা উঁচুতে উঠিতে পারে নাই, নষ্টাবশিষ্ট চিত্রমালার নমুনা দেখিয়া এটুকু অনায়াসে কল্পনা করা যায়। মিশরের ভাস্কর্য্যে তবু কতকটা স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু চিত্রের মধ্যে সেটুকুও দেখা যায় না। মিশরবাসীরা ছবিকে লেখা বলিয়া ভাবিত মাত্র; (Egyptian paintings must in fact, be looked upon as picture-writing, and the pictures are nothing more than enlarged hieroglyphics.) লেখার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই সে-সব ছবির আর বড়-বেশী সার্থকতা থাকিত না; হয়ত এই জন্যই মিশরের চিত্র-শিল্পের পরিণতি আশানুরূপ হয় নাই। শিল্পী ও শিল্পসমালোচক পয়েন্টার তাঁহার Classic and Italian Painting নামক পুস্তকে তাই বলিয়াছেন :—"The art of Egypt was in many respects so primitive, and so trammelled by its peculiar formalism, that it belongs rather to the domain of archaeology than of aesthetics."

মিশরের চিত্রশিল্প যে তাহার ভাস্কর্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন, এ-কথা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে মিশরের পটুয়ারা



১১শ চিত্র—দুটি হাঁস

ব্যবহারের পাত্রাদির উপরে যে-সকল ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার কতক-কতক এখনো টিকিয়া আছে। সে-সব ছবি উঁচুদরের নয় বটে, তবু, সেগুলি দেখিলে পুরাকালের মিশরীয় চিত্রকলার কিছু-কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। পিরামিড-যুগে মিশরীয় চিত্রশিল্প যে বেশ উন্নত হইয়াছিল, একাদশ চিত্রে তাহার একখানি প্রতিলিপি দেখিলে সে-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই ছবিখানি Medum এর বিখ্যাত ভিত্তি-দৃশ্য হইতে



১২শ চিত্র—সমাধি-ভবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি ও চিত্রাক্ষর।

সংগৃহীত। চিত্রলিখিত হাঁসদুটির সচ্ছন্দ ভঙ্গী খুব সুন্দর; ইহাদের ভিতরে গতির আভাসও আছে। মধ্যযুগে মিশরের চিত্রমালা কেমন-ধারা ছিল, তাহার কোনরকম নমুনা আজ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশের আমলে মিশরের চিত্র-কলার চর্চ্চা হইয়াছিল যথেষ্ট। এই সময়ে সমাধি-গৃহ ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার প্রথা উঠিয়া যায়; ভাস্কর্য্যের বদলে সমাধিগৃহের দেওয়ালে ছবি-আঁকা প্রথার চলন হইল। (দ্বাদশ চিত্র দেখুন) আধুনিক রাজবংশের সময়ে Akhenatenএর রাজত্ব-কালে মিশর-দেশে চিত্রকলার অধিকতর উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এতদিন মিশরীয় চিত্রকররা যে-সব মূর্ত্তি আঁকিত, তাহাদের ভাব-ভঙ্গী ধরা-বাঁধা, একছাঁদের ও এক-ঘেয়ে হইত। কিন্তু Akhenatenএর সময়ে দু-একজন চিত্রকারী প্রথার বাঁধন কাটিয়া স্বাধীনতার মন্ত্রগ্রহণ করেন; তাঁহারা ছবির মূর্ত্তিগুলিতে যে ভঙ্গিমা দিলেন, নির্দ্দোষ না হইলেও মিশরীয় চিত্রকলায় তাহা একেবারে নূতন। (ত্রয়োদশ চিত্র) আগেই বলিয়াছি, মিশরের ভাস্কর্য্যেই হোক্ আর চিত্রেই হোক্, সকল মূর্ত্তিরই দেহ ফিরানো থাকিত সুমুখ দিকে। নূতনদলের চিত্রকররা এরূপ খোসখেয়ালী উদ্ভটতা পরিহার করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরদেশে এই নূতন দলের প্রভাব ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল।

মিশরের চিত্রকরদের রেখা-চিত্রে দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব। চিত্রকলার এ-দিকটি তাহাদের হাতে যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা আশাতীত। (চতুর্দ্দশ চিত্র দেখুন) তুলিকার এক-একটি নিপুণ আঘাতে তাহারা মূর্ত্তির এক-একটি অংশ একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিত; সময়ে-সময়ে একটানে তাহারা একটি সমগ্র মূর্ত্তিও আঁকিয়া তুলিতে পারিত। রেখার এমন কারিকরি দেখিলে একালের অনেক আর্টিষ্টকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে। সুধু তাই নয়, সে রেখাগুলি এতটা অবাধ, জোরালো অথচ পেলব ও ছন্দমধুর হইত যে, দেখিলেই প্রাচীন যুগের সুপটু শিল্পীর নিপুণ আঙ্গুলগুলিকে ধন্য ধন্য করিতে হয়! চতুর্দ্দশ চিত্রে চারি-জাতীয় লোকের চারিটি মুখের রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মুখ লিবিয়ান জাতীয়, দ্বিতীয়টি আবিসিনিয়ান, তৃতীয় সিরিয়ান ও চতুর্থ নিগ্রো। চারিটি মুখেই চারি



১৩শ চিত্র—বাজী



১৪শ চিত্র—চারিটি মুখ

জাতির বিশেষত্ব চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরদেশে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধাতুনির্ম্মিত শিল্পকার্য্য রঞ্জিত হইত না বটে, কিন্তু পাথরে-গড়া বেশীর ভাগ মূর্ত্তির উপরেই রং লেপিয়া দেওয়া হইত। এমন-কি কেহ কেহ বলেন যে, স্ফিংস্ প্রভৃতি দৈত্যের মত মস্ত মস্ত মূর্ত্তির উপরেও পটুয়ারা তুলিতে করিয়া রং বুলাইত। প্রাচীন মিশরবাসীরা রং-চং ভারি পছন্দ করিত। তাহাদের বাসগৃহের, কবরের ও দেবালয়ের ভিতরে-বাহিরে যেখানে-সেখানে ছবি ও ছবির হরফ দেখা যায়। তাহাদের ব্যবহারের ঘরসাজানো জিনিষগুলি পর্য্যন্ত চিত্রিত না হইলে সম্পূর্ণ হইত না। মিশরের যেদিকেই চাওয়া যায় সেইখানেই রঙ্গের লীলা।

মিশরীয় চিত্রশিল্পের কতকগুলি বিশেষত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই বিশেষত্বগুলি অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতার নামান্তর। ছবির প্রধান মূর্ত্তি-গুলির আকার প্রায়ই ডাগর হইত, তাহাদের পাশাপাশি অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিকে প্রধান মূর্ত্তির তুলনায় অত্যন্ত খাটো করিয়া আঁকা হইত। (১৫শ চিত্র দেখুন) ছবিতে আলোক-ছায়া বা পারিপ্রেক্ষিত,—এ সব কিছুই থাকিত না। 'পারস্পেকটিভ' না-থাকার দরুণ মিশরীয় চিত্রপট দেখিতে হইত ঠিক মানাচত্রের মতন। পাশাপাশি দুটি লোক থাকিলে একটি লোকের উপরে আর-একটি লোককে আঁকা হইত; ম্যাপে যেমন নানাদেশের নাম চারিদিকে ছড়ানো থাকে, যুদ্ধ-দৃশ্যে সৈন্যসামন্তদের মূর্ত্তিগুলিও তেমনি ছাড়া-ছাড়া ভাবে এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া থাকিত।

মিশরীয় চিত্রকররা যখন জীবজন্তুর মূর্ত্তি আঁকিত, তখন কিন্তু তাহারা এতটা



১৫শ চিত্র—নিমন্ত্রণ-বাড়ী

উদ্ভট অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিত না। আর্টের প্রথম অবস্থা হইতেই মিশরে জীব-জন্তুর মূর্ত্তিগুলি হইত জীবনে, স্ফূর্ত্তিতে, তেজে ও সঙ্গতভাবে পরিপূর্ণ। জীবজন্তুর মূর্ত্তি যাহারা এমন নিপুণ হাতে আঁকিয়াছে, মানুষ আঁকিতে বসিয়া তাহারা এত ছেলে-খেলা করিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে একজন সমালোচক বলেন, "মিশরীয় চিত্র-করেরা যদি নরমূর্ত্তি আঁকিবার সময়ে চলিত নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর্টকে হয়ত তাঁহারা নির্দ্দোষ এবং পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিতেন।" চিত্রকরদের পরাধীনতার বোধ হয় আর-একটা কারণও আছে। মিশরের শক্তিশালী পুরোহিত-সম্প্রদায় হয়ত চিত্রকে লিখন-কার্য্যের গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে চাহিতেন; ছাড়া পাইলে সৌন্দর্য্যভক্ত চিত্রকররা পাছে তুলিকে আর কলম বলিয়া মানিতে না চায়, সেই ভয়ে তাঁহারা শক্ত নিয়মের বাঁধনে পটুয়াদের হাত-পা আচ্ছা-করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ ধারণার কারণ এই যে, শিল্পীদের শক্তির অভাবই মিশরীয় চিত্রকলার সংকীর্ণতার হেতু নহে; কেননা, শিল্পীরা যে শক্তিধর ছিল তাহার ঢের প্রমাণ আছে। সুতরাং একটা বড় প্রভাব যে শিল্পক্ষেত্রের বাহির হইতে তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিশরের চিত্রকররা যে-সব রং ব্যবহার করিত, তাহা খুব সাদাসিধে বটে; কিন্তু দেখিতে এমন সুন্দর যে চোখ-মন মোহিত হইয়া যায়। সাদা বা হলদেটে জমির উপরেই সচরাচর ছবি আঁকা হইত।

প্রাচীন মিশরে চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের যে বীজ মুকলিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হইলেও সর্ব্বাগ্রগণ্য; কেননা, উন্নত ললিত কলার জন্য আধুনিক য়ুরোপ প্রাচীন মিশর-ভূমির নিকটে সকল দিকেই ঋণী। গ্রীসের প্রাথমিক ললিত কলার উপরে মিশরের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। মিশরের আর্ট না থাকিলে গ্রীসের আর্ট, সামনে কোন-রকম আদর্শ দেখিতে পাইত না। আর্টের যে মুকুল মিশরভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, গ্রীস দেশে তাহাই বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়া বিশ্বের মনোহরণ করিয়াছিল। মিশরবাসীরা গৃহের ছাদ ও ভিত্তিতে যে চিত্রিত অলঙ্কারের নমুনা রাখিয়া গিয়াছে, আজ এত সহস্র বৎসর পরেও য়ুরোপের আধুনিক শিল্পীরা তাহার অবিকৃত অনুকরণ করিতেছে। কলিকাতার ধনীরা জানেন না, অথচ তাঁহাদেরও অনেকের গৃহভিত্তি বা গৃহছাদ ঈষৎবিকৃত মিশরীয় আদর্শেই অলঙ্কৃত হয়। তাই Apolloর লেখক S. Reinach বলিয়াছেন, "After monumental architecture, of which they set the example, the greatest gift of the Egyptians to art was their system of decoration."

এমনি নানা গুণে গুণী বলিয়াই, প্রাচীন মিশরের কলাবিদরা শিল্পজগতে অমর হইয়া আছে। তাহাদের খুঁৎ আছে ঢের,—অপূর্ণতা আছে যথেষ্ট; কিন্তু এই দোষ-ত্রুটির জন্য মিশরের আর্টকে অবহেলা করিলে

পৃথিবীর ললিতকলা আজ অনেকদিকে দরিদ্র হইয়া থাকিত। দোষে-গুণে মিশরের আর্টিষ্ট অতুল্য এবং বরেণ্য; তাহাদের সম্বন্ধে সমালোচক তাই বলেন, If they made a mistake, they at least 'sinned splendidly.'

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# তোড়া

### সহর

সদাই ছোটা, মাইনে মোটা,
পাশের বাড়ী, অরুণ ওঠা;
সভায় জোটা, কথায় টোটা,
মোটার-গাড়ী, আমোদ লোটা।

### পল্লী

গোরুর ঘর, পাটের দর,
কুঞ্জবন, ভূতের ডর;
'মরবি মর,' 'ছুঁসনে সর'
ক্ষুদ্র মন, বেজায় জ্বর!

### বৌ

সিঁথায় সিঁদুর, হস্তে শাঁখা,
শান্ত মধুর, আস্তে ডাকা।

### শাশুড়ী

বৌকে তাড়া, মেজাজ কড়া,
সবার-বাড়া, গল্প-গড়া!

### মেসের ছেলে

সাজ-গোছ, কৈ কৈ!
সঙ্গীত, হৈ-চৈ!

### হিন্দু

মন্দির, পেরণাম,
আশ্বিন, ধুমধাম!

### বামুন-পণ্ডিত

বেলপাতা, দক্ষিণা,
থান-ধুতি, উন্-পিনা,
বকপাখী, জাত-মান,
খুঁৎখুঁৎ, নির্ব্বাণ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# শয়তানের হাত

## ( গী দে মোপাসাঁ )

মাস-আষ্টেক আগেকার কথা। এক বন্ধুর বৈঠকখানায় আমরা ক-জন বসে-ছিলুম। ভরসন্ধ্যা; সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে মদও চলছিল। আমরা সবাই সাহিত্য আর আর্ট নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছিলুম।

হঠাৎ আমার এক প্রাণের বন্ধু হুড়্-মুড়্ করে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই সে বলে উঠল, "বল দেখি, আমি কোথা থেকে আসছি?"

আমাদের যার যা মনে হোল, বলে দিলুম।

"দুয়ো, তোমরা কেউ আন্দাজ করতে পারলে না! আমি গিয়েছিলুম দেশে—সেখানে সপ্তাহ-খানেক থেকে এই মাত্র ফিরে আসছি। আসবার সময়ে আমি সঙ্গে করে কি এনেছি জান? শয়তানের হাত!" —এই বলে বন্ধু তার কাপড়ের ভিতর থেকে মানুষের একখানা কাটা হাত বার করলে! হাতখানায় কোন-রকম রাসায়নিক ঔষধ মাখানো হয়েছে—তাই তাতে পচ্ ধরেনি। কিন্তু দেখতে সেটা কী ভয়ানক!—কালো, শুক্‌নো, লম্বাটে, কুঁচকে-পড়া! পেশীগুলো ফুলো-ফুলো, শক্ত;—তার উপরে পার্চমেণ্ট কাগজের মতন একখানা পাতলা, ফ্যাকাশে চামড়া; সরু-সরু হল্‌দে নখ-গুলো এখনো আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে; দেখলেই মনে হয় এ হস্তের যে অধিকারী ছিল, সে একজন নররূপী শয়তান!

বন্ধু বল্‌তে লাগল, "আমাদের দেশে এক বুড়ো যাদুকর ছিল, সম্প্রতি সে পটল তুলছে। এবার গিয়ে দেখি, তার জিনিষ-পত্তরগুলো নিলাম হচ্ছে। সেই নিলামে আমি এই হাতখানা কিনেছি। এ হাতটাকে যাদুকর খুব সাবধানে, খুব তোয়াজে রাখত। এ না-কি একটা খুনের হাত—ফাঁসীতে সে মরেছে। উপর-উপরি দু-বার নিজের স্ত্রীকে বধ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে সে ভবঘুরে হয়। তারপর—ফাঁসী যাবার আগে সে যে কত মানুষ মেরেছে, কত ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, কত সতীর সর্ব্বনাশ করেছে, তার আর হিসাব হয় না।"

আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "কিন্তু এই বিদ্‌কুটে জিনিষটা নিয়ে কী করতে চাও তুমি?"

—"ওহো! এটা আমি সদর-দরজায় ঝুলিয়ে রাখব! পাওনাদার বেটারা টাকা-টাকা করে ভারি জ্বালায়—এটা দেখলে ভয়ে তারা আর আমার কাছে ঘেস্‌বে না!"

নেশায় চুরচুরে হয়ে আমার আর-এক বন্ধু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে উঠল, "হুঁ-হুঁ, এ তামাসা নয়! পীয়ের, ভাল চাও ত মানে-মানে এ হাতখানাকে এইবেলা কবর দিয়ে এস—নইলে, কোন্‌দিন দেখবে যার এ হাত, সে নিজে এখানাকে আবার দখল করতে এসেছে। জান ত, কথায় বলে 'যে একবার খুন করেছে সে আবার খুন করবে'!"

—"আর, যে একবার মদ খেয়েছে সে আবার মদ খাবে!"—এই বলে একজন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ভর্‌তি এক গেলাস 'পাঞ্চ' সেই গম্ভীর মাতালটির হাতের কাছে এগিয়ে দিলে। সে ঢক্ করে এক চুমুকেই গেলাসটি সাবাড়্ করে ফেল্‌লে; তারপর মাটিতে পড়ে মার্ব্বেলের মত ঘরময় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

পীয়েরও এক গেলাস মদ ঢেলে খুনের সেই হাতখানাকে সম্বোধন করে বললে, "ওহে, আমি তোমার মনিবকে নেমন্তন্ন করলুম,—সে মহাপ্রভুকে আমার কাছে আসতে বোলো!"

তারপর, আমরা অন্য কথা তুললুম।

পরদিন বাড়ী ফেরবার মুখে একবার পীয়েরের বাড়ীটা হয়ে এলুম। মুখে একটা

সিগারেট গুঁজে, বসে বসে সে বই পড়ছিল।

—"কি হে, কেমন ?"

—"উত্তম !"

—"সে হাতখানার খবর কি ?"

—"আসবার সময় দেখেছ ত, হাতখানা আমি দরজার কড়ায় ঝুলিয়ে দিয়েছি ? কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, হাতটাকে আনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে !"

—"কি-রকম—কি-রকম ?"

"কাল রাত যখন বারোটা, তখন কে আমার দরজার কড়া ধরে ক্রমাগত নেড়েছে ! হু চারবার নাড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি 'কে—কে' বলে বারকতক সাড়া দিলুম, কিন্তু জবাব পেলুম না। বোধহয় পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলে—কি বল ?"

এমন সময় বাড়ীওয়ালা এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই সে মহা খাপ্পা হয়ে আমার বন্ধুকে বললে, "মশাই, দরজার কড়া থেকে হয় আপনি ঐ পচা হাতখানা সরিয়ে ফেলুন, নয় এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যান ! এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড !"

পীয়ের ভারিক্কে হয়ে জবাব দিলে, "মশাই, আপনি ও হাতখানাকে অনর্থক অপমান করবেন না। মনে রাখবেন, যার ও হাত, তিনি একজন খাঁটি ভদ্রলোক ! অপমান করলে তিনি চটে আপনাকে দেখা দিলেও দিতে পারেন। সুতরাং—সাবধান !"

বাড়ীওয়ালা এ ঠাট্টাটা বোধহয় মোটেই পছন্দ করলে না ; কারণ সে আর উচ্চ-বাচ্য না করে সেখান থেকে সিধে সরে পড়ল।

পীয়েরও তার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে গিয়ে হাতখানা সদর-দরজা থেকে খুলে নিয়ে এল। বিছানার পাশে, টেবিলের উপরে চাকরদের ডাকবার একটা ঘণ্টা ছিল। হাতখানা সেইখানে রেখে পীয়ের বললে, "গোলমালে কাজ নেই, হাতটা এখানেই থাক্। রোজ ঘুমোবার আগে এটাকে দেখলেই আমার মনে পড়বে—'জন্মিলে মরিতে হবে' !—এ একটা মস্ত উপদেশ !"

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

সে রাত্রে আমার ভাল করে ঘুম হোল না ; থাকি থাকি, চমকে উঠি ; একবার মনে হোল, আমার ঘরে যেন কেউ এসে ঢুকে পড়েছে ! তাড়াতাড়ি উঠে আমি খাটের তলাটা দেখে নিলুম—কেউ সেখানে ঘুপ্‌টি মেরে লুকিয়ে আছে কি না ! ভোরের মুখে তন্দ্রাটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে—হঠাৎ দরজাটা বাইরে থেকে দুম্‌দুম্ করে কে ঠেলতে লাগল ! এক-লাফে নেমে দরজাটা খুলতেই দেখি, বন্ধু পীয়েরের চাকর সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; তার মুখ ফ্যাকাশে, শুক্‌নো ; গা থর্‌থরিয়ে কাঁপছে !

আমাকে দেখেই কান্নার সুরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলে উঠল, "মশাই গো, আমার মনিবকে কে খুন করে গেছে !"

খুন !... ...চট্‌পট্ জামা-কাপড় পরে আমি উঠ্‌তে-পড়তে বন্ধুর বাড়ীতে ছুটলুম।

সেখানে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য ! সকলেরই মুখে ঐ এক কথা ! মহা হৈ-চৈ ! অনেক কষ্টে, পুলিশের কাছে নিজের পরিচয়

দিয়ে তবে আমি পীয়েরের শয়নগৃহে গিয়ে ঢুকতে পারলুম। ··

পীয়ের মারা যায় নি বটে, কিন্তু তার অসাড় দেহটাকে দেখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হোল।

তার চোখদুটো অত্যন্ত বিস্ফারিত;—চোখের তারাদুটো যেন ভীষণ ও অজ্ঞাত কোন-একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে আছে; হাতদুটো সবলে মুঠো করা! পীয়েরের পা থেকে চিবুক পর্য্যন্ত একখানা মিশ্‌-কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল;—সেখানা একটু সরিয়ে আমি দেখলুম, তার গলায় পাঁচটা আঙুলের দাগ মাংসের মধ্যে গভীর হয়ে চেপে বসে গেছে; জামার উপরে ক-ফোঁটা রক্তের ছোপও লেগে রয়েছে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। বিছানার পাশে টেবিলটার দিকে আমি ফিরে দেখলুম,—খুনের হাতখানা সেখানে নেই! সে ভয়ানক হাতটা দেখলে লোকে পাছে ভয় পায়, হয়ত সেইজন্যে কেউ সেখানাকে চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে।

সকালের খবরের কাগজে এই ব্যাপারটার যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, এখানে আমি সেটুকু তুলে দিলুম :—

"গত কল্য রাত্রে শ্রীযুক্ত পীয়ের বি—, নামে একজন আইনশিক্ষার্থী ছাত্রকে হত্যা করিবার জন্য কে বা কাহারা চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ যুবক ছাত্রটি কল্য রাত্রি দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁহার শয়নগৃহ হইতে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হওয়াতে বাড়ীর চাকরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। চাকরটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভীতভাবে প্রদীপ জ্বালে; ঘণ্টাটা মাঝে একবার থামিয়া পুনর্ব্বার এত জোরে বাজিয়া উঠে যে, সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্বারবানকে জাগাইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত পীয়েরের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। অনেক ঠেলাঠেলিতেও ঘরের দরজা যখন খুলিল না, তখন থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সকলে এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায়। জিনিসপত্তর চারিদিকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া আছে,—আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর ভিতরে যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি হইয়াছিল—ঘরের সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় জাজ্বল্যমান। মেঝের মাঝখানে হতভাগ্য যুবকটির দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মুখ মড়ার মত—চোখ যেন ভয়ে আড়ষ্ট। তাহার গলার উপরে কাহার হাতের পাঁচটা আঙুলের দাগ। ডাক্তারের মতে যুবককে যে দুরাত্মা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার শরীরের শক্তি অমানুষিক; তাহার হাতের আঙুলগুলোও অস্বাভাবিকরূপে শিরাবহুল ও শীর্ণবিশীর্ণ;—কারণ, যুবকের কণ্ঠের ভিতরে আঙুলের চাপে পাঁচটি গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। অপরাধীর উদ্দেশ্য কি, এবং কাহার দ্বারাই বা এমন কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

পীয়ের-বেচারা এ যাত্রা প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু একেবারে বদ্ধপাগল হয়ে গেল। উপর-উপরি সাতমাস ধরে গারদে

তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম, সে কিন্তু সহজ জ্ঞান আর ফিরিয়ে পেল না। প্রলাপের সময়ে সে হরেক-রকমের উদ্ভট কথা বলত। পাগলদের যেমন হয়ে থাকে, সেও তেমনি একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকত; সর্ব্বদাই মনে করত যে, তার ঘাড়ে একটা প্রেত চেপেছে।

একদিন গিয়ে দেখি, তার গতিক বড়ই খারাপ। আমার সামনে ঘণ্টাদুয়েক সে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে পড়ে রইল; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল এবং ভয়ে আত্মহারা হয়ে দু-হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এটাকে সরিয়ে ফেল! এটাকে সরিয়ে ফেল! ওঃ! ওঃ! এ যে গলা টিপে আমায় মেরে ফেললে! বাঁচাও—বাঁচাও!"

ঘরের চারিদিকে চেঁচাতে চেঁচাতে বারদুয়েক দৌড়োদৌড়ি করে মাটির উপরে মুখ-থুবড়ে সে পড়ে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু!

পীয়েরের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না; কাজেই সৎকারের জন্যে শব নিয়ে আমিই তার দেশে গেলুম। এই দেশ থেকেই পীয়ের সেই অলক্ষুণে শয়তানের হাতখানা নিয়ে গিয়েছিল।... ... ...

আজ পীয়েরের কবরের দিন।...

আকাশ পরিষ্কার নীল। বাতাসে বনে বনে মর্ম্মরোৎসব জেগে উঠেছে, আলোকে চারিদিক ভরে গিয়েছে; গাছে গাছে পাখীরা মধুর স্বরে পুরাণো দিনের স্মৃতি-গান গাইছে। মনে পড়ল, ছেলে-বেলায় এইখানে পীয়ের আর আমি কত খেলাই খেলেছি, এই মাঠে দুজনে কত ছুটোছুটি করেছি, ঐ বনের তলায় গিয়ে কত ফল কুড়িয়ে খেয়েছি!

আজকেও দেখলুম, মাটির উপরে একটা পাকা ফল পড়ে রয়েছে। আনমনে সেই ফলটি কুড়িয়ে নিয়ে মুখের কাছে ধরলুম...

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন,—জনকতক লোক পীয়েরের কবর খুঁড়ছে। হঠাৎ তাদের কোদাল শক্ত কি-একটার উপরে পড়ে সশব্দে বেজে উঠল।

খানিক পরে লোকগুলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের ডাকতে লাগল। আমি আর পুরুত ব্যাপার কি দেখতে এগিয়ে গেলুম।

গোরস্থান খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা পুরাণো কবর আবিষ্কার করেছে। এক জন কুড়ুলের ঘা মারতেই কফিনের ডালাটা গেল খুলে—সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা দেখতে পেলুম, তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত দীর্ঘাকার কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সেই মাংসশূন্য কঙ্কালটা তখনো যেন চক্ষুহীন অক্ষিকোটর মেলে, শূন্য অথচ ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিল! আমার মনটা কেমন দমে গেল; কেন জানি না, কি-একটা অজানা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা যেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

একজন বলে উঠল, "এ কি! দ্যাখ, দ্যাখ, লোকটার একখানা হাত নেই! এই যে, হাতখানাও যে এর সঙ্গেই রয়েছে!" —বলে, সে কঙ্কালের পাশ থেকে একখানা দীর্ঘ, শুষ্ক ও পেশীস্ফীত কাটা হাত তুলে নিয়ে আমাদের সকলকে দেখালে!... ...

দেখেই আমার মনে হোল, শয়তানের সেই হাতখানার কথা!...... পীয়েরের ঘর থেকে সে হাতখানা হারিয়ে গিয়েছে!...

আর-একজন ঠাট্টা করে বললে, "দেখেছ! তুমি ওর হাত কেড়ে নিয়েছ বলে ও যেন লাফিয়ে উঠে তোমার টুঁটি কামড়ে ধরবার উদ্যোগ করছে!"

পুরুত বললেন, "ভাই সব, যে মরেছে তাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও! আর-একটা জায়গা দেখে মিঃ পীয়েরের জন্যে কবর খোঁড়ো!"

পীয়েরের শেষ কাজ শেষ হোল; সহরে ফেরবার আগে পুরুতের হাতে আমি গুটি-কয় টাকা দিয়ে এলুম,—অকালে যে নিদ্রিত আত্মার সুপ্তিভঙ্গ করেছি, তার যাতে শান্তি হয়, সেইজন্যে স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করতে!

শ্রীমতী রেণু রায়

---

# পূর্ণতা

(Rupert Brooke)

ভাল, মন্দ দুই লেখা লিখিয়া ললাটে,
অশ্রু ভরি অন্তর গভীরে,
বিদায় লয়েছি দোঁহে ধীরে অতি ধীরে!
নিঃশব্দে খুলিয়া আজ নিরুদ্ধ কপাটে
সায়াহ্নের প্রচ্ছায় তিমিরে,
বিগ্রহ-বিহীন শূন্য নিভৃত মন্দিরে
আবাহন করিতেছে, উড়ে আশা চিন্তা শত শত,
বক্ষ ছিন্ন নাহি করে তীক্ষ্ণচঞ্চু বিহঙ্গের মত,
যারা আলোকের প্রায়, নীরবে ঘুমায়
পূর্ণ করি রজনীর আঁধার কুলায়!

হায় মন, শূন্য তোরে রাখি পল ভর,
সে শকতি নাহিক আমার,
তাই ভাবি সেই প্রেম গ্রন্থে গাঁথা যার
পুলক অপার, যেথা সে চির-অমর!
পুত্রবতী নারীর জীবন,
প্রবীণের শান্তি-ভরা বিরাম-ভবন,
পরিপূর্ণ প্রাণ-বান অবারিত প্রান্তর শ্যামল,
নিশ্চিত শস্যের আশে বক্ষ যার সিঞ্চনে কোমল,
শিশুর কল্যাণ মুখ, আলোকে উন্মুখ
বর্ষণবিরত স্বচ্ছ আকাশের বুক!

নীরব প্রশান্ত স্তব্ধতা যাহার
ঘরে-ফেরা বিহগের দল,
আনন্দে ভাঙিয়া দেয় করি কোলাহল!
সঙ্গীতের সদানন্দ, যে পুণ্য সত্তার
মরণ-অতীত অবিরল,
উদার সুন্দর শান্ত উজ্জ্বল নির্ম্মল!
ধীরে ধীরে, একে একে, বার বার নিয়ত স্মরিয়া
অমৃতের অভিষেকে লব মোর অন্তর ভরিয়া!
আজ সাধ্য নাহি আর, হৃদয়ে আমার
শূন্যতারে এক তিল দিতে অধিকার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

# সমালোচনা

**নচিকেতা।** শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, আদি ব্রাহ্ম সমাজ; কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন—ভূমিকায় তিনি উপনিষদের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল; তবে বক্তব্য কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই, আগাগোড়া ধোঁয়াটে রহিয়া গিয়াছে! এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধারণ পাঠক যে 'আলো পাইবেন', এমন সম্ভাবনা ত দেখিলাম না।

**ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার।** দ্বিতীয় খণ্ড। সুসঙ্গ রাজবংশ। কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। রামগোপালপুর রাজবাটী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা চেরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লেখা নাই। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল—এই খণ্ডে সুসঙ্গ রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই বংশের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জে সোমেশ্বর পাঠক নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—তিনি ৬৮৭ সালে ( ১২৮০ খৃঃঅব্দে ) কামরূপ ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিবার মানসে কয়েকজন অনুচরের সহিত বঙ্গদেশে আসেন ও ক্রমে গারো পাহাড়ের নিকট বাস-স্থাপন করেন; বাইশা গারোর অত্যাচারে সে প্রদেশ তখন প্রপীড়িত—বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী ও ধীবর অধিবাসীর সাহায্যে সোমেশ্বর বাইশা গারোকে হঠাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধুর পরামর্শে ও সৎপ্রকৃতিক ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার নাম হয় 'সুসঙ্গ'। এই সময় হইতেই সুসঙ্গের শ্রী ও সমৃদ্ধির সূত্রপাত। এ গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি রাজবংশের কথা ধারাবাহিক বিবৃত হইয়াছে; কোথাও অবান্তর কথা বা ঝাঁঝালো উচ্ছ্বাসের কোন চিহ্ন নাই—রচনায় কোনরূপ আড়ম্বর নাই; বিচিত্র ঘটনায় স্বতঃই বেশ কৌতূহল জাগিয়া উঠে।

**১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।** প্রথম বৎসর, ১৩২৩, ১১ই পৌষ। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ সম্পাদিত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। এখানিকে বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের 'ডিরেক্টরী' গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহাতে বহু বাঙলা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের পরিচয়, মাসিক ও সংবাদ পত্রাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ভুল বিস্তর আছে। এ ধরণের পুস্তক যতদূর-সম্ভব নির্ভুল হওয়া দরকার—নহিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না। তবে এই প্রথম চেষ্টা বলিয়া এবার ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই। বইখানি বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ বলিয়া অনেকের অনেক উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা। নানা বিভাগে নানা বিষয় সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি কাজের হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাধারণের কাছে বঙ্গসাহিত্য-সেবীদের পরিচয় দানে এবং তাঁহাদের গ্রন্থ-প্রচারেও সহায়তা করিবে।

---

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে




ব্যঙ্গোক্তি (?)

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ ]		আষাঢ়, ১৩২৪		[ ৩য় সংখ্যা

# আলেয়ার আলো

## দশ

### হরেন্দ্রের কথা

মুরারিবাবু একটি বয়স্ক শিশু; অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধও বটেন, শিশুও বটেন! বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা আর শিশুর সরলতা, তাঁর চরিত্রের মধ্যে এ দুয়েরি হরি-হর মিলন হয়েছে।

আর, তাঁর প্রাণটি ত দয়ামায়ায় একেবারে কানায় কানায় ভরা! সেদিন একটি সামান্য ব্যাপারে তাঁর চরিত্রের এই কোমল দিকটি দেখতে পেয়েছি। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বসে বসে কথাবার্ত্তা কইছি, হঠাৎ আমার পিছন থেকে 'কেঁউ-কেঁউ' করে কি-একটা জানোয়ার ডেকে উঠল। কিন্তু পিছন ফিরে কিছুই দেখতে পেলুম না। খানিক পরে আবার সেই 'কেঁউ-কেঁউ' আর্ত্তনাদ,—ঠিক আমার পিছনে! আবার পিছনপানে চাইলুম—কিন্তু কিছুই নেই। আমাকে আশ্চর্য্য হোতে দেখে মুরারিবাবু কৌতুকমাখা চোখে বললেন, "কি দেখছেন?"

—"ঘরের ভিতরে কি ডাকে ও?"

—"কুকুর-ছানা।"

—"কুকুর-ছানা! কৈ, দেখতে পাচ্ছি না ত!"

—"তাকে দেখতে চান ত ঐ জামার জেবের দিকে তাকান!"

তাইত! আনলায় প্রকাণ্ড একটা 'ওভার-কোট' ঝুলছিল, তারই এক পকেটের ভিতর থেকে একটা কুকুর-ছানার ছোট্ট নাকের ডগা আর পুটপুটে দুটি চোখ দ্যাখা যাচ্ছে! পকেটের কারাগারে বন্দী থাকতে নারাজ হয়ে সে ক্রমাগত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে পারছিল না।

—"অ্যাঁ, জামার পকেটে কুকুর-ছানা! এ কি ব্যাপার!"

মুরারিবাবু হাসতে হাসতে উঠে জেব থেকে তাকে টেনে বার করলেন। এটি দেশী কুকুরের বাচ্ছা, বয়স মাসখানেক হবে, গা-ময় ধূলো-কাদা মাখা।

মুরারিবাবু করুণ নেত্রে সেই অস্থিসার বাচ্ছাটির দিকে তাকিয়ে, তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "কাল সন্ধ্যে-বেলায় রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় দেখি একটা কুকুর-ছানা বৃষ্টিতে

ভিজতে-ভিজতে কাদার উপর পড়ে কেঁপে মরছে। আহা, সে এমনি কাঁদছিল যে প্রাণ যেন ফেটে যায়!—সুতরাং—”

—“সুতরাং আপনি ওকে নিয়ে এসে জামার জেবের ভিতরে পুরে ওর শীত নিবারণ করেছেন?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে করছি খাইয়ে-দাইয়ে এ বেচারীকে মানুষ করব।”

—“যতই খাওয়ান-দাওয়ান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ-পর্য্যন্ত ও কুকুরই থেকে যাবে, মানুষ কখনো হবে না মুরারিবাবু!”

—“কি আশ্চর্য্য! আপনি কি জানেন না অনেক মানুষ কুকুরের চেয়েও নীচু? যত্ন করলে কোন কুকুরই নিমকের মর্য্যাদা নষ্ট করে না—বরং তারা যে অনেক মানুষের চেয়েও বড়, সেই পরিচয়ই দিয়ে থাকে।”

মুরারিবাবুর ঠিক কথা! অপকারীকে মানুষ ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে সে দু-পায়ে থ্যাঁৎলাতে পারলে আর ছাড়ে না। এই ত দুনিয়ার ধারা!

মেয়েটিকে নিয়ে বৃদ্ধ ভারি নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছেন। আর বাস্তবিকই ভাবনার কথা ত! তাঁর এমন-কোন আত্মীয় নেই, তাঁর অবর্ত্তমানে যিনি সরমার অভিভাবক হোতে পারেন।

আমি চাই সরমার সঙ্গে মোহনের বিয়ে দিতে। মোহনের প্রাণকে বরাবর আমি মরাগঙ্গা বলে জানতুম; কিন্তু তার প্রাণে এত-হঠাৎ প্রেমের জোয়ার যে এমন জোরে বইতে পারে, এ খেয়াল আমার মোটেই ছিল না! বেচারী একেবারে ডুবেছে! দিন-রাত আন্‌মনা, পড়া-শুনোয় মন নেই, কথায় কথায় সরমার নাম করে,—প্রেমে পড়লে মানুষের এম্‌নি হাল হয় বটে! এবারে সে একজামিন দিলেও তার পক্ষে পাশ হওয়া শক্ত কথা।

মোহন কিন্তু এদিকে বেড়ে জমিয়ে তুলেছে। সরমা আমার সামনে মুখ খুলে বেরোয় না, কিন্তু মোহনের সামনে বেরোয়, দু-চারটে কথাবার্ত্তাও কয়। সরমা পরমা সুন্দরী বটে, কিন্তু মোহনও পরমসুন্দর পুরুষ। সরমাকে দেখে মোহন যখন ভুলেছে মোহনকে দেখে সরমাও তখন ভুলবে না কেন? এ ত হৃদয়ের ধর্ম্ম! দুটি তরুণ হৃদয় যখন পরস্পরের সামনাসামনি থাকে, তখন মিলন ত স্বাভাবিক! বিশেষ, কবিও বলেছেন—

“প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!”

এখানেও ফাঁদ পাতা হয়েছে—শিকার পড়তে বেশী দেরি লাগবে না; ফাঁদ ব্যর্থ হবে না। তা যদি হয়, মোহনের অদৃষ্ট তবে নেহাৎ মন্দ।

মোহনকেও সেদিন এই কথাটা বললুম। সে মুচকে একটু হাসলে—কিছু বললে না।

খানিক পরে সে বললে, “হরেন, তোমারও বয়স হোল, এইবার বিবাহের চেষ্টা দ্যাখ।”

—“মাপ কর ভাই! ও বিবাহ টিবাহ আমার দ্বারা হচ্ছে না!”

—“কেন হে?”

—“ও জিনিসটিকে আমি জুজুর মত ডরাই।”

—“কারণ?”

—“অনেকগুলো বই পড়া হয়ে গেলে

পর প্রায়ই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে, এগুলো না পড়লেই ছিল ভাল! তেমনি, অনেকগুলি বিবাহিত বন্ধুর চরিত্র অধ্যয়ন করে আমার এই দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, যাতে-করে' সহজ মানুষের বিগ্‌ড়ে যাবার সম্ভাবনা, সে হাঙ্গাম থেকে তফাতে থাকাই যথার্থ সুবোধের কার্য্য।"

—"মানুষ তবে বিয়ে বিয়ে করে পস্তায় কেন?"

—"কারণ, বিবাহ হচ্ছে দিল্লীর লাড্ডু! কাজেই, না খেলেও পস্তাতে হয়—খেলেও পস্তাবে!"

—"এ তোমার মিথ্যা বিশ্বাস!"

—"বন্ধু, আমার মিথ্যা বিশ্বাসে আমার শ্রদ্ধা আছে। সমাজে তোমরা যাকে 'সত্য' বল, সেই 'সত্য' হচ্ছে এমন কতকগুলি মিথ্যার সমষ্টি—যেগুলিকে সব-চেয়ে সহজে বিশ্বাস করা চলে। একটু তলিয়ে দেখলেই সে-সব ভুয়ো সত্যের ভাঙ্গা ঠাট বেরিয়ে পড়ে। আমি তাই জানি, পৃথিবীতে 'মিথ্যা'র চেয়ে বড় 'সত্য' আর নেই। তোমাদের কাছে যা মিথ্যা, আমার কাছে তাই সত্য।"

—"তুমি তাহলে বিবাহ করতে চাও না?"

—"না। বিবাহ করে' আমি আমার স্বাধীনতা লোপ করতে চাই না।"

—"হরেন, তুমি ভারি স্বার্থপর ত!"

—"কিসে?"

—"যারা একলা থাকতে চায়, তারা স্বার্থপর নয় ত কি?"

—"ভাই, স্বার্থপরতার একটি মস্ত গুণ আছে; কৃতঘ্নের দংশন থেকে আমাদের সে বাঁচিয়ে রাখে।"

—"দিন দিন তুমি যেন কী হয়ে উঠছ! আমার কথার উত্তরে তোমার এই দুর্ব্বোধ দার্শনিকতা সুধু যে অসহনীয়, তা নয়—অসাময়িকও বটে!"—এই বলে মোহন রাগ করে চলে গেল।

কাল যখন মুরারিবাবুর বাড়ীর কাছে যাই—তখন দূর থেকে যেন মনে হয়েছিল, দুটো লোক মুরারিবাবুর বাড়ীর সামনে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের কাছে যেতে-না-যেতে তারা ছায়ার মত সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল। আমি খানিকক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও আর কারুকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু মনে-মনে কেমন-একটা খটকা লেগে রইল। সহরের এদিকটা কী নির্জ্জন! যে-কোন একটা অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে।

পরদিন একটু সকাল-সকাল মুরারিবাবুর বাড়ীর দিকে গেলুম। তাঁর বাড়ীর পাশেই একটা ছোট গলি ছিল,—তার ভিতরে ঢুকে চুপটি করে' ঘাটি আগলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই গলির ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, দুটো লোক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আপনা-আপনি কি বলাবলি করছে।

মিনিট দুই-তিন পরে তারা আস্তে আস্তে চারিদিকে চাইতে-চাইতে সতর্কভাবে এগিয়ে এল। তারপর মুরারিবাবুর বাড়ীর সদর দরজাটা একটু ফাঁক করে' ভিতর-পানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কি দেখতে লাগল।

কে এরা? যেই হোক্—এদের মত লোক ত ভাল নয়! নিশ্চয় এরা কোন-একটা অসৎ কাজ করবার সুবিধা খুঁজছে।

গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে, পা টিপে-টিপে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর বেশ বাগিয়ে দু-হাতে দুজনের গলা ক্যাঁক্-করে' টিপে ধরলুম।

তারা চমকে উঠল,—আমার হাত ছাড়াবার জন্যে ঝটাপটি করতে লাগল। কিন্তু আমি যখন আচ্ছা করে' এর মাথায় ওর মাথায় ঠকাঠক্ ঠুকে দিলুম, তখন তারা কেমন লোকের পাল্লায় পড়েছে বুঝতে পেরে কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্যাসের আলোর দিকে ফিরিয়ে, তাদের মুখ দেখে নিয়ে বুঝলুম, গ্যালবারে যে দুই মহাপ্রভু মুরারিবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন, এঁরা তাঁরা ছাড়া আর কেউ নন!

টিট্‌কিরি দিয়ে বললুম, "এই যে! সেবার আশা দিয়ে গিয়েছিলেন আবার দর্শন দেবেন; আপনারা কথা রেখেছেন দেখে সুখী হলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের নমস্কার করতে পারলুম না—যেহেতু আমার দু-হাতই জোড়া!"

যে লোকটার চেহারা গুণ্ডার মত, সে কাতরভাবে বললে, "ছেড়ে দিন মশাই, লাগছে!"

খুব-জোরে একটা ঠ্যালা মেরে তাকে ছেড়ে দিলুম—সে তিনহাত তফাতে ছিটকে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল।

—"ব্যাটা, তালপাতার সেপাই, কল্‌কাতায় এসেছ গুণ্ডামি করতে! যাও, আবার যদি কখনো এদিকে দেখি, আর বাঁচবে না!"—

সে কোন জবাব না দিয়ে চট্‌পট্ উঠেই চোঁচা দৌড় মারলে!

অন্য লোকটিকে ব্যঙ্গ করে আমি বললুম, "ওহে, দেখেছ! তোমার স্যাঙাত্ পড়ল ঠিক লাট্টুর মত ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, আর পালাল ঠিক টাট্টুর মত ছুটতে ছুটতে। এখন তোমাকে নিয়ে কি করা যেতে পারে বল দেখি? লাথি, চড়, ঘুসি, গাঁট্টা—বন্ধু, এর মধ্যে কোন্‌টা তুমি বেশী পছন্দ কর?"

সে মিনতি করে বললে, "আর কেন, আমাকেও যেতে দিন!"

মুরারিবাবুর মুখে যে জমিদারের কথা শুনেছিলুম, নিশ্চয় ইনি সেই মহাপুরুষ! জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার নাম কি?"

নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বিরক্ত হয়ে বললে, "নামে কি দরকার? ছাড়ুন না!"

গলা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, "এখনো ঝাঁঝ! নাম বল বলচি!"

সেই এক ঝাঁকুনিতেই তার সব ঝাঁঝ ঠাণ্ডা হয়ে গেল! শুষ্ককণ্ঠে আস্তে আস্তে সে বললে,—"নবীনচন্দ্র পাল।"

—"নবীনবাবু, তোমার আর-একটু শিক্ষার দরকার।"—বলে আমি মুরারিবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম।

মুরারিবাবু বাইরে এসে, ব্যাপার দেখে একেবারে থ! বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে গেলে পর তিনি বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এযে নবীনবাবু!"

—"হ্যাঁ, আপাতত কিঞ্চিৎ কাবু!"

—"ব্যাপার কি?"

—"ক্রমে শুনবেন। আগে বাড়ীর ভিতরে চলুন।"

—"আহা, ওঁর লাগছে—ছেড়ে দিন হরেনবাবু!"

—"ছাড়ব বৈকি, এ রত্নকে যত্ন করে বেশীক্ষণ রেখে লাভ নেই।"— বলে, নবীনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টেনে-হিঁচড়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলুম।

সরমা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল,—আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে আড়ালে সরে যেতে গেল!—আমি কিন্তু ডেকে বললুম, "দ্রৌপদী-ঠাকরুণ, যাবেন না—দয়া করে' একটু দাঁড়াতে হবে।"

সরমা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নবীনের গলা ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম, "নবীনচন্দ্র, যাও—ওঁর পায়ের কাছে নাকে খৎ দিয়ে, ওঁকে প্রণাম করে' বল, 'মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো করব না।' গেলে না যে? যাও,—যাও বলছি!"

নবীন তবু নড়ল না—মাথা হেঁট করে' কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

—"তোমার ও পাপমুখে সহজে তাহলে মা-নাম বেরুবে না? দেখবে? আমার এ হাতের একটি—একটি মাত্র চড় খেলে তুমি কি আর বাঁচবে মনে করেছ?"—বলেই আমি চড় তুললুম।

মুরারিবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললেন, "অ্যাঁ,অ্যাঁ—করেন কি—করেন কি! কি আশ্চর্য্য! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—আহা, আমার মায়া হচ্ছে!"

—"যে মা বলতে জানেনা তাকে মায়া করলে মায়ার বাজেখরচ হয় মুরারিবাবু! নবীন, এখনো যা বলছি কর!"

সে আস্তে আস্তে আড়ষ্টভাবে সামনের দিকে হেঁট হোল।

—"দাও নাকে খৎ! আচ্ছা; প্রণাম কর! আচ্ছা; বল 'মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো করব না'!"

নবীন বিড়্‌বিড়্ করে আমার কথা আবৃত্তি করতে লাগল।

আমি বললুম, "ওতে হবে না—চেঁচিয়ে, ভাল করে বল!"

সে চেঁচিয়ে আবার বলতে লাগল—"মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ—"

দেখলুম, সরমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে হাসির লহর বহে যাচ্ছে; শেষটা আর থাকতে পারলে না—নবীনের কথা ফুরোবার আগেই মুখে কাপড় দিয়ে কোনরকমে হাসির বেগ থামিয়ে সে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তারপর ঘরের ভিতর হোতে শুনতে পেলুম, তার চাপা হাসির অস্ফুট উচ্ছ্বাস!

নবীন মুখ চুণ-করে' দাঁড়িয়ে আছে দেখে মুরারিবাবু আস্তে-আস্তে তার কাছে গেলেন। তারপর দুহাতে তার একখানা হাত চেপে ধরে মমতা-মাখানো গাঢ় স্বরে বললেন, "নবীনবাবু, কিছু মনে করবেন না!"

নবীন আর সামলাতে পারলে না—অপমানে, দুঃখে বিহ্বল হয়ে সে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল, চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল।

আমারও তার উপরে কেমন দরদ হোল; মনের ঝোঁকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, হাজার-হোক ভদ্রলোকের ছেলে ত! আমি তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললুম, "ভাই, মাফ কর!"

আমি যে তার কাছ থেকে মাফ চাইব, এতটা বোধহয় সে আশা করে-নি। কারণ, নবীন তার সজল চোখ তুলে দুঃখিত ও বিস্মিত ভাবে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলে ; কিন্তু, কোন কথা না বলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে, মাথা নীচু করে'ধীরে-ধীরে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন মুরারিবাবুকে একে-একে সমস্ত কথা খুলে বল্‌লুম।

মুরারিবাবু প্রশংসার চোখে আমার দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনার গায়ে এত জোর!"—তারপরেই বোধ করি নবীনের কান্না মনে করে'ই একটু বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "কিন্তু এতটা সাজা দেওয়া আপনার ভাল হয়-নি! হাজার-হোক, জমিদারের ছেলে, অপমানের মাত্রাটা বড় বেশী হয়ে গেছে!"

—"মুরারিবাবু, আজ যদি ওকে সুধু মেরেধরে ছেড়ে দিতুম, কাল তাহলে ও তার শোধ তুলতে আবার ফিরে আসত। কিন্তু, এই-যে অপমানটা করা হোলো, ওর যদি মানের ভয় থাকে তাহলে আর এ-মুখো হবে না। সে-সব কথা যাক্। অনেক পরিশ্রম করা হয়েছে, অতএব দ্রৌপদী-ঠাকরুণকে বলুন, আমার আজকের ঋণটা হাতে-হাতে পরিশোধ করতে। ধার জমিয়ে রাখতে পারব না —আমি তেমন নির্ব্বোধ মহাজন নই!"

## এগারো

## সরমার কথা

মাগো, বাবা যেন কি! কোথা-থেকে একটা হাড়-জিরজিরে কুকুরের ছানা ধরে এনেছেন, সে দিন-রাত তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছে-ফিরছে। বাবা যখন খেতে বসেন, সে তাঁর পাতের পাশটিতে বসে টিক্-টিক্ করে' সরু-লিক্‌লিকে ল্যাজটি নাড়ে; বাবা যখন শুতে যান, সে তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। আদর করে' তার আবার নাম রাখা হয়েছে 'নন্তুয়া'!

আচ্ছা, বাবা আজকাল মাঝে-মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে যান কেন? মুখখানি বিমর্ষ করে' এক-একবার আমার দিকে তাকান, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর আকাশ-পাতাল কত-কি যেন ভাবতে থাকেন। সময়ে-সময়ে আমাকে বোধহয় কিছু বল্‌ব-বল্‌ব করেন—অথচ কিছু বলতেও ত পারেন না।

এ আর কিছু নয়—আমার এই ছার কপালের কথা ভেবে-ভেবে বাবার মনের সব সুখ-সোয়াস্তি ঘুচে গেছে। কিন্তু আমাকে তিনি কি বলতে চান? কেনই-বা বলতে পারেন না? সে কথা শুনলে কি আমার মনে বিশেষ কষ্ট হবে? এমন কি কথা?

সেদিন আমি বাবাকে জোর করে' ধরে বসলুম। বললুম, "হ্যাঁ বাবা, তুমি কি ভাব, আমাকে বলতে হবে।"

বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; ইতস্তত করে' বললেন, "কৈ মা, কিছু ভাবিনা ত!"

আমি বাবার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম, "না বাবা, তুমি লুকোচ্ছ। আজ কিন্তু কিছুতেই আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে।"

বাবা আমার মুখের পানে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে দেখি, তাঁর চোখ ক্রমেই জলে ভরে উঠছে!

—"বাবা, তুমি কাঁদছ!"—বলে আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর বুকের ভিতরে মুখ লুকোলুম। মনে হোল বাবার বুকখানা থেকে-থেকে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অনেকক্ষণ বাবাও কথা কইলেন না—আমিও না। তারপর তিনি আমার মাথার উপর দুটি হাত রেখে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, "মা সরো, আজ আমি তোমায় যে-কথা বলব, সেটা হাল্‌কাভাবে নিও না। যে দুঃখী, সে তার দুঃখ যতই ভুলে থাকৃতে পারে, তার পক্ষে সেটা ততই মঙ্গলের কথা। নারীর যার-বাড়া দুঃখ নেই, তুমি তাই সয়ে আছ। এ-অবস্থায় তোমাকে তোমার দুর্ভাগ্যের কথা নূতন করে' স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়—অথচ এ না করে' আর উপায়ও নেই।"

বাবা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আমার বয়স বাড়ছে বৈ কমছে না—সংসার থেকে এখন আমার চিরবিদায় নেবার সময় এসেছে। আমার এমন-কোন আত্মীয় নেই, যিনি তোমার ভার নিতে পারেন। এখন আমি যদি যাই, এ পৃথিবীতে তুমি একলা হবে। তোমার এই বয়স—তাতে তুমি স্ত্রীলোক। এ অবস্থায় আমাকে এমন-কিছু করতে হবে, যাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

বাবা আবার থামলেন। আমার প্রাণের ভিতরটা কি-রকম হু হু করতে লাগল।

—"মা সরো, কিন্তু একটি উপায় ছাড়া আমার আর-কিছু করবারও নেই। আজকাল সমাজে বিধবা-বিবাহ চলছে। পণ্ডিতরা বিধানও দিয়েছেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তোমার আবার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমি ত আর দ্বিতীয় উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এ-বিষয়ে তোমার মত কি, আমি তাই জানতে চাই। তোমার মত না নিয়ে আমি কিছু করব না—করতে পারব না। বেশ করে' সমস্ত ভেবে-চিন্তে তোমার যা মত আমাকে জানিও। আমার কাছে কিছু লজ্জা কোরো না মা, কারণ এর ওপরেই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

—এই কথা বলে বাবা ধীরে-ধীরে উঠে বাইরে চলে গেলেন।... ...

বাবার আজকের কথাগুলো যেন আচম্‌কা প্রহারের মত আমাকে মূর্চ্ছাহত করে' দিলে! নিজের শূন্য জীবনের যাতনা ভুলি-নি বটে, কিন্তু আবার বিবাহের কথা ত কোনদিন ভাবতে পারি-নি,—এ অসম্ভবের সম্ভাবনা ত কোনদিন স্বপ্নেও মনে আসে-নি! বি-ধ-বা বি-বা-হ! আমার অন্তরাত্মা যেন শিউরে উঠল! এক বিবাহের ফলভোগ করছি, আবার বিবাহ! ... ...

বিধবা-বিবাহ!—আমার এ নারী-প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—'এ অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়!'.

... ... স্বামীর মুখ মনে পড়্‌ল। সে মুখেতে সুখস্মৃতির কিছু ছিল না, ভক্তি-শ্রদ্ধার কিছু ছিল না... ... কিন্তু, তবু—তবু, তিনি ত আমার স্বামী—তিনি ... ...

বাবা এ কি বললেন! দেশে এখন প্রায়ই বিধবার বিবাহ হয়—কিন্তু তা কি হওয়া উচিত? একটিমাত্র ফুল কি দুই দেবতাকে উপহার দেওয়া চলে?

ওগো, তোমাদের পুরুষের পৃথিবীতে

নারী কি অসহায়! পুরুষ একলা এই ধরণীতে দিগ্বিজয় করে' আসতে পারে, আর একাকিনী নারী যদি নিজের ঘরের কোণে আপনাতে-আপনি বিলীন হয়ে থাকে, তাহলেও কি সে বাইরের হিংস্র দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না? তাকে রক্ষা করবার জন্যে পুরুষ না হলে চলবে না?

... ... কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে আবার বিবাহ! আমার স্বাধীন হৃদয়কে আবার পরাধীন করতে হবে! কিন্তু আবার যিনি আসবেন, তিনিও যদি রক্ষক না-হয়ে ভক্ষক হন? তখন তাঁর গ্রাস থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?

ভগবান্! জগতে নারীর মত দুর্ব্বল প্রাণী কেন সৃষ্টি করেছ... ... কেন?

বিছানার উপর পড়ে, মুখ গুঁজড়ে আমি কাঁদতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চোখের জল মুছতে গিয়ে দেখি,—দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, করুণ বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে, মোহনবাবু!

এ কী লজ্জা! তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসলুম। মোহনবাবু যেমন নীরবে এসেছিলেন, তেমনি নীরবে চলে গেলেন।

মাগো, তিনি কি মনে করলেন! আরো-কিছুক্ষণ বসে বসে নানান্ কথা ভাবতে লাগলুম। ভাবতে-ভাবতে মাথাটা কেমন ধরে গেল—বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

বাগানের দিকে তাকাতেই আবার দেখলুম, মোহনবাবুকে! তিনি আমায় দেখতে পেলেন না,—আপনমনে মাথা হেঁট করে' ঘাসের উপর পাইচারি করছিলেন।

একটা গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে, মোহনবাবু তার সুমুখে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিলেন। ফুলটি একবার শুঁকে, বিরক্তভাবে সেটিকে আঙ্গুলে থেঁৎলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর দু-একবার পায়চারি করে ঘাসের উপরে কেমন অবসন্নের মত বসে পড়লেন!

ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার মাথা-ধরাটা একটু কমল। আমি ঘরকন্নার কাজ সারতে, সেখান থেকে চলে এলুম।

ঘণ্টাদেড়েক পরে ঘরে আসতেই আবার বাগানের দিকে চোখ গেল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম, মোহনবাবু ঠিক সেইখানটিতে, ঠিক তেমনি চিন্তিত ভাবে বসে রয়েছেন!... ... কেন?

সারাদিন বাবার কথা নিয়ে মনের ভিতরটা তোল্পাড়্ হোতে লাগল। বিবাহ—আবার বিবাহ! কেন জানি না, যতবার বিবাহের কথা ভেবেছি, ততবারই মোহনবাবুকে মনে হয়েছে!... ... এ দুয়ের মধ্যে কিসের সম্পর্ক? এ ভাবনা ক্রমে আমার কাছে দুর্ভাবনা হয়ে উঠল। মনকে আমি বারংবার জোর করে' বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে—এ অসম্ভব, আমার বিবাহ অসম্ভব! কিন্তু মনকে যেই মানা করি, চোখের সামনে অমনি দেখি, মোহনবাবুর মুখ! কেন দেখি, কে আমাকে বলে দেবে?

সন্ধ্যের সময় দেহ আর মন, দুই-ই কেমন নেতিয়ে পড়ল—বুক যেন পুড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ বাবা আমার কপালে হাত দিয়ে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠলেন, "সরো, একি! আমাকে তুই কিছু বলিস-নি? কি আশ্চর্য্য! জ্বরে তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

বারো

## মোহনের কথা

হরেনটা দেখছি, বেজায় কাঠখোট্টা হয়ে উঠল! বলে কিনা, বিয়ে করব না! সেদিন সে তাই নিয়ে এমনি আবোল-তাবোল বক্‌তে সুরু করেছিল যে, আর বরদাস্ত করতে না পেরে শেষটা আমি রেগে চলে এসেছিলুম।

তার পর দিন যখন হরেনের সঙ্গে দেখা হোল, সে নিজেই আবার সেই প্রসঙ্গ তুললে; বললে, "কাল তুমি হঠাৎ রেগে চলে এলে বড় যে!"

আমি বললুম, "কুস্তি লড়ে লড়ে তোমার দেহের সঙ্গে মনটাও পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠছে, নইলে—"

আমাকে বাধা দিয়ে সে বললে, "মোহন, আমার যা বলবার ছিল, তুমি তা না শুনেই কাল চলে এসেছিলে। আসল কথা কি জান, আমি আমার মনে মনে যথার্থ সহধর্ম্মিনীর যে মূর্ত্তি গড়েছি, হিন্দুসমাজে তা দুর্ল্লভ বলেই আমি বিবাহ করতে চাই না।"

—"হরেন, তোমাকে বোঝা ভার! কাল তুমি কঠোর প্রত্নতাত্ত্বিকের মত কথা বলছিলে, আর আজ একেবারে ভোল ফিরিয়ে কবির মত কথা বলতে সুরু করেছ!"

—"মোহন, আরসোলা পাখী হলেও হোতে পারে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়! কিন্তু যাক্ সে কথা! স্থাখ ভাই, শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে অশিক্ষিত রমণীর বিবাহের মত বিসদৃশ ব্যাপার আমি ত আর কল্পনা করতেই পারি না; আমি তাই বিবাহের বিরোধী।"

"—কিন্তু হিন্দুসমাজে খোঁজ করলে তোমার মনের মত বিদুষী রমণী পেতে পার।"

—"বলছি ত তা দুর্ল্লভ। আমাদের সমাজে যে দু-চারজন লোক মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাতে চান, তাঁরাও শিক্ষার আসল অর্থ বোঝেন না। কোনরকমে বর্ণপরিচয় সাঙ্গ করিয়ে মেয়েদের বই পড়াতে শেখানোর নামই লেখাপড়া নয়; এমন অল্পবিদ্যা মূর্খতার চেয়েও শোচনীয়।"

—"আমার ত মনে হয় এদেশী মেয়েদের এ-রকম অজ্ঞতার মূল কারণ হচ্ছে, স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব। দেখবে, যে-সব দেশে রমণীদের উপরে ঘেরাটোপ খাটানো হয় না, সেই-সব দেশের রমণীরাই গেরস্থালীর কাজ-কর্ম্মের সঙ্গেসঙ্গেই বিদুষী আর নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ। ঘরে-বাইরে তাঁদের গতি অবাধ, দশজনের সঙ্গে তাঁদের হামেসাই মেলামেশা করতে হয়; তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে এই স্বাধীনতার উপযোগী জীবন গঠন করেন!"

হরেন খানিকক্ষণ নিরুত্তর হয়ে বসে ঢুলতে লাগলো; তারপর হঠাৎ, অকারণে টেবিলের উপরে চটাং করে' একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল,—"আমাদের দেশে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, তার আসল কারণ এই যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থে আমরা বুঝি, স্ত্রীলোকের পবিত্রতা নষ্ট করা! আমাদের দৃঢ় ধারণা,

ঘরের বাইরে মেয়েরা যদি ঘোমটা খোলেন, অন্য পুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যোগ দ্যান, তাহলেই তাঁদের নির্ম্মল চরিত্র পঙ্কিল হয়ে উঠবে! সূর্য্য যাঁর মুখ দেখতে পায় না, অন্য পুরুষের ছায়াও যিনি মাড়ান না, অত্যাচারী স্বামীর সাত চড়েও যাঁর কথা সরে না—আমাদের বিশ্বাস, তিনিই হচ্ছেন পয়লা নম্বরের সতী! অথচ, সতী বলে যাঁদের আমরা পূজা করি, সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীরা পর্দ্দা খুলে বাইরে আসতে, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইতে ইতস্তত করতেন না! নিন্দুকের মুখবন্ধের জন্যে আমরা যে যখন-তখন ঐ সব বিখ্যাত সতীকে আদর্শ করে' দ্যাখাতে যাই, কিন্তু আমাদের রমণীরা কি ঐ আদর্শ-মত চরিত্র গঠন করবার সুযোগ পায়? আবার, এর মধ্যে মজা এইটুকু যে, এ-সব অপ্রিয় সত্য বলতে গেলেই শাস্ত্রীর দল ঘন ঘন টিকি নেড়ে তোমাকে 'অহিন্দু, ম্লেচ্ছ, পাপিষ্ঠ' বলে পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিতে আসবে! যতদিন এই ভণ্ডের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ানো না হচ্ছে, ততদিন আমাদের মা-বোন-মেয়েরা যথার্থ রমণীত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবেন,—পত্নীকে আমরা ভাবব, স্বামীর সেবাদাসী মাত্র!"

—"বন্ধু হে, তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আঙুরের আশা দুরাশা মাত্র! তোমার মনের মত রমণী-রত্নের খোঁজ করতে গেলে এ জন্মটাই তোমাকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে!"

হরেন কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, "আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের, সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী হচ্ছেন স্ত্রীলোক; অথচ এই স্ত্রী-জাতিতেই জন্ম নিয়ে আমাদের মেয়েরা যদি বেশী লেখাপড়া আর নাচ-গান-বাজনা শেখেন, তাহলে সুধুই যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা নয়; সেই সঙ্গে তাঁরা গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম ছেড়ে দেবেন, স্বামীর অবাধ্য হবেন, সতীত্বের মহিমা খর্ব্ব করে' বসবেন! ওঃ, কি অপূর্ব্ব যুক্তি! অতএব বিয়ে যদি করতে চাও, তবে চোখ থাকতেও কাণা, মুখ থাকতেও বোবা, প্রাণ থাকতেও জীবন্মৃত,—এমন-একটি অন্ধকারের জড়সড় স্ত্রী-জাতীয় জীবকে, চেলীর কাপড়ে মোড়া জীবন্ত পার্শেলের মত ঘরে তুলে আনো! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, তিনি সতী না হয়ে যাবেন না! সতীত্বে আমার শ্রদ্ধা আর কারুর চেয়ে কম না—কিন্তু এ-সব কৃত্রিম সতীর পায়ে দূর থেকেই আমি গড় করছি!"

হরেনের কথা আমারই মনের কথা। তবু, তাকে চটাবার মৎলোবে আমি বল্লুম, "সতীকে কৃত্রিম বলা! ওহে পাষণ্ড, তোমার জীভ যে এখনি খসে পড়বে!"

হরেন তার দুখানা বলিষ্ঠ ও চ্যাটালো হাতে আমার দু-কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "কিন্তু যতদিন জীভ না খস্‌ছে, এই কথাই বলব! মোহন, তুমি কি জাননা যে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকরা যা করে, তা সুধু অন্ধবিশ্বাসের জোরে? একবার কোনরকমে যদি এই অন্ধবিশ্বাস টলানো যায়, তাহলে আর তাদের বাঁচোয়া নেই। কিন্তু, যে রমণী বিদুষী—যিনি বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি বেশ সচেতন থাকে,—এ সচেতনতা

অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে নেই; তাই বিদুষী আর স্বাধীন রমণীর চেয়ে মূর্খ পর্দানশিন স্ত্রীলোকের পক্ষে পতনের ভয় আছে পনেরোআনা। সেইজন্যেই এদের সতীত্বকে আমি বলি কৃত্রিম। হোতে পারে আমি ভ্রান্ত;—কিন্তু আমার এই মত।"

আমি তেমনি কৌতুকভরে বললুম, "হরেন, তুমি কি গায়ের জোরে তোমার এই অদ্ভুত মত প্রতিষ্ঠা করতে চাও?"

আমার মুখের সামনে তার দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে,' হরেন মাথা তুলে ভুরু-কুঁচকে বললে, "আঃ, তা যদি পারতুম মোহন! তাহলে দেখিয়ে দিতুম!"

তর্কের সময় হরেনকে চটিয়ে দিলে, তার মুখের কথা ও হাতের ঘুষি এক-সঙ্গে চলবার সম্ভাবনা আছে; এইজন্যে তার বিপক্ষে তর্ক করা নিরাপদ ছিল না। তাকে আর বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয় বুঝে আমি বললুম, "হরেন, বাতাসের সঙ্গে যুঝে লাভ নেই; নাও, একটা সিগারেট খেয়ে শান্ত হও।"

হরেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে বসে সিগারেটের ধূমপান করতে লাগল। এবং ঘন ঘন কয়েকটা টানে দু-দণ্ডেই সমস্ত সিগারেটটা ভস্ম ও ঘরখানা ধূমপূর্ণ করে সে বললে, "মুরারিবাবুর খবর কি হে মোহন?"

—"ভাল।"

—"ভাখ মোহন, সরমাকে যাতে বিবাহ করতে পার সে-বিষয়ে চেষ্টার ক্রটি কোরো না। সরমার মত রূপে-গুণে নিখুঁত স্ত্রী লাভ হওয়া ভাগ্যের কথা। বুঝেছ?"

এই বলে সে আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

আজ সকালে মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে কী দেখলুম!

সরমা বিছানায় পড়ে বিহ্বলভাবে কাঁদছে!

প্রথমটা সে আমাকে দেখতে পায় নি; আমিও, সে জানতে পারবার আগেই চলে আসব ভেবেছিলুম—কিন্তু তাকে কাঁদতে দেখে আমি যেন কেমন-একরকম হয়ে গেলুম—ঠিক সময়টিতে সরে আসতে পারলুম না। আমাকে সে দেখে ফেললে। দেখেই আমার দিকে সন্ত্রস্ত ভাবে পিছন ফিরে জড়সড় হয়ে বসল। আমিও আর দাঁড়ালুম না।

সরমা কাঁদছে কেন? যেদিন থেকে তাকে দেখেছি—হাস্যময়ী, লীলাময়ী মূর্ত্তিতেই দেখেছি—এমন অশ্রুসজল বিষণ্ণ প্রতিমা রূপে ত কখনো দেখি-নি! ইদানীং তাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গাঢ় হয়ে উঠেছিল, মুরারিবাবু আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন,—সেও আমার সামনে বেরোয়, আমার সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা কয়, আমার গান শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার মনের মধ্যে দুঃখের আগুণ যে এমন তুষানলের মত ধিকি-ধিকি জ্বলছে, সে যে প্রাণের কান্না মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছে, তা ত আমি বুঝতে পারি-নি।

হায়, এ বাঙ্গলাদেশের ঘরে-ঘরে বালিকা বিধবা, তাদের সকলেরই হৃদয় ত এমনি আগুনে-পোড়ানো কটাহের মত তপ্ত! পুরুষ স্বাধীন, তাই নিজের দুর্ভাগ্য সে উচ্চকণ্ঠে সমাজে ঘোষণা করতে পারে; তার এই আন্দোলনের শক্তি আছে বলেই,

আপনার ছোটখাট দুঃখও পুরুষ পুরিয়ে নিতে পারে। আমাদের সমাজে কিন্তু নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত; তাই বুক ফাটলেও তার মুখ ফোটে না—নিজের হতভাগ্যের চাপে সে নিজেই নুয়ে পড়ে, মনের দুঃখ সে মনেই চেপে রাখে! তাই ত আমার মনে হয়, এমন সমাজে শুধু উদার ও নবীন পুরুষ আত্মপ্রকাশ করলেই চলবে না;—সেই সঙ্গে চাই বিদ্রোহী নারীর দলকেও—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধঘোষণা করতে পারবে!

রাত্রিবেলা নীচের ঘরে বসে, এস্রাজে স্বরগ্রাম সাধছি, এমনসময়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আলুথালু বেশে মুরারিবাবু এসে হাজির।

তাঁকে এমন অসময়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে এস্রাজটি নামিয়ে রাখলুম।

মুরারিবাবু বললেন, "বাবা, বড় বিপদ!"

—"বিপদ! কি হয়েছে?"

—"সরোর ভয়ানক জ্বর!"

তখনি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি মুরারিবাবুর বাড়ীতে গেলুম।

পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে সরমা শুয়ে আছে। মুরারিবাবু আলো নিয়ে মেয়ের মাথার কাছে দাঁড়ালেন।

সরমার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে আমি বললুম, "আপনি মুখটা একবার খুলুন ত!"

আমার গলা শুনেই, সেই জ্বরের ঘোরেও সরমা চমকে উঠল!

আমি আবার মুখ খুলতে বললুম।

সরমা সাড়াশব্দ কিছুই দিলে না—মুখও খুললে না। বোধ হয় লজ্জায়।

—"আচ্ছা, মুখ না খোলেন, হাতটা একবার বার করুন দেখি।"

সরমার গায়ের চাদরখানা নড়ে উঠল। মনে হোল, হাত বার করা দূরের কথা, সে যেন তার হাত-দুখানিকে বুকের আরো কাছে গুটিয়ে নিলে!

মুরারিবাবু বললেন, "সরো, মোহনকে লজ্জা কি মা? নে, হাত দ্যাখা!"

কাপড়ের ভিতর থেকে অত্যন্ত জড়সড় ভাবে আস্তে-আস্তে সরমার একখানি শুভ্র হাত বেরুল। সে হাত ছুঁতেই কেন জানিনা, আমার গা-টা যেন কেমন করতে লাগল! সরমার হাতও থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল—জ্বরে কি সঙ্কোচে, বুঝলুম না!

জ্বরের মাত্রাটা বড় বেশী বলে মনে হোল। বাড়ীতে গিয়ে তখনি আমার চেনা এক ভাল ডাক্তারকে 'টেলিফোনে' ডাকলুম।

ডাক্তার এসে সরমাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, "ভয় নেই। সামান্য জ্বর, শীঘ্রই সেরে যাবে।"

ডাক্তারের কাছে সরমা কোনরকম লজ্জা-সঙ্কোচ করলে না—অথচ, আমার কাছে তার মুখ খুলতে, হাত দ্যাখাতে অত আপত্তি কেন?

ডাক্তার ভুল বুঝেছিলেন,—সরমার অসুখ কমল না, বরং বেড়ে উঠল।

মুরারিবাবু ত ঠিক বালকের মত অধীর হয়ে পড়লেন—মুখখানি কাতর করে' থাকেন, কথায়-কথায় কেঁদে ফেলেন। তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া দূরের কথা—রোগীর চেয়ে তাঁকে নিয়েই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লুম।

হরেন যখনি সময় পেত—আসত। সে মুরারিবাবুকে যত বোঝায়, তিনি ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কাঁদো-কাঁদো মুখে সেদিন তিনি বললেন, "হরেনবাবু, জানেন-না, এ যে আমার অনাথা মেয়ে! ওকে নিয়েই বেঁচে আছি—ওর এ কি হোল! সেদিন ওকে বিয়ের কথা বলেছিলুম বলেই বুঝি মা আমার ভেবে-ভেবে এমন কাল-জ্বর ডেকে আনলে! হায় হায়, অমন কাজ কেন মরতে করেছিলুম!"

হরেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমার বুকটা যেন ধড়াস্ করে' উঠল! মুরারিবাবু বিয়ের কথা তোলাতেই দুর্ভাবনায় সরমার জ্বর এসেছে? তবে কি সরমার আর বিবাহে মত নেই?

সরমা এ-ক-দিন জ্বরের ঘোরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে যা তা ভুলও বকছে। জ্বর ক্রমে বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমি আজ তিন রাত ভাল করে' ঘুমোতে পারিনি—দিন-রাত যতক্ষণ শরীর রয়েছে রোগীর বিছানার পাশে ঠায় বসে থেকেছি। মুরারিবাবু ত একরকম কাজের বাইরে বললেই হয়; রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ওষুধ-খাওয়ানো সব আমাকেই করতে হয়েছে। সামান্য যেটুকু সময় আমি থাকতে পারতুম না—হরেন এসে আমার জায়গায় বসত।

নিশুতি রাতে আমি আর মুরারিবাবু রোগীর বিছানার পাশে বসে আছি। একটা টুলের উপর 'রিডিং-ল্যাম্প'টা জ্বলছে। রোগীর গতিক আজ-একটু ভাল। ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে।

আমি বললুম, "মুরারিবাবু, আজ আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

"কি আশ্চর্য্য, সে কি হয় বাবা? বাপ হয়ে আমি ঘুমোব—আর তুমি জেগে থাকবে? তার চেয়ে তুমি বরং ঘুমিয়ে নাও।"

—"বেশ ত, শেষ রাত্রে আমি ঘুমোব অখন, এখন আপনার পালা। আজ আর কোন ভয় নেই—মিছামিছি দুজনেরই জেগে থেকে কি হবে?"

মুরারিবাবু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, "বাবা, আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে, জানি না! সরোর জন্যে তুমি যা করলে, আমার ছেলে থাকলে সেও হয়ত এমন করে' করতে পারত না! স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন দিয়ে তুমি যে আমাকে বড় শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখলে বাবা!"

মুরারিবাবু ত জানেন না, সরমা আমার কে! আমার এই যত্নের মধ্যে তিনি সুধু আমার পরোপকারের প্রবৃত্তি দেখছেন! কিন্তু সুধু পরোপকারের প্রবৃত্তি নিয়ে আমি কি এতটা করতে পারতুম! তা ত নয়! সরমার ভাল-মন্দের সঙ্গে এখন যে আমার অদৃষ্ট এক সূতোয় গাঁথা! আমি যা করছি, এ ত আমার স্বার্থপর প্রাণের টানেই করছি!

কিন্তু এ-সব মনের কথা ত মুখ ফুটে বলবার মত নয়! উল্টে, বাইরের বাঁধা বুলি দিয়ে মনের কথা ঢেকে রাখতে হবে। কাজেই, মুরারিবাবুর জবাবে আমি বললুম, "এসব কথা কেন মুরারিবাবু! মানুষের

আপদে-বিপদে মানুষই সাহায্য করে' থাকে! যান, আপনি এখন ঘুমোন গে যান!"

আরও খানিক ইতস্তত করে' মুরারি-বাবু শেষটা অনিচ্ছাসত্বেও উঠে সেই ঘরেই এককোণে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন।

আমি আলোর কাছে বসে বসে একখানা বই পড়তে লাগলুম।

খানিক পরে ঘড়িতে টং-করে' একটা বাজল। মুখ তুলে দেখি, সরমা বিছানার উপরে উস্‌খুস্‌ করছে।

তার দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ সে ক্ষীণস্বরে বললে, "একটু জল।"

জলের গেলাস নিয়ে তার হাতে দিলুম। সে জল খেয়ে আবার চোখ মুদলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কেমন আছেন?"

আলোটা আমার পিছনে ছিল বলে জল দেবার সময়ে সরমা আমাকে চিনতে পারে-নি। কিন্তু এখন আমার কণ্ঠস্বর শুনে সে সচমকে চোখ চাইলে; তার পর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে ঠিক ভীত হরিণীর মত ত্রস্ত নেত্রে তাকিয়ে রইল—তার সে দৃষ্টি থেকে আমিও আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঢোঁক গিলে সে মৃদুস্বরে বলে উঠল, "আপনি!"

আমি কোন জবাব দিলুম না।

একটু চুপ করে' থেকে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা কোথায়?"

—"তিনি ঐ যে শুয়ে-শুয়ে ঘুমোচ্ছেন—এ ক-দিন দুর্ভাবনায় তাঁর চোখে ত নিদ্রা ছিল না!"

সরমা স্তব্ধ হয়ে চোখ মুদে শুয়ে রইল। দেখলুম জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়াতে তার বুকটি ফুলে-ফুলে উঠছে!

কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কেটে যাবার পর, কি ভেবে সরমা আবার বললে, "মোহনবাবু, আপনি এখনো জেগে আছেন কেন?"

কি করে বলব, কেন জেগে আছি? সরমা কি আজও তা বুঝতে পারে-নি!—আমি তার মুখের পরে চোখ রেখে বললুম, "আপনাকে দ্যাখবার জন্যে কাছে সর্ব্বদাই একজন লোক থাকা দরকার।"

সরমা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, কোন দরকার নেই!"

—"আপনি জানেন না, এ ডাক্তারের হুকুম!"

—"তবে বাবাকে তুলে দিয়ে আপনি বাড়ী যান।"

—"আহা, আজ উনি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছেন, ওঁকে কি জাগানো উচিত?"

—"তবে আমার জন্যে কারুর জেগে থাকবার দরকার নেই। আপনি যান।"

সরমার নীরস স্বর শুনে মনে হোল, আমি এখানে থাকাতে সে যেন খুসী নয়! তবু, তাকে বুঝাবার জন্যে আমি বললুম, "আপনি এখনি অত কথা কইবেন না, তাহলে অসুখ বাড়বে। আপনার অসুখ হয়ে-পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি, আজকের রাতটা কাট্‌লেই আমাকে আর দরকার হবে না।"

তিক্ত স্বরে সে বলে উঠল,—"কে আপনাকে এখানে থাকতে বলছে? আপনি যান না!"

সরমার কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। কেন সে আমাকে তাড়াতে চায়?

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরমা আবার বললে, "আপনি এখনো গেলেন না! যান!"

নিজের শরীরের মায়া ভুলে, দিনের বিশ্রামে রাতের নিদ্রা ভুলে, পৃথিবীর সব কথা ভুলে আমি যে তার এত সেবা করছি, এই কি তার পুরস্কার! আজ সে আমার মুখের উপরে, আমাকে ঘর থেকে দূর করে' দিতে চায়! তার কটু কথায়, অন্যায় ব্যবহারে, আমারও মন অপমানে, অভিমানে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল; কিন্তু আপনাকে সামলে নিয়ে সেখান থেকে আমি তখনি বাইরে বেরিয়ে এলুম। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

# ছিটে-ফোঁটা

"ছবিটা ছবির মত হওয়া উচিত" এই সহজ কথাটি আমাদের বড়ই হেঁয়ালির মত শুনতে ঠেকে এবং এর মীমাংসা হওয়াও বড়ই শক্ত হয়ে ওঠে। আমরা এখন চাই ছবির ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও বিবিধ প্রকারের গভীর গবেষণা। এককথায় আমরা চাই ছবিটি বিবিধ জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার হবে এবং তার ভাণ্ডারী হবেন শিল্পী। কিন্তু এটা জানা উচিত, সুকুমার কলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথি বা যন্ত্র নয়, এটি ঠিক ফুলেরই মত। ফুল যখন ফোটে তখন সে অকারণ পুলকেই ফুটে ওঠে, কিন্তু তার পিছনে অলক্ষিতে যখন ফলের সৃষ্টি হয় তখন সে কোথায় ঝরে পড়ে তার ঠিকানা নেই। আজ র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে আমরা যে বিশ্বমাতার রূপ দেখতে পাই, সেটা র‍্যাফেলের কাছে বিশ্বমাতারূপেই যে প্রকাশ পেয়েছিল তা বলা যায় না। তিনি এঁকে গেছেন একটি মায়ের সাদা-সিধে রূপ, এখন সেই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্বমাতায় পরিণত হয়েচে। শিল্পীরা আঁকবে, গড়বে, সৃষ্টি করবে; তাতে তত্ত্বকথা খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা তাদের জানবার কোনই আবশ্যক নেই! সে ছবিকে ছবির মত করেই আঁকবে, মূর্ত্তিকে মূর্ত্তির মত করেই গড়বে, এবং সেইটেই তার সাধনা।

* *
*

ছবিতে যে ছন্দ (Rhythm) আছে, গাছপালার ভিতর, তাদের খেয়াল-খুসির মধ্যেও সেইটি বর্ত্তমান। প্রকৃতির মধ্যে নানান বস্তুতে যে ছাঁদটা পাওয়া যায় সেইটে থেকে আমরা ছবির ছাঁদের তাৎপর্য্য যে কি, তা বেশ বুঝতে পারি। ধরণীর শোভার মধ্যে এইরকম ছাঁদ না থাকলে যেমন সেটা সুশোভন হতোনা, তেমনি চিত্রশিল্পে

এই ছন্দটি না বজায় রাখলে ছন্দহীন কবিতার মতই তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। শিল্পী প্রকৃতির এই লীলায়িত ছন্দ থেকে তার ছবির জমিতে ( back ground ) সুন্দর সুন্দর ছাঁদের আদরা ( Sketch ) আঁকা শিখতে পারেন। শিল্পীর পক্ষে তাই আঁকতে জানার চেয়ে দেখতে জানার প্রয়োজন অনেক বেশী।

* *
*

চিকিৎসকের অস্ত্রচালনার দ্বারা রোগীর রোগ-নিরাকরণের যে আনন্দ, যোদ্ধার অসি-আস্ফালনের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভের যে আহ্লাদ, শিল্পীর তুলির টানের ভিতরও সেই একই খুসি বর্ত্তমান; কেবল তাতে পূর্ব্বোক্তগুলির মত কোন ফললাভের আশা থাকেনা—সেটা ছেলের মায়ের প্রতি এবং মায়ের ছেলের প্রতি প্রীতির মতই আপনা-আপনি জন্মলাভ করে। আসলে শিল্পীর কথা হওয়া উচিত "মা ফলেষু কদাচন।"

* *
*

ভারতের আদিম অধিবাসী কোলেদের মধ্যে মালার নামে একটা জাত আছে, তারা পিতল-কাঁসার কাজ করে। তাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, তারা গোড়ায় কোলেদের স্বজাতি ছিল। বহুকালপূর্ব্বে কোন-একটি কোল-পরিবারে চার ভাই বাস করত। চাষবাস করেই তাদের দিন কাটত। এথন, একদিন তারা চার ভাই ক্ষেতে হাল দিচ্ছে, এমনসময় ছোট ভাইটি হঠাৎ লাঙ্গল ছেড়ে সেইখানেই মাটিতে বসে পড়ল আর তার খানিক পরেই ক্ষেতের চষা নরম মাটি দিয়ে একটা ছাঁচ তৈরি করে ফেললে। তাতে তার অন্য তিন ভাই ভারি চটে গেল। তারা তাকে "কুঁড়ে" "নিষ্কর্ম্মা" প্রভৃতি বলে অজস্র গালিবর্ষণ করতে লাগল। সে কিন্তু কোন কথা কানে না নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। শেষে তিন ভাই পরামর্শ করলে, ছোট ভাইকে তারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। তারা লাঙ্গল দেওয়া শেষ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলে, তাদের ছোট ভাই যে মাটির ছাঁচ তৈরি করেছিল, তাতে পিতল গালিয়ে ঢালাই করে একটা চমৎকার 'পয়লা' ( ধান মাপবার পাত্র ) তৈরি করেচে। তারা পয়লাটার চমৎকার কারুকার্য্য দেখে এত খুসি হয়ে গেল যে, তারা তখন ছোট ভাইটিকে উৎসাহ দিয়ে বল্লে, "আজ থেকে তুই বসে বসে এই নতুন কাজই করবি আর আমরা চাষবাস করে তোকে খাওয়াব।' প্রবাদ এই, সেই ছোট ভায়ের বংশধরেরাই 'মালার' অর্থাৎ কোলেদের কাঁসারী নামে খ্যাত। অসভ্য কোলেদের মধ্যে এই সুক্ষ্মশিল্পের আবির্ভাব ও সম্মানের গল্পটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষের কাছে ললিতকলা খুব-একটা আদরের বস্তু; কেননা সেটা তাদের মনের খাদ্য যোগায়। মনের খাদ্যের জন্যে লালায়িত হয় মানুষেই; আর দেহের খাদ্যের জন্যে ব্যাকুল, পশুতে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

# বিচার-বিবেচনা

ভগবান সকলেরি বটে, তবে তিনি আবার প্রত্যেকেরি! প্রত্যেক সুতাটির উপর দৃষ্টি না দিলে, তাকে অখণ্ড না রাখলে—কিম্বা ছিঁড়ে গেলে গিঁট না দিলে, কাপড় যেমন সমগ্র হয় না, যে কাপড় বোনে সে যেমন প্রত্যেক সুতাটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে সমস্ত কাপড়খানি সম্পূর্ণ করে-তোলে, ঈশ্বরকেও প্রতিটি মানবজীবনের সম্বন্ধে তাই করতে হয়। তিনি আমাকেও গড়েছেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোনো বোঝাপড়া নেই যে, আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে, টুকরো-টুকরো করে, দলে পিষে তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ডেরি উপকার করবেন। আমার মন, আমার স্নেহবৃত্তি, আমার আত্মার একান্ত আকাঙ্খা, অতৃপ্তি যা-কিছু, তিনিই আমার মধ্যে দিয়েছেন, তার সবই ব্যর্থ করে দেবেন? মানুষের জীবনে যদি অকারণ দুঃখই দেখা যায়, অদ্ভুত ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সে যদি কেবলি বিধ্বস্ত হতেই থাকে, অথচ সবই বাহির হতে আসে—তার চেষ্টার সুদূরে গড়ে ওঠে—তাহলে কেমন করে স্বীকার করি বিশ্ব-ব্যাপার করুণার সৃষ্টি, ন্যায়ের পরিচালনা? তাহলে যে পা রাখবার ঠাঁই কোথাও পাওয়া যায়না, ঘুর্ণি হাওয়ায় ঘুরে মরতে হয়। যেমন দিনরাত্রি হাত-ধরাধরি করে আসে, দুঃখ সান্ত্বনা, বিপদ আর আশ্বাস, অসহ্য উত্তাপের পর বর্ষা, নিরন্তর বর্ষণের পর নিরাময় প্রসন্ন আকাশকে আসতেই হয়। দুর্দ্দিনের অবসানে আলো আসতেই হবে। এই ন্যায়ের তুলাদণ্ড দুলছে—কাঁটায়-কাঁটায় মাপ ঠিক হচ্ছে না, একে ঠিক হতেই হবে। বিশ্ববিধাতা আপন সত্যে আপনি বাঁধা। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে মাপকাঠি রেখে দিয়েছেন, হিসাব ঠিক করে তাঁকে দিতেই হবে—তবে ত মন মেনে নেবে!

* *
*

মনে যখন কোনো ভার থাকে না, আশা ও আলোর আশ্বাস জীবনের চারিদিকে, তখন একদিন দুদিন কেন, মাস বৎসরও দীর্ঘ সময় মনে হয় না। কিন্তু জীবন যখন দুঃখভারগ্রস্ত, প্রতিমুহূর্ত্তই অনিশ্চিত, সমস্তই অন্ধকার, প্রতিপদক্ষেপে যখন হাতড়ে চলতে হয় তখন একটি দিনও কত ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয়। মনের মধ্যে দীর্ঘতার ভার ক্রমে বিপুল হয়ে ওঠে, সম্মুখে আর কিছু থাকে না! ফাঁসীর আসামী যেমন অবশিষ্ট দিন-কয়টা কোনো রকমে কাটায়, তেম্নি আর কি! প্রভেদ এই যে, সে নিশ্চিত জানে, তার শেষ কবে!

* *
*

জীবনে সত্যের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়ানো বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যি, সুখ দুঃখ স্নেহ

বড় তীব্র, বড়ই তীক্ষ্ণ,—একেবারে মর্ম্মন্তুদ! শেল বিঁধেই আছে, বেদনায় সমস্ত জীবন জর্জ্জর হয়ে যাচ্ছে, তবু এ শেল তুলে নেবার কেউ নেই, এ ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দেবার মত ঔষধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে পরমধনের জন্যে দেহমনের প্রত্যেক অণু-পরমাণু ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে, তাঁকে পেতে হবে, নয় ত মরতে হবে! প্রথমটি পরমানন্দ, তা যদি ঘটে তবে জীবনে সমস্ত দুঃখের পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে উপরি পাওয়া যায়; আর তা যদি না হয় তবে মৃত্যু ত পরামুক্তি—সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়, দিনের পর দিন এই দুর্ব্বহ ভার, অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে বন্ধুর পথে হাতড়ে, হুঁচট খেয়ে চল্‌তে হয় না। তবে ত বিরাম, শান্তি, সুষুপ্তি।

* *
*

কারো-কারো মনের মধ্যেকার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির কি গোল থাকে, কাছের সম্মুখের জিনিষ, বাক্য ও সঙ্গীত কেমন যেন ডিঙিয়ে চলে যায়। এ তার ইচ্ছাধীন নয়, হয়ে পড়ে! কিছুতেই মনের শান্তি অর্জ্জন করিতে পারে না, কেবলি বোধ করে কি-একটা ত্রুটি রয়েই গেল! তাই তাদের ভুলও খুব বড়, ভাল ও অত্যন্ত বেশী। ঠিক্ যত টুকু আর যেমনটি হলে সব বেশ সামঞ্জস্য করে নেওয়া যায়, তেমনটি তার কিছুতেই মনে ধরে না। একেবারে চরম চরমপন্থী! তাই কেবলি কষ্ট পায়, প্রতিকার করতে পারে না। যে প্রদীপটি জ্বাললেই সব অন্ধকার ঘোচে, সে অপূর্ব্ব দীপ জ্বালা আর হয়ই না। তেল জোটে ত বর্ত্তি নাই; বর্ত্তি জুটল, তবে যে দীপ-শলাকা দিয়ে তাকে উদ্‌বুদ্ধ করবে, বুকের আঁচলে ঘিরে নিয়ে পথ চলবে, সেই আলো খুঁজেই পাচ্ছে না, পাওয়াই দুর্ঘট! পাওয়া যে দৈবাধীন! দেওয়া মানুষ নিজের সম্বল হ'তেই দিতে পারে।

তবে জীবনে দৈবই কি বলবত্তর? যার উপর কোনোই হাত নাই, সেইখান হতেই কি নির্ম্মম আঘাত, অসহ্য বজ্রবেদনা এসে উপস্থিত হয়? সেদিনে যে-কথাটি শুনেছিলাম সেটি খুব ঠিক্! ঈশ্বর, নির্ব্বোধ মায়ের মত, ছেলেকে শুধু সুখই যোগান্ না, কেবলি আমোদে রাখবার জন্যেই ব্যস্ত ন'ন! মঙ্গলময় বলেই তিনি অত্যন্ত কঠোর, তাঁর দয়া যেমন অপার, তাঁর শাসনও তেমনি অমোঘ! তবে ঐটুকু বোঝা কঠিন হয় যে মানুষের দুর্ব্বল শক্তির পক্ষে এমন দুরূহ প্রলোভনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে তার পর যদি সে ভুলই করে, তখন তাকে এমনতর যন্ত্রণা কেন দেওয়া হয়? সেই প্রলোভনই বড় ভয়ানক, যখন মন ঠিক কিছুই বুঝতে পারে না, যখন সরল পথ যে কোথায় তা মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় না। দুঃখ দেখে তা দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যা করে বসে, তা শুধু ভ্রান্তি! তার ফলে অধিকতর দুঃখই যখন হয়, তখন সে অবাক হয়ে ভাবে, এ কি হল? কেবলি অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হতে থাকে, প্রতিকার আর তার শক্তিসামর্থ্যের মধ্যে থাকে না। যত ভাবা যায়, ততই মনে হয় দ্বিধা, দুর্ব্বলতাই মানুষের সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। যে-মানুষ

প্রবল নির্ভীকভাবে ভাল হক্ মন্দ হক্, যা তার প্রাণ চায়, তাই করে, তার যেন গতিমুক্তি আছে, সে আপনার চারিদিকের জাল ছিন্ন করে, সম্মুখের পথে চল্‌তে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্য কেবলি দ্বিধায় আন্দোলিত, শুধুই যাব-কি-যাবনা ভাবনায় এক পা অগ্রসর হতে পারে না, সে নিজের গতি করতে অক্ষম, অপরের উন্নতির বাধা। 'বেঁধে মারলে সয়' বলে একটা কথা আছে। সেটা ঠিক নয়;—সয়না। ব্যথা বরং বেশীই হয়। তবু যার বাঁধনটুকু খোলবার উদ্যম পর্য্যন্ত নেই, তার পক্ষে ব্যথার বিধানই চরম বিধান! যে পড়ে-পড়ে লাথি-গুঁতোই খাবে আর বলবে—ভগবানের ইচ্ছা, ভগবান তার সহায় হন না। যে উঠে দাঁড়াবার জন্যে, উঠে বসে; তাকেই তিনি আপন হাত বাড়িয়ে দেন। মনোবৃত্তি যার সজাগ, যে খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু গোধূলির আলো-ছায়ার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরে না, সেই সৌভাগ্যবান। কারো-কারো মনশ্চক্ষু বোধ হয় অস্বাভাবিক,—কতক খুব ভাল দেখতে পায়, আবার কতক কিছুই দেখে না। দূরের অনেক জিনিস খুব পরিষ্কারই দেখে আর ঠিক্ যেটি হাতের কাছে আছে, তাই হাতড়ে মরে।

* *
*

ভেবে দেখলে এই কথাই ঠিক মনে হয়, এ পৃথিবী, Survival of the fittest—যোগ্যতমের স্থায়ীত্বের নিয়মেই চল্‌ছে। প্রবলের প্রাধান্যই স্বধর্ম্ম। সুস্থশরীর দীর্ঘ-জীবী, সুস্থমন কর্ম্মক্ষম,—আত্মরক্ষায় সমর্থ। উভয়েই প্রাণসার, ক্ষয়হানির সম্ভাবনা কম। যার এ দুয়েরি অসদ্ভাব, সে যে মৃত্যুক্ষতিগ্রস্ত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

* *
*

অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ। ছোট ছেলে জানে না, আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায়। সে সুন্দর নির্ম্মল উজ্জ্বল বহ্নিশিখার আন্দোলিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখে আনন্দে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া আর-কিছুই সে তার হাতের মধ্যে পায় না! মারীচ, সোনার মায়াহরিণ, সীতার চিরদুঃখের সূচনা করেছিল—মায়া-মৃগের চাতুরীতে প্রিয়কণ্ঠস্বরের ব্যাকুল আহ্বানভ্রমে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণীও সুদীর্ঘ বিচ্ছেদদুঃখের আয়ত্বাধীন হয়েছিলেন।

* *
*

পাপ পুণ্য কি? আমার মনে হয় অপরকে দুঃখ-দেওয়াই পাপ! যা আমরা জেনে-শুনে করি, ইচ্ছে-করে ফন্দি-করে অপরের মন্দ হবে জেনেও করি, সেইটে বেশী অন্যায়! মানুষ দ্বিধায় পড়ে যেটা করে,—কতকটা না বোঝবার দরুন, কতকটা অহঙ্কারবশতঃ ভ্রান্ত হয়ে,—তার শাস্তিও হওয়া দরকার, কিন্তু সে শাস্তি যেন একেবারে প্রাণ-মারা বিধান না হ'য়ে বসে!

ভুল কি,—না অনিয়ম! তাহলেই কেমন কষ্ট পেতে হয়, গতির বাধা ঘটে, স্থিতির স্থানচ্যুতি হয়, তাই দুঃখও এসে পড়ে। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে বাঁচিয়ে চলবে এই হচ্ছে আসল কথা। কেমন-করে এই

বাঁচানো ব্যাপার হতে পারে সেইটে বোঝা কঠিন। "চাচা আপন বাঁচা" করলেই কি সব কর্ত্তব্য পালন করা হয়? আঁচড়টি লাগলনা, দিব্যি আরামে গায়ে ফুঁ দিয়ে চল্‌লাম, তবেই কি সব ভাল হল? ইংরাজীতে যাকে goody goody বলে তাই কি জীবনের আদর্শ? মানুষ এম্নিভাবে চারিদিক দিয়ে দশের সঙ্গে জড়িত যে একের মাথায় যে আঘাতটা পড়ে, সেটা অপরকেও বাজে। নিজেকে বাঁচাতে হলে অপরের জীবনে অনধিকার চর্চ্চা করা সঙ্গত নয়। নিজের দাবী-দাওয়া যদি গণ্ডী পেরিয়ে না যায় তবেই অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সাম্যরক্ষাই জীবনের মূলসূত্র। কিন্তু এটাও তো দেখতে পাই বিষমতাই অনেক স্থলে, মুক্তির, স্বাধীনতার সহায়। লোকে বলে golden mean—কিন্তু মধ্যপথ কতকগুলি বিষয়ের একেবারেই নেই। সত্যের সঙ্গে সর্ত্তকরা চলেনা, আর মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সত্যকে একেবারে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে হয়,—রাজপুত-রমণীরা যেমন করে জহরব্রত পালন কর্ত্তেন। আর মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করলে গতি কোথায়? খাঁটি কে খোঁজে? রংচঙে মিথ্যা বড় চমৎকার, তাকে কতরকমে পাওয়া যায়,—একেবারে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু! কিন্তু যার এ মোহ কেটে গিয়েছে, পরিষ্কার আলোতে যে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছে, জীবন কি, তার পক্ষে এমন অবাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যে অসম্ভব! যা অসম্ভব তা সম্ভব হয় না এই মস্ত ভরসা! গতি মুক্তি হতেই হয়। মনের সম্মুখ হতে এক ছাড়া সবই মুছে যায়। সেই এককে, সত্যকে বরণ করতে হয়, তার জন্যে দুঃখকে গ্রহণ করতে হয়, তবেই জীবনের কোনো সাফল্য যদি আসে। তখন দ্বিধা, দো-মনা করার সময় থাকে না। ভগবান শুধু দুঃখই দেন, সে দুঃখও নিষ্ফল—এ কখনো হয় না। জীবনের সন্ধিক্ষণের রহস্য নিরাকরণ হয়। দৃষ্টি আসে, শ্রবণ-শক্তি প্রখর হয়, লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আদেশ পরিষ্কার শোনা যায়, জীবনের গতি আর কিছুতেই স্থগিত হয়ে থাকে না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

# শেমুষী

## ( গল্প )

সেদিন মান্‌থ্‌লি টিকিট রিনিউ করবার দিন; তার উপর সাগরযাত্রীর ভিড়; ষ্টীমার ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব দেখে ব্রীজের ধারে ফুট পাতের উপরে যেখানে অনেকগুলো নাগা সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে সেইখানে অশথগাছের তলায় আমি একটু দাঁড়িয়েছি এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে

অবিন টিকিট কিনে হন্‌-হন্‌ করে আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে—"ওহে শেমুষী দেখবে তো এসো।"

লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফার্ষ্ট ক্লাসে রোজ অবিন যেখানটায় বসে সেইখানে একটা লোক;—চেহারাটা বেশ গম্ভীর, পরণে লুঙ্গী, গায়ে বেরালের লোমের একটা আলখাল্লা। আর তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি—তেমন টুপি আমি কখনো দেখিনি—কতকটা টোপর, কতক পাগড়ী, কতকটা যেন বিলিতী ষ্ট্র-হ্যাট!

ষ্টীমারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে সোজা এগিয়ে চল্লো। আমি দেখলেম অবিনের দুই চোখের মাঝখানে একটা ভ্রূ-কুটি বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেল। অবিন যেখানটিতে বসে লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে! তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ঐ অংশটুকু থেকে অবিনকে বেদখল করেছে এমন লোক—কি সাদা, কি কালো—আমি তো দেখিনি। লোকটার কপালে কি আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি এমন সময় অবিন দেখি "ইয়েঃ সম্‌স্‌"—বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাজিয়ে অতি ভালোমানুষের মতো আমার পাশে পিছনের বেঞ্চিতে এসে বস্‌লো! লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইলে না; সে কেবল নিজের বাঁ-হাতখানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার তুলিয়ে গট্‌ হয়ে বসে রইল। ঝুঁটি-কাটা ময়ূরের মতো অবিনকে একেবারে মুহ্যমান দেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। অবিনকে এ-রকম করে দমিয়ে দিতে পারে এমন লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বল্লুম—"ওহে এই ভাগীরথীতীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ কচ্ছিলে, আজ আবার এ কোন্‌ ভাসুরক এসে উপস্থিত হল হে?" অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ইঙ্গিতে আমায় চুপ করতে বলে চোখ বুজে চুরুট টানতে লাগ্‌ল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে বালির চড়ার উপরে গোটা-কতক নৌকা কাত হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের ক্ষেত; তার পিছনে একটা কলের চিম্‌নি থেকে একটু-একটু ধোঁয়া উঠ্‌ছে; একটি শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে আস্তে জলের দিকে নাম্‌ছে।

নদীনীর বালুতীর দুপুরের আলোয় মিলে আমাদের চারিদিকে যখন একটা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজখানা কুটীঘাট থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে ওপারের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে ঠিক সেই সময় অবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—"ওহে সে লোকটা গেল কোথায়?"

সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি সেই প্রথম-শ্রেণীর বেঞ্চখানা একেবারে খালি—সেই অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায়নি; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম জনমানব নেই, গ্রামের পথ ঘাট-পেরিয়ে সোজা দেখা যাচ্ছে—সেখানে একটা মড়াখেগো কুকুর রাস্তার

মাঝখানে ধূলোর উপরে মুখ-গুঁজ্‌ড়ে শুয়ে রয়েছে—আর অন্য পথিক কাউকে দেখা গেল না। অবিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের এধার থেকে ওধার, নীচের তলার কামরা মায় ইঞ্জিন ঘরটা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে, সারেং থেকে সুকনী খালাসী এবং সকল যাত্রীদের একে একে সেই লোকটার হুবহু বর্ণনা দিয়ে জেরা করে দেখলেন সে-লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও কেউ দেখেনি, বসে থাকতেও কেউ দেখেনি, এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ দেখেছে কিনা তাও জানা গেল না। আমরা দুজনে গিয়ে সেই সাম্‌নের বেঞ্চিখানা এবং তার চারিদিকটা এমন-করে সন্ধান কল্লুম যে সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার যদি একগাছিও লোম সেখানে থাকতো তবে সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়তোই পড়তো। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা এলো, বস্‌লো এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর কোনোখানে একটু আঁচড়ও পড়ল না! কোনো কোনো দিন ঘন কুয়াসার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ একখানা নৌকা তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রসারসি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াসার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল,—এ লোকটা ঠিক যেন তেমনি করে আমাদের দেখা দিলে! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল। প্রথম-শ্রেণীতে অবিনের সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমায় ভালো লাগলো না; আমি তৃতীয়-শ্রেণীতে যেখানে ইঞ্জিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলো চিনেম্যান তাদের ফ্যাকাসে মুখগুলো তাতিয়ে নিচ্ছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

"শেমুষী" বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবিন কিন্তু আজ তার নিজের সিংহাসনে বসতে বড় উৎসাহ প্রকাশ কল্লে না। সে বেঞ্চিখানার পিঠে হাত রেখে চুপকরে দাঁড়িয়ে, থেকে-থেকে খানিক চুরুট টেনে-টেনে দোতালায়—যেখানে সারেংসাহেব চাকা ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটা দেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে—মই বেয়ে সেখানে উঠে গেল। সাধারণ যাত্রীর দোতালায় যাবার হুকুম নেই, আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু অবিনের গতিবিধি সর্ব্বত্র। সে দোতালার উপর থেকে দিব্যি আমাদের নাকের উপর দুই পা ঝুলিয়ে সারেংসাহেবের হুঁকোর মজলিস জম্‌কে তুল্লে। সারা পথটা তার আর কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি ষ্টীমার তখন আহিরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন সময় অবিন নেমে এসে বল্লে—"ওহে কাল আবার আসছো তো?"

আমি বল্লুম—"আসছি, কিন্তু এ জাহাজখানার দিকেও আসছি নে!" ঘাটে নেমে জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম 'প্রতিভা'।

তার পরদিন থেকে বড়বাজারের ঘাটে 'প্রতিভা'টি বাদ দিয়ে এ-লাইনের আর যতনামের যত জাহাজ সব কখানাতে চড়ে বেড়াই কিন্তু অবিনকে আর দেখতে পাই নে! সে যে কখন কোন্ জাহাজ ধরে যাতায়াত করে তার আর সন্ধান পাই নে। দূরবীন লাগিয়ে দেখেছি 'প্রতিভা'র ডেকে তার জায়গা শূন্য পড়ে আছে! লোকটা গেল কোথা? শেমুষীর মতো তাকেও

গা-ঢাকা হতে দেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাদের আহিরীটোলার ঘাটে নেমে জেটি পেরিয়ে অবিনদের বাড়ির দিকে চলেছি এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হন্-হন্ করে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে চলেছে; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ। তখন সন্ধ্যা ৭টা হয়ে গেছে। বড়বাজার থেকে শেষ-ষ্টীমার রাতের অন্ধকারে ভেঁপুর শব্দ এবং সার্চ লাইটের আলোর শুঁড় দোলাতে দোলাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে আস্তে জেটির গায়ে এসে থাম্‌লো। অবিনকে এতরাত্রে জাহাজে উঠতে দেখে আমার ভারি-একটা কৌতুহল হল। আমি তার অসাক্ষাতে ষ্টীমারে উঠে থার্ড ক্লাসের একটা খালি বেঞ্চে শালমুড়ি দিয়ে বসলুম। আমি অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটি মাত্র সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির আড়ালে চুপ করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে সন্তর্পণে চলেছে। তীরের আলো-গুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক-একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বল্লে—"ওহে ইয়ার, শেমুষীর অত কাছে বসা নিরাপদ নয়; এদিকে চলে এস।"

অবিনের চোখ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বল্লুম—"এখানে আবার শেমুষী কোথায় পেলে?" অবিন একবার ঝুড়ি-কোলে যে মানুষটা, তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে সুরু কল্লে—"শেমুষী কি একরকম? তারা নানাবেশে জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।—অভিধানে শেমুষী অর্থে দেখবে বুদ্ধি।" আমি বল্লুম—"বুদ্ধিমন্ত জীবমাত্রেই যদি শেমুষী হয় তবে তুমি-আমিও তো শেমুষী!" অবিন বল্লে—"না ওই বুদ্ধির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেমুষী। যেমন তোমার ঠগী তেমনি শেমুষীর একটা দল এখনো আছে। আমরা যেমন কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোই, এদেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে হয় শেমুষী। আজন্ম-শেমুষীও দুচারজন আছে। তারা কেমন জানো? হতভাগা লক্ষ্মীমন্ত, ধার্ম্মিক ও পাজি, ভদ্র অভদ্র, মহাত্মা এবং দুরাত্মা, সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, পাজি ছুঁচো, মহাশয় দুরাশয়, পণ্ডিত ও গোমূর্খ, সমালোচক ও গোবদ্দি, বুজরুগ ও বেচারা একত্র মেশালে যা হয় তাই। এরা স্মরণমাত্রে যেখানে খুসি যেতে পারে, যা খুসি তাই করতে পারে;—ঘটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মায় তোমার লোহার সিন্ধুকের ক্যাসবাক্স পর্য্যন্ত সরানো! হোসেন খাঁর যত বুজরুকী সব এঁদের জানা আছে। এঁরা ইচ্ছে করলে অফুরন্ত তূণ, অক্ষয় কবচ, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, বিশল্যকরণীর মলম—এমন-কি ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তোমার মুঠোয় এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অপ্সরী এঁদের দাসী; দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, তার ভূতগুলো ইয়ার। মনে কল্লে একরাত্রের জন্যে এঁরা তোমাকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে, কালীফের বোগদাদে, এমন-কি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গায়ে একটু ঘাম দেবে না। এমনি এক-

জন শেমুষীকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু আজ যে ঐ ঝুড়ি নিয়ে ওধারে ভালোমানুষটি বসে আছে দেখছো, ওঁকে চিনেছ ?"

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা। অবিন আমার কানে-কানে বল্লে—"উনিই সেই দিনের শেমুষী ; ওঁরই পাল্লায় একবার পড়ে একটা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি ! আবার উনি যে কার সর্ব্বনাশ করতে কিম্বা কার-বা কি ভালো করতে এখানে এসেছেন তাই ভাবছি।"

লোকটার চেহারায় কোনো-রকম শেমুষীত্ব ছিল না। আমি অবিনকে বল্লুম—"নির্ভয়ে তোমার শেমুষীর ইতিহাস বলে যাও, ও-লোকটা এখনি নেমে যাবে।"

অবিন আমার দিকে একটু ঝুঁকে বল্লে—"দেখবে তবে ?" বলেই অবিন তার বুকের পকেট থেকে একটা বনমানুষের হাড়ের বাঁশী বার করে বল্লে—"এই হল শেমুষীদের বুকের হাড়ের বাঁশী। গান এবং এই বাঁশীর সুর এই দুই হচ্ছে শেমুষী তাড়াবার এক মাত্র ওস্তাদ। তুমি গান ধর আমি বাজাই।"

হাড়ের মধ্যে থেকে যে অমন সুর বার হয় তা আমার ধারণা হয়-নি এবং অবিনও যে এমন বাঁশী বাজায় তা আমি আগে জানতেম না। সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে অমনি মনে হল যেন রাত্রির নীল পর্দ্দা খুলে দলে-দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ঐ সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে। আর মনে হল রাত্রির রং ক্রমে যেন পাতলা হয়ে আসছে। তখন শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারে একটা চিতার আগুন ধূধূ জলছে। সেই লোকটা ঝুড়ি-মাথায় জেটিতে নেমে দাঁড়াল। আমি দেখলেম সেটা ঝুড়ি নয়, সেটা তার সেই টুপিটা। অবিন বল্লে—"দেখলে ?" দেখতে আমার ভুল হয়-নি কিন্তু শেমুষীর সঙ্গে তার কি লড়াই বেধেছিল যখন তাকে প্রশ্ন কল্লুম সে বল্লে—"ভুলে গেছি, মনে নেই।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# স্বরলিপি

সা সা II সা সা সা। রা রা জ্ঞা I রজ্ঞা পমা জ্ঞা। রা সা । ॥ সা র্সা র্সা।
তু মি ডা ক দি য়ে ছ ০ কো ন্ স কা লে ০ কে উ তা

ণধা পা ধা I না । । । । ধা পা I মা মা জ্ঞা। রা সা রা I রজ্ঞা পমাজ্ঞা।
জা ০ নে না ০ ০ ০ তু মি ডা ক্ দি য়ে ছ ০ কো ন্ স

র
রা সা । I । । । । গা গা গা I গা গা গা । গা গ । I সা গা । ।
কা লে ০ ০ ০ ০ ০ আ মার ম ন্ যে কাঁ দে ০ আ পন ০

গা মা গ I গমা পমা গা । মা । । I রা মা জ্ঞরা । সা ন্ ন্ I
ম ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ কে উ তা মা ০ নে

মা । । । । । । II
না ০ ০ ০ ০ ০

II {পা পমা পা । মা জ্ঞা মা I পা না না । র্সা র্সা । I না র্সা জ্ঞা ।
ফি রি ০ আ মি ০ উ দা স্ প্রা ণে ০ তা কা ই

[ । ]
র্রা র্সা র্সা I সর্রা র্সা না । না র্সা ( নর্সা ) } I ণর্সা ণা ণা । ধা পা
স বা র মু খে র পা নে ০ তো মা র ম ত

ধ গ
। I পা পধা । ণর্সা র্সা ণা ণা I পা ধা পা । মা গা গা I মা । । ।
০ এ ম ০ ন্ টা নে কে উ ত টা ০ নে না ০ ০

। । জ্ঞরা সনা II
০ ০ তু মি

II । । ন্ । সা রা জ্ঞা I রা মা জ্ঞা । রা সা ঋা I । । গা ।
০ ০ বে জে ও ঠে প ন্ চ মে স্ব ০ ০ র কেঁ

প
গা গা গা I সা গা মা । গা মা মা I রা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা জ্ঞা I
পে ও ঠে ব ন্ ধ এ ঘ র বা হি র হ তে ০

রা রজ্ঞা মজ্ঞা । রা সা রা I রাপা মা । রজ্ঞা রমা জ্ঞরা I
ছু য়া ০ রে ক র কেউ ত হা ০ নে

সা । । । । । । II
না ০ ০ ০ ০ ০

[ নর্সা না ]
II { (পা পমা) পা । মা জ্ঞা মা I পা না । । না র্সা । I না র্সা জ্ঞা ।
আ কা ০ শে কা র ব্যা কু ০ ল তা ০ বা তা স

র্ ন্ স্
র্রা র্সা । I র্সা না না । না র্সা র্সা } I র্সা না । । ধা পা পা I
ব হে ০ কা র বা র তা এ প ০ থে সে ই

পা পধা ণর্সা। র্সা ণা ধা I পা ধা পা। মগা রা গা I মা া া।
গো প ০ ন্ ক থা কে উ ত আ ০ নে না ০ ০

া জ্ঞরা সন্া II II
০ "তু মি"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# অলৌকিক

আদিম মানব যখন বিরাট বিশ্বের দিকে প্রথম চাহিয়া দেখিয়াছিল, তখন সে তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া শিশুর মতই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্র, স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন,—সকলই তাহার কাছে দুর্জ্জেয় রহস্যে জড়িত হইয়া দেখা দিয়াছিল। বিশ্বের এই বিচিত্র রহস্য বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ অসম্ভব কল্পনা করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল। বিবিধ অদ্ভুত দিব্যলোক, আশ্চর্য্য শক্তিশালী প্রাণীসমূহ, অগণ্য বহুরূপী দেব-দেবতা,—এই সকল দিয়া মানুষ তখন স্বতন্ত্র এক মানস-জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

পরে যতই মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই সে কল্পনা ছাড়িয়া সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুক্তি, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্ব-রহস্যকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাধনায় সিদ্ধিও কিয়ৎ-পরিমাণে মিলিল,—মানুষ বিশ্বের রহস্য-যবনিকা দুই-এক জায়গায় একটু-আধটু ফাঁক করিয়া ফেলিল; আশে-পাশে প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডারের দুই-একটা রত্নও কুড়াইয়া পাইল। ফলে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্রই মানুষ তাহার বিজয়-পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সে যতই চেষ্টা করুক, এই জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে মানুষের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আর বিশ্বের মধ্যে মানুষের বিজয়-যাত্রা এই সীমার গণ্ডিতে পদে পদে থামিয়া যাইতেছে। এই অনন্ত-অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কত-টুকুই বা মানুষের স্থান, আর কত সামান্য কত তুচ্ছ তাহার শক্তি, মানুষ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সেটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। একটা রহস্য-যবনিকা উঠিতেছে তো দ্রৌপদীর বসনের ন্যায় সহস্র সহস্র রহস্য-যবনিকা তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিতেছে; একটা সমস্যার মীমাংসা হইতেছে তো, তাহার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নব সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপে মানুষের জ্ঞান যতই প্রকৃতিকে জিতিতে চাহিতেছে, প্রকৃতি ততই দৈত্য-

লোকের মায়া-তুরঙ্গের মতো আরও দূরে সরিয়া পলাইতেছে।

জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে একটা সীমা-রেখা টানা থাকিলেও মানুষের আর একটা দিক আছে, যাহার সীমা নাই। সেটা হইতেছে মানুষের প্রেমের দিক। এই প্রেমের দিক দিয়াই মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে,—বিশ্বের মূলরহস্যের সঙ্গে একটি অখণ্ড যোগসূত্র বাঁধিতে পারিয়াছে। যে দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা মানুষের জ্ঞানকে চিরদিন ঘুলাইয়া দিতেছে, এই প্রেমের কাছেই কেবল তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে। যিনি প্রকৃতির সহস্র আবরণের আড়ালে চিরদিন আপনাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, মানুষের এই প্রেমের শক্তিতেই কেবল তিনি ধরা পড়েন। আর, এই প্রেমের শক্তিতেই একদিকে যেমন মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে;—একদিকে পরম তত্ত্বের সঙ্গে যেমন তাহার যোগ সাধিত হয়, অন্য দিকে তেমনই সর্ব্বভূতের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে।

আসল কথা, মানুষের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব তাহার জ্ঞানের দিক দিয়া—বুদ্ধির দিক দিয়া নহে;—প্রেমের দিক দিয়াই তাহার যথার্থ মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের গৌরব। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই প্রেমের পরিণতিতে, সমাজের শ্রেষ্ঠ কার্য্য এই প্রেমবিকাশের সহায়তায়, মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তন এই প্রেমের উৎকর্ষে। ইহাই মানুষের বিশিষ্ট সম্পত্তি, জীবজগতে তাহার স্থান-নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি।

মানুষ যে তাহা কতকটা না বুঝিতে পারিয়াছে, এমন নয়। কিন্তু বুঝিয়াও বহু পুরাতন অভ্যাস তাহার পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাই সভ্যতার শৈশব-যুগের ন্যায় এখনও সে বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিজয়-যাত্রাতেই মত্ত রহিয়াছে;—বিশ্বের পরম লোভনীয় ঐশ্বর্য্য-মন্দিরের রহস্য ভেদ করিবার জন্যই বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া সেই অনন্ত রহস্যের দরজায় মাথা কুটিয়াও তাহার বিশেষ-কিছু লাভ হইতেছে না। আপনার অক্ষমতা পদে পদে তাহাকে পীড়া দিতেছে ও বিফলতার অতৃপ্তিতে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতেছে।

মানুষের এই অক্ষমতা ও অতৃপ্তির ভিতরেই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের অবসর। মানুষ জটিল বিশ্ব-রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না, কেবল কতকগুলি অসার কল্পনা-জাল রচনা করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতেছে; প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইতেছে, আর কতকগুলি মনগড়া কথাকে 'অতিপ্রাকৃত' নাম দিয়া, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গের ফটক পার হইবার একটা কিনারা হইয়াছে ভাবিয়া তুচ্ছ আরাম লাভ করিতেছে। এইদিকেই মন্ত্রতন্ত্র, যোগযাগ, তুকতাক, বুজরুকী, ভূত-প্রেত, ডাকিনী-শাখিনী, মারণ-উচাটন, স্তম্ভন-বশীকরণ প্রভৃতি স্তূপীকৃত ভাবে সাজানো রহিয়াছে। এইদিক দিয়াই লোক-লোকান্তর হইতে নানা অদ্ভুত, অশরীরী প্রাণী আসিয়া, মানুষের এই মাটীর পৃথিবীতে, অতি

সাধারণ ভাবে আনাগোনা করিতেছে ; ফলে, দেশকালের সীমাকে তুচ্ছ করিয়া মানুষের মন নানা অপরূপ খেয়ালের দৃষ্টিতে মাতিয়া উঠিতেছে। কিমিয়া-বিদ্যা এই পথেই স্বর্ণলোভে যুগ-যুগান্তর বৃথা ভ্রমণ করিয়াছে ; বিধাতার পুরাতন সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া এইদিক দিয়াই বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন ; আর রাবণ স্বর্গে যাইবার একটা পাকা সিঁড়ি এই দিক দিয়াই গড়িয়া তুলিবার ফিকির করিয়াছিলেন। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, মানুষের মন অতি সহজেই ইহার বশীভূত হইয়া পড়ে, সম্মুখের কঠোর সত্যকে ত্যাগ করিয়া লোভনীয় কাল্পনিক মায়ামৃগের পাছে পাছে ছুটিতে থাকে।

মানুষের মনের উপর অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের এই অসীম প্রভাব কোনদিনই প্রকৃত পক্ষে হ্রাস পায় নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা যতই বাড়িতেছে, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের সীমা-রেখা দিকচক্রবালের ন্যায় ততই সরিয়া সরিয়া যাইতেছে,—এই মাত্র তফাৎ। নব বৈজ্ঞানিক যুগে অলৌকিকের মায়া হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরই নূতনভাবে তাহার প্রতিমা গঠন করিয়া তাহার পূজা চলিতেছে, মানুষের সসীম মস্তিষ্কের ভিতরে নানা অভিনব শক্তির কল্পনা করিয়া, স্থূল জগতের বাহিরে নানা সূক্ষ্ম লোকের ও জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্থির করিয়া অলৌকিক চেষ্টার পরিচয় দিতে আমাদের কোনই ত্রুটি নাই। আমাদের জ্ঞান ও শক্তির সম্বন্ধে আমাদের এতই অবিশ্বাস ও অতৃপ্তি যে, কণামাত্র অতিপ্রাকৃতের কাছে আমাদের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা লঘু করিয়া দেখিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

সেকালে মহাপুরুষ, অতি-মানুষ বা শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে যাঁহাদিগকে মনে করা হইত, তাঁহাদের শক্তি ও মহত্ত্ব এই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের উপরই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের পৌরাণিক বীর ও মহাপুরুষগণের প্রায় প্রত্যেকেই এই অলৌকিক শক্তির আধার। কেহ হয় ত বিশাল সাগর এক লাফে উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেন, আর কেহ বা এক বাণে সাগর শুষিতেন কিংবা সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতেন। ইচ্ছামত ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নখদর্পণে জানা, অশরীরী প্রাণীর ন্যায় শূন্যে ওড়া, তপস্যার বলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলা, ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল। আমাদের দেশের ন্যায় প্রতীচ্যেও এই একই ভাব। গ্রীক, রোমান এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পুরাণেও সেই অলৌকিক শক্তিরই রাজত্ব। সেকালের দেবতারাও মানুষের চেয়ে এই অলৌকিক শক্তির বলেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, তাঁহারা অনায়াসে সে-সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিতেন ; মানুষের পক্ষে যাহা অদ্ভুত ও অসম্ভব, তাঁহাদের পক্ষে তাহা ইচ্ছামাত্রই ঘটিতে পারিত বলিয়াই তাঁহারা দেবতা ছিলেন। চরিত্র বা স্বভাবগত শ্রেষ্ঠত্ব—প্রেমের মহত্ত্ব মোটেই তাঁহাদের দেবত্বের মাপকাঠি ছিল না। বরং সে হিসাবে অনেক স্থলে তাঁহারা যে মানুষের

অপেক্ষা হীন ছিলেন, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মানব-সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রেমই যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ, যথার্থ মনুষ্যত্ব যে প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা ক্রমে জানা যাইতে লাগিল। তখন আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র অলৌকিকের উপর নির্ভর করিত না, তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব বা প্রেমের বিকাশও প্রয়োজনীয় বোধ হইতে লাগিল। মানুষ যে কত বড় তাহা বুঝিতে হইলে, কেবলমাত্র তাহার অতিপ্রাকৃত শক্তিরই হিসাব-নিকাশ পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইল না,—তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব কতটা বিকশিত হইয়াছে, প্রেম কি পরিমাণে তাহার মধ্যে জাগ্রৎ হইয়াছে,—স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ত্যাগ, প্রভৃতি কি পরিমাণে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরেও দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাই তখনকার যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব ও চরিত্র-বলও লোকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে ঐতিহাসিক যুগের মহাপুরুষেরা কেবলমাত্র অলৌকিক বাজিকর নন্, শ্রেষ্ঠ মানুষও বটেন।

কিন্তু বলিয়াছি ত, যে অলৌকিকের মোহ কোনদিনই মানুষ কাটাইতে পারে নাই। তাই ঐতিহাসিক যুগেও, মহাপুরুষদের ধারণা বিষয়ে, মানুষ যেমন তাঁহাদের ভিতরকার যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশকেও অনুভব করিয়াছে, তেমনই তাহাতে ইচ্ছামত অলৌকিকের ভাগ না মিশাইয়াও ছাড়ে নাই। বরং এই অলৌকিকের ভাগ কোন কোন স্থলে এত বেশী যে, যথার্থ মনুষ্যত্বের গৌরব তাহার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা তাঁহার সাম্য ও মৈত্রীর কথা ততটা বুঝে নাই, তাঁহার নানা অলৌকিক শক্তির কল্পনা যতটা বেশী বুঝিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের আত্মত্যাগ ও ভগবানে নির্ভরতা খৃষ্টান-জগৎ যতটা না ভাবিয়াছে, তাঁহার জলের উপর পায়ে-হাঁটিয়া নদী পার-হওয়া, স্পর্শমাত্রে কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্তি বা ইঙ্গিতমাত্রে ঝঞ্ঝাবাত নিবারণ প্রভৃতির হিসাব-নিকাশের গল্প লইয়া তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মহান্ বিশ্ব-প্রেম ও অতুল ভাবতন্ময়তার কথা ভাবিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা অদ্ভুত অতিপ্রাকৃতের ভাগ মিশাইতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও এই অলৌকিকের পসার কিছুমাত্র কমে নাই। আজ আমরা মনুষ্যত্বকে বেশী পরিমাণে বুঝিয়াছি, প্রেমের মাহাত্ম্য মানুষের মনের উপর আজ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজও মানুষের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বকে অলৌকিকের মায়া-স্পর্শ হইতে আমরা একটুও মুক্ত করিতে পারি নাই বলিলেও হয়। আজও শ্রেষ্ঠ মানুষ বা মহাপুরুষের ধারণায়,—মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরবে ও প্রেমের মহত্ত্বে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে যতক্ষণ না কিছু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কার করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের প্রাণ আইঢাই

করিতে থাকে। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও এই মোহ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, ভক্ত প্রেমিকদের মধ্যে চরিত্র-গৌরব ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের খোঁজ বড় বেশী লোক লয় না। তাহাদের কোনরূপ বুজরুকী বা অলৌকিক কিছু আছে কি না, সেইদিকেই সকলের ঝোঁক থাকে বেশী। আসল কথা, মানুষ যে কত বড়, তাহার প্রেমের মধ্যেই যে তাহার দেবত্ব পরিস্ফুট, এ ধারণা এখনও আমাদের ভাল-করিয়া হয় নাই। তাই অভ্যাস-বশে আসল মানুষটাকে আমরা এত ছোট করিয়া দেখি যে, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের কাছে ধার না করিলে কিছুতেই আমাদের মন উঠে না।

অবতারবাদের মূলে এই অলৌকিকের দাবী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আমরা অবতারবাদ অবিশ্বাস করিবার কথা বলিতেছি না। কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্ব, এবং প্রেমের মধ্য দিয়া মানবে দেবত্বের অভিব্যক্তি যতদিন না আমরা অনুভব করিতে পারিব, ততদিন অবতার-বাদের যথার্থ সার্থকতা বুঝিতে পারিব না; বরং অলৌকিকের মায়াদণ্ড ছুঁয়াইয়া যেখানে-সেখানে অবতারের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শকে আমরা খাটো করিয়া ফেলিব। হইতেছেও তাহাই। মানুষকে যথার্থ গৌরব আমরা দিতে পারিতেছি না। মানুষ যে প্রেমবলে কত মহৎ হইতে পারে, তাহার চরিত্র-গৌরবে দেবত্বের আদর্শকেও সে যে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এ-কথা ভাল-করিয়া না বুঝিয়া আমরা মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের অভিব্যক্তি দেখিলেই, সেখানে ঈশ্বর গড়িয়া তুলিতেছি; মহাভক্ত বা মহাপ্রেমিকের মধ্যে মানুষকেই বৃহৎভাবে উপলব্ধি না করিয়া যেখানে-সেখানে ঈশ্বরকে স্বর্গরাজ্য হইতে নামাইয়া আনিতেছি। ইহাতে মানব-সমাজের, মানব-প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির—তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যের সাধনায় অপরিমেয় ক্ষতি সাধন হইতেছে। আর যাঁহারা মহাপুরুষদের চেলা ও ভক্ত সাজিয়া অতি-মাত্রায় এই অলৌকিকের পূজায় মন দিতেছেন, তাঁহারা যে এক-হিসাবে মনুষ্যজাতির ও মানব-সভ্যতার ঘোরতর শত্রু, এ-কথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

---

# পিতা-পুত্র

## ( শাহজাহান ও আওরংজেব ) (১)

সামুগড়ের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—দারার ভাগ্যলক্ষ্মী দারাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; মুগল রাজলক্ষ্মী আওরংজেবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন; অতঃপর পিতা-পুত্রে যে ঘটনা ঘটে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

সামুগড়ের যুদ্ধের তিন কি চারি দিবস

(১) এই প্রবন্ধ-রচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার-মহাশয়ের "আওরংজেবের ইতিহাস", "আওরংজেব

পরে, আওরংজেব এবং মুরাদ দুর্গ হইতে তিনমাইল দূরবর্ত্তী আগ্রার সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ উপবনে উপনীত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা আওরংজেবের একজন বিশ্বস্ত, বাক্‌পটু এবং চতুর খোজার প্রমুখাৎ শাহজাহানকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর নামে বৃদ্ধ বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া জানাইলেন, বাদশাহের প্রতি আওরংজেবের ভক্তি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে; সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যদিও তাহা একমাত্র দারার অত্যধিক দুরাকাঙ্ক্ষা ও কু-অভিপ্রায়ের জন্যই ঘটিয়াছে, তথাপি তাহার জন্য তাঁহারা দুঃখিত। তিনি বিশেষ সরলতার সহিত আওরংজেবের মহামান্য পিতৃদেবের স্বাস্থ্যোন্নতিতে অভিনন্দন-জ্ঞাপন এবং পিতার আদেশ গ্রহণ ও প্রতিপালনই যে তাঁহার আগ্রায় উপনীত হইবার একমাত্র কারণ, তাহাও নিবেদন করিলেন।

বাদশাহ পুত্রের ব্যবহারে অনুমোদনের ভাব দেখাইলেন ও বশ্যতা স্বীকারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আওরংজেবের কপটতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা অবশ্যই তিনি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই সকল বাক্যে তিনি আস্থা স্থাপন করিলেন না; তথাপি অটলতা প্রদর্শন, প্রজাবর্গের নিকট উপস্থিত হওয়া ও ওমরাহগণকে একত্র না করিয়া তিনি নিজের চতুরতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আওরংজেব এই উভয় বিষয়েই সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং পিতা পুত্রের জন্য যে জাল রচনা করিতেছিলেন, চতুর পুত্রের কৌশলে পিতা স্বয়ং যে সেই জালে নিপতিত হইবেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই! শাহজাহান আওরংজেবকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আওরংজেব দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং যদিও তিনি পুনঃপুনঃ পিতার সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলেন, তথাপি প্রত্যহই দিন পরিবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী দিবস স্থির করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপনীয় চক্রান্ত চলিতে লাগিল এবং দুর্গ-অবরোধও হইল। প্রথমতঃ দুর্গাবরোধ করিয়া আওরংজেব কোন সুবিধা পান নাই। অবশেষে আওরংজেব দুর্গের জল রুদ্ধ করিলেন। আগ্রাদুর্গ সুদৃঢ় ও গভীর পরিখাবেষ্টিত হইলেও, পানীয় জলের অভাবে সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তখন শাহজাহান আওরংজেবকে এই মর্ম্মস্পর্শী চিঠিখানি পাঠাইলেন :—

"বাবা আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল আমি নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ আমার জল দিবার একটী চাকরের অভাব!

---

সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী" ও প্রবাসীতে লিখিত প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক আরভাইনের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং বার্নিয়ারের পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যাঁহারা বার্নিয়ারকে প্রমাণস্বরূপ (authority) গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁহাদিগকে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে তাঁহারা যাঁহাকে প্রমাণ (authority) বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই আরভাইনও বার্নিয়ারকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary ১৯১১ দ্রষ্টব্য)। বার্নিয়ার 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

হিন্দুদের যাহা হউক ধন্য বলি,
তাহারা মৃত ( আত্মীয় )কে জলদান করে।

কিন্তু, হে পুত্র, তুমি এমন অদ্ভুত মুসলমান যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত করিয়াছ।"

আওরংজেব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেয়াদবি।"

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া বিজয়ী নির্ম্মম পুত্রকে এই চিঠি পাঠাইলেন :—

"পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ! আমাকে শত্রু বলিয়া মনে কর এবং আমাকে যে-সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইহ-জগতে লজ্জা ও পরকালে সর্ব্বনাশ হইবে। শেষ বিচারের দিন কি বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে? যুদ্ধ জয় করিয়াছ বলিয়া উদ্ধত হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চির-কাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ ভাগ্য বড় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে এরূপ কাজ করিও না। জগৎজন আমার রাজত্বের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষাংশ তুমি বিষময় করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য্য কর, যেন তোমার মান ও যশ চিরস্থায়ী হয়।"

আওরংজেব উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। এখন দুর্গটা আমার লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিউন; তৎপরে আমি বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিব।"

আগ্রাদুর্গ আওরংজেবের হস্তে সমর্পিত হইল। বৃদ্ধ বাদশাহ বন্দী হইলেন।

শাহজাহান প্রজার সুখ ও রাজ্যের শান্তির জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য সমস্ত দিবা-ভাগকে ভাগ করিয়া তিনি নিয়মমত সময়ে প্রত্যেক কাজে নিযুক্ত হইতেন। ভোগ-বিলাসের ইচ্ছাকে তিনি সর্ব্বদা দমন রাখিতেন। ফলে, হিন্দুস্থান তাঁহার রাজত্বকালে অতুলনীয় সমৃদ্ধি ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। দস্তর-উল-আমল্-এ আগহী শাহজাহান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"নিজ স্কন্ধে নিলে তুমি গুরু রাজ্যভার।
প্রফুল্লহৃদয় তাই তব প্রজাগণ॥
রাত্রিদিন নিদ্রা নাই নয়নে তোমার।
অত্যাচার তাই হ'ল নিদ্রায় মগন।"

আওরংজেব শাহজাহানকে বাহিরের কোন লোককে পত্র লিখিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি পত্র লিখিতে সচেষ্ট হওয়ায়, লিখনোপযোগী দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর আর স্বহস্তে পত্র লিখিবারও তাঁহার অধিকার রহিল না।

তাহার পর, আওরংজেব ময়ূরতক্ত, দারা শুকোর পরিত্যক্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য রত্নাদি শাহজাহানের নিকট হইতে লইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে, আওরংজেব শাহজাহানের একশত গোলাকার মুক্তার জপের মালা (যাহার মূল্য চারি লক্ষ টাকা ছিল) ও হস্তের অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট চাহিলে তিনি অঙ্গুরীয় প্রেরণ করেন,



পিতা-পুত্র

( শাহজাহান ও আওরংজেব )

অধ্যাপক সমাদ্দারের সংগৃহীত হস্তিদন্তোপরি চিত্র হইতে

কিন্তু জপের মালা সম্বন্ধে বলেন যে, আওরংজেব পুনর্ব্বার ইহা প্রার্থনা করিলে তিনি মুক্তার প্রত্যেকটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবেন।

যতদিন আওরংজেব-পুত্র সুলতান মুহম্মদ শাহজাহানের কারা-রক্ষক ছিলেন, ততদিন শাহজাহান কথঞ্চিৎ শান্তিভোগ করিতেন। মুহম্মদের পরে, খোজা মুতমদের উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে, বাদশাহের উপর অত্যন্ত পীড়ন চলিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় খোজা তাঁহার সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। অধিক কি সামান্য পাদুকা বা বস্ত্রও যথাসময়ে এবং যথাযোগ্যভাবে বৃদ্ধ বাদশাহকে সরবরাহ করা হইত না।

প্রথম বৎসর পিতাপুত্রে বাদানুবাদ-সূচক পত্র ব্যবহার চলিত। আওরংজেব নিজের ব্যবহার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতেন; এবং কারণ দেখাইতেন যে, বাদশাহের পীড়িত অবস্থায় দারা স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দারা জয়লাভ করিলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম লোপ পাইত; দারার স্বেচ্ছাচারিতা-দমনের জন্যই তিনি আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের জন্যই তিনি তরবারি-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। দারার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই ভ্রাতৃযুদ্ধের মূল কারণ, রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম, সুখেচ্ছা ও বিলাস রাজধর্ম্ম নহে, জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সকলের উত্তরে শাহজাহান পুত্রকে চোর বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

এদিকে শাহজাহানের মনঃপীড়ার অবধি ছিল না। দারা, মুরাদ, ও সুলেমান শমন সদনে প্রেরিত হইলেন; শুজা সপরিবারে অপরিচিত মগের দেশে নিহত হইলেন। কিন্তু, এরূপ অবস্থাতেও শাহজাহান ধৈর্য্য হারান নাই। সাতবৎসর-ব্যাপী কারাবাস-কালে তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভৃত্যের সর্ব্বনাশ ও অনেক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তিনি শেষজীবন পর্য্যন্ত বিচলিত হন নাই। ধর্ম্মই তাঁহার সান্ত্বনা ছিল। প্রার্থনা, ধর্ম্মচিন্তা ও কোরাণ-পাঠে তিনি সময়াতিপাত করিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়া বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত পিতার সেবা এবং দারা ও মুরাদের কন্যাদ্বয়কে মাতার ন্যায় লালন-পালন করিতেন।

মৃত্যুর জন্য শাহজাহান প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে আর তাঁহার কোন ভয় ছিল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তাঁহার জ্বর হয়। ২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার বেগমদ্বয় আকবরবাদী ও ফতেপুরম-হল, জ্যেষ্ঠাকন্যা জাহানারা ও ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাদশাহ আওরংজেব পিতার নিকটে আসেন নাই। শাহজাহানকে তাঁহার প্রিয় বেগম মমতাজমহলের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

পিতার প্রতি আওরংজেব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনুষ্যোচিত হয় নাই। জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে ও শাহজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও পিতার প্রতি কেহই এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আওরংজেবের রাজ্যলিপ্সা

ভদ্রতার কোনপ্রকার খাতির রাখে নাই এবং সেজন্য তিনি সাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর মহাসমারোহ ও সমৃদ্ধির সহিত রাজ্য করিবার পর বাদশাহ শাহ-জাহান পুত্রের হস্তে বন্দী হন। কারাগারে শেষ আট বৎসর কাটাইবার পর মৃত্যু তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক খাফি খাঁ লিখিয়াছেন—

"সোনার কলসী মত জানিও জগৎ,
কভু তাহে তিক্ত জল, কভু সরবৎ।
শমনের অশ্ব থাকে সদা সুসজ্জিত,
'আমি বড়' বলে কভু হয়োনা গর্ব্বিত।" (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

# আমাদের সম্পদ

## ( ক্রপটকিন হইতে )

প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগে মানুষ যেদিন প্রস্তরফলক ও অকস্মাৎলব্ধ মৃগয়ার উপর নির্ভর করে' জীবন ধারণ করত সেদিন-থেকে আজ পর্য্যন্ত নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আমরা সভ্যতার যে স্তরে উপনীত হয়েছি, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এতদিন ধরে মানুষ অনবরত বিচার করেছে, পর্য্যবেক্ষণ করেছে, আবিষ্কার করেছে, নির্ম্মাণ করেছে, ধূসর জমাট পৃথিবী তাদের চেষ্টায় স্বর্ণ শস্যে ভরে' গেছে, আকাশের বিদ্যুৎ বাতাসের বাষ্প তাদের পদানত হয়ে দাসবৎ সেবা করেছে, সুনির্ম্মিত সূক্ষ্ম যন্ত্র পরিশ্রমের গুরু ভার লাঘব করেছে; এবং এই বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য আমরা অনেকখানি জানতে পেরেছি। এই হাজার হাজার বছরের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে মানুষ যে-সম্পদ সঞ্চয় করেছে তা 'আরব্য-রজনী'-বর্ণিত প্রাচ্যের সকল ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করে' দিয়েছে।

নানা কলকৌশলের দ্বারা দেশের জন-কয়েক মাত্র লোক ধনী হচ্ছে বটে তবুও মানবসাধারণ সে-সম্পদ-ভোগে একেবারে বঞ্চিত নয়।

আমরা নিজেদের যতখানি সম্পদের অধিকারী মনে করি, আমরা তার চেয়ে বেশী ধনী; আমাদের যা আছে শুধু তাই নিয়ে নয়, আমাদের উদ্ভাবিত কল-বল যন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা আছে। বিত্ত আহরণ ও সঞ্চয় ধনীর একমাত্র লক্ষণ নয়; আহৃত ও সঞ্চিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহারেই

---

(১) দারাশুকো:=দারিয়াসের ন্যায় প্রভাবশালী। শুজা=সাহসী। মুরাদ বখশ=যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আওরংজেব=সিংহাসনের অলঙ্কার। জাহানারা=পৃথিবীর অলঙ্কার। জাহানারার কনিষ্ঠা রৌশন-আরা অর্থাৎ আলোকমণ্ডিতা।

ধনীর পরিচয়। সাধারণত অজ্ঞাত-বংশপরম্পরা-প্রচলিত যন্ত্রবলের ও বিজ্ঞান-কৌশলের সহায়তায় যদি আমরা সার্ব্বজনীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করি, তাহলেই আমরা যথার্থরূপে ধনী হতে পারব।

বর্ত্তমানে সভ্যসমাজ মাত্রেই উপরোক্ত প্রকারে বিপুল সম্পদের অধিকারী। তবে দেশব্যাপী দারিদ্র্যের এ হাহাকার কেন? জনসাধারণের দেহ-প্রাণনাশী এ নিদারুণ পরিশ্রম কেন? অতীতের ভাণ্ডারলব্ধ এত সম্পদের মধ্যে কর্ম্মী সাধারণের এ সংস্থানহীনতা ও অনিশ্চয়তারই বা কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে, সুদূর অতীতে মিথ্যা অধিকারের দাবীতে জনকয়েক লোকে সাধারণের শ্রমলব্ধ বিত্তের বেশী অংশ হস্তগত করেছেন এবং নিতান্ত মূর্খের মত বদ খেয়ালে সেই অন্যায়লব্ধ সম্পদ নষ্ট করেছেন। এর কারণ, ছলে-বলে-কৌশলে সেই সামান্য কয়েকজন লোক জনসাধারণের একমাসের ত দূরের কথা, এক সপ্তাহেরও অন্নসংস্থান না রেখে, এমন অবস্থায় তাদের এনে ফেলেছেন যে আজ সেই জনকয়েক ধনীকে শ্রমলব্ধ জিনিসের বেশীর ভাগ দেওয়ার কড়ারে কাজ করা ছাড়া তাদের আর উপায় নেই। এর কারণ, সেই জনকত ধনী অবশিষ্ট লোকদের দিয়ে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈরি না করিয়ে যে-জিনিসে তাঁদের লাভ বেশী সেই প্রকার জিনিসই তৈরি করাচ্ছেন। Socialist সম্প্রদায় এই সব কথার আলোচনা ও আন্দোলন করেছেন অনেকবার; সাধারণের আহার, বিহার, আশ্রয় ও শিক্ষার কথা তাঁরা বারবার বলেছেন, কিন্তু কেউ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করেন নি, কারণ যাঁদের হাতে এই সংস্কারের ভার, তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করেন কেমন করে'!

অধিকার-সূত্রে লব্ধ বর্ত্তমান সভ্যতা, জীবন-যাত্রার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পূর্ব্ববর্ত্তীগণের জীবনব্যাপী প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফল। বিশ্বে যা-কিছু গরীয়ান, যা-কিছু মহীয়ান, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ বৎসরের একান্ত চেষ্টা নিহিত। প্রতি কাঠা জমি কত শত জাতির শ্রম-ঘর্ম্মসিক্ত, প্রতি বিঘা জমির পশ্চাতে অন্যায়রূপে বাধ্য পরিশ্রমীর, দীন-দরিদ্র মজুরের প্রতি দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের সুদীর্ঘ নিরানন্দ ইতিহাস। প্রতি রাজপথ, প্রতি হর্ম্ম্য, সভ্যতার প্রতি অঙ্গ মানুষের শোণিত-সিক্ত। যে বিচিত্র সভ্যতার গর্ব্বে আমরা আজ স্ফীত, লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীর চেষ্টায় সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীময় প্রাণপণ যত্নে তাকে রক্ষা করেছে। তাদের অভাবে এ সভ্যতা টিঁকবে কদিন?

অতীতেরই হোক আর বর্ত্তমানেরই হোক, প্রতি আবিষ্কার, প্রতি চিন্তা সাধারণ সম্পত্তি। বিখ্যাত হোন বা অখ্যাত হোন, হাজার হাজার আবিষ্কর্ত্তা ও শিল্পীর দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানের সঙ্গে অনন্ত সংঘাতই বর্ত্তমান সুখ-সমৃদ্ধির মূল। দেশ বা জাতি মাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধির, ভ্রম-নিরসনের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগৎ-সৃজনের মূলেও লক্ষ লক্ষ লেখক, কবি ও মনীষীর এই বিপুল

পরিশ্রম দেখা যায়। কিন্তু সমসাময়িক কর্ম্মীদলের সাহায্য পেয়েছি বলেই, অতীতের সঞ্চিত সম্পদ লাভ করেছি বলেই আজ আমাদের পরিশ্রম এতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে; তার অভাবে বর্ত্তমানে কি অবস্থা হোত তা কল্পনা করাও কঠিন। আজ যদি আচার্য্য বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করার মত উপযুক্ত শিল্পীর অভাব হোত তবে তাঁর আবিষ্কারের মূল-নির্দ্ধারণ ততটা সহজ হোত না। শুধু তাই নয়, শিল্পীর দল প্রথম-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সমস্ত অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা পূরিয়ে তোলবার পক্ষে কতকাল ধরে যে কত সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়, মস্তিষ্ক ও দেহের সহযোগিতায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, এ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে; তবে কেন কয়েকজন মাত্র লোক এই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে? আমাদের—জনসাধারণের কি এতে কোন অধিকার নেই?

মজুরের ছেলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে' মনিবকে তার উৎপন্ন ফসলের বা আহৃত সম্পদের বেশীর ভাগ না দিয়ে কোন ক্ষেত্রে, কোন কল-কারখানায় বা কোন খনিতে কাজ করতে পায় না। সারা জীবনের পরিশ্রমের ফলে তার সম্পদ সঞ্চয় ত দূরের কথা, অতিকষ্টে দিন-গুজরাণও অসম্ভব হয়ে উঠ্ছে। কিন্তু অনিশ্চিত ও সামান্য এই মজুরীর বিনিময়ে সে বিক্রয় করছে তার দেহের শক্তি, তার জীবনের রক্ত। তারই পিতৃপিতামহ জলা সেঁচতে, কল তৈরি করতে, কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের সমস্ত শক্তি এই কাজে ব্যয়িত হয়েছে; এবং আমরা তাদেরই রক্তরঞ্জিত এই প্রাচীন সভ্যতায় গর্ব্বিত। কিন্তু তাদের বংশধরেরা আজ দীনতম হীনতম বর্ব্বরের চেয়ে দরিদ্র। তাদের জীবন দুঃখ ও হতাশার গভীর অন্ধকার হতে গভীরতর অন্ধকারে এক মহা আত্মবিসর্জ্জন। তাদের পরিশ্রমলব্ধ ফলের এক-চতুর্থাংশ তাদের মনিব, অপর-চতুর্থাংশ দেশের শাসনকর্ত্তা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দেওয়ার কড়ারে সে কাজের অধিকার পায়। ধনী-সম্প্রদায়ের খাঁই প্রত্যহই বেড়ে চলেছে, সে-খাঁই মেটে মজুরেরই সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে। তারপর তার নিজের উন্নতি করবার শক্তিই বা কোথায় আর সুযোগই বা কোথায়? তারা দিন দিন মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সভ্যসমাজ তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ বিলাস-লালসায় নষ্ট করে' সভ্যতার আবরণে বর্ব্বরতার অভিনয় কচ্ছেন।

সমাজের অভাবের দিকে দৃষ্টি না রেখে যাঁরা দেশের ফসলের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা ব্যবসাদারের লাভ-ক্ষতির বাঁধা খতিয়ানের দিকে চেয়ে আছেন। এবং ব্যবসার উঠা-নামায়, কল-কারখানার গোলমালে হাজার হাজার লোক সকল-হারা হয়ে পথের ভিখারী হচ্ছে।

দেশের সাধারণ-সম্প্রদায় নিজেদের হাতে জিনিস গড়ে, কিন্তু তা নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে কিন্তে পারে না। দেশের কল-কারখানার স্বদেশী শিল্পীরা বিদেশের রপ্তানির দিকে চেয়ে বসে আছে, সেখানকার বাজারেই তাদের শিল্পের গতি। আর এই বাজার-দখলের আশায় সব জাতিসমূহ পরস্পরের

মধ্যে যে ঈর্ষার আগুন জ্বেলেছে, তার শেষ কোথায়? বিশ্ব জুড়ে কেবল কামান-গর্জ্জন, এক-একটা জাতি অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে ধরা-বক্ষ থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সভ্যদেশে আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যয়িত হচ্ছে, আর সেই অন্যায় ব্যয়ভার বহন করছে দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত মজুর-সম্প্রদায়!

শিক্ষার সুবিধা এখনও জনকত লোকেই ভোগ করে। মজুরের ছেলেকে যখন তের-বছর বয়সে বাপ-দাদাকে সাহায্য করতে মাঠে, কারখানায় বা ঘানিতে যেতে হয়, তখন দেশব্যাপী শিক্ষার কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তারা শিক্ষা-লাভ করবে কখন? এমনি করে' সুযোগে ও অসুবিধায়, সম্পদে ও দারিদ্র্যে সমাজ দুই পরস্পর-বিমুখ সম্প্রদায়ে যখন বিভক্ত, তখন মানুষের স্বাধীনতার কথা তোলা হাস্যকর নয় কি?

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নীতি-উপদেশ লম্বা-চওড়া কথার কথা মাত্র। এই বিপরীত ও অদ্ভুত ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথায় এ দেশের লোক বিশেষরূপে উদাসীন; কারণ, এই ব্যবস্থার প্রতিকারের ফলে তাঁদের স্বার্থহানি সুনিশ্চিত। নিজেদের সামান্য স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা দেশশুদ্ধ সবাই অন্যায় ও মিথ্যা আচরণ করি এবং সেই অন্যায় ঢাকবার জন্যে লোক-ভুলানো সাহিত্য ও বিজ্ঞান গড়ি। যথার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বদলে পণ্ড পণ্ডিতী আমাদের একমাত্র আশ্রয়। বর্ত্তমানে ভণ্ডামি ও পণ্ড পাণ্ডিত্য, সভ্যমানবের দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সমাজ হয় সত্যের দিকে ফিরবে, নয় ধ্বংস হয়ে যাবে। মাঝামাঝি অবস্থা কিছু নেই। সত্যকে বাদ দিয়ে, আত্ম-সম্ভ্রমকে বাদ দিয়ে, পরস্পর সাহায্য ও সমবেদনা বাদ দিয়ে সমাজ বাঁচতে পারে না—অতীতের বিলুপ্ত ও জিঘাংসু পশুর মত মানুষ অদূর-ভবিষ্যতে লোপ পাবে। এই মিথ্যার জাল থেকে সমাজকে, আমাদের মনকে বিমুক্ত করতে হবে। যদি বাঁচতে চাও, যদি মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা কর, তবে এতদিনের সঞ্চিত অন্যায়ের ভার লাঘব কর। দেশের ফসল সবাই ভাগ করে' নাও। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে আপনার সঞ্চয়-লালসার প্রশ্রয় দিও না। জগতে যা জন্মায় জগদ্বাসীই তার মালিক। এ সভ্যতা একজনে গড়ে' তোলেনি—যুগ-যুগান্তের পরিশ্রম এর মধ্যে নিহিত। সকলেরই সমান অধিকার; কারও কম বা বেশী নয়—হোক সে শক্তিমান বা অক্ষম, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা নির্ধন। অভাবও আছে সবারই, কম বা বেশী; সে অভাব পূরণ হবে দেশের উৎপন্ন জিনিসেই। যাদের মানুষ হবার সুবিধা নেই, তাদের সুবিধা দাও; দশকে হারিয়ে এককে বড় করবার চেষ্টা করো না। তোমার যা একলার নয় তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তোমার কোথায়?

অস্ত্রভার বা সঞ্চিত সম্পদ যথার্থ সভ্যতার পরিচায়ক নয়; জ্ঞানের গভীরতা এবং হৃদয়ের প্রসারই সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। মানুষকে যখন তার যথার্থ অধিকার দেব, তখনই মনুষ্যত্বের যা বড় কথা তার প্রতিষ্ঠা হবে; সে কথাটি হচ্ছে—"কল্যাণের অধিকার, সার্ব্বজনীন কল্যাণ।"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# ভারতীয় পরিবার-মণ্ডলীর উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

## ( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

যখন ইংলণ্ড, স্বকীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মূলক মতামত ভারতে প্রচার করিতেছিলেন, তখন ভারতের জনসমাজ কিরূপ ছিল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐসকল মতামতের পরিসর-সীমা কতদূর বিস্তৃত তাহা দেখাইবার জন্য প্রথমে আমি Smiles-এর Self-Help হইতে তাহার গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ক্রমোন্নতির মূলে আত্মসাহায্যের তত্ত্বটি অবস্থিত... অনেক সময়, যে সাহায্য আমরা অপরের নিকট হইতে পাই তাহা আমাদিগকে দুর্ব্বল করে; নিজের নিকটে যে সাহায্য পাই তাহাই আমাদিগের বল বিধান করে। কোন সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য অথবা বিশ্বমানবের হিতের জন্য, কোন ব্যক্তি যে কাজ করে তাহা একপ্রকার হীনতাজনক ; কেননা, সেই কাজ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে, নিজের জন্য কাজ করিবার আবশ্যকতা অপনীত করে ; বেশী উপদেশের ফলে, বেশী শাসনের ফলে, মানুষ অগত্যা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও কাজ করিবার জন্য মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। বড় আমরা এইটুকু আশা করিতে পারি যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান, আত্মোন্নতি সাধনে, নিজের অবস্থার উন্নতিসাধনে, মানুষকে স্বাধীনতা দিবে।"

আবার, ঊনবিংশতি শতাব্দীতে আবির্ভূত ইংলণ্ডের দুইজন চিন্তাশীল লেখকের লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

John Stuart Mill বলেন :—

"স্বেচ্ছাচার-শাসন হইতে কেবলমাত্র কিয়ৎ পরিমাণে কুফল ততক্ষণই উৎপন্ন হয়, যতক্ষণ না স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষিয়া ফেলে ; কিন্তু যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা-কিছু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পেষিত করে তাহাই কতকটা স্বেচ্ছাচারিতা।"

Spencer বলেন ;—"প্রভুত্বের হ্রাস—যাহা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশেষ লক্ষণ সেই প্রভুত্ব হ্রাসের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা স্বাধীন-চেতা কোন বালককে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হন না। উৎপীড়নের দিকে মা-বাপের প্রবণতা যত কম হয় ছেলে-মেয়ের স্বাধীনতার দিকে প্রবণতা ততই বেশী প্রকাশ পায়। এই উভয় প্রবণতাই এমন একটা শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার সূচনা করে যাহা আমরা নিষেধ করিয়া থাকি : আসল কথা, নিজ কার্য্যফলের অভিজ্ঞতা হইতে আপনাদিগকে যথাপথে পরিচালিত করিতে

বালকেরা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়। এই উভয় প্রবণতা হইতেই আমাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সপ্রমাণ হয়। স্বাধীনচেতা শিশু হইতেই স্বাধীন-চেতা পূর্ণবয়স্ক ইংরেজ বা মানুষ উৎপন্ন হয়। একটি না হইলে আর একটি হইতে পারে না।" (১)

* *
*

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এই যে-সব উদ্বোধন, ইহার কিছু না কিছু পরিণাম-ফল অবশ্যম্ভাবী।

একজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার বলেন:—"যেকাজে চিত্তের প্রশান্তি ও অবিচল শ্রমশীলতা খুবই দরকার সে কাজে বাঙ্গালী সফলতা লাভ করিতে যে পারে না, তাহার কারণ, গৃহের মধ্যে বাঙ্গালীর অশান্তি ও উদ্বেগ। অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর "মধুর গৃহ"ই অশেষ প্রকার গোলযোগ ও অশান্তির মূল-উৎস। যে গৃহে কোন গুণীজন বা প্রতিভাবান ব্যক্তি অবস্থিতি করে, সেই গৃহের প্রাচীরকে যদি প্রশ্ন করা যায়, না জানি তাহার নিকট কত কথাই শুনা যাইতে পারে! না জানি সে কত অশ্রুজল দেখিয়াছে, কত দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে! কত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের, কত অসাড় স্নায়ুর দৃশ্য চোখে পড়িয়াছে; সে দেখিয়াছে—কত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে,—আবার আরম্ভ হইয়াছে, আবার নিষ্ফল হইয়াছে;—গার্হস্থ্য দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া কত বীর-হৃদয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করিয়াছে! এই হিন্দুগৃহ, অন্তরের কত উৎসাহ-স্ফুলিঙ্গকে নির্ব্বাপিত করিয়াছে, কত মহৎ উদ্দেশ্যকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। এই যে সব বিনাশের শক্তি ইহার মধ্যে সব-চেয়ে খারাপ দারিদ্র্য নহে। কিন্তু যে গৃহে অনেক নরনারী একত্রে বাস করে, অথচ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, অন্যের সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই

---

(১) এই অংশ স্পেন্সরের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে এই কথা আরও আছে:—

"রাষ্ট্র-শাসন সম্বন্ধে যে প্রচলিত মত, পরিবার-তন্ত্র সম্বন্ধেও সেই একই মত দৃষ্ট হয়: যত-কিছু গুণ সবই শাসন-কর্ত্তাদের, আর যত-কিছু দোষ সবই শাসনাধীন লোকদের। শিক্ষাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি যদি বিশ্বাস করিতে হয়—পুরুষ ও রমণী যখনই নিজ সন্তানদিগকে লইয়া ব্যাপৃত হয় তখনই তাহারা রূপান্তরিত হইয়া যায়। আমরা জানি, যে সকল পৌরজনের সহিত আমরা কারবার করি, যে সকল লোকদিগের সহিত সংসার-ক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হয়—তাহারা অপূর্ব্ব জীব। দৈনন্দিন নিন্দা গুজোব, বন্ধুদের বিবাদ-কলহ, দেউলিয়াদের প্রকাশিত গুপ্তকথা, মোকদ্দমা-মামলা, পুলিসের কার্য্য-বিবরণ এই সমস্ত আমাদিগকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়—ঐ সকল লোকের নিগূঢ় স্বার্থপরতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু যখনই শিক্ষার কথা উপস্থিত হয়, অবাধ্য বালকদিগের কথা উপস্থিত হয়—তখনই নিজের ছেলেমেয়েদের সহিত ব্যবহারে, এই সব দুশ্চরিত্র লোককেই আমরা সুনীতিসম্পন্ন আদর্শচরিত্র বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে,—গৃহের যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছেলেমেয়েদের দুষ্টবুদ্ধির প্রতি আরোপিত হয়, তাহার জন্য আসলে পিতামাতার অন্যায় ব্যবহারই যে দায়ী—এ কথা বলিতে আমাদের একটুও দ্বিধা হয় না।"

একটা না একটা অভিযোগ আছে—সে গৃহে যে-অশান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্য স্বভাবতই উৎপন্ন হয় তাহাতে-করিয়া সকল প্রকার উদ্যম উৎসাহ ও কার্য্যশক্তি অসাড় না হইয়া যায় না। স্ত্রীলোকদিগের ঝগড়া-ঝাঁটি, পুরুষদিগের বদ্ধমূল বিদ্বেষ, "সামান্য কারণ হইতে মহাসংগ্রামের উৎপত্তি"—এই সমস্ত ব্যাপারে, হিন্দু-গৃহের দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের মনে একটুও শান্তি থাকে না। কখন মানমর্য্যাদার বৃথা মান লইয়া, কখন ধনসম্পত্তির কথা লইয়া, কখন-বা কর্ত্তৃত্ব ও অধীনতার কথা লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অবশ্য সময়ে সময়ে যুদ্ধের বিরাম হয়, কিন্তু "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা" ছাড়া শান্তির সীমা আর বেশীদূর অগ্রসর না।" (N. Ghosh, Kristodas Pal p.p. 146-147)।

একজন বাঙ্গালী লেখক, M. Bose তাঁহার "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে" এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—"পাশ্চাত্য প্রভাব, হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। যে সকল প্রতিষ্ঠান লোপ পাইতে বসিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের যে সুবিধা তাহা আমাদের বুঝা উচিত এবং সেই সকল সুবিধা যাহাতে আরও দীর্ঘকাল আমরা রক্ষা করিতে পারি তৎপ্রতি আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজকালের শিক্ষিত লোকেরা যে সকল সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবাদি হইতে নিজে সাক্ষাৎভাবে আমোদ পায় না, সেই সকল উৎসবাদির প্রয়োজনীয়তা তাহারা বুঝিতে পারে না। পারিবারিক ব্যবস্থা-পদ্ধতির ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজি প্রভাবে পরিপুষ্ট স্বার্থবুদ্ধির সহিত উক্ত ব্যবস্থা-পদ্ধতি খাপ খায় না। নব্য হিন্দুসমাজে দরিদ্রেরা, প্রাচীন সমাজ-প্রতিষ্ঠিত স্বকীয় অধিকার হারাইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভিক্ষাদানের নিন্দা করিয়া থাকে।...

পাশ্চাত্য প্রভাব এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দুসমাজে ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হিন্দু পরিবার-মণ্ডলী, হিন্দুসমাজ, এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি সেখানে মাথা তুলিতে না পারে,..... কিন্তু ইংরাজি-শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও ইংরাজি শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটা বড় জায়গা রাখিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখন বেশ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, নিজ পরিবারের নিকট বা সামাজিক পরিবেষ্টনের নিকট সে সম্পূর্ণরূপে ঋণী নহে। যে-জাতের লোকই হোক্ না কেন, সে সকল ধাপের শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সর্ব্বোচ্চ পদগৌরব লাভ করিতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। এই ইতিহাসে যে সকল পরিবর্ত্তন বিবৃত হইবে, এই আকাঙ্ক্ষাই সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের হেতু।" (Hindu Civilisation I. P. LXIX, LXX)।

M. Bose, ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির পরিপুষ্টির মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভূত প্রভাব যে দেখিয়াছেন তাহা কতকটা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তিনি যে মনে করেন,

কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই ভারতীয় সমাজে হঠাৎ একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, একথা ঠিক নহে। এই পরিবর্ত্তন, সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশেরই ফল। য়ুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজ ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইলেও হিন্দুসমাজের গতি সেই একই লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ :—তাহা, ব্যক্তির মুক্তিসাধন। জাতের খণ্ডবিভাগ, জাতের পদমর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন, পিতৃ-কর্ত্তৃত্বের ও কৌলিক সত্বাধিকারের অন্তর্দ্ধান; ভাইদিগের ও পুত্রদিগের, অবিভক্ত পরিবার-পদ্ধতি হইতে বাহির হইবার অধিকার; স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার ও অন্তিম-দানপত্র অনুযায়ী উত্তরাধিকার স্বীকার করা; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সমূহকর্ত্তৃক প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রী-সম্বন্ধীয় মতবাদ—এই-যে-সব উপাদান ইহা সেই ক্রমবিকাশের অন্তর্ভূত নিছক হিন্দু উপাদান। এবং য়ুরোপীয় প্রভাবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল বিদেশীয় উপাদান সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজকে ওলট্‌পালট্ করিয়া দিয়াছে, সেই সকল উপাদানকেও গণনার মধ্যে আনা আবশ্যক। এইরূপ, শক জাতির ও মোগল জাতির রীতিনীতি, সামন্ততন্ত্র, ক্ষত্র-বীরোচিত ব্যবহার, ইস্‌লামের সাম্যবাদ, ভাগ্য-পরীক্ষক সাহসিকদিগের অদ্ভুত বৃত্তান্ত, সর্ব্বোপরি ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-মাহাত্ম্য—এই সমস্তও ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা উচিত।

তা' ছাড়া, আরো অন্যান্য উপাদানও ইহার ভিতরে আসিয়া পড়ে :—যথা, অর্থ-নৈতিক উপাদান। M. Bose ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, আয়েস্-আরামের ইচ্ছা, সুখভোগের বাসনা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানের লঘু গর্ব্ব, আধুনিক জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কঠিনতা, মূল্যবান ধাতুসমূহের মূল্য-হ্রাস—এই সমস্ত, একান্নবর্ত্তী পরিবার-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধনে সাহায্য করে। ইংরাজের আমলে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাবাধীনে এই সকল অর্থনৈতিক উপাদান সাক্ষাৎভাবে বেশী কাজ করিলেও দীর্ঘকাল হইতেই উহার ক্রিয়াফল কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইয়া আসিতেছে : অন্দর-মহলে রমণীদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, মুসলমান-প্রবর্ত্তিত সেলাই-করা কাপড় ব্যবহারের প্রচলন, মোগল ও পারসীকদিগের নিকট হইতে বিলাসিতার শিক্ষা,—এই সমস্ত, এদেশের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পরিবার-মণ্ডলীর অধঃপতনে সাহায্য করিয়াছে। কি বৈষয়িক কি নৈতিক উভয় হিসাবেই, য়ুরোপীয় সভ্যতা শুধু এই কার্য্যের সত্বরতা বিধান করিয়াছে, সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে মাত্র—আসলে বহুকাল হইতেই এসিয়িক সভ্যতা লোকের অজ্ঞাতসারে এই পথেই চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# আধুনিক নাট্যসাহিত্য

আমাদের দেশে নাট্য জিনিসটা রঙ্গ-মঞ্চের রঙ্গের সঙ্গে এমনি জড়িত হইয়া আছে যে, stage-craft যে নাটকে নাই তাহাকে আমরা নাটক বলিতেই প্রস্তুত নই। নাটক বলিতে সাধারণ লোক বুঝে, প্রবল ও প্রচণ্ড সব ঘটনার রটনা, যথা প্রণয়ের হাহাকার-হাহুতাশ, দ্বেষ-হিংসা অবিশ্বাস-অভিমানের পালা ; তারপর পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, গ্রেপ্তার বা খুনখারাপি ব্যাপারে মিলনে বা বিয়োগে সে পালার শেষ। এ হেন নাটকে কোন অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা করিতে আটক নাই। খুব রুদ্র রস, বীর রস, করুণ রস, হাস্যরস বা ভাঁড়ামির ছয়লাপ ঘটিলেও তাহাতে শ্রোতা বা পাঠকদের উৎসাহের অপলাপ হয় না, বরং উত্তেজনার উত্তাপের মাত্রা বাড়িতেই থাকে।

সেই জন্য আমার মনে হয় যে, নাটক সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের. ধারণা যতটা অস্পষ্ট, উপন্যাস বা নবন্যাস সম্বন্ধে ততটা নয়। নাটক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই উচ্চাঙ্গের কোন আধুনিক নাটক পড়িলে তাঁদের কারো বা বুঝিতে কষ্ট হয়, কারো বা সময় নষ্ট হয় এবং কেহবা খামখা রুষ্ট হন! রূপক নাটক পড়িলে, সেটা তাঁদের কাছে ঠেকে ঘোর হেঁয়ালী, আর বাস্তব নাট্য পড়িলে সেটা হয় সমাজ বা ধর্ম্মের খোস্-খেয়ালী গালাগালি। একটাতে পাওয়া যায় শুধুই কুয়াশা, আর একটাতে দেখা যায় ব্যর্থ কু-আশা!

সুতরাং নাট্যের প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ বাংলা দেশে আধুনিক কালের রূপক নাট্যই বলি আর বাস্তব নাট্যই বলি, দুচারটে হাল ধরণের নাট্য দেখা দিয়াছে ; এমন আরো দেখা দিবে আশা করা যায়।

নাট্যের উৎপত্তি আমরা কখন্ দেখি?

এক দেখি, যখন সমাজের মধ্যে জীবনটা বিচিত্র ও বেগবান্ এবং সেই বৈচিত্র্য ও বেগকে প্রকাশ করিবার আবেগ মানুষের মনকে খুব কসিয়া নাড়া দেয়। সেই আবেগের সুর নাটকে যত চড়া এবং এবং তার লয়টাও নাটকে যত বিলম্বিত হয়, সাহিত্যের অন্য কোন রূপে, যেমন খণ্ড কাব্যে বা উপন্যাসে, তেমন হইতেই পারে না। তাই জীবন যখন একটা অভূতপূর্ব্ব আবেগ-নিবিড়তা কিম্বা বিস্ময়ের উত্তেজনার উচ্চ সপ্তকে লীলা করে, তখনই দেখি নাটকে তার প্রকাশ। সেই আবেগ-উত্তেজনা কতকটা থিতাইলে ও থম্‌কাইলে তবেই উপন্যাসের অবকাশের পালা দেখা দেয়। তুলনা দিতে গেলে নাটককে বলা যায় অর্কেষ্ট্রার গান, আর উপন্যাসকে বলা যায় অর্গেনের গান।

আর দেখি নাট্যের উৎপত্তি, যখন সমাজের মধ্যে সমস্যাগুলো জটিল হইয়া ওঠে এবং তাহাদের নানারকমের সমাধানের

প্রস্তাব হয়, সুতরাং আদর্শগুলোর ঘাত-প্রতিঘাত প্রবল আকারে দেখা দেয়; যখন মানুষের সহজ অখণ্ড জীবনটা সেই সব বাহিরের বিচিত্র আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া নানাখানা হইতে থাকে এবং ভিতরেও এক ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাত জাগিয়া ওঠে। কাজেই তখন নাটকের আকার ছাড়া অন্য কোন আকারেই এই সব বিরুদ্ধ বিচিত্র সমস্যা ও আদর্শকে সাকার করিয়া তোলা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু জীবনের বিচিত্রতা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি হোক্ কিংবা জীবনের সমস্যার জটিলতা হইতেই তার উৎপত্তি হোক্, নাটকে আমরা যে সব চরিত্র দেখি তারা রাস্তা-ঘাটের মানুষের চরিত্র নয়, কিম্বা যে সব চিত্র দেখি সেগুলিও প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জীবনের চিত্র নয়। হ্যাম্‌লেটের মত লোক যে পথে-ঘাটে ছদশটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বলিতেছে, To be or not to be that is the question—এটা বোধ হয় কেউ বলিবেন না। লিয়রের মত সাধারণ মানুষ যে কারণে-অকারণে সর্ব্বদাই সপ্তমের উপর অষ্টমে চড়িয়া আছে তাতো বলা যায় না।

অতএব, নাটককারকে তাঁর সুপরিচিত চরিত্রগুলোর ভিতর হইতে নাট্যকল্পিত চরিত্রকে অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ করিয়া লইতে হয়—নাট্য-উপন্যাসের চরিত্রমাত্রেই সেই জন্য এক হিসাবে abstraction। অবশ্য সেজন্য যে নাটকের চরিত্রগুলো কম "বস্তুতন্ত্র" হয়, তাহা মনে করার কোনও হেতু নাই। কেননা, বাহিরের সংসারে মানুষেরা যেখানে চলাফেরা করিতেছে, সেখানে আমরা না পাই তাদের type বা বিশিষ্টরূপ, না পাই তাদের temperament বা বিশিষ্ট প্রকৃতি। সেখানে সবাই কেমন যেন ঝাপ্‌সা—ছায়াবাজীর খেলার মত। কিন্তু সেই বাহিরের ছায়ানাট্যের অন্তরালে অন্তরতর জীবনের আসল নাট্যের লীলাখেলা যেখানে চলিতেছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই মেলে ভিন্ন ভিন্ন types, ভিন্ন ভিন্ন temperaments। কল্পনার যোগে নাটককার তাই সেই লীলানাট্যের নাটবেদিকায় যাদের দাঁড় করান, তাদের abstraction বলিলেও আসলে তারা—

"Forms more real than living man,
Nurslings of Immortality."

মানুষের চেয়ে বাস্তবতর নাহি তাহে ভুল
তারাই হচ্চে অসীমকালের সন্ততিকুল!—

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায় যে, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়াছিল, স্বামী রাগিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। এই সব কাগজী ঘটনাই যে নাট্যের সব উপযোগী ঘটনা তা নয়। অথচ শেক্‌স্‌পীয়রের "ওথেলো"তে ত স্বামী স্ত্রীকে খুন করিয়াছে; সেই খুনের বর্ণনার সঙ্গে আর খবরের কাগজের খুনের বর্ণনার কি তফাৎ? তফাৎ অনেক খানি। ঐ খবরের কাগজের বিষয়ীভূত বাইরের খুন-খারাপিটাই বর্ণনা করা যে শেক্‌স্‌পীয়রের মতলব ছিল, এমন কথা মনে করিলে শেক্‌স্‌পীয়রকে নাট্যকার হিসাবে অত্যন্ত খাটো করা হয়। ওথেলোর প্রতি

ডেস্‌ডেমোনার অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেম ঐ সন্দেহ এবং হত্যাকাণ্ডের দ্বারাই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে প্রকাশ পাইল, খুনের অবতারণার সেই জন্যেই প্রয়োজন ছিল। খুনটা কেবলমাত্র বাইরের ঘটনা—নাটকের ভিতরকার ঈর্ষা ও সন্দেহের সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের সংঘাত-বিচিত্রতাটাই আসল। সেই সংঘাতের climax দেখাইবার জন্যই খুনের অবতারণা।

তবু বোধ হয় খুন ভিন্নও সেটা দেখানো যাইতে পারিত। শেক্‌স্‌পীয়রের যুগে violent passions, উদ্দাম প্রবৃত্তির নৃত্য দেখানো নাট্যকলার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলায় কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর কোন প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা নিষিদ্ধ ছিল। এখন সাধারণতঃ বড় নাট্যকারেরা সেই প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলারই পদ্ধতিরই অনুমোদন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। মেটারলিঙ্ক বলেন, ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ হইবে "A Theatre of peace and of beauty without tears."—অশ্রুপাতহীন শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি। তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন, "A truly illumined consciousness has passions and desires infinitely less exacting, infinitely more pacific, more salutary, more abstract and more generous than an unillumined consciousness"—যথার্থ উদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলি অনুদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলির চেয়ে অনেক কম প্রবল, এবং অনেক

সুতরাং তাঁর মতে, শেক্‌স্‌পীয়রের যুগের নাট্যের ঐ সব বাহ্যিক উদ্দাম প্রবৃত্তির দৃশ্যগুলি নাট্যহিসাবে যে খুব উৎকৃষ্ট তা নয়। সে যাই হোক্, শেক্‌স্‌পীয়র পড়িবার বেলাতেও মনে রাখিতে হইবে যে, সেখানে ঘটনাটাই নাট্যের প্রধান বিষয় নয়। ঘটনার অন্তরালে মানুষের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলি, বিচিত্র ভাব ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতগুলিই নাট্যের সত্যিকারের বিষয়। এই মোটা কথাটা ভোলার দরুণ নাট্য সম্বন্ধে লোকের পক্ষে সত্য ধারণায় উপনীত হওয়া এতই শক্ত হয়।

আধুনিক রুশ নাটককার লিওনিড এন্‌ড্রেফ্ ১৯১৩ সালে রুশ দেশের একটা রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটা চিঠি ছাপেন, তাতে প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ ও ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর আইডিয়া তিনি খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যৎ থিয়েটারের তিনি নাম দেন "Panpsyche" অর্থাৎ all-soul বা all thought, অর্থাৎ আত্মাসর্ব্বস্ব বা চিন্তাসর্ব্বস্ব। তাঁর মতে action জিনিসটার থিয়েটারে কোন স্থান থাকার দরকার নাই। কেননা, আমাদের জীবনে অত্যন্ত বিষাদ বা অত্যন্ত শোকাবহ পরিণাম যে সব দেখা দেয়, বাহিরে তার প্রকাশ কতটুকু? ভিতরের দিকেই, আত্মার ভিতরকার স্তব্ধতার মধ্যেই, তার সমস্ত লীলা নয় কি? তা যদি হয়, তবে ট্রাজেডি লিখিতে গেলেই যে তাকে actionএর ভিতর দিয়া ফলাইয়া তুলিতে হইবে তার কোন অর্থই নাই। ভিতরকার জীবন-ড্রামাকে উদ্‌ঘাটিত করিতে

উদাহরণ স্বরূপ এন্‌ড্রেক্‌, বেন্‌ভেনুটো চেলেনি এবং ফ্রেড্‌রিক্‌ নীট্‌শে এই ছুটি মানুষের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। চেলেনি একজন মধ্যযুগীয় আর্টিষ্ট ছিলেন এবং ইতিহাসপাঠজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, তাঁর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য যত, এত অল্প লোকের জীবনেই দেখা যায়। কত খুন-খারাপি, পলায়ন, কত ক্ষত-ক্ষতি, কত প্রণয়-অপ্রণয় শত্রুতার কাহিনী তাঁর চরিত-কথাটিকে মুড়িয়া জুড়িয়া আছে। চেলেনির এই চরিত-কথাটি এন্‌ড্রেফের মতে পুরাণো থিয়েটারের উপজীব্য। শেক্‌সপীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই এই চেলেনি-ছাঁচে গড়া।

চেলেনির পাশাপাশি নীট্‌শে-চরিত্র যদি দেখা যায়, তবে দেখা যায় যে, যৌবন বয়সে তিনি যখন সৈনিক ছিলেন, তখন বরঞ্চ তাঁর জীবনে কিছু নড়াচড়া ছিল, কিন্তু তখন তাঁর জীবনে নাট্যরস বিশেষ কিছুই জমিয়া ওঠে নাই। কিন্তু যখন হইতে তিনি তাঁর লেখকের নিস্তব্ধ আসনে আসীন হইলেন, তখন হইতে স্তরে স্তরে তাঁর ভাব-জীবনের বিকাশ ঘটিয়াছে। যে নীট্‌শেকে আমরা জানি এবং যাঁর প্রভাব আমরা সবাই মানি, তখন হইতেই বাস্তবিক তাঁর আরম্ভ।

কিন্তু এই নিস্তব্ধ অথচ নিগূঢ় নীটশে-চরিত্র ড্রামায় বিচিত্র করিয়া ফলাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চেলেনি আঁকা বরং সহজ। action দেখানো সহজ, thought দেখানো সহজ নয়। এন্‌ড্রেফ এইজন্য তাঁর শেষ নাটকটার নাম দিয়াছেন "Thought"। তাঁর মতে হালের নাটকের প্রধান নট বা নায়কই thought। সেই হচ্চে নটরাজ।

অবশ্য এন্‌ড্রেফের মতটা হয়ত বা একবগ্‌গা বলিয়া মনে হইতে পারে—কেননা, পুরাণো নাটকের সঙ্গে নূতন নাটকের কৌলিক আত্মীয়তার বন্ধনটুকুও তিনি ছেদন করিতে চান্‌। সেটা যে সবাই চায় বা চাইবে, তার কিন্তু কোন প্রমাণ নাই। হাল নাটক বলিলে সব নাটকই যে মেটারলিঙ্কের ধরণের অথবা এন্‌ড্রেফের ধরণের, তাতো নয়। ইব্‌সেন এবং তৎশিষ্য ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ, বার্ণার্ড শ প্রভৃতির নাটক ত অন্তরঙ্গ লীলানাট্য নয়, pan-psyche নয়। এন্‌ড্রেফ অবশ্য তাদেরও পুরাণো নাটকের দলভুক্ত করিয়া থাকেন। আমার বিবেচনায় ইব্‌সেন প্রভৃতি, পুরাণো-নূতনের সন্ধিস্থানেই আছেন; অর্থাৎ action-কে তাঁরা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেন নাই, ওদিকে thoughtকেও তাঁরা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করেন নাই। সমাজের উপরকার conventionএর ঢাকাটা তুলিয়া তার ভিতরকার ফাঁকাটাকে তাঁরা দেখাইয়াছেন—কিন্তু সে ফাঁকার নিমিত্তটা কি, তাহা দেখিবার জন্য এন্‌ড্রেফ প্রভৃতির মত খুব বেশি দূর পর্য্যন্ত তলান নাই। যাই হোক্‌ আধুনিক নাটক বলিতে শুধু এন্‌ড্রেফের Black Maskers বা The Life of Man জাতীয় নাটকই ত বুঝায় না। আধুনিক নাটকের এত বিচিত্রতা ও বিশিষ্টতা আছে যে কোন্‌টাকে যে প্রাচীনের কোটায় পুরিব আর কোন্‌টাকে আধুনিকের সঙ্গে জুড়িব তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। নাটকের সব

রূপই চাই, সব রূপই ভাল—একথা বলিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। D'Annunzio ত আধুনিক প্রসিদ্ধ ইতালীয়ন নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক,তাঁর Honeysuckle পড়িলে মনে হয় যে শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেটের অনুবৃত্তিই পড়িতেছি। Hamletএর জায়গায় নাটকের প্রধান নায়িকা Audainকে বসান হইয়াছে মাত্র। সেটা কি আধুনিক নাট্য নয়? গ্রীক নাটককারগণ, শেক্‌সপীয়র, কালিদাস এঁরা কি আধুনিক নন্? শুধু যুগধর্ম্মের মাপকাটিটাই কি আধুনিকতার চরম মাপকাটি? সে মাপে যে খাটো হইল, তাহাকে আধুনিকতা হইতে ছাঁটো—এইটেই কি সাহিত্যের রায়? তা হইতেই পারে না। কেননা দেখা গেল যে মেটারলিঙ্ক, এন্-ড্রেফের সঙ্গে ইব্‌সেন, শ'দের খুব তফাৎ। আবার মেটারলিঙ্ক এন্‌ড্রেফই যে মেলেন তাও নয়! এন্‌ড্রেফের বাস্তবচিত্র মেটারলিঙ্কের কোন নাটকেই পাওয়া যায় না। সেই জন্য বলিতে হয় যে, আধুনিক নাট্যকার মাত্রেই স্বয়ম্ভু। তাঁরা সাহিত্যের আকাশে দলের নীহারিকায় বাস করেন না; তাঁরা নিজেরাই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। তাঁদের কারো কারো চারিদিকে যদি সৌরমণ্ডলের মত একটা মণ্ডলী বাঁধে, তবে বাঁধুক; কিন্তু সেই মণ্ডলীটাই আসল মণ্ডলী, এমন দুঃসাহসের কথা বলিবার সাধ্য কারো নাই।

আইরিশ নাট্যকার জে, এম্, সিঞ্জের নাট্য আধুনিক ত বটে; কিন্তু তিনি ইব্‌সেন্, হাপ্‌টম্যান জুদারম্যান্‌দের দলে একেবারেই পড়েন না। তিনি বেন্ জন্‌সন্, মলেয়ার প্রভৃতি পুরাণো নাট্যকারদের পক্ষপাতী। তাঁর নিজেরও রচিত যে কোন নাট্যই পড়া যাক্, যেমন The Well of the Saints, বা The Tinker's Wedding, কিম্বা The Play boy of the western world—তার মধ্যে কোন 'সমিস্যে' নাই, "চিন্তা" নাই, রূপক নাই। তার মধ্যে আছে শুধু বাস্তব জীবনের চিত্র ও প্রচুর হাস্যকৌতুক। The Tinker's Wedding নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন "The drama...does not teach or prove anything. Analysts with their problems and teachers with their systems are soon as old-fashioned as the pharmacopœia of Galen—look at Ibsen and the Germans—but the best plays of Ben Jonson and Moliere can no more go out of fashion than the blackberries on the hedges." অর্থাৎ ড্রামা কিছু শিক্ষা দিতেও চায় না, প্রমাণ করিতেও চায় না। সমস্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষকগণ এবং নানা "বাদের" বাদীপ্রতিবাদী মাষ্টারগণ গ্যালেনের ফার্ম্মাকোপিয়ার মত শীঘ্রই তামাদি হইয়া পড়েন—যেমন দেখ না কেন ইব্‌সেন ও জার্ম্মাণ নাট্যকারদের অবস্থা! কিন্তু ব্ল্যাকবেরির যেমন কখনও আদর কমে না, তেমনি বেনজন্‌সন, মলেয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটক কি কোন দিন বেফ্যাসান হয়?

সেই জন্য নানাদিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি অবশেষে বুঝিতেছি এই যে, এটা পুরাণো, ওটা নূতন, এটা সেকেলে, ওটা

একেলে, ওর যুগের পত্তন হইয়াছে আর এর যুগের পত্তন হইতেছে—এসব পাঁচিল-তোলা সাহিত্যবিচার বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত টেঁকা শক্ত। কেননা আধুনিকেরই মধ্যে কেউ বা পুরাণো নাট্যের, কেউ বা গ্রীক নাট্যের, কেউ বা প্যান্‌সাইকি নাট্যের, কেউবা সমস্যা-নাট্যের পক্ষপাতী। সেই জন্য আমার বিবেচনায় সব নাট্যই আধুনিক—'অধুনার' মধ্যে যাকে দাঁড় করানো যাইতে পারে এবং হার মানানো শক্ত হয়, তাই আধুনিক। তার মানে পুরাণোকে পুরাণ বলিয়া ঠেলাটা ঠিক্ নয়। পুরাণোর মধ্যে অনেক জিনিসই আছে যা চির-নূতন; আবার নূতন যাকে বলি তার মধ্যেও অনেক জিনিস থাকিতে পারে যা "চির"র অন্তর্ভুক্ত কোন কালেই হইবে না, অচিরেই লয় পাইবে।

তবে এটা ঠিক্ যে, পুরাণোই হোক্ আর নূতনই হোক্, নাটক বলিতে আমরা এদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, কোন নাটকই তাহা নয়। অর্থাৎ তাহা কেবলি বাহ্য কতগুলো প্রচণ্ড প্রবল ঘটনার রটনা মাত্র নয়। বাহ্য ঘটনা তখনি নাট্য-ঘটনা হয়, যখন নাট্যকারের কল্পনার মধ্যে তাহা নব রূপান্তর লাভ করে। গোড়াতেই এ কথার আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুন-রাবৃত্তি অনাবশ্যক। যেমন ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, There is nothing good or bad but thinking makes it so—ভাল বা মন্দ কিছুই নাই, চিন্তাতেই ভাল মন্দ হয়, তেমনি বলা যায় যে, নাট্যঘটনা বা অ-নাট্যঘটনা বলিয়া কিছুই নাই, নাট্য-কারের কল্পনাতেই কোন ঘটনা নাট্য-ঘটনা হইয়া ওঠে, কোন ঘটনা বা হয় না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

---

# রূপসী

## পাত্র ও পাত্রী *

| | | |
|---|---|---|
| বরাট | ... | মোগল-সেনাপতি |
| রূপসী | ... | মান্দার-দুর্গাধিপতি নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী |
| ভানু | ... | বরাটের বিশ্বস্ত অনুচর |
| মহম্মদ | ... | মোগল সম্রাটের পুত্র |
| মুনতব | ... | মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ |
| প্রহরীগণ | | |

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল-শিবির। বরাটের কক্ষ।

বরাট আসীন; রূপসীর প্রবেশ

বরাট

এসো রূপসী!...এ কি তোমার হাতে রক্ত যে—

রূপসী

কাঁধে একটা গুলি লেগেছিল।

বরাট

গুলি লেগেছিল! কোথায়? কখন? আমাদের শিবিরে? এইমাত্র যে বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম, সে তবে—কিন্তু কার এ স্পর্দ্ধা হল?

রূপসী

লোকটা পালিয়ে গেল।

বরাট

তোমার খুব লেগেছে? যন্ত্রণা হচ্ছে?

রূপসী

না।

বরাট

আঘাত সামান্য নয় ত! দেখি, ওযুধ দি।

রূপসী

কোন প্রয়োজন নেই! এ সামান্য আঘাত! (ক্ষণেক স্তব্ধতা)

বরাট

তুমি তাহলে এসেছ রূপসী? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই যে এসেছ, এ কি তোমার নিজের ইচ্ছায়?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

কেউ জোর করে পাঠায় নি?

রূপসী

না।

বরাট

জানো, কি সর্ত্তে এসেছ তুমি?

রূপসী

জানি।

বরাট

তবু এসেছ! আমি বিস্মিত হচ্ছি।... অচঞ্চল মনে এসেছ তুমি?

রূপসী

এমন সর্ত্ত ছিল না ত সেনাপতি যে আমার মনের চাঞ্চল্যটুকু সেখানে রেখে দিয়ে আসব।

বরাট

তোমার স্বামী—দুর্গাধিপতি আসবার অনুমতি দিয়েছে?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

ভেবে দেখ নারী, এখনো সময় আছে। ইচ্ছা হলে তুমি ফিরে যেতে পারো—

রূপসী

না।

বরাট

ফিরবে না! আশ্চর্য্য! জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন এ সর্ত্তে তুমি রাজী হলে?

রূপসী

কেন! না-হলে ক্ষুধার জালায় একটা বিকাশমান জাতি সমূলে ধ্বংস হয়! আমার স্বামীর কীর্ত্তি অকালে লোপ পায়!

বরাট

এ-ছাড়া আর কোন কারণ নেই? এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে, আপনাকে এভাবে বলি দিতে—

রূপসী

এ-ছাড়া আর কোন কারণ নেই,

সেনাপতি!...কিন্তু এত কৈফিয়ৎ দেবার সর্ত্ত বোধ হয় ছিল না!

বরাট

রাগ করো না। আমি শুধু আশ্চর্য্য হচ্ছি! এত উচুঁ প্রাণ!...কিন্তু এখনো আমার সন্দেহ হচ্ছে, একজন সাধ্বী এমনভাবে—

রূপসী

বলেছি ত আমি তর্ক করতে আসিনি, সেনাপতি। তা-ছাড়া কোন কথার জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

বরাট

এমন পতিগত-প্রাণা! আশ্চর্য্য!

রূপসী

নারীর হৃদয় নিয়ে ব্যঙ্গ করো না, সেনাপতি! আমার অন্তরাত্মা জানে—

বরাট

অন্তরাত্মা! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!...যাক্, আসবার সময় আমাদের শিবিরের সম্মুখে দেখেছ, গাড়ী-ভরা খাদ্য, গাড়ী-ভরা অস্ত্র-শস্ত্র, সব সজ্জিত রয়েছে—?

রূপসী

দেখেচি।

বরাট

এ-সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মান্দারে পাঠানো হবে। আমার সঙ্কেত পেলেই ওরা রওনা হবে।...কিন্তু ভেবে দেখ নারী, এখনো সময় আছে—ইচ্ছা হলে তুমি ফিরতে পারো—

রূপসী

আমি সর্ত্ত রক্ষা করতে এসেছি, সেনাপতি, চাতুরী করতে আসিনি।

বরাট

তুমি আমায় বড়ই বিস্মিত করেছ! এ সমস্ত একটা প্রহেলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে! কিন্তু সে সব কথা থাক্!...যখন এসেছ...বেশ, (বংশীধ্বনি করিল) এইবার ওরা রওনা হোক্! আহার আর অস্ত্র যা পাঠানো হচ্ছে, মান্দার তাতে প্রাণ পাবে, নব বলে বলী হবে, যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করবে!... তুমি চোখে দেখতে চাও—গাড়ী রওনা হল কি না?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

তবে এসো এই শিবিরের দ্বারে। (পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল) ঐ দেখ—

[অদূরে অস্পষ্ট আলো দেখা গেল,—ও সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আহার্য্যে-ভরা অসংখ্য গাড়ী মান্দার-অভিমুখে চলিতে সুরু করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল]

মান্দার আজ তার জঠর-জ্বালা ভুলবে! কাল প্রত্যূষে নব বলে বলী হয়ে মান্দার দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তিতে জেগে উঠবে!...সুগভীর জয়ের উল্লাসে সারা মান্দার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে—আর তার জন্য ধন্যবাদ দেবে সে কাকে, জানো? তাদের রাণী বিজয়িনী রূপসীকে!...দেখলে? এখন তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

এসো তবে, রূপসী। এইবার এইখানে এসে বসো। যদিও তোমার যোগ্য স্থান এখানে নেই—এ শিবির—তবু এই জানলার পাশে বেদীর উপরে এসে বসো।...বেশ শান্ত রাত্রি!

মৃদু জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে—এইখানে বসো। জ্যোৎস্না তোমার সারা অঙ্গে লুটিয়ে পড়ুক! জ্যোৎস্নার ফুটে ওঠা আজ সার্থক হোক্।...কিন্তু হাঁ,...তোমার সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই ত? বুকে ছুরি লুকিয়ে রাখনি?

রূপসী

না।

বরাট

বিষ?

রূপসী

এত ভয়! সন্দেহ হলে তল্লাস নিতে পারো।

বরাট

সন্দেহ? না। আর ভয়? মৃত্যুর ভয় বরাট কখনো করে না। তবে—তোমার জন্যই সতর্ক হতে চাই—

রূপসী

আমার জন্য ভয় করবার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে আমার চেয়ে আমার মান্দারের মূল্য অনেক বেশী—

বরাট

এ তোমার ভুল, রূপসী! যাক্, আমি মিছে তর্ক করতে চাই না! এসো—এই জানলার পাশটিতে এসে বসো—বাহিরে জানলার ধারে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে, পাহাড়ী ফুল—সন্ধ্যার বাতাসকে মৃদু গন্ধে আকুল করে তুলেছে! এ গন্ধ আমার বড় ভাল লাগে—এ গন্ধে মন অতীতের অনেক হারানো সুখের স্মৃতি কুড়িয়ে পায়!...(রূপসী জানালার কাছে আসিয়া বসিল)...ঐ দেখ, আকাশে একটুখানি ছোট্ট চাঁদ উঠেছে—কি শান্ত জ্যোৎস্না চারিধারে ঢেলে দিয়েছে! তোমার মুখে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—সুন্দর দেখাচ্ছে! (রূপসী মুখ নত করিল; বরাট কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে রূপসীর পানে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল) হাসি—(রূপসী চমকিয়া উঠিল) মনে পড়ে, হাসি? সে আজ কত—কত দিনের কথা...সেই ঝরণার ধারে ছোট্ট কুটীর—কুটীরের পাশ দিয়ে ছোট্ট রেখা বয়ে তরল রূপার মত জলের ধারা তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছিল—আশে-পাশে গাছের ছায়ায় সেই পাখীর গান—দূরে রাখালদের ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছিল, খেলা করছিল!...উঃ, তারপর সারা জীবনের উপর দিয়ে আমার কি ঝড় বয়ে গেছে—নৈরাশ্যের বাজ কি সে হুঙ্কার দিয়ে ফিরেছে—সমস্ত প্রাণ আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—কিন্তু আমার হাসিকে তারা কৈ কখনো এ বুকের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি ত!

রূপসী

ও-নাম কি করে জানলে? কে তুমি?

বরাট

আমি! তুমি অবাক হচ্ছ, হাসি, আমায় চিনতে পারছ না?...ঐ নাম শুনে কাকেও আজ তোমার মনে পড়ছে না? কি করে চিনবে তুমি! ফুলের মত তার কোমল শুভ্র মনই তুমি দেখেছিলে, আর আজ! ফুল নেই, তার একটি দলও নেই—আছে শুধু পাষাণ, পাষাণ, কঠিন পাষাণ, হাসি!...কিন্তু বিশ্বাস করো, এ পাষাণের গায়ে যদি কোনদিন কোন অক্ষর ফুটে উঠে আজ-পর্য্যন্তও অটুট থাকে ত সে সেই অতীতের স্মৃতি—হাসি, তোমারই স্মৃতি!

রূপসী

আমায় চেনো তুমি? আমার সে ছেলেবেলাকার নাম ধরে ডাকলে! কিন্তু—

বরাট

আশ্চর্য্য হয়ো না, হাসি…সারা জীবন ভরে ধ্যান করে আসছি আমি! নিজের ধ্যানের মূর্ত্তিকে মানুষ কখনো ভুলতে পারে?…এখনো তুমি চিনতে পারছ না?

রূপসী

(সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া) না। তুমি—?

বরাট

আমি কিন্তু ভুলিনি ত, মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিনি! হতভাগা আমি একটা ঢেউয়ে কূল ছেড়ে কোথায় কতদূরে সরে পড়লুম—তারপর আজ আবার আর-এক ঢেউয়ে যদি সেই কূলেরই কাছে এসে পৌছুলুম, ত সে কূলে আমার ঠাঁই নেই!·বারো বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আমার, কিন্তু তুমি ঠিক তেমনি আছ, হাসি, এতটুকু তফাৎ নয়, সেই নির্ম্মল সরল দৃষ্টি, সেই জগৎ ভোলানো মূর্ত্তি—

রূপসী

কে তুমি? পরিচয় দাও।

বরাট

মনে পড়ে হাসি, সেই তোমাদের কুটীরের সামনে ছোট্ট বাগানটুকুর কথা? একদিন বিকেলে এক যুবা সেই বাগানে গাছে ফল পাড়তে উঠেছিল, আর তুমি ঝরণার ধারে বসে কাঁদছিলে, ঝরণার জলে তোমার আংটি পড়ে গেছল—তুমি খুঁজে পাচ্ছিলে না। যুবা গাছ থেকে নেমে তোমার কাছে এল, তারপর ঝরণার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার আংটি খুঁজে তুলে আনলে, তোমার হাতে সে আংটি সে পরিয়ে দিলে! তোমার জল-ভরা ডাগর চোখদুটি তুলে তুমি তার পানে চেয়ে দেখলে…তার পর—তার পর, হাসি—

রূপসী

সে মুঞ্জা—

বরাট

হাঁ, মুঞ্জা। মনে আছে? সেই মুঞ্জাই বরাট।

রূপসী

মুঞ্জা! তুমি মুঞ্জা। (বরাটের পানে চাহিয়া) হাঁ, মুঞ্জাই বটে! কপালের উপর সেই তিল! ঠিক—আমি লক্ষ্য করিনি, তাই চিনতে পারিনি—

বরাট

এখন ত চিনেছ, হাসি? (হাসিল)

রূপসী

হাঁ, এবারে চিনেছি। তুমি বীর, অনেক নরহত্যা করেছ তুমি, কিন্তু তোমার হাসিটুকু এখনো তেমনি শিশুর মতই সরল রেখেছ ত…এ কি? তোমার চোখের নীচে রক্ত! অতখানি কেটে গেছে—

বরাট

ও কিছু নয়—সামান্য একটু চোট লেগেছে মাত্র!

রূপসী

না, না, সামান্য নয়! এসো, আমি বেঁধে দি—(নিজের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া ক্ষত-স্থানে বাঁধিয়া দিল) এ কাজ তোমারই জন্য শিখতে হয়েছে। এ যুদ্ধে এই হাতে অনেক আহতের শুশ্রূষা করতে হয়েছে।…বারো বৎসর—বললে না?…হাঁ, বা-রো—ব-ৎ-স-রই

বটে! অনেক দিন, তবু মনে হচ্ছে, যেন সে কালকের কথা! সেই বাগান, সেই ঝর্ণা,—বাবা—মা—সব যেন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! মানুষের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে—ওঃ, মানুষ এত ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! আজ নতুন করে সমস্ত অভাব আমার মনে জেগে উঠছে।...সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে, সেদিন ভারী গরম পড়েছিল, এতটুকু বাতাস বয়নি, গাছপালাগুলো অমনি-যেন কঠিন নিশ্চল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তুমি একটা বরা মেরে পিঠে বয়ে সেটাকে নিয়ে এলে—

বরাট

মনে পড়েছে!...শুধু সেইটুকুই মনে পড়েছে? আমার কিন্তু আরো মনে পড়ছে, বরা দেখে তুমি কি বলেছিলে। তার পর আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দিলে! সেদিন তুমি একটি ফুলের মালা গেঁথেছিলে, মনে আছে, হাসি? সেই মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে তুমি বললে, "বিজয়ী বীরের পুরস্কার এই!"

রূপসী

মনে আছে। তুমি কিন্তু সে মালা তখনি গলা থেকে খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিলে, বললে, ফুল পুরুষের জন্য নয়, তাতে ফুলের অপমান হয়! ফুলের সৃষ্টি হয়েছে, মেয়েদের রূপশ্রীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য—...কিন্তু তার পরে হঠাৎ যে তুমি কোথায় একদিন চলে গেলে—

বরাট

কাশ্মীরে। পথে বাবার মৃত্যু হল, মাও শোকে প্রাণ দিলেন। পথ হারিয়ে আমি গান্ধারের দিকে চলেছিলুম—একদল পাহাড়ী ডাকাতের হাতে বন্দী হলুম। যথাসর্ব্বস্ব তারা কেড়ে নিলে; আমার মৃত্যু-ভয় ছিল না দেখে জীবন নিলে না। তার পর সঙ্গী করলে। তাদের দলে মিশে লুঠপাট দাঙ্গা-হাঙ্গামে রীতিমত দড় হয়ে উঠলুম। তার পর যখন বন্দী দশা ঘুচল, নজর-বন্দীর হাত এড়ালুম, তখন একদিন প্রথম সুযোগ পেয়ে তাদেরই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বরাবর আমাদের সেই গাঁয়ে ফিরলুম। সে চার বৎসর পরে। এসে দেখি, তোমাদের কুটীরের চিহ্নও নেই! শুনলুম, তোমার বিধবা মা মারা গেছেন। তোমার সন্ধান দেশের লোক কেউ দিতে পারলে না। তার পর কত দিন যে তোমার খোঁজ করে বেড়িয়েছি, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর! কেউ বললে, তোমায় কারা চুরি করে নিয়ে গেছে—কেউ বললে, তুমি বেঁচে নেই! আরো অনেকে অনেক কথা বললে, সব শুনলুম—শুনে মানুষের উপর কেমন রাগ হল। ভাবলুম, মানুষ আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত, এত মত্ত! এক অসহায় বালিকার কোন সন্ধান রাখলে না! আচ্ছা, এই মানুষকে একবার দেখে নেব। মোগল তখন মানুষ মারবার কল পাতছিল। আমি এসে সেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করলুম! মোগল আমার দুঃসাহস, আমার কৌশল দেখে আমায় তারিফ করলে—তাই আজ আমি মোগল সেনার একজন অধ্যক্ষ!...তার পর মান্দার লুঠ করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধ কৃষকের কাছে মান্দারের রাণীর পরিচয় পেলুম।

ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মান্দারের দিকে মন আরো আকৃষ্ট হল। আর সেই জন্যই জয় করবার অবসর পেয়েও মান্দারকে আমি জয় করিনি। মান্দার জয় করতে আর আমার ইচ্ছা ছিল না—কোনমতে মান্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মান্দারের রাণীকে যদি একবার দেখতে পাই, এই হল আমার সাধ—

রূপসী

কিন্তু তবু আমিই যে হাসি, এ তুমি এত শীঘ্র চিনতে পারলে! বারো বৎসর পরে দেখা—

বরাট

বারো বৎসর ত সামান্য, হাসি। যুগ-যুগান্তের পরে দেখা হলেও আমি তোমায় চিনতে পারতুম। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর সঙ্গে মিশে থাকলেও আমি তোমায় চিনতে পারতুম। বললুম ত, হাসি, বারো বৎসর অনেক অত্যাচার করেছি আমি। পশু থেকে নিজেকে এতটুকু তফাৎ করিনি—তবু এই বারো বৎসরে এমন দিন ছিল না, যেদিন তোমার এই মূর্ত্তি না ধ্যান করেছি! আমার বারো বৎসরের ধ্যানের মূর্ত্তি—তাকে আমি চিনতে পারব না—এ কি সম্ভব, রূপসী?... বারো বৎসর তোমার সন্ধানে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, কত বন ঢুঁড়েছি, পাহাড়ে উঠেছি, খর-স্রোতা নদী সাঁতরে পার হয়েছি। কিন্তু তোমায় পাই নি! নিজের দেশ নেই, ভুঁই নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শুধু তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। ভক্ত যেমন করে তার ভগবানের খোঁজ করে, তেমনি করে খুঁজেছি। কোথাও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন একবার মনে হল, আর বাঁচা তবে কিসের জন্য? কিসের আশায়? নিজেকে হত্যা করতে তলোয়ার তুলেছি, উদ্যত তলোয়ার হাত থেকে পড়ে গেছে। তখন মনে হল,—না, মরবো না। মনের মধ্যেও কে যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, "দেখা হবেরে, দেখা হবেই!"

রূপসী

তুমি উন্মাদ।

বরাট

সত্যই উন্মাদ, হাসি। তোমার রূপে উন্মাদ! তোমার প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু তুমি—তুমি—

রূপসী

এ-সব কথা বলো না, মুঞ্জা—আমি অপরের স্ত্রী, সে কথা ভুলে যেয়ো না—

বরাট

সে কথা ভুলি নি, হাসি।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কি বেশ মনের সুখে আছ? বল, বল, তোমার প্রাণে কোন দুঃখ, কোন অভাব—?

রূপসী

না, কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব আমি জানি না। স্বামীর নিবিড় স্নেহে-প্রেমে আমার চিত্ত ভরপুর। তাঁর ভালবাসা অগাধ, করুণা অসীম।

বরাট

বড় বিলম্ব করেছিলুম, হাসি, বড় বিলম্ব। ...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার স্বামীকে কি যথার্থই এমনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালবেসেছ? বল, বল—

রূপসী

বাসিনি ? মুঞ্জা, তোমরা পুরুষ, বড় ভুল বিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে তোমরা শুধু মিথ্যার রাশি জড় কর ! নিজের দুঃখ তোমরা নিজেরা গড়ে তোলো !···মা মারা গেলেন,—অসহায় আমি অকূল পাথারে পড়লুম। সে বিপদ থেকে মাথা তোলবার আগেই আবার অন্য বিপদ সুরু হল। বলবান পুরুষ বলে আমায় লুণ্ঠন করতে উদ্যত হল ; রূপের ভিখারী মিনতি জানালে ; দুর্বৃত্তেরা হুঙ্কার দিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। শেষে এক মোগলের লোলুপ দৃষ্টি শ্যেনের মত আমায় আক্রমণ করলে। নিরাশ হয়ে বর্ব্বর একদিন আমায় নির্জ্জনে অসহায় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। চারিধার অন্ধকার দেখলুম—চোখ মুদে ভগবানকে ডাকলুম—স্বামীর মূর্ত্তি ধরে আমার ভগবান সেদিন আমায় দেখা দিলেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তারপর আমার পরিচয় নিয়ে তিনি আমায় অসীম সম্পদের অধিকারিণী করলেন, পথের ভিখারিণীকে রাণীর ঐশ্বর্য্য দিলেন। স্বামীর প্রেমে, স্বামীর স্নেহে আমি স্বর্গসুখ পেলুম। সব শোক ভুললুম। অতীতের বেদনা জীবন থেকে নিমেষে মুছে গেল। তিনিই আমায় পরিহাস করে বললেন, 'তুমি শুধু হাসি নও, রূপের হাসি' ! তিনিই আমার নাম দিলেন, "রূপসী—"...সেই-অবধি শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তির মধ্যে আমি ডুবে আছি। এ যে কি সুখ, কি তৃপ্তি, তা বোঝাবার আমার ভাষা নেই, মুঞ্জা। শুধু এইটুকু বোঝো যে এর স্পর্শে আমার সমস্ত অতীত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বরাট

আর সেই-সঙ্গে সেই বাগান, কুটীর, ঝর্ণা, মুঞ্জা, সব তুমি ভুলে গেলে !

রূপসী

তাতে কি কিছু অন্যায় হয়েছে, মুঞ্জা ? —আমার দেবতা স্বামী, তাঁর অমন ভালবাসা—এতেও যে নারী অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার দুঃখের সীমা নেই ! সে ত দুর্ভাগিনী !

বরাট

( স্তব্ধ রহিল ; কোন কথা কহিল না )

রূপসী

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মুঞ্জা, হঠাৎ এ সর্ত্ত তুমি কেন করলে ? একজন নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে টেনে এনে, তার সব গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে—

বরাট

ভুল করেছি, হাসি, অন্যায় করেছি। আমি ভেবেছিলুম, আমার মত তুমিও বুঝি সেই অতীতকে আঁকড়ে বসে আছ ! তাই দুজনেই সুখী হব, এই ভেবে আমি আমারও সমস্ত ভবিষ্যৎকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলেচি।

রূপসী

বুঝেচি, এইজন্য মোগলেরও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি।

বরাট

মোগলের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ! সে আমি গ্রাহ্যও করি না। বে-ইমান মোগলই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে—এ আমি বুঝেছিলুম, তাই আমি হাসির স্বামীকে সাহায্য করব, স্থির করেছিলুম—ভালই করেছি, হাসি। যে

দেশের জন্য আমার সেই হাসি মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে নিতে এতটুকু হঠেনি, অকম্পিত পদে মোগলের শিবিরে চলে এসেছে, সেই-হাসির সেই-দেশকে আমি প্রাণ দিয়েছি, এ কি কম সুখ আমার!

রূপসী

আমারই জন্য তুমি এতখানি ত্যাগ করেছ! নিজের একমাত্র অবলম্বনটুকুকে তুমি পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেছ!

বরাট

কিন্তু কি সুখ পেয়েছি আমি! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলে ফেলতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, হাসি।

রূপসী

মুঞ্জা, ভাই, তুমি মহৎ!

বরাট

না হাসি, দুর্বৃত্ত নরাধম বর্ব্বর আমি। তাই আমি বুঝে দেখিনি, তোমায় আসতে বলে কত বড় অন্যায় করেছি! তোমার সর্ব্বনাশ করেছি—

রূপসী

সর্ব্বনাশ!

বরাট

নয়? এখন তুমি ফিরে গেলে তোমার স্বামী আবার তেমনি হাসি মুখে তোমায় বুকে তুলে নেবে কি? সারা দেশ—তুমি জানো না, হাসি, এ বড় লক্ষ্মীছাড়া জায়গা, এই পৃথিবী! নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ হেথায় দিবারাত্রি ষড়যন্ত্র করছে, কি করে তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখবে! তুমি জানো না নারীর প্রতি এখানে পুরুষের কি দারুণ অবজ্ঞা, গভীর অবিশ্বাস! তুমি ভাবো তোমার স্বামীর বিশ্বাস হবে যে—তুমি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক—?

রূপসী

আমার স্বামীর বিশ্বাস! কেন হবে না? নিজের মুখে আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললে—

বরাট

তাই হোক্! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

রূপসী

আর তুমি? তোমার কথা ভাবছ না?

বরাট

আমার কথা! সে আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি করব!...যাক্, একটা কথা, হাসি, তুমি যখন বরাটের শিবিরে আসতে উদ্যত হলে, তখন জানতে কি, কোথায় আসছ—কার কাছে আসছ?

রূপসী

না।...অনেক কথা শুনেছিলুম...কেউ বললে, বরাট একটা দুর্বৃত্ত বর্ব্বর—আবার কেউ বললে, সে এক তরুণ যুবা, অদ্ভুত রকমের খেয়ালী—

বরাট

কিন্তু তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর আমায় দেখে গেছলেন—তিনি কিছু বলেন নি?

রূপসী

না।

বরাট

তুমি নিজেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি? জানবার কৌতূহল হয়নি?

রূপসী

না, জানবার প্রয়োজনও মনে করিনি। সর্ত্ত-মত আমায় আসতে হবে, এইটুকু শুধু বুঝেছিলুম! না হলে দেশ-রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।

বরাট

কিন্তু আসতে তোমার বুক কাঁপেনি? পা টলেনি? এই সন্ধ্যায় এক অপরিচিত দুর্বৃত্তের শিবিরে, শত্রুর শিবিরে—সুন্দরী কিশোরী তুমি একলা আসছ—

রূপসী

বলেছি ত—সর্ত্ত ছিল, আমায় আসতেই হবে।

বরাট

তারপর যখন আমায় দেখলে, তখন কি মনে হল?

রূপসী

কিছুই মনে হয়নি।

বরাট

এখন কি মনে হচ্ছে? যদি আমি কোন অত্যাচার করি—?

রূপসী

অত্যাচার! তুমি করবে? (হাসিয়া) আমার কোন ভয় নেই, মুঞ্জা—কাকেও ভয় নেই! মানুষ মানুষের উপর খামখা অত্যাচার করবে কেন! বিশেষ তুমি! তুমি ত কোন অত্যাচারই করতে পার না।

বরাট

পারি না!—কেন?

রূপসী

তুমিই ত বলেছ, আমায় তুমি ভালবাস!

বরাট

হায় নারী, এত সরল, এত নির্ম্মল তোমার মন!...পুরুষকে তুমি জানো না, তার প্রবৃত্তি কত কুৎসিত, তার মন কত কদর্য্য—

রূপসী

মুঞ্জা, মিথ্যা আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ—তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমার মন্দ করতে কখনো পার না—

বরাট

ঠিক বলেছ—হাসি,—আমি তোমার মন্দ করতে পারি না। তোমায় ভালবাসি, তোমায় সুখী দেখলেই আমি সুখ পাই।...কিন্তু না, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। চল, এই রাত্রির গোপনতার মধ্য দিয়ে তোমায় দুর্গে রেখে আসি—তোমার স্বামীকে বলো, বরাট তার বন্ধু, ভাই, আর বলো,—এ যুদ্ধে মান্দার জয়ী হবেই।

রূপসী

তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

বরাট

বিশ্বাসঘাতকতা! বরাট বিশ্বাসঘাতক নয়। তা-ছাড়া কার বিশ্বাস সে ভাঙ্গবে? মোগলের। সে ত সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে—মোগল যেদিন আমায় অবিশ্বাস করেছে, সেই দিনই যে মোগলের নিমকের দেনাও আমি শোধ করেছি—

রূপসী

মোগল বলী।

বরাট

বরাটও মোগলের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী—

রূপসী

নিজের ভবিষ্যৎ—মোগলের রোষ-রক্ত আঁখি—

বরাট

বরাট থোড়াই তার তোয়াক্কা রাখে! …যাক, এসো হাসি, আর দেরী নয়। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। (নেপথ্যে কোলাহল—বন্দুকের শব্দও শুনা গেল) ও কি—

(শশব্যস্তে ভানুর প্রবেশ)

ভানু

সেনাপতি—

বরাট

খবর কি, ভানু?

ভানু

শাহজাদা পালিয়েছেন—সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তারা আপনার বিরুদ্ধে উদ্যত হচ্ছে। আপনার অনুচর কৃকব শাহজাদাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

বরাট

এত অকস্মাৎ—?

ভানু

মুলতব সাতশ' ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁচেছে—

বরাট

দেখ হাসি, মোগলের বিশ্বাস দেখ! মোগলই আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা শেখাচ্ছে। এর প্রতিফলও তাকে পেতে হবে।…এখন এসো, শীঘ্র এসো—

রূপসী

তুমি কোথায় যাবে?

বরাট

মান্দার দুর্গে। ভানু, তুমিও আমার সঙ্গে এসো—যদি পথে মোগল আমায় আক্রমণ করে, তাহলে তুমি এই মান্দারের রাণীকে—আমার ভগ্নীকে সসম্মানে দুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসবে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঐ ঢাকা পড়েছে, বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলেছে।

রূপসী

মান্দারও যে তোমার শত্রু, মুঞ্জা। দুধারে দু'দল শত্রুর মধ্যে পড়ে তুমি—তুমি কি করবে?

বরাট

আমার জন্যে ভেবো না—এ পৃথিবীর কোলটুকু বড় ছোট যায়গা নয়—আমার ঠাঁই আমি কোনখানে করে নেবই। আর না হয়,—

ভানু

কিন্তু শিবিরের সামনেই মুলতবের আস্তানা—

বরাট

বেশ—তবে এই শিবির ফুঁড়েই আমরা পথ করে নেব। এসো হাসি।

রূপসী

না, তোমার সঙ্গে যাব না আমি। তোমাকে বিপদে ফেলে—

বরাট

হাসি, এ-সময় অবুঝ হয়ো না। তুমি আমার কৌশল জানো না—যা বলচি, শোনো, এসো—নাহলে দুজনের কেউ রক্ষা পাব না।

রূপসী

তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বরাট

যাব।

রূপসী

তবে এসো—কিন্তু একটা কথা, বল, ফিরে আসবে না? মান্দারেই থাকবে?

বরাট

তোমার স্বামীর মত হবে?

রূপসী

আমি তাঁকে সব কথা খুলে বলব।

বরাট

তিনি বিশ্বাস করবেন?

রূপসী

নিশ্চয়।

বরাট

যদি না করেন—?

রূপসী

যদি না করেন!…না, না, করবেন বৈ কি, নিশ্চয় করবেন—আমি নিজে সব কথা বলব—এসো—

বরাট

না, মান্দারের দ্বারে শুধু তোমায় পৌঁছে দেব—মান্দারে পা দেওয়া হবে না, হাসি—

রূপসী

কেন, মুঞ্জা—তোমার ভয় কি?

বরাট

ভয়! তোমারই জন্য ভয়।

রূপসী

আমার জন্য?

বরাট

হাঁ, তোমারই জন্য। আমায় তোমার সঙ্গে দেখলে—

রূপসী

সে ভয় ত সমানই আছে—আমি তোমার সঙ্গেই ফিরি কি একলাই ফিরি—নয় কি? ভয় তোমারই জন্য। কিন্তু তবু আমি সে ভয় করি না। বিপন্ন মান্দারকে তুমি তার বড়-দুর্দ্দিনে রক্ষা করেছ, নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়েও তাকে রক্ষা করেছ, মান্দার অকৃতজ্ঞ নয়, আজ তোমার দুর্দ্দিনে সেও তোমায় রক্ষা করবে।…তাকে ঋণী করে রেখো না, মুঞ্জা,—এসো, মান্দারের রাণী তোমায় নিমন্ত্রণ করছে—এসো তুমি।

বরাট

যাব?

রূপসী

হাঁ। না যাও, আমিও যাব না।…যদি আমায় ভালবাস, মুঞ্জা—এসো, আর বিলম্ব করো না—ঐ, ঐ শোনো চীৎকার—শীঘ্র এসো—

বরাট

ভানু, আমরা শিবির ছাড়লে তুমি শিবিরে আগুন লাগিয়ে দাও, তারপর অলক্ষ্যে আমাদের পিছনে এসো। যদি আমায় আক্রমণ করে, তাহলে মোগলকে আমি রুখে রাখব, তুমি ততক্ষণে রাণীকে মান্দারে পৌঁছে দিতে পারবে।

রূপসী

মুঞ্জা, ভাই, এসো—

[ বরাটের হাত ধরিয়া রূপসী বাহিরে গেল; ভানু তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল ]

( মহম্মদ ও মুলতবের প্রবেশ; সঙ্গে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী )

মহম্মদ

কোথায় গেল?

ভানু

আমি এসে দেখি, শিবিরে কেউ নেই।

মুলতব

কেউ নেই! এ তোর শয়তানী বান্দা! শাহজাদা, এইই তাহলে এসে সংবাদ দিয়েছে। মূর্খ—

মহম্মদ

নিমকহারাম—

মুলতব

বল্, তোর বিশ্বাসঘাতক মনিব কোথায়? কোন্ দিকে গেছে?

ভানু

জানি না।

মহম্মদ

জানিস্ না? মুলতব, একে বন্দী কর। সাঁড়াসি দিয়ে এর জিভ টেনে ধর। দেখি, কতক্ষণ ও না বলে চুপ করে থাকে।

ভানু

বেশ! তাই হোক্।

( প্রহরীগণ ভানুকে বন্দী করিল )

মহম্মদ

শিবিরে-শিবিরে সন্ধান কর।

ভানু

( স্বগতঃ ) যাক্, অনেকখানি সময় পাওয়া গেল। বাঃ, এমন হবে, তা ত ভাবি নি কখনো। সেনাপতি যদি খবরটা পেতেন—আহা—

( ক্রমশ )

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# আর্টের সেকাল-একাল

১

সেকাল ছিল আর্টের কাল; কলা-লক্ষ্মীর পাদপদ্মে সেকালের ভক্ত রসিকরা যেমন চিত্ত ঢালিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিল, একালে তেমন তন্ময়তা বড় আর দেখা যায় না। আর্ট লইয়া এখন কথার ছটা তর্কের ঘটা বাড়িয়াছে, কিন্তু ফিডিয়াস বা মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল বা রেমব্রাণ্ডের মতন মহা শিল্পী আর ত কৈ জন্মাইল না! শিল্পীকে লোকে এখন অকেজো ঠাওরায়, আর্টের নামে মাতব্বররা এখন মুরুব্বি-আনা-চালে হাসি-ঠাট্টার ফোয়ারা খুলিয়া দেন! এখনকার চালচলন, ধরন-ধারন, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরকন্নার জিনিষপত্তর, বাড়ী-ঘর সমস্তই কেমন-যেন শ্রী-শূন্য, ছন্দশূন্য, মোটা-রকমের,—কোন-কিছুরই ভিতরে রস-কশের ছিটেফোঁটাটি নাই, কোনগতিকে কাজ চলিয়া গেলেই আমরা এখন আঃ বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। সুদূর অতীতের কলাবিদরা জ্ঞানে ও সভ্যতায় আমাদের মত এতটা অগ্রসর ছিলেন না; আজকালকার অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রও এ-দিকে তাঁহাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে অতীতের গুণীদের কাছে আমরা প্রায় শিশুর মত বলিলেও চলে। এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতাতেও ক্রমোন্নতির বিধানে আমরা যে গতযুগের কলা-

বিদদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিতেছি না, শিল্পজ্ঞানহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের এই রাজধানী ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নগর কলিকাতায় শত শত প্রাসাদ রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের একটিও শ্রী-ছাঁদে ও গঠন-সুষমায় দিল্লী বা আগ্রার অনেক পুরাতন, ভাঙ্গাচোরা ও ছোট-খাটো বাড়ীর কাছে ছায়ার মতও দাঁড়াইতে পারে না। বাঙ্গালী ধনকুবেররা বৎসরে বৎসরে অজস্র অর্থব্যয়ে নূতন নূতন বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন; কিন্তু তাহাদের ভিতরে কেহ কি জাতীয় আদর্শ বা রুচির চিহ্নমাত্র দেখিতে পায়? উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতে, দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরে প্রাচ্য শিল্পের কত সুন্দর আদর্শ লোকের অবহেলায়, কালের মহিমায়, অজ্ঞানের অজ্ঞতায় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে; সে-সব অতুল আদর্শ কেন আমাদের চোখে পড়ে না? আমরা হয় ত বাড়ীর থামগুলো গড়ি গ্রীক আদর্শে, উপরটা গড়ি রোমীয় আদর্শে, ভিতরটা গড়ি প্রাচ্য আদর্শে; আমাদের হাতে পড়িয়া সৌন্দর্য্যের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে! আমাদের নিজেদেরও জাতীয়তা নাই—শিল্পেরও তাই।



প্রাচীন গ্রীশের একটি পাত্র

সেকালের লোকরা আর্টকে যে কতটা ভালবাসিত, ভাষায় তাহার সবটা খুলিয়া বলা যায় না। বড় বড় জিনিষের কথা ছাড়িয়া দি, সামান্য যে ঘটি, বাটি, গেলাস, থালা, কুঁজো ও গামলা প্রভৃতি জিনিষ, সেকালে সেগুলি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পে এমনি চোখজুড়ানো ছিল যে, তাহাদের একটিকে হাতে পাইলে আপনাকে ধন্য মনে হয়। গ্রীশ, রোম, মিশর ও ভারতের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যত্র-তত্র এই শ্রেণীর সুন্দর আসবাব দেখা যায়। কাশীর সারনাথ অনেক বাঙ্গালীই দেখিয়াছেন; সেখানে মাটির তৈয়ারি ছোট-বড় অগুন্তি পাত্র প্রভৃতির প্রত্যেকটিই আমার কথার প্রমাণ দিবে।

আর্ট, জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়াই সেকালের লোকরা আর্টকে জীবনের সহচর করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষের কঠোর বাস্তব জীবনকে কোমল ও সুন্দর করিয়া তোলে, আর্ট। সংসারের ঝালাফালায় আমরা যখন বড় জ্বালাতন হইয়া উঠি, পৃথিবীর গোলামী

সারিয়া আমরা যখন দু-দণ্ড ধীরে-সুস্থে জিরাইয়া লইতে চাই, অবসন্ন জীবনে নূতন উৎসাহ ও নূতন কর্ম্মপ্রেরণা আনিতে চাই, আর্ট আসিয়া তখন আমাদের চিত্তবিনোদন করে, তাহার সোণার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া তখন আবার আমাদের এলানো প্রাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তখনকার ধনী-নির্ধন সকলেই তাই ললিত কলার কদর জানিতেন। শিল্পের প্রতি এই গভীর সহানুভূতি বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পম্পি, প্রাচীন রোমের একটি তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র সহর—ভিসুভিয়াসের অগ্নিবৃষ্টিতে ৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সহরটি ভস্মস্তূপে ডুবিয়া যায়,—সংপ্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাহাকে আবার উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, এই সেকেলে সহরটি হইতে যত ছবি, যত মর্ম্মর-মূর্ত্তি, যত শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, একালের অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর হইতেও তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যাইবে না!

রোমের স্থান শিল্পজগতে খুব উঁচু না হইলেও রোমবাসীরা আর্ট লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিতেন। অমন যে নরবেশী দানব নীরো,—সেকালে জন্মিয়া সেও আর্টের পরম ভক্ত ছিল। নীরোর রাজত্ব যখন যায়-যায়, তাহার চারিদিকে যখন মৃত্যু-ভয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গলদের উত্তেজিত করিবার জন্য Vindex বলিয়াছিলেন, 'নীরো হচ্ছে অকবি আর গান-বাজনাতে আনাড়ি!' Vindex যে সসৈন্যে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এখনি যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে রক্ষা নাই, সে-সব কিছুই না ভাবিয়া নীরো রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি অকবি, গান-বাজনায় আনাড়ি! Vindex জগৎ খুঁজে আমার চেয়ে আর-একটি লোককে আনুক না দেখি! সে যা বলেছে তা প্রমাণ করুক!"

নীরো যে কত বড় একজন শিল্পরসিক ছিল, তাহার মরণ-উক্তিতেও সেটুকু বেশ বোঝা যায়। রাজ্যহারা হইয়া, বিতাড়িত বন্য পশুর মত বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে পথ হারাইয়া, নীরো যখন কর্দ্দমাক্ত জলে অসহ তৃষ্ণা মিটাইয়া আত্মহত্যা করে, তখন এইকথা তাহার শেষ কথা:—"Qualis artifex peres!"—"আমার ভিতরে কত বড় একজন আর্টিষ্টের মৃত্যু হোল!"

গ্রীশের, এথেন্স-নগরও শিল্পগৌরবে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাহার পার্থেননের নাম সকলেই জানেন। সুধু পার্থেনন নহে;—এথেন্সে প্রপিলিয়া নামে আর-একটি মন্দির ছিল, গ্রীক লেখকরা তাহার স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন পার্থেননেরও উপরে। গ্রীকরা এতটা শিল্পভক্ত ছিল যে, এথেন্সের প্রধান গৌরব বলিতে তাহারা বুঝিত, প্রপিলিয়ার শিল্পকীর্ত্তি। গ্রীশের অন্যান্য সহরের বাসিন্দারা, এথেন্সের নাগরিক-দের এই শিল্পসৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরিত; আর সে হিংসা এতটা প্রবল ছিল যে, ইপামিনোডাস ভিত্তিসমেত সমস্ত প্রপিলিয়া-মন্দিরটিকে নিজের দেশে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন! নীচের গল্পটিতে গ্রীকদের শিল্পানুরক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২

Phryne ছিল এথেন্স নগরের রূপযৌবনশালিনী বিখ্যাত নর্ত্তকী;—তাহার চপল নয়নের সামনে অটল থাকিতে পারে, এমন লোক তখন সারা দেশ ঢুঁড়িয়া একটিও মিলিত না।

যৌবন ও লাবণ্যকে সে আপনার সেরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিত; পাছে লোকে বিনামূল্যে তাহার মোহন তনু দেখিয়া ফেলে, সেই ভয়ে সে রাজপথে বা জনতার ভিতরে বা রঙ্গালয়ে সহজে আসা-যাওয়া করিত না; যদি বা কখনো পথে বাহির হইত, তবে পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত কাপড়মুড়ি না দিয়া ও মুখে ঘোমটা না টানিয়া যাইত না। তাহার রূপ দেখিবার ভাগ্য হইত খুব কম লোকেরই—কারণ, ততটা অর্থ-সামর্থ্য ছিল না অনেকেরই।

তাহার জীবনকে পবিত্র জীবন বলা যায় না। কিন্তু রূপ লইয়া বিকিকিনি করিলেও Phryneএর হৃদয় উদার ও উচ্চ ছিল। আলেকজান্দার যখন থিবস্ সহর ধ্বংস করিয়া দেন, সে তখন ঐ সহরটিকে নিজের খরচে আবার নূতন-করিয়া গড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল। করিন্থের অধিকাংশ শিল্পবিচিত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহারই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ললিত কলা ছাড়া পৃথিবীর আর-কিছুকে সে ভালবাসিত না।

এই সময়ে ফিডিয়াসের বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে গ্রীকরা আর্টের মহান আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়াছিল; ফিডিয়াসের প্রতিভা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যকে নানা দিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। যিয়াস, ফিবাস, আর্টেমিস ও এথীনী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি তখন শরীরী হইয়া মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু রূপলক্ষ্মী ভেনাস—যিনি সৌন্দর্য্যের নিখুঁত আদর্শ,—কল্পনালোক ছাড়িয়া তখনও তিনি নরলোকে ভাল শিল্পীর হাতে যথাযোগ্য আকার ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই; হয়ত কল্পনার সে অতুল সৌন্দর্য্যের কাছে বাস্তবের সমস্ত শক্তি নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল।

গ্রীশদেশে প্র্যাক্সিটিল্স্ তখন সর্ব্বপ্রধান ভাস্কর এবং অ্যাপেলিস সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর।

রূপপিয়াসীর কাতর পূজা ঠেলিয়া, পুষ্পিত বিরামকুঞ্জের বিলাস-শয়ন ছাড়িয়া, অর্থের সমস্ত মায়া ভুলিয়া Phryne, হঠাৎ একদিন ভাস্কর প্র্যাক্সিটিল্সের কলাভবনে গিয়া হাজির হইল। কথায় সুরের ঢেউ তুলিয়া বলিল, "শিল্পী, আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না, কেবল তোমার শিল্পের আদর্শ হোতে চাই।"

দেহের কৃত্রিম আবরণ ফেলিয়া আপন নগ্ন সৌন্দর্য্যকে সে প্রকাশ করিল।

ভাস্করের চক্ষু বিস্ময়ে-প্রশংসায় একেবারে মুগ্ধ! এ কি কল্পনাতীত দৃশ্য! এ যে রূপের বীণা,—এ তনু-যন্ত্রের একটি তারও যে বেস্থরো বাজিতেছে না! এ যে রূপলক্ষ্মী দেবী ভেনাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! প্রাক্সিটিল্স্ স্বপ্নেও এমন সৌভাগ্যের আশা করেন নাই, নরদেহে যে এত সুষমা থাকিতে পারে, এ ধারণাও তাঁহার ছিল না! তিনি সেইদিন হইতেই এই সজীব আদর্শের সামনে বসিয়া প্রতিমা গড়িতে লাগিয়া গেলেন;



প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া Aphroditeএর একটি নকল-প্রতিমূর্ত্তির মুখ

সে প্রতিমার নাম হইল Aphrodite বা Venus of Cnidos। আসল প্রতিমাটি কেমন ছিল, আজ আর তা জানিবার উপায় নাই; তবে, তাহার নকলে আরো অনেকে যে-মূর্ত্তিগুলি গড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই আসলের কিছু-কিছু আঁচ পাওয়া যাইতে পারে।

প্লিনি বলিয়াছেন, ভেনাসের এই মূর্ত্তিটি সুধুই প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত নয়—সমস্ত গ্রীশদেশে, সমস্ত পৃথিবীতে এর চেয়ে নিখুঁত সুন্দরীর মূর্ত্তি আর নাই!

Cnidosএর নাগরিকরা এই ভেনাস-মূর্ত্তিটিকে কিনিয়া লইল এবং একটি শৈল-শিখরে চারিদিক-খোলা মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করিল। বহুদুর হইতে নগরবাসীরা পুলকিত নেত্রে নীল গগনপটে মূর্ত্তিমন্ত ভেনাস দেবীকে চিত্রলিখিতের মত দেখিতে পাইত।

Cnidosএর লোকরা একবার অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা নিকোমেডেস নামে অন্য এক নগরপতি সেই সময়ে ভেনাসের মূর্ত্তিটিকে কিনিয়া ঋণের সমস্ত টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু সহরবাসীরা ভেনাস-মূর্ত্তিটিকে কিছুতেই বিক্রী করিতে রাজি হইল না; বলিল, "আমরা যদি সমস্ত খুইয়ে পথের ভিখারী হই, তাহলেও এ প্রতিমাকে ছাড়তে পারব না—এ যে আমাদের প্রাণের রতন!" তাহারা বাড়ী-ঘর বিক্রী করিয়া ফেলিতে, পরের গোলাম হইতে, দিন-মজুরী করিতেও প্রস্তুত হইল,—কিন্তু প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া এই অদ্বিতীয় শিল্পরত্নকে প্রাণ থাকিতে বিকাইয়া দিতে সম্মত হইল না! আর্টের প্রতি সমগ্র জাতির এই গভীর প্রেম, সেকালেই সম্ভব ছিল; একালে শিল্পের জন্য এমন স্বার্থ-ত্যাগের কথা স্বপ্নেও কারুর মনে আসিবে না।

Venus of Cnidos যেমন প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া সকল মূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি চিত্রকর আপেলিস যত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সকলের সেরা হইয়াছিল, তাঁহার



প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া মূর্ত্তির নমুনা

যতদিন পুষ্পিতযৌবনা ছিল, ততদিন সে-সময়কার সকল শিল্পীরই আদর্শ হইয়াছিল। প্রচুর অর্থব্যয় না করিলে কেহই তাহার দেখা পাইত না, কিন্তু সে যখন শিল্পীর আদর্শ হইয়া আপনার মূল্যবান সময় কাটাইত, তখন কাহারও কাছ হইতে এক পয়সাও লইত না; সুতরাং আর্টের প্রতি তাহার অনুরাগ যে কতটা অকৃত্রিম ছিল, সে কথা বোধ হয় আর খুলিয়া বলা অনাবশ্যক। তাহার শিল্পানুরাগে সুধুই যে গ্রীক কলার একটা মস্ত অভাব দূর হইয়াছে, তাহা নয়; পরন্তু, রমণীর নির্দোষ সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী একটা স্পষ্ট



"বিজয়িনী ভেনাস"

Venus Anadyomene নামে পটখানি। এখানেও Phryne স্বেচ্ছায় আদর্শ হইয়া চিত্রকরকে কৃতার্থ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আপেলিসের এই চমৎকার ছবিখানির নাম ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নাই।

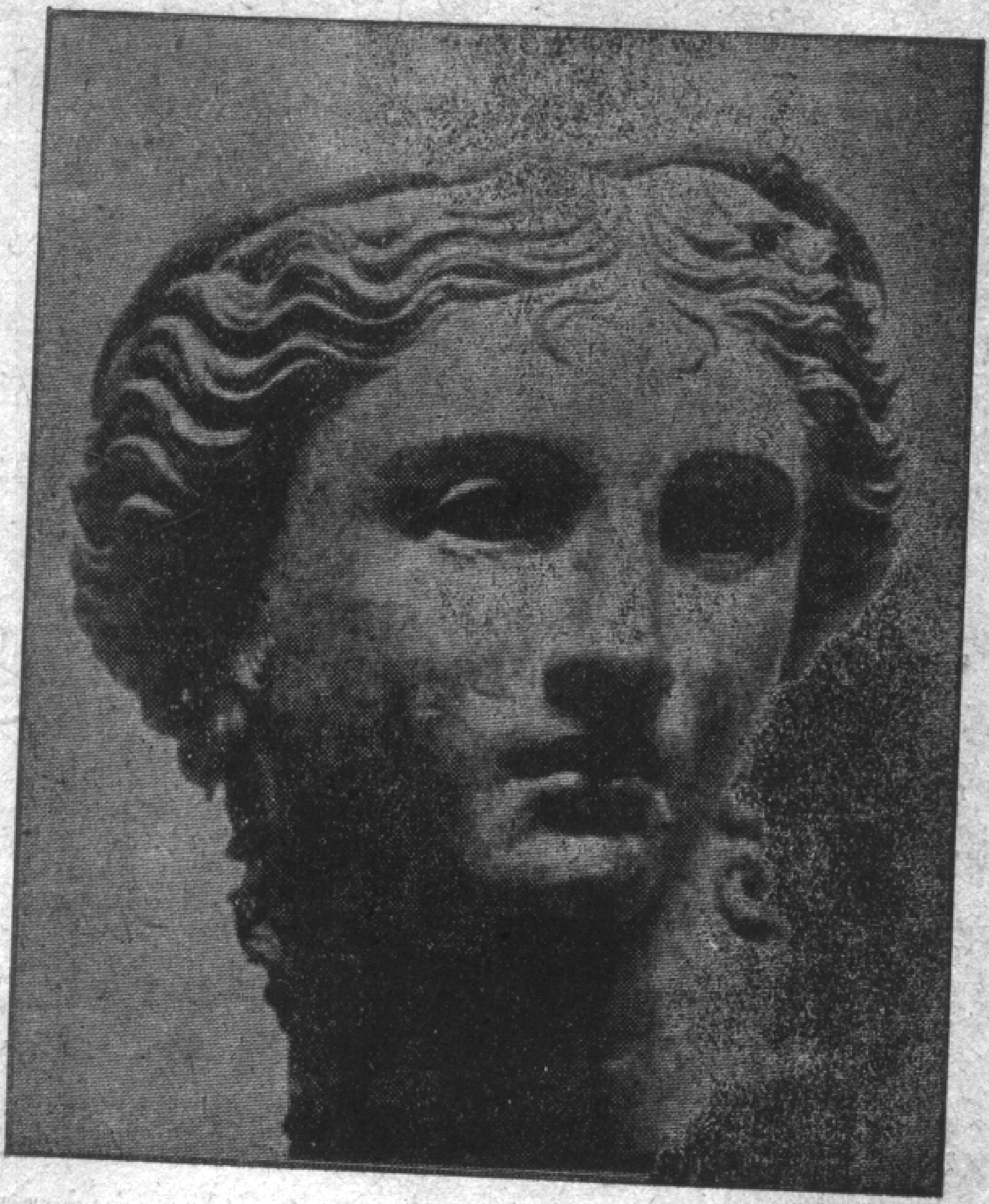
"Venus Triumphant," "Venus of the Capitol," "Venus De Medici" ও "Venus of Milo" প্রভৃতি নামে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অনেকগুলি বিখ্যাত মূর্ত্তি আছে। সমালোচকদের মতে প্র্যাক্সিটিল্‌সের Venus of Cnidosএর অনুকরণেই এ-সকল মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, Phryne



"ভেনাস অফ দি ক্যাপিটল"

ধারণা করিতে পারিয়াছে। Phryne যদি সেকালের শিল্পীর আদর্শ না হইত, তাহা হইলে একালের আর কোন শিল্পী এমন নিখুঁত গড়ন গড়িতে পারিতেন না।

এইখানে Phryneএর জীবন-কাহিনী হইতে আর-একটি গল্প বলা দরকার; কারণ, এই গল্প হইতে বেশ বোঝা যাইবে যে, প্রাচীন গ্রীক জাতি কতটা সৌন্দর্য্য-বিলাসী ছিল।



Aphroditeএর আর-একটি মুখ

Phryneএর অপরূপ রূপের আগুনে সকলের মন পতঙ্গের মত পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, একদল লোক তাহার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার Phryneএর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ষড়যন্ত্রীরা Phryneএর বিরুদ্ধে নালিস করিল, সে নাকি এই বলিয়া জাঁক করে যে, সহরের সমস্ত লোক যদি একজনে পরিণত হয় আর সে যদি তখন এথেন্সকে কিনিতে চায়, তবে তাহার একরাত্রির প্রেমের লোভে লোকে এথেন্স সহরটি অনায়াসে বিকাইয়া দিবে! Phryneএর বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ উঠিল। অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে চরম দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সে বিচারালয়ে গিয়া হাজির হইল। বিচার দেখিবার জন্য সেখানে তখন হাজার হাজার লোক আসিয়া জমিয়াছে। সকলে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠনে ও বস্ত্রে আবৃত। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে, সে স্থিরভাবে সেগুলি শ্রবণ করিল।

তাহার পর বিখ্যাত বক্তা Hyperides, সেই নির্দ্দোষ রমণীর পক্ষ সমর্থন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, Phryneএর বিরুদ্ধে যে-সব কথা রটিয়াছে, তাহা মিথ্যা।

Hyperides এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন, "হাঁ, সহরের সমস্ত পুরুষ যদি একজনে পরিণত হয়, Phryneএর

সঙ্গলাভের জন্য তবে তাহাদের পক্ষে এথেন্স নগরকে বিকাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়!"

Hyperidesএর শেষ কথা শুনিয়া বিচারকরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আদালতে উপস্থিত জনতার ভিতর হইতেও অসন্তোষের খুঁৎখুঁতুনি শুনা যাইতে লাগিল।

চতুর বক্তা তখন Phryneএর কাছে গিয়া, হঠাৎ তাহার দেহের কাপড় খুলিয়া দিলেন!

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, আজন্মযৌবনা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী ভেনাস্ যেদিন মুক্তবেণী বিবসন হইয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, সেদিন

"তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।"

আজও এই বিরাট জনতা-সাগরের মাঝখানে Pnryneএর অপূর্ব্বসুন্দর নগ্নতনু ও তাহার নিষ্কলঙ্ক মুখ-শ্রী যেন সেই পৌরাণিক দৃশ্যের মতই দেখাইতে লাগিল। বিচারালয়ের যে যেখানে ছিল, সকলেই মোহিত, চকিত, স্তব্ধ! "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র!"—Phryneএর নামে সকলেই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—সে জয়ধ্বনিতে বিচারকর্ত্তারাও যোগদান করিলেন! চারিদিক হইতে শোনা গেল—'হ্যাঁ, এ মুখের একটুখানি হাসির বদলে আমরা এথেন্সকে বিকিয়ে দিতেও রাজি!'—Hyperidesএর বলিষ্ঠ বাহু নির্ভর করিয়া শরমনত মুখে, সঙ্কোচজড়িত চরণে বিজয়িনী Phryne আপন আবাসে ফিরিয়া আসিল।

Phryneএর জয়লাভের কথায় এক-জন বিখ্যাত লেখক বলিতেছেন, "In that celebrated acquittal of Phryne, we ought to see something more than is generally seen in it. It was not only due to the erotic frenzy of the people, but also to the admiration and respect of an artistic race, bending the knee before the unexpected and sovereign apparition of Beauty. They felt that if they were to suppress that wonderful type, painters and sculptors would be deprived of a living ideal, and the feeling that inspired Hyperides with boldness, the judges with clemency and the crowd with enthusiasm, was one of those inspirations which do the greatest honour to the Athenian people."

এই বিচিত্র বিচারের পরেই বিচারালয় হইতে এক বিচিত্র আদেশ-পত্র বাহির হইল:—Phryneএর স্বর্গীয় সুষমা কেবল ধনীদের জন্যই নয়—সে রূপ সকলেরই দর্শনীয়। দেবতারা মানুষের জন্য যে অপূর্ব্ব লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সে লাবণ্য তাঁহাদিগকেই নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে চাই। বিশেষ, নির্দ্দোষ রমণী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিলে জনসাধারণেরও মনের উন্নতি ও উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব বিচারা-

লয়ের সেদিনকার দৃশ্য, যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে বা উৎসবে, সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে আবার অভিনীত হয়, সেইজন্য আদেশ দেওয়া হইল।

এ আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য, Phryneএর ছিল না। সুতরাং বৎসরে একদিন করিয়া তাহাকে সাগর-স্নানে যাইতে হইত। বসনের আড়ালে আপন সুরবাঞ্ছিত তনুলতাটি গোপন করিয়া, সাগরের চঞ্চল-তরঙ্গে সে ধীরে ধীরে অবগাহন করিত; এবং "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" যখন সে ফেনচিত্রিত নীল জলের উপরে আবার ভাসিয়া উঠিত, তখন তাহার তুষারশুভ্র নগ্ন তনুর উপরে তপ্ত সূর্য্যকর প্রেমচুম্বনে লীলায়িত হইয়া যাইত! শিল্পীর কলাকুঞ্জে সে, যে দেবীর আদর্শ হইত, এ সেই ভেনাসের পুরাণ-কথিত জন্ম-দৃশ্যেরই সুন্দর অভিনয়!

তখন সহর খালি করিয়া সমুদ্রতীরে লোকের পর লোক ছুটিয়া আসিত! সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল নগ্নতা দেখিয়া বৃদ্ধ ও যুবা এবং ধনী ও নির্ধন—সকলেই একসঙ্গে একতানে বলিয়া উঠিত:

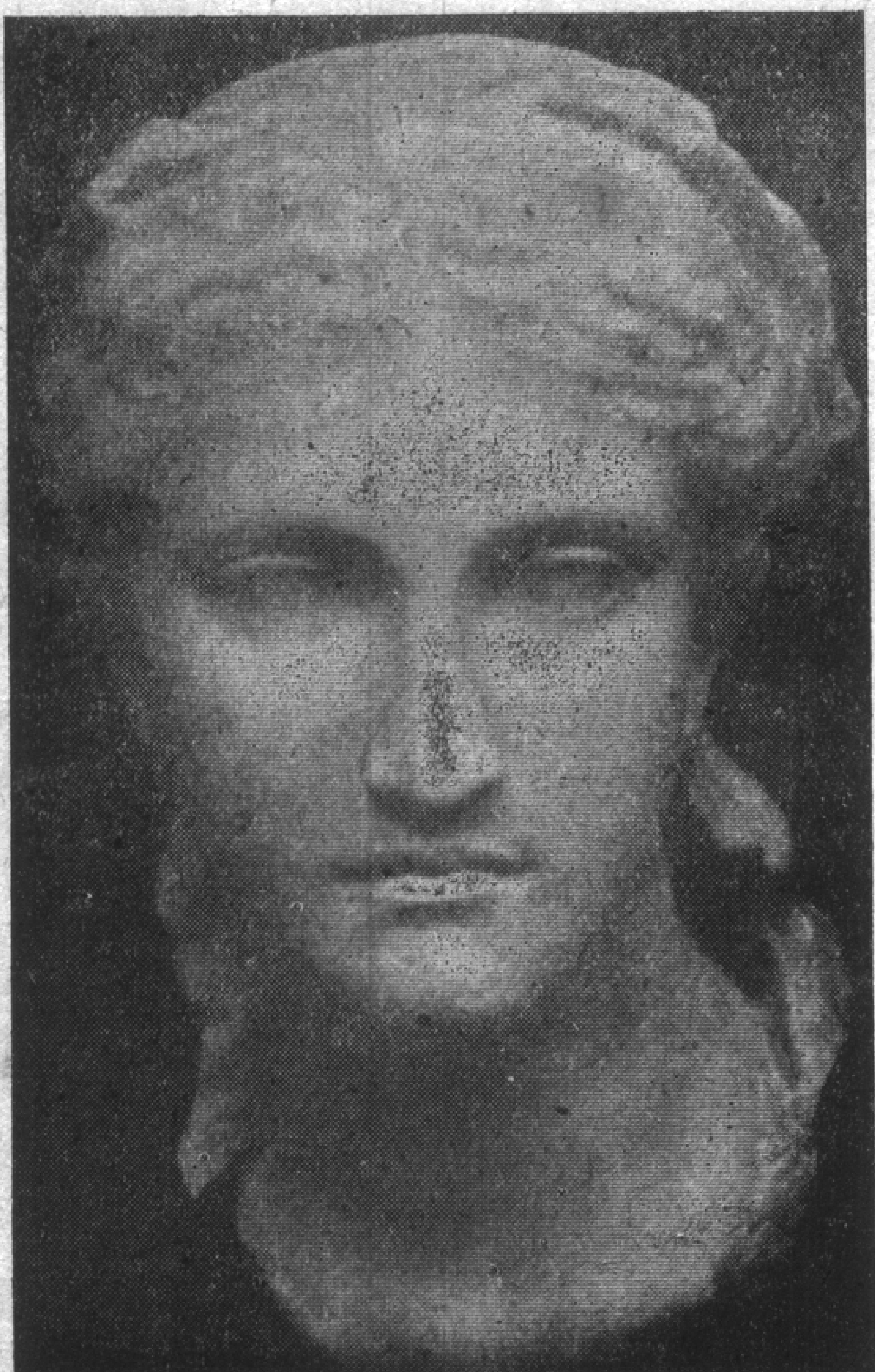
"ওগো স্বর্গের দেবী, তোমার মঙ্গল হোক! কেননা, মানুষের নয়ন ও হৃদয়ের সম্মুখে তুমি সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াছ!"

সৌন্দর্য্যের প্রতি সমস্ত গ্রীক-জাতির এমন অনুপম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই ললিত কলায় আজও তাহারা অমর ও শ্রেষ্ঠ হইয়া আছে!

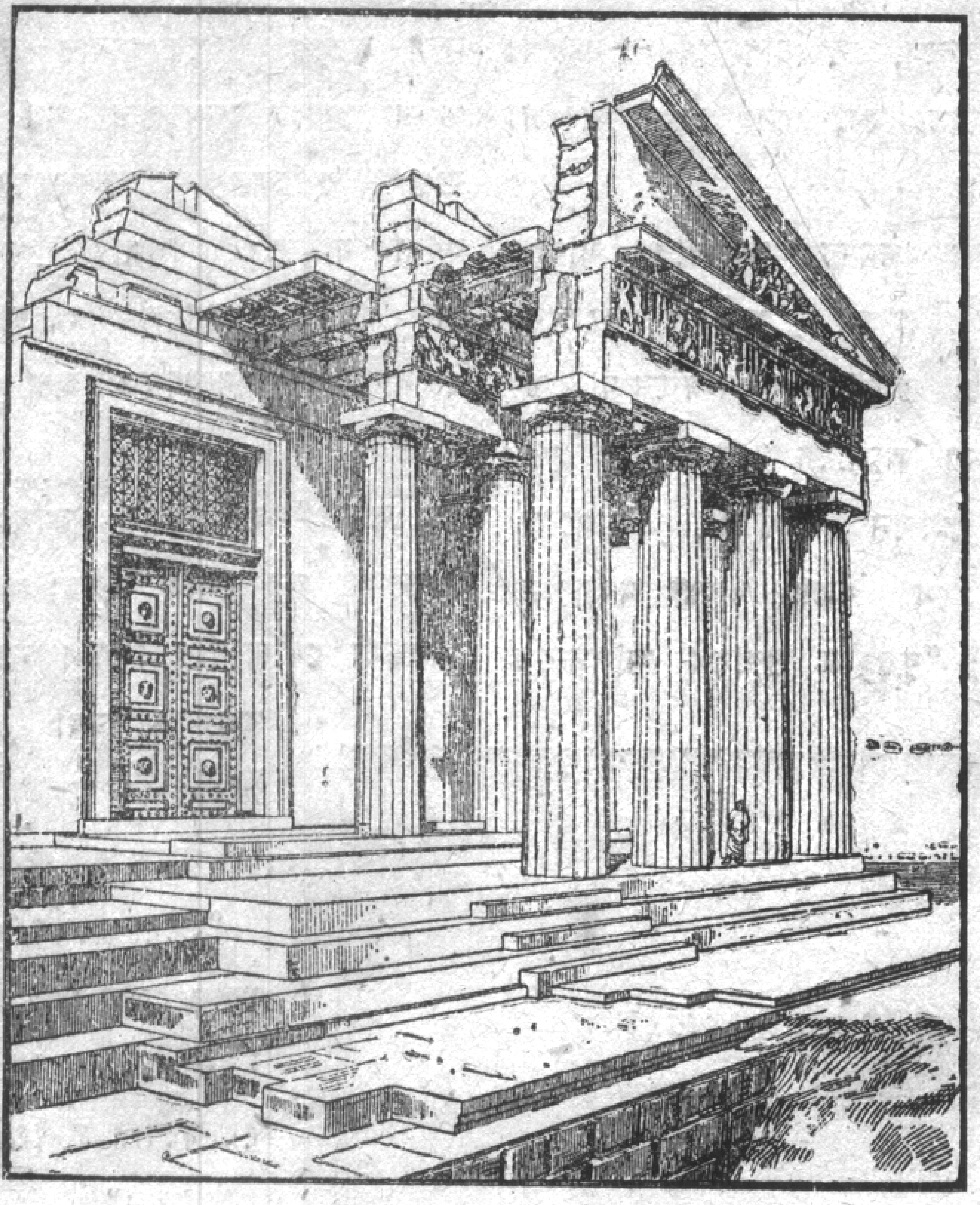
৩

ললিত কলার সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক যে কমিয়া আসিয়াছে, তাহার অগুন্তি প্রমাণ আছে।

আর্ট হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস; শিল্পীর খেয়াল-খুসির সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আর্টের



গ্রীক ভাস্কর্য্যের একটি রমণীমূর্ত্তির মুখ



পার্থেননের একাংশ

মধ্যে সমসাময়িক যুগের ছবি আপনি ফুটিয়া ওঠে। অতীতের অনেক বিখ্যাত জাতি কেবল আর্টের মধ্যেই তাহাদের সভ্যতা ও সমাজের ইতিহাস রাখিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; যেমন প্রাচীন মিসরবাসীরা;—তাহাদের যাহা-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সমস্তই শিল্পের দৌলতে। কলা ও বিজ্ঞানে যদি অনভিজ্ঞ হইত, তবে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোম্যানদের অনেক কথাই আজ আমরা জানিতে পারিতাম না। ভারতের গুহা-শিল্পে ও পুরাতন দেব-মন্দিরে এবং গ্রীশের পার্থেনন প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক জাতির সভ্যতা, সমাজ, আচারব্যবহার, আকার-প্রকার এবং পোষাক-পরিচ্ছদের যেমন জ্বলন্ত নমুনা পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। পরন্তু, শিল্পে সুধু বাহিরের চেহারাটাই ধরা পড়ে না, মানুষের মনের মতি-গতিও তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হয়। এইজন্যই আর্টকে ছেলে-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না;—আমরা যতবড়ই সাংসারিক, হিসেবী ও শুষ্কপ্রাণ জীব হই না কেন, একটু যদি ভাবিয়া দেখি, তবে জীবনের পদে পদে আর্টের সার্থকতা বুঝিতে পারিব।

আর্টের মধ্যে এই গভীরতা আছে বলিয়াই আমাদের উচিত, তাহার প্রতি

শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্ভ্য হইয়া আজ আমরা আর্টের উপর যে অসভ্য অত্যাচার করিতেছি সে অনাচারকে কিছুতেই শ্রদ্ধা বলিয়া মনে করা চলে না।

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানব আজ শক্তির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অতীতের প্রতি তাহার সম্মান নাই, আর্টের প্রতি তাহার ভক্তি নাই, ললিত কল্পনার প্রতি তাহার অনুরাগ নাই! কারুশিল্পে অতুল্য যে-সকল মন্দির-প্রাসাদ আজ যুগ-যুগ ধরিয়া পৃথিবীর বিস্ময়-প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়াছে, অতীত সভ্যতা-স্মৃতির স্বপনে যাহারা এতদিন সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল, আমাদের সম্মুখে এতদিন যাহারা সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেক পাষাণখানি কত হৃদয়ের সাধনায়, কত প্রেমের পুলকে, কত শিল্পীর বুকের রক্তে জীবন্ত হইয়া জাগিয়া ছিল, সভ্যতার নির্ম্মম বর্ব্বরতায় এখন তাহারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, অগ্নির সর্ব্বগ্রাসী শিখায় সমর্পিত! মানুষ গেলে তাহার স্থানে আবার নূতন মানুষ আসে, কিন্তু অতীতের যে-সব শিল্প-নিদর্শন ধরাপৃষ্ঠ হইতে একবার মুছিয়া যায়, তাহার অভাব পূরণ করে বর্ত্তমান সভ্যতার এমন সাধ্য নাই! বলিয়াছি, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সকল দিকে উন্নত হইলেও, শিল্পক্ষেত্রে সে একান্ত দুর্ব্বল, অক্ষম ও পঙ্গু! প্রতীচ্যের লোকরা প্রাচ্য জাতিদের বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করে, কিন্তু কিছুদিন আগে তাহারা যখন চীনদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন চীনসম্রাটদের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পবিচিত্র নিদাঘ-প্রাসাদ 'ইউয়েন-মিন-ইউয়েন' ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিবার সময়ে তাহাদের কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা হয় নাই!

প্রাচীন কালে সভ্যতার শৈশব অবস্থায় এরূপ বর্ব্বরতার কাহিনী আছে অনেক। ধর্ম্মদ্বেষিতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, সাধারণের অজ্ঞানতা, ব্যক্তিগত নির্ব্বুদ্ধিতা ও যুদ্ধবিগ্রহের গোলমালে সেকালেও অনেক অমূল্য শিল্পরত্ন হারিয়া গিয়াছে। গথজাতীয় অ্যালারিক গ্রীশের এলিস সহর আক্রমণ করিয়া তিন হাজার ধাতুর তৈয়ারি প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। রোমের মামিয়াস গ্রীশের পরম-সুন্দর কোরিনথ্‌কে এমনভাবে ভূমিসাৎ করিয়া দেন যে, তাহার শিল্পসুষমা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গ্রীক শিল্পের অনেক মূর্ত্তি কনস্তানতাইন আপনার নূতন সহর সাজাইতে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; ফলে, মহা-ভাস্কর ফিডিয়াস এবং আরো-অনেক শক্তিধর শিল্পীর পরিকল্পনার চিহ্ন-পর্য্যন্ত আজ আর টিকিয়া নাই। ভারতে মুসলমান ও হিন্দু, যে যখন সুবিধা পাইয়াছে, পরস্পরের শিল্পের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে; তবে, এদিকে মুসলমানদের অপরাধই গুরুতর। এমনি ধর্ম্মদ্বেষিতা বা সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার য়ুরোপেও অনেকবার হইয়াছে।

ধর্ম্মোন্মত্ত স্যাভোনারোলার প্ররোচনায় ফ্লোরেন্সের অনেক শিল্পীর ভাল ভাল হাতের কাজ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাইকেল এঞ্জিলো প্রথমশ্রেণীর যে কয়টি মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি তাহার অন্যতম। অজ্ঞান জনসাধারণের

বিষদৃষ্টিতে পড়ায় আজ সে বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তির একটুকরাও আর পাওয়া যায় না।

কিন্তু, প্রাচীন কালের এ-সব বিকৃত রুচি ও মূর্খতার পরিচয় এখনকার বিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার মধ্যেও যদি পাওয়া যায়, তবে এ সভ্যতার সার্থকতা কোথায়? অথচ, সেকালে বর্ব্বরতাও যেমন ছিল, উদারতাও তেমনি কম ছিল না। বরং, আর্টের প্রতি তখনকার লোকদের ভক্তি-প্রেমের যত দৃষ্টান্ত মেলে, ততটা একালেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে! Phryneএর কাহিনীতে সে শিল্পানুরক্তির অনেক উদাহরণ আছে,—এবং ইতিহাসেও এ-সম্বন্ধে বিবিধ প্রমাণের অভাব নাই।

৩০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে Demetrius Poliorcetes যখন রোড্‌স্ অবরোধ করেন, তখন আপন সৈন্যদের আজ্ঞা দেন যে, সহরের যেদিকটাতে চিত্রকর Protogenesএর আঁকা Ialysus নামে বিখ্যাত পটখানি আছে, সেদিকটাতে কেউ যেন অস্ত্র না চালায়! পাছে ছবিখানি নষ্ট হইয়া যায়, তাই এই হুকুম! তিনি এরূপ আজ্ঞা দেওয়ার হেতুও দেখাইয়াছেন:—"যুদ্ধ সুধু রোডেসিয়ানদের বিরুদ্ধে—আর্টের বিরুদ্ধে নয়!" একখানি মাত্র ভাল ছবি বাঁচাইতে দু-হাজার বৎসরেরও আগেকার একজন সেনাপতি কতটা মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন! কিন্তু একালের সভ্যতাগর্ব্বী জার্ম্মানরা একখানি ছবি ত সামান্য কথা—এমন কত শত চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত বড় বড় স্থাপত্য-শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শনকে রক্তস্রোতের মুখে একেবারে ধুইয়া-পুঁছিয়া দিতেছে! অথচ এই জার্ম্মানরা যে "Culture"এর জাঁক করে, সেই "Culture"এর মন্ত্র সর্ব্বাগ্রে প্রচার করেন এক গ্রীক চিত্রকর! তাঁহার নাম Pamphilus; তিনি ৩৯০—৩৫০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দের লোক! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক চিত্রকর অ্যাপেলিস তাঁহারই ছাত্র। শিল্পীর কাছ হইতেই "Culture"এর মন্ত্র নিয়া জার্ম্মানরা এখন শিল্পের উপরেই মরণ-বাণ মারিতেছে! চমৎকার কৃতজ্ঞতা!

আসল কথা, আমাদের সভ্যতা হচ্ছে মুখমিষ্ট ভণ্ডের মৌখিক শিষ্টতার মত;—ইহার ভিতরটা একেবারে ফাঁপরা! এত কাল ধরিয়া আমরা সুধু দেহের উপরটাই মাজিয়া-ঘষিয়া চকচকে করিয়া তুলিয়াছি—কিন্তু দেহের ভিতরে আমাদের যে মনটি আছে, বর্ত্তমান সভ্যতা সে অসভ্য মনের ময়লা এখনো মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই! তাই সময়ে-অসময়ে মনের ময়লা আমাদের বাহির-পরিষ্কার দেহের উপরে স্বেদজলের সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার কৃত্রিম পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করিয়া দেয়।

৪

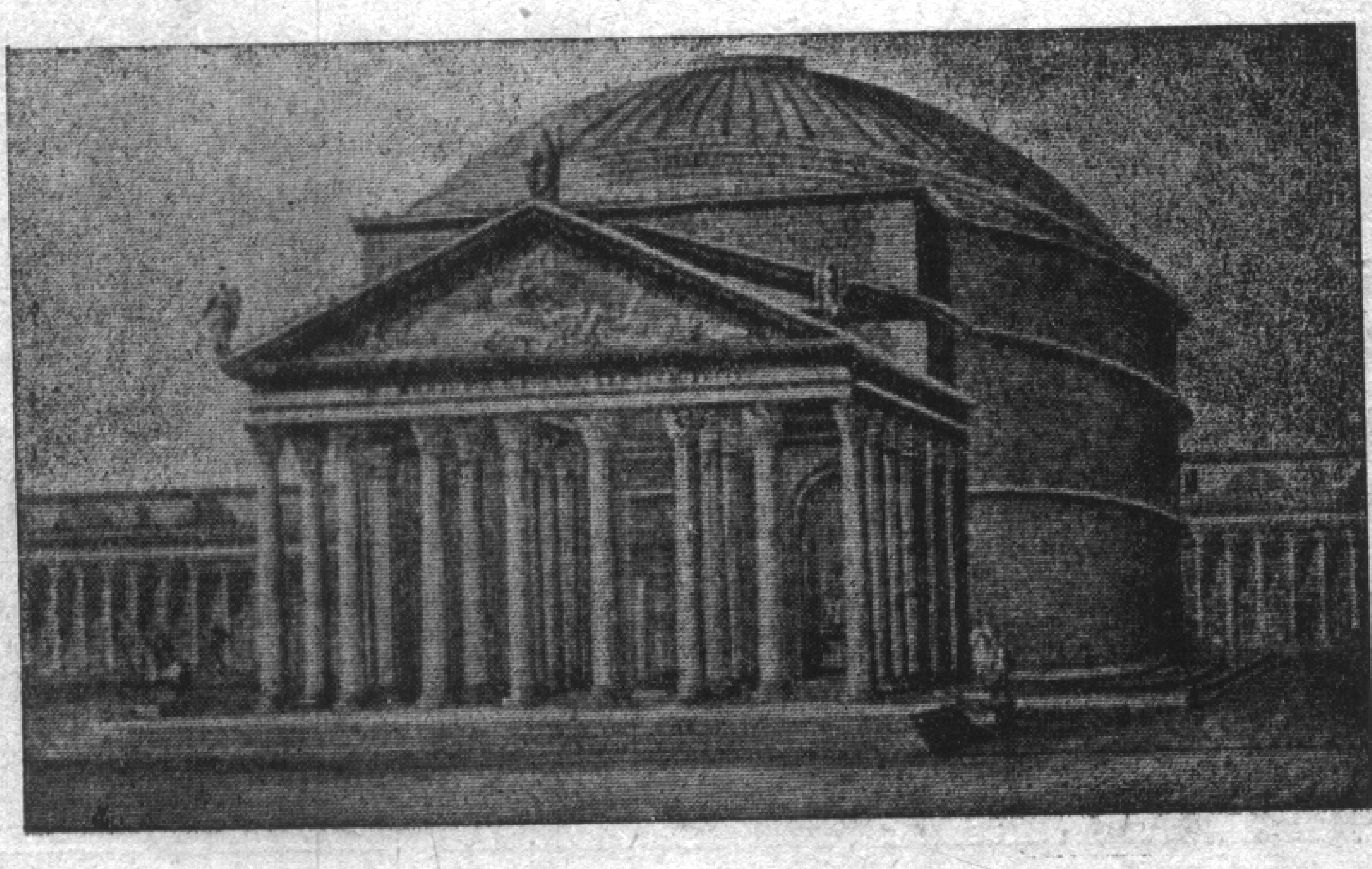
সভ্যতার কর্ম্মকোলাহলে কবির বীণা-ঝঙ্কার ক্রমেই মৃদু হইয়া আসিতেছে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় মানুষের পথ হইতে আর্ট ক্রমেই সরিয়া দাঁড়াইতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, পৃথিবীর বয়স-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাত ক্রমেই আর্টে কম-নিপুণ হইয়া উঠিতেছে। আগেই বলিয়াছি, আর্ট অকেজো বলিয়া কাজের লোকরা তাকে আর ভালবাসে না।



রিম্‌সের গির্জ্জা

আবার, যারা আরো-বেশী চালাক, তারা চায় আর্টকে দাসী-বাঁদীর মত কাজে লাগাইতে! ফলে, তাজমহল, পার্থেনন ও কণারকের মন্দিরের বদলে, জীবন-বিমা কোম্পানী ও সওদাগরী আপিসের হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ-য়ের মত বেঢপ-বিশ্রী অট্টালিকার সারি, অ্যাপলো ও ভেনাস প্রভৃতি নগ্ন ও স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তির বদলে নখ-থেকে চুল-পর্য্যন্ত পোষাক-পরা দরজির দোকানের পুতুলের দল এবং ম্যাডোনা বা মোনা লিসার মত রমণীয় চিত্রপটের বদলে, রয়েল অ্যাকাডেমির ছাপ্-মারা আর্টিষ্টের দ্বারা আঁকা 'পিয়ার্স সোপ' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-পটের সংখ্যা দেখিতে দেখিতে ব্যাঙের ছাতার মত বাড়িয়া যাইতেছে! ভাল আর্টিষ্ট কম হইলেও এখনো দু-চারজন টিকিয়া আছেন,—কিন্তু তাঁহারা কলির এক-পেয়ে ধর্ম্মের মত একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত! সংসারের হাজার কাজের পোড়া বালির তলায় তাঁদের অকেজো মনটি লুকানো ফল্গুর এতটুকু সরু ধারাটির মত বহিয়া যায়—কেহ জানিতে পারে না,—জানিতে চাহেও না! তাঁহাদের কল্পনার রঙ্গিন ফানুষ এখনো ভোরের কালো মেঘ-ফাঁকে সোণার রবি-কর-স্রোতে স্নান করে, অর্দ্ধচন্দ্রের আধা-আলোয় আধা-ছায়ায় তারকার মুখে মুখে সোহাগের চুম্বন দেয়,—কিন্তু সে মায়ালোকের আনন্দ-বার্ত্তা লইয়া পৃথিবীর দিকে সে আর সহজে নামিতে চায় না, পাছে এই শত শত সহরের কোটি কোটি কলের মস্ত মস্ত ধূম্রমুখ চিমনিগুলো ডাগর হা-মেলিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলে! আর্ট এখনো একেবারে মরিয়া না গেলেও, তার যে প্রায় যায়-যায় অবস্থা, তাতে আর সন্দেহ কি!

অতীত তাহার বিরাট কল্পনা, মহান আদর্শ ও গভীর আনন্দ লইয়া আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মিশরে কর্ণ্যাকের বিশাল স্তম্ভ-গৃহ, স্ফিংস্ ও পিরামিড, চ্যাল্‌ডিয়ায় ব্যাবেলের মন্দির, এথেন্সের পার্থেনন ও প্রপেলিয়া, রোমের



রোমের পান্থিয়ন



ওঙ্কারধামের মন্দির

পান্থিয়ন, ফোরাম ও কলিসিয়াম, সিরিয়ার ব্যালবেকের মন্দির, ফ্রান্সের রিম্‌সের গির্জ্জা, জাভার বড়বুদ্ধের মন্দির, শ্যামদেশের ওঙ্কারধাম এবং ভারতের ইলোরা প্রভৃতি গিরিগুহাশিল্প, ভুবনেশ্বর জগন্নাথ ও কণারকের মন্দির প্রভৃতি, অতীতের বিশ্বকর্ম্মাদের অমানুষিক ক্ষমতা ও প্রতিভার জ্বলন্ত উদাহরণ। আর্ট তখন অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিত—তাই সে যুগের কবি-কল্পনা শিল্পীর হস্তে স্বর্গের সোপান-নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই।

আবার, সুধু শিল্পে বলিয়া নয়, সাহিত্যেও সে যুগের কবি-হৃদয়ে যে বিশাল ধারণা-শক্তি ছিল, এখন তাহাও আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য এখন খণ্ড ভাবে নিখিলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বযুগের সাহিত্যে সমগ্রতার যে মহান সৌন্দর্য্য ছিল, একালে তাহার অভাব হইয়াছে একান্ত। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের অমর কাব্যে সমগ্র মানবতার এবং হৃদয়-বৃত্তির যে অপূর্ব্ব ঘাত-প্রতিঘাত দেখা যায়, দান্তের বিরাট কল্পনায় যে স্বপ্নাতীত অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান হইয়াছে, আধুনিক কবির এমন সাধ্য নাই যে, তাহার তুল্য আর কোন-কিছু দেখাইতে পারেন। এতটা বিশালতার ভার একালের কবিরা একসঙ্গে বোধ হয় সহিতে পারেন

না; তাই তাঁহারা রহিয়া-বসিয়া একটু-একটু করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র ও বিশাল সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলেন।

এখন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের যে নির্ম্মল আনন্দ তখনকার শিল্পীদের ছোট-বড় প্রত্যেক কার্য্যকে প্রাণবন্ত ও সকলদিকে সফল করিয়া তুলিত, এ-যুগে বোধহয় তাহার অভাব হইয়াছে; নহিলে, এতদিনের বহুদর্শিতাতেও আমাদের হাত ক্রমেই অপটু হইয়া পড়িতেছে কেন? তাহার উপরে, যে ব্যস্ততা হচ্ছে আর্টের জন্মশত্রু, সেই ব্যস্ততা আমাদের আধুনিক জীবনে ঢুকিয়া সুকুমার শিল্পের মূলে কুড়ুলের ঘা মারিতেছে। যেখানে কর্ম্মজীবন প্রবল ও কল্পনার অবসর কম, আর্ট সেখানে সহজে আসিতে ভয় পায়।

আমাদের সৃষ্টি-ক্ষমতা ত গিয়াছেই; বেশীর ভাগ, যেখানে আমরা প্রাচীনকে হুবহু নকল করিতে বসি, সেখানেও আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা পদে পদে জাহির হইয়া পড়ে। আগ্রা ও দিল্লীর মোগল শিল্পীদের পুরাণো কাজ মেরামত করিবার জন্য যেখানেই একালের নূতন কারিকর লাগানো হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে, নূতনের কাজ কতটা অসার, কতটা খেলো! সে মেরামতের নিস্ফলতা যেন হীরার সঙ্গে কাঁচ জোড়া দিবার চেষ্টার মত, পূর্ণিমার চাঁদিনীর ভিতরে ন্যাকৃড়ার পলিতা



ছাদে শিবের মুখ—ওঙ্কারধাম

জালার মত! মেরামত করা দূরে থাক্‌—উড়িষ্যার শিল্পক্ষেত্রে প্রাচীন স্থপতিরা যে-সব মস্ত মস্ত ভারি পাথর অবলীলায় মেঘচুম্বী মন্দিরের টঙে হাল্‌কা পালকের মত টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, একালের বড় বড় পাশ-করা তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা, হরেক-রকমের জীবজন্তু ও যন্ত্রের সাহায্যে তাহার একখানি পাথরকেও সিকি মাইল সরাইয়া আনিতে পারে নাই!

আর, সংস্কারের নামে প্রাচীন শিল্পের বুকে আমরা কি নির্দ্দয় খাঁড়ার ঘা মারি! জগন্নাথের মন্দির একসময়ে ভুবনেশ্বর ও কণারকের মত সূক্ষ্মশিল্পে বিচিত্র ছিল; কিন্তু একালের অপূর্ব্ব সংস্কারের মহিমায় মন্দিরের সেই মধুচক্রের মত নিপুণ খোদাই-কাজ, চুণ-বালির প্রলেপে বেমালুম ঢাকিয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, ভুবনেশ্বরেও তথাকথিত প্রাচীন শিল্পের সংস্কারের—অর্থাৎ সংহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। শুধু এদেশ বলিয়া নয়—য়ুরোপেও এই ভয়ানক সংস্কারের পাল্লায় পড়িয়া প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের গণনাতীত নিদর্শন একেবারে দর্শনাতীত হইয়া গিয়াছে। লিওনার্ডো ডা ভিন্সির বিখ্যাত চিত্র Last Supperএর দুর্দ্দশার কথা ত সকলেই জানেন!

সেকালের তুলনায় একালের আর্টিষ্টদের কল্পনা, ক্ষমতা, প্রতিভা ও ভাবুকতা ত খাটো হইয়া গিয়াছে বটেই,—তাহার উপরে আমাদের রসবোধের মাত্রাও এতটা কমিয়া আসিয়াছে যে, বলিতে লজ্জা হয়। সেকালে একালে তুলনা,—মাতঙ্গের পাশে যেন পতঙ্গ! তাই একালের বামন-রূপী মানুষের সামনে বিশাল দৈত্যপুরীর বিচিত্র বিস্ময়ের মত, সেকালকার যে-সকল শিল্পের সৌন্দর্য্য আজিও অটুট আছে, নিজেদের অক্ষমতা ভাবিয়া আমরা যেন শ্রদ্ধানত শিরে তাহাদের কাছে গমন করি। দেবতার অপমান করিয়া কালাপাহাড় আজ ইতিহাসে নিন্দিত; যাহারা ললিত কলার অপমান করে, তাহাদের অপরাধও কালাপাহাড় অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# পঞ্চশরে পঞ্চত্ব

## ( ওনরে দে বালজাক্‌ হইতে )

### ক

যখন নেপোলিয়ন, মস্কো হইতে সসৈন্যে হঠিয়া আসিতেছেন, তখন আমি একজন লেফ্‌টেনাণ্ট।

শীতের সন্ধ্যা; সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়াতে আমি তখন একা। সারাদিন পথ হাঁটিয়া একটি গ্রাম পাইলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় আশ্রয় মিলিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি, সেখানে

আরো কয়েকজন সৈনিক আসিয়া জুটিয়াছেন। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া তাঁহারা খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন; দু-চারিটি চেনা মুখও নজরে পড়িয়া গেল। টেবিলের আর-একধারে একটি রমণীও বসিয়াছিল;—এতগুলি সৈনিক-পুরুষের সঙ্গে রমণীর দেখা পাওয়া এ-সময়ে কিছুমাত্র নূতন দৃশ্য ছিল না।

আমাকে দেখিয়াই বন্ধুরা আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমিও সকলকে উচিতমত সম্ভাষণ করিয়া ঘরের এককোণে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। শীতের চোটে আমার হাত-পা তখন অসাড় হইয়া আসিয়াছিল; চট্‌পট্ যাতে শরীরটা গরম করিয়া তুলিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি জড়োসড়ো হইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলাম।

এ-ঘরের ভিতর দিয়া পাশের ঘরে যাইবার জন্য দেয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজা—সেই দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ফৌজের এক কর্ণেল বসিয়া আছেন। একসময়ে এর তাঁবে আমি কাজ করিয়া-ছিলাম।

এই কর্ণেলটির চরিত্র বড় বিচিত্র,—এমন লোক সহজে নজরে পড়ে না। জাতিতে ইনি ইতালীয়। লম্বায়-চওড়ায় দৈত্যের মত—গায়েও বেজায় জোর। পুরুষোচিত বলবীর্য্যের সঙ্গে তাঁহার আকৃতিতে রমণীসুলভ সৌন্দর্য্যের মিলন হইয়াছে। নাক-চোখ যেন তুলি-দিয়া আঁকা, গড়নটি যেন ছাঁচে-ঢালা, রংটি দুধের মত ধব্‌ধবে।

কিন্তু, একবার রাগিলে তাঁহার আর হুঁস্তিদিব্য জ্ঞান থাকিত না। সে যে কি বিষম রাগ, ভাষায় তাহা খুলিয়া বলা যায় না—সে রাগের মুখে দাঁড়ায়, কার হেন সাধ্য! সকলেই তাঁর কাছে ভয়ে কেঁচোর মত এতটুকু হইয়া থাকিত। তাঁকে ডরাইতাম না কেবল আমি; তার কারণ, আমাকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কিছুতেই তিনি আমার কোন খুঁৎ দেখিতে পাইতেন না—আমি হাজার বেঠিক কাজ করিলেও তিনি বলিতেন, ঠিক!

রাগের সময়ে তাঁর কপালের মাংসের উপরে ঘোড়ার খুরের মত একটা বাঁকা দাগ ফুটিয়া উঠিত; তখন তাঁহার অগ্নিবর্ষী চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি অপেক্ষা এই চিহ্নটিকেই দেখাইত, বেশী ভয়ানক! সে-সময়ে মত্ত হস্তীও বোধহয় তাঁহাকে এক-পা পিছু হঠাইতে পারিত না। কিন্তু যখন তাঁহার মাথা ঠাণ্ডা থাকিত, তখন তাঁহার মুখ-খানিকে মেয়েলি মুখের মত মধুর ও কোমল দেখাইত!

আমার সামনে, টেবিলের এধারে বসিয়া আছেন, একজন কাপ্তেন। ওধারে, কর্ণেলের সামনেই, কাপ্তেনের স্ত্রী। তাহার নাম রোসিনা।

বছর-কয় আগে এই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে লইয়া একটা বিষম হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছিল।

খ

সে-সময়ে আমি কর্ণেল ও কাপ্তেনের অধীনে কাজ করি।

একদিন আমরা জঙ্গলের ভিতরে একটি

সরু রাস্তার উপর দিয়া কামানের গাড়ী টানিয়া আনিতেছিলাম। মাঝপথে উল্টা-দিক হইতে হঠাৎ আর একদল পল্টনের সঙ্গে দেখা।

নূতন দলের কর্ণেল ঠোঁট বাঁকাইয়া আমাদের হুকুম দিলেন, "তফাৎ! তফাৎ! পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!"

কিন্তু সে হুকুম তামিল করিয়া আমাদের কাপ্তেন খাটো হইতে যাইবেন কেন? তিনি দেয়ালের মত নিথর হইয়া পথের উপরেই খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!

বিরোধী পক্ষের কর্ণেল ঝাঁঝালো গলায় বলিয়া উঠিলেন, "বটে, সরবে না? দাঁড়াও, দ্যাখাচ্ছি মজাটা!"—তিনি ফিরিয়া তাঁহার কামানের গাড়ীর চালককে বলিলেন, "এই! চালাও গাড়ী!"

চালক, যতটা-সম্ভব পথের একধার ঘেঁষিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল; কিন্তু তাতেও আমাদের একগুঁয়ে কাপ্তেনটি বাঁচোয়া পাইলেন না,—গাড়ীর চাকায় পা আটকাইয়া ঘোড়া হইতে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন! সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ডান পা-খানি ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখের পলক না পড়িতে এই কাণ্ড! আমরা সবাই থতমত খাইয়া অবাকমুখে দাঁড়াইয়া আছি,—হঠাৎ দেখি, পিছন হইতে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া, মূর্তিমন্ত একটা ঝড়ের মত আমাদের কর্ণেল আসিয়া হাজির!

সেই মুহূর্তেই কাপ্তেন কাতরাইয়া উঠিলেন, "ওঃ! গেলুম—গেলুম!"

আমাদের কর্ণেলকে তখন মানুষ মনে হইতেছিল না! মুখ দিয়া তাঁর ফেনা বাহির হইতেছিল এবং দুর্জ্জয় ক্রোধে বাক্যহারা হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিলেন। আগুনভরা চোখে বনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া, তিনি ও-দলের কর্ণেলকে ঈসারা করিলেন!

দুই কর্ণেল তখনি বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। দূর হইতে নিশ্বাস চাপিয়া আমরা দেখিলাম, বনের মধ্যে প্রদীপ্ত শিখার মত ঝকিয়া উঠিল দুখানা লকলকে তরবারি,—এবং পলক না-পালটিতে ও-দলের কর্ণেলের মাথাটা ধড় হইতে ছিটকাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল!

সে-দলের লোকেরা আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না—যে পথে আসিয়াছিল, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে সেই পথেই আবার দৌড় মারিল!

কাপ্তেন তখনো কাদার উপরে আধমরা হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গ্যাঙাইতেছেন। এই কাপ্তেনটির স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কর্ণেলের কিছু মাথামাথি ছিল।… … কর্ণেলের এতটা রাগের আসল কারণ তাহাই!… …

গ

আজ সন্ধ্যেবেলায় সেই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে অনেকদিন পরে আবার এক জায়গায় দেখিলাম।

কাপ্তেনের স্ত্রী রোসিনা পরমরূপসী; বয়সগুণে তাহার যৌবনে ভাটা পড়িতে সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার রূপের স্রোত আজও বন্ধ হইয়া যায় নাই। এখনো

তাহার ডাগর চোখের কোণে বিদ্যুৎ চমৎকার, কপোলে গোলাপী রং ফুটিয়া ওঠে, চলা-ফেরায় ছন্দের তাল পাওয়া যায়! এখনো তাহাকে দেখিয়া কেউ যদি প্রাণ হারাইয়া ফেলে, তবে তার পছন্দকে নিন্দা করা চলে না।

রোসিনার স্বামী কাপ্তেনকে দেখিলে লোক নেহাৎ মন্দ মনে হয় না। তিনি ভদ্র ও শিক্ষিত; কিন্তু আজ বছরতিন ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে কর্ণেলের যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তিনি যেন তা দেখিয়াও দেখিতে চান না! হয়ত তাঁহার এই বিচিত্র নির্লিপ্ততার আর-কোন গুপ্ত অর্থ আছে!

তবু, এই কাপ্তেনটির মুখের দিকে যখনি চাহিয়াছি, তখনি কেন জানিনা, আমার মনে কেমন-একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে!

তাঁহার নীচের ঠোঁটটা খুব পাতলা এবং উপরদিকে না উঠিয়া তলার দিকে ঝুইয়া পড়িয়াছে; যাদের ঠোঁট এমনধারা, তাদের চরিত্র হয় আল্‌সে ও ম্যাদামারা এবং স্বভাবটা হয় নিষ্ঠুর।

ঘরের ভিতরে যে ক-জন লোক বসিয়াছিল, তাহারাও আমার মতই পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত; কাজেই এই অবসন্নতার মাঝখানে গল্পগুজবটা তেমন জমিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

কর্ণেলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তিনি হাত-মুখ পুঁছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমাদের নমস্কার করিয়া রাতের মত বিদায় মাগিলেন। তারপর, পাশের ঘরে ঢুকিবার আগে, কাপ্তেনের স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া স্পষ্ট স্বরেই ডাকিলেন, "রোসিনা!"—উত্তরের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া কর্ণেল, গড্‌-গড্‌ করিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কর্ণেলের এ ডাকের মানেটা যে কি, সেটা বুঝিতে কারুর দেরি হইল না। চেনা-অচেনা এতগুলো লোকের মাঝে,—বিশেষ করিয়া—স্বামীর সামনেই কর্ণেলের এমন অন্যায় ব্যবহারে, রোসিনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিল; এবং স্বামীর সম্মানে ও তাহার রমণীত্বে আঘাত লাগাতে, সে পাঙাশ-মুখে আড়ষ্ট ও গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে কর্ণেলের শয়নগৃহ হইতে আবার উচ্চস্বরে ডাক আসিল—"রোসিনা!" এই দ্বিতীয় ডাকে কর্ণেলের স্বভাবসিদ্ধ অধীরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ভাবও ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রোসিনার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিল! ভয়ে-ভয়ে সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং একটু ইতস্তত করিয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত কর্ণেলের ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

এ ঘরে টুঁ-শব্দটি নাই,—সবাই তটস্থ! হঠাৎ আমি হাসিয়া ফেলিলাম; সঙ্গে-সঙ্গে সকলকার মুখেই আমার হাসির প্রতিধ্বনি খেলিয়া গেল!

কাপ্তেন আমার দিকে চাহিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন, "তুমি যে হাসলে বড় ?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া বলিলাম, "আমার দোষ হয়েছে, মাফ করুন!"

কাপ্তেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, "না, দোষ তোমার নয়—দোষী হচ্ছি আমি!"

এই ব্যাপারটার পর সকলেই কেমন যেন মনমরা হইয়া গেল। সমস্ত কথা-বার্তা বন্ধ করিয়া আমরা যে যেখানে ছিলাম, শুইয়া পড়িলাম; এবং শীঘ্রই ঘুমঘোরে আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ঘ

সকাল বেলা; যে যার তল্পিতল্পা বাঁধিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। আমাদের কেউ কারুকে সাথী হইতে ডাকিল না—যার যেদিকে খুসি, সে সেইদিকে চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু, খানিকদূর যাইতে-না-যাইতেই আমরা হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, পিছন হইতে উচ্চস্বরে কে যেন আর্ত্ত চীৎকার করিতেছে! কী সে চীৎকার! মানুষের স্বর কি এমন হয়? এ যেন আহত সিংহের বিকট গর্জ্জন! সেই প্রাণ-কাঁপানো, অমানুষিক, ভয়াবহ গর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা সবাই শুনিলাম, নারীকণ্ঠের আর-এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ!

চকিতে আমরা সবাই—যে যেখানে ছিলাম—ফিরিয়া দাঁড়াইলাম; সকলেই ভয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত!

যে বাড়ীতে গেল-রাত কাটাইয়াছিলাম, দূর হইতে সেই বাড়ীর দিকে চাহিলাম। কিন্তু, এ কি! যেখানে সে বাড়ীখানা ছিল—এখন সেখানে শুধু ধূ-ধূ-ধূ-ধূ আগুনের শিখা ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে! এলমেল হাওয়ার হু-হু শ্বাসে চক্রে চক্রে ধূমের পর ধূম পাক্‌সাট্ মারিয়া আমাদের দিকে ধাইয়া আসিতেছে—সঙ্গে-সঙ্গে সেই তীব্র অথচ বুক-ভাঙ্গা, আর্ত্ত, ভগ্ন স্বর; এবং একটা মাংসপোড়া দুঃসহ দুর্গন্ধ!

অল্পক্ষণ পরেই কাপ্তেন আসিয়া হাজির! আমরা তাঁহার দিকে বোবার মত চাহিয়া রহিলাম,—কারুর এমন ভরসা হইল না, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করে! তিনি কিন্তু নিজেই আমাদের মনের ধাঁধা মিটাইয়া দিলেন। ডানহাতে আপনার বুকের পানে দেখাইয়া এবং বাঁ-হাতটা জ্বলন্ত আগুনের দিকে তুলিয়া, কাপ্তেন বলিলেন, "এতদিনে প্রাণের ব্যথা গেল!"

আমরা যে যার পথে ফিরিলাম,—নীরবে, কলের পুতুলের মত!

... ... ... ...

ভ্যাড়া যদি হঠাৎ বিদ্রোহী হয় তবে তার চেয়ে ভয়ানক আর-কিছু ভাবা যায় না!

শ্রীমতী রেণু রায়

# বাঙ্গালীর রসবোধ

বাঙ্গালীর অন্য যত গুণ থাক, বা নাই থাক, তাহারা যে বুদ্ধিমান জাতি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রসবোধ বুদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কালিদাস স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিতপটু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত মনে হয়—বাঙ্গালী জাতি-মাত্রেই এই বিশেষণ লাভে অধিকারী। আমাদের দেশের, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-রঙ্গ, কাব্য-কবিতা, গান-ছড়া প্রভৃতি রচনা শিক্ষিত জগতেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে;—বস্তুতঃ শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত কবির সংখ্যাই এদেশে অধিক। কারণ, আমাদের আগম-নিগম পুরাণ-কথা-কাহিনীর সরস ভাবোচ্ছ্বাস মাঠ-ঘাট-জল-স্থল ওতঃ-প্রোতঃ করিয়া প্রবাহিত। তাই সুশিক্ষিত কবি জয়দেবকেও ভাব-সম্পদে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নিকট হার মানিতে হইয়াছে আর কবিপ্রবর রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তিভাবে বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই হৃদয় জয় করিয়াছে।

বাঙ্গলার মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয়—আজকাল কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকেও অনেকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধু সাধু! আমরা ইঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে এই প্রার্থনা করি, আঁহাদের উত্তম সফল হৌক, অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হৌক।

নিম্নে আজি যে পদাবলী উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা-পদবাচ্য নহে, ইহা একজন বাঙ্গালী সৈনিকের ছন্দে লিখিত দৈনন্দিন বিবরণ।

বাঙ্গালী সেনা! এই নামটিতেই হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে! সকলেই জানেন, কিছুদিন হইল ষাটজন বাঙ্গালী-সেনা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক করাচী হইতে এখানে আনীত হইয়া বাঙ্‌লার স্থানে স্থানে নব সৈন্য-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইবামাত্র মহিলা-সমিতি একদিন ইহাদিগকে অভ্যর্থনা-ভোজ প্রদান করেন। সেই অভ্যর্থনা-সভায় ইহাদিগকে দেখিয়া মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। চিরদিন ধরিয়া, গানে, কবিতায়, কথায়, বক্তৃতায়, গদ্যে-পদ্যে আমরা যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছি, পোষণ করিয়াছি—সেই অতৃপ্ত বাসনা আজি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের নয়নের সম্মুখে বিরাজিত! এই বাঙ্গালী যুবকদিগের সাজ-সজ্জায়, চলনে-বলনে আকার-ইঙ্গিতে কি বীর-মাধুর্য্য! স্বদেশকে তাহারা স্বজাতিতে পরিণত করিবার ইচ্ছায় দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়াছে; রাজার আহ্বানে, দেশের কার্য্যে, তাহারা আজ অদম্য উৎসাহে দলে দলে মরিতে চলিয়াছে, মৃত্যুকে তাহারা আর ভয় করে না—; প্রাণ তাহাদের নিকট আজি কেবল কর্ত্তব্যের পণ। কি আনন্দ! এই দিনটি দেখিবার জন্যই যেন এতদিন এ জীবন বহন করিয়াছি! সেদিন আমাদের মনের

এই আনন্দ আকাশে বাতাসে, আলোকে ছায়ায় যেন মাতামাতি করিয়া বহিয়া উঠিয়াছিল।

সেই নিমন্ত্রণ-সভায় সমবেত সকলের চিত্তবিনোদন জন্য হাবিলদার ধীরেন্দ্রনাথ সেন-রচিত নিম্নলিখিত পদাবলী একজন সৈনিক পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছন্দে-বন্ধে নির্দ্দোষ নহে, ভাষালালিত্যেও অপরূপ নহে, তথাপি ইহার ছত্রে ছত্রে যে একটি হাস্যকৌতুক নিহিত আছে তাহা অতি মনোরম, এবং ইহার বর্ণনাও অতি —উপাদেয়। আমি সেইজন্য এই পদাবলী পত্রস্থ করিবার জন্য লেখকের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছি। আশা করি পাঠকগণ ইহা পড়িয়া আমারই মত তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

---

# বাঙ্গালী সেপাইয়ের রোজ-নামচা

## প্রথম অধ্যায়

সরকার হয়ে তুষ্ট বাঙ্গালীর বলে,
গঠিল বাঙ্গালী সৈন্য পরীক্ষার ছলে।
সীমান্ত-প্রদেশে আছে নৌশেরা সহর
শুনিয়াছি চিরদিন দেশ মনোহর।
দৃশ্যে সেরা, খাদ্যে সেরা, জল-বায়ু ভালো;
বাদাম আঙ্গুর পেস্তা গাছ করে আলো।
নদী চলে নেচে-নেচে মাছ লয়ে বুকে
এত শুনি বঙ্গযুবা ছোটে উর্দ্ধমুখে।
কেউ এল জেনে-শুনে দিবে প্রাণ রণে,
কেউ এল পেস্তাঙ্গুর খাবে প্রাণপণে,
কেউ এল ফৎনা নিয়ে ধরিবারে মাছ,
কেউ এল ফল খাবে উপাড়িয়া গাছ!
দুরু-দুরু হিয়া লয়ে দিনপাঁচ পরে
উপনীত সবে সেই স্বপন-সহরে।
হরি হরি, একি হেরি একি মনোব্যথা,
আগাগোড়া একেবারে ডাহা মিছেকথা!
কোথায় আঙ্গুর-পেস্তা! কোথায় বাদাম!
গন্ধ তার দূরে থাক,—নাহি মেলে নাম!
নদী আছে বটে কিন্তু তেপান্তর পার
এমন ভীষণ স্রোত নামে সাধ্য কার!
মাছের কথাটা থাক্, আঁসের সন্ধান
পেতে যদি চাও খোঁজ শ্রীমৎস্যপুরাণ।
আলু মুলো প্যাঁজ ছাড়া আর নাই গতি,
দূর ছাই তাও ভাল পেলে দিন প্রতি!
জীবের জীবন জল সহজে না জোটে
প্রাণটা রাখিতে গিয়ে প্রাণ ওঠে ঠোঁটে!
ইঁদারায় আছে জল ষাট হাত নীচে,
দুই হাতে হ'ল ব্যথা লম্বা দড়ি খিঁচে।
সঙ্গে এসেছিল চার বামুন ও ভিস্তি
একে একে তাহাদের দিতেছি ফিরিস্তি।
বামুন বিক্রম সিংহ চারি দিন পরে
Deserter হয়ে চুপে পড়িলেন স'রে।
ভিস্তি সে শচীন দাস চুরি করে এসে,
বাঙ্গালায় ফিরে গেল কয়েদির বেশে।
রাজেন আরেক ভিস্তি হাসপাতালে বাস,
দুধ রুটি chiken broth খান বারমাস।
নগেন রাঁধুনী পাকা, একা করে কি—
বসে বসে ঢালে শুধু খিচুড়িতে ঘি।

রান্নাঘরে কান্না আসে,—কাঠ সব কাঁচা,
অস্থির ধোঁয়ার চোটে দায় হল বাঁচা।
নুনে-পোড়া ডাল আর কঠিন চাপাটি,
হাসিমুখে পেটে পূরে সারাদিন খাটি।

পাঠায়ে দিয়েছে সঙ্গে Ladies Committe,
অনেক জিনিষ ভরা এই পুঁটুলিটি!
ঘটি বাটি থালা আছে, আর সেফ্‌টি পিন,
চিরুণী, বুটের লেশ, চিনি একটিন।
বোতাম, ছুরী ও ছুঁই, সেলায়ের সুতো,
ব্রুশ কালি তাও আছে সাফ কর্ত্তে জুতো।
বালিসের খোল, আর তেল একশিশি,
সাবান আরসী আছে হয়ে মেশামিশি।
তোয়ালে, চুরুট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেশলাই,
মশলা প্রভৃতি আরো যা খুঁজিবে তাই!
এখানেও লভিয়াছি জিনিষ অশেষ,
একে একে সব কথা করিতেছি পেশ।
ট্যাঁকৃটি ভেবনা ফোক্কা, আছে মুদ্রা ষাট,
তা হতে পেয়েছি এক মুর্দ্দা-ফেলা খাট্।
প্যাণ্ট, সার্ট, ব্রুশ আর কোমরের বেণ্ট,—
টুপিরও আশা রাখি,—made of felt।
একজোড়া Puttee আর একজোড়া মোজা,
শ্রীচরণে Boot, বাপ্! শ্রীগাধার বোঝা!
পেতে শুতে সতরঞ্চি, গায়ের কম্বল—
কম-বল হচ্ছিনাকো—উল্টে বাড়ে বল!
গলা-আঁটা অপরূপ খাকীর সে কোট,
সব নিয়ে হল এই বারো দফা মোট!

( ৩ )

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### (প্যারেড)

বিস্তৃত প্যারেড-মাঠ করিতেছে ধুধু,
ঘাস নেই, ছড়াছড়ি নোড়া-নুড়ি শুধু!
গলা-আঁটা কোট আর বুট-পটি এঁটে,
প্যারেড করিতে ছুটি চা ও রুটি সেঁটে।
ভীষণ রোদের তাতে ফাটে খোলা শির,
চোখ ছেপে ঝরে অহো! বরষার নীর!
ভদ্র বটে মিষ্টমুখ মাষ্টার-মশাই,
প্যারেড-জমিতে কিন্তু সাক্ষাৎ কসাই।
জবর চেহারাখানি, গোঁফে-ভরা মুখ,
নজরে পড়িয়া গেলে ভয়ে কাঁপে বুক।
দৈবে যদি ভুল হয়, দিবেনাকো ছাড়ি—
'কুঁইয়ামে গিরো' বলে উঠিবে ফুকারি!
দুই পায়ে দুই বুট—পাঁচসের ভারি,
তদুপরে রাইফেল—চলিতে কি পারি!
মাথা হেঁট হয়ে আসে, ভাঙ্গে বুঝি নাক,
পিছে হতে বলে উচ্চে "মুর্দ্দা উপর-তাক!"

যে-কোন অসুখ হলে Quinine mixture
গুরুতর হলে কিছু Iodine Tincture।
ডাক্তারের হাতে খালি এইমাত্র পুঁজি,
পথ্য পাবে হয় রুটি, নয় দুধ-সুজি।
রবিও বিস্যুৎবারে খাবে কুইনিন;
তা না হলে ম্যালেরিয়া করে দেবে ক্ষীণ!

## তৃতীয় অধ্যায়

### N. C. Os.

আমাদের মধ্যে আছে N. C. O গণ
একে একে তাহাদের দিব বিবরণ।
হাবিলদার মজুমদার অনাদি চাটুয্যে,
নায়ক বর্দ্ধন আর শ্রীদুর্গা বাঁড়ুয্যে।
অরুণ, ধীরেন সেন, Lance বিমল সিং,
শচীন, পটল আর তারক ফড়িং।
দাড়ী-কাটা ফনী-দাদা, বিশ্বেশ্বর ভায়া
কারিকর যিতু-ভাই প্রাণে বড় মায়া।

আম্বুলান্সে নারায়ণ পেন্সোন্নারী বেশে ;—
পাঠালেন ফটোগ্রাফ ভিন্ন ভিন্ন দেশে।
এর পরে আসিলেন জমাদার বোস,
বাঙ্গালীর আড্ডা পেয়ে দিল্ হল খোস।

বর্ণনা

পেটুক মজুমদার, ঘোরে-ফেরে বারবার
খাবার দেখিলে ছিনে জোঁক!
যা পাবে সে সোজাসুজি খাবে দুই চক্ষু বুঁজি
চায়ে মারে এতবড় ঢোঁক!
যশোর-জেলায় বাস করিয়া বি, এল পাস
কচ্ছিল উকিলী নিজ দেশে।
ছেড়ে গাউনের মায়া কাঁদায়ে মক্কেল-ভায়া
হঠাৎ হাজির রণ-বেশে।
অনাদি সে অনামুখো মেজাজ বড়ই রুখো
জলের ধারেতে নাহি যায়,
চেহারাটি ধূম্রবর্ণ ঘুমে আস্ত কুম্ভকর্ণ
তারে বুঝা দেবতার দায় ;
গতরটি মোটাসোটা চুলগুলি কটা কটা
কাহারও প্রতি নহে বাম।
রাত্তিরে দেখিলে পরে বুক দুরু-দুরু করে,
মনে মনে বলি রাম রাম!
অতি-ভোজে নন কাবু নায়ক বর্দ্ধন-বাবু
খেয়ে রুগ্ন, ড্রিলে কিন্তু ভালো,
মেজাজটি খিটখিটে চেহারাটি ফিটফিটে
দোষের মধ্যে বর্ণটি কালো।
আমাদের দুর্গা-ভায়া ডাক-নাম মহামায়া
দেহখানি মার্ব্বেল-সুগোল।
তার নাম দিল John রসিক সাহেবগণ
কাজে কুড়ে, মুখে লম্বা বোল!
শ্রীঅরুণ writer, পুলিনটি fighter
শিখেরা বলে আমুর বাবু।
শুতে পেলে মুখে হাসি, দু-বেলা বিছানাবাসী
ড্রিলে চটা,—জ্বরে জ্বরে কাবু।
Lance-বিমলচন্দ্র গড়নটি নহে মন্দ,—
—ম্যাগ্রিগর ফুটবল প্রায়।
প্যারেডেতে দিয়ে ফাঁকি বন্দুক রাখিতে ডাকি
ঘড়ি-ঘড়ি ঘড়ি পানে চায়!
ঘরে বসে থাকে বেশ রোগের নাইক লেশ
কাজের সময় পায়ে ব্যথা,
Skirmish করিতে নারে, কি-করে ড্রিল সে করে,
গুপ্ত কভু থাকে সত্য কথা?
Evening Roll Callএ মিনতি করিয়া বলে
'সেন-দাদা, বাঁচাও—দোহাই!'
সরে পড়ে ছুটি নিয়ে নিজ কর্ম্ম পরে দিয়ে
হাতে তুড়ি, মুখে মস্ত হাই!
(বিমলের বিবরণ, করিলাম withdrawn
আধসের জিলিপির লাগি,
বাদ রেখে কথা তার, পড়িও সকল আর,
হে পাঠক, এই ভিক্ষা মাগি।)
উদাস শচীন রায়, উল্কী-ভরা সারা গায়
মৌনব্রতী—গম্ভীর পেচক!
বই-হাতে, বিছানাতে সদা শুয়ে, কল্পনাতে
ছোটে তাঁর মানস-ঘোটক!
পটল অটল বীর চলে উঁচু করে শির—
বুদ্ধির ভাঁড়েতে মা-ভবানী!
গোঁফদুটি খাড়া খাড়া তাতে ঘন ঘন চাড়া
বৃদ্ধ-খোকা, হাসি মুখখানি!
বাঁড়ুয্যে তারকনাথ ভুঁড়ি-ভরে' মারে ভাত
এত খেয়ে, দেহটি বাঁখারি,—
চুলের বাহার ভালো, রং নয় তত কালো—
শ্যামকান্ত রোদে-পোড়া ভারি।

Rumea ফেলিছে অশ্রু তাহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু
কে দিয়েছে ছেঁটে বিলকুল,
অতিশয় গো-বেচারা, মারো-ধরো, নাই সাড়া,
রাগে কভু হয় না বেভুল !
খেলোয়াড় বিশ্বেশ্বর বিরস গলার স্বর
জন্ম তার নিজ-বর্দ্ধমানে,
ছাড়ি নবাবের খানা, সীতাভোগ মিহিদানা
ধন্য ধন্য, এসেছে এখানে !
বিশ্বকর্ম্মা যিতু-ভাই, মুখে টুঁ-শব্দটি নাই
একটুতে ভ্যাঁক্ করে কান্না !
লোকটা বড়ই ভালো, তবে কিনা, রংটা কালো
অমাবস্যা নাগাল পান্‌না !

হাবিলদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন।

---

# মাসকাবারী

## (৫) সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ

গতমাসের "ভারতী"তে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে রবিবাবুর আমেরিকার বক্তৃতাবিশেষ না পড়িয়াই তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রবিবাবুকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন এবং রবিবাবুর স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত বক্তৃতাগুলি পড়িয়া (অথবা শুনিয়া) জ্ঞাতসারে হোক্ বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক্ রবিবাবুর অনেক কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার থাকিলে তাহার জবাব দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দু একটা কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা প্রতিবাদ নয়, অপবাদ দিবার চেষ্টা। বাংলা দেশে এই চেষ্টাটা সম্প্রতি বিশেষ সুলভ হইয়াছে, কেননা বিদ্যা-বুদ্ধি বা গুণপনা অনেক লোকের পক্ষেই দুর্ল্লভ এবং এ চেষ্টায় তাহাদের সেরেফ কোন দরকারই নাই। সুতরাং যুক্তির মুখ বন্ধ করিবার উপযুক্ত মুখবন্ধ কতকগুলি লোকে স্থির করিয়াছেন, প্রতিপক্ষকে অভদ্র ভাষায় গালি দেওয়া। তাঁরা বেশ জানেন যে এ আর্টে কোন ভদ্রলোক তাঁদের হার মানাইতে পারিবেন না, কারণ ভদ্রলোক মাত্রেই ভদ্রতা জিনিসটার মর্য্যাদা জানেন। কিন্তু বাংলা দেশের বিস্তর 'ভদ্রলোক' এই আর্টে হাত পাকাইতে সুরু করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁদের লেখার সমজদারের ও খরিদ্দারের দল বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে বোধ হয় ছোঁয়াচে ব্যামোর মত গালি জিনিসটারও একটা ছোঁয়াচ আছে। কিম্বা বোধ হয় গালির বাঁধুনির মধ্যে একটা রসও বা আছে, যে রসটা ইতর রস হইলেও ক্রমশ ক্রমশ অনেক লোকেই তাতে স্বাদ পায়! ভয়ের যেমন একটা রস আছে যে-জন্য ছেলেপিলেরা যত বেশী ভয় পায় ততই ভূতের গল্প বা রাক্ষসের গল্প শুনিতে ভালবাসে, যেমন বীভৎস বলিয়া একটা রস আছে, যে জন্য বীভৎস হুক্কারজনক দৃশ্যের বর্ণনা পড়িয়া

বই বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইলেও কোন কোন লোকের সবটুকু পড়িবার জন্য মনটা উস্‌খুস্‌ করিতে থাকে, তেমনি বোধ হয় একটা গালি-রসও আছে এবং এ রসের রচনায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের নাম না করিলেও অনেকেই জানেন যে তাঁদের গালি-রস-রচনা পড়িবার জন্য গালি-রসিকদের মনটাও কিরূপ চঞ্চল হয়।

কোন্ সময় হইতে মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে এ রসের উৎপত্তি তাহা নির্ণয়ের জন্য ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন করে না। স্বদেশীর সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় 'সন্ধ্যা' কাগজে এই রসটাকে popularise বা সর্ব্বজনসুলভ করেন। তার আগে তাঁর চেয়ে সূক্ষ্মতর ভাবে এ রসের সৃষ্টি করেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয়। যিনি যাই বলুন, এক সময়ে হাতের কাছে "সাহিত্য" পাইয়া, মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা পড়িবার প্রলোভন সম্বরণ করা অতি বড় বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পক্ষেও সম্ভাবনীয় ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় যখন 'সন্ধ্যা' বাহির করিলেন, তখন সন্ধ্যার সময় ভদ্রাভদ্র সবাই মিলিয়া তাঁর স্থূল গালি-রস সাগ্রহে উপভোগ করিত, ইহা দেখিয়াছি। তবে ইতিহাসের সাল তারিখ মিলাইয়া দেখিলে এঁরাও এ আর্টে 'নভিস্'; কারণ বাস্তবিক ইন্দ্রনাথ, অমৃতলালই এ আর্টের সেরা আর্টিষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই। Satireএর সঙ্গে গালি মিশাইবার ওস্তাদি তাঁদের ছিল। শুনিয়াছি অমৃতলাল এখনকার কোন নামজাদা 'নভিস্' সম্বন্ধে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁর সযত্নরক্ষিত বহুকালের একটি 'ভাঁড়' উক্ত ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে এই ইতর রসটা কেন অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে, তার একটা কারণ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী চরিত্রের মধ্যে একটা লঘুতা ও আমোদপ্রিয়তা আছে। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গেই এ রসের উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং পশ্চিম হইতে উহা পূর্ব্ববঙ্গে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙালীর চরিত্রের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আছে; সাহসিকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে তারা পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীকে জিতিয়া আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম কৌতুক-হাস্য তাদের পক্ষে অসহ্য ছিল; ব্যঙ্গ-কৌতুক আরো অসহ্য ছিল। এখনও যে সম্পূর্ণ সহিয়া গেছে তা বলা যায় না; তবে অনেকটা সহিয়া আসিয়াছে বটে।

কিন্তু বাঙালী চিত্তের লঘুতাই এই লঘু ও ইতর রসের উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়। বাঙালী খুব অল্প দিন হইল নাগরিক সভ্যতায় দীক্ষিত হইয়াছে, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। আজকাল কবির গানের স্তুতির একটা ধুয়া উঠিয়াছে; যাঁরা স্তুতি করেন আশা করি তাঁরা তার সব ইতিবৃত্তান্তটা জানেন। কবির গানে দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ যতবেশী অশ্লীল ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালি দিতে পারিত, সে ততই বাহবা পাইত। আজ বিংশ শতাব্দীতে নাগরিক সভ্যতায় আমরা সভ্য হইলেও সেই কবির খেউড়ের প্রভাব সাহিত্যে যে আমরা বেশী দূর পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তার প্রমাণ মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে প্রত্যহই

এবং অজস্র পরিমাণেই পাইতেছি। তারপর সম্প্রতি বাংলার গ্রাম্য সভ্যতার মহিমা-কীর্ত্তন যে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সেই 'গ্রাম্যসভ্যতার' মধ্যে গ্রাম্যতা বলিয়া যে বস্তুটা ছিল এবং এখনও আছে, সেটা সভ্যতা কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কেননা দেখিতে পাই যে, উচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও এবং এত বছরের সহুরে সভ্যতার প্রভাব সত্ত্বেও সেই গ্রাম্যতার জড় মরিতেছে না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের জায়গায় এখন সংবাদপত্রের আসর তৈরি হইয়াছে, সেখানে গালির সোরগোল যত ইচ্ছা চড়াইলেও ভদ্রলোকের কানে তালা ধরে না, এবং গালির চালবোল কদর্য্যতার মাত্রা ছাড়াইলেও তাঁদের কান ফেরে না, বরং কর্ণদ্বয় আরো উৎকর্ণ হইয়া ওঠে।

গালির যে একটা রস আছে তাহা ত গোড়াতেই বলিয়াছি। কিন্তু ইউরোপে এক সময়ে ভদ্রলোকদের মধ্যেও Cockfightও bull-fight দেখারও ত একটা রস ছিল। ইংলণ্ডে পোপ ড্রাইডেনের আমলে এবং তারও পরে বাইরন প্রভৃতির সময়েও গালি-রসটা অথবা খেউড়-রসটাও সাহিত্যে বেশ জমিয়াছিল। তবে এখন বোধ হয় bullfightএর রস, তথৈব সাহিত্যে গালির রস, ইংরেজ বা ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভদ্রলোকেরা তেমন উপভোগ করেন না। কেননা, ভদ্রতার আদর্শটা যে সাহিত্যে ভদ্রলোকের রক্ষা করিয়া চলা উচিত, এ বিষয়ে ইউরোপীয় ভদ্র সাহিত্যে বোধ হয় একটা ষ্টাণ্ডার্ড ঠিক হইয়া গেছে।

অবশ্য প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চালাইবার সময়ে, হাস্য-কৌতুক বা ব্যঙ্গ-কৌতুকের যথেষ্ট অবকাশ আছে—চেষ্টরটন্, বার্ণাডশ, বা এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি হালের কোন লেখকই সে অবকাশটুকু একবার পাইলে ছাড়েন না। লালিকা বা parody এবং ব্যঙ্গচিত্র বা cartoonএর স্থান সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দিয়া অথবা তাহার যুক্তিকে ব্যঙ্গ না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া কিংবা তাহাকে অশিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া যে অদ্ভুত কৌতুক-হাস্যের অবতারণা করা হয়, তাহা অত্যন্ত গ্রাম্য এবং অভদ্র রসিকতার নমুনা।

বাংলা সাহিত্যে গ্রাম্যতা ও অশিষ্টতার রীতি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই ইতর রসের স্বাদে পাঠকসাধারণ একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, মার্জ্জিত রুচি-বিশিষ্ট রচনা আর তাহাদের মনে ধরিবে না, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে ভদ্র সাহিত্যিক মাত্রেরই কোমর বাঁধিয়া লাগা উচিত।

## "বাঙ্গলার কথা"

চিত্ত বাবুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সুদীর্ঘ অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করি নাই, শুধু তিনি কত জায়গায় রবিবাবুর লেখার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি ও রবিবাবুর প্রতি তাঁর অযথা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছি, ইহাতে কোন কোন খবরের কাগজ দুঃখ

প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবিবাবু যে সব মত প্রচার করিয়াছিলেন, সবুজপত্রের আমলে তাঁর সেই সব মত কি অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে? পরিবর্ত্তনটাই যে জীবনের ধর্ম্ম এবং জীবনধর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই পরিবর্ত্তনের লীলা অথবা অভিব্যক্তির লীলা যে জীবনের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দেখা যায়—এ কথা এমনি স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে ইহাকে গায়ের জোরেও অস্বীকার করা চলে না। রবিবাবুর জীবনের বিচিত্র বিকাশের ইতিহাসে নানা মত ও আদর্শ-বৈচিত্র্য দেখা যায়; বস্তুত বড় জীবন মাত্রেই এরূপ বৈচিত্র্য দেখা গিয়া থাকে। যেমন গ্যয়টের জীবনে যত বৈচিত্র্য, এমন ইউরোপীয় আর কোন মহাকবির জীবনে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বুদ্ধিমানও কেহ কেহ আছেন, যাঁরা জীবনের এই নৈসর্গিক অভিব্যক্তির দরুণ, জীবনে মতের ও আদর্শের যে সকল বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা ক্রমশ ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, তাহাকে স্বতোবিরুদ্ধতা (self-contradiction) আখ্যা দিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করেন। দেশপ্রীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে দেশের অনেক প্রথা ও আচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে সকল সমর্থন করেন না—তাঁর জীবনে চিন্তার বা অভিজ্ঞতার এই যে একটা বিকাশ, এটাকে স্বত-বিরুদ্ধতা বলিলে মানুষের জীবনের লীলাই আগাগোড়া স্বত-বিরুদ্ধ একথাও বলা যাইতে পারে। বাল্যটা যৌবনের স্বতবিরুদ্ধ, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থার স্বতবিরুদ্ধ, প্রৌঢ়ত্ব বৃদ্ধত্বের স্বতবিরুদ্ধ—এমন কথাও বলা যাইতে পারে, যদিচ 'স্বতবিরুদ্ধ' বলিতে আমরা তাহা বুঝি না। কোন মানুষের বিরুদ্ধে স্বতবিরুদ্ধতার অভিযোগ তখনি উপস্থিত করা যায়, যখন সে একই সময়ে একই অবস্থায় দুই রকমের বা নানা রকমের কথা বলে। আমরা তখন বলি এ লোকটা self-contradictory—এর মতের স্থিরতা নাই। কিন্তু অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গিয়া তারপরে যদি মানুষের মতের বদল হয়, (যেটা হওয়াই স্বাভাবিক), তবে তখন তাহাকে self-contradictory বলিবার কোন মানেই পাওয়া যায় না। যাই হোক্, চিত্তরঞ্জনবাবু রবীন্দ্রনাথের যে সকল আইডিয়ার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে এখনও সে সকল আইডিয়া ধরিয়াই বসিয়া আছেন, এমন কোন আভাষ আমরা কোথাও দিই নাই। শুধু বলিয়াছি যে 'Cult of Nationalism' অর্থাৎ বৈদেশিক nationalism সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটা কিছু নূতন মত নয়; "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং অন্যান্য প্রবন্ধে সেই একই কথা তিনি বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। জীবনের বিকাশ ঘটে বলিয়া মানুষের সমস্ত ভাব ও আদর্শেরই যে বদল হইয়া যায়, তার কোন প্রমাণ নাই। nationalism সম্বন্ধে রবিবাবুর মতের বদল হয় নাই, একথা বলিলে এটা বোঝায় না যে, তাঁর কোন মতেরই বদল হয় নাই, এইটাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

রবিবাবু এক সময়ে দেশকে যথেষ্ট

idealise করিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশকে realise করেন নাই। তিনি তখন তাঁর একটা মনগড়া ভাবুকতার আব্‌হাওয়ার মধ্যে গোটা দেশটাকে স্থাপিত করিয়া দেখিতেন, তাঁর সেই কল্পনা-প্রদীপ্ত দেশের রূপটাই তাঁর কাছে দেশের যথার্থ স্বরূপ ছিল। কখনো কখনো বাস্তব সেই কল্পনার প্রতিবাদী হইলে বরং কল্পনার উত্তাপে বাস্তবটা বাষ্প হইয়া উবিয়া যাইত, তবু কল্পনার কল্পলোক অটুট থাকিত। রবিবাবুর এই অবস্থার পরিচয় তাঁর নানা প্রবন্ধে ত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেই, অ-বিক্ষিপ্ত ভাবে সংহত ভাবে যদি এ পরিচয় কোথাও পাইতে হয়, তবে তাঁর 'গোরা' চরিত্রের গোড়ার দিকটায় তাহা পাওয়া যাইবে।

অভিভাষণে, চিত্তবাবু রবিবাবুর সেই "মোহমুগ্ধ" দেশপ্রীতির অবস্থার বিস্তর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াছেন। তিনি সাজিয়াছেন ঠিক্, কিন্তু সে সুর কোথায়? সে জোর কোথায়, সে আগুন কোথায়, সে দিব্য দৃষ্টি কোথায়, যার গুণে তখন ভাবীকে কবি পদেপদেই আবির্ভূত করিয়াছিলেন। রবিবাবু যখন "আত্মশক্তি"র মন্ত্র ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই হাসিয়াছিল, অথচ অনতিকালের মধ্যেই যখন স্বদেশীর সময়ে সেই আত্মশক্তির মন্ত্র আমরা গ্রহণ করিলাম, তখন রবিবাবুই যে সেই মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা এবং প্রথম উদ্গাতা তাহা কি দেশের সকল লোক স্মরণ করিয়াছিল? দেশের শিক্ষার ভার দেশের "স্বভাবসঙ্গত" করিয়া দেশের লোকেই গ্রহণ করিবে, একথা যখন রবিবাবু প্রচার করিয়াছিলেন এবং বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এ সম্বন্ধে একটা পরীক্ষাও সুরু করিয়া দিয়াছিলেন, তখন দেশের লোকের মন ত এ প্রস্তাবের অনুকূল ছিলনা। 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্' যখন সত্য-সত্যই গঠিত হইল, তখন তার আদর্শ যে বহুপূর্ব্বে রবিবাবুর দ্বারা দেশে রটিত হইয়াছিল, সে কথা কত অল্প লোকেই মনে করিতে পারিয়াছে। এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি রবিবাবুর মধ্যে একটা বিশেষত্ব বলিয়াই তাঁর মোহমুগ্ধ দেশপ্রীতির অবস্থায়, তিনি যে-সকল বাণী বলিয়াছেন, তার সকল অসঙ্গতি, সকল কাল্পনিকতা ও অবাস্তবতা, সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্বেও তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা জীবনপ্রদ। ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের জন্য তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

চিত্তবাবু বাংলার সেই 'জাতীয়তা' সম্বন্ধে, বাঙালী জাতির 'জাতিত্বের দাবী' সম্বন্ধে যে ভাবে এবং যেদিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রবল অনুভূতির সাড়া পাই। বাঙালীর জাতীয়তা যে বাঙালীর ইতিহাসেরই ফল—এ বোধটা বোধহয় বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় করিয়া এবং পরিষ্কার করিয়া বাঙালীর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেন্। সুতরাং চিত্তবাবুর সমস্ত অভিভাষণের মধ্যে গোড়ার এই অংশটুকু চমৎকার ও উপভোগ্য হইয়াছে। তার পরে বাংলার ভূতকালের অবস্থার কথা এবং এখনকার কালের জন্য নানা কাজের কথা যেখানেই তিনি পাড়িয়াছেন, সেইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং বাস্তব

জ্ঞানের অভাব প্রতিপদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে 'বাংলার কথা'টি গড়িয়াছেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেটা একটা মস্ত abstraction—সেটা কলিকাতাবাসী ভাবুকের বাংলা। আসল বাংলার অবস্থা তিনি বিশেষ কিছু জানেন অথবা আসল বাংলার ব্যবস্থারও তিনি বিশেষ কিছু খবর রাখেন তাতো তাঁর লেখা পড়িয়া আদপেই মনে হয় না।

চিত্তবাবুর ধারণা যে, সেকালে আমাদের সবই ছিল—'মুক্ত আকাশ', 'শ্যামল-পল্লীবীথি', মাঠভরা ধান, পুকুরের জল যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা সেগুলো এখনও আছে। কিন্তু মানুষের 'পরস্পরের প্রতি প্রীতি' ছিল, শান্তি, আনন্দ ও সুশৃঙ্খলা ছিল, মানুষ বলিয়া মানুষের মর্য্যাদা ছিল, "মন্দিরে মন্দিরে সাধনসঙ্গীত" ছিল, আর যাত্রা কথকতা কবির গানে বাংলা সাহিত্যের এক "অতল প্রাণ" ছিল—মুক্ত আকাশ ও শ্যামল পল্লীবীথি প্রভৃতি নৈসর্গিক তথ্যের সঙ্গে এই বাকী ক'টাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ইতিহাসকে পরিহাস করা হইবে। গ্রামের কোন্দল, দলাদলি, গালাগালি; পুরুষানুক্রমে শত্রুতাচরণ, কুৎসারটন, জমিদারে জমিদারে লড়াইয়ে স্বচ্ছন্দে প্রজাদের মস্তক ফাটন; গুরুপুরোহিতদের দুষ্ক্রিয়া, নীচ জাতদের স্পর্শদোষ ও তজ্জনিত নানারকমের মনুষ্যোচিত ব্যবহার; তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনের বিচিত্র অবৈধ যৌনসঙ্গমের ব্যবস্থা, কবির লড়াইয়ের অশ্লীলতা এবং পাঁচালীর প্রলাপ—এ গুলো বাংলার গ্রাম্যসভ্যতার যে রিয়ালিষ্টিক ছবিটা চোখের সাম্‌নে এখনো আনে তার উপর ভাবুকতার দুচার পোঁচ দিলেও তার বিশুদ্ধ রংটা কিছুতেই মরে না। ম্যালেরিয়া কিছু কম থাক্ বা পুকুরের জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল থাক্, দুধ, মাছ, চাল, ডাল, শাক্‌শব্‌জী এখনকার তুলনায় অনেক শস্তা থাক্, জীবনের মাহাত্ম্য ও মূল্যটা যে এখনকার চেয়ে সেকালের লোকে বেশি বুঝিত, এ বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। বাংলা গ্রাম ও বাংলা দেশের মানুষ মোটের উপর সমানই আছে, তবে গ্রামে ভদ্র পরিবার বেশি নাই বলিয়া তার জলাশয় দূষিত ও তার শ্রী-স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে এটা সত্য কথা বটে।

চিত্তবাবু মনে করেন যে আমাদের এই সমস্ত দুর্গতির একমাত্র কারণ আমরা নিজের আদর্শকে ভুলিয়া পরের আদর্শকে ঘরে তুলিয়া লইয়াছি। বিলাতী Industrialismই যত দুর্গতি যত অনর্থের মূল।

অবশ্য চিত্তবাবু এটা মানেন যে "শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব", ব্যবসাবাণিজ্য চাই। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার মত তারও নাকি একটা "বিশিষ্ট" বাঙালী পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিটা সংক্ষেপে হইতেছে, আমাদের "কুটীর-শিল্পের" পদ্ধতি। আমাদের হাতের তাঁত ছিল, তাতে মিহি কাপড় তৈরি হইত এবং অন্যান্য অনেক সূক্ষ্মশিল্পের কাজ এদেশে ছিল। কিন্তু আজ সেই সকল কুটীরশিল্প পশ্চিমের কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবেনা,

তাহা যে চিত্তবাবু 'নিশ্চিত' জানেন তাহা কবুল করিয়াছেন তবু তাঁর পণ এই যে, সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করা যাইতে পারে। কি উপায়ে? স্বদেশীর সময়ে আমরা যে উপায়কে প্রশস্ত মনে করিয়াছিলাম, সেই উপায়ে,—অর্থাৎ বয়কটের দ্বারা Industrialism বর্জ্জন করা যাইতে পারে। চিত্তবাবু বিদেশী পণ্য বয়কট করিতে বলেন নাই; তিনি তার চেয়েও বড় "অর্ডার" দিয়াছেন, একেবারেই "বিলাস বর্জ্জন" করিতে হইবে, বলিয়াছেন। "মোটা কাপড়" আমাদের "কটিতে ব্যথা" দিলেও "তাহা সহ্য করিতে হইবে," Industrialism সমস্যার এই তাঁর সহজ সমাধান। অতএব প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আর রহিল কোথায়? দেশশুদ্ধ লোক মানব-প্রকৃতিটাকে এম্নি রাতারাতি বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, হঠাৎ বিলাস-বাসনা দূর করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে, এতটা আশা কোনদেশের মানব-গুরুরাও করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাক্, এই গেল একটা তাঁর বড়গোচের practical programme, অথবা ১নং নৈতিক উপদেশ। আমাদের বিবেচনায় "বাঙ্গলার কথা" নামটার বদলে "নীতিকথা" নাম দিলে তাঁর পুস্তিকাখানি সার্থকনামা হইত। কারণ নীতিকথার চোটেই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। চিত্তবাবু রবিবাবুর অনেক আইডিয়ার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্র্যাক্‌টিক্যাল প্রোগ্রাম তথৈব নীতি-উপদেশগুলি প্রায় তাঁর নিজস্ব। অবশ্য স্বদেশীর সময়ে শুধু রবিবাবু কেন, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে কুটীরশিল্প উদ্ধারের দ্বারা ও বিদেশী পণ্য বয়কটের দ্বারা আমাদের ব্যবসার উন্নতি হইবে। কিন্তু এখনও এত পরীক্ষা ও অকৃতকার্য্যতার পরেও সে বিশ্বাস একা চিত্তবাবুর ছাড়া আর বোধ হয় কাহারও নাই। তার পর, লোকশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব তাহা একটু পরেই দেখা যাইবে।

বস্তুত চিত্তবাবুর সব "কাজের কথা"-গুলিই এম্নিতর, অর্থাৎ অকাজের কথা। তিনি একস্থানে চাষার দ্বারা নানা শিল্পপণ্য প্রস্তুত করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, সব কৃষক নিজের হাতে লাঙল ধরিতেও চায় না, মজুরের দ্বারা সে কাজ করায়। তারপর চাষী চাষের কাজ ছাড়া আর অন্য কোন শিল্পকর্ম্ম করিবেই না, কেননা কাজ-অনুসারে আমাদের দেশে জাত তৈরি হয় এবং নিজের নিজের জাত-ব্যবসায় বজায় রাখাই জাত রক্ষার প্রশস্ত উপায়।

লোকশিক্ষা সম্বন্ধে যাত্রা কথকতা, কবি-গান, ভাগবত-পাঠ, চণ্ডীপাঠাদি শিক্ষা-বিস্তারের যে সকল সাবেক ব্যবস্থা ছিল সেইগুলিই চিত্তবাবু যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। কারণ, তাঁর আর একটি অপূর্ব্ব বিশ্বাস এই যে মনুষ্যত্বে আমাদের চাষারা কোন রকমেই আমাদের চেয়ে "কম নয়"। ইংরাজী শিক্ষাটা তাঁর মতে দেশে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, সুতরাং চাষাদের পক্ষে সে শিক্ষার আবশ্য-

কতা নাই। তার পর, তারা ত মানুষ আছেই, শুধু ক খ গ জানেনা বলিয়া "দুই একটা নৈশ বিদ্যালয়" হইলেই "আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে"। আর যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবির গানের শিক্ষাপ্রণালী ত পড়িয়াই রহিয়াছে। অথচ গ্রামেগ্রামে থিয়েটার-পার্টির প্রভাবে যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি যে প্রায় উঠিয়া গেছে সে খবরটা চিত্তবাবু বোধ হয় ভাল করিয়া রাখেন না। এবং নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারা শিক্ষাবিস্তার যে কেমনতর হয়, তারও কোন অভিজ্ঞতা বোধ হয় তাঁর নাই। এ সব শিক্ষার ব্যবস্থা ফুটা কলসীতে জলঢালার মত, কারণ শিক্ষালাভের কিছুমাত্র আগ্রহ চাষীদের মধ্যে নাই। compulsory free education ভিন্ন চাষাদের শিক্ষা হইতেই পারে না।

স্বর্গীয় গোখ্‌লে মহোদয়ের সেই Compulsory Primary Educationএর প্রস্তাবের পর লোকশিক্ষা সম্বন্ধে এমনতর অদ্ভুত অসঙ্গত কথা সাহস করিয়া প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে কেহ বলিতে পারেন, এটা আমাদের কাছে অদ্ভুততর ঠেকে। ইংরাজী শিক্ষার যতই কুফল থাকুক, তাহা যে বাঙালীর নব জাতীয়তাকে উদ্বোধিত করিয়াছে, বাঙালীকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় সাধন করাইয়াছে এবং তাহার মনের কৌলিক, দৈশিক ছোট বড় নানা ক্ষুদ্র সংস্কারের জাল ছেদন করিয়া বিশ্বমনের সঙ্গে ভাবের স্বাধীন আদান প্রদানে তাহাকে রত রাখিয়াছে, এ সব কথা স্বদেশিকতার মোহে পড়িয়া অস্বীকার করা যাইতে পারে তাহা ত জানিতাম না। চিত্তবাবু যে বাংলার কথা লিখিয়াছেন, একশো বছর পূর্ব্বে বাংলার 'মুক্ত আকাশের' তলায় বসিয়া পল্লীবাসী কোন সেকেলে বাঙালী কি এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন, না এ সব কথা ভাবিতে পারিতেন? অতএব সেই ইংরাজী শিক্ষার ষোল আনা ফলটুকু আমরা চিরকাল ভোগ করিতে থাকিব,—কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুলিয়া দিতে হইবে এ কথা চিত্তবাবু বলেন নাই, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির গান পাঁচালী ইত্যাদি পড়ানো হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যে সে ফল হইতে চাষারা যেমন বঞ্চিত আছে তেমনই বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির কোন বিকাশ না ঘটুক্, তাদের মূঢ় সংস্কার কোনদিন না ঘুচুক্, কালের সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে তারা সকল রকমেই অক্ষম হোক্ এবং তাদের সেই অক্ষমতা ও জড়তার প্রকাণ্ড বিপুল টানে তার সমস্ত জাতিটাকে শুধু ক্রমাগত নীচের দিকে টানিতে থাকুক্। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে দেশের এই অশিক্ষিত সাধারণের যোগ নাই, ইহা লইয়া সভাপতি বিলাপ করিতে বাকী রাখিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আমাদের কোন্ কমিটীতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্যশ্রেণীভুক্ত?" যারা সামান্য একটা ওকালতনামা পড়াইবার জন্য এর তার খোসামোদ করিয়া মরে, নিরক্ষরতার জন্য দুনিয়ার কিছুই যারা বোঝেনা, তারা প্রভিন্‌শ্যাল-কন্‌ফারেন্স-কমিটির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত নয় বলিয়া এদিকে সভাপতি অশ্রুপাত

করিতেছেন, অথচ ওদিকে তাদের ইংরাজী শিক্ষার দরকার নাই এবং মোটের উপর কোন শিক্ষারই দরকার নাই এটাও তিনি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আশ্চর্য্য!

উচ্চশিক্ষিত আমাদের সঙ্গে আর অশিক্ষিত চাষাদের এই অসামঞ্জস্য যে তাদের শিক্ষার অভাবের দরুণ, এ কথাটা চিত্তবাবু একবার ভাবিয়া দেখিলেন না ইহাই আশ্চর্য্য! দু একটা নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারাই এই প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যটা দূর হইয়া যাইবে? কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন অসম্ভব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছে কি?

এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য চিত্তবাবুর দ্বিতীয় নম্বরের নৈতিক উপদেশ এই যে "উচ্চশিক্ষার অভিমান," "অর্থের অভিমান "বর্ণের অভিমান", এ সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। এ জায়গায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা তাঁর এই অপূর্ব্ব নীতি-উপদেশ সত্ত্বেও আর একটি চমৎকার উপভোগ্য প্রসঙ্গ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন নাই এবং "ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের মধ্যে কার্য্যগত কোন পার্থক্য" যখন তিনি দেখিতে পান না, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অস্তিত্বের তাৎপর্য্যটা বুঝা যায় না। কিন্তু এই কথা বলিয়াই তিনি "সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চান্ না" বলিয়া দিব্য পাশ কাটাইয়া গেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ জাতিভেদ ভাঙিতেই হইবে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গেই "তাহা ভাল কি মন্দ" "তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না," বলিয়া

দিয়াছেন। তাঁর ধারণায় আমাদের চাষারা তো আমাদের চেয়ে মনুষ্যত্বে বেশি অগ্রসর,—কিন্তু বর্ণের সংস্কারটা তাদের মধ্যে যত প্রবল, আচার বিচারের সহস্র বাধায় তারা যতটা ব্যাহত, এতটা বোধ হয় আমরা নই। কেননা, শিক্ষার জন্য আমাদের মনের অনেকটা প্রসার হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকের তাহা মোটেই হয় নাই। যাত্রা কথকতা, কবির গান, পাঁচালী, হরিসংকীর্ত্তন সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই অন্ধ সংস্কার, ব্রাহ্মণের এই অর্থহীন আধিপত্য, এদেশ হইতে একটুও শিথিল হইল না কেন, চিত্তবাবু চিন্তা করিয়া দেখিলে পারেন।

যাহাই হৌক্, "মনকে চোখ ঠার" না দিয়া, "ভাবের ঘরে চুরি" না করিয়া এবং ধর্ম্ম-উপদেষ্টা চিত্তবাবুর নীতি-উপদেশগুলি সুবোধ বালকের মত সম্পূর্ণ পালন করিয়াও আমরা তাঁর বাংলার কথার মধ্যে বাংলার কথাই সবচেয়ে অল্প পাইয়াছি। আসল বাংলার কথা,—বাংলার আসল ইতিহাস, সমাজ ধর্ম্ম সাহিত্য, অনুষ্ঠান-উৎসব, কৃষিবাণিজ্য, বাংলার ভাব ও অভাবের কথা বাঙালীর জন্য এখনও কেহ তৈরি করেন নাই এ কথাটা লজ্জার সহিত আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

## নবীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিযোগ

"ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে"র বৈশাখ সংখ্যায় "সাহিত্যে নবীন পন্থা" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে নবীনপন্থী সাহিত্যিকেরা নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়া বড্ড

বান যে "রমণী কেবল নায়িকা নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী", এবং "নারীত্বের পরিসমাপ্তি পত্নীত্বে নয় মাতৃত্বে"।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লেখকদের একটা মহৎ দোষ দেখিতে পাই এই যে, সব সময় তাঁদের চিন্তা একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না, সুতরাং কোন চিন্তারই একটা সুবিহিত ক্রম পাওয়া যায় না। পাঠকদের কাছে তাঁরা তাঁদের যে সব ভাবনা নিবেদন করেন, তাহা পড়িয়া অনেক সময়ে তাঁদের সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হয়। "সম্মিলনের" লেখকের বিষয় হইতেছে, সাহিত্যের নবীন পন্থা—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, নবীন সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্যটা কেন? সুতরাং পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার, নারীর শরীর ও মনের গঠন, সেই গঠন অনুসারে সমাজে তাহার কিরূপ স্থান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ স্থান হওয়া উচিত, ইত্যাদি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-ঘটিত সামাজিক প্রশ্ন তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়। অবশ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে সমাজের কোন প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই যে রসভঙ্গ হয়, এমন কথা বলি না; কিন্তু সাহিত্যের সীমার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা যদি বদ্ধ না থাকে, সাহিত্যের আলোচনা যদি সামাজিক আলোচনা হইয়া দাঁড়ায়, তবে তখন লেখককে এই কথাটুকু স্মরণ করানো দরকার হয় যে, সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়, সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে সেটা ভবিষ্যতে আলোচনা করিলেই চলিবে, উপস্থিত সাহিত্যের নবীন পন্থা সম্বন্ধে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাঁর কি বলিবার আছে, তাহাই শোনা যাক্।

সমাজে রমণীর sphere বা কর্ম্মক্ষেত্র কতখানি সেটা ভিন্ন আলোচনা, রমণীর পত্নীত্বটা বড় না মাতৃত্বটা বড় তাও একটা সামাজিক প্রশ্নের বিষয়। তবু লেখক যখন সে সম্বন্ধেই মাথা ঘামাইয়াছেন তখন এইমাত্র বলা দরকার যে, সে সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা পূর্ব্বে পূর্ব্বে হইয়া গেছে এবং এখনও যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। মিল, হক্সলি, হর্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ; যাঁরা sex-psychology লিখিয়াছেন এমন জার্ম্মান ও ইংরেজ বিস্তর লেখক; Sex-Evolution সম্বন্ধে বায়লজির দিক্ হইতে ডারউইন, ওয়াইস্‌ম্যান, ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক; স্ত্রীজাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে যাঁরা খবরদারি করিতেছেন তাঁরা; স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকায় শিক্ষাপ্রণালী লইয়া যাঁরা পরীক্ষা করিতেছেন—এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে এই বড় প্রশ্নটার সদুত্তরের চেষ্টা করিতেছেন। মাসিক পত্রের একটা ছোট প্রবন্ধের মধ্যে এতদিনব্যাপী ও এত বিচিত্র আলোচনার ফলগুলিকে ব্যক্ত করিতে যাওয়া নিষ্ফল চেষ্টা হইবে। অতএব সরাসরি এ সব আলোচনার নামগন্ধ না করিয়া রমণীর মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ এবং মাতৃত্বই তাহার পূর্ণ অধিকার এমন সিদ্ধান্ত অজ্ঞ পাঠকদের মাথার উপর বিজ্ঞভাবে বর্ষণ করাটা পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ দুই রকমেরই বর্ষণ হইতে পারে।

আলোচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হন্, যেমন ওগস্ত কঁত বা লরা হান্সন্ (স্ত্রীমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম স্ত্রীমনস্তত্ত্ববিদ্) বা রস্কো, অথবা স্পেন্সার, ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি—এঁদের কারো নামোল্লেখ পর্য্যন্ত লেখক করিলেন না এবং এ বিষয়ে আধুনিক যাঁরা লেখক তাঁদেরও নামোল্লেখ করিলেন না—কেবল Treitschke বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির স্বাধীন অধিকারের আইডিয়া "অশুভকর," তাঁকেই এ সম্বন্ধে লেখক একমাত্র "অথরিটী" খাড়া করিয়া বসিলেন। এ হেন অসম্পূর্ণ আলোচনার কোন মূল্য দাঁড়ায় কি?

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিচার বিষয়ে এই সব আলোচনার ধাক্কা যে সাহিত্যে আসিয়া পৌছিতেছে না তাহা বলিনা। আধুনিক সাহিত্যে sex-problem অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে এ সকল সমস্যা যে-ভাবে দেখা দেয়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহাদের যে রকমের সমাধান হয়, তাহার দ্বারাই যে সমাজ চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা মনে করিবার কোনই হেতু নাই। ইব্সেনের Ghosts অথবা The Pillars of Society, ষ্ট্রীন্ড্বার্গের Father অথবা The countess Julie, হাপ্ট্ম্যানের Rose Berntd, বার্ণাডশয়ের The Devil's Disciple, ব্রিয়ের The Maternity, ইত্যাদি সামাজিক নাট্য পড়িলে ইউরোপীয় সমাজের যে বীভৎস চেহারাটা আমাদের চোখের সাম্নে উপস্থিত হয়, বাস্তবিকই ইউরোপীয় সমাজটা কি তাই? আর বাস্ত-

উচ্ছৃঙ্খলতা ও কদর্য্য দুর্নীতিগুলাকেই, "সম্মিলনের" লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে "চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায়" বলিয়া স্থির করিয়াছেন? আমার মনে হয়, রস-সাহিত্যের ঘাড়ের উপর কোন রকমের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের বোঝা চাপানোটাই ঠিক নয়। প্রথমতঃ, সামাজিক নাট্য সমাজের ফোটোগ্রাফ নয়, কারণ কোন আর্টই জীবনের ফোটোগ্রাফ নয়। আর্টের রিয়ালিজম্ বা বস্তুতন্ত্রতা সমাজের বাস্তবতার সামিল নয়। আধুনিক সমাজের কতগুলো বিশেষ সমস্যা, কতগুলো বিশেষ অবস্থা, মানব-চরিত্রের কতগুলো অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন দিক্—যেসব দিক্ সামাজিক সংস্কারের আবরণে দিব্য আবৃত থাকে ও সচরাচর গোচর হয় না—সেই সব নূতন মালমসলা আধুনিক সাহিত্যিকদের কল্পনাকে নূতন নূতন আর্ট-রূপ সৃষ্টি করিবার দিকে উত্তেজিত করিতেছে এবং তারি ফলে এই সামাজিক নাট্যগুলি তৈরি হইতেছে। সুতরাং এ সকলও সম্পূর্ণরূপেই কল্পনার সৃষ্টি। তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, সব বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির মতই এ সকল নাট্যও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বহন করিতেছেনা। তা যদি করিত তবে ইব্সেন্ বা হাপ্ট্ম্যান বা ষ্ট্রীন্ড্বার্গ কিম্বা বার্ণাডশ বা শেকফ্ বা ব্রিয়ে প্রত্যেকেই সম্মিলনের লেখকের মত এক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দিতেন। আর তাই যদি তাঁরা করিতেন, তবে নাটক নভেল না লিখিয়া sex-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিম্বা সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণা করাই উচিত হইত।

আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা আর্ট হইলে, ধর্ম্ম ও নীতিউপদেষ্টা এবং ইস্কুলমাষ্টারেরা সবাই আর্টিষ্ট হইতেন সন্দেহ নাই। এবং রসসাহিত্য যে তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিত না সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাক্ সে কথা। ইব্‌সেন্ প্রভৃতির নাট্যকে যে বিশুদ্ধ আর্ট হিসাবে দেখিতে হইবে তার আরও কারণ এই যে, তাঁরা সবাই সমাজের সমস্যাকে একই রকম করিয়া দেখান্ নাই, মানব-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দিকগুলিও একই ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিই বিচিত্র, কেননা তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট। যেমন ধরুন সমাজের চারিপাশের সংস্কার মানুষের স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে চাপিয়া-চুপিয়া রাখে, মানুষ সেই সব বাধাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে কি অবস্থায় কেমন করিয়া বাধ্য হয়—বোধ হয় এটা ইব্‌সেন্ যতটা দেখাইয়াছেন, মানুষের অন্তরের প্রচ্ছন্ন গ্লানিগুলিকে তিনি ততটা ঘাঁটাইয়া তোলেন নাই। কিন্তু ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ, হাপ্‌ট্‌ম্যানের মধ্যে সেই গ্লানি, সেই পাঁকগুলিকে ঘাঁটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বেশি দেখিতে পাই। আবার ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গের মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য যতটা উজ্জ্বল, এমন বোধ হয় আর কারো মধ্যে নয়। তার দৃষ্টান্ত তাঁর The Connecting Link নাট্যটি। সেখানে—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দূষিত চরিত্র, তবু সন্তান উভয়ের মধ্যে বন্ধন হইয়াছে। এমনি করিয়া দেখা যাইবে যে তাঁরা সবাই নূতন নূতন দিক্ হইতে সৃজন করিয়াছেন। তাঁরা কেহই কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁরা কোন উদ্দেশ্য খাড়া করেন নাই। অবশ্য তাঁদের এই সব সৃষ্টি মানুষের মনে মনে নব নব চেতনা সঞ্চারিত করিতে করিতে সমাজকেও প্রবল ভাবে আঘাত করিবে সন্দেহ নাই। সাহিত্য মাত্রেই তাহা করিয়া থাকে। কিন্তু সমাজকে মুখ্যভাবে চিত্রিত করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, সমাজ-সমস্যার একটা স্থির সমাধান খাড়া করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের রচনা সাহিত্যই—সমাজ-বিজ্ঞানও নয় অথবা সমাজ-নীতিও নয়।

লেখক ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন কিরূপে এবং কেন আদিরসই আজ পর্য্যন্ত "সাহিত্যের সাড়ে পনেরো আনা দখল করিয়া বসিয়াছে।" তাঁর মনের ভাব এই যে, মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে পৃথিবীর কাব্য উপন্যাসের যতটা ব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল তারা ততটা ব্যস্ত হয় নাই এবং আজও পর্য্যন্ত হইতেছে না, এটা বড়ই খেদের কথা। কেননা, মাতৃস্নেহ নায়িকার প্রেমের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সমাজের দিক্ হইতে মাতৃস্নেহের মূল্য নায়ক-নায়িকার স্বাধীন প্রেমের মূল্যের চেয়ে বেশি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের কাছে মাতৃস্নেহের মূল্য তত বেশি হয় নাই। তার কারণ মাতৃস্নেহের যেটা রস, তার মধ্যে নব নব উন্মেষ নাই, সুতরাং নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, যার আর এক নাম প্রতিভা, সে রস লইয়া ততটা কারবার করিতে রাজি হয় নাই। যে রসে নব নব উন্মেষ, নব নব বিস্ময়, তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা থাকে—সেইজন্যই তাহা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। কারণ, সাহিত্যের প্রধান কাজই অনির্ব্বচনীয়কে বচন দেওয়া।

কিন্তু আদিরস বলিতে আমরা যা বুঝি, সাহিত্যে যুগলপ্রেমের যে বিচিত্র রস এ পর্য্যন্ত

সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই 'আদিরসের' কোটায় পড়ে না। কারণ, যুগল প্রেমের রস বলিতে শুধুই কামপ্রবৃত্তি বা ভোগলালসা বুঝায় না। কোন বড় প্রেমের কবি,কোন বড় ঔপন্যাসিক একান্ততঃ ভোগ-লালসার কবি অথবা চিত্রী নহেন। আধুনিক কালের এমন কোন "বড়" উপন্যাসের নাম করিতে পারি না, যেখানে ভোগলালসার চিত্র ভোগলালসাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের শুভ্র নির্ম্মলতায় উত্তীর্ণ হয় নাই। "ঘরে বাইরে"র পরিণামটা খারাপ এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীও অসতী, ঘরে-বাইরের নায়িকা বিমলাও অসতী; কারণ তারা পতি থাকিতেও অন্য পুরুষকে মনে মনে কামনা করিয়াছে। কিন্তু মানুষের এমন কোন পাপ হইতেই পারে না, যে পাপ হইতে তাহার উদ্ধার নাই। সমাজে আমরা সে উদ্ধারের চিত্র সবসময়ে দেখিতে পাইনা বটে, কেননা সমাজের সংস্কার এবং শাসন এ সম্বন্ধে নিদারুণ। কিন্তু সাহিত্যে দেখিতে পাই। সেখানে Tolstoyএর Resurrectionএর বারাঙ্গনা মাস্লোভারও উদ্ধার হয়; সেখানে ডষ্টয়ভ্‌স্কির Crime and Punishmentএর দেহবিক্রয়কারিণী সোনিয়ারও সতীমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই পরিণামটাই সাহিত্যে বিশেষ করিয়া দেখিবার বিষয়, মাঝখানের অভিব্যক্তিটা নয়। এবং বাংলাদেশের এই লেখকটির ন্যায় এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখকেরও মনে রাখা উচিত যে ভোগের জীবন পার হইয়া ভোগ-ক্ষুব্ধ জীবনে উত্তীর্ণ না হইলে, এই পরিণামের চিত্র কোন সাহিত্য-স্রষ্টাই আঁকিতে সমর্থ হন্ না। শেক্‌স্‌পীয়র মাঝ-বয়সে তাঁর ট্রাজেডিগুলি লিখিয়াছিলেন; শেষ বয়সে লেখেন সেই ট্রাজি-কমেডিগুলি যাহাতে মাঝখানের জাঁকালো অভিব্যক্তির চেয়ে পরিণামের আভাসই বেশি, কুরুক্ষেত্র পর্ব্বের পরেই শান্তিপর্ব্বের সমাপ্তির কথা আসিয়াছে। গ্যয়টে বেশি বয়সেই ফাউষ্টের দ্বিতীয় অংশ শেষ করিয়াছিলেন, "Elective Affinities" নামক sex-problem সম্বন্ধীয় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। টল্‌স্‌টয় তাঁর উচ্ছৃঙ্খল যৌবন-বয়সে নয়—প্রবীণ বয়সেই অ্যানাক্যারেনিন্‌ ও রিসারেক্‌শন্‌ লিখিয়াছিলেন। "সুতরাং "রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অঙ্কে 'ঘরে বাইরে' লিখিতে পারিয়াছেন; আজ যখন তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার ঋষিত্ব প্রতিপাদনের এবং তাঁহার কাব্যের সহিত মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই সময়েও রবীন্দ্রের লেখনী একটা অনেকেরই মতে নিন্দিত প্রেমলীলা প্রসব করিতে পারিয়াছে"—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" লিখিয়াছিলেন সে বয়সে "চোখের বালি" বা "ঘরে বাইরে" লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নভেল পরিণত বয়সেই পাকা হয়। পরিণত বয়স হইলেই সাহিত্য-স্রষ্টা "মোহমুদ্গর" বা "বৈরাগ্যশতক" লিখিতে থাকিবেন, ইহা যাঁরা সত্যসত্যই মনে ভাবেন, তাঁরা আর যাই করুন সাহিত্য-সমালোচনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।




ব্যঙ্গ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ ]　　শ্রাবণ, ১৩২৪　　[ ৪র্থ সংখ্যা

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক

চৈত্র এবং বৈশাখ সংখ্যার "নারায়ণে" "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক এক ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক যেন স্বাধীনভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত ও তৎকালীন ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাঠকদিগকে এরূপ বুঝিতে দিয়াছেন। অথচ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত সুবিস্তৃত গ্রন্থ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিতই যে "নারায়ণে"র লেখকের একমাত্র অবলম্বন ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না এবং উক্ত জীবন-চরিত-পাঠক মাত্রেরই নিকট ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব মাত্রও করে না। কিন্তু লেখক নানাস্থানেই অজিতবাবুর সেই জীবনচরিতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ অজিতবাবুর বা তাঁহার লিখিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই— "প্রতিবাদকারী" বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় যে অজিতবাবু তাঁহার পূর্ব্বে লিখিত স্বাধীন গবেষণার প্রতিবাদ করিয়াছেন পরে, নহিলে তাঁহাকে "প্রতিবাদকারী" নাম দিবার সার্থকতা কি? কে প্রতিবাদকারী, কাহার রচনার প্রতিবাদ করা হইতেছে, ইহা পাঠকবর্গকে জানিতে দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। কারণ, অধিকাংশ পাঠকই হয়ত অজিত বাবুর গ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, কেহ কেহ গ্রন্থের নামমাত্র শ্রুত আছেন, কাহারও কাহারও তাহাও না জানিবার সম্ভাবনা। এরূপ ভাবে প্রতিবাদের কারণ কি? পাছে অজিতবাবুর গ্রন্থের সহিত লেখকের প্রতিবাদ কেহ মিলাইয়া পাঠ করেন এবং তাহা হইলে লেখক যে ঐ গ্রন্থ হইতে তথ্য ও তারিখ প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ধরা পড়ে, এইজন্য কি লেখক গ্রন্থকর্ত্তার নাম করিতে বিরত হইয়াছেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি—স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে একজন অসাধারণ ঈশ্বর-নিষ্ঠ সাধক বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ কি ব্রাহ্মসমাজ, সকল

সমাজের ব্যক্তিরাই তাঁহার মহৎ চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, স্বদেশ-হিতৈষা ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। এরূপ বঙ্গবাসী অল্পই আছেন যিনি তদীয় "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হন্ নাই। সেই মহাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া যে সকল অভদ্র ও অসংযত ভাষা 'নারায়ণে'র লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং লেখকের বিকৃত রুচির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এরূপ রচনা যে 'নারায়ণের' ন্যায় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে স্থান পাইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে লিখিতেছেন—"তাঁহার শাস্ত্রের দোহাই ও যুক্তির বড়াইয়ের উত্তরে" ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথকে একস্থানে বলিয়াছেন—"অজ্ঞ অনধিকারী"—আর একস্থানে লিখিতেছেন, "তিনি সমস্ত সংস্কার যুগ ভরিয়া এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত 'অচলায়তনের' মত পড়িয়া থাকেন।" অথচ যে সকল কারণে এই সকল অভিযোগ, সে সকল কারণ সম্পূর্ণরূপেই লেখকের অনুমান-প্রসূত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষভাবপ্রসূত।

বৈশাখের "নারায়ণে" লেখক মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি "অবিচার" করিয়াছেন, বৈষ্ণব "তত্ত্ব বিচারের সম্পর্কেও তিনি পাণ্ডিত্যের অভাবই দেখাইয়াছেন" এবং তিনি "বৈষ্ণব সাধনায় অনধিকারী ছিলেন"। এগুলি উক্তিমাত্র, ইহাদের সমর্থনে লেখক কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং রামমোহন রায়ের "পাণ্ডিত্যের অভাব" দেখাইবার মত সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লেখকের নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এত বড় স্পর্দ্ধার উক্তি করিতে আধুনিক কালের অনেক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ইতস্ততঃ করিতেন সন্দেহ নাই। তারপর কোন্ ধর্ম্মসাধনায় রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ অধিকারী বা অনধিকারী ছিলেন তাহাও নির্দ্দেশ করিতে ইনিই সুযোগ্যতম ব্যক্তি, কারণ রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও অধ্যাত্ম সাধনায় কোন ব্যক্তি অধিক অগ্রসর না হইলে এরূপ মত প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হন্ না। এই সকল বালসুলভ অথচ জ্যাঠামিপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিতে যে লেখকের লজ্জাবোধ হইবার কিছুমাত্র কারণই নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যাঁহারা ছাপেন বা যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বোধ নিশ্চয়ই থাকার কথা। তাঁহারা কি না পাঠ করিয়াই প্রবন্ধ ছাপেন?

মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু আলোচনা এ দেশে হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে বলিবার অনেক কথাই থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল সাধক মূর্ত্তিপূজাকে মানেন নাই তাঁহাদিগকে সে জন্য অশ্রদ্ধাপূর্ণ বা ব্যঙ্গপূর্ণ বিশেষণে বিশিষ্ট করিবার তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজার বিপক্ষে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কিংবা তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-

সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে বহুবহু সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিবাদোক্তি আছে। ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে অস্বীকার করেন নাই। নানকপন্থী কবীরপন্থী দাদুপন্থী প্রভৃতি 'পন্থা'গুলি এদেশে তাহা হইলে স্থান পাইতেই পারিত না। কবীর বলিয়াছেন—

"প্রতিমা সকল তো জড়হৈ
বোলে নহিঁ, বোলায় দেখা।
পুরাণ কোরাণ সব বাত হৈ
য়া ঘটকা পর্দ্দা খোল দেখা।"

অর্থাৎ প্রতিমাগুলি সব জড় পদার্থ, কোন কথা বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। এবং পুরাণ কোরাণ কেবল কথা—পর্দ্দা তুলিয়া আমি তাহা দেখিয়াছি। অথচ সেই কবীরকে সাধক বলিতে ভারতবর্ষের কিছু মাত্র দ্বিধা হয় নাই। কেহ তো নারায়ণের লেখকের মত ঐ প্রশ্ন করে নাই, "হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিবার কি অধিকার তাঁর ছিল, তাহা আমরা জানিনা"। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কি পরিমাণ ছিল, তাহাও ওজন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা কেহ অনুভব করে নাই। মূর্ত্তিপূজা বা যে কোন পূজাবিধিকে অস্বীকার বা স্বীকার করিবার অধিকার অধ্যাত্ম সাধকেরই আছে,নানা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের নাই—ইহা ভারতবর্ষের লোক বিলক্ষণ অবগত আছে। কিন্তু কোন সাধকের সাধনা সম্বন্ধে বাচালের মত মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকারটা কোন্ শ্রেণীর অধিকার?

তৎপরে লেখক Vedantic Doctrines Vindicated নামক ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ অজিতবাবুর গ্রন্থ হইতে কিছুমাত্র স্বীকার না করিয়া সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, অজিত বাবুর "গরজ বড় বালাই",—সেই কারণে তিনি Vedantic Doctrines Vindicated প্রবন্ধমালার আসল লেখক দেবেন্দ্রনাথকেই স্থির করিয়াছেন। অজিত বাবু বলেন যে, খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত তর্কবিতর্কের প্রবন্ধগুলি দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় লিখাইয়াছিলেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী লিখিতেন না। নারায়ণের লেখক বলেন তাহার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কেননা "দেবেন্দ্রনাথই রাজনারায়ণ বাবুকে দিয়া" লিওনার্ড সাহেব কর্তৃক লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের "মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই ইতিহাসগ্রন্থ লেখাইবার "অদৃশ্য কারণ" হইয়াছিলেন।" সুতরাং লিওনার্ড দেবেন্দ্রনাথকে ঐ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন নাই কেন?—দেবেন্দ্রনাথ লিওনার্ড-লিখিত ইতিহাসের "অদৃশ্য কারণ" ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার হেতুও লেখক সুস্পষ্টরূপেই জানাইতে লজ্জাবোধ করেন নাই। নিঃসন্দেহ শোভনতা, সঙ্কোচ প্রভৃতি জিনিসকে তিনি নিতান্তই বাহুল্য বোধ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"লিওনার্ড সাহেবের এই ইতিহাসগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ—কুচবিহার বিবাহ প্রভৃতিতে কেশবদিগকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে তাহা লিওনার্ড সাহেব সম্ভবতঃ নিজের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকিলেও এই গ্রন্থ লেখায় যে দেবেন্দ্রনাথের কোন যোগ

আছে,—নানাদিক্ বুজিয়া সুজিয়া হয়ত ইচ্ছা করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে নিজের নাম জাহির করিতে চান্ নাই।" ইহার চেয়ে ইংরাজীতে যাহাকে বলে mean insinuation, আর কি হইতে পারে তাহা জানি না। লিওনার্ড সাহেবের ইতিহাসে তিনি রাজনারায়ণ বাবুর নিকট তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছিলেন ইহা ভূমিকায় লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতামতের জন্য রাজনারায়ণ বাবু বা অপর কেহই দায়ী হইতে পারেন না। তারপর দেবেন্দ্রনাথের ইহাতে কিছুমাত্রই হাত ছিলনা এবং লিওনার্ডও তাহা কোথাও বলেন নাই,—সুতরাং তাঁহাকে 'অদৃশ্য কারণ' বলিয়া স্থির করা লেখকের পক্ষে একেবারে "যুক্তির" চূড়ান্তই হইয়াছে বটে। একজন ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ নীচতার আরোপ করিতে লেখকের কিছু মাত্র দ্বিধা হইল না। এবং ইহাকেও তিনি ইতিহাস বলিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে জাহির করিতেছেন! কি আস্পর্দ্ধা!

তারপর লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার পক্ষে Vedantic Doctrinesএর ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের নাম জানিবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। কারণ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই। এমনকি রাজনারায়ণের নিকট হইতেও অনেক জ্ঞাতব্য ঘটনা যথাযথরূপে আদায় করিতেও পারেন নাই। লিওনার্ডের ইতিহাসে জ্ঞাতব্য কথা অল্পই আছে। তাই মনে হয় যে মহর্ষির শেষবয়সে তাঁহার 'আত্মজীবনী' বাহির না হইলে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি সম্বন্ধেই বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ থাকিত। তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কথা অবগত ছিলেন না। আত্মজীবনী বাহির না হইলে তিনি যে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতনা, তিনিই যে প্রথম ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন বা বঙ্গদেশে লুপ্ত বেদশাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইত না। তথাপি আত্মজীবনীতেও তিনি নিজের কৃতকীর্ত্তির কথা অল্পই বলিয়াছেন, নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথাই অধিক বলিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লেখেন সে সময়ে এ সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা ছিলনা বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য প্রায় আগাগোড়াই ভুল। লিওনার্ড সাহেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলে এরূপ ভুল হইত না। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতেও তিনি যে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন তাহা মনে হয় না—কারণ রাজনারায়ণের "আত্মচরিতে" যে সকল তথ্য আছে, তাহা লিওনার্ডের গ্রন্থে নাই। এই সকল কারণে ঐ ইতিহাসকে আজ আর ইতিহাস বলিয়া কেহই স্বীকার করেনা,—অবশ্য নারায়ণের লেখক ছাড়া! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে

দুএকটা ভুল থাকিলেও উহাই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র খাঁটি ইতিহাস। কারণ, ঐ ইতিহাসের বহুতথ্য তিনি মহর্ষি মহাশয়ের স্বমুখাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য। যথা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের তন্ত্রবিধি অনুসারে ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা-বিধি কি ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি মহর্ষির মুখে না শুনিলে ইহা কেহই জানিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি যখন Vedantic Doctrines Vindicated মহর্ষির রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন, তখন তাহাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে। তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে এই যে, তিনি ঐ ইংরাজী রচনা রাজনারায়ণ বাবুর দ্বারা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন। সে ভ্রমের কারণও এই যে, রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিবার পরে হইতে যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনিই ইংরাজীতে লেখ্য দেবেন্দ্রনাথের সকল রচনা ও চিঠি পত্রই লিখিয়া দিতেন—অতএব Vedantic Doctrines Vindicated রচনাগুলিও শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপ দুএকটা ভুল অজিতবাবু দেখাইয়াছেন বলিয়া, নারায়ণের লেখক, তাঁহার ন্যায় 'দায়িত্ববোধহীন লেখক' আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই, এইরূপ অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যুক্তির কি অপূর্ব্ব দৌড় এবং "দায়িত্ববোধ" সম্বন্ধে লেখক আগাগোড়া কি সচেতন! সর্ব্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে এতগুলি প্রমাণহীন উক্তি ও অভিযোগ করার পশ্চাতে কি গুরুতর দায়িত্ব-বোধ রহিয়াছে!

অজিতবাবু যে সকল কারণে দেবেন্দ্রনাথকেই Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থের আসল লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে সকল কারণের মধ্যে একটিমাত্র কারণ উদ্ধার করিয়া অবশিষ্ট কারণগুলিকে লেখক চাপা দিয়াছেন। অজিত বাবু বাহ্য প্রমাণ এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণ ( external and internal evidence ) উভয়বিধ প্রমাণের উপরেই তাঁহার অনুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যে তাঁহার সেই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত না করিয়া এবং চাপা দিয়া তাঁহার 'যুক্তির অসারতা' এবং 'নীচজনোচিত হীনপ্রয়াস' পাঠক-সমাজে উদ্ঘাটিত করিতে ব্যস্ত, ইহা তাঁহার পক্ষে উদার-জনোচিত উত্তম প্রয়াস হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বাহ্য প্রমাণ অজিতবাবু দিয়াছেন দুইটি—( ক ) দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন "এত উপনিষদ বচন উদ্ধার করিয়া ও তাহাদের ভিতরকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ডাক্তার ডফের মতামত খণ্ডন করা তখন আর দ্বিতীয় কারো সাধ্যের ভিতরে ছিলনা" (খ) "বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার প্রণেতা যে কে তাহার কোন উল্লেখ থাকিলনা"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩ পৃষ্ঠা দেখ। আভ্যন্তরিক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন এই :— "বেদ যে আপ্তশাস্ত্র তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে

দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না।"—পৃঃ—১৩৬—ঐ গ্রন্থ।

নারায়ণের লেখক উপরের ঐ (ক) প্রমাণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর দেব রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত যুদ্ধে তাঁহার সহায় ছিলেন—Brahminical Magazine No III এর যখন তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তখন তিনি তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। অতএব তিনি দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষা উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাদ্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের Brahminical Magazine "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া" তত্ত্ববোধিনী ডফের জবাব দেয়, সুতরাং চন্দ্রশেখরেরই ঐ সকল লেখার একমাত্র লেখক হইতে কোন বাধা নাই। অথচ লেখকের এই সমস্ত কথাগুলিরই কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী-লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় কখনো কখনো কল্পিত নামে বা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নামে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। Brahminical Magazineই এক ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজা রামমোহনের বেদান্ত-যুদ্ধে চন্দ্রশেখর তাঁর ডান পার্শ্ব বা বাম পার্শ্ব কোন "পার্শ্বেই" ছিলেন না এবং রাজার মত লোকের কাহারো সাহায্যেরই অপেক্ষা ছিল না। তাঁহার বেদান্ত-যুদ্ধ বা যে কোন যুদ্ধে তিনি একাই একশো! তাঁহার সহায় আবার কে ছিল, কেই বা হইতে পারিত? সে যাহাইহোক্, চন্দ্রশেখর দেব সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিতেন তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ কোথাও নাই। রাজা যখন শাস্ত্রাদি লইয়া বিচার করিতেন তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ও তদীয় ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রাজাকে সাহায্য করিতেন, রাজার জীবনী-লেখকেরা ইহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনায় বা তর্কবিতর্কে তাঁহার সহায় ছিলেন একথা নূতন শোনা গেল! চন্দ্রশেখরের ঐ ভূমিকা তাঁহার লিখিত হইতেও পারে না হইতেও পারে—রাজা রামমোহন কর্তৃক লিখিত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। আর যদি বা তাঁহার কর্তৃক লিখিতও হয়, তবে তাহাতেও কিছু আসে যায়না, কারণ উহা বিজ্ঞাপন ছিল মাত্র। তাহাতে Brahminical Magazine এর বাদানুবাদে চন্দ্রশেখরের সাহায্যের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখর যে সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা অতিশয় গাঁজাখুরী গল্প। অতএব চন্দ্রশেখর দেবের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের এই যে অপূর্ব্ব তথ্য, ইহা "মিথ্যার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছে" কিনা জানিতে চাই। চন্দ্রশেখর দেবই যদি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিবেন তবে দেবেন্দ্রনাথ বহু অন্বেষণ করিয়া বিদ্যাবাগীশকে ছাড়া বেদান্তাদি বুঝিবার জন্য অন্য কাহারো সাহায্য পান্ নাই কেন, এবং বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ পাঠ করিয়া পরে উপনিষদ প্রচারে

তৎপর হইলেন কেন? চন্দ্রশেখরের দ্বারাই তো সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত?

রামমোহন রায়ের পরে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র যিনি এদেশে প্রচার করিবার জন্য একাকী কত পরিশ্রম ও যত্ন করিলেন, তিনি ইংরাজীনবীশ চন্দ্রশেখর দেবের অপেক্ষা শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রজ্ঞানে অযোগ্যতর বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। ইহাও ইতিহাস! কারণ ইহা যে ঐতিহাসিক সমালোচনা!

তারপর অজিতবাবুর (খ) প্রমাণ সম্বন্ধে লেখক নীরব। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই গ্রন্থকর্ত্তার নাম আছে শুধু Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। অজিতবাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখেন নাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখনও নানা লোকের কাছে আছে এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের কাছেই আছে। তাহাতে কাহারো নাম নাই অথচ অন্যান্য সকল গ্রন্থেই নাম আছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রশেখর দেবের দ্বারা ইংরাজিতে লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া কাহারো নামে ঐ গ্রন্থ বাহির হয় নাই। বেনামা বাহির হইয়াছিল।

তার পর অজিতবাবু যে আভ্যন্তরিক প্রমাণ (internal evidence) দিয়াছেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে Vedantic Doctrines Vindicated রামমোহনের Brahminical Magazine কে "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরে নাই"।

শাস্ত্র সম্বন্ধে রামমোহন রায় এ কথা লিখিতেই পারিতেন না যে "To prove their authority & truth by any extraneous evidence is impossible". P. 31. V. D. V, শাস্ত্রীয় সত্য তবে কিভাবে নির্ণীত হইবে? "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" দ্বারা। "All his (God's) revelations are effected simply by the enlightenment of the human understanding". P. 32. V. D. V. তারপর Vedantic Doctrines Vindicated পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মহর্ষির যে সকল উপনিষদ শ্লোক সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাহা পরবর্ত্তী কালে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই শ্লোকগুলিই ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে। রামমোহনের Brahminical Magazine এর ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শনাদির বিচার ইহাতে আদৌ নাই। তবু ইহা নাকি ঐ Magazine এর "হুবহু" নকল মাত্র!

দেবেন্দ্রনাথ যে খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ অজিতবাবু অন্যত্র দিয়াছেন এই যে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এই বাদানুবাদের সংবাদ কোন গতিকে বোধ হয় ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া এক ইংরাজী পত্রে লেখেন:— "আমি ভাবিয়া অবাক্ হই যে, এখনো সমস্ত বিষয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই কেন! আমার বিশ্বাস তোমার সমস্ত সময় খবরের কাগজ লিখিয়া এবং মিশনারীদের সঙ্গে লড়াই করিয়াই কাটিতেছে ইত্যাদি।" ১১৫ পৃষ্ঠা মহর্ষি-চরিত। ইংরাজীপত্রে আছে

"controversies with the missionaries"—এবং ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই Vedantic Doctrines এর যুদ্ধ সম্বন্ধেই দ্বারকানাথ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে নারায়ণের লেখকেরই একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া আমি এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই—"এইরূপ ···হীন প্রয়াসে সাহিত্যের কোন কোন অংশ যে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

---

# প্রতারণা

( গল্প )

চিত্রকর ডি—বলিল,—জীবনে আমি একটি স্ত্রীলোককে শুধু ভালবাসিয়াছি। পাঁচটি বৎসর আমি কি সুখ যে ভোগ করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। এই যে আজ আমার এমন খ্যাতি, কাজে এতখানি অনুরাগ, ইহার মূলে তাহার সেই ভালবাসা। সে ছিল আমার কল্পনার উৎস। জীবনে প্রথম যেদিন তাহাকে চোখে দেখিলাম আমার মনে হইল,এ যেন আমার অনেক দিনের চেনা —আমার ধ্যানের ধন, স্বপ্নের ছবি! সে কখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই—আমারই এই হাতে মাথা রাখিয়া সে চিরবিদায় লইয়াছে! কিন্তু আজ তাহার কথা মনে হইলে ক্রোধে আমার চিত্ত জ্বলিয়া উঠে! সেই পাঁচটি বৎসরের স্মৃতি দারুণ হিংসায় আমার মনকে তাতাইয়া তুলে—সেই সুন্দর মুখখানি মনে হইলে দারুণ ঘৃণায় অন্তর ভরিয়া উঠে—আমি তাহাকে ঘৃণা করি।

তাহার নাম ছিল ক্লোতিল্। আমারই এক বন্ধুর গৃহে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়—মাদাম দেলোস্ বলিয়াই সকলে তাহাকে জানিত। তরুণী বিধবা। সে ছিল এক সদাগরের স্ত্রী। অনেক দেশ ঘুরিয়াছে সে—তাহার কথাবার্ত্তা হইতে সেটুকু বেশ বোঝা যাইত। চালচলন ছিল খাস পারির—বেশভূষাও খাঁটি পারির কেতায়—ভাবভঙ্গী দেখিলে পারির সৌখীন-সমাজের নারী বলিয়া চিনিতে কষ্ট হইত না।

যেদিন বুঝিলাম, আমি তাহাকে অসহ্য ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি সেই দিনই সমস্ত দ্বিধা ভয় ঠেলিয়া একেবারে তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুলিলাম। অবশ্য কথাটা অপরের মুখে পাড়িয়াছিলাম। সে শুধু বলিয়াছিল যে আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিবে না। শুনিয়াছিলাম, তাহার চোখের কোণে দুই ফোঁটা জলও দেখা দিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন তাহার সহিত আর দেখা করি নাই। ক্রমে দেশে থাকা দায় হইয়া উঠিল—কাজে মন লাগিত না, বন্ধুবান্ধব গল্প করিতে আসিলে বিরক্তি ধরিত—অর্থাৎ পূরাদস্তুর হতাশ-প্রেমিক হইয়া দাঁড়াইলাম। শেষে বেড়াইতে বাহির হইবার স্থির করিলাম। বাক্স তোরঙ্গ গুছাইয়া লইতেছি—সেই দিন রাত্রেই বাহির হইয়া পড়িব —বেশ মনে পড়ে, তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে, হঠাৎ শুনিলাম মাদাম দেলোস্ আসিয়াছেন!

মাদাম আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায় যাইতেছি। আমি সঠিক কথাটা বলিলাম। মাদাম বলিল, "কেন যাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করতে পারি?" তাহার স্বর বড় কোমল, বড় করুণ। আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিলাম না। মাদাম কহিল, "বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস? তাই, না? আসল কথা, আমিও তোমায় ভালবাসি—কিন্তু আমাদের মিলন অসম্ভব,—তার জন্ত আমি দুঃখিত। কি করব? —নিরুপায়! অর্থাৎ বুঝেছেন—(এইখানে মাদামের স্বরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল) আমার স্বামী বেঁচে আছেন, আমি বিধবা নই।"

মাদাম তাহার কাহিনী বলিতে লাগিল। সে যেন রূপকথার মত। প্রেম আর বিরহের কাতর দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা! বিবাহের তিন বৎসর পরে স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়। মাদামের খুব বড় বংশে জন্ম—পারিতে সে-বংশের অত্যন্ত সম্রম! কুৎসার ভয়ে মাদাম স্বামীর বিচার মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! সর্দ্দার রাবি তাহার খুড়া। হীনবংশে বিবাহের দরুণ পিতৃকুলের সহিত মাদামের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মাদামের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে এক রেঞ্জারের সহিত। স্বামী ত্যাগ করিলেও মাদামকে আশ্রয়ের জন্ত বড় ভাবিতে হয় নাই—লেখা-পড়া মাদাম ভাল করিয়াই শিখিয়াছে—সেলাইয়ের কাজও চমৎকার জানে। গান-বাজনাতেও বেশ দক্ষতা আছে।—বড়বড় ঘরে মেয়েদের পড়াইয়া, সেলাই ও গান শিখাইয়া মাদামের উপার্জ্জন অল্প দাঁড়ায় না।

দীর্ঘ হইলেও কাহিনীটি আগাগোড়া ভারী এক করুণ-সুরে ভরা। এত সংক্ষেপে আমি এটুকু সারিয়া লইলাম, কিন্তু মাদাম এত বিস্তারিত করিয়া জীবনের ইতিহাস ফাঁদিয়া বসিয়াছিল, যে শুনিতে আমার দুই দিন লাগিয়াছিল। কাহিনীটি আমার প্রাণে বাজিয়াছিল;—দুইদিন কি, দুই বৎসর ধরিয়া মাদামের মুখে এ কাহিনী শুনিলেও আমার ধৈর্য্য টুটিত না। মাদাম আমায় ভবঘুরে হইয়া বাহির হইতে নিষেধ করিল; সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাজ কর—মিথ্যা মোহের ভুলে ভবিষ্যৎ মাটি করিয়ো না। জীবনটা হেলাফেলায় নষ্ট করিয়ো না।" মাদামের সে সান্ত্বনায় আমার মন গলিয়া গেল; ভাবিলাম, কাজ করিব, মানুষ হইব। এত দুঃখে পড়িয়াও মাদাম কাজের গৌরব ভোলে নাই! নারী হইয়াও কাজে কর্ম্মে আপনাকে এমন ডুবাইয়া রাখিয়াছে, এত বড় বেদনা অনায়াসে চাপা দিয়া রাখিয়াছে! আমি মুগ্ধ হইলাম। মাদাম আশ্বাস দিল, রোজ রাত্রে সে আমার কাছে আসিবে—তাহাকে প্রতিদিনকার কাজের হিসাব দিতে হইবে। হিসাব উচিত-মত না হইলে মাদামের সঙ্গে আমার দেখা হইবে না!

সেইদিন হইতে আমার চোখে জগৎ নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কাজে উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সারাদিন কাজ করিয়া গৃহে ফিরিতাম, এইবার মাদাম আসিবে। দীপ জ্বালিয়া মাদামের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম—একটু বিলম্ব হইলে মন অস্থির হইয়া উঠিত। অভিমান করিতাম—মাদাম সাধিয়া কাঁদিয়া অভিমান ভাঙাইত। মাদাম আমার জন্ত প্রত্যহ ফুলের তোড়া আনিত,—বাছা বাছা তাজা ফুলের তোড়া—

শোভায় গন্ধে ভরপূর! আমি উপহার দিলে মাদাম তাহা গ্রহণ করিত না—অনুযোগ করিয়া বলিত, কেন এ বাজে খরচ—মাদামের এ-সবে প্রয়োজন নাই—আমার চেয়ে মাদামের টাকা অনেক বেশী। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই!

তাহার উপর মাদাম বলিত, পড়ানো বা সেলাই প্রভৃতি শেখানো কাজে তাহার মোটেই ক্লান্তি লাগিত না। ছাত্রীরা সব বড়লোকের মেয়ে—তাহারা মাদামকে খুবই ভালবাসে; অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কখনো একটা খুব দামী ব্রেস্‌লেট বা আংটি আমাকে দেখাইয়া বলিত, অমুক ডিউকের মেয়ে তাহাকে দিয়াছে। অত্যন্ত সুখে সময় কাটিতেছিল। দিনের বেলা যে যাহার কাজে যাইতাম, আর রাত্রে আমাদের মিলন ছিল অটুট। শুধু রবিবার মাদামের দর্শন মিলিত না। রবিবার ভোরে সে সাঁৎ জার্ম্ময় যাইত—বোনের সঙ্গে দেখা করিতে; আর সোমবার ভোরে সেখান হইতে ফিরিত। আমি ষ্টেশন অবধি তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিতাম। আবার সোমবার ভোরে ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইতাম—মাদাম হাসি-মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া ছাত্রীদের বাড়ী চলিয়া যাইত, আমিও নিজের কাজে লাগিতাম। সোমবার রাত্রে বোনের বাড়ীর খুঁটিনাটি কথা—ছেলেমেয়েদের দুষ্টামি, ভগিনী-পতির বিচিত্র খেয়াল প্রভৃতির গল্প বলিতে মাদাম যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

কি গভীর বিশ্বাসে, আশ্চর্য্য সুখে সময় কাটিতেছিল! মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নাই! মাদামের সুরে মিথ্যার সঙ্কোচ কোথাও ছিলনা;—স্বর এতটুকু কাঁপিত না, কণ্ঠ এতটুকু বাধিত না! তবে একটা কারণে রাগ ধরিত। অত্যন্ত ছোটখাট ব্যাপার বর্ণনা করিতে গিয়াও মাদাম এত খুঁটিনাটি পাড়িয়া বসিত যে গল্প অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়িত। মাদাম যেন আপনার চারিদিকে রোমান্সের জাল বুনিত—নাটকীয় ঘটনার ছড়াছড়ি! মাঝে-মাঝে হিংসা হইত—এই রবিবারটুকু মাদামকে যদি নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম! মাদামের এই রবিবারের আত্মীয়-বন্ধুরা মাদামকে অনেকখানি ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমার মনে হইত, এই রবিবারটুকুর প্রতীক্ষাতেই বাকী কয়টা দিন যেন সে সেলাই, গানবাজনা আর আমায় লইয়া কাটাইয়া দিতে চায়! রাগ হইলেও মুখ-ফুটিয়া কিছু বলি নাই। বলিবার ইচ্ছা হইলে মনে হইত, আহা, পতিপরিত্যক্তা অভাগিনী তরুণী!

শেষে একদিন কেমন সন্দেহ হইল। সেদিন সোমবার ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলাম। প্রথম-ট্রেন বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল, মাদাম আসিল না। মন খারাপ হইয়া গেল। মাদামের কি হইল? কোন অসুখ করিল না-কি? সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু কোথায় যাইব? অত-বড় সহরে মাদামের ভগিনী-পতির বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা—সে কি সহজ ব্যাপার। নিজের উপর রাগ ধরিল। এতদিন ইহাদের গল্প শুনিতেছি, কোনদিন ভগিনীপতির নামটিও জিজ্ঞাসা করি নাই! সন্ধ্যার ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয়—রাত্রে অজানা দেশে কোথায়

ঘুরিব! ভাবিলাম, মঙ্গলবারে সকালের ট্রেনে বাহির হইব। সেদিনের ছুটি লইলাম। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া দীপ জ্বালিতেছি—এমন সময় মাদাম আসিয়া উপস্থিত। মলিন মুখ, চোখে কেমন উদ্বিগ্ন ভাব! বোনের অসুখ করিয়াছিল, তাই সে আসিতে পারে নাই। তখন সে অসুখের এক দীর্ঘ বর্ণনা ফাঁদিয়া বসিল। আমার কেমন বিরক্তি ধরিল—এত বেশী কথা কে শুনিতে চায়! বিশেষ মাদামের বোন, সে আমার কে? তাহাকে চিনি না, জানি না, চোখেও কখনো দেখি নাই!

সে সপ্তাহে দুই-তিন রাত্রি মাদাম আসিল না—বোনের অসুখ সারে নাই। পর-সপ্তাহে আবার সব ঠিক-নিয়মে চলিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মাদামের অসুখ হইল। একদিন সন্ধ্যায় জ্বর-গায়ে আসিয়া কহিল, শরীর অত্যন্ত খারাপ—এখানে রোগ লইয়া আমায় জ্বালাতন করা ঠিক নয়—মাদাম তাই বোনের কাছে চলিয়াছে—সারিলেই আসিবে—একদিনও বিলম্ব হইবে না। আমি বলিলাম, না, তাহা হইবে না। এখানে আমি ডাক্তার দেখাইব, সেবা করিব। শেষে আমার কথাই রহিল। মাদাম আমার গৃহেই রোগশয্যা গ্রহণ করিল। ডাক্তার আনিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, রোগ কঠিন। আশা তিনি একটুও দিতে পারেন না।

আমার সমস্ত অন্তর হুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাদামের পানে চাহিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। উপায় কি—কি করিব! ভাবিলাম, আহা অভাগিনী, —যদি শেষমুহূর্ত্তে কিছু শান্তি দিতে পারি! মাদামের বোনের নামে পত্র দিলাম, ছাত্রীদের ও পত্র দিলাম। কেহ আসিল না। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল—দুঃখে চোখ-ফাটিয়া জল বাহির হইল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া প্রাণপণে মাদামের সেবা করিলাম। আমার শান্তি, আমার আনন্দ, আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্ব! যেমন করিয়া পারি, এই শেষমুহূর্ত্তে শান্তি তোমায় আনিয়া দিবই।

নার্শকে বুঝাইয়া আমি চুপিচুপি সর্দ্দার রাবির বাটীর দিকে রওনা হইলাম। কখন্ পৌঁছিলাম, সে কথা আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। সে দিন রাবির গৃহে কিসের মজলিস ছিল—বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীর ভিড় ঠেলিয়া গৃহে ঢুকিলাম। বৃদ্ধ রাবি তখন নিমন্ত্রিত-দের লইয়া ভোজে বসিয়াছেন। আমি ঘাম মুছিয়া বলিলাম, "বড় বিপদ, কর্ত্তাকে চাই।"

আমার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়াছিল। কর্ত্তা রাবি শশব্যস্তে আসিয়া কহিলেন, "কি চাই? কোথা থেকে আসছেন?" আমি মিনতি জানাইয়া বলিলাম, "আপনার ভাইঝী মাদাম দেলোস্ মৃত্যুশয্যায়। এ—সময় আর মনোমালিন্য রাখবেন না—একবার তাঁর শেষমুহূর্ত্তে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান—সে বেচারী একটু হাসিমুখে বিদায় নিক।"

বৃদ্ধ রাবি এমন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইলেন যে আমি ভড়কাইয়া গেলাম। আমি বলিলাম, "আপনার ভাইঝী মাদাম দেলোস্ মৃত্যুশয্যায়—" তিনি যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "আমার ভাইঝী!" আপনি এ কি বলছেন?

আমার ভাইই নেই, তা ভাইঝী! আপনি বাড়ী ভুল করেছেন।"

আমি তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইলাম, কহিলাম, "এখনো সেই সব পুরানো কথা মনে রেখেছেন! বংশের মর্য্যাদাকেই বড় বলে ধরছেন! একটা প্রাণ চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে—মাদাম দেলোস্—মাদাম দেলোস্—চিনতে পারছেন না?"

"না, ও নামও কখনো শুনিনি। আমি বুড়োমানুষ, আপনার সঙ্গে পরিহাস করবারও পাত্র নই। হয় আপনি পাগল, নয় বাড়ী ভুল করেছেন, নাম ভুল করেছেন।"

বৃদ্ধ আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। রাগে আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। এই সব বংশ-দর্পিতের দল—হতভাগা, স্বার্থপর বৃদ্ধ! আবার পরক্ষণে মনে হইল, তবে কি মাদাম আমায় মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে! কিন্তু কেন—কি তাহাতে লাভ তাহার? বাহিরে আসিয়া গাড়ি ডাকিলাম,—প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কারের কন্যা মাদামের ছাত্রী—কোচম্যানকে ব্যাঙ্কারের বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্মুখে ভৃত্যটা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিলাম, "মাদাম দেলোসের কাছ থেকে আসছি, আমি!"

"মাদাম দেলোস্!" ভৃত্যের মুখেও রাবির মত বিস্মিত ভাব!

আমি কহিলাম, "তোমার দিদিমণিদের যিনি গান-বাজনা শেখান, সেই মাদাম দেলোস্—"

ভৃত্যটা কি বিড়বিড় করিয়া বকিয়া গৃহমধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল!

বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিয়া এক পত্র পাইলাম—সাঁৎ জার্ম্মেয়র পোষ্ট-অফিসের ছাপমারা চিঠি। খামটা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। মাদামের ভগিনী-পতি রেঞ্জার সাহেব পত্র দিয়াছেন;—তিনি লিখিয়াছেন, মাদাম দেলোস্ বলিয়া তিনি কাহাকেও জানেন না। তাছাড়া তিনি অবিবাহিত, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রই নাই, তা শ্যালিকা!

যথেষ্ট হইয়াছে! মাদামের মিথ্যা বুঝিলাম। পাঁচ বৎসর ধরিয়া মাদাম আমার সহিত চাতুরী খেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন—কেন? কি তাহার স্বার্থ ছিল এ মিথ্যা বলবার? কি প্রয়োজন? এতদিন সে তবে কোথায় ঘুরিত? আশ্চর্য্য হেঁয়ালি! রাগের মাথায় রোগশয্যাশায়িনী মাদামের প্রতি প্রশ্নের ঝড় নিক্ষেপ করিলাম, বলিলাম, "রবিবার তুমি সাঁৎ জার্ম্মেয় কার কাছে যেতে? দিনের বেলায় কোথায় থাকতে? বল, সব কথা খুলে বল।" মাদাম স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। দৃষ্টিতে সেই গভীর দর্প, অটল অবজ্ঞা!

আমি কহিলাম, "তুমি কাকেও পড়াতে যেতে না; সর্দ্দার রাবির তুমি কেউ নও। সবজায়গায় আমি সন্ধান নিয়েছি! তোমায় কেউ চেনে না, জানে না। আগাগোড়া আমাকে মিথ্যা বলে এসেছ! বল, এত গহনা-পত্র, টাকাকড়ি পোষাক-পরিচ্ছদ তোমার কোথা থেকে জুটত? কার কাছ থেকে আদায় করতে?"

মাদাম গভীর বিষাদের দৃষ্টি হানিল—সে দৃষ্টিতে কি নৈরাশ্য, কি হতাশ! আমার দয়া হইল—আহা, কেন এ শেষমুহূর্ত্তে বেচারীকে এ আঘাত দিলাম! তখনই

কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিলাম। বড় দুঃখে বলিলাম, "এ পাঁচ বৎসর কেন তুমি আমায় শুধু মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে এসেছ? আমার এ ভালবাসার কেন এ অপমান করেছ? সত্য-পরিচয় কেন দাওনি? তুমি ত বুঝেছিলে তোমায় আমি কি অসহ্য ভালবাসতুম—তবে কেন এত-বড় চাতুরীর দেওয়াল তুলে রেখেছিলে? এই পাঁচ বৎসর তোমার প্রত্যেক স্পর্শে, প্রত্যেক চুম্বনে এতখানি গোপনতা রেখেছিলে—এত ছল! নামহীনা পরিচয়-হীনা নারী—আজ পর্য্যন্তও তোমার পরিচয়, তোমার নাম আমার কাছ থেকে গোপন রেখে চললে! শুধু খেলা—মিথ্যা খেলা খেলেছ আমার সঙ্গে! এখনো বল, কে তুমি—কি নাম তোমার, —কেন আমার জীবনে এভাবে এসে উদয় হয়েছিলে? বল, এখনও খুলে বল,—একটা অনুরক্ত হৃদয়ের এতখানি আবেগ নষ্ট করে দিয়ে যেয়ো না, তাকে কিছু দিয়ে যাও—কিছু স্মৃতি, কিছু—"

মিথ্যা প্রয়াস! মাদামের দুই চোখে শুধু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। নিঃশব্দে আমার তিরস্কার গ্রহণ করিয়া আমারই মুখের পানে চাহিয়া মাদাম শেষনিশ্বাস গ্রহণ করিল; একটা কথা কহিল না—মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী নারী তাহার সকল রহস্য বুকের মধ্যে গোপন রাখিয়াই বিদায় লইল!

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

---

# কণিকা

এক-একরকম দুঃখ আছে বৈরাগ্যের মত, সন্ধ্যার গেরুয়া আলোর মত শ্রান্ত! তার মধ্যে কোন আগ্রহ কি চেষ্টা নাই। কিরণের দীপ্তি নিবু-নিবু করতে করতে একেবারে নিবে আসে, প্রখর তাপ দূর হয়ে চারিদিক ছায়ার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, চারিদিক নিঃশব্দ নির্জ্জন হয়, নিদ্রার গভীরতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিমগ্ন হয়ে যায়। চরাচর শান্তি লাভ করে, শ্রান্তির বিরাম হয়, সুষুপ্ত বিশ্ব নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। হয়ত এ দুঃখের অবসানে, নূতন দিনের চেতনা ফিরে এসে আবার নবীন জীবনের সূচনা করতেও পারে!

কিন্তু আর-একরকম দুঃখ আছে যা, রাত্রি-শেষ প্রভাত-সূর্য্যের মত একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ। তার তপ্ত স্পর্শে সব জড়তা দূর হয়ে যায়—তপনের সহস্র রশ্মির মতই অজস্র আলোকের তীর তার বুকে গিয়ে বেঁধে, শ্রান্তি শান্তি স্বপ্ন সুপ্তি সমস্তই সমাপন করে। নিষ্ঠুর জাগরণের প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তহীন শব্দের কল্লোলে, অবিরাম গতির অবারিত দীপ্ত দৃষ্টির অশান্তিতে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চলা, ফেরা, দেখা, অবিরাম চেতনায় সমস্ত জীবন জ্বালাময় হয়। আকাশের সূর্য্যের সহস্র রশ্মি মনের অন্ধকারে অজস্র দৃষ্টি সঞ্চার করে, তাকে আকুল করে তোলে। মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকে না। এর অবসানে যে রাত্রির অন্ধকার আসে, সে মৃত্যুর মত অনন্ত শান্তির নিস্তব্ধতা এনে দেয়। প্রখর জ্বালা-যন্ত্রণার অশেষ গতির

বিরাম হয়ে, চরম শান্তির পরম বৈরাগ্যের আবাহন করে। চেতনার এই একান্ত ব্যথাময় জাগরণ, এ জীবন্ত দুঃখ, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই এর নিবৃত্তি হয় না।

* *
*

দুঃখের মত নির্ব্বাক কিছু আছে কি! চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না, দুঃখ যখন বড়ই গভীর আর মর্ম্মন্তুদ হয়, তখন আহা-উহু, গেলাম, মলাম ব'লতে পারা দূরে থাক, তার- অসহ্য যন্ত্রণা হ্রাস করে এককোঁটা চোখের জলও যে ঝরে পড়ে না! সমস্ত জীবনের সব রং পুড়ে খাক হয়ে যায়, মাথার চুল দুদিনে শাদা হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীর একেবারে নুয়ে পড়ে, মূক মুখ আর খোলে না। যে বড় প্রিয়, যাকে অন্তরের আসনে বসিয়েছি, তার নাম কি কারো কাছে উচ্চারণ করা যায়, সে যে ইষ্টমন্ত্রের মত বড় পবিত্র, অন্তরেই জপ করতে হয়। ঐখানেও যদি আত্মবিস্মৃতি না আসে, ঐখানেও যদি জাহিরের ভাব আসে, সে তো বিলাস বৈ আর কিছু নয়! রঙ্গালয়ের দুঃখের অভিনয়, ক্ষণিকের ভ্রান্তি; তবে সেই যে অভিনয়ের দুঃখ, তাও সে সময়ের জন্য অন্তরে যথার্থরূপে অনুভব করতে হয়। নয় তো সেই যে মিথ্যার অভিনয় সে আরো মিথ্যা হয়ে পড়ে, ন্যাকামির মত দেখায়, দর্শকের মন স্পর্শ করতে পারে না! গভীর দুঃখ, সত্য দুঃখ অন্তর সমাহিত হয়ে থাকে, তার বহির্বিকাশ নাই বলে সে মনের মধ্যকার সব মালিন্য পুড়িয়ে নিঃশেষ করে, সব খাদ মিটিয়ে শুধু খাঁটিটুকু বজায় রাখে। যেখানে আত্ম-সম্মানের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সেখানে আর বাকী রইল কি? কিছুই না, ফাঁকা, ভুয়ো হাঁক-ডাক!

* *
*

চেতনা আসে বুকের মধ্যে আগুনের ছোরা, চোখের উপর বিদ্যুতের স্পর্শ! ধূ ধূ করে সব আড়াল আবর্জ্জনা পুড়ে যায়, চোখের সামনে ঝাপসা কিছুই থাকে না—তখন আর অন্ধকার গণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকা চলে না, পথ চলতে হয়, সেবা করতে হয়। জীবনের এ অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব-গ্রন্থের ভাষ্য নিজেই করে যেতে হয়। এই ধূলি, কাদা, ভূমিকম্প, দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের পৃথিবী যেমন আকাশের করুণায়, ফলফুল তৃণপত্র ধনধান্যে অতুলন সুন্দর, তেমনি মানুষের এই দুঃখ-দুর্দ্দিন-সঙ্কুল, প্রলোভনে কণ্টকাকীর্ণ, খণ্ডিত জীবনও ভাবের স্পর্শে অপূর্ব্ব মহিমাময়। ত্যাগ ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু অপার শান্তি সন্ধ্যার অনুপম কান্তি নিয়ে জীবনে তখনই আসে, যখন আমরা স্বার্থের সীমা সঙ্কুচিত করে আনি!

* *
*

ভয় ভরসা দুই একত্রে মনে জাগে। পথ যখন হয়, চল্‌বার শক্তিও তখন আসে। কারো জীবনই ব্যর্থ হবার জন্য সৃষ্ট হয়-নি। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরি পরিণতি হয়ে থাকে; খানিকটা প্রাকৃতিক কারণ, কতকটা আবার অদৃশ্য দৈব শক্তির উপর নির্ভর

করে। ফুল হতে ফল হয়, তবে ফলটি স্বাদে-গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, আকারে সর্ব্বাঙ্গে পরিপুষ্ট হতে হলে যেমন অনুকূল রোদ বাতাস বৃষ্টির উপর নির্ভর করে রাখে, তেমনি কৃষকের যত্ন-চেষ্টা, সতর্কতারও অপেক্ষা রাখে। ফলটি দেখা দেওয়া দৈবানুগ্রহ, তাকে রক্ষা করা যত্ন-চেষ্টা-সাপেক্ষ, পুরুষকার! বাহির হতে যা আসবার তা আসবেই অন্তরের অনুকূলতা যেন কিছুতে নষ্ট না হয়!

* *
*

কাজ কি? সে তো আনন্দের অভিব্যক্তি, সদানন্দের লীলা! এই যে এত বড় বিশ্বব্যাপার চলছে, জীবনের এই অবিরাম স্রোত এর মধ্যে কোন কষ্ট-চেষ্টা নাই। প্রাণে, আনন্দে আলোকে সঙ্গীতে, ছায়ায় অন্ধকারে, সুখ-দুঃখের ছন্দে উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে! এর ভাবের আর প্রকাশের, কাজের ও উদ্যমের একটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মন যেখানে পড়েমাথা কুটছে, সেখানে বাহিরে কি উৎসবের আয়োজন ক্ষীণ হস্ত করতে পারে? বিরস মনে যে কাজই করা যাক্‌না কেন সে দেবভোগ্য হয় না—মানুষের তাতে কোন উপকার হয় কি না বলা কঠিন, তবে দেবতা যে তা গ্রাহ্য করেন না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাই হাতের কাজ আর মুখের কথার সঙ্গে মনের ভাব, অন্তরের প্রীতি যোজনা করে দিতে হয়, প্রাণের প্রেরণা আনন্দকে সঙ্গী করে যখন যাত্রী হয়, কল্যাণ তখনই সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব লাভ করে।

আজকাল দেবদারুর পাকা ফল ঝরে পড়বার সময় কত লক্ষ লক্ষ ফল কেবলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে কয়টারই বা অঙ্কুর হতে পায়? আর যার বা অঙ্কুর হয় তার মধ্যে কতগুলিই বা বাঁচতে পায়? যেটি বেঁচে ওঠে সেটিরও পরিণতির দিকে কত বাধা, ছাগলে মুড়িয়ে খায়, অনাবশ্যক মনে হলে মালি এসে তাকে উপড়ে ফেলে। চারিদিকেই দেখতে পাই মৃত্যু-পরীক্ষায় যে জয়ী হয়, তারি পরিণতি-লাভের আশা থাকে—কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর তাড়না চারিদিক হতে ঘিরে আসছে। আত্মরক্ষার চেয়ে আত্ম-নিবেদনই অধিক দেখা যায়। এই যে অসংখ্য মৃত্যু এ কোনো অমরতাকে আশ্রয় করে, কেননা স্থূল যা-কিছু প্রত্যক্ষ নষ্ট হয়েও মরে না, তার প্রাণ-সার অলক্ষ্যে প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে থাকে। মানব-জীবনের পক্ষেও কি এই নিয়ম সত্য? জীবনের এই বারম্বার দুঃখের মধ্যে মনে যা সঞ্চয় হয়, তা কি জন্ম-জন্মের সাথী হবে না! এই স্বকৃত-সংগ্রহ এবং অপর-দত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং লাঞ্ছনা এ কোন্ ভাবে কার্য্য-কর হবে? এত কথা ঠিক্ করে ভেবে নিষ্পত্তি করা কঠিন, তবে একটি জিনিসই শুধু সম্ভব,—ভাবনার বোঝা নামিয়ে ফেলা আর মনকে একেবারে খাঁটি করে বাহিরের কাজে তারি সঙ্গে মিল রেখে চলা!

* *
*

আমার ভাবনা দিয়ে ভেবে ভেবে যখন সব রহস্য পরিষ্কার করে নিতে চাই, তখন

কিছুই দেখতে পাইনে। যে সূক্ষ্ম তন্তু-গুলি দিয়ে আমার দৃশ্য বস্তু রচনা করব, তার সূত্রগুলিই আমার চোখে পড়ে না, আমার হাতের আয়ত্বের মধ্যে আসে না। কিন্তু নিজে যখন ভাবনার অসাধ্যতা বুঝে হাল ছেড়ে দি, তুমি যখন আমায় বোঝাও তখনি আমি সব পরিষ্কার করে দেখতে পাই। আমার ভাবনা যেন ঐ আকাশের মেঘ, আমার স্বর্গকেও আচ্ছন্ন করে আছে, আবার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে আমার পৃথিবী-টাকেও আবছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। তোমার বিচার-শক্তি যেন ঐ আকাশের আলো, স্বচ্ছ অবারিত স্বতঃপ্রকাশ! সে আপনাকেও যেমন দেখায়, আপনার চারিদিকটিকেও তেমনি উজ্জ্বল করে তোলে। সেই আলো দিয়ে যখন দেখি, তখন সবই সহজ সরল পরিষ্কার হয়ে যায়।

* *
*

তুমি যাকে পথ দেখাও তার কি আর মুখ ভার করে থাক্‌বার উপায় থাকে? চারিদিকে যে হাসির ফোয়ারা খুলে যায়, আলোর জোয়ার ভেসে আসে! আলোর তেজে জীবনের কোথাও কোন কালো ঠাঁই পায় না। বুকখানা এতখানি বেড়ে যায়, আর বুদ্ধি কেমন সহজেই সব মীমাংসা করে ফেলে! সোজা পথটি চট্ করে বেরিয়ে যায়! যাব কি যাব-না'র মিছে ভাবনা দূর হয়ে যায়। যাওয়ার পথ, আর না-যাওয়ার অপথ দুইই সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিজের চোখ দিয়েই দেখি আর নিজের বুদ্ধি দিয়েই বিচার করি, আর দশজনে কি বল্‌বে—ভাল মনে করবে, না মন্দ বল্‌বে সে কথা মনেও আসে না। খুব নিঃস্বার্থ হতে হলে বড়ই স্বার্থপর হতে হয়, কেননা আমি কতটা ছাড়ব, আর কতটা ধরে থাক্‌ব, সে বিচার অন্যে কখনই করে দিতে পারে না, এ-বিষয়ে নিজের উপর নিতান্তই নির্ভর করে কর্ত্তব্য-বিচার করতে হয়। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে যখন আমার ক্ষীণ শক্তির মিলন হয়, আমার ইচ্ছা যখন কল্যাণময়ী পরমা ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করে, তখন আমি স্বাধীন হই। বাধা, বিপত্তি, বিঘ্ন তিরোহিত হয়, গতি-পথে কোন প্রতিবন্ধকই স্থায়ী হয় না!

* *
*

স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃশ্য-কারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না। স্বাধীন মনোবৃত্তি উদ্দাম নয়, সাবধান এবং সতর্ক! স্বাধীনতার গতি উল্কার মত কক্ষ-ভ্রষ্ট নয়, সে গতি গ্রহ-তারকার নিয়মিত সঞ্চরণ, অক্ষৌহিণী নক্ষত্র সবাই মুক্ত পথে চলেছে, উন্নতি, পরিণতি ও নিয়তির পথে যাত্রা, তার মধ্যে বিষমতা নাই বলেই তা বাধাহীন। উল্কার গতিতে ছুটে চলতে বাধা নাই সত্য, তবে তার শেষ সত্ত্বরই হয়। অনন্তের পথে অবিরত যে চল্‌তে পারত, সে মধ্যপথে অকস্মাৎ দীপ্ত অঙ্গারের মত ভস্মীভূত হয়ে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে। তার আত্মঘাতী পরিণামে কারো কোন কল্যাণই সাধিত হয় না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

# আলেয়ার আলো

## তেরো

### সরমার কথা

জ্বরের ঘোরে আমি যখন বেহুঁস হয়ে ছিলুম, তখন স্বপ্নের মত মনে হোত, কে যেন আমার শিয়রের কাছে ঝুঁকে বসে আছে, যে যেন কাতর-করুণ চোখে আমার মুখের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে! তার মুখখানি মনে হোত চেনা-চেনা,—অথচ চিনতে গেলে চিন্‌তে পারতুম না, সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যেত!

যেদিন প্রথম জ্ঞান হোল, দেখলুম রাত্রিবেলায় আমার বিছানার পাশে মোহনবাবু!... ...

আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—লজ্জায়, সঙ্কোচে মাথা যেন কাটা যেতে লাগ্‌ল! জ্বরে যখন হুঁস্ ছিল না, তখন আমার গায়ের কাপড়-চোপড় নিশ্চয়ই অসামাল হয়েছিল! ছি, ছি, মোহনবাবু কি-বলে এমনসময়ে আমার ঘরে বসে আছেন! আর, তাও বলি—বাবাই বা কি-রকম মানুষ? আমার বিছানার পাশে একজন পুরুষকে বসিয়ে রেখে, তিনি কিনা অম্লানমুখে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন! তাঁর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে?

ভারি রাগ হোল; মোহনবাবুকে ঘর থেকে চলে যেতে বললুম। তিনি আবার সহজে নড়তে চান না দেখে আমার রাগ আরো বেড়ে উঠল। কড়া কথা বলে' তাঁকে ঘর থেকে একরকম তাড়িয়েই দিলুম।

ভোর হবার আগেই বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে আছি দেখে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললেন, "কেমন আছিস মা?"

—"ভাল আছি।"

—"আঃ, বাঁচলুম! তোর জ্ঞান হয়েছে দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল! এ ক-দিন যে কি-করে' কেটেছে, তা—

—"হ্যাঁ বাবা, আমার অসুখ কি খুব বেশী হয়েছিল?"

—"ওঃ—যমে-মানুষে টানাটানি! ভাগ্যে মোহন ছিল, নৈলে তুই কি আর বাঁচতিস সরো?"

—"মোহনবাবু?"

—"হ্যাঁ মা! এ ক-দিন ক-রাত তোর জন্যে সে যে মুখের রক্ত তুলে খেটেছে। হ্যাঁরে, মোহন কোথায় গেল? বাড়ী গেছে বুঝি? আহা, তার শরীর নিশ্চয়ই কাহিল হয়ে পড়েছে—এ ক-দিন সে ঠায় তোর বিছানার পাশে বসেছিল,—আমার চেয়ে তোর উপরে তার যেন দরদ বেশী! ডাক্তার তাই কাল বলছিলেন, মোহন যদি না থাকত, তাহলে তোর অসুখ আরো সংঘাতিক হয়ে উঠত। আহা, মোহনের আমার ভাল হোক্!"

ভেবেছিলুম, বাবাকে খুব বকব! কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মুখ

দিয়ে আর বাকি্য সরল না! মনের ভিতরে কেমন একটা খেদ জেগে উঠতে লাগল।

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "মোহনের মত যদি একটি পাত্র পেতুম, তাহলে আজ আর তোর কপালে এ দুঃখ"—বলতে-বলতে হঠাৎ তিনি আমার মুখ দেখে থেমে পড়লেন!

আজ সারাদিন মোহনবাবু আমাদের বাড়ীতে আসেন-নি।

বিকাল-বেলায় বাবা বললেন, "কি আশ্চর্য্য! মোহন আজ একবারও এল না বড় যে?"

মোহনবাবুকে ডাকবার জন্যে তিনি ঝীকে পাঠিয়ে দিলেন। ঝী ফিরে এসে বললে, মোহনবাবু সেই দুপুরে বেরিয়ে গেছেন—এখনো ফেরেন-নি।

বাবা অস্ফুট স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য!"

কিন্তু, আমি বুঝলুম।

সন্ধ্যার সময় হরেনবাবু এলেন, কেমন আছি তাই জানতে! তিনিও মোহনবাবুর কোন খবর বলতে পারলেন না।

বাবা ঘাড় নেড়ে আবার বললেন, "কি আশ্চর্য্য!"

সে রাত গেল। তার পরের দিন শুনলুম, হঠাৎ কি বিশেষ দরকারে মোহন বাবু মধুপুরে গিয়েছেন।

বুঝলুম, এ স্রুধু অছিলা। এ ক-দিন আমাদের বাড়ীতে তিনি সারাদিনই থাকতেন, হঠাৎ একেবারে আসা বন্ধ করে' দিলে বাবা সন্দেহ করতে পারেন—এই ভয়েই মোহনবাবু কলকাতা ত্যাগ করেছেন।

না-জানি আমার অকৃতজ্ঞতায় প্রাণে তিনি কী আঘাতই পেয়েছেন!

দিনে দিনে আমি সেরে উঠতে লাগলুম।

বাবা বড় বেশী করে'ই মোহনবাবুর অভাব বোধ করতে লাগলেন। মোহনবাবু প্রায় সারা দিনটাই আমাদের বাড়ীতে কাটাতেন। হরেনবাবু এখনো রোজ সন্ধ্যায় এক-একবার আসেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টা বাবা যে কি-করে' কাটাবেন, তাই নিয়ে তিনি যেন মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন!

বাবা সেদিন আমাকে বললেন, "মা সরো, মোহন যে আমার মনের এতখানি দখল করেছে, এতদিন তা বুঝি-নি। তোর জন্যে সে এমন করে' খাট্‌লে-খুটলে, কিন্তু তুই সেরে ওঠবার আগেই হঠাৎ চলে গেল, চিঠি-পত্রেও আর খবরাখবর নিলে না, এর কারণ কি? বিদেশে গিয়ে সে নিজে অসুখে-বিসুখে পড়ে নি ত!"

বাবাকে সব কথা বলব-বলব করে'ও বলতে পারলুম না—মুখে কেমন বেধে গেল! যিনি আমাদের এমন আত্মীয় ছিলেন, তাঁর প্রাণে যে আমি কত-বড় দাগাটা দিয়েছি, কোন্‌মুখে তা প্রকাশ করে' বলব!

বাবা একলাটি বসে-বসে তাঁর বেহালার উপরে ছড়ি টানেন, যখন বাজনা ভাল লাগে না তখন তাঁর নন্থয়া-কুকুরকে নিয়ে সময় কাটান, তাকে আদর করেন, তার সঙ্গে আবোল-তাবোল কত কি বকেন!

নন্নুয়ার মত আর-কোন দেশী কুকুর বোধহয় মানুষের কাছে এর আগে এতটা আদর ভোগ করে-নি!

আজ সকালে বাবা আবার রাস্তা থেকে আর-একটি জীব সংগ্রহ করে' এনেছেন!

আমার কাছে এসে বললেন, "কাপড়ের ভিতরে এটা কি নড়ছে বল্ দেখি?"

আমি কিছুই ঠাহর করতে না পেরে বললুম,—"কি বাবা?"

বাবা হাসতে-হাসতে কাপড়ের ঢাকা খুললেন—ছোট্ট একটি বেড়াল!

তার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, "এর নাম কি রেখেছি জানিস?"

—"এর মধ্যে নামও রেখে ফেলেছ বাবা?"

—"কি আশ্চর্য্য! নাম না রাখলে কি চলে? এর নাম রেখেছি মেন্নুয়া!"

এদিকে বাবার সাড়া পেয়ে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে আহ্লাদে জিভ্ বার করে' নন্নুয়া এসে হাজির! কিন্তু, বাবার কোলে হঠাৎ বেড়াল-ছানা দেখে সে বেজায় চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ল্যাজ-নাড়া একেবারে থামিয়ে ফেললে। তাকে অমন হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে, মন্নুয়াকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, "নন্নুয়া, তোর খেলার সাথী এনেছি রে!"

কিন্তু আ কপাল, নন্নুয়া আর মেন্নুয়া—দুজনেই দুজনকে দেখে মোটেই খুসী হল না! কোনরকম ইতস্তত না করে'ই নন্নুয়া তেড়ে এসে দিলে মেন্নুয়ার ঘাড়ে ঘ্যাক্ করে' এক কামড়, আর মেন্নুয়া ল্যাজটি ফুলিয়ে কলাগাছ করে', নন্নুয়ার নাকের ডগায় দিলে ধাঁ-করে' এক থাবা বসিয়ে! থাবা খেয়ে নন্নুয়ার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল! সে দাঁত বের করে', চার হাত-পা তুলে মেন্নুয়াকে তফাৎ থেকেই নানারকমে ভয় দেখাতে সুরু করলে—কিন্তু তার থাবার সীমানায় ভরসা করে' আর এগুল না।

বাবা নন্নুয়াকে এক ধমক দিয়ে মেন্নুয়াকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "মেন্নুয়া, এ-বাড়ীতে থাকা সুবিধের নয় মনে করে', তুমি যেন পালিয়ে-টালিয়ে যেও না বাছা! দুষ্টু নন্নুয়াকে আমি দুদিনেই শায়েস্তা করে' দেব—তোমার কিছু ভয় নেই!"

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে মেন্নুয়া করুণ স্বরে বলে উঠল—"মিউ!"

বাবা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এরা মানুষের কথা বোঝে—দেখ্‌চিস্ সরো!"

দিন-পনেরো কেটে গেল—মোহনবাবুর কোন খবর নেই! মোহনবাবুর বাড়ীতে স্ত্রীলোক ছিলেন একজন,—তাঁর পিসীমা। ঝীকে পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকেও কোন খবর পেলুম না—মোহনবাবু চিঠি-পত্র কিছুই লেখেন-নি।

আমার সেদিনকার কথাগুলো মোহনবাবুর প্রাণে গিয়ে যে কতটা বিঁধেছে, এতদিনে সেটা বুঝতে পারলুম। নিজের মনের ব্যথা বুকেই চেপে রেখে দিনের পর দিন কাটাচ্ছি, রোজ ভাবি আজ তিনি আসবেন,—কিন্তু কৈ, তিনি ত এলেন না—

তিনি ত এলেন না!… • সেদিন বাবার বেহালায় যে সুরটি বাজছিল, সেটি শুনে আমার সেই সুরের একটি গান মনে পড়ল—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
মধু নিশি পূর্ণিমার, আসে যায় বারবার
সেজন ফিরে-না আর যে গেছে চলে!"

আর কি তিনি ফিরবেন? আর কি তিনি আমাদের দোর মাড়াবেন?

আজ সকালে কি-একটা কাজে ঘরের ভিতরে এলুম। মোহনবাবুর বাড়ীর দিককার জানলাটা খোলা ছিল। সেদিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম, মোহনবাবু ঘরের যে জানলাটা এতদিন বন্ধ ছিল—আজ সেটা খোলা। একটু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলুম। মোহনবাবুর ঘরের মধ্যে একখানা বড় আরসি ছিল, তার দিকে চোখ পড়ল। আরসিতে একটি লোকের ছায়া! দেখেই চমকে উঠলুম,—একি, এ যে মোহনবাবু!

বিছানার উপরে তিনি আধ-শোয়া আধ বসা অবস্থায় ছিলেন, তাঁর মুখখানি হেঁট-করা। তিনি কখন্ এসেছেন? আমরা ত কিছুই জানতে পারি-নি! জানলার কাছে আরো এগিয়ে গেলুম—তাকে ডাকা উচিত কিনা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগলুম।

এমনসময় তিনি মুখ তুললেন, কিন্তু আরসির দিকে চোখ পড়বামাত্র চমকে উঠলেন। আরসির ভিতরে আমার ছায়া দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন—তারপর ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। দেখলুন, যাবার সময়ে তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল!

আমার উপরে তিনি এখনো রাগ করে' আছেন! মনটা কেমন হা-হা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

নন্নুয়া আর মেনুয়াকে নিয়ে বাবা বারান্দায় বসেছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, "বাবা, মোহনবাবু এসেছেন!"

—"কি আশ্চর্য্য! কোথায় সে?"

—"তাঁর বাড়ীতে।"

বাবা তখনি মোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ছুট্‌লেন।

খানিক পরে, আমি রান্নাঘরে বসে আছি, বাবা ফিরে এসে হতাশ ভাবে বললেন, "হ্যাঁ মা, মোহন এসেছে বটে!"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "কৈ, তিনি এলেন না?"

—"না মা, বললে রেলে বড় কষ্ট হয়েছে —শরীর ভারি খারাপ!"

ফস্ করে' বলে ফেললুম, "আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলেন না?"

—"কৈ আর করলে! আমিই বললুম, সরমা এখন একেবারে সেরে উঠেচে, তোমার জন্যেই এ যাত্রা সে বেঁচে গেল। মোহন শুনে হ্যাঁ না কিছুই বললে না—খালি একটু হাসলে। মোহনকে দেখে মনে হোল, সে-যেন কেমন খাপ্‌ছাড়া হয়ে গেছে। কেন বল্ দেখি মা?"

আমার চোখে জল এল, পাছে বাবা দেখে ফেলেন সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি উনুনের কাছে গিয়ে পিছন ফিরে বসলুম।... ...

ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলুম।

মোহনবাবু যে রাগ করেছেন, এ কথা আর বেশীদিন লুকানো থাকবে না। বাবা আর হরেনবাবু যখন জানতে পারবেন যে, মোহনবাবু কেন রাগ করেছেন, তখন কি হবে? তাঁরা আমাকে কি ভাববেন?

তাঁরা কিছু ভাবুন না ভাবুন, তাতে তত যায়-আসে না—কিন্তু মোহনবাবুর চোখে আমি কত নীচে নেমে পড়েছি! যে লোক আমাদের বাড়ীতে দিনে এক-শো বার আসতেন, যিনি আমাদের সকল দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন, যিনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে শরীর দিয়ে মন দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন—আজ কিনা তাঁরই মন আমাদের দিক থেকে একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, তিনি এখানে এসেও আমাদের বাড়ী মাড়ালেন না, একটিবারও আমার নাম মুখেও আনলেন না! কেন আসবেন, কেন আমার নাম করবেন,—পোড়ারমুখী আমি—আমি যে নিজেই কটু-কথায় তাঁকে বিদায় দিয়েছি!

না-বুঝে, না-ভেবে অমন কথা কেন তাঁকে বললুম? রাত্রে আমার ঘরে আছেন বলে' তাঁর উপর রাগ করে' আমি যে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতি অন্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি! এ-কথা কি তিনি ভুলতে পারেন?

ওগো তুমি ভুলে যাও, ভুলে যাও! আমি মনে-প্রাণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি—তুমি এস গো, আমাকে ক্ষমা কর! তুমি ভুলে যাও!

কিন্তু, তিনি এলেন না—আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগও দিলেন না। সারাদিন এই-আসেন এই-আসেন মনে করে' তাঁর পথ চেয়ে বসে রইলুম,—তিনি এলেন না!

ফুলে-ফুলে রঙ্গে-রঙ্গে বাগানখানি ছেয়ে গেছে—উদাস-চোখে সেইদিকে চেয়ে জানলার ধারে বসেছিলুম। হঠাৎ দেখলুম, বাগানের এককোণে—যেখানে ঘনসবুজ লতাকুঞ্জ ঘাসের উপরে পুষ্পিত-পল্লবের কম্পমান ছায়াপাত করেছে—সেইখানে স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত মোহনবাবু একলাটি বসে আছেন। পুকুরের কালো জল আলো করে' গুটিকয় রাজহাঁস দীর্ঘগ্রীবা হেলিয়ে এঁকে-বেঁকে জল-খেলা খেলছে, তিনি আনমনে চুপটি করে' তাই দেখছেন।

মোহনবাবুকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না—আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালুম। বাইরের ঘর থেকে বাবার এস্রাজের আওয়াজ কাণে এল। একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, যা করতে যাচ্ছি—এ কি উচিত? তারপরেই মনে হোল, দোষ যখন করেছি, তখন ক্ষমা চাইতে লজ্জা কি? এক-একবার মনে নারীর অভিমান জেগে উঠতে লাগল কিন্তু সে অন্যায় অভিমানকে আমি প্রবল হতে দিলুম না। মনকে শক্ত করে', খিড়কির

দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দুধারে কচি ঘাসে-ভরা জমি—মাঝ-খান দিয়ে ছোট্ট একটি রাঙ্গা কাঁকরের পথ। চলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল—কিন্তু আমি থামলুম না—কি-যেন এক মন্ত্রের টানে কে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—আচ্ছন্নের মত চলতে-চলতে আমি সেই লতাকুঞ্জের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সেখানে গিয়ে মনে হোল, আবার ফিরে যাই—একি বেহায়াপনা করছি! কিন্তু তারপরেই ভাবলুম, এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আর ফৈরা নয়!

কুঞ্জের পাশে যেখানে তাঁকে দেখে-ছিলুম, সেইখানে এক-পা এক-পা করে' এগিয়ে গিয়ে দুরু-দুরু বুকে ডাকলুম, "মোহনবাবু!"

কেউ সাড়া দিলে না।

সামনে আর-একটু ঝুঁকে পড়ে হতাশ চোখে দেখলুম, মোহনবাবু যেখানে বসে-ছিলেন, সেখানে কেউ নেই—তিনি কখন্ উঠে চলে গেছেন!

মাথাটা ঘুরে গেল—দুই চোখ মুদে সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম।

মনের মাঝ থেকে কে-যেন সকাতরে বলে উঠল—ওরে অভাগী, তোর প্রাণের কান্না প্রাণেই ফিরে এসে, তোর রমণীত্বের সকল গর্ব্ব আজ ডুবিয়ে দিলে যে!

রাত্রে শোবার আগে বাবার কাছে গিয়ে বসলুম।

বাবা বললেন, "কি মা, আজ যে বড় এখনো জেগে?"

আমি মাটীর দিকে তাকিয়ে বললুম, "হ্যাঁ বাবা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়-নি?"

বাবা একটু দুঃখিত ভাবে বললেন, "ওরে, মোহন আর সে মোহন নেই! তা'র মনে কি হয়েছে তা সে-ই জানে!"

—"তাহলে দেখা হয়-নি?"

—"না।"

—"বাবা, মোহনবাবু আমাদের উপর রাগ করেছেন।"

—"রাগ? কেন মা, আমরা ত তার রাগ হবার মত কিছুই করি-নি!"

—"তুমি কিছু কর-নি বাবা, কিন্তু আমি তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি!"

বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "কি আশ্চর্য্য! তুই?"

আমি আর কিছু লুকোলুম না—একে একে সেদিনকার সমস্ত ব্যাপার বাবার কাছে খুলে বললুম। সমস্ত শুনে বাবা অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

তারপর ব্যথিত স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এতবড় অন্যায়টা তুই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিস্! ছিঃ ছিঃ, মোহনের পায়ে ধরে' তোর মাফ চাওয়া উচিত!"

বাবার কোলের উপরে মুখ রেখে আমি কাঠের মত বসে রইলুম।

—"তাই ত বলি, মোহন ত তেমন ছেলে নয়, হঠাৎ সে এমন হোল কেন? তলে-তলে এমন কাণ্ড হয়ে গেছে, কে

জানত তা? সে হয়ত ভাবছে, আমরা কি হীন, কি অকৃতজ্ঞ! ছি ছি, লজ্জার কথা, লজ্জার কথা! সুতরাং—"

## চোদ্দ

## মুরারিবাবুর কথা

সরমার মুখে সমস্ত শুনে সারারাত ভালরকম ঘুম হোল না; মোহন আমাদের কি ভাবছে, তাই ভেবে আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

ঐ ত সরোর দোষ! সামান্য কারণে হঠাৎ এমনি বেঁকে দাঁড়াবে যে কার সাধ্য তখন তাকে আর বাগ মানায়! ওর ঐ উল্টো স্বভাবের জন্যে মাঝে-মাঝে আমাকেও কি কম ভুগতে হয়? কিন্তু আমি যে তোর বাপ! আমি যা সইব, অন্যে তা সইবে কেন বাছা?

ভোরবেলায় কাক-চিল ডাকতে-না-ডাকতেই উঠে মোহনের বাড়ীতে ছুটলুম। মোহন সবে তখন মুখ-হাত ধুয়ে নীচে নামছে,—আমাকে দেখে নামতে-নামতে সে সিঁড়ির উপরেই থমকে দাঁড়াল।

আমি তার সামনে গিয়ে বললুম, "মোহন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে!"

মোহন অবাক হয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল; তারপর নেমে এসে আমাকে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে।

মোহনের কাছে কথাটা কি-ভাবে পাড়ব তাই ভাবছি, হঠাৎ "হ্যাঁ হে মোহনলাল, যাবার সময়েও খবর দিলে না,

আসবার সময়ও দিলে না—ব্যাপার কি বল দেখি?—এই যে মুরারিবাবু!"—বলতে বলতে হরেনবাবু ঘরে ঢুকে আমাকে নমস্কার করলেন।

—"হরেনবাবু, আজ এত সকালে যে?"

—"এই অকৃতজ্ঞ মোহনকে ধমকাতে। ওর জন্যে যারা ভেবে মরে, কত সহজে ও তাদের ভুলে যায়, দেখছেন ত! আমাদের মেয়েলি কথায় আছে না—'বনের মোষ খায়, বনের পানে ধায়'—ও হচ্ছে সেই জাতীয় জীব! বিদেশে না বলে-কয়ে চলে গেল, একখানা চিঠিও লিখলে না!"

হরেনবাবুর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—তিনি মোহনের প্রাণের বন্ধু, আজ হোক কাল হোক সমস্তই শুনতে পাবেন ত! এই-সব ভেবে-চিন্তে বললুম,—"হরেনবাবু, মোহন আমাদের উপর রাগ করেছে!"

মোহন চমকে উঠে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে, মাথা হেঁট করলে।

হরেনবাবু খানিকক্ষণ হা-করে' থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর আশ্চর্য্য স্বরে বললেন, "রাগ!"

—"হ্যাঁ। সরো ছেলেমানুষ, জ্বরে তার মাথা ঠিক ছিল না—কি বলতে কি বলে ফেলেছে! তার কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা? মোহন, এই তোমার দুটি হাত ধরে বলছি, একবার গিয়ে দেখবে চল, সরো কি-রকম অনুতপ্ত হয়েছে! তুমি এখানে যে ক-দিন ছিলে না, সে ক-দিন সে খালি তোমার কথা তুলত। কিন্তু আমি কি ছাই এ-সব জানতুম! কাল

বাড়ী মাড়ালে না, সরো তখন কাঁদো-কাঁদো মুখে আমার কাছে গিয়ে সকল কথা খুলে বললে। সে যা বলেছে, না-বুঝে জ্বরের ঘোরে বলেছে! মোহন, বাবা, তোমার আশ্রয়েই আমরা কলকাতায় রয়েছি, তুমি আমাদের এত উপকার করেছ—আমরা কি তোমাকে অপমান করতে পারি? চল বাবা, দেখবে চল—সরো তোমার আশায় বসে আছে, তোমার কাছে মাফ চাইবে বলে। সুতরাং—"

হরেনবাবু চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "বটে, বটে? কিন্তু মুরারিবাবু, এতে ত আমি দ্রৌপদী-ঠাকরুণের কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না! তিনি রুগ্ন দেহে বেঠিক মাথায় যা বলেছেন, সুস্থ দেহে মোহন তাতে যখন রাগ করতে পেরেছে, তখন সে যে একটি অতি-বড় হস্তীমূর্খ, সত্যের অনুরোধে এ আমি স্বীকার করতে বাধ্য!"

আমি বললুম, "মোহন, বল, আমাদের তুমি ক্ষমা করবে?"

হরেনবাবু তাঁর হাতের ছড়ীটা ঠক্‌ঠক্ করে' মাটীর উপরে ঠুকে বললেন, "যে নিজে দোষী, সে মত দেবে না—দণ্ড নেবে। এখন ওর প্রতি কি শাস্তি বিধান করা যাবে—আসুন, আলোচনা দ্বারা সেইটেই অবধারণ করা যাক্।"

মোহন এতক্ষণ চুপ করে' বসেছিল। এবার সে লজ্জিতভাবে বললে, "মুরারিবাবু, আমারই অপরাধ হয়েছে—আমাকে ক্ষমা করুন।"

আমি বললুম, "কি আশ্চর্য্য! বাবা আমরা—

হরেনবাবু আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "মুরারিবাবু, চুপ! আপনি আশ্চর্য্য হবার অবকাশ পরে যথেষ্ট পাবেন। আগে শাস্তির কথা হোক—আপোষে মেটালে চলবে না। তুমি মোহন, তোমার প্রতি এই শাস্তি হোল যে, তুমি অবিলম্বে শ্রীমতী দ্রৌপদী-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে তোমার এই প্রকাণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে বিশেষ অনুতপ্ত চিত্তে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ওঠ—দেরি নয়, ওঠ!"

মোহন বললে, "এতে আমি রাজি। কিন্তু—"

"কী! আবার কিন্তু? এ সব বাক-চাতুরী চলবে না মোহন!"—হরেনবাবু দু-হাতে শিশুর মত মোহনকে আগে শূন্যে তুলে, তারপর দাঁড়-করিয়ে দিয়ে আবার বললেন, "যাও! আগে ক্ষমা চেয়ে এস—নইলে আর তোমার মুখদর্শন করব না! অ্যাঁ,—দ্রৌপদী-ঠাকরুণের উপরে রাগ? যাঁর স্বহস্তে ভর্জ্জিত ঘৃতপক্ক লুচি এবং অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি উদরসাৎ করে' আমরা পৃথিবীতে বসেও স্বশরীরে স্বর্গলাভের পরমানন্দ উপভোগ করি, তাঁর উপরে রাগ! অকৃতজ্ঞ মোহন, শীঘ্র যাও! ততক্ষণ আমরা এখানে বসে গল্পগুজব করি! যাও—যাও, আর দাঁড়িও না বলছি!"

## পনেরো

## মোহনের কথা

সরমার ব্যবহারে সে দিন কী মর্ম্মাহত হয়েছিলুম!

কলকাতায় থাকলে পাছে আবার বাধ্য

হয়ে সরমাকে দেখতে যেতে হয়, সেই ভয়ে আমি দেশত্যাগী হলুম। ভাবলুম, যে আমাকে চায় না—আমিও তাকে ভুলে যাব! কিন্তু যার দিকে আমার সকল প্রাণ-মন একাগ্র হয়ে আছে, তাকে ভোলা কি সহজ! সামান্য একটা উল্কীর আঁচড় দেহের উপর থেকে তুলে ফেলা যায় না, আর দেহের ভিতরে প্রাণের মাঝখানে যে ছবি আঁকা হয়ে যায় সে ছবি পুঁছতে গেলে প্রাণকেও যে ত্যাগ করতে হয়!

পনেরো দিন বিদেশে ছিলুম—এ পনেরো দিন যে কি-করে', কোথা দিয়ে কেটেছে, তা আমি জানি আর জানেন ভগবান! সত্যি, দিন কারুর জন্যে বসে থাকে না, দিন কেটে যায়; কিন্তু আশাহীনের এক-একটি দুঃখের দিনের সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকের এক-একটি তন্ত্রীও যে বেসুরো হয়ে ছিঁড়ে যেতে থাকে!

সরমাকে ছেড়ে থাকতে আর পারলুম কৈ! যদিও তার সেদিনকার নিষ্ঠুর কথাগুলো সূচের মত বুকের মধ্যে বারংবার বিঁধছিল, তবু জানি না, কি মোহের টানে সেই ব্যথাকাতর প্রাণ নিয়েই আবার কলকাতায় ফিরে এলুম।

ফিরে এসে সবে ঘরে বসে বিশ্রাম করছি,—আরসির মধ্যে দেখলুম তার ছায়া! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নীরবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। আমার মনে হোল, তার সেই নীরবতা, মৌন ব্যঙ্গ বৈ আর-কিছুই নয়! সে কি তাই দেখছিল নিস্তব্ধভাবে, যে, তার নিষ্ঠুর আঘাতে আমি কতটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছি? আবার আমার মনের মধ্যে অভিমান উথলে উঠল,—আমি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে'ই সে ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

কিন্তু আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, তাকেও ভাল করে' বুঝি-নি! তখন যদি বুঝতুম যে, তার সে নীরবতা লজ্জা-অনুতাপের নীরবতা, দীনতার নীরবতা, তাহলে কি তেমন করে' মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে পারতুম? না, তা' ত পারতুম না!

পরদিন প্রভাতেই যখন মুরারিবাবুর মুখে সমস্ত শুনলুম, তখনি বুঝলুম সরমার উপরে আমি কত-বড় অবিচারটা করেছি! আমার সকল রাগ, সকল অভিমান, আবেগের স্রোতে কুটোর মত এক লহমায় ভেসে গেল—একান্ত লজ্জিত হয়ে মূঢ়ের মত আমি বসে রইলুম।

তারপর দুষ্ট হরেন যখন তার বাক্য-চাতুর্য্যের দ্বারা সরমার সঙ্গে আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটিয়ে দিলে, তখন সে মাহেন্দ্রক্ষণকে আর আমি অবহেলা করতে পারলুম না!

ঘরের দরজার কাছে সরমা প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল। আমার পদ-শব্দ শুনে সচকিতে সে একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েই, আবার লজ্জিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে।

দোষীর মত তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম—কিন্তু কোন কথা কইতে পারলুম না।

সরমাও মৌনমুখে মাথা নামিয়ে হাতের আঙুলে আঁচলের খুঁটটা জড়াতে লাগল।

কি বলি? কি করি? কত কথাই

মনে হোতে লাগল, কিন্তু মুখের কাছে এসেই বুকের কথা হারিয়ে যায় কেন? অনেকক্ষণ পরে সুধু বললুম, "সরমা!"

সরমা আবার মুখ তুললে! 'সরমা' বলে তার নাম ধরে আর-কোনদিন ডাকিনি, কিন্তু আমার মুখে এই প্রথম তার নাম শুনে সে কিছুমাত্র বিস্মিত হোল না—সে যেন আমার কাছ থেকে এমনি সম্বোধনের জন্যেই আগে-থাকতে প্রস্তুত ছিল!

সরমার চোখদুটি কি কাতর, কি করুণ, কি ছলছল! সে আয়ত নয়নে তার প্রাণের যে দুঃখ-তাপের ছায়া এসে পড়েছে, মুখের কথা এর চেয়ে আর বেশী কি প্রকাশ করবে?

মিনতি করে' বললুম, "আমি না বুঝে তোমার ওপর অত্যন্ত অবিচার করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।"

সরমা যেন খুব চেষ্টা-করে' কথা কইলে। মৃদুস্বরে, সকাতরে সে বললে, "মোহনবাবু, অবিচার আপনি করেন-নি,—আমি করেছি। ক্ষমা করবার অধিকারও আমার নেই—আপনার আছে। আমি যা বলেছি, যে অন্যায় করেছি, সমস্ত ভুলে গিয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"—বলে, সরমা ঊর্দ্ধ-মুখী ফুলের মত তার মুখখানি তুলে হাত-দুটি যোড় করে' ধরলে!

আমি আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, "সরমা, এ-সব বিচার-অবিচারের কথা ছেড়ে দাও,—আমাদের মনের অন্ধকার যখন দূর হয়ে গেল, তখন আমরা আর কেউ ভাবের ঘরে চুরি করব না!"

এমনসময় নীচে হরেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওহে মোহন, আশা করি এতক্ষণে তোমাদের পালা শেষ হয়েছে—অতএব, যবনিকা-পতনের হুকুম হোক!"

হরেন আর মুরারিবাবু উপরে এলেন। সরমা মাথায় ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল। হরেন বললে, "দ্রৌপদী-ঠাকরুণ, আজকের এই সন্ধি-স্থাপন ব্যাপারে আমি দূতগিরি করেছি; অতএব—"

মুরারিবাবু বললেন, "অবশ্য, অবশ্য!"

সরমা মৃদুস্বরে বললে, "বাবা, ওঁকে বল যে, উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে,—আমি এখনি গিয়ে কড়া চড়িয়ে দেব!"

সেদিন দুপুরবেলায় খেতে বসেছি, পিসিমা পরিবেষণ করছেন। সংসারে এখন আমার আপন বলতে আছেন, এই পিসিমা আর একটি বোন। পিসিমার ছেলেপুলে কিছু হয়-নি, তিনি বিধবাও হয়েছেন অনেকদিন।

পিসিমা আমার পাতে মোচার ঘণ্ট দিতে-দিতে বললেন, "হ্যাঁরে, ও-বাড়ীতে তুই যে হামেসাই আসা-যাওয়া করিস, ওরা কারা?"

বুঝলুম পিসিমা মুরারিবাবুদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি বললুম, "পিসিমা, ওঁরা আমাদেরই জাত!"

—"তা শুনলুম ওদের নাকি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে?"

—"কোথা থেকে শুনলে পিসিমা?"

—"তিনুর মার মুখে।"

—"হ্যাঁ, আছে। তার নাম সরমা। সরমাকে দেখবে?"

—"তা, দেখতে দোষ কি ?"

—"আচ্ছা, খেয়ে উঠেই সরমাকে এনে দেখাব।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে, সরমার কাছে গিয়ে বললুম, "আমার পিসিমা তোমাকে ডেকেছেন। একবার আমাদের বাড়ীতে আসবে ?"

সরমা রাজি হোল। বাগানের পথ দিয়ে তাকে নিয়ে আমি পিসিমার কাছে এলুম।

পিসিমা, সরমাকে আগে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন,—তিনি সেকেলে মানুষ, একেলে আদব-কায়দার কোন ধার ধারেন না।

আমার দিকে ফিরে তিনি বল্‌লেন, "মোহন, এম্‌নি একটি রাঙ্গা বৌ যেদিন তোর জন্যে ঘরে আনতে পারব, সেদিন আমার সাধ মিট্‌বে।"

সরমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আহা মা, এই বয়সেই তোমার কপাল পুড়েছে—ভগবানের এ কী অবিচার!"

সরমা মাথা হেঁট করে' দাঁড়িয়ে রইল।

পিসিমা আবার বললেন, "যাহোক্ মা, খুব সাবধানে থেক! তোমার এই সোমত্ত বয়েস, এ বয়েসে নানান জ্বালা! পুরুষ পরেশ-পাথর, যা করে তা শোভা পায়, কিন্তু মেয়েমানুষের সব তাতেই—"

"আঃ পিসিমা, কি যে বল তার ঠিকানা নেই। কোথায় ছুটো ভাল কথা কইবে, না, যত-সব সৃষ্টিছাড়া কল্পনা! চল সরমা, তোমাকে রেখে আসি।"

পিসিমার কথায় সরমা কেমন জড়সড় হয়ে পড়েছিল। আমি তাকে ডাকবা মাত্রই পিসিমার পায়ে সে টিপ্ করে' একটি নমস্কার দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল।

সরমাকে রেখে আমি যখন বাড়ী ফিরে এলুম, পিসিমা আবার আমার কাছে এসে ধন্না দিয়ে পড়্‌লেন।

বললেন, "হ্যাঁরে মোহন, এ-সব কি শুনছি ?"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কি শুনছ ?"

—"তোদের সরমা নাকি বাজনা বাজায়, তুই গান গাস্, ওর সঙ্গে একলা একঘরে বসে কথা কস্ ?"

—"কে বললে ?"

—"কেন, তিনুর মা।"

—"কি-করে' জানলে সে ?"

—"তাদের বাড়ী থেকে যে আমাদের ও-বাড়ীর সবটা দ্যাখা যায়।"

—"হ্যাঁ, যা বললে তার কতক সত্যি কতক মিথ্যে! কিন্তু তিনুর মার আমাদের নিয়ে এত মাথাব্যাথা কেন ?"

পিসিমা গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, অবাক! তুই আইবুড়ো সোমত্ত ছেলে আর সরমা একে সোমত্ত, তায় বিধবা! লোকের দোষ কি, বলবে না ? আরো কত কথা রটেছে, তা কি তুই জানিস ?"

আমি রেগে বললুম, "জানতে চাইনা! ফের্ যদি এ-সব কথা নিয়ে আমার বাড়ীতে কেউ আসে, তাহলে দরোয়ানকে বলে

দেব, কারুকে যেন বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়!"

আমাকে রাগতে দেখে পিসিমা থতমত খেয়ে বলতে-বলতে চলে গেলেন, "একালের সব উল্টোছিষ্টি—ঘোর কলি কিনা, হবে না কেন ?"

এতক্ষণে বুঝলুম, পিসিমা আজ হঠাৎ কেন মুরারিবাবুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সরমার সঙ্গে অমন অপূর্ব্ব ভণিতা করে' কথা কইলেন!

একটু চিন্তিত হলুম। বাঙ্গালী-সমাজে জনরব বড় ভয়ানক জিনিস। মুরারিবাবু যে-রকম ভীতু, সরল স্বভাবের মানুষ,—এ-সব কুৎসিত কথা যদি তাঁর কাণে গিয়ে ওঠে, তাহলে তিনি একেবারেই মুস্‌ড়ে পড়বেন। আর, একবার কুৎসা রটাবার, ঘোঁট পাকাবার সুবিধা পেলে পাড়া-পড়শীরা চরম না-করে' ত ছাড়ে না! এখন এর উপায় কি ? পিসিমা যা বললেন, সেটা ত উপেক্ষা করবার ব্যাপার নয়! এইবেলা যদি সাবধান না হই, দুষ্টলোকের মুখবন্ধের চেষ্টা না করি, তবে আজ যা সামান্য বলে ভাবছি, কাল তাই অসামান্য ও অসহনীয় হয়ে উঠবেই-উঠবে!

( ক্রমশ )

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# বিবেকানন্দ-সঙ্গমে

( Jules Bois প্রণীত Visions de L'Inde হইতে )

সহর দূরে চলিয়া গেল। এতক্ষণে বারো মাইল দীর্ঘ পোতাশ্রয় ( ডক্‌ ) প্রভৃতিরও শেষ হইল। জোয়ার আসিয়াছে। আমাদিগের চারিদিকেই গঙ্গার জল বর্দ্ধিত হইতেছে। জোয়ারের অনুকূল স্রোত আমাদিগের পান্সী-খানিকে মঠের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। মঠ-বাড়ীটি শুভ্র—সর্ব্বত্র সুন্দর চূণকাম করা, উদ্যান ও তালীকুঞ্জে বেষ্টিত। ত্রিশূল-শীর্ষ মন্দির-চূড়া সকলের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। অদূরে মঠ-সংলগ্ন সৌধ-শ্রেণী যেন আমাদিগকে শিষ্টভাবে আহ্বান করিতেছে।

আমার সহযাত্রী মার্কিণ-রমণী গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। নিউইয়র্ক সহরে বিবেকানন্দের সর্ব্বচিত্তহারী অপূর্ব্ব শক্তির কথা শুনিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই। একত্রে সাধু-সন্দর্শনে যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। এই মহিলাটির দেশ-পর্য্যটনে ক্লান্তি নাই। পারি-নগরীতে প্রদর্শনীর সময় তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। তাহার পর, পুনরায় কায়রো-নগরীতে সাক্ষাৎ। গতকল্য গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আবার দেখা হইল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ খরধার দৃষ্টি, অপাপবিদ্ধ মুখচ্ছবি ও সেই দুরাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত ভাব সহজেই তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, "দেখুন, পৃথিবীটা কত ক্ষুদ্র !" বাস্তবিক ধরিতে গেলে আমাদের এই বিপুল

পৃথিবী একটা বিরাট চতুষ্পথ মাত্র। এখানে ভ্রমণশীল পথিকবৃন্দ অনুপ্রস্থে গমনকালীন সর্ব্বদাই পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে।

বিবেকানন্দ অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বিশাল-আয়ত নেত্রদ্বয় মুখ-মণ্ডলের যেন অধিকাংশই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে শ্যামাঙ্গ ব্যক্তিটি প্রাচীন আর্য্যগণের সেই ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আমি ভূমণ্ডলের যে কোণটিতে বাস করি সেখান হইতে ইঁহার জন্মস্থান কতই না দূরে অবস্থিত! ইনি ভিন্ন-ভাষাভাষী, ভিন্ন দেবের উপাসক, তথাপি আমি ইঁহাকেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিলাম। পারি-নগরীতে অবস্থান-কালে তিনি কয়েকসপ্তাহ আমার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। আমরা একত্রে কনস্তান্তি-নোপল্, গ্রীস ও মিসর দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম! তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিপুল ভাবোন্মাদনার সাহায্যে আমার মানসচক্ষে ভারতবর্ষের যে চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সে দেশকে আমার স্বপ্নের পিতৃভুমি-বোধে স্নেহের সহিত হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। আমার মনের মাধুরী মিশাইয়া আমি যে আদর্শটি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা এই কল্পনার নন্দন-কাননেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে পরলোক ও অদৃষ্টবাদের কত না কথাই আলোচনা করিয়াছি! যে মহাপ্রাণ টলষ্টয় এখন মহাপথের আসন্নযাত্রী*, তাঁহার ন্যায় এই হিন্দুটিরও বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের চিন্তা ও বিশ্বাস-অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়াছেন, সংসারে মানবের যাহা গর্ব্ব ও আনন্দের বস্তু, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন; স্নেহ-ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজন,—এমন-কি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরূপে যশোলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইনি এখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী! ইমার্সনের ভাষায় ইঁহার জীবনের ইতিহাসকেও representative বা আদর্শ-জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। তরুণবয়সে ইঁহার একজন সাধুর সহিত পরিচয় হয়—তিনি 'পরমহংস' 'মহাত্মা'। ইনি অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ—বিজ্ঞানের বড় ধার ধারিতেন না; কিন্তু তপশ্চর্য্যা ও কঠোর সন্ন্যাসব্রতে বিশেষ শক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ হিন্দুদিগের দুইটি প্রধান দেবতা ও বীরপুরুষের নামানুসারে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত—মনে করিত, একাধারে তিনি এই দুই দেবতারই 'অবতার'। যে সংস্কৃত ভাষা এখনও ভারতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত তাহাতে রামকৃষ্ণের অধিকার ছিল না। তিনি কখনও বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই। কলিকাতার উত্তরে একটি কালিকা-মন্দিরের উদ্যানে তাঁহার অদীর্ঘ জীবন-স্রোত মৃদুভাবেই প্রবাহিত হইয়াছিল। ভাবাবেশ যখন তাঁহাকে আর ধ্যানের অতল-স্পর্শ গভীরতায় রুদ্ধ রাখিতে পারিত না সেই সময়ে মুক্তিকামী জনগণের প্রতি তাঁহার

* জুল বোয়ার পুস্তকখানি ১৯০৩খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

কথামৃত অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপদেশাবলী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। বালকের স্বদেশনিষ্ঠ হৃদয়খানি তখন দেশের দুঃখ ও নিরাশায় কত-না বেদনায় ভরিয়া উঠিত! তিনি ভাবিতেন, এই নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর উপদেশ অবলম্বন করিয়া তিনি জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে ব্রতী হইবেন। গুরু তাঁহার বিবেকানন্দ নামকরণ করিয়াছিলেন এবং সংস্কারকের উপযোগী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাকে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তরুণ শিষ্যটির মানবাত্মার পরমাত্মায় বিলীনতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি বেশ-ভূষা ছাড়িয়া, অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও রাজার প্রাসাদে আহার করেন, কখনও দীনহীন কৃষকের পর্ণকুটীরে আশ্রয় লন—কখনও বা বারান্দায় কখনও বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করেন। গুরুদেবের তিরোভাবে শোকাকুল বিবেকানন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এইরূপ অধীর ভাবেই দিনপাত করিতে লাগিলেন; যাহাতে প্রত্যাদিষ্ট প্রচারকার্য্য সফল ও চিরস্মরণীয় হয়, সে-সম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইহা বিশ্ব-মানবের ধর্ম্ম—পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। ইহার কোনও নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই—সকল দেবতা, সকল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মহাপুরুষগণের প্রতিই এ ধর্ম্মের সমান ভক্তি ও অনুরাগ। পর্য্যটনরত ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বলবতী হইয়া উঠিলে বিবেকানন্দ মার্কিণ দেশে যাত্রা করেন। সেখানে সভায় পরিষদে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব যশোলাভ ঘটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার বাঙ্গালী-সুলভ ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যটুকুও সেইখানে নষ্ট হইয়া যায়। বংশগত যকৃতের দোষে ও বহুমূত্ররোগে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। যাহা হউক সুখের কথা এই যে, তাঁহার বিদেশ-গমন নিষ্ফল হয় নাই। তিনি প্রত্যাগমন-কালে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও গুরু-ভাইদের একত্র করিয়া সঙ্ঘ-স্থাপনার জন্য সেই অর্থই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেই সর্ব্বপ্রথমে এই সম্বন্ধেই কথা-বার্ত্তা হইল।

বিবেকানন্দ বলিলেন, “বন্ধু, আমি মুক্তি পাইয়াছি। গুরুভার শৃঙ্খলের ন্যায় কাঞ্চনরাশি বহন করিতেছিলাম, সমস্ত উৎসর্গ করিয়া—এখন যেন নূতন করিয়া মুক্তি লাভ করিলাম। আমি এখন জগতের দরিদ্রতম দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি। কিন্তু তাহাতে কি? আমার রামকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখানে আমার গুরুভাই ও শিষ্যগণের এখন মাথা গুঁজিবার স্থান হইয়াছে।” তিনি আমার সঙ্গিনী মার্কিণ-বাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া কতই নম্রতার সহিত জোড়করে—মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের প্রতীচ্য দেশে এ ভঙ্গীটি কেবল প্রার্থনার সময়েই দেখা যায়; কিন্তু হিন্দু-শিল্পে দেবগণের সহ-ভঙ্গীতেই ধর্ম্মিণীরা তাঁহাদের ভর্ত্তৃদিগের সম্মুখে এইরূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকেন।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে অপর সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, ইঁহারাই আমার ভ্রাতা ও সন্তানস্থানীয়।"

মোহন উষ্ণীশধারী তরুণ তাপসগণ আমাদিগের প্রতি সহাস্যে ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহাদিগের সরল অপাঙ্গের অকপট দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল যে, জীবনের কর্ম্মশালায় তাঁহারা এখনও শিক্ষনবীস মাত্র। বৃদ্ধ মঠবাসিগণ কিয়ৎক্ষণের জন্য বেদাদি-সংক্রান্ত গবেষণা হইতে আপনা-দিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শৈব চিহ্নে চিহ্নিত ললাটদেশ আমাদিগের উদ্দেশ্যে অবনত করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এমন-কি অস্পৃশ্য চণ্ডাল পর্য্যন্ত একত্রে সম্মিলিত। এই ধর্ম্মোপদেষ্টাটির নিকট জাতি-ভেদের কোনও স্থান নাই—কারণ ঈশ্বর সকল মানবেই সমভাবে বিরাজমান। একজন শিষ্য তামাক খাইতেছিল। স্বামীজি তাঁহার হাত হইতে গড়গড়াটি তুলিয়া লইয়া—তাহাতে একবার টান দিয়া ফিরাইয়া উহা প্রত্যর্পণ দিলেন। গোলাপী গন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দ আমাদিগের হাতে কয়েকটি পদ্মফুল দিয়া বলিলেন, "চলুন, ছাদের উপর যাওয়া যাক্। আমার বন্ধুরা এখন "টিফিন" প্রস্তুত করিতে যাইতেছেন।" ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে দ্বিপ্রাহরিক আহার এখন "টিফিন" নামেই অভিহিত।

উপর হইতে কি-এক অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী দৃশ্য আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইল! প্রচণ্ড সৌরকরোদ্ভাসিত মুক্ত গগন-তলে একি বিমোহন চিরনবীন পল্লী-শোভা! সরসীগুলি আরসির ন্যায়ই স্বচ্ছ! যেন কোনও পলায়ন-পরা দেববালা সেগুলি ভূতলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে কানন-শ্রেণী মখমল-সুকোমল সুদীর্ঘ রোমাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। গঙ্গার রজতধারা প্রণয়ীর বাহুর ন্যায় বসুধার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পর পারে আর-একটি উচ্চ মন্দির-চূড়া দেখিতে পাইতেছি; উহার সন্নিকটে একটি বিশাল-বিতত-শাখ বটবৃক্ষ। এই প্রাচীন বৃক্ষের শাখাদি হইতে 'শিকড়' নামিয়া—মৃত্তিকাসংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-একটি বিভিন্ন বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামীজি কহিলেন, "ওই ছায়াশীতল বৃক্ষতলে আমার প্রভু রামকৃষ্ণদেব প্রথমে সমাধিমগ্ন হইয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সাধনার স্থান বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুম বৌদ্ধগণের নিকট যেরূপ পবিত্র, ওই বৃক্ষটিও আমাদের চক্ষে তাহা অপেক্ষা কম পবিত্র নহে।"

আধঘণ্টা পরে—তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবেকানন্দ আমাদিগকে স্বহস্তে 'টিফিন' আনিয়া দিলেন। ডিম, টাটকা দুগ্ধ, সুগন্ধি অন্ন * ও কতকগুলি আম্র রহিয়াছে দেখিলাম। এই ফলগুলি আমাদিগের নিকট 'পীচ' ( Peach ) অপেক্ষাও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। মঠে আমিষের ব্যবহার নাই; সেজন্য আমিষ-সম্পর্কীয় খাদ্যাদি আমাদিগকে দিতে পারিলেন না বলিয়া স্বামীজি ত্রুটি স্বীকার করিলেন। তাঁহার এই কক্ষটি বড় অদ্ভুত রকমের।

* ফরাসী "grain" শব্দের অর্থ "...

হিন্দু সন্ন্যাসীর আড়ম্বরহীন নগ্নতার সহিত যেন পাশ্চাত্য দার্শনিকের ব্যবহারিক গৃহ-সজ্জা বিচিত্র ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। দোদুল আরাম-কেদারা—বহুবিধ গ্রন্থপূর্ণ গ্রন্থাগার সবই রহিয়াছে দেখিতেছি। ইমার্সন ও স্পেন্সার কীটদষ্ট দেশীয় পুস্তকাদির সহিত এক পংক্তিতেই ঠাসাঠাসিভাবে স্থান পাইয়াছে একটি নম্রস্বভাব শিষ্য হরিৎপত্রে মণ্ডিত কয়েকটি ('দোনা-করা') পান আমাদিগকে আনিয়া দিল। শুনিলাম, পর্ণপত্রগুলি সমস্তই মঠের উদ্যান হইতে সংগৃহীত। আমি খিলি লইয়া চিবাইতে লাগিলাম। ফুলের গন্ধে, তাম্রকুটের আস্বাদে ও খিলির রসে আমার মুখ পরিপূর্ণ হইল —দন্তপাতি আরক্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকে মাদক দ্রব্যাদি ধূমপান বা চর্ব্বণ করিয়া ব্যবহার করে। আমাদিগের নিকট জীবন শুধুই স্বপ্নবৎ। আপনারা যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া থাকেন আমরা তাহাই বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করি। দৃষ্টিগ্রাহ্য বা স্পর্শ-যোগ্য বলিয়া আপনারা যাহা সত্য, প্রকৃত ও সত্ত্বাসংযুক্ত বলিয়া মনে করেন, আমাদিগের নিকট তাহা মায়া-প্রপঞ্চ মাত্র—মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীক। এ সকলই সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তন-শীল, সর্ব্বদাই ধ্বংস-প্রবণ। ইহাতে এমন কোনও গুণ নাই যাহাতে আসক্তি জন্মাইতে পারে বা যাহার জন্য এই সকল মায়িক দৃশ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন ঘটে। নগর-জনপদ, বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য্য-গৌরব-সভ্যতা, জাতীয় উন্নতি ও জড়-বিজ্ঞানের অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি "আমাদের কিছুই অবিদিত নাই। কয়েক শতাব্দীর পরীক্ষার ফলে আমরা এখন ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; এ সকল শুধু বালকের ক্রীড়নক—বালকের জন্যই নির্ম্মিত। আপনারা যে কঠোর স্বপ্নমোহে এখনও আবিষ্ট রহিয়াছেন, আমরা তাহা বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই জাগরিত হইয়াছি। আমরা শ্বাস রোধ করিয়া কোনও সুবৃহৎ বৃক্ষের তলায় বসিয়া সেই পুরাকালীন 'অগ্নি'র প্রতি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া থাকি। যিনি ভূমা—যিনি অনন্ত—যিনি স্বয়ং জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত, তিনিই তাঁহার অপরূপ দ্বারগুলি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন—আমরা সেই পথ দিয়া অন্তর্জ্জগতের সেই একমাত্র সত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকি। আপনারা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন, এ যাবৎ খুব অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়ই যোগসাধনার এই সকল রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

আমরা প্রকোষ্ঠের জানালার দিকে ঝুঁকিয়া দেখিলাম। কোথায় একটা ঘড়ি টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল। নীচে—বৃক্ষবাটিকায় একটি উডুম্বর তরুতলে সন্ন্যাসীরা বৃত্তাকারে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তালে তালে, যেন ছন্দের মাত্রায় মাত্রায় তাঁহারা নিজেদের শির ও পৃষ্ঠদেশ দুলাইতেছিলেন। যে সন্ন্যাসীটি একটু পূর্ব্বেই আমাদিগের সহচর ছিলেন, তিনিও দেখিতেছি এক অশ্রুতপূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম-স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন; শুনিলে আমাদের গির্জ্জা-ঘরের plain-chant গীতের কথা মনে পড়ে; তবে, তার চেয়েও এই স্তোত্র যেন

আরও একটু কর্কশ—আরও আনন্দ-পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। অগ্নির একপার্শ্বে পুষ্পমাল্যভারে সজ্জিত শিবের ত্রিশূল প্রোথিত; যে অগ্নিশিখায় দেবতা স্বয়ং বিরাজমান, সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাহারই প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছেন। এই অগ্নিগর্ভ আত্মার সম্মোহন শক্তিপ্রভাবে কোনও অপূর্ব্ব স্বপ্নে অভিভূত এই সকল সেন্দ্রিয় দেহীগণ হইতে কি জানি কি এক বিপুল শান্তি উচ্চে উত্থিত হইতে ছিল! আমাদিগের উন্মত্ত কর্ম্ম-প্রবণতার তুলনায় এ শান্তি যেন আরও ভয়াবহ! মনে হইতেছিল, এই ভীষণ স্থৈর্য্যের ভিতর দিয়া পবিত্র স্তোত্র-গীতের প্রতিধ্বনি যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ত্রিদিবের পথে অগ্রসর হইতেছে! সুবর্ণপ্রভ মধু-মক্ষিকাগণ সূর্য্যকিরণে এই সকল যোগানন্দে মগ্ন সাধুর মস্তকের উপর নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে। এদিকে পবিত্র গোশালার ভিতর সযত্নপালিত গাভীগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া যে অপরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মানব বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিনা-মৃত্যুতে মোক্ষলাভ করে—সেই অসাধারণ আরাধনা-পদ্ধতির সহিত যেন নিজেদের সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছিল!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

---

# আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়

আমাদের সম্মুখে এখন বহুবিধ সমস্যা! রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি,—যেদিকেই তাকাই সেই দিকেই আমাদের জাতীয় জীবনের গোড়ায় গলদ দেখি। সংসারটা আগাগোড়া পরিবর্ত্তনশীল; জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে বিশ্বসংসার প্রতিদিন বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের জাতীয় জীবন-ধারা যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে, উহাও কতক জ্ঞাতসারে, এবং কতক-বা অজ্ঞাতসারে হইবে।

কিন্তু সম্মুখে এই এক বিষম সমস্যা উপস্থিত যে, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব? আমাদের যদি নিজস্ব কিছু থাকিত, তবে এমন ভাবে আমাদের এ ভাবনা ভাবিতে হইত না। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা নিজস্ব সম্পদ হারাইয়া পরের সম্পদেই একরূপ প্রাণ-রক্ষা করিয়া আসিতেছি। তারপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শি, সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষে এমন বিভিন্নতার সৃজন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের নিজস্ব বলিতে সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে কল্পনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন মাহাত্ম্য জাহির করিতেছেন। এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ জাতীয়তার ক্ষেত্রে কোনও দিক দিয়া আপনার যথার্থ মহিমা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

তাই ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সভ্যতা জাতীয়ত্ব-রূপ বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত এবং ইহারই জন্য ভারতীয় সভ্যতা আজ নিতান্ত খর্ব্ব ও পঙ্গু।

অনেকে প্রচার করিতেছেন, হিন্দু-সভ্যতার আড়ম্বরহীন সরলতার দিকেই আমাদের ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই যে আমরা আপন ভুলিয়া বিদেশীর অনুকরণে জীবন যাপন করিতেছি ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এমন-কি, গত প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি-মহাশয় পূর্ব্বকালের সেই প্রাচীন সহজ-সরল জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তখন লোকের প্রাণে আনন্দ ছিল, পরস্পরের সহানুভূতি ছিল, দেবতায় ভক্তি ছিল, অথিতির সেবা দান ধ্যান ছিল। লোক বিনা আড়ম্বরে তখনকার দিনে শান্তিময় জীবন যাপন করিত।'

এ খবর কতদিন আগেকার, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কবে হইতে এ দেশের এই শান্তির জীবন যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাও সাব্যস্ত করা সহজ নহে। আজ আমরা তাহার জন্য যে দুঃখ করিয়া থাকি, সে দুঃখ অনেকটা কাল্পনিক। রামচন্দ্র বা অন্য কোন মহাপ্রাণ রাজার শাসনে এদেশের জনসাধারণ হয়ত তেমন শান্তির জীবন যাপন করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী রাজা বা কোন দুর্দ্দান্ত রাজার রাজ্যশাসনে দেশের সাধারণের অবস্থা তেমন শান্তিময় ছিল কিনা, সেবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তারপর, আর-একটা কথা মনে জাগে, বাস্তবিকই লোকে যদি অত শান্ত জীবনযাপন করিত—তাহা হইলে তখনকার দিনের সেই নির্জ্জীবতার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিত কি? আপন আপন পল্লীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে "আপনার শ্যামল নির্ম্মল কোমল উত্তরী" বিছাইয়া, সমগ্র দেশব্যাশী জাতীয়তার স্রোতে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য না করিয়া যে জীবন-যাপনের স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা ইংরেজ-আমলেই সম্ভব; তাহা অলসতা ও শক্তিহীনতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাহার ভিতরে ক্ষুদ্রত্বের আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বমানবের জীবন-স্রোতের সঙ্গে ঐ শান্তি-পূর্ণ পল্লী-জীবনের মিলন-সাধন হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জীবন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছে। অনেকেই এখন জিজ্ঞাসা করিবেন, বর্ত্তমান সভ্যতায় থাকিয়া এই যে আমরা আবার সেই অতীতের জীবনের জন্য লালায়িত হইয়াছি, তাহা কি বাস্তবিকই আমাদের প্রাণের বাসনা, এবং তাহা কি কোনরকমে সম্ভবপর?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের নিজস্ব যে কোন্‌টি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা শক্ত ব্যাপার। এই দেড়শত বৎসরব্যাপী ইংরেজ-রাজত্বে আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও অধ্যায় ভাল করিয়া খুলিয়া দেখা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী যে সকল শক্তির সংঘর্ষ আমরা প্রতিনিয়ত সহ্য করিতেছি, তাহাতে আমাদের আপন শক্তি কোনদিকেই বিকসিত হইয়া উঠে নাই। এবং আমরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক সামাজিক ইত্যাদি কতকগুলি সংস্কারকে

অবলম্বন করিলেও, সে সকল চেষ্টা মোটের উপর ব্যর্থতাতেই পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাবই সকলের উপরে জয়যুক্ত হইয়াছে, এবং আমাদের যে জাতীয় জীবন, তাহার প্রতি অঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। হইবারই কথা; কেননা, আমরা নিজস্ব হইতে বঞ্চিত, এবং দেশের শাসনভার পাশ্চাত্যের হস্তে অর্পিত।

অবশ্য, এ-কথা স্বীকার করি যে, আমরা যদি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ্ খাইয়া জীবনের আরম্ভ হইতেই চলিতে পারিতাম, এবং বাহিরের কোন জীবন্ত প্রতিঘাত প্রথম হইতেই যদি আমাদের সহজ বুদ্ধির অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে আমরা আজ স্বভাবের অঙ্কে নিশ্চয়ই একটি অভিনব জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। কিন্তু আজিকার দিনে আমাদের পক্ষে আর ইহা সম্ভব নহে।

ধরুন, আমাদের সমাজের কথা। কে আজ আমাদের সমাজের প্রকৃতিকে সম্যকরূপে ভারতীয় সমাজ বা পুরাতন হিন্দুসমাজের ছাঁচে ফেলিয়া একটি নূতন ও আদর্শ হিন্দু সমাজ গঠন করিতে পারে? একসময় ছিল, যখন এ দেশে হিন্দুর প্রভাব ছিল সর্ব্বোপরি প্রবল। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় তখন আপনার প্রভাব জাহির করিয়া হিন্দুসমাজের উপরে ছায়াপাত করিতে পারিত না। তখন হিন্দুই রাজা, এবং হিন্দুই ছিল প্রজা। যদিও পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য-সমাজের প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজ তখন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলনা, তবু এমন কথা অনায়াসে বলা যায় যে, হিন্দু তখন একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাটে আপনার সমাজের সীমানায় বসিয়া উহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারিত। রাজ্য, ধর্ম্ম, কৃষি ও বাণিজ্যকে আপনার প্রয়োজনানুসারে হিন্দু তখন বেশ একটা শৃঙ্খলার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মানুষের জীবনটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ প্রভৃতি অধ্যায়ের মধ্য দিয়া হিন্দু তখন অপনাকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যতখানি প্রয়োজন ছিল, ততখানি অর্জ্জন করিতে তাহারা কোনও ত্রুটি করে নাই। অর্থাৎ, তখন এমন কোনও শক্তির সংঘর্ষ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই, যাহা তাহাদের স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করিতে পারিত।

এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয়, অতীতের সেই সমাজকে আজিকার দিনে আমরা আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারিব কিনা, এবং আজিকার দিনে তাহাই আমাদের ঈপ্সিত বস্তু কিনা?

তখনকার দিনে যে সকল অনুকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে সে অবস্থা আর বিদ্যমান নাই। এখন দেশের রাজনীতি ও কর্ম্মনীতির ভার পরের হস্তে। গল্প শোনা যায়, তখনকার রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণকে এমন ভক্তি করিতেন যে, অকাতরে সকল রাজ্য-সম্পদ এককথায় বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইতে পারিতেন। আজ কিন্তু ব্রাহ্মণের সে মাহাত্ম্য আর নাই। রাজা আপনার

স্বার্থে রাজ্যশাসন করে এবং এ-দেশীয়দিগের জীবন-যাত্রা আপনার প্রয়োজনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করে। বর্ণাশ্রমে কর্ম্মের যে বিভিন্নতা ছিল, সে বিভিন্নতা বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাস্তবিকই সাগর-প্রমাণ অতীত মহিমার মালিক হইয়া আমরা আজ কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহি। আমরাও এখন চাহিতেছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশকেও আমরা এক শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। সমগ্র পৃথিবী আজ আমাদের হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, সুতরাং সকলের সহিত দেনা-পাওনা আজ যদি আমরা বুঝিয়া না লই, তবে আমাদের একেবারেই ঠকিতে হইবে।

আজ আমাদের ভিতরে যে বৃহৎভাবের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রত্বের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ত আমাদের এমন স্বভাব ছিল না। অবশ্য ধার-করা বিষয়ের অধিকারী হইয়া আমরা আপন প্রকৃতির বিকাশসাধন করিতে পারিব না, এবং কেহ কখনও তাহা পারেও না। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেই যে ধার-করা সম্পত্তি, এমন ধারণাও ভ্রম-মূলক। কে জানে, এই যে পরিবর্ত্তনের হাওয়া আসিয়াছে, ইহাই এদেশের পক্ষে যথার্থ উপযোগী এবং স্বাভাবিক কিনা!

যতদিন একটা জাতি আপনার নিজস্ব সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে, ততদিন পৃথিবীর চক্ষে সে বরণীয় হইতে পারে না। ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মণ ও মার্কিণ প্রভৃতি জাতির প্রত্যেকেরই কতকগুলি করিয়া নিজস্ব সম্পত্তি আছে। কিন্তু আমাদের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বরূপ কেহ ঠাহর করিয়াছে কি? ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, সকলে মিলিয়া এখানে পরস্পরবিরোধী এক Chaos জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন পথ করিতে একে অন্যকে তফাতে সরাইয়া দিতেছে। আবার, ইহাদের মধ্যেই শত শত অংশ ভগ্নাংশ এমন ভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে যে, ভারতবাসী বলিয়া একটি সমগ্র জাতির কল্পনা করা একপ্রকার দুসাধ্য ব্যাপার। এখানকার নানা জাতির সামাজিক শাখাপ্রশাখাগুলির আবার ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক টান থাকাতে, জাতীয় জীবনের একত্বের পক্ষে তাহা বিষম বাধা-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষুদ্রত্বের বিশাল মোহ, পাহাড়-প্রমাণ ধর্ম্মাভিমান, আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতার এককোণে ঠেসিয়া লইয়া যাইতেছে। এই মোহ ও অভিমানে একটুখানি আঘাত লাগিলেই সমাজ বৃথা আস্ফালন করে, অথচ এ দেশের বুকের উপর দিয়া দানবের নর্ত্তন চলিলেও কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহাতেই বোঝা যায়, এদেশে মানুষের মনুষ্যত্বের অভাব আছে;—সমাজের জন্য এ দেশের লোকের যে নিষ্ঠা-প্রবৃত্তি, তাহা শক্তির বিকৃতি মাত্র। সামাজিক উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সমাজ যতদিন অসংস্কৃত থাকিবে,

ততদিন জাতির উন্নতি হইবে না। হিন্দু মুসলমান যেই হউক না কেন, যে সমাজ আত্মপীড়ন করে, সে সমাজ জাতীয় জীবনের ধ্বংসসাধন করে! পূর্ব্বে আমি দু' একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যার লীলা তত প্রবল নহে, দেশের গৌরব-পদ্মগুলি সেই থানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের লইয়া আজ আমরা গৌরব করি, তাঁহারা এই আত্মহত্যার লীলাক্ষেত্র হইতে বরাবর তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, কিন্তু সমাজ এই ব্যক্তির স্রষ্টা। আমরা যে সমাজ-সংস্কারের প্রতি এত অমনোযোগী, তাহার কারণ জাতির প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগের অভাব। অথচ যাহাদের লইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাহারা সকলেই স্বায়ত্ব-শাসন চাহিতেছে, এবং পৃথিবীতে একটি বিশেষ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য অন্ততঃ মৌখিক অগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সংস্কার করিতে আমরা সকলেই আগ্রহবান। কিন্তু সংস্কারের ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও আমাদের ভাবিতে হইবে। যাঁহারা সমাজের কর্ণধার—তাঁহাদের দৃষ্টি সমাজের দিকে পড়িলে, তাঁহারা সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া সকল বিষয় আমাদের চেয়ে ভালরূপে বিচার করিতে পারেন। তবে, যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ভারত-সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম উপাদান বলিয়া আমরা স্বীকার করি, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে জাতি গঠন করা যাইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের হয় না। বৈদিক-যুগ বা তৎপূর্ব্ব কালের সমাজের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, আমাদের সমাজ-যাত্রা আবার সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

যখন এক পরিবারের কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের, কোনও ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের, কোনও ব্যক্তি বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত, যখন জন্মের খাতিরে পার্থক্য ছিলনা, ব্যবসায়ের খাতিরে পার্থক্য ছিল, আমাদের আবার সেই দিনে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। এই শতধাভিন্ন বিশাল ভারত-বর্ষে এক জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইলে, সামাজিক ভিন্নতা ভাঙ্গিয়া না দিলে, জাতিগঠনের আশা আকাশকুসুম বই আর কিছুই নহে। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘরে ঘরে দলাদলি, ঘরে ঘরে বিবাদ, পরস্পরের ঈর্ষা, লাঞ্ছনা, শত প্রকার দুঃখ-কষ্ট যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি মনে করেন, পল্লীসমাজের লোক কোন বৃহৎ কর্ম্মে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে? সমাজগত পার্থক্য তাহাদের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে বিকারগ্রস্ত করিয়াছে যে, তাহারা ঘৃণ্য সংকীর্ণতার পাঁকে একেবারে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া রহিয়াছে। এই যে প্রতিনিয়ত আমরা শুনিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি 'একঘরে' হইয়াছে, ইহার মানে কি? ঐ ব্যক্তিকে সমাজ ত্যাগ করিয়াছে; ধোপা, নাপিত, পুরোহিত পর্য্যন্ত তাহার বাড়ী যাইবে না। এবং যে-কেহ তাহার সংশ্রবে যাইবে, সেও দণ্ডভোগ করিবে। হয়ত তাহার অপরাধ,

সে কুলীনের ঘরে মেয়ের বিবাহ দেয় নাই, অথবা কোন বিলাতফেরতা আত্মীয়কে ঘরে বসিতে দিয়াছে! পল্লী-সমাজ সুধু এই সকল শাসন-অনুশাসন লইয়াই উদ্ব্যস্ত; কোথায় বা দেশ, কেই বা জাতি, এ সব ভাবনা তাহার মাথায় নাই। পল্লীকে দেশের কথা ভাবাইতে হইলে যে ব্যাধি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করা ভিন্ন আর কি পন্থা থাকিতে পারে?

অবশ্য, ইহা একপ্রকার অসম্ভব যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কেহ থাকিবে না, সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। তেমন মিছা স্বপ্নের ঘোরে কাহাকেও আচ্ছন্ন হইতে বলি না। হিন্দুর নিজস্ব হিন্দুই যদি বজায় রাখে, মুসলমান এবং খৃষ্টানও যদি তাহাদের নিজস্ব আপনারাই বজায় রাখে তাহা হইলেই এদেশে জাতীয়তার স্বপ্ন সম্ভব হয়। বিভিন্নতার ভিতর দিয়াও মিলনের ক্ষেত্রে পৌছান যায়, যদি প্রকৃতি অবিকৃত থাকে।

সমাজের ভিতরে যে আত্মীয়-কুটুম্বিতা হয়, তাহার অর্থ কোনও সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া। য়ুরোপে এই ক্ষেত্রের পরিসর অতিবিস্তৃত। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভারতের মত বিষম নহে; সেখানে ভাষা-গত যে পার্থক্য, তাহাও খর্ব্ব করিবার জন্য য়ুরোপীয়েরা সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশের এই আত্মীয়-কুটুম্বিতার পরিসর য়ুরোপের তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। এবং এই ক্ষেত্রে সমাজ যে ক্রমশ রসাতলের পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে আমাদের ভিতরে বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম-গত ব্যবধান আর লক্ষ্য করা যায় না। সকলেই এখন সকল ব্যবসায় করিতেছে, সকলেই এক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছে, এক জল-হাওয়ায় মানুষ হইতেছে। তবু আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর হয় না কেন?

সমাজের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমরা কোনও আলোচনা করিতে চাহি না। যদিও, উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা সমাজের ভিতরে প্রকৃত বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে বিশ্বজনীন মহান ধর্ম্ম সকল পার্থক্য একদিনে ঘুচাইয়াও দেয়।

যে সকল বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিলে সমাজ ব্যক্তির সৃজন ও পরোক্ষে জাতি-গঠন করিতে পারে, বাংলাদেশে কোথাও যে তাহা দেখিতে পাইনা, এমন নহে। বাংলার হিন্দুসমাজে প্রধানতঃ তিনটি শক্তিমান সম্প্রদায় আছে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। এক জল-হাওয়ায়, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক আহারীয় সামগ্রীতে, এক ভাবনা-চিন্তায়, এক কর্ম্মস্রোতে ইহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম্মচিন্তা, ভাষা ও আদর্শ, সকল বিষয়ে ইহারা অভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে আত্ম-পরিচয় না দিলে অনেক সময় চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ, কে বৈদ্য ও কে কায়স্থ। তবু, ইহাদের ভিতরে একএক জায়গায় এমন ঘোরতর পার্থক্য বিদ্যমান যেখানে একে অপরের অস্পৃশ্য! একটি ব্রাহ্মণ এই ভাবটি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, মুসলমান সকলেই এক, তাই

তাহাদের ভিতরে একতা আছে; আর হিন্দুগণ এক নহে, তাই তাহাদের ভিতরে একতাও নাই। হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের মধ্যেও প্রায় তেমনি পার্থক্য। অনেক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, কায়স্থের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত তাঁহারা পান করেন না। আরো অনেক আচার-ব্যবহারে তাঁহারা একে অন্যকে দূরে রাখিয়াছেন।

অনেক বিদেশীয় ও দেশীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, রক্তের সম্বন্ধ যত সুবিস্তৃত হয়, সমাজের ব্যক্তিগত জীবন তত উন্নত হয়। নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রের বিশালতার উপর জাতির মনুষ্যত্ব যে অনেকাংশে নির্ভর করে, এ কথা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু, আমরা এই মিলন-ক্ষেত্রকে দিনে দিনে কত সংকীর্ণ করিয়া আনিয়াছি, আপনারা তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাংলাদেশে সর্ব্বসমেত সাড়ে চার কোটি লোকের বাস, ইহার ভিতরে অনেকে মুসলমান। তারপরে যত হিন্দু আছে, তাহাদের মধ্যে যে কত ভেদ কত দলাদলি তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে ডোম, মেথর ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত বোধ হয় একশত বর্ণ আছে। তারপর প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে কতক কুলীন, কতক বংশজ, কতক শ্রোত্রীয়। আবার বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক ও মধ্যম শ্রেণী ইত্যাদি শত শত শ্রেণীবিভাগ। ইহারা সকলেই একপ্রকার পরস্পরবিরোধী। বিবাহের ক্ষেত্রে এবং আহার-বিহার ব্যাপারেও ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিতেছে। আমরা যে দৈহিক, মানসিক এবং চরিত্রের বলে দিন দিন খাটো হইয়া জাতীয়ত্ব হারাইয়াছি, আমাদের সমাজের সংকীর্ণতা, তাহার জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী নয় কি? আমাদের যুবকদের শতকরা ৭৫ জন দৈহিক প্রমাণে অনুপযুক্ত বলিয়া সৈনিক-বিভাগে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহার জন্য দায়ী কে? তাই মনে হয়, নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রে কণ্টক থাকাতে এবং সেই মিলনে স্বাধীনতার অভাবেই আজ আমাদের এই দুর্দ্দিন।

যদি জাতীয় উন্নতির বাসনা আমাদের দেশের লোকের মৌখিক আন্দোলন না হয়, তাহা হইলে এদেশে নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেওয়া, আমাদের দেশ-নায়কগণের আজিকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহার জন্য অন্ততঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের ভিতরকার সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যতদিনে তাহা না হইবে, তত দিনে এ জাতির উন্নতি নাই—কিছুতেই নাই! কেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অহি-নকুল সম্পর্ক? ইহার সার্থকতা কোথায়? কেন সমাজের অগ্রণীরা এই মিছা সঙ্কীর্ণতাকে গৌরবের মুখোস পরাইয়া একটা মস্ত অসত্যকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন? হইতে পারে, এই খণ্ডবিখণ্ড সমাজ পুরাতনের স্মৃতিজ্ঞাপক, কিন্তু অখণ্ড-দেহী ব্যতীত মেরুদণ্ডে ভর করিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য আর কাহার আছে? সমাজের এই সকল খেলো

রীতি-নীতির গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যা করিয়া যাঁহারা আস্ফালন করেন, তাঁহাদের কথা প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ ও অসার মনে হয়। হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদের গণ্ডী এড়াইয়া সমাজকে আবার প্রসারতা ও উদারতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা এবং বৈদ্যসভার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এই পন্থা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণকে বৈদ্যকে এবং কায়স্থকে যে নিজস্ব সম্পদে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। জাতীয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য হিন্দুসমাজ যদি এতটুকু ত্যাগস্বীকার না করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কৌলিন্য-প্রথার স্বার্থান্ধতা ও দাম্ভিকতা বজায় রাখিবার জন্য এ গোঁড়ামি অনেকেই ছাড়িতে চাহিবে না, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান পৃথিবীর হাল-চাল কিছু-কিছু বুঝিয়াছে, তাহাদের ভিতরেও যদি এই অন্ধ জড়ত্ব দেখি তবে আমাদের পক্ষে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরা ছাড়া, আর কোন উপায় নাই।

সংস্কারের নাম শুনিলেই একদল লোক সাব্যস্ত করিয়া বসেন যে, উহা খৃষ্টানী অনুকরণ। বোধ হয় তাঁহাদের প্রকৃতি কোন রকম পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এমন প্রকৃতি সুধু জড়ভরতেরই যোগ্য। যাহাতে বাস্তবিক উন্নতি হয়, তাহা গ্রহণ করিব না কেন? কে না আজ দেখিতে পাইতেছে, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না, এবং বিশবৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা আর নাই! এই যে বর্ণাশ্রমের গৌরব করি, প্রকৃত প্রস্তাবে আর উহার গুরুত্ব আছে কি? সেই বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেই ভারতবর্ষ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল বলিয়া যদি আমরা স্বীকার করি, তবে সেই যুগধর্ম্মকেই আমাদের স্বকীয় সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের কি বাধা থাকিতে পারে? এই তান্ত্রিক যুগ কত দিনের? ইহাতে ভারত-বর্ষের কি উপকার হইয়াছে? হইতে পারে, মুসলমানের প্রভাব হইতে তন্ত্র আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই লোক-বিমুগ্ধকারী জটিল ধর্ম্ম প্রকৃত অধ্যাত্ম-ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছে। এবং আজিকার দিনে তাহার প্রয়োজন আর কি আছে? উহা আমাদিগের উপনিষদের ব্রহ্মকে বামন-রূপে পরিণত করিয়াছে, আন্তর্জাতিক ঘৃণা-মূলক জাতিভেদের কঠোরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং অবরোধ ইত্যাদি প্রথাকে দৃঢ়তর করিয়া নারী জাতিকে বিশ্বের অলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ দিনে দিন ত্যাগের মন্ত্র ভুলিয়া পার্থিব স্বার্থের দিকে ঝুঁকিয়া এবং আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্যই এই তন্ত্র দ্বারা এ দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবে, স্বাধীন ভাবে ভগবানের আরাধনা করিবে, ইহাকে কি পাশ্চাত্য ভাব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত? ইহা তো সর্ব্ব-জীবের, সমগ্র জগতের সার্ব্বজনীন্ মঙ্গলময় পন্থা।

তাই বলিতেছিলাম, সংস্কারের নাম

করিলেই যদি উহা পাশ্চাত্য বলিয়া কাহারও ধারণা জন্মে তবে সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমমূলক। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন চরিত্র থাকা সত্ত্বেও সকলেরই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা সকলেরই শ্লাঘার বস্তু। যাহা বিশেষভাবে প্রাচ্য, তাহা ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে যাহা পাশ্চাত্য, তাহা গ্রহণ করিলে জাতির মৃত্যু ঘটিতে পারে। তেমন সংস্কারের কথা আমরা বলি না। কিন্তু সংস্কার চাই। সংস্কার কি এ দেশে ঘটে নাই? হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসূত হইয়া ছিল কেমন করিয়া? কেমন করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? কিন্তু এইসকল পরিবর্ত্তনে কি বিজাতীয়তা ছিল? প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এখনও একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-পরিবর্ত্তন হইতে এ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি ভিন্ন। এখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধননৈতিক ও কর্ম্মনৈতিক সমস্তরই বদল না হইলে আমরা কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের এখন দশ জাতির সঙ্গে মিশিতে হইবে, দশ জাতির সম্পত্তি হইতে ধন-রত্ন আনিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। অভিমানে সকলকে ঘৃণা করিয়া আপনার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জীবন-সংগ্রামে আমাদের মরণ নিশ্চয়।

বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করার উপর আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পরিমাণ নির্ভর করে। মনুষ্যত্ব অর্থে আমরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পরিপূর্ণতাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এগুলি কি সমাজের শিক্ষা ও রীতিনীতির ফল নহে? অবশ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন। যে ছেলে হাঁটিতে শিখে নাই প্রথমে হাত ধরিয়াই তাহাকে হাঁটিতে শিখাইতে হয়। কিন্তু যে ছেলে খোঁড়া তাহার হাত ধরিলেই বা লাভ কি? ইংরেজ আমলে আমরা দেড় শত বৎসর কাটাইলাম, কিন্তু এতদিনেও আমরা কোন অধিকার লাভ করিলাম না কেন? হইতে পারে, ইংরেজ আমাদিগকে হাত ধরিয়া হাঁটাইতে শিখায় নাই, কিন্তু আমরাও কি বারবার পড়িয়া আবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছি? যদি করিয়াই থাকি, তবে ব্যর্থ হইয়াছি কেন?

আমরা যেখানে যতটুকু ক্ষমতা হাতে পাইয়াছি, সেটুকুও বিকৃত করিয়াছি কেন? কেন এ সমাজের লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে না, স্বাধীনভাবে উপাসনা করে না, স্বাধীনভাবে বিবাহ করে না, স্বাধীনভাবে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে না? সমাজের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, সমাজ তাহা বিকৃত করিল কেন? ইহাতে তো বিদেশীর কোন হাত ছিল না। অবশ্য, রাজা সাহায্য না করিলে সকল কাজ সুসাধ্য হয় না। রাজার সাহায্যে আমরা সহমরণ-প্রথা, গঙ্গায় সন্তান-ত্যাগ-প্রথা ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হওয়াও নিতান্ত ঘৃণার ব্যাপার। যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকুর সদ্ব্যয় করিলেই ত আমরা অনেকখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

যাঁহারা আজকাল বঙ্গদেশে রাজনীতির আন্দোলন করেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে সমাজের যে কিছুই করিতে পারেন না, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না! কিন্তু তাঁহারা অবজ্ঞাভরে সমাজের দিকে চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লন্। অথচ, সমাজের উন্নতির উপরেই দেশের উন্নতি যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, এ সহজ সত্যটা ত তাঁহাদের চোখে পড়ে না! তারপর, আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ, তাহারাও তো বেশ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, তেজস্বী এবং দেশপ্রেমিক। অথচ পাঠ্যাবস্থায় তাহাদের যে প্রবৃত্তি থাকে, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সে প্রবৃত্তি কোথায় বিলীন হইয়া যায়! কিন্তু ইহারাই তো হাতে হাতে সমাজের পীড়ন সহ্য করিতে থাকে এবং তাহার জন্য কত অনুতাপ করে। কন্যার পাত্র জুটে না, পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়বহন করা যায় না, দোল-দুর্গোৎসবে খরচ কুলায় না!

সকল দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি, যদি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সজাগ করিতে পারিতাম, জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর বক্ষে আজ আমরা এতটা হীনতার পরিচয় দিতাম না। ভারতবাসীর যে দিন গৌরবের দিন ছিল সে দিন ভুলিয়া আমরা অন্ধের মতন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া নিজের পথ বাহির করিতে পারিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস, বৈদিক কালের যুগধর্ম্মের মধ্যেই ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তি, এবং স্বাভাবিক নিজস্ব নিহিত রহিয়াছে। আজ কে তাহা উদ্ধার করিয়া আনিবে?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

---

# কবি ও সমালোচক

( Tennyson হইতে )

লোকালয় মাঝে যেই পাখী গায়
উচ্চবৃক্ষে উচ্চস্বরে,
শেষে মহিমার দেউলের দ্বারে
ধরি শেষ গান কণ্ঠে, মরে।
মাংসলোলুপ গৃধ্রের শ্রেণী
তার লাগি ঐ উড়িছে নভে,
জনতার মাঝে তার দেহ লয়ে
নির্দ্দয় ভাবে ছিঁড়িতে রবে।

তার চেয়ে ভাল তাহার জীবন,
গায় যেবা গিরি গহন বনে,
বনফুল অলি লতামঞ্জরী
তাহার মর্ম্ম-কাহিনী শোনে।
নর-নিলয়ের গর্ব্বিত দয়া
বিচার-বচন কভু না সহে,
নীরবে নিভৃতে সুখ-শান্তিতে
পত্র-পুঞ্জে মরিয়া রহে।

শ্রীকালিদাস রায়।

# অস্থি

হঠাৎ সে-ক'দিন জাহাজের ডেকে, ক্যাবিনে, পন্টুনে এবং টিকিট-ঘরে বাদল-পোকার ঝাঁকের মতো কেন এত 'সি আই ডি'র আবির্ভাব হল এবং কেনই বা দেখতে দেখতে একদিন তারা গা-ঢাকা হয়ে এ তল্লাট ছেড়ে গেল তা বলা শক্ত। কিন্তু তারা অদৃশ্য হবার অনেক দিন 'পর পর্য্যন্ত জলে-স্থলে-আকাশে, জাহাজের ডেকের তক্তাগুলোর ফাটলে-ফাটলে, বসবার বেঞ্চগুলোর তলায়-তলায়, এমন কি ষ্টীমারের চিমনির কালো ধূঁয়ার আড়ালে পর্য্যন্ত কতকগুলো যম-দূতের মতো ইংলিস্ আল্ফা বেটার উপ-সর্গের ছড়াছড়ি যে দেখছিলেম সেটা আমি বেশ বলতে পারি। বড়বাজার থেকে সাতটা-পঞ্চাশের ষ্টীমারের ফাষ্ট ক্লাসের সব-আগের ছুটো বেঞ্চির কোণে নষ্টামি, ভাঁড়ামি, গাঁজাখুরি গল্প, যাত্রা, গান, কবীর এবং তুলসীদাসের পদাবলী নিয়ে আমরা দিব্যি একটি কুঁড়েমির নীড় বেঁধে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আরামে কাটাচ্ছিলেম,উপসর্গের উৎপাতে যখন আমাদের সে নীড় ভাঙো-ভাঙো,—গানও জমছেনা, গল্পও প্রায় বন্ধ, ঠিক সেই সময় একটা লোক তার চক্চকে কালো ইরাণী টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুস্তিন্ আর সোনা-বাঁধা গেঁটে বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল এবং ঠিক তার আসার সঙ্গেই ষ্টীমার-কোম্পানী আমাদের আগের জাহাজখানা বদ্লে আকাশের দিকে নাক-তোলা, ঘুপসি এবং অতিরিক্ত-রকম কম-চওড়া ও অধিক-লম্বা ষ্টীমার বড়বাজারের ঘাটে এনে হাজির কল্লে তখন আমি সে লোকটাকে শেমুষী বলে স্থির করে নিতে একটুকুও দেরী কল্লেম না,—যদিও অবিন তাকে গিরগিটির চেয়ে উচ্চপদ দিতে মোটেই রাজি হয় নি।

এই জাহাজখানায় চড়ে আনাগোনা কচ্ছি বটে কিন্তু এখানার সবই আমাদের অপরিচিত খটমটে ঠেকছে। এটার বয়লার-গুলো কেল্লার বুরুজের মতো লোহার চাদরে ঢাকা; এটার খালাসী থেকে সারেং সুগনী সবাই যেন গোরাদের চুরুটের এবং মদের একটা উৎকট গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে;—আমাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাদের দৃষ্টিই নেই। আর মকরের শুঁড়ের মতো আগাতোলা সেই ফাষ্ট ক্লাসের ঘুপ্সি ডেক্—সেখানে বসে গঙ্গাও দেখা যায় না,আকাশের নীলও চোখে পড়ে না, মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি—সেখানে অবিনের ওই পুস্তিন্-পরা মানুষটি! আমরা ক'টি ঝোড়ো কাকের মতো নিজের নিজের ডানায় মুখ-লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় এক দিন কেল্লার একটা খুব বড় ইংরেজ, জার্নেল কি কার্নেল হবে, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ইউনিফারেমের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং থোপনা-বাঁধা তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বল্লে—"হেলো, তুমি যে এখানে?"

লোকটা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর

করে—'আমি এখানে কেননা আমার যাবার আর কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজখানা আমি পোর্ট কমিশনারদের বেচে ফেলেছি কিন্তু এর মায়াটা এখনো কাটাতে পারিনি তাই এটায় চড়ে দুই-সন্ধ্যা বেড়াই। এখানা এক বছর গার্ডেনরীচের ঐ দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডায়মণ্ড-হারবারে যাওয়া-আসা কচ্ছিল, এদিকের একখানা জাহাজ বেকল হওয়ায় এরা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ থেকে উত্তরে—ব্রীজের ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছি; তোমার সঙ্গে দেখা হল সুখী হলেম।"

তখন কাশীপুরের গন্‌ফাউণ্ডারির ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়ছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম্ কি জিজ্ঞাসা করলে। সে জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ম্যেকেব ওয়াচ বার করে বল্লে—"আটটা পঞ্চাশ।" ঘড়িটা আগাগোড়া হীরেয় মোড়া এবং তার চেন্‌টা সমস্তটা পান্না আর চুনি গাঁথা। সকালের আলো সে দুটোর উপরে পড়ে বিদ্যুতের মতো ঝক্-করে উঠল। সাহেব গুড্‌মর্ণিং বলে কাশীপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অন্যমনস্ক ভাবে সেই ঘড়ি আর চেন দুই আঙুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অবিন সেটাকে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারেনা জানতেম, কিন্তু সে আজ যে এমনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সাহেব নেমে যেতেই অবিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি সমেত চেন ছোঁ-মেরে টেনে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে দিয়ে গট্ হয়ে বসল;—আমার মনে হল যেন একটা আগুণের সাপ অবিনের বুকের পকেটে গিয়ে লুকুলো। লোকটা কী মনে করছে এই ভেবে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠেছে; অবিন কিন্তু দেখি চোখ-বুজে স্থির হয়ে বসে। আর সেই লোকটা একটু নড়লেনা চড়লেনা, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না,—উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনই রইল; আর দেখলেম তার দুটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে শূন্যে ঘুরছে। কড়া-কথা মিষ্টি-কথা মিনতি এবং বিনতি সব যখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বল্লেম—"তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।" বলেই আমি তার দিকে পিঠ-ফিরিয়ে বসলেম। কতক্ষণ এমন কাটলো মনে নেই। একটা সাদা পাখী ঢেউয়ের উপর পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় অবিন আমার পিঠে একটা মস্ত থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি বল্লে—"ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছো!"

সাপে ছোব্‌লালে যেমন আমি তেমনি চম্‌কে উঠলেম, দেখলেম ভয়ে অবিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার দুই চোখ চকিতের মতো ডেকটার একধার থেকে আর-এক ধার যেন ঝেঁটিয়ে নিলে। শিরিস্ কাগজ-করা সেগুন কাঠের সরু সরু তক্তাগুলো এবং পিচ্-ঢালা তাদের জোড়ের সেলাই-গুলো এমন অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে কোনো

দিন আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। অবিনও তার পায়ের কাছে জমা-করা জাহাজের মোটা কাছিটা যেন আন্‌মনে পা দোলাতে একটুখানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ খসে-পড়া গোলাপ ফুলটা কুড়োবার অছিলায় বেঞ্চের তলাটাও একবার বেশ করে হাত-বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও আর সেই ঘড়ি তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্য্যন্ত নাই! এ-দিকে দেখছি কুঠীঘাটার পণ্টুনে মৌমাছির ঝাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষায়। আর-একটু পরেই লোকের পায়ের তলায় অবিনের এই মহামূল্য বিপদ গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারবো ভেবে খানিকটা ফুর্ত্তি এবং সাহসও হচ্ছে, এমন সময় সেই লোকটা বেশ ধীরে-সুস্থে বেঞ্চি থেকে উঠে বরাবর থার্ড ক্লাসে ইঞ্জিন-ঘরের ধারে লালপাগড়ি একজন রিভার পুলিশের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কী ফুস্-ফাস্ করে আবার আস্তে আস্তে নিজের জায়গা এসে দখল করলে! কুঠী-ঘাটায় তখন লোক উঠতে সুরু হয়েছে। পাহারাওয়ালা-সাহেব ফার্ষ্ট ক্লাসে আসবার রাস্তাটা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্‌টারের সঙ্গে ফিস্-ফাস্ করে কি যে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেম না, অবিনও চোখ-বুজে কি ভাবতে লাগল তা আমি জানি না, কিন্তু আমি আমার দুই পকেটে হাত গুঁজে বুট জুতোর সুকতলা থেকে মাথার উপরে টুপি-ঢাকা ব্রহ্মতেলো পর্য্যন্ত একটা শীত অনুভব করতে লাগলেম। জাহাজ পূরো দমে কলকাতার দিকে চলেছে তার সমস্তটা একটা রুদ্ধ আবেগে থর-থর করে কাঁপছে, —যেন সে আমাদের যত শীঘ্র পারে বড় বাজারের পণ্টুনে হাজির কল্লে বাঁচে!—যেখানে নিকলের বোতাম-আঁটা কালো কোর্ত্তা গায়ে সাহেব-কন্‌ষ্টেবল কটা চোখের স্থির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল —"দেখুন তো আপনার ঘড়িতে কটা?" সমস্ত পৃথিবী ক্ষণকালের জন্য চলা বলা বন্ধ করে আমার দুই চোখের চসমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার জেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি মায় চেন হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বল্লে—"দশটা বিশ হল!" ঝমাঝম্ বাদলা হঠাৎ কেটে সূর্য্য উঠলে যেমন সব পাখীগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের যাত্রীদের কোলাহল, কলের হুস্-হাস্, জলের কল্ কল্ সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে;—অবিন যে কখন উঠে সেই লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহিরি-টোলায় নেমে গেল তা আমি দেখতেও পেলেম না।

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না,—যদিও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি-ধরে বাড়ি ফেরে! অবিনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দল একে-একে গা-ঢাকা হল,—পড়ে

রইলেম কেবল আমি,—নবীন ও প্রবীণ দুই দলেরই অবশেষ, উল্টে-পড়া মদের পেয়ালার তলানি একটি ফোঁটা। ইয়ারকির শেষ নাড়িচ্ছেদ বুড়ো গোলোকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ করে আমি আমার সেই আগেকার জাহাজে আজকের সকালে ঠিক সেই আগে-কারই মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন যেন শীতে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে আগুন-তাতে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি বসন্তকাল জলে-স্থলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো ফাগুনের হাওয়া বসন্তবাউরীর সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হল্‌দে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে। আমি তারি দিকে চেয়ে একলাটি আমার সেই আগেকার জায়গায় চুপ-করে বসে বসে দেখছি—সব নৌকার ফুটো-ফাটা নতুন-পুরাতন নির্ব্বিশেষে পালগুলোতে আজ নতুন দখিনে হাওয়া বেধেছে, নদীর বুকে যৌবনের জোয়ার তুফান তুলেছে, জলের ফেনা যেন ফুলের সাদা সাজ। বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক আঁজলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোস্‌বো চোরিদিকে ছড়িয়ে সেই সে হাঙরমুখো ষ্টীমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা যে এত সুন্দর ইতিপূর্ব্বে তা আমার চোখেই পড়েনি। আজ গোলাপী সাটিনের সদ্‌রী বাসন্তী রঙের ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মস্‌লিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজকরা হাল্কা টুপিটি পোরে মূর্ত্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর, দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি তাঁকে একটা সেলাম না দিয়ে থাকতে পাল্লেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নীচু করে চাইলেন। সেই সময় তার চোখদুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা! এমন চোখ আমি কারু দেখিনি,—এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে-নাও বটে! তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি, সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই রুমালে-ঢালা গোলাপফুলের রুঃ আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়েনা তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম কি না। তিনি যেন আমার প্রশ্নেরই জবাবে বল্লেন, তবে শুনুন্—

আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখতো না! এটা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হবেন না। পাঁজরের যে হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদিপুরুষের বুক থেকে খসে পড়েছিল। সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ঙ্কর রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলুম। বুকের ঐ হাড় যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশীর মতো ফুঁ-দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেলেনা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে দক্ষতার একটা শিলমোহর বুকে

নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলে-গুলো ভূমিষ্ঠ হতো এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ঐ হাড়ের বাঁশির অঙ্কুর মাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হতো, তবে হাকিম এবং বুজরুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক সময় শিশুপ্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয়নি। আমাদের যারা কেউ নয় তারা এজন্যে হাহাকার করতো, এবং এর জন্যে আমাদের বংশে অনেক মায়েরও বুক ফাটতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো পিতার তাতে এক-নিমিষের জন্য কাজে একটু শৈথিল্য এসেছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষানুক্রমে কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে আমাদের বুকের হাড়গুলো বাজ ধরবার সিকের মতো সরু, কালো এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

এই বংশের শেষসন্তান আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলেম তার ছমাস পূর্ব্বে পিতা আমার স্বর্গারোহণ করেছেন এবং আমায় প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগ-শয্যায় শুলেন, কাজেই আমার বুকের ভিতরে স্বপ্নের বাঁশি যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলেম না। শুকনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি, আমার মধ্যে দিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত বংশের অসংখ্য বিফল স্বপ্নগুলো শেষফুলটির মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে এই ভেবে মা আমার এক-এক দিন রোগশয্যার কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা আমার বুকের উপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেখতেন। সে সময় তাঁর দুই চোখ রোগের কালিমার মাঝে এমন একটা উৎকট আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত যে আমি ভয়ে এক-একদিন কেঁদে ফেল্‌তুম। মা আমার চোখে জল দেখে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে আমায় ছেড়ে দিতেন! আমার বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল ফেলেনি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল, কাজেই সেই অল্পবয়স থেকেই আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত বুকটা যখন কলের চাপে পাটের গাঁটের মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার জোগাড়, যে-সময় কাজের মধ্যে আমি এমন-একটু অবসর পাচ্ছিনে যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন মা-আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে, সেই সময় পাটের বাজারে একটা বিষম দাঁও-প্যাঁচের মাঝখানে মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবরটা আমার আফিস-ঘরে এসে পৌঁছল। বলা বাহুল্য সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত রেখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা তিনি তখন আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি এক-খান চিরকুটে আমার কাজ সেরে আসা পর্য্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরদারি করতে লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলেম। আর-কেউ হলে সব কাজ ফেলে মুমূর্ষু মায়ের

কাছে ছুটে যেতো কিন্তু আমি জানতাম আমি সেই নিরেট বাঁশের শেষ কঞ্চি—বাঁশি হয়ে বাজা যার পক্ষে অসম্ভব।

কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে জলযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলেম তখন রাত গভীর হয়েছে। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলেম সেজন্য আনন্দ হল না, তিনি যে আমার কাজ-সারা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি সেইটেতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বল্লেন—ওই বাক্সটা এখানে আন্। বাক্সটা তাঁর সম্মুখে ধরে দিতেই তিনি কি-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, তুই কখন স্বপ্ন দেখিস্?

বাক্সটার ভিতর আমি দেখলেম শূন্য। আমার মনে হল মায়ের কথায় কি উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বাক্সটা যেন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লেম—কোনো পুরুষে স্বপ্ন কাকে বলে জানিনি!—আমার মনে হল আমার কথা শুনে মায়ের বুকের ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাতের মুঠো সজোরে কি যেন আঁকড়ে ধরলে।

তার পর যা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না। একটা ঝড় যেন প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট-বাঁধা কাজকে হঠাৎ ঠেলে বার করে দিলে। আমার পাঁজরের সমস্ত হাড়গুলো তলতা বাঁশের বাঁশির মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠলো। আর আমার সেই মরা-মায়ের ডান হাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে আস্তে আপনার মুটো খুল্লে। তার ভিতর রয়েছে দেখলেম আবদ্ আল্লা লেখা আমার অভিশপ্ত অতি পুরাতন পূর্ব্বপুরুষের বুকের হাড়। তার গায়ে সাত-আটটা ছোট ছোট ফুটো। সেই দিন সব প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার করুণ সুর শুনতে পেয়েছিল। আর সেই দিন আমি প্রথম জানতে পাল্লেম আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশীর মত ফাঁপা ও ফুটো, কাজ দিয়ে সেগুলো বোজানো ছিল মাত্র—

গঙ্গার একটা জলের ঝাপ্টা হঠাৎ ষ্টীমারের ডেক্ ডিঙিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটেয় একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আমি হঠাৎ চম্কে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখলেম, একটা গোলাপ ফুল আমার পাশে পড়ে আছে কিন্তু সে লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পর দিন অবিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বল্লে—"ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে? পাশের ষ্টীমার থেকে গোলাপ ফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মাল্লেম তাতেও তোমার চৈতন্য হল না, অবাক্!"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।




“বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক’ ভুঁড়ি ;
ঝুড়িতে আসল কাব্য ছ’পন ছ’বুড়ি !”

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

# নারীর অবস্থা

## ( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

যে পরিবার-তন্ত্র হইতে সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তন দুই প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল :—

গৃহ ছাড়িয়া পুরুষদিগের ইতস্তত অপসরণ ( ভাইরা পৃথক হইয়া যায়, পুত্রেরা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে ) ;

নারীর দাসত্ব-মোচন।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে,—হিন্দুসমাজ ধীরে-ধীরে চলিলেও—উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল ; ইংলণ্ডের আবির্ভাবে, এই ক্রমবিকাশের কাজ আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এই মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে—উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া, ক্রমবিকাশ উন্নতির উল্টা পথে চলিতেছিল ; তাই নূতন আইন করিয়া ইংরাজদিগকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চলিতে হইয়াছিল।

প্রথমে সতীদাহ নিবারণ।

তাহার পর, শিশুহত্যা নিবারণ।

উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিবাহ-অনুষ্ঠানে যে অপরিসীম ব্যয় হয় সেই ব্যয় লাঘবের ইচ্ছা করিত ; তাছাড়া, তাহারা নিজ কন্যাদের জন্য স্বজাতের মধ্য হইতে, বর সহজে খুঁজিয়া পাইত না। ১৮৫৬ অব্দে, সরকার হইতে রাজপুতানার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হইলে, জানা গেল যে, ৩০৮ গ্রামের মধ্যে, ২৬ গ্রামে, ৬ বৎসর বয়সের নীচে কোন বালিকা ছিল না। অন্য ৩৮ গ্রামে, একটিমাত্র বালিকাও ছিল না। তাছাড়া এই প্রথাটি কেবল রাজস্থানেরই বিশেষ প্রথা নহে। বারাণসীতে,—মেয়েগুলি জন্মান্তরে যেন ছেলে হইয়া জন্মায়,—দেবতার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, মেয়েগুলিকে নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। আজকাল আইনের দ্বারা শিশুহত্যা নিবারিত হইয়াছে—যদিও এখনও গোপনে-গোপনে শিশুহত্যা হইয়া থাকে। ( ১ )

*

* *

যে সকল প্রথা ইংরাজ ও নব্য-হিন্দুরা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

উচ্চ-বর্ণসমূহের মধ্যেই বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ সমধিক প্রচলিত। ১৮৯০ অব্দে, ১১ বৎসরের কম বয়স্ক দশহাজার ভারত-বাসী পুরুষের মধ্যে ৬০৬জন বিবাহিত ও ১২ জন গতপত্নীক ; এই একই বয়সের দশহাজার ভারতবাসিনীর মধ্যে ২৭৫২ বিবাহিতা ও ৫২

( ১ ) রাজপুতানার কোন কোন প্রদেশে, ২৫ বৎসর ধরিয়া অভিজাত-বংশীয় বালিকাদিগের বিবাহ হয় নাই। বারাণসীর কোন কোন প্রদেশে, বালিকার বিবাহ দেখিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না। (Wilkins, Modern Hinduism) M. Ibbetson বলেন, পঞ্জাবে, যত্নের অভাবে অনেক বালিকা মারা যায়। এবং কোন কোন শাখাজাতির মধ্যে চিহ্নিতপূর্ব্ব শিশুহত্যার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

জন বিধবা। এই গণনার অন্তর্ভুক্ত—দেশের সমস্ত অধিবাসী, এমন-কি মুসলমানেরাও, যাহাদের ধর্ম্মে, যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, এবং সেই সকল বন্য জাতি যাহারা এই প্রথার সহিত আদৌ পরিচিত নহে। এই প্রথা বিশেষরূপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত। ১৮৯১ অব্দের আদম সুমারে, দক্ষিণ বেহারের নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কগুলি পাওয়া যায়; দশ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার মধ্যে, ২৬৩৯ জনের বিবাহ হয়; তন্মধ্যে ১৭৭৩ জন হিন্দু ও ৮৬৬ জন মুসলমান; বেহারের অবশিষ্ট অংশে ও পশ্চিম বঙ্গে প্রায় একই অনুপাত দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি পার্শী ও নব্য-হিন্দু সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টায় ১৮৯০ অব্দে "সম্মতি-আইন" বিধিবদ্ধ হয়,—যাহার দ্বারা ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, বিবাহের পূর্ণ-পরিণতিসাধন নিষিদ্ধ; কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার না থাকায়,—এই আইনের নিষেধ একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে(২),

(২) Justice Maihu-Swami Iyer M. Rees কর্ত্তৃক Nineteenth Century"তে উদ্ধৃত হইয়াছে —অক্টোবর ১৮৯০) এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"গর্ভাধান ও জন্ম উভয়ই অশুচি ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের পরিণাম, সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক —এই যে ধারণা, ইহা অমরতার স্পৃহা হইতে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এই বিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত। বিবাহের অনুষ্ঠান এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবশ্যক এবং নারীর পক্ষে বিবাহই একমাত্র অত্যাবশ্যক সংস্কার-কর্ম্ম।

১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারের পর, হিন্দুনারীর রাষ্ট্রিক (civil) অবস্থা এইরূপ ছিল। দেখ :—

| বয়স | | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা |
|---|---|---|---|---|
| ৫ বৎসরের নীচে | ... | ১৩,৬৭২,৪৯৪ | ২২২,১১১ | ১০,১৬৫ |
| ৫ হইতে ৯ | ... | ১০,৮০৫,২৯৮ | ১,৮৯৩,০৩৯ | ৫১,৮৭৬ |
| ১০ হইতে ১৪ | ... | ৩,৮৫৪,৮৯৩ | ৪,৭২৪,৩৭২ | ১৪০,৭৩৪ |
| ১৫ হইতে ১৯ | ... | ৭৮২,৮৮০ | ৬,৩০৩,৯৯৮ | ২৮০,৯৪২ |
| ২০ হইতে ২৪ | ... | ২০৩,২১৬ | ৭,৬৩১,৮৩৮ | ৫৪৫,৪০৫ |
| ২৫ হইতে ২৯ | ... | ১২১,১৩৪ | ৭,৪০৩,০৯৪ | ৯০৩,২৩১ |
| ৩০ হইতে ৩৪ | ... | ৯৯,১৭১ | ৬,৪৩১,৪২০ | ১,৪৯৩,৯০৭ |
| ৩৫ হইতে ৩৯ | ... | ৫৬,৪৩৪ | ৩,৭৯৩,৮৫৪ | ১,৩৬৪,৭৩২ |
| ৪০ হইতে ৪৪ | ... | ৫৪,০১২ | ৩,৪৮২,৪১৮ | ২,৪৯১,০৫২ |
| ৪৫ হইতে ৪৯ | ... | ২৬,০৬৭ | ১,৫৩১,৫৬৯ | ১,৪৮৮,২০৮ |
| ৫০ হইতে ৫৪ | ... | ৩২,৫১৭ | ১,৪০৭,৫৪৪ | ১,০৫২,০৮৩ |
| ৫৫ হইতে ৫৯ | ... | ১২,৩৭৭ | ৪৯২,৬৬৮ | ১,০৫২,০৮৩ |
| ৬০ এর নীচে | ... | ৩৬,২৩৮ | ৩৮,৮৩৩ | ৪৭১৭ |
| উল্লেখ-বিহীন | ... | | | |
| সমষ্টি | ... | ২৯,৭২৮,৮০১ | [illegible] | |

*
* *

বহুবিবাহ প্রথা মুসলমানদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে, হাজার-করা ৪০ জন হিসাবে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা, বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; বুনো জাতিদিগের মধ্যে হিসাবটা হাজার করা ৬০ জন। সমস্ত ভারতে, প্রত্যেক হাজারের মধ্যে ৭ জন বিবাহিত পুরুষের একাধিক পত্নী। এই অনুপাতটা খুবই কম, কিন্তু উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে এই অনুপাতের সংখ্যা আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। (৩)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী উপন্যাস "বিষবৃক্ষে" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বহুবিবাহ-প্রথার কু-ফলই বিবৃত করিয়াছেন।

নগেন্দ্র নামক এক ধনী জমিদার সূর্য্য-মুখীকে বিবাহ করে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল। ভ্রমণ-পথে

---

সমস্ত প্রশ্নটার অবস্থা এইরূপ:—

১৮৭২ অব্দে "দেশীয় বিবাহ-আইন" জারী হয়; ঐ আইনে, পুরুষের বিবাহের বয়স ১৮ বৎসর ও বালিকার বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যাহারা নিম্নলিখিত ধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত নহে বলিয়া ঘোষণা করিবে তাহারা ব্যতীত আর কেহই এই আইনের সংস্রবে আসিবে না:—যথা;—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও "পজিটিভিষ্ট" সম্প্রদায় ছাড়া আর কাহারও সম্বন্ধে এই আইনের প্রয়োগ হয় না।

১৮৮৪ অব্দে, আইনের দ্বারা বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত মালাবারী একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৮৮৬ অব্দে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। ১৮৯০ অব্দে, একটি ক্ষুদ্র বালিকার বিবাহ হইয়া, বিবাহের পূর্ণ-পরিণতি-সাধন একটু বেশী শীঘ্র হওয়ায়, তাহার মৃত্যু হয়,—এই মৃত্যুর দরুণ আবার আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার ফলে ১৮৯২ অব্দে "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ হইল। সেই অবধি, বিভিন্ন সভাসমিতি, বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সভ্য-সংখ্যা অল্প হওয়ায়, সেই সভ্যদিগের বাহিরে আর কোথাও তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আইনের সর্ত্ত-অনুসারে, স্বামী "বৈবাহিক অধিকার পুনঃস্থাপনের" জন্য নালিশ দায়ের করিতে পারে। যে অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে তত্ত্বাবধানার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই বালিকার পতি জজের নিকট হইতে আদালতের সাহায্য লইয়া স্বীয় পত্নীকে নিজ গৃহে আনিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার দরুণ, কতকগুলি য়ুরোপীয় লেখক ভারতীয় ইংরাজ-সরকারকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের আইনেও, পত্নীকে পতিগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার পতির আছে। য়ুরোপ অপেক্ষা ভারতে এই ব্যবস্থা যদি বেশী অপ্রীতি-কর হইয়া থাকে,—সে দোষ হিন্দু রীতিনীতির,—ভারত-সরকারের নহে।

(৩) উচ্চবর্ণ বাঙ্গালীদের মধ্যে, বিশেষত অন্য ব্রাহ্মণেরা যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমুৎসুক সেই কুলীনব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা সমধিক প্রচলিত। কুলীনেরা পণ গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সব পত্নী পিতৃগৃহেই বাস করে, পিতৃগৃহেই তাহাদের মৃত্যু হয়। কলিকাতার "সঞ্জীবনী" পত্রিকা হইতে M. P. N. Bose কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় গ্রন্থে দিয়াছেন:—১৮৯৩ অব্দে, ৪জন বাঙ্গালীর ৩০, দুইজনের ৩২, একজনের ৩৪, একজনের ৩৫, একজনের ৩৬, একজনের ৫০, একজনের ৬৭, ও একজনের ১০৭ পত্নী ছিল।

দৈবক্রমে কুন্দনন্দিনী নামক একটি নিঃসম্বল অনাথা যুবতীকে দেখিয়া নগেন্দ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কুন্দনন্দিনীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য। মৌন-প্রকৃতি, শান্ত, ধীর ও প্রেমাসক্তা। কিন্তু লেখাপড়া জানে না,—দ্বেষহিংসাহীন, নিরুদ্যম ও নিস্তেজ। নগেন্দ্র তাহার প্রেমে উন্মত্ত হইল। সূর্য্যমুখী যখন দেখিল, কুন্দের প্রেমে নগেন্দ্র ওষ্ঠাগতপ্রাণ তখন কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য নগেন্দ্রকে জিদ করিয়া বলিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তখন আপনার মনের বল ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই—তাহা অপেক্ষা আর একজনকে নগেন্দ্র বেশী ভালবাসে একথা তাঁর সহ্য হইল না। সূর্য্যমুখী গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন।

সূর্য্যমুখী তাহার ননদকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দ-নন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দ-নন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম; কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনিই বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না, আর আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল।

কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না! যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যতদিন না মাটীতে এ মাটী মিশে, ততদিন থাকিবে। কেননা তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এই আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

একজন খুব উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক, মালাবারি এইরূপ বলেন:—

"হাঁ, একটা গীতে আছে,—যাহাদের হৃদয় পবিত্র, যাহাদের অন্তঃকরণ সরল, তাঁরাই যেন নারীদিগের ভাগ্যবিধাতা হয়! ভেঙ্গে ফেল নারীদের পায়ের শিকল; তাহারা গোলাম, তাহারা বলির পশু; তাহাদের সমস্ত জীবনটা, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে, ন্যায্য অধিকাররূপে সুখের দাবী করে। ···যখন এই ব্যাধি দূর হইবে, যখন বিধবারা দুঃখ-আঁধার হইতে মুক্ত হইয়া আবার আলোকে আসিবে তখনই ভারত প্রকৃত-রূপে বর্ব্বরতার উপর জয়লাভ করিবে, আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে,—অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক আনন্দের যুগ আরম্ভ হইবে।

বিধবার এই মুক্তিদাতা,—বিশ্বমানবের হিতকারী বন্ধু—এই উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইবে। তাহার যশোভাতি সূর্য্যকিরণের ন্যায় জগতে উদ্ভাসিত হইবে। আর আজিকার দিনে যাহারা নারী-পীড়ন অপরাধে অপরাধী, যাহারা শাস্ত্র-বচনের অর্থ মিথ্যা করিয়া ব্যাখ্যা করে, সেই অত্যাচারী পাষণ্ড-দিগের জন্য পরলোকে অশেষ দুঃখ, অনন্ত দুর্গতি সঞ্চিত রহিয়াছে। আহা না, তাহা নহে—যে সকল দয়ার্দ্রচিত্ত মহাত্মাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা দুর্ব্বলের সাহায্যার্থ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, সেই মহাত্মাদিগেরই নয়নাশ্রু-বারি এই অত্যাচারী নরাধমদিগের জন্যও মার্জ্জনা আনিয়া দিবে।

হায়, এক্ষণে কি-কষ্ট কি-দুর্দ্দশা! দেখ —কতকগুলি বাল-বিধবা, কতকগুলি স্তন্যপায়ী শিশু,—যাহাদিগের সরল অকপট

চক্ষু আলোর দিকে উন্মুক্ত; আলোক তাহাদিগকে বলিতেছে, 'ঐখানে আশা রাখ'। আরও দেখ—এমন কতকগুলি মা দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা যাহাদিগকে মা হইতে নিবারণ করে। দুর্ব্বলতার দরুণ তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে—তাহারা পতিতা হয়। মার্জ্জনীয় তাহাদের সেই দুর্ব্বলতা! এই দুর্ব্বলতার দোষে, তাহাদের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই শিশুর গলায় ফাঁস লাগাইয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শিশুকে হত্যা করে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সুন্দরের বরণ

( জামী হইতে )

হে চির সুন্দর দেব পরম প্রেমিক
তব পুণ্য সুমধুর স্মৃতি,
এ বিশ্বের নরনারী হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রেমরূপে জাগিতেছে নিতি।
তোমারি আনন্দ-উৎসে রসধারা পিয়ে
প্রেমিকের কণ্ঠে ফুটে ভাষা,
তোমারি চরণ-ছায়ে, প্রণাম করিয়া
বিনিময় করে ভালোবাসা।
তুমিই পাগল কর প্রেমিকা-প্রেমিকে
তুমি ধ্রুবসুন্দরের প্রাণ,
নাহি রূপ ছাড়া প্রেম তোমা ছাড়া রূপ,
প্রেম বিনা মানুষ পাষাণ।
কর তুমি 'মজনু'র শোণিত চঞ্চল
গণ্ডস্থলে রহি 'লয়লা'র,
শিরীনের রক্তাধরে মাধুর্য্য হইয়া
মত্ত কর প্রিয়জনে তার।

এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-মায়া ঘন যবনিকা—
অন্তরালে হইয়া আসীন,
করিবে বঞ্চনা মোরে হে ধ্রুব সুন্দর,
কতদিন—আরো কত দিন?
ছিঁড়ে ফেল যবনিকা পূর্ণরূপে জাগো
দূর হতে কেন উঁকি দাও,
মম আত্মাবালিকারে পুতুল-খেলায়
মিছে আর কেন গো ভুলাও।
নববধূ সম আমি বর-প্রতীক্ষায়,
এস আজি শুভদৃষ্টি হোক্,
বিশ্বের সকল আলো ভুলাইয়া দিক্
তব দীপ্ত আঁখির আলোক!
লাজ-নম্র বধূটির রুদ্ধ কর আঁখি
আর যেন চাহে না বাহিরে,
পূর্ণইন্দুহার তুমি জাগ চিরদিন
হে সুন্দর, হৃদি-সিন্ধুতীরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

# বাদ্‌লার গল্প

দিনটা ভারি মেঘলা; সকাল থেকে সেই যে ইল্‌সেগুঁড়ি সুরু হইয়াছে, থামিবার আর নামটি নাই। সমস্ত আকাশটার রং যেন বর্ষার স্কন্ধ, ঘোলা গঙ্গাজলের মত! পথ-ঘাট কাদায়-কাদায় একেবারে প্যাচ্‌-প্যাচ্‌ করিতেছে।

পরেশের বৈঠকখানায় বসিয়া সন্ধ্যা-বেলায় জনকতক যুবা সিগারেট ফুঁকিতে-ছিল, তামাক টানিতেছিল, গল্পগুজব করিতে-ছিল।

মাণিক আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভাগ্যে আজ রবিবার,—নৈলে এই বাদলায় জুতো বগলে করে', হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, পা পিছ্‌লোতে-পিছ্‌লোতে আপিসে ছুটতে হোত। ওঃ, বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে!"

সুরেন মুখভার করিয়া বলিল, "মরে যাই! বেঁচেছ ত ভারি! এমন বেঁচে লাভ কি,—হপ্তায় একটিমাত্র রবিবার—বাদল নেমে সেটিও বাজেখরচ হোল!"

পরেশ হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে-দিতে বলিল, "বাজেখরচই বা হবে কেন,—পার-ত কাজে খাটিয়ে নাও না! শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর মত বর্ষারও ত একটা বিশেষত্ব আছে—সে বিশেষত্ব যে উপভোগ করতে পারে, তার কাছে কিছুই বাজেখরচে যায় না।"

সুরেন বলিল, "কবির মত একঝুড়ি বাক্যব্যয় ত করলে, কিন্তু তোমার মত আমরা সবাই ত আর কবি নই,—কাজেই বর্ষা নামলে আমাদের বলতে হয়—'পায়ে জুতো পথে কাদা যাই কেমন করে'! এই সহুরে বর্ষায় রাস্তায় কাদা-ঘেঁটে মরা কিম্বা ঘরের কোণে সেই সাক্ষাৎগন্ধরূপিণী চিরপুরাতন স্ত্রীর কাছে হাত-পা গুটিয়ে বসে গয়নার বায়না শোনা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব আমি ত দেখতে পাই না।"

নবীন হুস্ করিয়া সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ভুল সুরেন, ভুল! প্রথমত, যা বল্‌লে সেগুলো তোমার বিশেষত্ব হতে পারে—বর্ষার নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের সকলকার স্ত্রী পুরাতনও নন, গন্ধরূপিণীও নন, স্বামীকে পাশে পেলে গয়নার বায়নাও ধরেন না!"

রমেশ আলবোলার নলটা পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "নিশ্চয়, আমি তোমার বাক্য সমর্থন করি নবীন!"

সুরেন চটিয়া বলিল, "তুমি আর মুখ নেড়ো না রমেশ! তোমার ত বিয়ে হয়েচে আজ তের বছর, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে এখনো নবীনা বলতে সাহস কর?"

রমেশ বলিল, "আলবৎ! কেননা, আমি আমার স্ত্রীকে ফি-মাসে দিন-পনেরোর জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে পুরাতনে নূতনত্বের রসান দিয়ে নি।"

রমেশ কোনদিকেই আঁটিতে না পারিয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, বর্ষার বিশেষত্বটা কি, শুনি!"

মাণিক বলিল, "সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।"

—"কি ?"

—"প্রথম, আড্ডায় বসে পাঁচজনে মিলে-মিশে গল্পস্বল্প করা।"

—"সে ত হচ্ছেই।"

—"দ্বিতীয়, কচিশষা, নারিকেল-কুচি আর গরমাগরম ফুলুরি সহযোগে মুড়ি ভক্ষণ। তৃতীয়, সেই সঙ্গে দাবাবোড়ে, পাশা বা তাস খেলা, কিম্বা—"

—"তাশ-দাবা-পাশা—ওঃ, ভারি বিশেষত্ব!"

—"কিংবা ভূতের গল্প-শোনা।"

পরেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "Bravo! ঠিক বলেছ! মুড়ি-টুড়ি আমি এখনি আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভূতের গল্প বলবে কে ?"

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ তাকিয়ার উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে আড়্ হইয়া চক্ষু মুদিয়া তাম্বুলরস উপভোগ করিতেছিল। এখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "মুড়ি-ফুলুরির ভার যদি পরেশ নেয়, গল্প-বলার ভার তাহলে আমি নিতে পারি।"

—"কিন্তু, ভূতের গল্প!"

—"অবশ্য, অবশ্য!"

—"আর, সত্যঘটনা!"

—"নিশ্চয়। গল্পের নায়ক হচ্ছি, আমি।"

—"আর, নায়িকা ?"

—"আমার প্রিয়তমা।"

—"সাধু! সাধু!—এতদিনে একজোড়া বাস্তব নায়ক-নায়িকার সন্ধান পাওয়া গেল! ওহে পরেশ, মুড়ি আনাও, ফুলুরি ভাজাও!"

বন্ধুরা সবাই সাগ্রহে চন্দ্রনাথের চারিদিক ঘিরিয়া বসিল।

* * *

বাহিরের মেঘলা আকাশের দিকে একবার চাহিয়া চন্দ্রনাথ আরম্ভ করিল :—

"সে-সময়ে হাওয়া খেতে আমরা মধুপুরে গিয়েছিলুম।

যে বাড়ীতে আমরা ছিলুম,—সেখানা খুব বড়সড়, সামনে বাগান, কাছেই নদী।

তোমরা সবাই জান ত, মধুপুরে গিয়ে আমরা—গারদরক্ষীরা, মেয়েদের পায়ের বেড়ী বেপরোয়া হয়ে খুলে দি। মেয়েরাও এমন দুর্লভ সুযোগের ষোলআনাই কাজে খাটিয়ে নিতে কিঞ্চিৎমাত্র গাফিলি করেন-না, রোদ পড়লেই তাঁরা আল্‌তা-পরা পদযুগলের সদ্ব্যবহার করতে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

কম্‌লাও (বলাবাহুল্য, আমার স্ত্রী—এই গল্পের নায়িকা) এ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়-নি। সেও রোজ মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে, গ্রীষ্মেও গায়ে একখানি শীতের আলোয়ান জড়িয়ে, আল্‌তা-পরা পায়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরুত।

মেয়েদের বন্ধুসংগ্রহের ক্ষমতাও অদ্ভুত। বেড়িয়ে এসে কমলা প্রায়ই বল্‌ত, "আজ একটি বৌয়ের সঙ্গে ভাব হোল।"

—"কে ?"

"অমুক বাবুর বৌ। কল্‌কেতায় বাড়ী। গায়ে এক-গা গয়না।"

কার গায়ে কত গয়না মেয়েরা সকলের আগে সেটা ভাল করে' চোখ-বুলিয়ে দেখে

নেয়। কমলাও গয়নার 'কম-বেশীত্ব' দেখে আমার কাছে সমালোচনা করত—দেখ, অমুকের গায়ে এত গয়না—নিশ্চয় খুব বড়-মানুষের বৌ। অমুকের হাতে সুধু ডু-গাছা বালা আর চুড়ী—তার বর নিশ্চয় তাকে দেখতে পারে না।"

স্ত্রীর মুখে শুনে আরো বুঝতুম, কমলার এই নিতুই-নূতন বন্ধুর দল একদিনের আলাপেই বেফাঁস হয়ে এত হাঁড়ির খবর বলে ফেল্‌ত যে, আমরা—পুরুষরা, দশবছরের আলাপেও কোন বন্ধুর কাছ থেকে তত পেটের কথা আদায় করতে পারি না।

কমলা একদিন নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করে' এসে বল্‌লে, "ওগো, আজ আমার নেমন্তন্ন।"

আমি বিস্মিতস্বরে বললুম, "নেমন্তন্ন! কোথায়?"

—"সেই যে অমুক বাবুর পরিবার—যার কথা পরশুদিন তোমায় বলেছিলুম।"

—"কি মুস্কিল, পথে-পথে আলাপ আর পথে-পথেই নেমন্তন্ন!"

কমলা চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে, "অবশ্য!—

'আমি ত তেমন মেয়ে নই!
আকাশ যুড়ে আমি সখা,
পাতিয়ে নিচ্ছি সই!'

পথেই এখন আমার আস্তানা,—সুতরাং পথেই নেমন্তন্ন!"

—"কিন্তু পথেই যে পাত পাতবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তাদের বাড়ীতে ত পুরুষমানুষ আছে, তুমি একলা যাবে কি করে'?"

কমলা কৃত্রিম কোপকটাক্ষে আমার গোঁফ টেনে দিয়ে বললে, "হে জটিল-কুটিল নিপট-কপট শঠ, হে সন্দেহের মূর্ত্তিমান অপদেবতা! আশ্বস্ত হও, তোমার এ সন্দেহ অমূলক! কেননা, পুরুষের ভেতরে একটি পনেরো-ষোল বছরের ভাই, হঠাৎ কি দরকার পড়াতে বউটির বর কল্‌কেতায় গেছেন, কাল আস্‌বেন। বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে সুধু একপাল মেয়ে আর ঐ বাচ্ছা পুরুষটি। সে-সব না জেনেই কি নেমন্তন্ন নিয়েছি? আমি কি তেমনি হাঁদা গা?—আর, এখান থেকে এমন-কিছু দূরেও নয়—এই খানতিনেক বাড়ীর পরেই। যাবার সময় ঝী-চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাব,—না গেলে তারা কি মনে করবে বল দেখি?"

আমার এই স্ত্রী-রত্নটি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত এবং অন্যায় রকমের মুখরা। সুতরাং তার মুখবন্ধের জন্য আমি বললুম, "প্রিয়ে, লেক্‌চার থামাও—আমি রাজি!"

কমলা উঁচু হয়ে আমার গলা জড়িয়ে (আমি লম্বায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চি, প্রিয়তমা সহজে আমার নাগাল পান না) ধরে বললে, "তুমি আমার পোষমানা স্বামী—তাইত তোমার চরণে কায়মনোপ্রাণে আমার এ জীবন-যৌবন সঁপে নিশ্চিন্ত আছি। হে প্রিয়তম, তোমার উঁচু মাথা নিচু কর, নৈলে আমার চুম্বন অতদূর পৌঁছুবে না!"

চন্দ্রনাথ হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া পড়িয়া বলিল, "ওহে, মুড়ি-ফুলুরি এখনো এল না যে!"

পরেশ বলিল, "ধৈর্য্য ধর, এল বলে। তপ্ত তৈলে এখন সৎব্রাহ্মণের দ্বারা

মহাসমারোহে ফুলুরির অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, রান্নাঘর থেকে ঐযে শ্যামের বাঁশীর চেয়েও সুমধুর ছ্যাঁক্-কল্‌কল্ ধ্বনি আস্‌চে—শুনচ না?"

রমেশ বলিল, "ওহে চন্দর, ভূত কৈ—বিনামূল্যে মুড়ি-ফুলুরি খেতে চাইলে ত চল্‌বে-না! বল গল্প, খাও মুড়ি—ফেল কড়ি, মাখ তেল,—ভদ্দরলোকের এক কথা!"

চন্দ্রনাথ বলিল, "রও, আগে গোড়াটা ফেঁদে-নি! নৈলে শেষটা তোমাদের জেরার মুখে টেঁকব কেমন করে'! তারপর, শোন ঃ—

সন্ধ্যার একটু আগে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কমলা জামার একটা হাতা শেলাই করছে।

আমি বল্লুম, "একি, সাজগোছ করে' অসময়ে সুঁচ নিয়ে কি হচ্ছে?"

কমলা মুখভার করে' বল্‌লে, "দেখনা, পোড়ারমুখী 'ঝুমী'র কীর্ত্তি! আমি কাপড় পর্‌চি, জামাটা ওখানে বার করে' রেখেছি, আর ঝুমী এসে কিনা জামার হাতাটা দাঁতে করে' ছিঁড়ে দিলে! ভাগ্যে রেশমের সুতোর বাণ্ডিলটা সঙ্গে এনেছিলুম, তাই তাড়াতাড়ি শেলাই করে' নিচ্চি। দাও-ত হতভাগার দাঁতগুলো ভেঙ্গে!"

যার নামের গোড়ায় কমলা দু-দুটো সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করলে, সেই ঝুমী হচ্ছে আমার সখের কুকুর। কমলা যখনি তার দাঁত ভাঙ্গবার আদেশ দিলে, তখনি সে বুঝে নিলে তার বিরুদ্ধে মস্ত-একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি যেই তার দিকে তাকালুম, সে অমনি পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে ফুড়ুক্ করে' ঘর থেকে সরে পড়্‌ল।

কমলা হেসে বল্‌লে, "দেখেচ, হতভাগা মানুষের চেয়েও চালাক। বোঝে সব, জামা ছিঁড়েচে দুষ্টুমি করে'।"

এমনসময় চাকর এসে খবর দিলে, কমলাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে।

কমলা বল্‌লে, "বল্-গে যাচ্ছি। তুই আর ঝী আমার সঙ্গে যাবি।"

চাকরটা একটু জড়সড় হয়ে বল্‌লে, "মা, আপনি কি সেখানে বেশী রাত পর্য্যন্ত থাকবেন?"

—"কেন, সে খোঁজে তোর দরকার কি?"

—"না মা, মালী বল্‌ছিল ও-বাড়ীতে ভূত আছে। রাত হলে তারা গান গায়—তবলা বাজায়!"

কমলা ত হেসেই অজ্ঞান! বল্‌লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, ভূতকে আমি মানা করে' দেব—সে যেন তোর ঘাড় না মট্‌কায়। নে, এখন চল্!"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে কমলার পিছু-পিছু গেল।

কমলা চলে গেলে পর, আমি জুতো খুলে বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লুম। হাতের কাছেই রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থাবলী পড়ে ছিল, সেখানা তুলে নিয়ে একটা গল্প পড়তে লাগ্‌লুম। সেটা ভূতের গল্প।

রাত্রিতে তোমরা কেউ যদি ভূতের গল্প পড়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই জান যে, পড়তে-পড়তে কি-রকম একটা অকারণ,

অজ্ঞাত আতঙ্কে মনটা গুমোট হয়ে আসে। বিশেষ, গল্পটি যদি আবার ভাল লেখকের লেখা হয়! কারণ, ভাল লেখকরা আজগুবির রংটা এমন করে' ফলিয়ে তুলতে পারেন, যে মনে হয়, যা পড়চি তা সব সত্য—একেবারে বাস্তব আর স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কবলে পড়ে আমারও সেই হাল হোল। পড়তে-পড়তে বোধ হতে লাগল, গল্পের সেই ভুতুড়ে কাণ্ড আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

হঠাৎ মনে পড়ল, নেমন্তন্নে যাবার সময় চাকরটা কমলাকে বলে ছিল, যে বাড়ীতে সে যাচ্ছে সেটা হানাবাড়ী। আশ্চর্য্য কি! মধুপুরের এই ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে কত-রকমের রুগী আসে আর মরে—এখানে কোথায় কি আছে, কে বলতে পারে?

এই, আমি যে বাড়ীতে আছি, এটাও ত ভাড়াটে বাড়ী, এখানেও লোক মরেছে নিশ্চয়, এ-বাড়ীতেও ত ভূত থাকতে পারে! ... ... ... কথাগুলো মনে হোতেই গা-টা কেমন ছম্‌ছম্ করতে লাগল। ভূতের ভয় রাত্রিকালে প্রবল হয় কেন? কারণ, রাত্রির সঙ্গে এমন-একটা রহস্যের ভাব আছে, যাতে-করে' সম্ভব-অসম্ভবের মাঝ-খানকার তফাৎটা একেবারে ঘুচে যায়। দিনের আলো হচ্ছে বাস্তব, তার মধ্যে আবছায়া, আধ ঢাকা বা গোপন কিছুই থাকবার যো নেই; আর রাতের অন্ধকার হচ্ছে অবাস্তবের বাসা, তার মধ্যে নজর চলে না, তাই যত-কিছু কাল্পনিক, অদেখা, অচেনা ব্যাপার আড়ালে আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।... ... ...

একটা মেঠো হাওয়া এসে আচম্‌কা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে আলোটা গেল নিবে।

আস্তেআস্তে বিছানা থেকে নামলুম। অন্ধকারেই জুতো পরে দেশলাইটা কোথায় আছে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লাগলুম। দেশলাইটা খুঁজে বের করে' আলোর দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পিছনে কিসের একটা শব্দ হোল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না—শব্দও আর নেই। ভাবলুম, বাতাসে বোধহয় ঘরের কোন জিনিষ নড়ে উঠেছে।

কিন্তু, আবার যেই আলোর দিকে এগুব,—ফের সেই শব্দ!—না, এ ত বাতাসে জিনিষ-নড়ার শব্দ নয়! ফস্ করে' দেশলাই জ্বাললুম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। তবে কিসের শব্দ এ?

না, এ-সময় অন্ধকারে থাকা সুবিধের নয়—আগে আলো জ্বেলে তবে অন্য কথা। কিন্তু যতবার আমি আলোর দিকে এগুতে যাই, ততবারই ঠিক আমার পিছনে কিসের শব্দ হয়, অথচ আমি থমকে দাঁড়িয়ে-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দটাও থেমে যায়। ক্রমাগত দেশলাই জ্বালতে লাগলুম,—কিন্তু ঘরের ভিতরে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

এ ঘরে একখানা খাট, একটা ছোট টেবিল আর খানদুই 'বেণ্টউড' চেয়ার ছাড়া আর-কিছু আসবাব ছিল না—সুতরাং কেউ যে কোথাও লুকিয়ে থাকবে, সে সম্ভাবনাও নেই।

ঘরে কেউ নেই—অথচ শব্দ হচ্ছে,

এর মানে কি? তবে কি যা ভাবছিলুম, তাই? এটা কি হানাবাড়ী?—আমার সমস্ত দেহ ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণ ঘর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখন মেঘের ফাঁক থেকে আবার চাঁদ ফুটে উঠল। জানলা দিয়ে ঘরের মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নার শিখা এসে পড়ল।

অন্ধকার যে ছিল ভাল! এই খানিক কালো, খানিক আলোতে সমস্ত ঘরখানা যেন অপার্থিব হয়ে উঠল। মনে হোতে লাগল, আমার চারিদিকে যেন অনেকগুলো ছায়াশরীরী রক্তপিপাসু প্রেতাত্মা, তাদের লিক্‌লিকে কঙ্কাল-বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে ওঁৎ পেতে গুম্ হয়ে বসে আছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে হুড়্-মুড়্ করে' আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়তে পারে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু আর কোন শব্দ পেলুম না। তবে কি এতক্ষণ আমি মিথ্যাভয়ের কুস্বপ্ন দেখছিলুম? তাই হবে! ভূতের গল্প পড়ে মাথাটা আমার বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, নিশ্চয়!

একটু আশ্বস্ত হয়ে আবার এক-পা এক-পা করে' এগুতে লাগলুম। আবার—আবার সেই শব্দ! শব্দটাও ঠিক আমার পিছনে পিছনে এক-পা এক-পা করে' এগুচ্ছে। চকিতে ফিরে দাঁড়ালুম,—কেউ কোথাও নেই! আমি খুব জোরে জোরে পা ফেলে জানলার দিকে এগিয়ে গেলুম,—সে অজ্ঞাত, অদৃশ্য, অমানুষ শত্রুর পদ-শব্দও আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে এল—থুপ্, থুপ্, থুপ্!

ভয়ে আর পিছনপানে চাইলুম না। কে জানে—কি দেখতে কি দেখব! প্রাণ-পণে জানলার গরাদেগুলো দুহাতে আঁকড়ে রইলুম।

দেখলুম, রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে একটা লোক যাচ্ছে সে আমার এত কাছে,—কিন্তু আমার মনে হোল, কাছে থেকেও সে যেন বহুদূরে! তার আর আমার মাঝখানে যেন প্রেতলোকের একটা অদৃশ্য যবনিকা পড়ে গেছে। তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে গেলুম—কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না।

আকাশের গায়ে উড়ন্ত তিমির-পিণ্ডের মত একটা প্যাঁচা, ভীষণ কর্কশ চীৎকারে মৌন নিশীথকে বিদীর্ণ করে' দিয়ে কোথায় উড়ে গেল। আমার প্রাণ যেন গলা-পর্য্যন্ত উঠে ধুক্‌ফুক্ করতে লাগল।

ঐযে—পথ দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে কারা আসচে না?—এ কি—কমলা আসছে? হ্যাঁ, তাইত—ঐযে, ওরা আমার বাড়ীর বাগানের ভিতর ঢুকল। আঃ—বাঁচলুম!

তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গেলুম—সঙ্গেসঙ্গে ঘরের একখানা 'বেণ্টউড' চেয়ার হড়্‌হড়্ করে' আমার দিকে সরে এল—তারপরেই পিছন থেকে কে-যেন আমার একখানা পা টেনে ধরেই ছেড়ে দিলে!... ... ... আমার পাদুটো ঠিক পাথরের মত হয়ে গেল, বুকের মধ্যে প্রাণটা যেন ধড়্‌ফড়্ করে আছ্‌ড়ে মরে' গেল—ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম।"

চন্দ্রনাথ গল্প থামাইয়া শ্রোতাদের মুখের দিকে চাহিল। বাহিরে তখনো ঝুরুঝুরু করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে—মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে জোলো হাওয়া ঢুকিয়া 'অ্যাল্‌ম্যানাকে'র ছবিগুলো দোলাইয়া দিয়া যাইতেছে। গল্পটাও রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের দেয়ালে কালো-কালো ছায়া ফেলিয়া শ্রোতারা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে রুদ্ধনিশ্বাসে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ গল্প বন্ধ হওয়াতে সকলে মহা উদ্বেগে, সাগ্রহে, সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর! তারপর!"

চন্দ্রনাথ গদাই-লস্করি চালে থামিয়া থামিয়া বলিল, "তারপর? তারপর—বুঝেছ কিনা—যা ঘটল, সে একেবারে—ওর নাম কি—অবর্ণনীয় ব্যাপার। আচ্ছা, আমার গল্পটি ক্রমপ্রকাশ্য হলেই ভাল হয় না কি? আজ ত কাটল,—আগামী বাদলে এটি সমাপ্য!"

—"না, না! শীগ্‌গির বল বল্‌চি! নইলে মুড়ি-ফুলুরির থালা কেড়ে নেব এখনি!"

—"স্বচ্ছন্দে। তোমরা বোধহয় জান যে, খালি থালা ভক্ষণ করা আমার অভ্যাস নেই—মুড়ি, ফুলুরি ইত্যাদি সমস্তই এখন আমার উদর-সিন্দুকে আবদ্ধ। তবে সবাই যখন এতই নাছোড়বান্দা, আমার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে আপত্তি নেই। শোন··· ··· ···

যখন জ্ঞান হোল, দেখলুম, শিয়রে হেঁট হয়ে কমলা আমার মাথায় জল ঢালছে—ঝী বাতাস করছে, চাকরটা লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জ্ঞান হোতে দেখে কমলা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে তোমার!"

আমি ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাইতে-চাইতে উঠে বস্‌লুম। তারপর বললুম, "কমলা, ঘরে কোন শব্দ-টব্দ হচ্ছে না? ভূতটা চলে গেছে ত?"

—"ভূত! ভূত কিগো?"

—"হ্যাঁ, ভয়ানক ভূত—দেখা যায় না অথচ শব্দ করে; মানুষ ধরে!"

—"ওমা, তুমি বল্‌ছ কি! স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ নাকি?"

—"স্বপ্নই বটে! এও যদি স্বপ্ন হয়, তবে আমি স্বপ্ন—তুমি স্বপ্ন—সবই স্বপ্ন!" —এই বলে কমলাকে একে-একে সব কথা খুলে বললুম।

সব বলা হয়ে গেলে মুখ তুলে দেখি, লণ্ঠনটা ফেলে চাকর, পাখাখানা ফেলে ঝী-মাগী সে মুল্লুক ছেড়ে সরে পড়েছে।

পরদিন ভোরবেলায় হঠাৎ চটুল হাসির কলরোলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে চোখ-কচ্‌লে চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে বসে কমলা মুখে কাপড় দিয়েও কোনমতে হাসি চাপতে পারছে না। হাসতে-হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

—"হয়েচে কি, অত হাসির ঘটা কেন?"

কমলা হাসতে-হাসতে হাত নেড়ে আমাকে সবুর করতে বল্‌লে;—অর্থাৎ, আগে সে প্রাণ ভরে হেসে নিক্, তারপর কথাবার্ত্তা। আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম।

তারপর হাসির ধূম যখন একটু কম্‌ল,

কমলা তখন উঠে, আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "গুণমণি, কালকের সে দুরন্ত ভূতটাকে, তদন্ত করে' আমি আজ এই ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করেচি!"

—"কি ?"

—"ভূত, মশাই, ভূত! যে ভূত দেখা যায় না অথচ শব্দ করে, মানুষ ধরে! এই দেখ!"

কমলার হাতে খানিকটা রেশমের সূতো!

—"ও ত দেখছি, সূতো!"

—"হুঁ, এ-টুকু তোমার ঐ 'আলবার্ট শ্লিপারে'র ভেতর থেকে আবিষ্কার করলুম।"

—"বেশ ত, হয়েছে কি ?"

—"ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখ। তাতেও যদি মশাই বুঝতে না পারেন, তবে আপনার গোঁফজোড়া আমাকে বাধ্য হয়ে কর্ত্তন করতে হবে।"

তাইত! ঘরের যেদিকে চাই—খালি দেখি কালো কালো রেশমের সূতো! দরজার কাছে, জানলার কাছে, টেবিলের চারিদিকে, চেয়ারের পায়ায়, সূতো—খালি রেশমের সূতো!

কমলা যা বল্লে, তার মর্ম্ম এই : নেমন্তন্নে যাবার সময় সূতোর বাণ্ডিলটা সে বিছানাতেই তাড়াতাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। আমার পা লেগে বা যেমন করে'ই হোক্—বাণ্ডিলটা বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে যায়, সেই সময়ে কোনগতিকে খানিকটা খোলা সূতো গিয়ে পড়ে আমার জুতোর ভিতরে। তারপর ঘরের আলোটা যায় নিবে। ভূতের গল্প পড়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় যখন আলো জ্বাল্‌তে নীচে নামি, তখন আমি সেই সূতো-সুদ্ধ জুতো পায়ে দি। কাজেই, যখনি আমি চল্‌তে গেছি, সেই পায়ে-আঁট্‌কানো বাণ্ডিল সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ করে' উঠেছে। এই হ'ল ভূত-দেখার প্রামাণিক ইতিহাস!

কমলার কথা অনেকক্ষণ ধরে ভেবে দেখলুম!

Circumstancial evidenceএ তার কথা সত্য বলে মেনে নিতে হয় বটে! কিন্তু কি-জান—বলা ত যায় না—

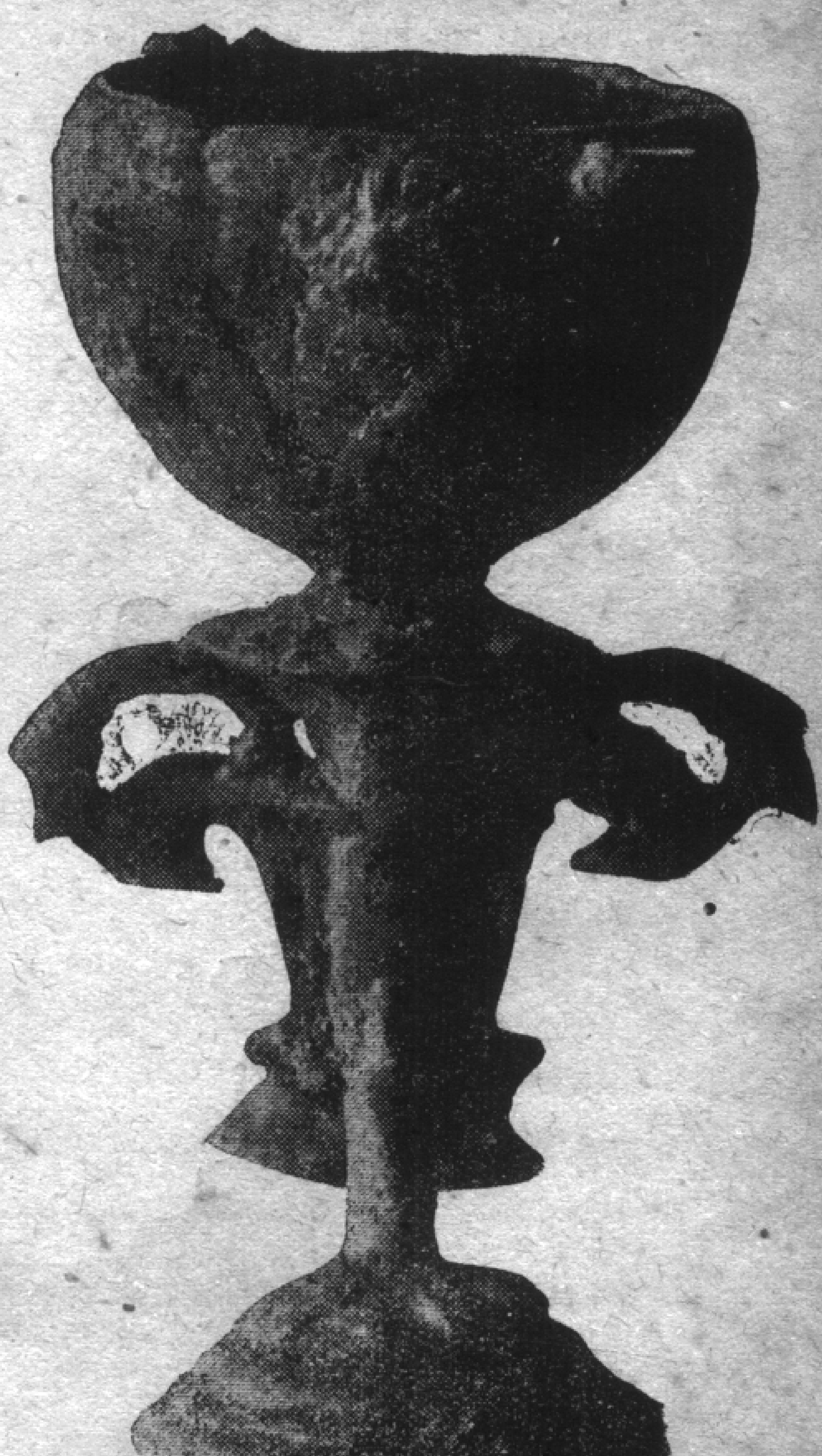
শ্রীঃ—

---

# পুরাতন পূজার সাজ

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে, অনেকে মুখে ও মাসিকপত্রে সমালোচনকালে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, উহা বাঙ্গালার ইতিহাসই হয় নাই, কারণ উহাতে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। অনেকে বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানি ইতিহাস-মূলক হইলেও উহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস নাম দেওয়া উচিত হয় নাই; Greenএর History of the English Peopleএর ন্যায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ যখন বাঙ্গালায় রচিত হইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে এতদিনে বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশিত

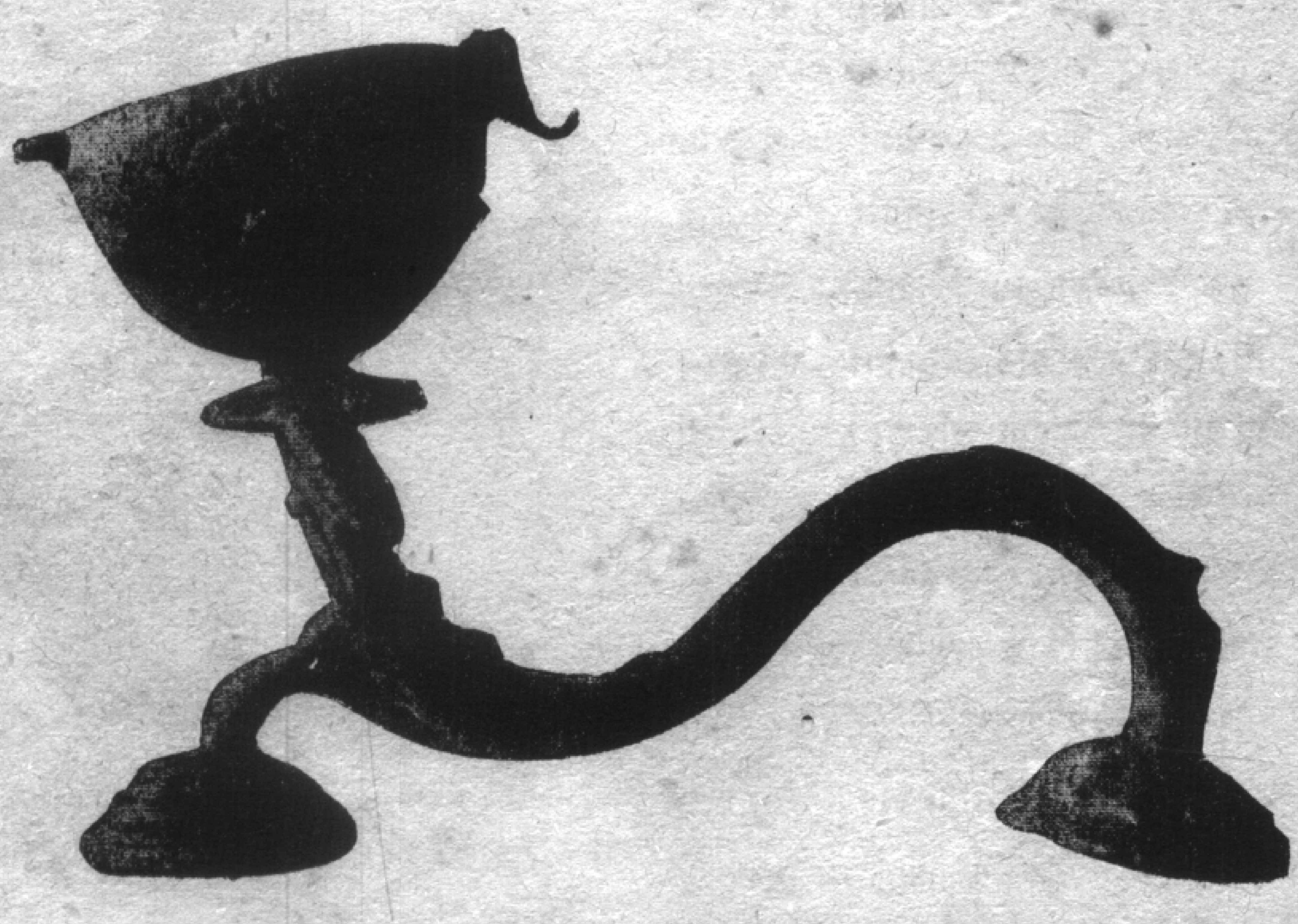
হইল। প্রাচীনযুগের বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস কখনও Greenএর ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণাবয়ব হইবে কিনা সন্দেহ। যে দেশের লিখিত ইতিহাস নাই, যে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহা অবলম্বনে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজনা করিতে হয়, কোনকালে সে দেশে Greenএর ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস কোনকালে ইংরাজ অথবা ফরাসী জাতির ইতিহাসের অথবা রোমক বা গ্রীক্ জাতির ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। আধুনিক ইংরাজ অথবা ফরাশী জাতির ও অধুনা-বিলুপ্ত প্রাচীন রোমক ও গ্রীক্ জাতির লিখিত ইতিহাস ছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে কেবল চীন ও জাপান দেশের লিখিত প্রাচীন ইতিহাস আছে। প্রাচীন মিশর অথবা বাবিরুষের ( Babylon ) লিখিত ইতিহাস নাই। খোদিত লিপি, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি অবলম্বনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ যোজনা করিয়া, এই সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কঙ্কাল একত্র হইয়াছে। প্রাচীন ভারত অথবা প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস এইরূপে রচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইলে যে দেশে যত অধিক উপাদান পাওয়া যায় সেই-দেশে প্রাচীন ইতিহাস তত সম্পূর্ণাবয়ব হয়। মিশরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাবিরুষে কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপাদান পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য প্রাচীন মিশরের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণাবয়ব ও বাবিরুষের ইতিহাস কিঞ্চিৎ অবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন ইতিহাস-রচনার উপাদান অতীব দুষ্প্রাপ্য, যাহা পাওয়া যায় তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, এইজন্য প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস কঙ্কালসার রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস-রচনার যে উপাদান পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না এবং বিশ্বাসযোগ্য হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায় না; কারণ সাহিত্যের



কর্পূরদান—সম্মুখ

প্রমাণ কোন্ যুগের ইতিহাস-রচনায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা যায় না। ইতিহাসের কঙ্কাল সম্পূর্ণাবয়ব করিতে হইলে প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করা আবশ্যক। এখন বাঙ্গালা দেশে সামাজিক ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝায় তাহা বলিতেছি না। কুলশাস্ত্র অবলম্বনে মেলবন্ধন, পটি-বন্ধন, সমীকরণ প্রভৃতি কৌলীন্য ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের বিবাহ-সম্বন্ধীয় অধ্যায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস বলিলে মানুষের আচার, ব্যবহার, জাতকর্ম্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, রীতি-নীতি, ব্যবসায় ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বুঝায়। আমাদিগের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে ইহার অনেক উপাদান আছে বটে, কিন্তু তারিখ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া এই সমস্ত উপাদান ইতিহাস-রচনা কালে ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

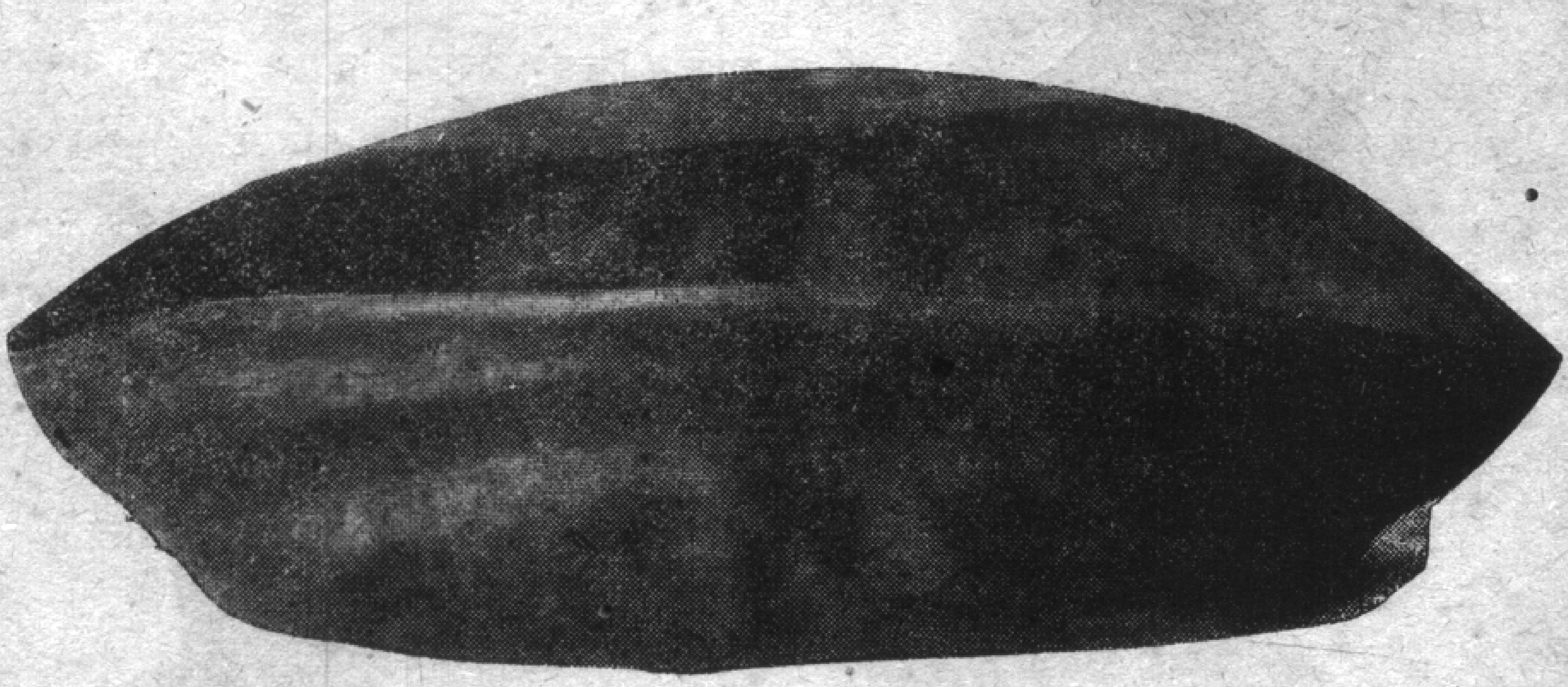
প্রাচীন মিশর অথবা বাবিরুষে সমাধি-স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন যুগের তৈজস-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে মৃতদেহ সমাহিত হয় না এবং মৃতদেহের সহিত তৈজসপত্রও রক্ষিত হইত না। সেই জন্য প্রাচীন ভারতের তৈজসপত্রের বিবরণ অদ্যাবধি কোনও ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের তৈজস-পত্রের কি প্রভেদ তাহাও নির্ণীত হয় নাই। মৃত্তিকা-খননকালে ভারতবর্ষের নানাস্থানে পুরাতন তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে কিন্তু কাল-নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে নৈহাটি গ্রামে একখানি তাম্রশাসন ও কতকগুলি প্রাচীন তৈজস-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনখানি বাঙ্গালার সেনবংশের রাজা বল্লাল-সেনের,



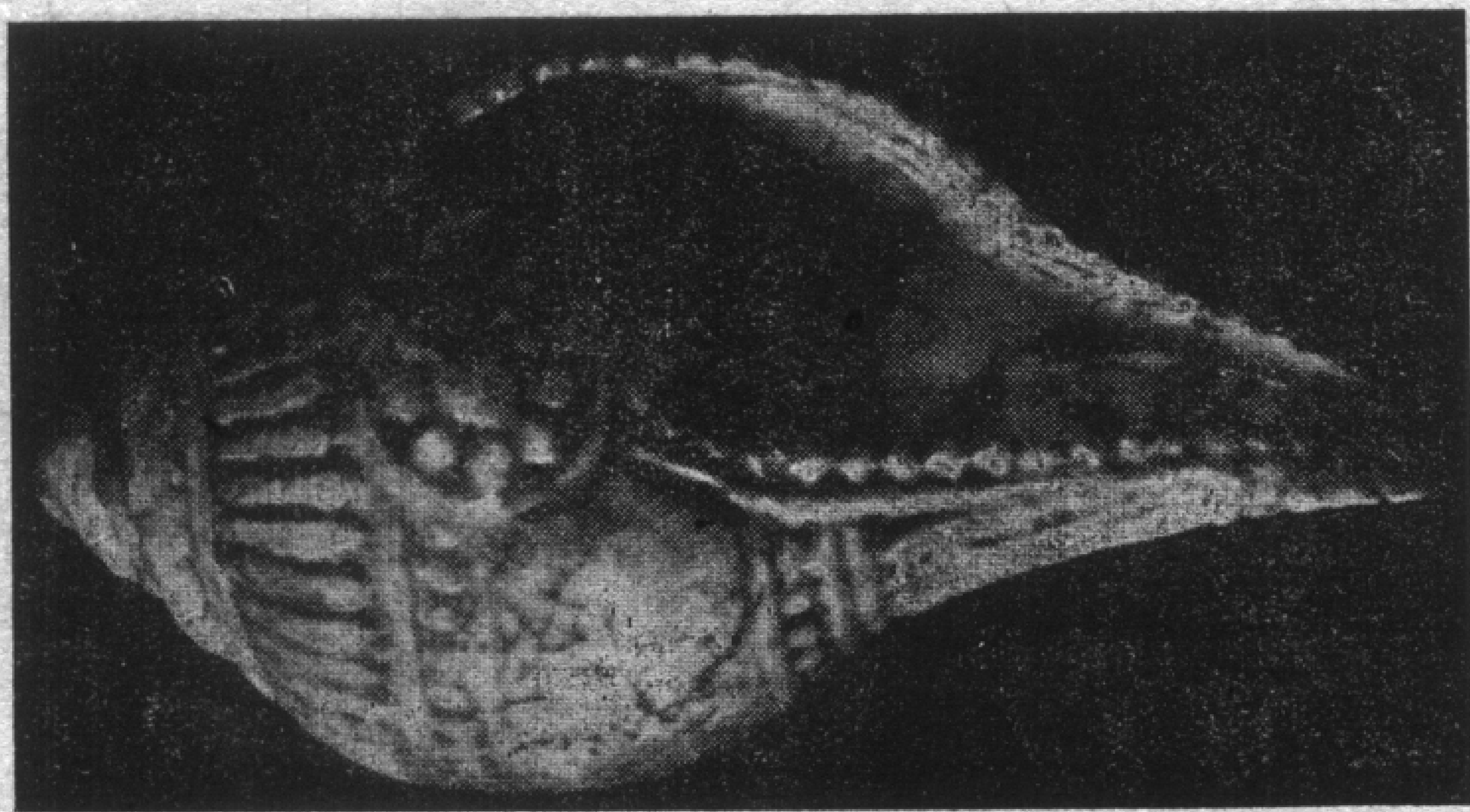
কর্পূরদান—পার্শ্ব

ইহার উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা"য় ও "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। যেস্থানে এই তাম্রশাসন ও তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নৈহাটি ও সীতাহাটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং কৃষক-সমাজে "নৈরাজার ভিটা" বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে আবিষ্কৃত তৈজসগুলি পুরাতন পূজার সাজ। তাম্রশাসনের সহিত একটি তাম্রকুণ্ড, তিনটি পানিশঙ্খ, চারিটি পিতলের পানিশঙ্খের আধার ও একটি গন্ধাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাটোয়ার তাৎকালীন হাকিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এ, তাম্রশাসনখানি ও তৈজসগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার চিত্রশালায় প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাম্রশাসনের সহিত অনেকগুলি সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, "নৈরাজার ভিটা" একটি প্রাচীন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে যে তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাম্রশাসনের সহিত আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান হয় যে, সেগুলি বল্লালসেনের সমসাময়িক। বল্লালসেন দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ ১১১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অতএব ১১১৭ বা ১১১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

"নৈরাজার ভিটা"য় আবিষ্কৃত তাম্রকুণ্ড-খানি বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে, তথাপি ইহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন যে আকারের তাম্রকুণ্ড ব্যবহৃত হইত, এখনও সেইরূপ তাম্রকুণ্ড ব্যবহৃত হয়। পানিশঙ্খ তিনটির মধ্যে একটি কারুকার্য্যশোভিত, ঢাকায় নির্ম্মিত পানিশঙ্খে এইরূপ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তলনির্ম্মিত পানি-শঙ্খের আধার চারিটি পানিশঙ্খের আধার কিম্বা শালগ্রাম শিলা বসাইবার টাট্ তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। তবে



তাম্রকুণ্ড



পানিশঙ্খ



পানিশঙ্খের আধার

আবিষ্কৃত পানিশঙ্খ তিনটি, ইহার তিনটি আধারে, জলপূর্ণ করিয়া বসাইলে, স্থির থাকে। অবশিষ্ট তৈজসটি নূতন ধরণের, এই জাতীয় তৈজসের চিত্র বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত প্রস্তর-মূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার ভোগেল ( Dr. J. Ph. Vogel ) মাদ্রাজে কর্ণুল জেলায় মামল্যদেবের মন্দিরে এই জাতীয় তৈজস বর্ত্তমান কালে পূজায় ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইহা গন্ধাধার, ইহাতে আরত্রিকের সময়ে কর্পূর দগ্ধ হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালাদেশে কোনও কোন স্থানে এই জাতীয় তৈজস এখনও ব্যবহৃত হয়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

# রূপসী

## পাত্র ও পাত্রী

| | |
|---|---|
| নিরঞ্জন | ... মান্দার-দুর্গাধিপতি |
| রূপসী | ... নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী |
| আর্য্যধন | ... নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা |
| দেবল<br>কহ্লন | নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ |
| বরাট | ... মোগল-সেনাপতি |

## তৃতীয় অঙ্ক

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

নিরঞ্জন, আর্য্যধন, দেবল ও কহ্লনের প্রবেশ

নিরঞ্জন

আর নয়। তোমাদের সকলের কথাই রেখেছি আমি, অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। কারো মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সকলের তৃপ্তি সাধন করেছি! নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম—ডাকাতে বাড়ী লুঠছে দেখে কাপুরুষ গৃহস্বামী যেমন এককোণে লুকিয়ে থাকে—তেমনি আমি নিজেকে এককোণে জোর করে লুকিয়ে রেখেছিলুম! আমার ঘর লুঠ হয়ে গেল, তবু একটা নিশ্বাস অবধি পড়তে দিই নি··· আমার এত বড় অসম্মানেও আমি ধৈর্য্য হারাইনি, মাথা খাড়া রেখেছিলুম। তোমরা আমার সে স্তব্ধতার চূড়ান্ত মূল্য আদায় করেছ! আমার সম্মানের মূল্যে আপনাদের তুচ্ছ উদর-পূর্ত্তির অন্ন কিনেছ···আমি কোন কথা কইনি, কোন বাধা দিইনি। এখন সর্ত্ত রক্ষা হয়েছে, তোমরা উদর পূর্ণ করেছ—চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছ! ব্যস্! এধারে রাত্রি কেটে গেছে, প্রভাত হয়েছে,—আমারও পা থেকে চুক্তির শৃঙ্খল খসে গেছে! আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন,—নিজেকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি! গা থেকে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে আবার আমি উঠে দাঁড়িয়েছি!

আর্য্যধন

তোমার এ দুঃখ সীমাহীন—এ দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, পুত্র... সান্ত্বনার কথা তোমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধবে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও আমি করছি না। তবু মনে রেখো পুত্র, তোমার মান্দার বড় বিপদ থেকে আজ পরিত্রাণ পেয়েছে। এর জন্য লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আছে, তোমার মুখের পানে আমরা চাইতে পারছি না। তবু...শোনো পুত্র, যদি কোন দিন বুঝে থাকো, আমি তোমায় ভালবেসেছি, সকলের চেয়ে সব-জিনিসের চেয়ে ভালবেসেছি, আমার প্রাণাধিক তুমি, গৌরব তুমি—তাহলে আমার একটা অনুরোধ রেখো—ক্রোধের বশে মন যখন তপ্ত, বিষাদে যখন সে মূর্চ্ছিত, তখন সেই মন দিয়ে আমার মার বিচার করো না তুমি। ...এই রাগ যখন শীতল হয়ে যাবে, বিষাদ কেটে যাবে, মন শান্ত হবে,—তখন তুমি এ ব্যাপারটাকে আর-এক মূর্ত্তিতে দেখবে ...মা আমার এখনই ফিরে আসবে। আজ তার বিচার করো না পুত্র—কোন

রূঢ় কথা বলো না। এ সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তোমার একটা তপ্ত শ্বাস প্রলয় ঘটিয়ে তুলতে পারে!...শান্ত হয়ে তার বিচার করো। যদি বোঝো, সে শক্তি তোমার আজ নেই, তাহলে তার সঙ্গে দেখাও করো না।...মানুষ কতকগুলো দুর্দ্দম শক্তির খেলনা বৈ ত নয়, সে শক্তিগুলো যতক্ষণ জেগে থাকে, মানুষ ততক্ষণ বুঝতে পারে না, তার বুকের মধ্যে কতখানি মহত্ত্ব, কতখানি সুবিচার, বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা পাথারের মত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে!...সেই শান্ত মুহূর্ত্তে আমার মার পানে চেয়ে দেখো পুত্র, দেখবে, মনে তোমার এতটুকু ঘৃণা হবে না, ক্রোধ মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না। এক অপূর্ব্ব অসীম ভালবাসায় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে!

নিরঞ্জন

বক্তব্য তোমার শেষ হয়েছে, বৃদ্ধ? আর ও-সব বাক্যচ্ছটার প্রয়োজন নেই—তোমাদের দিন কেটে গেছে—এখন আমার দিন এসেছে। তোমরা উদর ভরে আহার সংগ্রহ করেছ, কড়ায়-গণ্ডায় আমি তার মূল্য দিয়েছি। ব্যস্—দেনা-পাওনার সম্পর্ক চুকে গেছে।...তবু আমি ভাবছিলুম, এখনো তোমার কি বক্তব্য থাকতে পারে! তাই স্থির হয়ে সব শুনছিলুম। আশ্চর্য্য, এখনো সেই এক কথা,—ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর, ক্ষমা কর—! সেই সনাতন যুগ থেকে এই উপদেশ বকে বকে মানুষ এখনো তা বক্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে! যেন মানুষ একটা যন্ত্র—শুধু পরের হাতে দম খেয়েই সে চলবে—নিজের তার কিছু নেই! তার ইচ্ছা...থাক্, আমি বেশী কথার ধার ধারি না। স্পষ্ট করে সহজ ভাষায় বলি, শোনো, আমি কি করব, তা স্থির করেছি। একটা পাষণ্ড দস্যু আমার রূপসীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেছে—যতক্ষণ সে এ পৃথিবীতে আছে, ততক্ষণ রূপসীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই! হয় সে, নয় আমি, এক জনকে দুনিয়া থেকে সরতেই হবে। বুঝলে? আর আমি যে মূল্য দিয়েছি, তার বিনিময়ে আমি কি চাই, জানো?...মান্দার আমার সম্মানের মূল্যে এই যে আহার পেয়েছে, সেই আহারে সে আজ বলিষ্ঠ সবল হয়ে উঠেছে। তার নির্জ্জীব হাতে আবার সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। এখন মান্দার আমার সম্মানের মূল্য দিতে বাধ্য—আজ থেকে মান্দারের সমস্ত প্রাণী আমার ক্রীতদাস। আমি তাদের নিজের সম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছি। মান্দারের প্রতি আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, এখন মান্দার আমার প্রতি তার কর্ত্তব্য করুক! এই সমস্ত প্রাণী আমার ইঙ্গিতে আজ চলা-ফেরা করবে। আর রূপসী? তাকে আমি ক্ষমা করব—সে বুদ্ধিহীনা দুর্ব্বল নারী! কিন্তু সে পাষণ্ড বেঁচে থাকতে এ ক্ষমা পাবে না সে!...জানি, সে প্রতারিত হয়েছে, কতকগুলো স্বার্থপর বাক্‌পটু লোকের কথার ফাঁদে পা দিয়ে বিপন্ন হয়েছে। তবুও সে এতে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে।...তার এই সাধুতা, এই মহত্ত্ব এমনভাবে কাজে খাটাতে মান্দার এতটুকু লজ্জা বোধ করলে না? প্রাণটা তার কাছে বেশী দামী হল? আশ্চর্য্য! যাক্, যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়!...

ভুলব ? অসম্ভব ! মানুষ এ কি ভুলতে পারে কখনো ?...কিন্তু সেই পাষণ্ড—আর তুমি —আমার পিতা... জেনো, একটা মহৎ উদার প্রাণকে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত করে দিয়েছ—তার ফলও মান্দার দেখবে ! তোমায় শাস্তি নিতে হবে। আমি তোমায় ঘৃণা করি। খুব ঘৃণা—কোন পুত্র পিতাকে কখনো তেমন ঘৃণা করে নি—পিতাকে তেমন অভিশম্পাৎ কখনো দেয়নি—

আর্য্যধন

তাই কর, আমায় ঘৃণা কর পুত্র, অভিশম্পাৎ দাও—কিন্তু আমার মাকে মার্জ্জনা করো।...সমস্ত দেশকে আমার মাই আজ প্রাণ দিয়েছে—জগতে যদিও সে সুবিচার না পায়, জেনো, আর এক জগৎ আছে, সেখানে সোনার অক্ষরে মার এই কীর্ত্তি-কথা তারা লিখে রেখেছে, তারা এর সুবিচার করবে।...আমি মুখের কথায় অনুমতি দিয়েছি মাত্র। অনুমতি দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তা পালন করা—তাতে অসাধারণ শক্তি আছে, পুত্র !...আজ তুমি যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাও আমার সহ্য হবে। সহ্য হবে এই জন্য যে আমার মা—আমার মা আমায় অতুল গৌরব দান করেছে ! মার কৃপায় আমি স্বর্গ দেখেছি !... তোমার কোন দোষ নেই, পুত্র। তুমি আমায় ত্যাগ করলে, যে কদিন আমার এ দেহে প্রাণ আছে, জেনো, আমি তোমার মঙ্গলই কামনা করব। তোমার কোন অপরাধ নেই। তোমার মত বয়সে আমিও হয়ত এই রকম বিচার করতুম, পুত্র। আমি যাচ্ছি, আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু যাবার সময় আবার অনুরোধ করি, পুত্র, আমার মাকে কঠিন কথা বলো না, তিরস্কার করো না, তাকে ক্ষমা করো। তোমার ক্রোধের বহ্নি আমারই মাথায় তুমি নিঃশেষে নিক্ষেপ কর, করে শান্ত হও। এর একটি স্ফুলিঙ্গও তোমার বুকে লুকিয়ে রেখো না।... মনে রেখো পুত্র, ক্রোধ এখানে শুধু ক্ষণিক আস্ফালন করে, সে বড় ক্ষণিকের। ক্ষমা শান্ত প্রকৃতির নির্ম্মল হাসির মতই মানুষের বুক ভরে পড়ে আছে। ক্রোধের ক্ষণিক গর্জ্জনে ভীতা হয়ে প্রকৃতির সে হাসি মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু বুক ছেড়ে পালায় না। মানুষ তাই মানুষের পাশে এতকাল নিরস্ত্র হয়েও শুধু সেই গভীর বিশ্বাসেই হেসে-খেলে বেঁচে আছে !...আমি তোমার সমস্ত অকরুণা, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা নিয়ে চলে যাচ্ছি, পুত্র, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে ! পিতা হয়ে প্রার্থনা করছি, আমায় নিরাশ করো না—মনে আমার শুধু একটি সাধ আছে, যাবার পূর্ব্বে একবার আমায় দেখতে দাও,—মা আমার ফিরে আসছে, এখনই এসে পৌঁছুবে ! এলে তার দুই হাত ধরে তাকে তোমার বুকে তুলে নাও। সে দৃশ্য দেখে তখনি আমি চলে যাব, হাসি-মুখে যাব। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, পুত্র, তোমার এ বিচার বেশী আর-কি দুঃখ দেবে ? দুঃখের ভারে ঘাড় আমার নুয়ে পড়েছে, না হয় আর-একটু নুইবে, না হয় এ ঘাড় সে দুঃখের ভারে ভেঙ্গে যাবে ! তাতে আমি কাতর হব না পুত্র কিন্তু দেখো, আমার মাকে যেন একবিন্দু দুঃখ না স্পর্শ করে...তার মুখের হাসিটুকু যেন অটুট থাকে !

[ অদূরে অস্পষ্ট কোলাহল শ্রুত হইল ;

ক্রমে সে কোলাহল স্পষ্টতর হইলে শুনা গেল, অসংখ্য কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিতেছে,

"জয় মাতাজীর জয়"

"জয় রূপসী-রাণীর জয় —" ]

ঐ, ঐ মা আমার আসছে। কৃতজ্ঞ মান্দার মহা-উল্লাসে ঐ জয়-ধ্বনি করছে। এ কি মূর্চ্ছা? এ কি সুপ্তি? না, না, ভগবান, ভগবান...আমায় আর-খানিক বাঁচিয়ে রাখো, চেতন-হারা করো না!

দেবল ও কহ্লন বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল

দেখতে পাচ্ছ! ঐ—ঐ কাতারে-কাতারে সব দাঁড়িয়ে আছে, দলে-দলে সব লোক ছুটেছে! মান্দারের পথ-ঘাট নর-মুণ্ডে ভরে গেছে। গাছের ডালে, চারিধারে—শুধু মানুষের মাথা! কিন্তু আমার মা—আমার মা কৈ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃদ্ধ, দৃষ্টি আমার ক্ষীণ, তার উপর অশ্রু এসে সে ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুকেও রোধ করছে! কৈ, কৈ—আমার মা কৈ? যাই, যাই, আমি নেমে যাই—

দেবল

(আর্য্যধনকে ধরিয়া) না, যাবেন না। মান্দার উন্মত্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় অধীর মান্দার—তার পায়ের তলায় পড়ে আপনি পিষে চূর্ণ হয়ে যাবেন।...ঐ, ঐ রাণী আসছেন, মান্দারের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসিমুখে রাণী আসছেন...

আর্য্যধন

হাসিমুখে! হাঁ, ঠিক দেখেছ, তাহলে—হাসিমুখ! ঠিক! এই ত আমার মার মুখ। জয়ের হাসি-ভরা,—বড় গৌরবের হাসি এ! আজ বার্দ্ধক্যে আমার ক্ষোভ হচ্ছে! যদি সে শক্তি থাকত, যদি এ বাহুতে সে বল—মাকে আমার এ পথটুকু চলবার কষ্ট দিতে পারতুম না, কোলে তুলে নিয়ে আসতুম! তোমরা ব-, বল, মার মুখে সত্যাই হাসি দেখছ? বল, বল, মার মুখে দীপ্তি দেখতে পাচ্ছ? বিজয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি?

কহ্লন

অপূর্ব্ব রশ্মিতে মুখখানি উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত!...সারা পথে যেন আলো ছড়িয়ে আসছেন—

দেবল

কিন্তু ও কে? ঠিক-পিছনে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আসছে, নত শিরে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে?

কহ্লন

জানি না। অপরিচিত মুখ! বেশ-ভূষাও—

[ নেপথ্যে আবার জয়ধ্বনি উঠিল ]

আর্য্যধন

ঐ আবার সকলে জয়ধ্বনি করছে! কাছে এসেছে!...সমস্ত প্রাসাদ না এই কেঁপে উঠল? ঠিক। ওদেরই জয়-ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে! দেওয়ালগুলো, প্রাসাদের এ মূক দেওয়ালগুলো যেন উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে! এই দেখ, আমার পায়ের তলায় মেঝেটা অবধি তালে-তালে নেচে উঠছে! আনন্দ, ওরে, চারিধারে মা আমার অধীর আনন্দ ছড়িয়ে আসছে। সত্যই ত, পথে যেন আলোর হিল্লোল ছুটেছে...

দেবল

মান্দারের পুরনারীরাও পথে বেরিয়েছে। মা ছেলে কোলে করে, তরুণী দ্বিধা-ভয়

দূরে ঠেলে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতায়ন থেকে বধূরা ফুল ছুড়ে দিচ্ছে, মালা ছড়াচ্ছে, লাজ বর্ষণ করছে ঐ যে গলা থেকে মোতির মালা ফেলে দিচ্ছে! ফুলের পাপড়িতে পথ ভরে গেছে ··প্রাসাদের কাছে সব এসে পড়েছে। মান্দার সত্যই আজ উন্মত্ত হয়েছে। মান্দারের এ মূর্ত্তি ত কখনো চোখে দেখিনি! কৃতজ্ঞ মান্দার। না, না—এ যে বন্যার মত জনস্রোত ছুটে আসছে—প্রাসাদ-দ্বারে রক্ষীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল স্রোত রুখে রাখতে হবে। প্রাসাদে ঢুকলে প্রাসাদ চুরমার হয়ে যাবে। যাই, আমি যাই, প্রাসাদ-দ্বার বন্ধ করতে আদেশ দিইগে—এ উন্মাদের দলকে ভিতরে আসতে দেওয়া হবে না!

আর্য্যধন

আহা, না,—আসুক, আসুক! ওদের প্রাণে বড় উল্লাস মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ অজস্র ফুল ফুটেছে—কঠিন বুক সব কোমল হয়ে গেছে! বড় দুঃখ পেয়েছে...বেচারা মান্দার! তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের এ উচ্ছ্বাস রোধ করো না। মুক্তি এসেছে আজ, মুক্তি—প্রাচীর তুলে এ মুক্তিকে আর রুদ্ধ করো না। ওরে আমার সাহসী বীরের দল,—তোরা কণ্ঠ ভরে যে আনন্দ-সুধা আজ পান করেছিস, সে বড় মধুর সুধা রে, বড় মধুর! কর্, জয়ধ্বনি কর্, মধুর সুরে সব জয়ধ্বনি কর্! আমার জীর্ণ কণ্ঠ! তোদের সঙ্গে সুর মেলাতে পাচ্ছি না—দুঃখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ছি। আমার সাধ হচ্ছে, তোদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মার জয়ধ্বনি তুলি, গগন ফেটে যাক—গগনের বুক থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হোক!...মা, মা—আমার মা—ঐ না, ঐ না প্রাসাদ-সোপানে মার চরণ-পদ্ম ফুটে উঠেছে? আয় মা, তোর সন্তানের বুকে আয় - ( ছুটিয়া গমনোদ্যত ; দেবল ও কহ্লন আর্য্যধনকে ধরিয়া রাখিল ) ওরে, আমায় ধরে রেখেছে এরা ধরে রেখেছে—আমার এ আনন্দে ওরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আয় মা, আয়, আয়,—স্বর্গের সুষমা তোর সারা অঙ্গে আজ কি লাবণ্য যে ফুটিয়ে তুলেছে! আমার বড়-সুন্দর মা—আমার পুণ্যচরিত মা—আয় মা—( কক্ষ-মধ্যস্থ পুষ্পাধার হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া ছিঁড়িয়া পুষ্পদল ছড়াইতে ছড়াইতে ) আয় মা, এই সুগন্ধি ফুলের দলে তোর পা রাখবি আয়—তোর ঐ ফুলের মত সুন্দর কোমল পা দুখানি দিয়ে···

রূপসীর প্রবেশ ; পশ্চাতে নতশিরে বরাট ও নাগরিকগণ

রূপসী

বাবা—

আর্য্যধন

এসেছিস্, মা আমার এসেছিস্! আয় ( রূপসীকে বুকে ধরিয়া ) ছেলের বুকে ফিরে আয় মা! দাঁড়া, স্থির হয়ে দাঁড়া, একবার তোর পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে চেয়ে দেখি। তোর মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দৃষ্টির শেষ কিরণটুকুও যদি আজ মিলিয়ে যায় ত তাতে কোন ক্ষোভ থাকবে না! অশ্রু আমার দৃষ্টি রোধ করছে মা, তবু সেই অশ্রুর মধ্য দিয়েও আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমার মা—আমার মার কত রূপ, কত মাধুরী! আমার

মার মুখে কি স্বর্গীয় দীপ্তি! তারা ত এ দীপ্তি কৈ এতটুকু কেড়ে নিতে পারেনি—ঐ চোখে তোর সেই হাজার চাঁদের আলো, ঐ ঠোঁটে তোর সেই শুভ্র অমল হাসি তেমনি আছে, ঠিক তেমনি!

রূপসী

বাবা—(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) কৈ? কৈ?...আমি যে সকলের সামনে সব কথা বলতে চাই, বাবা। প্রথমেই—

আর্য্যধন

নিরঞ্জন! ঐ যে তোমার স্বামী, ঐ সে। আমার আজ সে বিচার করেছে মা, বিচার শেষ হয়েছে, দণ্ড দিয়েছে আমাকে! কিন্তু তোর প্রতি সুবিচারই করবে! এত বড় মহত্ত্ব! বর্ব্বরেরও মাথা যে তার সামনে নত হয়ে পড়ে!...এত বড় ব্রত উদ্‌যাপন করে এলে, যাও মা, তোমার স্বামীকে প্রণাম কর—

(রূপসী নিরঞ্জনকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে নিরঞ্জন বাধা দিল)

নিরঞ্জন

রূপসী—(নাগরিকগণের প্রতি) যাও তোমরা। এ ঠিক তামাসা হচ্ছে না যে দাঁড়িয়ে দেখবে সব! যাও—

রূপসী

না, না, থাকুক, সকলে থাকুক—সকলে শুনুক—সকলকেই বলব আমি! তুমিও শোনো (নিরঞ্জনের কাছে আসিল)

নিরঞ্জন

না, সরে যাও, আমায় স্পর্শ করো না, রূপসী। (নাগরিকগণের দিকে অগ্রসর হইয়া) তোরা শুনতে পাচ্ছিস না? দূর হ কাপুরুষের দল, তোরা চলে যা! নিজেদের গৃহে তোরা যা-খুসি তাই করতে পারিস, কিন্তু এখানে এ আমার বন্দী, এখানে আমি প্রভু—আমার আদেশ করবার শক্তি আছে, তোরা চলে যা। দেবল, কহ্লন, প্রহরীদের ডাকো—যারা না যাবে, তাদের স্পর্দ্ধার শাস্তি দাও! মান্দার আহার পেয়েছে, চুকে গেছে। যাও, সকলে চলে যাও। (জনতা অস্পষ্ট কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল) কেউ এখানে থাকবে না, কেউ না! (আর্য্যধনকে ধরিয়া) তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে বৃদ্ধ? তুমিও যাবে—তোমাকেও যেতে হবে। যাও—তুমিও ঐ বর্ব্বর মান্দারের একজন—তোমার অপরাধ সব-চেয়ে বেশী, তুমি যাও। তুমি আমার চোখের জল দেখে আনন্দ করবে, ভেবেছ? না, তা হবে না—লোকের নিশ্বাস আমার সহ্য হচ্ছে না। কলুষিত নিশ্বাস! কেউ এখানে থাকবে না—যাও। (বরাটকে দেখিয়া) তুই—তুই কে? মাথা নীচু করে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছিস্—কে তুই, বল্। কথা ক'। তুই কি প্রেত না, ছায়ামূর্ত্তি—কে তুই? এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কোন্ স্পর্দ্ধায়? এখনো নড়লি না? ভেবেছিস্, আমার হাতে অস্ত্র নেই? (তরবারি টানিয়া) দেখেছিস্, যদি প্রাণের মায়া থাকে, এই দণ্ডে দূর হ! কি, হাত তুলছিস্? তরবারির আঘাত তুই রোধ করবি? বাতুল তুই—জানিস্, এ তরবারি কত বীরের রক্ত পান করেছে? ... ... না, তোর অঙ্গে এ তরবারি আঘাত করব না!...এখনো নড়লি না? মাথা

তোল্ বর্ব্বর। এখানে ভেল্কি দেখাতে এসেছিস্! জবাব দে। এখনো জবাব দিলি না? কে তুই? বল্—

(বরাটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখে বাঁধা বস্ত্র-খণ্ড টানিয়া সরাইল; রূপসী ছুটিয়া আসিয়া দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিরঞ্জনকে সরাইয়া দিল)

রূপসী

না, ওকে স্পর্শ করো না তুমি ...

নিরঞ্জন

এ কি রূপসী! আমি বিস্মিত হচ্ছি—এত শক্তি তুমি কোথায় পেলে?

রূপসী

এ আমায় রক্ষা করেছে।

নিরঞ্জন

এ রক্ষা করেছে! কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, রূপসী! মহৎ কাজ করেছে ও, সন্দেহ নেই...কিন্তু—

রূপসী

শোনো, তোমায় মিনতি কচ্ছি, একটা কথা শোনো। এ আমায় শুধু রক্ষা করেনি, আমায় বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছে, বিপুল গৌরব দিয়েছে, পুরুষের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছে, প্রভু!·· এখন এখানে আমার আশ্রিত হয়ে এসেছে ও, আমি ওকে কথা দিয়েছি, কেউ ওর কেশাগ্রও এখানে স্পর্শ করবে না। তুমি অবধি না...রাগ করছ? কর, কিন্তু আমার একটা কথা শোনো—

নিরঞ্জন

কে এ—আমি জানতে চাই।

রূপসী

এ বরাট।

নিরঞ্জন

কে! কি বললে!··· এই সে—যাকে আমি খুঁজছি, এই সে বরাট?

রূপসী

হাঁ, এই সে। বরাট। তোমার অতিথি আজ, আমার আশ্রিত। তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করতে এখানে এসেছে। এই বরাটই আমায় দারুণ কলঙ্ক, দারুণ অপমান থেকে রক্ষা করেছে!

নিরঞ্জন

(মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, পরে) হাঁ, এই-বারে বুঝেছি সব।... এই ত আমার রূপসীর যোগ্য কাজ! রূপসী, সহধর্ম্মিণী আমার—বেশ করেছ। পতির ব্রতে আজ তুমি বড় সাহায্য করেছ সতী, ঠিক কাজ করেছ!··· তোমার কৌশল এখন বুঝেছি আমি! দুরাত্মাকে ছলে ভুলিয়ে এখানে টেনে এনেছ! বাঃ, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি, রূপসী ... দুর্ব্বল নারী আত্মহত্যা করে; সেটা দুর্ব্বলতা, পাপ! তাতে কোন লাভও নেই ... ক্ষতি—ঋণ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তুমি! উচিত কাজ করেছ···কি জয়ের আভাস পাচ্ছি আমি ... (হাস্য) তোমার পিছনে পিছনে পোষা কুকুরের মত চলে এল!... মুর্খ, এত সহজে ফাঁদে পা দিলে! আশ্চর্য্য! নিরাশ্রয় একা ওকে গোপনে শিবিরে মেরে ফেললে কি হত? কিছু না। এখানে কে জানত? কেউ না। তোমারও কোন্ গৌরব হত না—লোকের

মনে সন্দেহের ছায়া থেকে যেত। আর এখন? চমৎকার হয়েছে! বাঃ—সবাই এখন জানবে, সবাই এখন বুঝবে, নারীর বল কত অসীম, বুদ্ধি তার কত গভীর! না, ওদের ডাকি—সকলকে ডাকি—সকলে এসে দেখুক, নিজের চোখে তোমার গৌরব দেখুক—দেখে মাটির কীট সব ধন্য হয়ে যাক—দেখে কৃতার্থ হোক্! (বাতায়নের ধারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এসো, সকলে এসো এখানে। বরাট—বরাট আমাদের কবলে এসে উপস্থিত। আমাদের শত্রু, মান্দারের শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু! সেই বরাটকে আমাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি আজ। এসো সকলে।

রূপসী

(নিরঞ্জনকে ধরিয়া) ও কি করছ তুমি? না, না—তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? শোনো, শোনো—

নিরঞ্জন

(রূপসীকে হঠাইয়া) না,—কোন কথা শুনব না, কোন কথা শুনতে চাই না আর! বরাট, বরাটকে পেয়েছি আমি। এসো, সকলে এসো, আমার বৃদ্ধ পিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। বড় আনন্দ—বড় সমারোহ আজ! সকলে আজ রূপসীর জয়ধ্বনি কর—আমিও তোমাদের সুরে সুর মেলাই।

(জনতার প্রবেশ; সঙ্গে আর্য্যধন প্রভৃতি)

বিচার আছে—ভগবান আছে! কে বলে, নেই? মূর্খ সে, পাগল সে!... আমি ভেবেছিলুম, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর তার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে! তার জন্য কত নগর, কত বন চুঁড়তে হবে, কত দিতে হবে—কিন্তু না, কিছু না, এত সহজে বরাটকে পেলুম! ওঃ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না... কিন্তু না, কেন, অবিশ্বাস কেন? ঐ যে, ঐ বরাট—(আর্য্যধনকে ধরিয়া) দেখচ বৃদ্ধ, তোমার বন্ধু বরাটকে দেখচ?

আর্য্যধন

হাঁ। এই বরাট—

নিরঞ্জন

এই বরাট! দেখ, চিনতে পারছ ত?

আর্য্যধন

হঁা, বরাটই।

নিরঞ্জন

হাঁ, সে-ই। চেয়ে দেখ, কোন ভুল নয়—কোন সন্দেহ নেই!...দেখ, আরও কাছে এসে দেখ, স্পর্শ করে দেখ। হয়ত নতুন কোন সংবাদ থাকতে পারে। —হাঃ-হাঃ! আর সে উদ্ধত শির নেই, উজ্জ্বল বেশ নেই—তবু এতটুকু দয়া করব না আমি, করা হবে না। কদর্য্য হীন ফন্দিতে যে আমার অপমান করেছে, নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত আমার শান্তির গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—আমার ঘর, আমার স্ত্রী—কারো সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে নি,—এত বড়-কাপুরুষ, এত বড় নৃশংস বরাট আজ আমার মুঠোর মধ্যে এসেছে—আজ তার শাস্তি দেব। এমন শাস্তি দেব যে সে শাস্তির কথা শুনে—বড় বদমায়েস যে, তারও সমস্ত শরীর কেঁপে শিউরে উঠবে—শুনে পঙ্গু হয়ে বসে পড়বে! তাদের সমস্ত সয়তানী শক্তি উবে যাবে!...হঁা, এসো, আরো কাছে এসো। পালাবার পথ নেই আর—পালাতে পারবে না! এমন

আমার গ্রাস থেকে আজ ছিনিয়ে নেয়! ...শোন্ পাষণ্ড, তোমরাও শোনো, এই দুর্বৃত্ত দস্যু তোমাদের ধ্বংস করছিল, তোমাদের সুখের ঘর শ্মশান করে দিতে এসেছিল, তোমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করতে উদ্যত হয়েছিল, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাদের সম্মান হরণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাকে কি শাস্তি দিতে চাও তোমরা? বল, সকলে বল। সকলের কথাই আজ আমি রক্ষা করব। সকলের মিলিত ব্যবস্থায় প্রচণ্ড শাস্তি আবিষ্কার হবে! আমার স্ত্রী তাকে আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে! ...রূপসী, মান্দার এ ঋণ কখনো ভুলবে না। মন্দির গড়ে তাতে তোমার মূর্ত্তি স্থাপনা করবে, মান্দার সে মূর্ত্তির পূজা করবে।...শোনো, তোমাদের রাণী কি বলতে চান, শোনো—

রূপসী

হাঁ, সকলে এসেছ—তোমরা সকলে শোনো। আমি এক আশ্চর্য্য কাহিনী বলব, শোনো—

নিরঞ্জন

হাঁ, মন দিয়ে শোনো—এমন কাহিনী, নারীর এত বড় জয়ের কাহিনী তোমাদের পুরাণে নেই, ইতিহাসে নেই, শোনো—

রূপসী

সত্যই নেই। এত বড় গৌরব, এত বড় সম্মান, পুরুষের সংযমের এত বড় কাহিনী আজ পর্য্যন্ত কেউ শোনে নি, কখনো কল্পনাও করে নি। বাবা, আপনিও শুনুন—

নিরঞ্জন

বল, রূপসী—আসল কথাটা শীঘ্র করে খুলে বল। দেখ, এরা শোনবার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে—

রূপসী

হাঁ শোনো, সকলে শোনো, মান্দারবাসী তোমরা সকলে শোনো, জীবনে কখনো আমি মিথ্যা বলিনি—চিরদিন সত্য পথে চলে এসেছি, সত্য কথা বলে এসেছি—কোন বিষয়ে কোন গোপনতা রাখিনি কখনো—আজও কিছু গোপন করব না। এত বড় সত্যও আমি আর-কখনো বলিনি, শোনো—আমার পানে চেয়ে দেখ, সকলে, আমার প্রাণের মধ্যে দৃষ্টি রেখে শোনো—সমস্ত দেবতার নামে শপথ করে আমি বলছি—আমার কথা বিশ্বাস কর...কাল রাত্রে এই শত্রুর শিবিরে আমি গেছলুম, উপায় ছিল না। দারুণ ভয়ে কম্পিত বক্ষে গেছলুম! কিন্তু শত্রু আমায় স্পর্শ করে নি, আমায় কোন অপমান করে নি—প্রচুর সম্মানে সম্মানিত করে ভগ্নী বলে সে আমায় সম্বর্দ্ধনা করেছে—আমি যেমন নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়ে গেছলুম, তেমনি নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়েই ফিরে এসেছি! এতটুকু কলঙ্ক আমায় স্পর্শ করে নি! আমি ফিরে এসেছি,—মানুষের উপর সুগভীর শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস-ভরা হৃদয় নিয়ে আমার ভাইয়ের ঘর থেকে আমি ফিরে এসেছি!

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল আমাদের?

রূপসী

হাঁ।

নিরঞ্জন

কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

রূপসী

কারণ? কারণ, বরাট আমায় ভাল বাসে, তার তরুণ বয়স থেকে প্রথম কৈশোর থেকে সে আমায় ভালবাসে।

নিরঞ্জন

এই কথাই আমি শুনব, ভাবছিলুম।...ঠিক···তোমার চোখে তাই আমি অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখেছিলুম!...আমি তা গ্রাহ্য করিনি। কি বললে? তোমায় ও স্পর্শ করে নি···?

রূপসী

না, স্পর্শ করে নি। বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি আমায় চেনো ত, তুমি আমায় জানো ত—আমি সত্য কথা বলছি, কিছু গোপন করিনি—

নিরঞ্জন

সত্য কথা বলেছ! কিন্তু অস্বাভাবিক সত্য এ, রূপসী। একটা বর্ব্বর, যে বিশ্বাসঘাতকতায় হটে না, নিমকহারামিতে পেছপাও নয়, সারা পৃথিবীর যে শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু, শান্তির শত্রু, আনন্দের শত্রু—চট্ করে সে এতটা মহৎ হয়ে উঠবে! এ অসম্ভব, রূপসী। পৃথিবীতে সম্ভাবনারও একটা গণ্ডী আছে—সে গণ্ডীর অনেক দূরে তুমি আমাদের যেতে বলছ! কাল সন্ধ্যার কামোন্মত্ত বর্ব্বর, অমন স্নিগ্ধ চন্দ্র-করোজ্জ্বল রাত্রি, সুন্দরী কিশোরী, নির্জ্জন অবসর—তুমি এ কি বলছ, রূপসী! পুরাণেও এমন অসম্ভব গল্প কেউ কখনো পড়েনি যে...আচ্ছা, তোমরা বল, তোমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করেছ কেউ? (সকলে নিস্তব্ধ) যারা বিশ্বাস করেছ, তারা আমার দিকে অগ্রসর হয়ে এসো—[আর্য্যধন শুধু অগ্রসর হইল] তুমি, বাতুল বৃদ্ধ, এ প্রলাপ তুমিই শুধু বিশ্বাস করেছ—কিন্তু চেয়ে দেখ, আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

আর্য্যধন

মূঢ় হতভাগা মান্দার, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড মান্দার, নীচ কুৎসিত মান্দার—না, তোদের কোন কথা বলতে চাই না!···কিন্তু নিরঞ্জন, এ-ভাবে তুমি সতীর অমর্য্যাদা করো না। সতী, তোমার স্ত্রী! মনে রেখো, সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা!...সতীর পরীক্ষা করছ! লজ্জা হচ্ছে না? মার মুখ দেখেও বুঝছ না! ধিক! তোমাদের আর কি বলব? মা, মা আমার, এরা বড় হীন, বড় নীচ এরা, ও মহত্ত্ব এরা ধারণাও করতে পারে না—নিজেদের পাপে-ভরা জর্জ্জরিত হৃদয় দিয়ে অপরের হৃদয়ের বিচার করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি মা, তোর প্রতি কথা আমি বিশ্বাস করেছি।

নিরঞ্জন

তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছ! তোমার বিশ্বাসে মান্দারের কিছু আসে যায় না—

আর্য্যধন

কিন্তু এই মান্দারই সব নয়। মান্দারের উপর যে বড় মান্দার আছে, আমার বিশ্বাসে তার বিস্তর এসে যাবে পুত্র—

নিরঞ্জন

বাতুলের সঙ্গে বাদানুবাদ করাও বাতুলতা! যাক,···রূপসী, তুমি দেখলে ত—মান্দার তোমার এ কাহিনী বিশ্বাস করছে না—

রূপসী

মান্দারের বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি গ্রাহ্যও করি না। এরা কি জানে—কাকে জানে? কিন্তু তুমি, তুমি বল, তোমার স্ত্রীর কথা তুমি বিশ্বাস করেছ কি না!...চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখচ—হাঁ, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ, দেখে বল, তোমার মনে কোন অবিশ্বাস আছে কি না—

নিরঞ্জন

অবিশ্বাস! বলা কঠিন, রূপসী···যে ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে ঝড় আমায় একেবারে জীর্ণ করে দিয়েছে, আমার বার্দ্ধক্য এসেছে! আমি চোখে সমস্ত ঝাপসা দেখচি—আমার চোখের সে আলো নিবে গেছে, আমার কাণে আমি সমস্তই অস্পষ্ট শুনচি—অনেক আশা করেছিলুম রূপসী, মনে বড় আশা হয়েছিল, —যাক···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। রাগ নয়, রূপসী, হিংসা নয়—আমার মন খুব শান্ত এখন, কিন্তু সে থই পাচ্ছে না—কোন্‌টাকে অবলম্বন করবে, তা সে কিছু বুঝছে না...যাক, ও আর ভাবব না—আমার এক কথা—একে শাস্তি নিতে হবে—! তারপর তোমার কথা পরে ভেবে দেখব···কিন্তু তোমার কোন অপরাধ নেই—যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়। উপায় নেই। তুমি সত্য বলেছ? হবে! পরে মন স্থির করে আবার তোমার কথা শুনব। হয়ত এখন যা অবিশ্বাস করছি, পরে তা বিশ্বাস করতে পারি।

রূপসী

কিন্তু আমার পানে আবার তুমি চেয়ে দেখ—দেখ, এই চোখের পানে চেয়ে দেখ, আর এই স্বর—দেখ, একটুও কম্পিত দেখচ! এমন অকম্পিত স্বর দেখেও তুমি কিছু বুঝছ না!···এমন করে মাথা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াতে পাচ্ছি, তবু তুমি বিশ্বাস করছ না! আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি সত্য কথা বলেছি, প্রভু—বরাট আমায় স্পর্শও করেনি—বরাটের দৃষ্টিতেও আমি কোন কালিমা দেখিনি!

নিরঞ্জন

খুব ভাল কথা, রূপসী, খুব ভাল কথা। তোমরাও সব শুনেছ ত, এখন তোমরা যাও।··· কিন্তু যাবার পূর্ব্বে একটা কথা শুনে যাও—এদের দুজনকে পথ ছেড়ে দিয়ো—আমার স্ত্রী আর এই বাতুল বৃদ্ধ। এরা তোমাদের দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে—তোমাদের প্রাণ দিয়েছে। এদের পথ রোধ করো না কেউ।···রূপসী, তোমার-আমার মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ—এ ঘটনার পর আর নতুন করে গ্রন্থি দেওয়া যায় না। আমি মানুষ, যদি অবিচার করে থাকি—মানুষ বলেই মার্জ্জনা করো। কিন্তু এই পাষণ্ড—এর শাস্তি দেব আমি—অন্ধকার কারাগারে আপাতত একে নিক্ষেপ করব, তারপর অনেক ভেবে শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। এর মুক্তি নেই, মুক্তি নেই—কিছুতেই মুক্তি নেই—

রূপসী

মুক্তি নেই···? ওগো, না, না, শোনো—

নিরঞ্জন

কোন কথা নয়—কোন মিনতি শুনব না। আমার অভিপ্রায় অটল—কারো মিনতিতে এ ব্যবস্থা টলবে না—(বরাটকে সবলে ধরিয়া) বর্ব্বর দস্যু, তোর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার—রাজার অধিকার, স্বামীর অধিকার—

রূপসী

(সবলে বরাটকে মুক্ত করিয়া) না, না, ওর উপর তোমার কোন অধিকার নেই! কিসের অধিকার! শোনো, সকলে শোনো। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আগাগোড়া মিথ্যা কথা—এখন সত্য কথা বলছি, শোনো—এই বর্ব্বর দস্যু আমায় কলুষিত করেছে—তাই শাস্তি দেবার জন্য কৌশলে ভুলিয়ে ওকে এখানে এনেছি—নিজের হাতে আমি ওর অমর্য্যাদার শাস্তি দেব—এইটুকু আমার মিনতি! আমি কত বড় মূল্য দিয়েছি, সে কথা মনে করে এ অধিকারটুকু তোমরা আমাকে দাও, ওগো, আমি এই নতজানু হয়ে তোমাদের সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছি—

বরাট

না, না, রাণী মিথ্যা কথা বলছে—আমায় রক্ষা করবার জন্য মিথ্যা বলছে। রাণী নিষ্কলঙ্কা—স্পর্শের কালিমাও রাণীর গায়ে লাগেনি—নির্ম্মলচিত্তা সাধ্বী রাণী—

রূপসী

চুপ কর বন্দী। না হলে তোমার প্রগল্‌ভতার শাস্তি পাবে। বর্ব্বর দস্যু—না, না, তোমরা গায়ে হাত দিয়ো না! (জনৈক প্রহরীর হাত হইতে শৃঙ্খল লইল) দাও, আমাকে দাও, আমি নিজের হাতে ওকে শৃঙ্খলিত করব। আমি ওকে বন্দী করেছি—ও আমার বন্দী, বন্দীর উপর আমার অধিকার! (বরাটকে শৃঙ্খলিত করিল) তোমরা দেখ—ওর মুখে অস্ত্র-চিহ্ন দেখচ? এ আঘাত আমিই দিয়েছি—আমি। কাপুরুষ, পশু, নারীর কোন সম্মান জানে না—ওর শাস্তি, তোমরা পুরুষ, তোমরা কি আবিষ্কার করবে? ওর শাস্তি আমি দেব। নারীর প্রতিহিংসা! পদাহতা অপমানিতা নারীর স্বহস্তে দেওয়া শাস্তি, তোমরা সে শাস্তির কথা শুনলে এখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে—

নিরঞ্জন

রূপসী—কোন্ কথাটা তুমি সত্য বলছ?

রূপসী

কোন্ কথা! তুমি এত বড় যোদ্ধা হয়েও তা বুঝছ না! বুঝবে না। কেবলই দেহের শক্তি দেখে এসেছ—মানুষের মন বলে যে একটা পদার্থ আছে, তার পানে ফিরেও চাওনি কখনো! হতভাগ্য স্বামী! যাক্, আমি তর্ক করতে চাই না। বন্দী—এ আমার বন্দী—এর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।... শোনো সকলে, সেই শিবিরেই আমি ওকে হত্যা করতে পারতুম,—পারিনি। অস্ত্র চোখের নীচে আঘাত করতেই ভীত দুর্ব্বল হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল—তাই এই কৌশল করে ওকে এখানে এনেছি।...বাবা, বন্দীর ভার আমি আপনার হাতে দিলুম। এর জন্য দায়ী আপনি। খুব সতর্ক থাকবেন। যেন না পালায়, যেন আমার বন্দীর কাছে আর কেউ না যায়—আমার অধিকারে কেউ না হস্তক্ষেপ করে! যান, একে আপনি নিয়ে যান্—

( আর্য্যধন বরাটকে লইয়া প্রস্থান করিল ; জনতার প্রস্থান )

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

কেন ?

নিরঞ্জন

আমি বুঝছি, এ মিথ্যা—এর সমস্ত মিথ্যা...বল, এখন বল, এখন এখানে আর কেউ নেই, সব কথা খুলে বল, আমার সামনে বল—

রূপসী

সত্যই আমি বলেছি নাথ। বরাট আমার বাল্য-সহচর, মুঞ্জ ; আমার পিতার কুটীরের কাছে থাকত। আমায় সে ভালবাসত। আমিও হয়ত আর এক মূর্ত্তিতে তাকে দেখতুম—কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে চলে গেল ! বরাট আমায় ভোলে নি, চিরদিন আমায় খুঁজে বেড়িয়েছে। সে মোহ এখনো আছে। আমায় দেখতে চেয়েছিল,কিন্তু আমার সুখের কথা শুনে 'ভগ্নী' বলে সে আমায় সম্বোধন করেছে—আমায় সে স্পর্শও করে নি ...এর জন্য মোগলের দারুণ বিদ্বেষ সে মাথায় নিয়েছে, মোগলকে শক্র করেছে !—তাই আমি ওকে এখানে এনেছি। ও আসতে চায় নি,আমি অভয় দিয়ে এনেছি। সেই শক্রর হাতে নিঃসঙ্গ ওকে রেখে আসতে পারিনি —চুপ করে রইলে যে—বিশ্বাস হল না ?

নিরঞ্জন

বিশ্বাস করা বড় কঠিন ! তুমি সুন্দরী কিশোরী, বরাট তরুণ পুরুষ, তারপর কৈশোরের সে প্রথম অনুরাগ ! ... বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব রূপসী। বেশ, তোমার কথাই থাক্—বরাটের কারাগারের চাবি তুমি নিজের হাতেই রাখো—যতক্ষণ না একটা প্রচণ্ড শাস্তি স্থির করিতে পারছি, ততক্ষণ বরাট তোমারই বন্দী থাক্। কিন্তু—

রূপসী

না, আর কিন্তু নয়—বিশ্বাস করতে চেষ্টা করো নাথ। নারীকে যতটা হেয়, যতখানি দুর্ব্বল মনে কর, নারী ঠিক ততখানি হেয়, ততখানি দুর্ব্বল নয়। নারীর চিত্তটা ছোট নয়, সামান্য জিনিষ নয়—বোধ হয়, পুরুষেরও এতখানি চিত্ত নেই !...বেশ করে বুঝে দেখো নাথ। দেখবে, এ সমস্তই দুঃস্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে যাবে...প্রভাতের আলোয় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে। তোমার চোখে আমি তার আভাস দেখতে পাচ্ছি...তা যদি না দেখতুম, তাহলে বাঁচবার কোন সাধ রাখতুম না আর। কাল-রাত্রি থাকে না, দিনের আলো ফোটেই—সেই আশায় আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব, নাথ। আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমান নেই। ঐ আলোর আশা-পথ চেয়ে আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব। যদি সে আলো ফুটতে দেরী হয়, অনেক অনেক দেরী হয়, তবুও ধৈর্য্য হারাব না। আমি জানি, নাথ, এ আলো তোমার বুকে তোমার চোখে ফুটবে, এ আলো ফুটবেই। *

যবনিকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

* মেটরলিঙ্ক রচিত Monna Vanna অবলম্বনে।

# মাসকাবারী

## "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য"

জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত সরস ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহুকাল পর্য্যন্ত বাংলা মাসিক সাহিত্যে পড়া যায় নাই। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বাংলার আধুনিক লেখকবর্গের ও সমালোচকবর্গের সম্পূর্ণ প্রণিধানযোগ্য; তাই তাঁর লেখা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি ঃ—

"জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধি নিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণ সজ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকি।...

"উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্টর হিউগো যখন ফরাসী সাহিত্যে ভাবের ভঙ্গিমার বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসী ভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাঁদের মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবিপ্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক স্তস্তব্যস্ত বলিতেছেন, "প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রকমারী ছাঁচ। প্রতিভারও অনন্তরূপ। তবে সমালোচক তুমি কেন এক মনিবেরই দাসত্ব করিতে থাকিবে।"...

"সাহিত্যে আর এক শুচি ব্যাধি আছে—এটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেই সাহিত্যের উপর "নীতিকতা", ধার্ম্মিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শ্লীলতা সাধুতা এমন কি আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়া দিলাম —লাতিন সাহিত্য যাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা বাহ্যশ্লীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত হইয়াছেন কাতুল্ল (Catullus) ওভিদ।"

লেখক সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যকে কৃত্রিম বিধি নিষেধের নিগড়ে নিগড়িত করিবার বিরুদ্ধে এই যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণহীন সোচ্ছ্বাস উক্তি নয়। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে ভাল রকম পরিচয় আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যেই তার সাক্ষ্য মেলে। তাঁর উক্তির সপক্ষে তিনি লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের তুলনা করিয়াছেন—নিম্নে তাঁর লেখার সেই অংশটি উদ্ধার করিয়া দিতেছি ঃ—

"গ্রীকের সৌন্দর্য্যবোধ—রসবোধ ছিল উদার বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা,—উহা চলিত সুবলয়িত তরঙ্গভঙ্গে। তাহাদের কবিত্বপ্রতিভায় দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতির বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্য পক্ষে বীরকর্ম্মী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাপ্রিয়তার সে লীলায়িত রেখাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঋজুদৃষ্টিতে, জিনিষকে ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট স্ফুট সহজগ্রাহ্য অঙ্গ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহুজাতি, বহুদেশ, বহুধর্ম্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ মহাধর্ম্মে পরিণত

করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজস্ ওজস্, সেনানীর মুখে সে আদেশবাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজানুশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীর প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাবভাবে কথায় চিন্তায় যে সহজবিগলিত গড্ডালিকা-প্রবাহ, যে সদা-চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খলগতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের ( Patricii) গুরুভার গাম্ভীর্য।···গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোম নগরীর ন্যায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য—একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফূরণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা এই বহুধা অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন সাহিত্য অল্প দিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীস কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।"

এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, তবে কি সাহিত্যে আভিজাত্যের কোন স্থান নাই? মিল্টন্, কর্ণেই, ভার্জ্জিল—প্রভৃতি কবির মধ্যে আভিজাত্যের অভিমান সুস্পষ্ট বিদ্যমান। এ প্রশ্ন যে লেখকের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গেছে তা নয়। তিনি ইহারও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। মিল্টন, ভার্জ্জিল প্রভৃতি কবির নামোল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান, তাই তাঁহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, মহনীয়—সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই জ্বলন্ত অনুভূতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনামাত্র। সাহিত্যের ধারাটি—শিষ্টাচারটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতন্ত্র্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি; হারাইয়াছেন সাহিত্য-সৃজনের মূল মন্ত্রটি। তাই দেখি, মিল্‌তনের পরে পোপ, কর্ণেইর পরেই বোয়ালো, ভর্জ্জিলের পরেই ওভিদ ষ্টাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট্ট।"

লেখক বলেন ক্লাসিক ঠাট বজায় রাখিলেই ক্লাসিক হয় না—

"Classic soul যাঁহার Classic manner তাঁহারই সহজসিদ্ধ। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ একটি কোন ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্ফূরণ, বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি বহুরূপী। তাহাকে দুই একজন কবির বা দুএকটি কবিসঙ্ঘের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলেনা।"

প্রকৃত আভিজাত্য তাই প্রতি কবির আত্মার আভিজাত্য।

"কবি সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

কবিত্বের এই মূল উৎসটি, লেখক যাহাকে বলিয়াছেন কবির "আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা", যখন শুকাইয়া যায়, কিম্বা আমরা যখন সেই মূল উৎস হইতে দূরে সরিয়া যাই, তখনই বিধিনিষেধ, অলঙ্কার, প্রকরণপদ্ধতি প্রভৃতি কাব্য-সংহিতার canons & standards খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টাতেই সাহিত্যের মৃত্যু। সেই জন্য লেখক আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন ঃ—

"সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী এক আদর্শানুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়াই উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। যেদিন মানুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যেদিন কেবল অভিরুপভূয়িষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছি, সেইদিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কের শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।"

অতএব আমাদের চাই, কোন "বিশেষ আদর্শ" নয় –"সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত প্রতিভা"র সম্যক উদ্বোধন। প্রাচীন গ্রীসে —"দেশটিই ছিল বাণীদেবীর জীবন্ত বিগ্রহ।" "সাহিত্যেও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia", জাতির সারস্বত প্রতিভা।

## ৮ "জাপানের কথা"

নববর্ষের "সবুজ পত্রে" রবীন্দ্রনাথের "জাপানের কথা" বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁরা কবির জাপানের পত্র আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিলেন, এবারকার জাপানের কথায় তাঁরা নূতন করিয়া ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস পাইবেন।

কবি বলিতেছেন, "পৃথিবীতে মোটামুটি দু রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর আর এক জঙ্গম"—"ইউরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা" এবং "জাপানেরও মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম।" সেই জন্য ইতিহাসে আর কোথাও যাহা হয় নাই জাপানে তাহাই হইয়াছে, জাপান "কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে"।

কিন্তু এই স্বভাবজঙ্গমতা জাপান পাইল কেমন করিয়া? কবি তাহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) জাপানীরা "মিশ্র জাতি"—"তারা এক ধাতুতে গড়া নয়"। "জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েচে এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি।" (২) "স্থানসঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধে হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুট-পাকের কাজ করেচে।"

কবি বাঙালী জাতির সঙ্গে জাপানী জাতির এক জায়গায় মিল অনুভব করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে বাঙালীরই "নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত চিত্তের নমনীয়তা আছে।" "তার আর একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে"।

কিন্তু সম্প্রতি বাংলা দেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, কবি তার কারণ স্থির করিয়াছেন, ইংরেজের নিকট আমরা বাধা পাইয়াছি এবং সেইজন্য ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের মনে অভিমান জাগিয়াছে।

জাপানী মিশ্রজাতি এবং বাঙালীও মিশ্র জাতি, তবে কে কি পরিমাণে মিশ্র তাহা বলা শক্ত। বাঙালীর মধ্যে মঙ্গোলায় রক্ত আছে এটা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের একটা সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্তটাকে উল্টাইবার এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। এইজন্য বাঙালীকে যাঁরা কেবলই ভাবপ্রবণ মনে

করেন, তাঁরা ভুল করেন, কর্ম্মপটুতাতেও বাঙালীর শক্তির পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে। মিশ্র জাতি বলিয়াই বাঙালীর মধ্যে যত রকমের type দেখা যা তেছে, এত বোধ হয় ভারতীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তার পর জাপানীরা ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিক্‌টা আত্মসাৎ করিয়াছে, সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য সমৃদ্ধির দিক্, বাহ্যশক্তির দিক্। ইউরোপের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দুক-কামান, রাষ্ট্রনীতি, জাপান আয়ত্ত করিয়াছে। ইউরোপের এই বাহ্য শক্তিটাকে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে বাঙালীর ছেলেও যে জাপানীরই মত আত্মসাৎ করিতে পারিত, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এই খানেই বাঙালী ক্রমাগতই প্রতিহত হইতেছে বলিয়াই বাঙালীর মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে। ইংরেজের কলকারখানায় তার সম্পূর্ণ প্রবেশ নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হওয়ার তার বিশেষ সুযোগ নাই, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা তার পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল—অথচ এই সব ক্ষেত্রে শক্তিলাভের জন্যই তার সমস্ত মন এখন চঞ্চল ও উৎসুক। এবং এইখানেই তার প্রতিদিন হার।

বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এ পর্য্যন্ত বাহ্য সাদৃশ্য চলে, যেমন জাপানীর সঙ্গে ইউরোপীয়ের এ জায়গায় একটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কবি দেখাইয়াছেন যে জাপানের সঙ্গে ইউরোপের, এবং বাংলারও, "একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে"। "যে গূঢ় ভিত্তির উপরে ইউরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবল মাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ।" তিনি তাই লিখিতেছেন :—

"মনুষ্যত্বের যে সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চল্‌তে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়।"

তিনি তাই বলিয়াছেন যে জাপানী সভ্যতা একমহলা; তার অন্তর মহাল নাই। এ কথাও খুবই সত্য। বোধ হয় এইজন্য জাপানী চিত্রশিল্পে রেখার লীলা আছে, কিন্তু রংয়ের বিচিত্র আবেগ নাই; তার ভাল কাব্য নাই; তার ল্যাণ্ডস্কেপ আছে, মানুষের চিত্র যথেষ্ট নাই—কারণ মানুষের শরীর সম্বন্ধে তার মোহ নাই, মানুষের রহস্য সম্বন্ধে তার বোধ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার এই যে আসল স্বরূপ, ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্প্রতি আমাদের দেশে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে আমরা নানা কর্ম্মসূত্রে যে সকল ইংরেজের সংস্পর্শে আসি, নানা কারণে তাঁদের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাবান্ নই, তাঁরাও আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান নন্। ইংরেজ মাত্রকেই এদেশে আমরা "এংলো ইণ্ডিয়ান" রূপেই জানি। সুতরাং ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনাকে কেতাবে আমরা যত বড় করিয়াই জানি, আসল মানুষের মধ্যে তাহাকে তত ছোট করিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত হই। এই

কারণে, রামমোহন রায়ের আমলে, কিংবা হেয়ার, বেথুন, ডিরোজিয়ো, রিচার্ডসনদের আমলে ইংরাজি শিক্ষা এদেশের চিত্তে যে নব উদ্বোধন আনিয়াছিল, যার ফলে আমাদের দেশে সাহিত্যসৃষ্টি বলি, সমাজ-সংস্কার বলি, সমস্তই নব প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ইংরাজী শিক্ষা আর সে ফল প্রসব করিতেছে না। ইংরাজি সাহিত্য এখন আর আমাদের প্রাণে সে রস সঞ্চার করে না, ইংরেজের ইতিহাস এখন আর কল্পনাকে সে মাতান মাতায় না। বরং ইংরেজের ইতিহাসের ছিদ্রগুলাই আমরা এখন বেশি করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছি।

যেখানে উভয় পক্ষের সম্বন্ধ সহজ ও আন্তরিক সম্বন্ধ হইতেই পারিবে না, সেখানে মিলনের কথা তুলিলে তাহা হয় বিরুদ্ধতাকে বেশি করিয়া জাগায়, নয় ঔদাসীন্যকে বাড়াইয়া তোলে। এ দুটো অবস্থার একটা অবস্থাও স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত নয়। এই জন্য এখনকার কালে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ বিষয়ে সব চেয়ে-বড় সমস্যা এই যে কেমন করিয়া আমরা এত বড় হইব যে ইংরেজ আমাদিগকে আর অবজ্ঞা করিতে সাহস করিবে না। ক্রমশঃ তাদের শ্রদ্ধা আমরা জোর করিয়া অর্জ্জন করিতে পারিব।

যিনি "জাপানের কথা" লিখিতেছেন তিনি ইউরোপের কাছে সেই বড় সম্মান নিজ প্রতিভাগুণে অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রতিভা সকলের নাই, কিন্তু নিজের শক্তির সম্পূর্ণ উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাইবার শক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেখানে বাধা কম, সেখানে যদি আমরা সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হই, দেশ-দেশান্তরে সেই শক্তির বোধন করি, তবে এমন দিন আসিতে বাধ্য, যখন ইংরেজ বা অপর ইউরোপীয় জাতি আমাদিগকে জাতে ঠেলিতে পারিবেনা।

অর্থাৎ রবিবাবু যে "অন্তরমহলের" কথা বলিয়াছেন, আমাদের এখন সেই "অন্তর-মহলের" দরজাগুলাই খুলিতে হইবে এবং বিশ্বজাতির অন্তরমহলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথঘাটগুলিকে প্রশস্ত করিতে হইবে। কবি লিখিয়াছেন "এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙালীর আহ্বান আছে।" এ পর্য্যন্ত সে আহ্বান বাঙালী শুনিয়াও আসিয়াছে। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ, —ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ইঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলাইয়াছেন। এ কাজ সম্প্রতি ব্যাহত হইলেও, ইহা যে বাধামুক্ত হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে। তখন জাপানেরও "অন্তরমহাল" রচনা করিবার ভার একসময়ে বৌদ্ধযুগে যেমন ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি হয়ত পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে।

## উত্তর-প্রত্যুত্তর

জ্যৈষ্ঠের "ভারতী"তে আমরা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-মহাশয়ের অভিভাষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অযথা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলাম এবং তাঁর অভিভাষণে তিনি যে কত জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ভাব

ও ভাষা ধার করিয়াছেন তাহা একে একে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। আষাঢ়ের "ভারত-বর্ষের" "সাহিত্য-প্রসঙ্গের" লেখক এজন্য বিষম "দুঃখ" এবং "লজ্জা" অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে, এ রকমের সমালোচনায় "সাহিত্যের চরিত্র...নষ্ট হইয়া যায়" এবং "সাহিত্য-সেবা ক্রমশঃ দোকানদারীতে পরিণত হয়।" তাঁর এই অভিনব মর্ম্ম-বেদনায় বাংলা দেশসুদ্ধ সমস্ত লোক সম-বেদনা অনুভব করিবে সন্দেহ নাই, কারণ "সাহিত্যের চরিত্র" রক্ষা করিবার জন্য "প্রবাসী"র প্রবীণ সম্পাদকের পরেই, তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রাণপণ প্রযত্ন উল্লেখ করিবার মত বটে !

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর "সভাপতির আসন" হইতে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকার বক্তৃতা-বিশেষ না পড়িয়াই তার প্রতিবাদ করা এবং ইঙ্গিতচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতগুলি অন্যায় দোষারোপ করা জরুরি বোধ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই, তাঁর কথার প্রতিবাদ করাও "প্রবাসী" এবং "ভারতী" এবং আরও দু-একটা কাগজ জরুরি মনে করিয়াছিলেন। কেননা, দেশের সভার সভাপতির আসনের একটা মর্য্যাদা আছে এবং সেজন্য সভা-পতির উক্তিও দায়িত্বপূর্ণ হওয়া চাই। চিত্তরঞ্জনবাবু "সভাপতির আসন" হইতে যদি ঐ সব দায়িত্ববিহীন কথা না বলিতেন, তবে তার প্রতিবাদ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না—কারণ, ব্যক্তিবিশেষ কোন্ কাগজে কি বলে না বলে তাহাতে কি আসে যায় ?

লেখক সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভরসা পান্ নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে "নকল পণ্ডিত" ও "বালির তাপ" বলা হয় নাই। অভি-ভাষণে চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন যে, "আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত" ধরিয়া বসিয়াছেন যে "জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে" "সমগ্র মানব জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে"। তারপর সেই অজ্ঞাত-নামা দুই-একজন ব্যক্তিকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলিয়া তিনি পরিহাস করিয়া-ছিলেন এবং "এমন কি" রবীন্দ্রনাথও "ঐ মতটি" আমেরিকায় "জাহির" করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ "এমন কি" বলার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলা হয় নাই এইটেই যদি সত্য হয়, তবে জানিতে চাই, ভারত-বর্ষে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ? তাঁদের নাম ও উক্তি আমরা নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারি—নহিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিই যে ঐ সকল ইঙ্গিত প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ থাকিয়া যায়।

তার পর ভারতবর্ষের লেখক প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন যে আমরা অভিভাষণের যে সকল আইডিয়াকে রবীন্দ্র-নাথের আইডিয়া বলিয়া মনে করিয়াছি "তাহার একটিও প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া নহে।...সে সমস্ত ভাবই ভূদেব বঙ্কিম ও বিবেকানন্দাদির রচনা মধ্যে পাওয়া যায়।" "প্রমাণস্বরূপ" কিছু কিছু নমুনাও

তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমেই বলা ভাল যে, তাঁর নমুনা-উদ্ধারের একটু বিশেষ বাহাদুরী আছে। ভূদেব বা বিবেকানন্দের কোন্ গ্রন্থ হইতে তিনি যে তাঁদের উক্তিগুলি উদ্ধার করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই; কেননা পরের উক্তিকে নিজের যুক্তিমাফিক কাটিয়া-ছাঁটিয়া সাজাইবার চাতুরী তিনি ইতিপূর্ব্বেও দুই-একবার প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে চাতুরী ফাঁস হইয়াও গেছে। ১৩২৩ সালের পৌষের 'ভারতী'তেই দেখিয়াছিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে তাঁর একটা উক্তিকে তিনি এমনি নিজের মনের মতন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আসলে যা মত নয়, লেখকের কোটেশন-চাতুরীর দ্বারা তাঁর সেই মতই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। "সাহিত্যের চরিত্র" রক্ষা করিবার জন্য লেখক বিশেষ ব্যস্ত কিনা, সেইজন্য এমন কাণ্ডটা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াই থাকে!

যাই হোক্, তিনি রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার স্বকীয়তা অপ্রমাণ করিবার জন্য এবং চিত্তরঞ্জন বাবুকে রবীন্দ্রনাথের ঋণমুক্ত করিবার জন্য ভূদেব বিবেকানন্দাদির এবং রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার সাদৃশ্য যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভূদেব প্রভৃতির উক্তি ঠিক্ তোলা হইয়াছে কি হয় নাই তাহা তাঁদের লেখা ঘাঁটিয়া দেখিবার কিছুমাত্র দরকার করে না। কারণ, সাহিত্যে কোন আইডিয়াই কারো নিজস্ব নয়, এই যখন তাঁর স্থির ধারণা—তখন কোন আইডিয়ার বিশেষত্বটুকু তিনি ধরিবেন কেমন করিয়া? কিন্তু এটা যে শুধু তাঁরই ধারণা তা নয়, এ-সম্বন্ধে তিনি রবিবাবুরও একটা কথা তুলিয়া দিয়া ইস্কুল-মাষ্টারের মত প্রবাসী ও ভারতীর "ছেলেমানুষীর" উপর দণ্ড আস্ফালন করিয়াছেন। বলিয়াছেন—আঃ 'এটুকু'ও পড় নাই! ইত্যাদি। রবিবাবু নাকি কোথায় লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নূতন করিয়া বলা। কিন্তু কথাটা যে রসসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন নাই, আমাদের নবীন মাষ্টার-মহাশয় তাহা মোটেই বুঝেন নাই। বস্তুত রসসাহিত্য যে সব ভাব লইয়া কারবার করিয়া থাকে, তাহা কারো নিজস্ব নয়; কিন্তু সেই মামুলি ভাবই প্রত্যেক রসস্রষ্টার হাতে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক থিওরি সম্বন্ধে একথা মোটেই খাটে না যে, সে সকল ক্ষেত্রে কোন মতবাদীরই নিজস্ব আইডিয়া বলিয়া কিছুই নাই। তাহা হইলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারা Political Theories সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেই পারিতেন না; Social Theories সম্বন্ধে বা Economic ideas সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীদের মতের ইতিহাস আলোচনা করার কোন অর্থ ই থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশীয় সমাজ-সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ মতামত খাড়া করিয়াছেন এবং সমাজ কি ভাবে গঠিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও কতগুলি কাজের পদ্ধতিও উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর থিওরিও

আছে এবং তার Practical application ও আছে। সেই সবটা জড়াইয়াই তাঁর আইডিয়া। এবং তাঁর সেই গোটা আইডিয়াটাই চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর নিকট হইতে জ্ঞাতসারে হোক্ বা অজ্ঞাতসারে হোক্,—লইয়াছেন, আমরা ইহা ক্রমে ক্রমে তাঁর লেখার নানা জায়গা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। রবিবাবুর সেই মূল আইডিয়ার সঙ্গে ভূদেব, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমের মূল আইডিয়ার কোন মিল নাই। তবে লেখক যে ভাবে মিল দেখাইতে ব্যস্ত সে ভাবের মিল—তাঁর কথা অনুসারেই বলি—বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ হইতেও দেখানো যাইতে পারে বটে।

যেমন ধরুন, রবিবাবুর প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের "আত্মশক্তি"র উপর দাঁড়াইতে হইবে, দেশের কল্যাণকর্ম্ম দেশের লোকেরাই সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রস্তাব বঙ্কিম, ভূদেব বা বিবেকানন্দের লেখায় কুত্রাপি নাই। তবে বঙ্কিম যে কমলকান্তের দপ্তরে পলিটিক্স্‌কে ভিক্ষা চাওয়া বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, এবং যে বিদ্রূপ-বাক্যটা উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষের লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অপ্রমাণিত হইল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে কথাটা পুরা উদ্ধার করিলেই তাহার আসল চেহারাটা ফুটিত। কিন্তু ভারতবর্ষের লেখক ঠিকমত কোটেশন দিতে বড়ই নারাজ। বঙ্কিম "স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন"—"সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাওগো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স", এবং তার স্পষ্ট মানে এই যে, যে জাতি পরাধীন, সে জাতির পলিটিক্স মানেই ভিক্ষা চাওয়া—বঙ্কিম তাহাকেই "কুক্কুর জাতীয়" পলিটিক্স নাম দিয়াছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির পরাধীনত্ব সম্পূর্ণ মানিয়াই কতটা আত্মশক্তির অধিকার ও চর্চ্চা সেই পরাধীনতার অবস্থার মধ্যেও পূর্ব্বকালে বজায় ছিল এবং এখনও থাকিতে পারে, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন,—সুতরাং তাঁর আইডিয়া এবং বঙ্কিমের আইডিয়ার মধ্যে সাদৃশ্যটা কেমনতর সেটা পাঠকেরা বিচার করিয়া লউন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি :—"রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী।" "দেশনায়ক"—"সমূহ"। ৫০ পৃঃ।

তারপর জাতিত্বের অর্থ কি এবং তাহার বিশিষ্ট আদর্শই বা কি, সে-সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য আমরা দেখাইয়াছিলাম বলিয়া লেখক ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের রচনা হইতেও (তাঁর মতে) অনুরূপ ভাবের বাক্য সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভূদেব বলিতেছেন "এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপরজাতীয় হইতে পারেনা" বঙ্কিম বলিতেছেন "বাঙ্গালী কখন

ইংরেজ হইতে পারিবে না" এবং বিবেকানন্দ বলিতেছেন "আমাদিগকে...ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপরজাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব"। এই তিন উক্তির মধ্যে কতকটা ভাবসাদৃশ্য আছে বটে, কারণ তিনজনের কথার সার এই যে, জাতিমাত্রেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—ইংরেজের যেটা স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর সেটা স্বাতন্ত্র্য নয়। এই platitudeটা অর্থাৎ এই অত্যন্ত সাদা সর্ব্বজনবিদিত মোটা কথাটা চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন বলিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে তড়িঘড়ি এই ধরণের গোটাকতক সর্ব্বজনবিদিত মোটা কথা উদ্ধার করিতে গিয়াছি, তাহা যে ভারতবর্ষের পাঠকদিগকে বুঝানো হইয়াছে, ইহা "সাহিত্যের চরিত্র রক্ষার" একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে! কিন্তু আমরা বাংলার জাতিত্ব ও তাহার বিশিষ্ট আদর্শ, বিশ্বজাতির সঙ্গে বাংলার জাতিত্বের কি সম্বন্ধ, চিত্তবাবুর এই সমস্ত আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার মিল দেখাইয়াছি; সুতরাং টুক্‌রাভাবে আমাদের উদ্ধৃত একটি মাত্র রবিবাবুর উক্তি ও চিত্তরঞ্জন বাবুর একটি উক্তি তুলিয়া দিলে পাঠকদিগকে সেরেফ ফাঁকি দেওয়া হইবে। ভূদেব বা বঙ্কিমের লেখায় চিত্তরঞ্জনবাবুর এ-কথা কোথায় আছে যে "সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। ... জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয় গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।" কিম্বা "জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।"? ইহার parallel passage ভূদেব হইতে ভারতবর্ষের লেখক বাহির করুন।

দেখুন না কেন, এই জাতিত্বের প্রসঙ্গেই তিনি যে অংশ ভূদেবের লেখা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে ভূদেব জাতি বলিতে বংশই বুঝিয়াছেন এবং স্পষ্টই বংশের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত।" "সামাজিক প্রবন্ধ" ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। এবং তার পরেই ভূদেব লিখিতেছেন:—"কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংরাজের উল্লিখিত ভাবে (বৈদেশিক বিদ্বেষভাব) পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া। ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া দেয়।" তারপর ইংরেজের ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষের একটি উদাহরণ দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের মধ্যে "বর্ণভেদ প্রথা" প্রচলিত থাকায় ভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ ভাব জন্মায় না।

এখানেও পাঠকেরা ভারতবর্ষের লেখকের কোটেশনের বাহাদুরী দেখিয়া লইবেন। ভূদেবের জাতিত্বের আইডিয়ার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জাতিত্বের আইডিয়ার কেমন মিল!

যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর ভূদেবের জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

"অভিমান"টা চিত্তরঞ্জনবাবু একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে Industrialism এর উপর চিত্তরঞ্জন বাবু খড়্গহস্ত—কারণ তিনি ও তাঁর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে এদেশে কল কারখানার আমদানি হইলে গ্রামগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রবল রূপেই প্রতিভাত হইবে—সেই Industrialism ভূদেব সমর্থন করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"এদেশে কলকারখানা হইয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কোন দোষই হইতে পারে না।"—সামাজিক প্রবন্ধ ১২২ পৃষ্ঠা। অথচ অর্থনীতি শাস্ত্রে যখন বলে যে অপর দেশ হইতে যদি শস্তায় তেলের আমদানি হয়, তবে তেলীর ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে, সুতরাং কারো পক্ষে জাতি-ব্যবসায় রাখাটা সঙ্গত নয়,—তখন ভূদেব বলেন:—

"আমার বিবেচনায় ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটি ভাল নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটি অঙ্গ-স্বরূপ নয়?"

—সামাজিক প্রবন্ধ।

অধিক উদাহরণ উদ্ধারের দরকার নাই। জাতিত্ব এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন স্ফুট, চিত্তরঞ্জনের লেখাতেও তেমনি স্ফুট হইয়াছে। ভূদেব, বঙ্কিম, এমন কি বিবেকানন্দের লেখাতেও হিন্দু সভ্যতারই এতটা প্রাধান্য যে, বিশ্বমানব সভ্যতার একটা অঙ্গ যে হিন্দু সভ্যতা—একথা মোটেই আমল পায় নাই। এই মূল জায়গাটিতে ভেদ আছে বলিয়া চিত্তরঞ্জনের ভাবের সহিত ভূদেব প্রভৃতির ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ভূদেবে যাহা নাই, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কারো লেখার মধ্যে মাথা খুঁড়িলেও ভারত বর্ষের লেখক তাহা পাইবেন না। অক্ষয়-"সনাতনীর" ভাণ্ডার হইতে ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত সাম্যবাদী চিত্তরঞ্জনের কথার অনুরূপ কথা উদ্ধার করা আরও অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা সারিয়া লই। চিত্তরঞ্জন দেশমাতার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিবার কথা লিখিয়াছিলেন; তাই আমরা রবিবাবুর গানের দুটি টুক্‌রা তুলিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথাটাও রবিবাবুর, চিত্তরঞ্জন প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের অন্তের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের এমনিই প্রকৃতিগত বিশিষ্ট বস্তু যে, স্বদেশের স্তবের বেলাতেও দেশমাতাকে তিনি বিশ্ব-মাতা, দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে তিনি বিশ্ব-দেবতাকে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ অনন্তকে সান্তরূপে দেখিতেই ভালবাসি, অন্তকে অনন্ত করিয়া অনুভব করিতে চাই না। সুতরাং এ জায়গাতেও ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় বর্দ্ধিত চিত্তরঞ্জনের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সহজেই পড়িয়াছে দেখা যায়। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা ও সংস্কার মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ব্যস্ত না হইলেও তাঁর সমর্থকেরা ভারী ব্যস্ত তাহাতো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে!

তারপর বিলাসের কথা। ভূদেব বলিয়াছেন 'দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ।' এ অতি সাধু কথা—বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী বা কথামালাতেও বোধ হয় এ

ধরণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে "বিলাসের ফাঁস" লিখিয়াছেন (সমাজ ২১ পৃষ্ঠা দেখ) বা চিত্তরঞ্জন যে বিলাস-জনিত সর্ব্বনাশের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতরকার কথাটা ভূদেবের নীতি-কথা মাত্র নয়। তাহার ভিতরকার কথা এই যে, "পল্লীসমাজ বাঙ্গালী সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র-স্থল," অতএব বাঙালীকে যদি বিলাস-ব্যাধি আক্রমণ করে, তবে সেই পল্লীতে থাকিবে চির দারিদ্র্য, আর সহরগুলি—"দেশের ভোগ-বিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী" হইয়া উঠিবে। এই যে পল্লীসমাজের কথা এবং পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা, ইহাই চিত্তরঞ্জনের সমস্ত রচনার আসল কথা এবং ইহাই আবার রবীন্দ্রনাথের আসল কথা। এই পল্লীসমাজের কথার অনুরূপ বাক্য ভূদেব বিবেকানন্দাদির রচনা হইতে ভারতবর্ষের লেখক উদ্ধার করেন নাই কেন?

তারপর রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে যে রাজাই রাজত্ব করুন না কেন, "স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই…স্বায়ত্ত শাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত।" তিনি পল্লীর Local Self-Government এর কথাই বলিয়াছেন।—আমাদের পল্লী যে self-governed self-contained community ছিল, একথার সাক্ষ্য বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও দিয়াছেন। পল্লীবাসীরাই আশ্চর্য্যরূপে পল্লীর শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসায় ধর্ম্ম কর্ম্ম শাসনাদির সমস্ত ভার নিজেরা লইয়াছে। চিত্তরঞ্জনবাবুও সেই কথা বলিয়াছেন এবং সেই পল্লী সংস্কারের দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়াছেন। ভূদেব লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। …আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলেও তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না।" ইত্যাদি। ভূদেবের এই কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জনের কথার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, কেননা হিন্দুসমাজের "অন্তঃ-শাসন" বলিতে ভূদেব পল্লীবাসীর স্বায়ত্তশাসন আদৌ বুঝেন নাই। তিনি অন্তঃশাসন বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে এবং লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাক্যের অর্থও পরিস্ফুট হইবে :—

"ব্রাহ্মণজাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন।"—সামাজিক প্রবন্ধ।

সুতরাং ভারতবর্ষের লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাক্যে, জাতি বা সম্প্রদায় বলিতে ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতিই বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই "সমাজপতি" ছিলেন। এইজন্য পূর্ব্বকালের ভারতীয় শাসনকে ইংরাজীতে theocracy বলা হয়। বিধি প্রণয়ন ছিল ব্রাহ্মণের কাজ, বিধি প্রয়োগ ছিল রাজাদের কাজ। ব্রাহ্মণদের legislative function, রাজাদের executive function। এতটা তলাইয়া ভূদেবের বাক্যটি লেখক বুঝেন নাই। অথচ, চিত্তরঞ্জনবাবু পরিষ্কার বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম।"

## "বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি"

জ্যৈষ্ঠের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী "বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে খুব অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে হিসাবে এ প্রবন্ধটি সুপাঠ্য হইয়াছে। তিনি প্রথমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহা ও গীতিকার কথা বলিতে গিয়া লিখিতেছেন:—

"আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ সম্যক্‌রূপেই Democratic বা লোক-মতানুগামী।" তারপর তিনি লিখিয়াছেন যে, পাঠানেরা এদেশ জয় করিবার পর যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটিল, তখন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রচুররূপে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু বাংলার খাঁটি বিশেষত্বটুকুকে নষ্ট করিতে পারিল না। তখন একপক্ষে এই সংস্কৃতের প্রভাব, অন্য পক্ষে ফার্শী, আরবী—বিশেষতঃ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব দেখা দিয়াছিল। লেখক বলেন, হিন্দী কবি সুরদাস প্রভৃতির গানই "ভাবান্তরিত" হইয়া নরোত্তম দাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রজভাষার সেই সময়েই উন্মেষ।

তারপর শ্রীচৈতন্যের যুগে পদাবলী-সাহিত্য যেমন রসের দিক্ হইতে একটা অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিল, তেমনি তত্ত্বের দিক্ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যের নব নব দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। সেই যুগেই বাংলা দেশ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি যদি Democratic হয়, তবে এই সময়ে তার সেই Democratic স্বরূপের চরম বিকাশ দেখা দিয়াছিল বলিতে হইবে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের যে যুগ আসিল লেখক তাহাকে "সৌখীন যুগ" নাম দিয়াছেন। পার্শী ও সংস্কৃতের দ্বারা বাংলা ভাষাটা সংস্কৃত হইয়া একটি সুমার্জ্জিত বিলাস-শ্রী লাভ করিল। ভারতচন্দ্রের কবিতা তার নিদর্শন। লেখক বলেন সেই কলা-সৌষ্ঠব-পূর্ণ কৃত্রিম ভাষাই "আজিও আমাদের আদর্শ"। কিন্তু এই সময়েই আবার কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরও আবির্ভাব। তাঁদের প্রভাবে পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, নিধুবাবু, দাশুরায়, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গানের উৎপত্তি। সুতরাং গোড়াতেও যাহা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও তাহাই রহিয়া গেল—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য লোকসাহিত্যই রহিয়া গেল।

তারপর ইংরেজি যুগের কথায় আসিয়া লেখক দেখিতেছেন যে এযুগে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা ইংরেজির অনুকরণে। বাংলাভাষার গতি ও প্রকৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে Democratic ছিল, তার কারণ বাংলা সাহিত্য ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিয়োজিত ছিল; কিন্তু ইংরেজি যুগে সাহিত্য Secular হইয়া দাঁড়াইল। যে সাহিত্য ছিল সর্ব্ব সাধারণের, তাহা এখন হইল প্রতিভাবান কবি বা লেখকের আত্মতৃপ্তির একটা উপ-করণ। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যকে লেখক "সখের সাহিত্য" নাম দিয়া বলিয়াছেন যে,

সমাজে একটা বড় রকমের বিপ্লব ঘটিলেই এ সাহিত্য কোথায় মিলাইয়া যাইবে। ইউরোপের Secular সাহিত্যও টিঁকিবে না, এমনতর কথা নাকি সেখানকার বহু প্রাজ্ঞ ও মনীষী বলিতেছেন। অবশ্য আমরা সে কথা শুনি নাই, এবং শুনিলেও সে সকল লোককে প্রাজ্ঞ বলিতাম কি না সন্দেহ।

কিন্তু লেখক ইংরেজি যুগে আসিয়া অনুকরণের উপর এমন খড়্গহস্ত হইলেন কেন, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। বৌদ্ধ সাহিত্যের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তো বিস্তর বিদেশী ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে ঢুকিয়াছে। তারপর মুসলমানযুগে তিনি দেখাইয়াছেন যে পার্শী আরবীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের যুগেতো আরও লক্ষ্য করা যায়। সে সব অনুকরণের বেলায় তিনি বলিবেন, বাংলাসাহিত্য নানা জায়গার ভাবকে ও ভাষাকে আরক্ত-আত্মসাৎ করিয়াছে—আর ইংরেজির প্রভাবের বেলাতেই সেই আত্মসাৎ করিবার সহজ ক্রিয়াটার অন্যথা দেখিবেন? পৃথিবীতে কোন দেশের সাহিত্য বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করে নাই, এটা দেখানো যাইতে পারে কি? ইংরেজি সাহিত্য বরাবর বাহির হইতেই পুষ্ট, বাহিরের খাইয়াই মানুষ—ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁরাই জানেন। ইংরাজী সাহিত্যে চশার আদি কবি, আর বার্ণাডশ অন্ত-সাহিত্যিক—চসারের কাব্যকে প্রথম স্তরে গড়িল ফরাশীস্ Chivalric romances-রচয়িতা কবিরা, দ্বিতীয় স্তরে গড়িল দান্তে বোকাসিয়ো পেত্রার্ক প্রভৃতি ইতালীয়ন কবিরা। এবং বার্ণাডশ ইব্‌সেনের শিষ্য—কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের পুষ্টিতে মানুষ। বাংলাসাহিত্যেও এইরূপ নানা বিদেশী ধাক্কা স্তরে স্তরে ইহাকে গড়িয়াছে এবং আজও গড়িতেছে। এজন্য আক্ষেপের কোন কারণ নাই, বরং আশা ও আনন্দের যথেষ্ট কারণ আছে।

তবে একটা কথা ঠিক্। পূর্ব্বেকার বাংলাভাষা ও সাহিত্য যেমন সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য ছিল, এখনকার বাংলা সাহিত্য তা নয়। তার প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষার দরুণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে এবং এখন সেই ব্যবধান কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে, সেইটেই হইয়াছে সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার উপায় লোকশিক্ষার বিস্তার ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে "সখের সাহিত্য" বলিতে পারি না—ইহার সঙ্গে দেশের নাড়ীর সম্পূর্ণ যোগই আছে। দেশের সমূহ-চৈতন্যে (mass-consciousness) ইহা পরিপূর্ণ। এমন এক দিন আসিবে যখন এই সাহিত্যের ধাক্কায় নবজাগ্রত লোক-সমূহের চেতনা উদ্বোধিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও অপূর্ব্বতর নিবিড়তর বিস্তৃততর করিয়া গড়িবে। তখন যা বাজে তা খসিয়া যাইবে, যা আসল তাই টিঁকিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে



—"হাউই কহিল, মোর কি সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—তার গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।"

( শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত )

# ভারতী

৪১শ বর্ষ ] ভাদ্র, ১৩২৪ [ ৫ম সংখ্যা

## দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস

রাজনীতির চারি অঙ্গের মধ্যে "দণ্ড" অন্যতম। রাজ-শাসন ইহার উপরই বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা দণ্ডেরই অধিক প্রশংসা দেখা যায়। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গেরই সাধক বলিয়া "ত্রিবর্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :—

"দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্ম্মং তথৈবার্থং বিধানতঃ।
কামং সংরক্ষতে যস্মাৎ ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত যুক্তিকল্পতরুঃ।

"দণ্ড ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করে—তদ্রূপ যথানিয়মে অর্থেরও সংরক্ষণ করে। যেহেতু (ইহা) কামকেও সম্যক্ রক্ষা করে—অতএব দণ্ড ত্রিবর্গ বলিয়া উক্ত হয়।"

এই "দণ্ড" ত্রিবিধ বলিয়া অমরকোষের টীকায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে যথা—

"স চ ত্রিবিধঃ। বধঃ অর্থগ্রহণং বন্ধনতাড়নাদিশ্চ।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত অমরটীকা সারসুন্দরী।

"সেই দণ্ড তিনপ্রকার—বধ, অর্থগ্রহণ বা জরিমানা ও বন্ধন-প্রহারাদি।" ইহাতে দণ্ডনীতি যে মূলে ইংরেজ-শাসনের 'Penal Code' বা 'দণ্ড-বিধি-আইনেরই' সম্পূর্ণ অনুরূপ হইতেছে—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'দণ্ডনীতি' ইংরেজী Penal Codeএর অনুরূপ হইলেও Penal Code নামে আমরা ইহার প্রথম ইতিহাসের প্রকৃত সন্ধান পাই না—বরং 'দণ্ডনীতি' নামেই ইহার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। "দণ্ডনীতি' নামের ব্যুৎপত্তি অভিধানে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"দণ্ডেন নীয়তে বেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতি রিতিখ্যাতা ত্রীল্লোকানতিবর্ত্ততে॥"

"দণ্ডের দ্বারা ইহা নিয়মিত হয় বা পক্ষান্তরে দণ্ডকে নিয়মিত করে বলিয়াই ইহা "দণ্ডনীতি" বলিয়া আখ্যাত। ইহা লোকত্রয়কে অতিক্রম করিয়া থাকে।"

এখানে আমরা "দণ্ডকেই" মূল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং এই 'দণ্ড' শব্দের মধ্যেই 'দণ্ডনীতির' মূল ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ 'দণ্ড' শব্দের মূলার্থের পর্য্যালোচনা

করিলে তাহার আলোকে অতীতের ঘনান্ধকার অপসারিত হইয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য' উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মনে হয় 'দণ্ড' শব্দ প্রথম প্রহরণার্থক যষ্টিকেই বুঝাইত এবং এই দণ্ড বা যষ্টিদ্বারাই অপরাধীর শাস্তি বিধান হইত বলিয়া 'দণ্ড' শব্দ শাস্তির বাচক হইয়াছে। দণ্ড এই প্রকারে শাসনের প্রধান অস্ত্র ছিল বলিয়াই "রাজদণ্ড" শাসন-দণ্ডের রূপক হইয়াছে। ইংরেজী Sceptre, rod প্রভৃতি শব্দ যে রাজ-চিহ্ন—প্রভুত্ব-চিহ্নের দ্যোতক হইয়াছে—ইহার মূলেও সেই যষ্টি অর্থই বর্ত্তমান।

দণ্ডই রাজার প্রধান চিহ্ন বলিয়া 'দণ্ড-ধর' শব্দ রাজার বাচক হইয়াছে। পুরাতত্ত্বের বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা—আমরা 'দণ্ড' অপেক্ষাও পূর্ব্বতন শাসনাস্ত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি। সেই সন্ধান আমরা বেদেই প্রাপ্ত হই। বরুণ বেদের একটী প্রাচীন ও প্রধান দেবতা। তিনি বেদে "সম্রাট্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক নাম "পাশী" যথা, "প্রচেতা বরুণঃ পাশী"; তিনি "পাশাস্ত্র" ধারণ করেন বলিয়াই "পাশী" নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই পাশকেই আমরা তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র বলিয়া মনে করি এবং 'দণ্ড' রাজার চিহ্ন বলিয়া যেমন রাজার 'দণ্ডধর' নাম হইয়াছে—তেমনই "পাশই" বরুণের সম্রাট্-চিহ্ন বলিয়া তাঁহার নাম "পাশী" হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। "পাশ" শব্দে রজ্জু বুঝাইয়া থাকে। পাশ বরুণের শাসনাস্ত্র হওয়াতে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া অপরাধীর শাস্তিবিধান করা হইত, ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

বেদের নিম্নোদ্ধৃত ঋকৃটি পাঠ করিলে বরুণের পাশ-শাসনের কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি :—

> "ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎপাশং
> বরুণো মুমোচৎ।
> অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্যূয়ং পাত
> স্বস্তিভিঃ সদানঃ॥"
> ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৮৮ সূক্ত।

"এই সকল নিত্যভূমিতে বাসকরতঃ (আমরা তোমার স্তব করি)—বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

বরুণের কোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত রেগোজিন্ লিখিয়াছেন :—

"The accepted poetical expresson of this fact was "Varuna binds the sinner with his fetters". Vedic India, p. 147.

এই বিষয়ই প্রচলিত কবিতার ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"বরুণ পাপীকে পাশের দ্বারা বন্ধন করেন।"

বরুণের "পাশী" নামের এই সমস্ত আলোচনা হইতে রজ্জুর দ্বারা বন্ধনই প্রথম শাসন ছিল—আমরা সেই লুপ্ত ইতিহাসেরই সন্ধান পাইতেছি।

বরুণে আমরা পাশের দ্বারা শাসনের যেমন প্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হই—যমে তেমনই আমরা দণ্ডের দ্বারা শাসনের প্রথম

ইতিহাস প্রাপ্ত হই। তাহাতেই দেবতাদিগের মধ্যে যমেরই অনন্যসাধারণ "দণ্ডধর" অভিধেয় হইয়াছে। যম কিরূপে দণ্ডের দ্বারা পাপী-দিগের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন—পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা :—

"পতনোৎপতনঞ্চৈব গদাদণ্ডাদি পীড়নম্॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

"কোথায়ও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথায়ও গদাদণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হইতেছে।"

'দণ্ডই' কেবল যে যমের শাসনাস্ত্র তাহা নহে—'পাশ'ও যমের শাসনাস্ত্র! তাহাতেই যমের 'কাল' নামানুসারে এই পাশের নাম 'কালপাশ' হইয়াছে। যমদূতেরা পাপীকে প্রথম পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়াই যমের নিকট লইয়া যায়—পরে যমরাজ তাহা-দিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে পাশের দ্বারা বন্ধন ও দণ্ডের দ্বারা প্রহার উভয়ই শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া একই 'দণ্ড' নামের বাচ্য হইয়াছে। এই জন্যই পাশের নামান্তর "রজ্জু"ও 'দণ্ডিকা' নামেই পরিচিত দেখা যায়। বর্ত্তমান 'হাতকড়া' 'বেড়ী' প্রভৃতিতে আমরা পূর্ব্বের সেই পাশ বা রজ্জু বন্ধনেরই নিদর্শন দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য ভাষায় hand-cuf, Shackles, fetters প্রভৃতির প্রয়োগে সেই পূর্ব্বপ্রথারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডের প্রথম অনুষ্ঠানেই যে কেবল বন্ধনের রীতি লক্ষিত হয় তাহা নহে—দণ্ডের পরিণামেও সেই বন্ধনের রীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতেই দণ্ডের পর যেস্থানে অপরাধী-দিগকে আবদ্ধ রাখা হয়—তাহার নাম হইয়াছে "বন্ধন-বেশ্ম", "বন্ধনালয়।" 'বন্ধন' শব্দের আদি রজ্জু অর্থও হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তিও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে— "বধ্যতেঽনেনেতিকরণব্যুৎপত্ত্যা।" 'বদ্ধ করা হয় ইহা দ্বারা' এইরূপে করণবাচ্যে ইহা সাধিত হইয়াছে। ইহাতে কারাগারেও যে অপরাধীদিগকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়! 'কারাগারে'র কারা শব্দটী পর্য্যন্ত বন্ধনের অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং 'কারাদণ্ড' শব্দে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হওয়ারূপ দণ্ড বুঝাইলেও আদিতে ইহা বন্ধন-দণ্ড পাওয়ার অর্থই যে প্রকাশ করিত আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি।

'দণ্ড' যে কেবল রাজ-শাসনেরই অস্ত্র ছিল তাহা নহে, ইহা সাধারণ শাসনেরও অস্ত্র ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইহার অতি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশুদিগের শাসন সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে "Spare the rod and spoil the child"—এস্থলে 'rod' স্পষ্টই দণ্ডের বাচক। প্রবাদটির অর্থ এই "যদি দণ্ড অর্থাৎ বেত্রাদি ব্যবহার না কর (তবে) শিশুকে বিগ্‌ড়াইয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" সংস্কৃতেও তদনুরূপ বাক্য পাওয়া যায় যথা—"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।"

"পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আদর করিবে—দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না করিবে॥"

"লালনে বহবো দোষা স্তাড়নে বহবে
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ ॥"

"লালনে বহু দোষ এবং তাড়নে বহু গুণ—অতএব পুত্র ও শিষ্যকে তাড়না করিবে কিন্তু তাহাদের প্রতি আদর দেখাইবে না।"

এখানে "তাড়ন" শব্দে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারই যে বুঝাইতেছে— তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সংস্কৃতে দণ্ডের শাসন সম্বন্ধে আর একটী অতি স্পষ্ট বাক্যও আছে; যথা—"মূর্খানাং লাঠ্যৌষধিঃ ॥" মূর্খদিগের লাঠীই ঔষধ অর্থাৎ হিতকারক অস্ত্র।

ইংরেজীতে Birch শব্দে যেমন বৃক্ষ বিশেষকে বুঝায়— তেমনই শিশুদিগের শাসন-দণ্ডরূপে ব্যবহৃত ইহার শাখাকেও বুঝায়।

সাধারণ শাসন সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়—

"ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতাচ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যা স্যুরজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

"পত্নী, পুত্র, দাস, শিষ্য, সোদর ভ্রাতা ইহারা অপরাধ করিলে রজ্জু বা বংশদণ্ড দ্বারা তাড়নীয় হইবে ॥"

এ স্থলে আমরা বন্ধনাস্ত্ররূপে রজ্জুর উল্লেখ না পাইয়া তাড়নাস্ত্ররূপে উল্লেখ পাইতেছি। পাশ্চাত্যদিগের lash, scourge ও whip অর্থাৎ চাবুকে আমরা তাড়নাস্ত্ররূপে রজ্জু ও দণ্ড উভয়েরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। আমাদের কশা, চর্ম্ম, যষ্টি বা চর্ম্মদণ্ডও, চাবুকেরই মত রজ্জু ও দণ্ড সংমিশ্রিত অশ্ব তাড়নাস্ত্র।

এই প্রকারে রজ্জু ও দণ্ডের সহিতই সকল শাসনের যোগ দেখা যাইতেছে। আমরা দণ্ডের ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে প্রথমেই যে বধের উল্লেখ পাইয়াছি তাহাতেও এই যোগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। বধ-দণ্ডটী সাধারণতঃ "উদ্বন্ধন" নামে অভিহিত। এই উদ্বন্ধন যে বন্ধনের দ্বারা হয় তাহা শব্দার্থ দ্বারাই প্রকাশ পায়। উদ্বন্ধনের শব্দার্থ দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে বন্ধন বুঝায় অর্থাৎ যাহাতে ঝুলাইয়া বাঁধা হয় তাহাই উদ্বন্ধন। উদ্বন্ধনের প্রচলিত শব্দ ফাঁস বা ফাঁসি। ইহাতে আমরা যেন 'পাশ' শব্দেরই অপভ্রংশ দেখিতে পাই। 'পাশের' অপভ্রংশে 'ফাঁস' হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ফাঁস হইতেই ফাঁসি হইয়াছে। বরুণের শাসনাস্ত্র "পাশ" এইরূপেই ফাঁসে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাগুক্ত আলোচনা হইতে আমরা দণ্ডের প্রথম ইতিহাস ইহাই উদ্ধার করিতে পারিতেছি যে, রজ্জু ও দণ্ডই প্রথমতঃ শাসনাস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইত। দণ্ড, রজ্জুর পরে উদ্ভাবিত বলিয়া উভয় শাসনাস্ত্র এক 'দণ্ড'-নামেই পরিচিত হয়। পরিশেষে দণ্ড শাসনের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া বস্তু হইতে ক্রিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতেই দণ্ড এক্ষণে শাসনমাত্রেরই বোধক হইয়াছে। এই সাধারণ শাসনার্থ হইতেই দণ্ড শব্দ—দণ্ডের দ্বিতীয় "অর্থ-গ্রহণ" অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে দণ্ড ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়া শারীরিক শাসন হইতে ক্রমে নৈতিক শাসনের অর্থ লাভ করিয়াছে। "দণ্ডনীতি" দণ্ডের এই অর্থ-গৌরবেরই আভাস প্রদান করে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# টুপি

আমাদের এ লাইনের দুখানা জাহাজের হঠাৎ স্বশরীরে বসোরা-লোক প্রাপ্ত হবার কারণ যে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে কি মুখুয্যে মশায়দের পদধূলি নয় সেটা নিশ্চয়। আজন্মত্রিসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মেখে, গঙ্গাজলে নিয়ত ডুবে থেকে, ও গঙ্গার বাতাস সেবা করেও জাহাজ-দুখানা মায় তাদের পুরানো তক্তার ঘুণ, বেঞ্চি-গুলোর ছারপোকা-শুদ্ধ গোলোকে না গিয়ে কেন বরাবর বসোরার গোলাপবাগে হাজির হয়, এর সঙ্গে অবিনের বুকের মাঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-পড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা সেটা আবিষ্কার করতে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটার ষ্টিমারে পাশের বেঞ্চে একটু জায়গা কোনোরকমে দখল করে চলেছি—একটু হাওয়া খেয়ে আসবার আশায়; কিন্তু দুরদৃষ্ট—এক জাহাজ বটে কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন প্রায় তিন জাহাজ! তার উপর খালাসী আছেন, সারেং আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বেতে-ছাওয়া চৌকি আছেন আর আছেন সমস্ত পুলিশ কোর্টটি! ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আটির মতো কোনো গৃহিনীর ফরমাস-দেওয়া আফিসের ফেরতা মার্কেটের ফুলকপি, শনির তাগাদা-মতো সা ও লা কোম্পানির গ্রীণ্ সিল্ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছিল না! এই সময় অবিনকে আহিরি-টোলার ঘাটে তার বাঁয়া-তবলা গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল কাপড়ে বাঁধা বিশ্বসঙ্গীতের মোটা পুঁথি-বগলে জাহাজ ধরতে দেখে মন আমার 'হা হতোস্মি' বলে মুর্চ্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু স্থান পেলে না;—দাবা-বোড়ের আটঘাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারা কিস্তি-মাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিস্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গঙ্গার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আস্তে আস্তে চলেছে। আশপাশের মানুষের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড় করে দেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিস—তীরের ও নীরের কিছু আজ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুণ্ডুর উপরে কেবল দেখছি প্রকাণ্ড খোট্টাই টুপির মতো আধখানা সূর্য্য,—যেন লাল সাটিন কেটে দর্জ্জি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট্ করে নিতে চাচ্ছে! টুপির রহস্যে মনটা আমার যখন বেশ মগ্ন হয়েছে সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে অবিন আমায় ডাক্‌লে—"ওহে এদিকে এসো!" সঙ্গে সঙ্গে অবিনের হাত এসে ছোঁ মেরে আমাকে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে লাষ্ট ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে এনে উপস্থিত কল্লে।

চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড অল্ থেকে চটকানো কাপড়ের স্যুট্টার মতো মানুষের

ঐ চাপন থেকে অবিন যখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেল্লে তখন কি যে সোয়াস্তি পেলুম! আঃ, জাহাজের এই অংশটা ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে বরাবর গড়িয়ে এসে একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে ভদ্র-য়ানার চাপ একআনাও নেই;—খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া যত খালাসী সূর্য্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস সারি-গানের সুরে জমিয়ে তুলেছে।

সে একটি ছোকরী,—হয় তো ঠিক ছোকরা বলতে যতটা বোঝায় বয়সটা তার চেয়ে বেশী হলেও হতে পারে—কিন্তু মুখ-চোখ তার এখনো কাঁচা। জগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার দেরী আছে সেটা বুঝলুম; এবং তার মুখে এই গানটা আমায় ভারি অদ্ভুত ঠেকল—

উত্তর থিকে অ্যালো বঁধু ভাঙা নায়ের গুণ টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা!
বঁধু মুখের মধুর হাঁসি, ন্থেথলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে ভরা ঠিক যেন চিনির পানা!

কলাই-করা ডেকচির বাঁয়া-তবলার তালে তালে মাথা দোলাতে দোলাতে—ওই বঁধু, চাঁদ, চিনির পানা, নয়ান জল এবং উত্তর থেকে গুণ টেনে ভগ্ন তরীর আসার মধ্যে সারবস্তু কিছু উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বেঞ্চির তলা হয়ে জাহাজ টোপ্‌কে একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথায় চড়ালেও টুপিটা ছিল নিতান্ত আমারি, সুতরাং আমি যখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই সময় পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে ফিরে দেখলেম সেই খালাসী ছোকরা তার সব ক'পাটি দাঁত বের করে হাস্‌ছে আর হাত-তালি দিচ্ছে—আমারি দিকে চেয়ে। আমার তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না। নগদ সাড়ে-সাত টাকা মূল্যের হোসেনবক্সের দোকানের নতুন টুপিটা জলে যাওয়া থেকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অবিনের পাশে এসে বসেছি সেই সময় সেই ছোক্‌রা খালাসী আমাকে এসে সেলাম করে বল্লে—"হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন! মাথা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড় খুসি হই। ওটা জলে গেলে আমি আরো খুসি হতুম। টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি। ছেলেবেলায় আমার বাপ আমাকে কখনো টুপি পরতে দেন্‌নি। তিনি বলতেন—লণ্ঠনের উপর গেলাপ্‌ ঢাকা দিলেও যা, মানুষের মাথায় টোপি চাপালেও তা,—আলো পাওয়া শক্ত হয়। টোপকে মাছ যেমন এড়িয়ে চলে, ছেলেবেলা থেকে—কি দেশী কি বিদেশী—সব টোপিকে তেমনি ভয় করে কেবলমাত্র খোদার দেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি বড় হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বাপ একদিন যে কালো টোপি মাথায় পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো রং ধোয়া কাপড়ের মতো, এই গঙ্গাজলের ফেনার মতো, পুন্নিমার ওই চাঁদের জোছনার

মতো সাদা করে নিয়ে খোদাতালার দরবারে হাজরি দিতে চলে গেলেন।

"মা তো ছিলেননা, বাপও গেলেন—এক ছেলে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক রেখে! কিন্তু বেশিদিন আমাকে অনাথ থাকতে হল না। অনেক জুটলো, এ গরীবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক জুট্‌লো ;—এত জুটলো যে তাদের ভিড়ে আমার সদর ও অন্দর ভর্ত্তি হয়ে শেষ আমার মালখানা তোসাখানা আস্তাবল পর্য্যন্ত সরগরম গুলজার হতেও বাকি রইল না। আমার মাথা খালি দেখে বাপও কোনদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে ব্যস্ত হন্‌নি এবং মাও কখন দুঃখ পান্‌নি ; কিন্তু এরা আমার মাথায় টুপি না দেখে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার খালি মাথার পর্দ্দা রাখবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল এবং মৌলবীসাহেবরা যতদিন না বিচ্‌মিল্লা বলে জাঁকালো একটা খুব উঁচু টুপি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না! টুপিটা বাইরে খুব জম্‌কালো—জরী জরাবতের কাজ, আর ভিতরটায় গাধার চামড়ার গদী লাগানো! তারা এমন চমৎকার করে সে টুপিটা বানিয়েছিল যে টুপি-পরা কোনোদিন অভ্যেস না থাকলেও সেটা পরতে আমার কোনো কষ্টই হল না।

"নতুন গোঁফ উঠতে আরম্ভ হলে যেমন সময়ে-অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা যায় না—তেমনি এই টুপিটাকে যখন-তখন মাথায় দিয়ে আমি বেড়াই। টুপির গুণে আমার মুখ দেখতে-দেখতে বুড়োদের মত গম্ভীর, আমার কথাবার্ত্তা চালচলন খুব পাকা আর মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্‌চকে ও চওড়া হয়ে উঠলো। ঐ টুপিটা দেখলেই রাস্তার লোকেরাও আমাকে খুব বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত এবং আরো কত-কি বলে দুহাতে সেলাম ঠুকতে লাগলো আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে দুবেলা মহল-ভরা আমার মা-বাপেদের পায়ে তেল দেবার জন্যে হাজির হতে লাগল।

এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কি-রকম সর্ব্বগ্রাসী ধূমধামের সঙ্গে যে দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন! এতগুলো শ্বশুর-শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে আমার স্ত্রীর কী সে যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারা প্রাণত্যাগ করলে আর সাতরাজার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের ঝুলির মতো করে বোগদাদের রাস্তায় রাস্তায়—মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায় উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অনাদর কল্লেনা বটে কিন্তু টুপি যাঁর মাথায় বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটি গোল টাক-ওয়ালা মানুষটিকে দেখলেম কেউ খাতিরেই আনতে চাইলে না—সেই দুঃখের দিনে।

"কতকাল টুপি-পরার এই ফল—অনেক তদবিরের এই টাক—এ'কে আবার সেই টুপিতে ঢেকে বোগদাদ ছেড়ে আমি বসোরার দিকে রওনা হলুম। যদি কেউ

না জোটে তবে টুপির একটা দোকান খুলে দেশশুদ্ধকে টুপি পরিয়ে তবে ছাড়বো! অবিশ্যি এ বুদ্ধিটা বোগদাদে থাকতে-থাকতেই আমার মাথায় যোগালে হোতো ভালো, কিন্তু কে জানে, ঐ টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বাকান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারি গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে—বসোরায় এসে পৌঁচেছি। সেখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না! গোলাপফুলের পাপড়ির গোড়ে-মালা গেঁথে তারা পাগড়ির মতো কিংবা আপনাদের ঐ শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথায় জড়িয়ে রাখে। বোগদাদে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না, তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-প্রমাণ টাকটি! যেখানে কেউ টুপি পরে-না সেখানে সর্ব্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কি আতঙ্কে আর অসোয়াস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলি মনে হতো বসোরার এই গোলাপফুলের খোসবোতে ভরা জোর-বাতাসে যেদিন আমার এ টুপিটা উড়ে যাবে সেদিন গাধার রোঁয়ার আস্তরের আওতায় টাক্-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোবো! বসোরায় যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপী ঠোঁটের মধুর হাসিও অনেক,—সেই হাসির তুফানের ঝাপ্‌টা থেকে টাক বাঁচাতে আমাকে কি ভোগই না ভুগতে হচ্ছিল। টুপিটা আমার মাথার কুরুনী পোকার মতো;—তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত, তাকে রাখলেও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

"এই সময় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা,—আমি প্রেমে পড়লেম! আসকের আগুন যদি মগজে জ্বলতো তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম কিন্তু সে যে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেন-নি। দুনিয়াকে রোসনাই দিতে সে বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন—বুকের মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক সামাদানে। সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলেম তাকে কি সুন্দরীই দেখলেম! যদিও সে বসোরার গোলাপবাগের খুব ছোট ফুল বৈ বড় ফুল ছিল না। সেই দিন আমি সবপ্রথম খোদাতালার কাছে হাত-পেতে ভিক্ষে চাইলুম আমার ছেলে-বেলাকার সেই কোঁকড়াচুল খালি মাথা! হাসবেননা বাবু, সবাই চায় খোদার কাছে বড় হতে, আমি বল্লেম—'আমায় ছোট কর'। দুনিয়া ছিষ্টি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু কি আমিই চেয়েছি, কত লোক চেয়েছে, পেয়েছে, এখনো চাচ্ছে দেখুন না—"

আমি সেই ছোকরার কথায় নদীর পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলেম পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখমলের বড় টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের শিয়রে কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর নদীর পূবপারে চাঁদনী রাতে নতুন জ্যোৎস্না, তারি তলায় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশীতে সাহানার সুর বাজছে।

সেই নতুন রাতের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বড়বাজারের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যেস-মতো অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাক হয়ে বল্লে,—"সে কি! তোমার পাশেইতো সেটা ছিল!"

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমরা দুই বন্ধুতে নামলেম খালি মাথা। তার পর দিন সে জাহাজখানাও বসোরায় চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সে ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সার্ব্বজনীন কল্যাণ

## ( ক্রপটকিন হইতে )

সার্ব্বজনীন কল্যাণকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—এটি পুরোপুরি বাস্তব এবং কার্য্যত সম্ভব। সার্ব্বজনীন কল্যাণের মধ্যে মানব-সাধারণের মনুষ্যোচিত জীবন-ধারণের চেষ্টাই নিহিত। এর অর্থ, মানুষ যাতে মানুষের মত বাঁচতে এবং তাদের কাজ-চালাবার ও সমাজ-রক্ষার জন্যে উপযুক্ত সন্তানপালনের সুবিধা পায়। এতদিন কর্ম্মী-সম্প্রদায় মুখ বুজে, পশুর মত জীবনযাপন করে' পরের জন্যে খেটে মরেছে; এবার তাদের মানুষের মত বাঁচবার দিন এসেছে—মানব-সাধারণের বঞ্চিত অধিকার লাভের পক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দী মাহেন্দ্রক্ষণ।

কর্ম্মী-সম্প্রদায় যদিও সভ্য লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, তবু তাদের উৎপাদিত ফসলে প্রত্যেকেই সুখেসচ্ছন্দে থাকতে পারে। বেশীর ভাগ, যে-সকল ধনী পরের পরিশ্রম-প্রসূত ফসলের আয়ে আলস্যে সময় ও পরিশ্রমের অপব্যবহার করেছেন এবং অপরের প্রাপ্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, তাঁদের যদি পরিশ্রমে বাধ্য করা হয় তবে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা। Malthusএর theory অনুসারে অনেকে মনে করেন যে, খাদ্যবৃদ্ধির অনুপাত জনবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম; কিন্তু তার বিপরীত কথাটাই বেশী প্রামাণিক;—যেখানে লোকসংখ্যা বাড়ে, খাদ্য তার চেয়ে বেশী বাড়ে;—কারণ, সেখানকার ভূমির প্রসবশক্তি আবশ্যকের সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। সকল দেশের ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই জনবৃদ্ধির অনুপাতে মাটীর প্রজনন-শক্তি ত বর্দ্ধিত হয়েছেই, এমন-কি, কোথাও কোথাও দশগুণ পর্য্যন্তও বেড়ে গেছে।

হয়ত ভাল অবস্থায় পড়লে আরও অনেক গুণ বাড়তে পারত, কারণ পৃথিবীর ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলস ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও বেড়ে চলেছে।

দেশের অর্থ কয়েকজন ব্যবসায়ী বা ধন-কুবেরের হাতে জমা হবার বদলে ধনী-মুখাপেক্ষী বারো ভূতের করতলগত হচ্ছে—কিন্তু তা'তে দেশের ধনবৃদ্ধির কোন সহায়তাই হচ্ছে না।

কেবল তাই নয়; মূলধনের মালিক জিনিষ-উৎপাদনের পথে বাধা দিচ্ছে—যাতে উৎপন্ন সামগ্রী সবাইয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় সেদিকেই তার দৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ লোক শীতের দিনে কয়লার অভাবে কেঁপে মরছে। কিন্তু কয়লার খনির অধিকারী কর্ম্মোৎসুক খনককে সপ্তাহে মাত্র তিনদিন খনিতে কাজ করতে দেয়। হাজার হাজার তাঁতি তাঁত বন্ধ করে' বসে আছে—তাদের স্ত্রী-পুত্রের ন্যাকড়া মাত্র অঙ্গের আবরণ, আর লক্ষ লক্ষ লোকের অঙ্গাচ্ছাদন পোষাক নামেরও অযোগ্য। হাজার হাজার কল-কারখানা বছরের মধ্যে কতবার বন্ধ রাখা হচ্ছে, অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে কারখানার দ্বারে দ্বারে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, এমন-কি অনাহারে প্রাণ-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

যদি এই-সমস্ত লোককে কাজের অধিকার দেওয়া হয়, যদি সমস্ত খনি-কারখানায় সপ্তাহ-ভোর কাজ চলে, তবে এই কর্ম্মীদের সানন্দ ও আন্তরিক পরিশ্রমে আমাদের ধূলার পৃথিবী সোনার হয়ে উঠবে। কিন্তু মানুষের এই সম্পদ অর্জ্জনের পথে বণিক ও কল-কারখানার মালিক তাদের সঞ্চয়-বাসনার কাঁটা পুতে রেখেছে।

এ-সব ত সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক। পরোক্ষ-ভাবেও ফসলের যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে। ধনীর বদখেয়াল চরিতার্থ করতে বা অসার বিলাস-সামগ্রী তৈরী করতে যে খাটুনিটা বাজেখরচ হয় সেটাও ধর্ত্তব্যের বিষয়। আরও অনেক রকমে কর্ম্মী-সম্প্রদায় পণ্ডশ্রমে বাধ্য হয়ে ফসলের ও কারখানায় প্রস্তুত সামগ্রী-উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। বাজার-দখলের চেষ্টায় জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ চলে তার সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করতে যা ব্যয় হয় সেটাও বাজেখরচ বই আর কি? নিষ্কর্ম্মা অথচ নামজাদা চাকুরেদের মাহিনায় যে মোটা টাকাটা খরচ হচ্ছে তা আমাদের লোকসানের অঙ্কই বাড়িয়ে তুলেছে। তারপর বিচার-প্রহসনে যে-সব বিচারপতি পুলিশ পাহারা শান্তিরক্ষার বিচিত্র অভিনয় এবং বাস্তবিক পক্ষে দেশের অশান্তি-বৃদ্ধিই করছেন তাঁরাও বিনা-শ্রমে দেশের ও দশের শ্রমলব্ধ অর্থশোষণ করছেন; অথচ কর্ম্মী-সম্প্রদায় বছরের পর বছর দশের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটেও কায়ক্লেশে দিন-গুজরাণ করতে অপারগ। বড়লোকের সখের কুকুর ও ঘোড়া প্রভৃতির আস্তাবলে ও বৈঠকখানায় যারা দাসত্ব করছে তারাও মস্ত-একটা বাজে খরচ। এই-সমস্ত বাজেখরচ যদি দশের উপকারে লাগান হয় তবে আমাদের সম্পদ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং কল-কার-খানায় উৎপন্ন যন্ত্রপাতিতে দোকান ভরে ও জিনিষ-পত্র সস্তা হয়ে সাধারণের অনায়াসলভ্য হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে দেশের সিকিভাগ লোক বছরে তিন-চার

মাসের মত কর্ম্মহীন হয়ে বসে' থাকতে বাধ্য; আর,—প্রায় অর্দ্ধেক না হোক—অন্তত আরও সিকিভাগ লোকের পরিশ্রম ধনীর বিলাসলালসা চরিতার্থ এবং সাধারণের অর্থশোষক সামগ্রী তৈরী করতে ব্যয়িত হয়।

এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সভ্য-সমাজে একদিকে যেমন ফসল বাড়াবার শক্তি আছে অন্য দিকে তেমনি সেই বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকও আছে যথেষ্ট—তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে-ভাবেই হোক না কেন! কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, দেশের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতির উপরে আশাতীত প্রাচুর্য্য নির্ভর করছে; কারণ, কেবল মজুরদল নয়—মানব-সাধারণের একজোট চেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের সকল অভাব দূর হয়ে যাবে। আমাদের আহার, পরিচ্ছদ ও সংসার-সামগ্রীর দৈন্য ত থাকবেই না, বরং আমাদের অবসর ও শক্তি কোন্ কাজে লাগাব এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

না, প্রাচুর্য্যের কথাটা নিতান্ত স্বপ্ন নয়—একেবারে বাস্তব। যখন হাতে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্র তৈরী করতে হতো, যখন এক-কাঠা জমীতে একমুঠো শস্য উৎপাদন করাও কষ্টকর ছিল, তখনকার পক্ষে এটি অবশ্য স্বপ্নকথা! কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বজোড়া সভ্যতার দিনে, মানুষের দৈহিক শ্রমলাঘব-কারী যন্ত্রপাতির দিনে এটি আর বাজে স্বপ্ন নয়—কার্য্যত সম্ভব!

কিন্তু, যদি এই প্রাচুর্য্য কার্য্যে পরিণত করতে হয় তবে যুগে যুগে সঞ্চিত মানুষের বিরাট মূলধন, লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা-খনি, কৃষিভূমি, পল্লীনগর ও শিক্ষা,—সমস্তই জনসাধারণের অধিকারভুক্ত করতে হবে, একচেটে ব্যবসায়ীর বা বিত্তশালীর খেয়ালের অধীন রাখলে চলবে না; কারণ, এই প্রাচুর্য্যের উপরেই আমাদের শক্তি ও শান্তি নির্ভর করছে। বহু পরিশ্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যা গড়ে গেছেন বা আবিষ্কার করেছেন সেই সঞ্চিত ও ক্রমশ-বর্দ্ধমান সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং সঙ্ঘের চেষ্টায় সকলের উপকারে ব্যয়িত হবে।

ধনীদের অন্যায় অধিকার-চ্যুতিই সার্ব্বজনীন কল্যাণসাধনের একমাত্র উপায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপর সভ্যসমাজে কেবল চিন্তার ও ভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু ধনীদলের চেষ্টায় সে চিন্তা বা ভাব কার্য্যে প্রকাশ পায়-নি; বর্ত্তমান শতাব্দীতে সেই চিন্তা ও ভাবই সামাজিক বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ধনী-নির্ধন সকলেই অল্পবিস্তর বুঝতে পেরেছেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানের ইতিহাসে এই অধিকারচ্যুতিই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা; কারণ, মানব-সভ্যতার সব-চেয়ে বড় কথাটা এরই মধ্যে সফল হয়ে উঠবে। কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট কোন শক্তি এ পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারবে না—সাধারণের একজোট চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হবে, এই মহান কল্যাণকর পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে আর বলছে, এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এ

প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, সভ্য-সমাজের ঘরে ঘরে আমাদের প্রচার করতে হবে—সকলেরই বাঁচবার সমান অধিকার আছে,—সমাজে সে যে স্থানই দখল করে থাকুক না কেন? হোক সে ধনী বা নির্ধন, সুস্থ বা রুগ্ন, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। আমাদের বলতে হবে, সমাজস্থ সবাই সমাজের প্রত্যেক জিনিষের সমান ভাগীদার। এ-কথা শুধু মনে স্বীকার করলে বা কাগজে লিখে প্রচার করলে চলবে না, প্রাণে প্রাণে এ সত্য বিশ্বাস করতে হবে, এই কথা-অনুসারে কাজ করতে হবে।

এই কাজের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সামাজিক বিদ্রোহ—অধিকারচ্যুতি। আমাদের এ বিদ্রোহে গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা নেই, গোলাগুলি রক্তপাত নেই; এর মধ্যে আছে উদার মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগ ও যথার্থ বীরত্ব,—যা প্রাণহননের পরিবর্ত্তে প্রাণরক্ষারই সহায়তা করে। অন্য শব্দের অভাবে আমরা এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনকেই বিদ্রোহ নামে অভিহিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

অনেকে মনে করেন, অধিকারচ্যুতি মানে, ধনীদের সিন্দুক ভেঙ্গে তাদের সঞ্চিত সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়া; সেটা কিন্তু নিতান্ত ভুল ধারণা;—কেননা, আমরা চাই যাতে প্রত্যেক মানুষ জীবনধারণের উপযোগী ব্যবসা শিখতে পায়, যাতে লোকে কোন মালিক বা মহাজনের অধীন না হয়ে সুবিধামত আপনার শিক্ষা ও শক্তি কাজে লাগাতে পায় এবং মানুষের মত বাঁচবার জন্যে যাতে কোন প্রভুকেই কর দিতে না হয়। অর্থাৎ কাউকে আর দিন-গুজরাণের জন্যে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বা অর্দ্ধ-অনশনে পরের কারখানায়, খনিতে বা মাঠে অনর্থক বুকের রক্ত ঢালতে হবে না। ধনীদের অর্থ যদি আমাদের কোন উপকারে আসে তবে সেটা জনসাধারণের সুবিধার জন্যে যন্ত্রপাতি বা শস্য-উৎপাদনের উপযোগী কোন কাজে ব্যয়িত হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা অনেক বিদ্রোহের কথা পড়েছি, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ দোষের জন্যে সে-সব চেষ্টা যথেষ্টরূপে সফল হয়-নি। আমরা কিন্তু রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হব—নিজের বা দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, সুবিধা বুঝে কাজ করলে পুরাণো ভুলেরই পুনরভিনয় হবে, প্রকৃত কাজ কিছুই হবে না। এই বিদ্রোহের প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জনসাধারণ উদর-পূর্ত্তি করে' খেতে পায়, লজ্জানিবারণের যোগ্য বসন পায়, মাথা রাখবার মত স্বাস্থ্যকর ঠাঁই পায়; তবেই-ত তারা বুঝবে যে, মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম তাদের ব্যথা বোঝবার বন্দোবস্ত হয়েছে, তাদের কাজে-খাটাবার আগে তাদের অভাব-অভিযোগ মেটানো হয়েছে—তবেই ত আমাদের প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু, কোন বিশেষ সভা বা কোন কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা এ-সব কাজ করতে গেলে কিছুই হবে না, প্রত্যেককেই কোমর বেঁধে ধূলা মেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে, জন-সাধারণের নামে তাদের শ্রমলব্ধ সমস্ত সম্পদ ধনীদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে—পরণের কাপড়, শয়নের ঘর,

স্বাস্থ্যকর খাদ্য—এককথায় মানুষের মত বাঁচতে হলে যা-কিছু দরকার, সবই তাদের অনায়াসলভ্য করতে হবে। একজনের বা একদলের সুবিধা নয়—জনসাধারণের সুবিধা-সাচ্ছন্দ্যের দিকেই আমাদের সকল চেষ্টা একাগ্র করতে হবে—যাতে মানুষ বাঁচতে পায় এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির জন্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে বাড়তে পায়।

একটা তর্ক আছে। অনেকে বলছেন, 'স্বীকার করলুম, কোন দেশে এমনধারা পরিবর্ত্তন সাধিত হল এবং সঙ্ঘের সকলেই সমান অধিকার লাভ করলে। কিন্তু ধর, যদি অন্যদেশ থেকে কোন ধনী মহাজন এসে সেই দেশে বাস করে এবং কারখানা খুলে বা বাণিজ্য করে' দেশের সম্পদ-আহরণের চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা দেবার উপায় কি? এ-কথা কোনমতেই বলা যায় না যে, সব দেশে একই সময়ে এই বিদ্রোহ ঘটবে, তা-ছাড়া তোমাদের শান্তি-রক্ষার জন্যে ত পাহারাদার সৈন্য থাকবে না?"

এ তর্ক যাঁরা তুলছেন, তাঁরা নিতান্ত একদেশদর্শী। মূলধনী মহাজন, কারখানার মালিক বা জমিদার সবাই একই উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং সে উপায় হচ্ছে অভাবগ্রস্ত কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ। কিন্তু এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পর যদি দেশে কারও কোন অভাব বা অসচ্ছলতা না থাকে তবে তারা শ্রম বিক্রয় করবে কিসের জন্যে! যদি স্বাধীন থেকে নিজের ক্ষেতে-কারখানায় বা খনিতে তারা কাজ করতে পায় তবে অপরের দ্বারস্থ হবার তাদের দরকার কি? অন্যদেশ থেকে কোন ধনী অর্থসঞ্চয়ের মৎলোবে সে-দেশে এলে, ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাকে ফিরতে হবে—সৈন্য-সাহায্যে তাকে বিদায় দিতে হবে না।

বর্ত্তমানের মনীষী, কবি ও বৈজ্ঞানিক আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, কর্ম্মী-সম্প্রদায় যে-দিন নিজেদের কলে, খনিতে ও মাঠে কাজ করবে, যে-দিন অশন-বসন-শয়নের জন্যে কাউকে কর দেবে না, সে-দিন এল বলে! অদূর-ভবিষ্যতের সেই শক্তি, শান্তি ও প্রাচুর্য্যের উৎসব-দিনের অপেক্ষায় ধরিত্রীর অঙ্গনে আমরা উৎসুকনেত্রে পথপানে চেয়ে আছি।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

---

# হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী রমণী

## ( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার চির-ব্রহ্মচর্য্য—এইগুলি ভারতীয় সমাজের খাঁটি লক্ষণ-পরিচায়ক মুখশ্রী। কিন্তু, সমাজ-সংস্কারকেরা জোর করিয়া যে সকল য়ুরোপীয় রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভারতবাসীর শিক্ষা, অভ্যাস, বিশ্বাস, সমস্ত জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপ্রণালী, তাহার বিরুদ্ধ।

*
* *

হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা; পরিবারের পুরুষ-পরিজনেরা পর্য্যন্ত তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্ব-হইতে সাবধান হইবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অ-বিভক্ত স্বত্বাধিকার-নিয়মের কল্যাণে, একশো দুশো লোক প্রায়ই এক বাড়ীতে বাস করে; কি পুরুষ, কি রমণী উভয়ই স্বল্পবাসাচ্ছাদিত; এইরূপ ঘরের ভিতর বন্ধ হইয়া না থাকিলে পারিবারিক নীতির দশাটা কি হইত বলা যায় না।

অন্তঃপুরে থাকে—গৃহস্বামীর মা, স্ত্রী, মেয়ে, বৌ, ছোট ছেলেদের বাগ্‌দত্তা বধূ; তাছাড়া বড়মানুষের বাড়ীতে কতকগুলা দাসী।

পরিচ্ছদ:—ছোট জামা, ছোট ছেলেদের জন্য কামিজ, স্ত্রীলোকদের জন্য কাঁচুলী, শাড়ী—যাহা কোমরের চারিদিকে জড়াইয়া, বাহুর নিচে দিয়া বাহির করিয়া, মাথার উপরে আনিয়া ফেলা হয়। বঙ্গদেশে কেবল একখানা শাড়ী মাত্র। বিবাহিতা রমণীর কপালে একটা লাল ফোঁটা; তাহার সুন্দর চুল তেল দিয়া আঁচ্‌ড়ানো; অলঙ্কারের সমধিক প্রাচুর্য্য।

কাজের মধ্যে—ঘরকন্নার কাজ, রাঁধা-বাড়া, তাস প্রভৃতি খেলা, গল্প-শোনা বা গল্প-পড়া, তাছাড়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়া। গরিব স্ত্রীলোকেরা, কাজ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়; ধনী গৃহের স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ গৃহের বাহির হয়, তাহারা পর্দ্দার ভিতর অবগুণ্ঠিতা; কখন কখন তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়, এবং প্রায়ই পূজা-অর্চ্চনার জন্য মন্দিরে যায়।

"বিষবৃক্ষে" অন্তঃপুরের বর্ণনা এইরূপ আছে:—"একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিত-কেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং উঁ উঁ করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল, কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা সিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন; কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন, কেহ কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া সিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্‌গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাসুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন, কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদু ভৎ‌র্সিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক অনেক

উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন। যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন; যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য-কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক-একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন।"

গৃহিণী, বাড়ীর সকল মেয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। কোন প্রবল জমিদারের পত্নী কিম্বা কোন ধনী বণিকের পত্নী, গরিব মা-বাপের কষ্টের অবস্থা হইলেও সর্ব্বজনবাঞ্ছিত য়ুরোপীয় রমণীর অবস্থা লাভ করিতে অস্বীকৃত হইবে। যে বাল-বিধবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর দাসী হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবস্থা অবশ্য শোচনীয়, কিন্তু যে বিধবা পুত্রবতী, সে স্বীয় শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর, স্বীয় পুত্রবধূর উপর যেরূপ প্রভুত্ব করে সেরূপ প্রভুত্ব য়ুরোপে অপরিজ্ঞাত।

*

* *

অন্তঃপুরের পর অন্দর-মহল। মুসলমানীরা সম্যক্ বাসাচ্ছাদিতা; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, চওড়া পা-জামার উপর, একটা বিপুল জামা। উৎসব-পার্ব্বণে, খুব দামী ঝক্‌ঝকে রংএর পরিচ্ছদ। মাথায় খুব ঝিক্‌মিকে দামী পাথরের সিঁথী।

তাহাদের জীবনটা এক-ঘেয়ে, কিন্তু—যদি একজন মুসলমান লেখকের কথা বিশ্বাস করা যায়—তাহাদের সান্ত্বনা আছেঃ—

(১) "বহু শতাব্দীর ব্যবহারে স্বীয় স্বভাবের মধ্যে যাহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেই অভ্যাসের বলে, মুসলমান-মহিলা বাহিরের লোকের সহিত মেলামেশা কারবার সুখ যদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন নিতান্ত একঘেয়ে বা অসহ্য নহে। মুসলমান-মহিলা স্বীয় গৃহের অধীশ্বরী; সমস্ত গার্হস্থ্য ব্যাপারের উপর তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত। সমস্ত গৃহের শাসন-ভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। সেখানে তাঁহারই মতামতের প্রভাব সব-চেয়ে বেশী। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত গৃহের কোন বিভাগের কাজই করা যায় না। যদি ছেলেদের জন্য, স্বামীর জন্য বা আর কাহারও জন্য কিছু করা আবশ্যক হয়,—তাঁহারই পছন্দ সবচেয়ে সেরা বলিয়া বিবেচিত হয়। স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রের তিনিই কাপড় পছন্দ করিয়া দেন। প্রাচ্য ভূভাগে, কোন ব্যক্তির পরিধান-বস্ত্রের পারিপাট্য ও কেতার মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর নৈপুণ্যই প্রতিভাত হয়। ভাল করিয়া মুখ-হাত না ধুয়াইয়া, ভালরকম কাপড় না পরাইয়া তিনি তাঁহার ছেলেদিগকে বাহিরে যাইতে দেন না। তিনি স্বয়ং রান্নাঘরে গিয়া সমস্ত রান্না চাখিয়া দেখেন, পাছে রান্নায় বেশী নুন বা কম নুন হয়। যদি তাঁহার স্বামীর নিকট কোন অনুগ্রহ যাচ্‌ঞা করা আবশ্যক হয়, তিনি জানেন কিরূপে তাহা আদায় করিতে হয়। যখনি

(১) Mahammad Barakatullah : Mahamedan Women in India (British Empire Series) p. 377.

দেখেন তাঁহার স্বামী ভাল মেজাজে আছেন, তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া তখনি তিনি সহজেই নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লন। স্বামীকে "মশারীর ভিতর বক্তৃতা" দিতে জগতের কোন রমণী অপেক্ষা তিনি কম পটু নহেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রমণীর যুক্তির ধারা একইপ্রকার। তাই মুসলমান স্বামী কোন একটা বিষয়ে স্ত্রীকে কিছুতেই লওয়াইতে না পারিলে শেষে শুধু এই কথাটি বলিয়াই স্ত্রীর নিকট হার মানেন :—"বাঁকা পাঁজ্‌রার হাড় না ভাঙ্গিয়া কখন সোজা করা যায় না"—(স্ত্রীলোকের পাঁজ্‌রার হাড় বাঁকা এইরূপ চলিত কথা আছে।)।"

* * *

ক্ষুদ্র পার্সী সমাজ-মণ্ডলীর মধ্যে রমণীরা খুব স্বাধীন। পার্সী-রমণী সাধারণত সুগঠিতকায় ও গৌরবর্ণ; তাহাদের ব্যবহার মধুর ও প্রীতিজনক। তাহারা ধর্ম্মঘটিত একটা কুসংস্কারবশতঃ তাঁহাদের সুন্দর কেশ ঢাকিয়া রাখে : ঢাকিয়া না রাখিলে যে-কোন দেশের সুন্দরীদের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে।

পুরুষদিগের ন্যায় তাহারাও "পবিত্র কামিজ" পরিধান করে; তাহারা রেশমের পায়জামা পরে এবং কামিজের উপর তাহাদের উপবীত বাঁধা থাকে। তাহারা পাঁচ হইতে দশ গজ আয়তনের শাড়ী পরে—বেশ মোলায়েম রেশমী শাড়ী। হাত-কাটা ফতুয়া। সবশুদ্ধ মিলিয়া পরিচ্ছদটি অতীব রমণীয় ও সুশোভন। তাহার উপর—সোনার গহনা; গলায় রত্নহার; বাহুতে রত্নখচিত বাজুবন্দ; সচরাচর একজন পার্সী-রমণীর ৫০০ হইতে • হাজার পৌণ্ড মূল্য-পরিমাণ গহনা-পত্র। ধনী ঘরের স্ত্রীলোকদের আরও বেশী।

(২) "সবাই জানে, পার্সী-রমণীরা হিন্দু ও মুসলমান রমণী অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত। সৌভাগ্যক্রমে বাপ-মায়ের নিকট হইতে তাহারা কোন বাধা পায় না। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা ভাষা ও সঙ্গীত প্রভৃতির জ্ঞানে যে-কোন জাতির সমকক্ষ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হন। প্রাচ্য দেশবাসীদের মধ্যে একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগে;—নূতন জ্ঞান লাভের জন্য তাদের চেষ্টা আছে, কিন্তু সেই নূতন জ্ঞান পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে না। কালেজের শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া কোন পার্সী-বালিকা মনে করিবে না যে, রন্ধন করা তাহার অযোগ্য; বরং সে অন্য গৃহিণীর ন্যায় ভাল রাঁধিতে পারে বলিয়া বেশ-একটা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) Zulirka Sorabji Cavalier : Parsi Women.

# নীলপাখী *

তিলতিল—ভাই
মিতিল—বোন
আলো
বেরীলুন—পরী
পিতা
মাতা
সময়
টাইলা—কুকুর
টাইলেট—বিড়াল
রুটী
আগুন
জল

## প্রথম অঙ্ক

### দৃশ্য—কাঠুরিয়ার গৃহ

গৃহাভ্যন্তরে তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ শয্যায় শুইয়া আছে। মাতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইতেছে। তিনি ইঙ্গিতে পিতাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং পা টিপিয়া ডানদিকের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামাত্র আলোটা আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠিল। তিলতিল ও মিতিল জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

তিলতিল। মিতিল?

মিতিল। কি ভাই তিলতিল?

তিলতিল। ঘুমুলে না কি?

মিতিল। না। তুমি ঘুমুচ্ছ?

তিলতিল। না; ঘুমুব যদি ত কথা কচ্ছি কি করে?

মিতিল। আজ মা বড়দিন?

তিলতিল। না, এখনও বড়দিন হয়নি; সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু ক্রীশ্‌মাস্ এ-বছর আমাদের জন্য কিছুই আনবেন না···

মিতিল। কেন?

তিলতিল। আমি শুনেছি, মা বলছিল তিনি আসছে বছরে আসবেন...

মিতিল। আসছে বছরের কি এখনও ঢের দেরী আছে?

তিলতিল। ঢের দেরী বৈকি! তবে আজ রাত্রে তিনি শুধু বড়লোকদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কাছে আসবেন...

মিতিল। সত্যি?

তিলতিল। হ্যাঁ।···বা রে কি মজা!... মা আলোটা নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে!... আমি একটা ফন্দী বার করছি!

মিতিল। কি ফন্দী?

তিলতিল। আমরা উঠে পড়ি এস...

মিতিল। না, না।

তিলতিল। কেন, কেউ ত আর দেখছে না—আশে-পাশে ত আর কেউ নেই···জানলা দেখতে পাচ্ছ?

মিতিল। হ্যাঁ, বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে!

তিলতিল। ওই যে চক্‌চকে আলো জানলার ভিতর দিয়ে আসছে, ও সেই তাদের।

মিতিল। কাদের?

তিলতিল। বড়লোকদের বাড়ীর... জানলা খুলে ফেলি, কি বল?

মিতিল। আমরা কি খুলতে পারব?

তিলতিল। আলবৎ পারব। এখানে

* মরিস মেটরলিঙ্ক রচিত Blue Bird নাটকের অনুবাদ।

কে আছে যে বাধা দেবে...গান শুনতে পাচ্ছ ?...এস, উঠে পড়ি...

দুইজনে উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া জানালা খুলিয়া ফেলিল। উজ্জ্বল আলোকে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। বালক-বালিকা দুইটী মুগ্ধ নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিলতিল। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। (টুলের উপর দাঁড়াইবার একটুখানি জায়গাও সে পায় নাই) আমি পাচ্ছি না···

তিলতিল। বরফ পড়ছে !...দুখানা গাড়ী আসছে, তাতে ছ-ছটা করে ঘোড়া জোতা !

মিতিল। গাড়ীর ভিতর থেকে বারোটি ছোট্ট ছেলে বেরুল !

তিলতিল। তুমি ভারী বোকা !. .ওরা ছেলে নয়, মেয়ে ··সবগুলিই মেয়ে ··

মিতিল। চমৎকার সব পোষাক পরেছে...

তিলতিল। তুমি কিচ্ছু জান না... আহাহা, অমন করে ধাক্কা দিয়ো না···

মিতিল। আমি তোমায় ছুঁলুম কখন যে, ধাক্কা দেব ?

তিলতিল। (সমস্ত টুলখানি সে দখল করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল) তুমি সমস্ত জায়গাটাই যে দখল করেছ।

মিতিল। কৈ, আমি একটুও জায়গা পাচ্ছি না দাঁড়াতে··

তিলতিল। থাম, থাম ! ওই গাছ দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। কি গাছ ?

তিলতিল। কেন, ওই যে গাছে সব খেলনা আর খাবার ঝুলোনো রয়েছে !... তুমি দেওয়ালের পানে চেয়ে ও দেখছ কি ?

মিতিল। কি করব, আমি যে দাঁড়াবার মোটেই জায়গা পাচ্ছি না...

তিলতিল। (মিতিলকে সামান্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিল) ওই দেখ ! এবার হয়েছে ত ?...এবার তুমি আমার চেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়েছ...দেখ, কতগুলো আলো জ্বেলে দিয়েছে !

মিতিল। ও লোকগুলো অত গোলমাল করছে কেন ?

তিলতিল। ওরা হল বাজনদার।

মিতিল। ওরা কি রেগেছে ?

তিলতিল। না, রাগবে কেন ?··· বাজানো কাজটা সহজ নয় ত ! ওতে কসরৎ দরকার।

মিতিল। ওই আর একখানা গাড়ী এল ; এর ঘোড়াগুলো সব সাদা !

তিলতিল। চুপ, কথা কয়ো না !... চোখে শুধু দেখে যাও !

মিতিল। ওই সোনার মত জিনিষ-গুলো কি, বল ত ? ওই যে গাছের ডালে ঝুলছে ?

তিলতিল। ওগুলো ? ওঃ, ওগুলো খেলনা···নিশ্চয়। দেখচ না, ঐ সব তলোয়ার, বন্দুক, সেপাই···

মিতিল। আর পুতুল ? পুতুল আছে কি না বল ?

তিলতিল। হ্যাঁ,—পুতুল কি আবার একটা জিনিষ না কি ?···পুতুলে কোন মজা নেই...

মিতিল। আর টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে, ওগুলো কি ?···

তিলতিল। ও সব পিঠে, মাখন, ফল ..

মিতিল। আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, তখন একবার পিঠে খেয়েছিলুম...

তিলতিল। আমিও খেয়েছিলুম... রুটীর চেয়ে ঢের ভাল খেতে, না ?

মিতিল। হ্যাঁ, অনেক পিঠে ওখানে রয়েছে ; ঐ যে। সমস্ত টেবিল একেবারে জোড়া...ওরা এখনি সবগুলো খাবে না কি ?

তিলতিল। নিশ্চয় ; তা নইলে কি করবে ?

মিতিল। একেবারে সবগুলো কেন খেয়ে ফেলছে না ?

তিলতিল। ওদের এখন তেমন খিদে পায়নি···

মিতিল। ( অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ) খিদে পায়নি ?···সে কি...কেন পায়নি ?

তিলতিল। কেন আবার কি ? ওরা যে কেবলই খাচ্ছে। যখনই চায়, তখনই ওরা খেতে পায় কি না !

মিতিল। ( অবিশ্বাসের সহিত ) রোজই ওরা খেতে পায়, যখন যা চায় ?

তিলতিল। এই রকম ত শুনি···

মিতিল। সবগুলো ওরা খাবে ?··· একটুও দেবে না ?

তিলতিল। কাদের দেবে ?

মিতিল। কেন, আমাদের ?

তিলতিল। তা কেন দেবে ? ওরা ত আর আমাদের চেনে না...

মিতিল। যদি আমরা চাই ?

তিলতিল। না, ছিঃ, চাইতে আছে ? কখ্‌খনো চাইব না।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। চাওয়া ভাল নয়।

মিতিল। ( হাততালি দিয়া ) হাঃ, হাঃ, ওরা কি মজাই করছে !

তিলতিল। ( উচ্ছ্বসিত হইয়া ) ওরা হাসছে, কেবলই হাসছে !

মিতিল। আর ঐ ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলি নাচছে !

তিলতিল। হাঁ, এস, আমরাও নাচি। ( আনন্দে পা নাড়িতে লাগিল )

মিতিল। বাহবা, কি মজা !

তিলতিল। ওই দেখ, ওরা সব পিঠে-গুলো নিচ্ছে !...ওই তুলছে !···ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে !

মিতিল। ছোট ছোট ছেলেগুলিও খাচ্ছে ! এক-একজনে দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা করে খাচ্ছে !

তিলতিল। ( আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ) কি সুন্দর !

মিতিল। ( কল্পিত পিষ্টক গণনা করিতে করিতে ) আমি বারোটা পিঠে পেয়েছি !

তিলতিল। আমি তোমার চার গুণ বেশী পেয়েছি···তা থেকে তোমাকেও কিছু দেব...

( দরজায় কে ঘা দিল )

তিলতিল। ( ভীত চকিত হইয়া চুপ করিল ) কি ও ?

মিতিল। বাবা আসছে !

তাহারা ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ

হুড়কো খুলিয়া দরজাটা অর্দ্ধেক ফাঁক হইয়া গেল এবং লাল রঙের টুপি ও সবুজ রঙের পোষাক-পরা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ক্ষীণদৃষ্টি ও খঞ্জ এবং তাহার পিঠে একটা কুঁজ। তার নাক বঁড়শীর মত। সে কোমর নোয়াইয়া লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিল। চেহারা যেমনই হোক, সে একজন পরী।

পরী। তোমাদের এখানে কি এমন ঘাস আছে যা গান করে, কি এমন পাখী যার রঙ নীল?

তিলতিল। ঘাস এখানে অনেক রকম আছে, কিন্তু তারা গান ত কৈ করে না কখনো! ঘাসে আবার গান করবে কি?

মিতিল। তিলতিলের একটী পাখী আছে।

তিলতিল। সেটা কিন্তু আমি দিতে পারব না···

মিতিল। কেন?

তিলতিল। সে যে আমার পাখী।

পরী। তোমার পাখী? তা কোথায় সে পাখীটি?

তিলতিল। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ খাঁচার মধ্যে···

পরী। (পাখীটিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য চসমা চোখে দিলেন) এ পাখী আমি চাই না; এটা ত তেমন নীল নয়। দেখ, তোমায় এক কাজ করতে হবে। আমি যে রকম পাখী চাই, ঠিক সেই রকমটি খুঁজে আনবার জন্য তোমায় যেতে হবে।

তিলতিল। কিন্তু সে পাখী কোথায় আছে, আমি ত তা জানি না···

পরী। আমিও জানি না। আর সেইজন্যই ত তোমায় যেতে হবে। যে ঘাস গান করে তা না হলেও আমার চলতে পারে—যদিও সে জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে; কিন্তু এই নীল পাখীটি আমার চাই-ই। আমার ছোট মেয়েটির জন্য দরকার। তার বড্ড অসুখ কি না!

তিলতিল। তার কি অসুখ?

পরী। আসল অসুখ যে কি, তা ঠিক জানি না। তবে সে খুসী হতে চায়...

তিলতিল। সত্যি?

পরী। আমাকে চেনো তোমরা?

তিলতিল। আমাদের পাড়ায় ঐ যে বারলিংগট আছে, তোমায় দেখতে তার মত···

পরী। (হঠাৎ ক্ষুদ্র হইয়া) কখ্খনো না!...তার চেহারার সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই!···এমন কথা বল! এ অসহ্য!...আমি কে, জানো?...আমি হচ্ছি পরী বেরীলুন···

তিলতিল। সত্যি? তা—

পরী। শোন, তোমাকে এখনি যেতে হবে।

তিলতিল। তুমিও সঙ্গে যাবে ত?

পরী। না, আমার যাওয়া হতে পারে না ···তোমাকে একলা যেতে হবে। আমার হাতে গেরস্থালীর অনেক কাজ। দেখ, তুমি কোন্ পথে যাবে, বল দেখি—ছাদের পাশ দিয়ে, না, চিমনির ভিতর দিয়ে, না জানলা দিয়ে?

তিলতিল। (সভয়ে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আমি ঐ দরজা খুলে যাব···

পরী। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) না, না, তা কি হয় কখনো? সে যে অসম্ভব! আবার মুখ নীচু করে দাঁড়ালে! যাবে না? তোমাদের কি বদ স্বভাব!...আচ্ছা, তবে ঐ জানলা দিয়েই যাও। কেমন...আর দেরী করছ কেন?...শীগ্‌গির্ সাজ-গোজ করে নাও...

(তিলতিল ও মিতিল তাড়াতাড়ি পোষাক পরিতে লাগিল)

তিলতিল। আমাদের জুতো নেই...

পরী। তাতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে একটি ছোট টুপি দেব। আচ্ছা, তোমাদের বাবা আর মা কোথায়?

তিলতিল। তাঁরা ওই যে ঘরে ঘুমোচ্ছেন...

পরী। আর তোমাদের ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা?

তিলতিল। তাঁরা মরে গেছেন...

পরী। আর সব ভাই-বোনেরা কোথায়?...কটী ভাই-বোন তোমারা?

তিলতিল। তিনটী ছোট ভাই...

মিতিল। আর চারটী ছোট বোন...

পরী। তারা সব কোথায়?

তিলতিল। তারাও সব মরে গেছে...

পরী। তাদের সবাইকে তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হয়?

তিলতিল। তা আর হয় না? খুব ইচ্ছা হয়!...কোথায় তারা, এখনি দেখাও!

পরী। আমি কি তাদের সঙ্গে করে এনেছি যে এখনি দেখাব?...তবে দেখতে পাবে—শীগ্‌গিরই তাদের দেখবে। যখন স্মৃতির দেশের ভিতর দিয়ে ঐ নীল পাখীর সন্ধানে তোমরা যাবে, তখন তাদের সকলেরই দেখা পাবে...আচ্ছা, আমি যখন দরজায় ঘা মারি, তখন তোমরা কি কচ্ছিলে?

তিলতিল। আমরা দু'জনে পিঠে খাওয়া খেলা করছিলুম...

পরী। তোমাদের কাছে পিঠে আছে? ...কৈ, দেখি?

তিলতিল। ওই যে ওখানে বড়লোকদের ছেলেদের কাছে আছে...দেখবে?...ঐ দেখ ...কি চমৎকার!... (পরীকে দরজার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল)

পরী। (জানালার কাছে দাঁড়াইয়া) যারা খাচ্ছে তারা ত সব অপর লোক!

তিলতিল। হ্যাঁ, ওরা খাচ্ছে, আর আমরা দেখছি...

পরী। ওদের উপর রাগ হচ্ছে না?

তিলতিল। রাগ হবে কেন?

পরী। সব পিঠেগুলোই ওরা খেয়ে ফেল্লে, তোমাদের একখানাও দিলে না! এ ওদের ভারী অন্যায়!

তিলতিল। অন্যায় মোটেই না... আমাদের কেন দেবে! বাঃ! ওরা যে খুব বড়লোক...আচ্ছা, ঐ জায়গাটা খুব চমৎকার দেখাচ্ছে না?

পরী। আমাদের এখানকার চেয়ে ওদের ওই জায়গাটা যে বেশী চমৎকার, তা নয়।

তিলতিল। ইস্! এখানটা ত অন্ধকার, একরত্তি, আর এখানে একখানাও পিঠে নেই...

পরী। ও জায়গাটা যেমন, এখানটাও

ঠিক তেমনি; কেবল তোমরা দেখতে পাচ্ছ না...

তিলতিল। কেন, আমি ত বেশ দেখতে পাচ্ছি; আমার চোখ খুব ভাল। আমি ঐ দূরের গির্জ্জার ঘড়ি দেখতে পাই... বাবা পায় না...

পরী। (হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি বলছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না!...আমায় দেখছ ত?...বল ত আমি কি রকম দেখতে?...(তিলতিল চুপ করিয়া রহিল) বল, জবাব দাও। আমি জানতে চাই, তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ কি না? আমি দেখতে সুন্দর, না, বিশ্রী?...জবাব দিচ্ছ না যে?...বলি, আমি কি দেখতে বুড়ী?...তুমি হয়ত বলে বসবে যে, আমার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ আছে...বল, বল—

তিলতিল। না, বেশী ত বড় নয়!

পরী। হাঁ গো হাঁ; তোমার মত সকলেই এটাকে মস্ত বড় দেখবে...আচ্ছা, আমার নাকটা কি খুব উঁচু, আর আমার একটা চোখ কি নেই?

তিলতিল। না, না, আমি তা বলছি না...কিন্তু চোখটা কি করে গেল?

পরী। (অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া) ওরে, হতভাগা ছেলে, চোখটা আমার নেই, কে বললে?...দেখছ না, এটা কত বড়; কেমন জ্বল্ জ্বল্ করছে... আকাশের রঙের চেয়েও বেশী নীল... আচ্ছা, আমার চুলগুলি কেমন সুন্দর, নয় কি, বল দেখি!...কেমন ঘন আর নরম ...এক গোছা আমার হাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কি?

তিলতিল। দেখতে পাচ্ছি বৈ কি! খুব পাতলা...

পরী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কি! পাতলা? ...এমন ঘন ঘন সোনালি চুল...দেখছি, তুমি আসল জিনিষ কিছুই দেখতে পাও না!.. আমি জানি, এমন অনেক মানুষ আছে, যারা চোখ থেকেও অন্ধ, কিছু দেখতে পায় না। সুখের বিষয়, আমি সর্ব্বদা এমন সব জিনিষ সঙ্গে রাখি, যাতে নজর খোলে আর সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায়...আচ্ছা, আমি থলির ভিতর থেকে কি বার করছি, বল ত...

তিলতিল। বাঃ, বেশ চমৎকার সবুজ টুপি ত! আচ্ছা, ওতে ফিতে বাঁধা ওটা ও কি জ্বলছে?

পরী। ও হল এক টুকরো বড় হীরে। এইটে চোখে দিলে মানুষ ভাল দেখতে পায়...

তিলতিল। সত্যি?

পরী। হ্যাঁ, সত্যি। টুপিটা মাথায় পরে হীরেটাকে একটুখানি ঘুরিয়ে দাও; বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—এই এমনি করে—বুঝতে পারছ? তার পরই একটা পট্‌কার মত আওয়াজ হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখ্ খুলে যাবে।

তিলতিল। আওয়াজ হবে! লাগবে না ত?

পরী। না; কেউ সে আওয়াজ শুনতেও পাবে না। আর চারিদিক অমনি বদলে যাবে, দেখবে। প্রত্যেক জিনিষের ভিতর-পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। রুটী, চিনি—এদেরও সব প্রাণ আছে, দেখবে।

তিলতিল। রুটীর প্রাণ আছে? যে রুটী আমরা খাই? আর তা চোখে দেখা যাবে?

পরী। (রুক্ষ হইয়া) নিশ্চয়! দেখ, আমি বাজে কথার লোক নই। মিথ্যাও বলি না। আমার কাছে যা ছিল, সব তোমায় দিলুম। তুমি নীল পাখীর সন্ধানে যাচ্ছ, এ সব জিনিষ তোমার খুব কাজে লাগবে। তবে উড়ন্ত আসন, আর আংটী—সে আংটি হাতে দিলে একেবারে অদৃশ্য হওয়া যায়—এ দুটি তোমাদের দিতে পারলে আরও ভাল হত, কিন্তু যে বাক্সে সেগুলি আছে, তার চাবি হারিয়ে গেছে। ওহো, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি। (হীরক খণ্ডের প্রতি দেখাইয়া) দেখ, এইটী যখন পরে থাকবে, তখন এই দিকে একবার ঘুরুলেই সমস্ত অতীত দেখতে পাবে—আরও একটু এমনি ভাবে ঘুরুলে ভবিষ্যৎ নজরে পড়বে। এটী ভারী আশ্চর্য্য জিনিস।

তিলতিল। বাবা কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।

পরী। তিনি দেখতে পাবেন না; যতক্ষণ তোমার মাথায় ঐ টুপি আছে, ততক্ষণ কেউ তোমায় দেখতে পাবে না। আচ্ছা, একবার পরখ কর ত। (ছোট সবুজ টুপিটী তিলতিলের মাথায় পরাইয়া দিলেন) এইবার হীরেটী ঘুরিয়ে দাও, আর-একটু!—ব্যস্!

তিলতিল হীরকটী ঘুরাইবামাত্র প্রত্যেক জিনিষ অদ্ভুত রকমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বৃদ্ধা পরী তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়া উঠিল। গৃহ-দেওয়ালের অপরিষ্কার প্রস্তরগুলি মণি-মাণিক্যের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। গৃহের সামান্য আসবাব-পত্র সজীব হইয়া উঠিল। দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির মুখটা চোখ্ মেলিয়া হাসিতে লাগিল, এবং দোলকের দরজা খুলিয়া 'সময়ে'র এক-একটী ঘণ্টা শরীর ধারণ করিয়া একে একে বাহিরে আসিতে লাগিল ও পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া সকলে তালে তালে নাচিতে সুরু করিল।

তিলতিল। (হতভম্ব হইয়া ঘণ্টাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ সুন্দর মেয়েগুলি কারা?

পরী। ভয় পেয়ো না; ওরা হল তোমাদের জীবনের এক-একটী ঘণ্টা। ওরা ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে তোমাদের দৃষ্টি-পথে আসতে পেরেছে, এইতে ভারী খুসী হয়েছে।

তিলতিল। দেওয়াল এমন চকচকে হল কেন? দেওয়ালটা চিনির তৈরী, না, পাথরের?

পরী। সব পাথরই সমান, আর সব পাথরেরই দাম আছে, কিন্তু মানুষ এ-সব ত আর খালি চোখে ঠিকটি দেখতে পায় না।

যে সময় ইহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় গৃহের মধ্যে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। পাঁউরুটীগুলা ছোট ছোট মানুষের আকার ধারণ করিয়া, আঁটা-সাটা পোষাক পরিয়া হামাগুড়ি দিয়া কড়াই হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল এবং টেবিলের উপর নর্ত্তন-কুর্দ্দন আরম্ভ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে 'আগুন' হলদে এবং সিঁদুরে রঙের পোষাক পরিয়া রুটীগুলার উপর আসিয়া পড়িল এবং আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাদের পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল।

তিলতিল। এই সব বিশ্রী ছোট্ট মানুষগুলি কারা?

পরী। ওরা? ওরা হল সব রুটীর আত্মা। এতদিন কড়ায়ের ভেতর খুব শক্ত ভাবে আটকে ছিল, এখন স্বাধীন হবার সুবিধে পেয়ে কড়াই থেকে বাইরে আসছে।

তিলতিল। আর ওই লাল রঙের লম্বা লোকটা? ওর গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ, মাগো!

পরী। চুপ, চুপ! অত চেঁচিয়ো না; ও হল আগুন, বড় ভয়ানক লোক।

এই সকল কথোপকথনের মধ্যেও কিন্তু ইন্দ্রজালের বিরাম ছিল না। কুকুর এবং বিড়ালটা এতক্ষণ বাসনের টেবিলের নীচে খাঁচার মধ্যে চুপ করিয়া শুইয়াছিল; হঠাৎ ইহারা চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইহাদের পরিবর্ত্তে দুইজন লোককে দেখা গেল। ইহাদের একজনের মুখ কুকুরের মত এবং অপরের মুখ বিড়ালের মত। কুকুরমুখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর কেবল 'কুকুর' বলিয়াই অভিহিত করিব) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিলতিলের কাছে ছুটিয়া আসিল ও তাহাকে চুম্বন করিয়া নানা প্রকার সোহাগ জানাইতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল-মুখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর 'বিড়াল' নামেই অভিহিত করিব) সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না। সে আপন মনে চুল আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিতিলের কাছে গেল।

কুকুর। (আনন্দে লাফালাফি করিতে করিতে) আমার প্রিয় দেবতা, তোমায় নমস্কার! আমার আরাধ্য, আমার প্রিয়তম, তোমায় নমস্কার! কি সৌভাগ্য! এতদিনে আমরা মন খুলে কথা কইতে পারব! আমার কত কথা আছে তোমায় বলবার! আমি এতদিন শুধু ল্যাজ নেড়ে চীৎকার করে আমার মনের ভাব তোমায় জানিয়েছি, কিন্তু তুমি কিছুই বোঝ নি! আর আজ! আঃ, কি আনন্দ! প্রিয়তম, তোমায় আবার নমস্কার! আমি যে তোমায় কত ভালবাসি! তুমি কি এখন আমার দু-একটা খেলা দেখতে চাও? আমি কি পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে নাচব, না, সামনের পায়ের উপর ভর দিয়ে ডিগ্‌বাজি খাব?

তিলতিল। (বিস্মিত হইয়া পরীর প্রতি) এই ভদ্রলোকটী কে?

পরী। দেখতে পাচ্ছ না? এ তোমার প্রিয়তম কুকুর টাইলোর আত্মা; একে তুমি মুক্ত করে দিয়েছ।

বিড়াল। (মিতিলের নিকট গিয়া তাহার হাত দুটী ধরিয়া অতিশয় আড়ম্বর ও কায়দার সহিত) নমস্কার, কুমারি! আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।

মিতিল। নমস্কার মশায়! (পরীর প্রতি) এ কে?

পরী। দেখছ না? তোমার প্রিয় বিড়াল টাইলেট তোমাকে অভ্যর্থনা করছে! যাও, ওর মুখে চুমু খাও।

কুকুর। আমায় শুদ্ধ! আমি আমার প্রিয়দেবতাকে চুম্বন করেছি! হাঃ হাঃ, আজ কি মজা! টাইলেটকে ভয় দেখাব, ওকে জব্দ করব! ভৌ-ঔ, ভৌ-ঔ, ভৌ-ঔ!

পরী। (ছড়ি উঠাইয়া কুকুরকে শাসাইলেন) খবরদার! চুপ কর; তা নইলে তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্মে আর খুলবে না।

ঘরের কোণে চরকাটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি লইয়া সুতা কাটিতে লাগিল। আর এক কোণে জলের নলটা হঠাৎ উঁচু সুরে গান ধরিয়া দিল। নলের মুখ হইতে বিচিত্র ধারায় নির্ঝরিণী বাহির হইয়া চারিদিকে মণি-মুক্তা ছড়াইতে লাগিল এবং ইহার মধ্য হইতে জলের আত্মা আলুলায়িত কেশে, সিক্ত বসনে বাহির হইয়া আসিল। ইহার চক্ষু দুইটী

অশ্রুভারাক্রান্ত। সে তৎক্ষণাৎ আগুনের সহিত লড়াই বাধাইয়া দিল।

তিলতিল। কে এই মেয়েমানুষটী ?

পরী। ভয় নেই। এ হল জলের আত্মা…এই মাত্র নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর হইতে হঠাৎ আলোকদানটা পড়িয়া গিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তে গৃহ-মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। তাহার বেশভুষা চাকচিক্যময়। উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ আবরণে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত; সে অপূর্ব্ব ভঙ্গি-মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তিলতিল। ইনিই হলেন রাণী!

মিতিল। আহা, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

পরী। না, ইনি আলো!

ইতিমধ্যে দরজায় কে তিনবার ঘা মারিল।

তিলতিল। (সভয়ে) ওই যা…বাবা আসছে, সব টের পেয়েছে!

পরী। হীরেটা ঘুরিয়ে ফেলো…বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে…শীগ্‌গির!

তিলতিল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হীরকখণ্ডটী ঘুরাইয়া দিল।

পরী। না, না, অমন করে নয়!… কি সর্ব্বনাশ!…সব মাটী!…তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি করে ফেল্লে। এরা সব এখন ত আর সময় পাবে না আগেকার জায়গায় ফিরে যেতে। এখন দেখছি, আমাদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হবে…

পরী পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধা হইয়া গেল। দেওয়ালটা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি সাধারণ আকার ধারণ করিল। ঘণ্টাগুলি একে একে ঘড়ির মধ্যে ফিরিয়া গেল। চরকা বন্ধ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু 'আগুন' বেচারী ঘরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়াও নিজের চিমনি খুঁজিয়া পাইল না। আর এক-খানা 'রুটী' তাড়াতাড়ি নিজস্থান অধিকার করিতে গিয়া ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেল সে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরী। কাঁদছ কেন?…কি হয়েছে তোমার?

রুটী। আমি নিজের জায়গায় যেতে পারি-নি!

কুকুর। (সোল্লাসে) প্রিয়দেবতা, আমিও এখানে আছি!…এখনও আমি কথা কইতে পারছি!

পরী। কি সর্ব্বনাশ!…তুমিও আছ?

কুকুর। নিজের জায়গায় ফিরে যেতে দেরী হয়ে গেল। আমাদের খাঁচার দরজা বড্ড তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

বিড়াল। আমারও সেই দশা! কিন্তু এখন উপায় কি?…কোন বিপদ হবে না, ত?

পরী। তা হলে এবার সত্যি কথাটাই বলতে হল। দেখ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তিলতিল আর মিতিলের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যাবে, রাস্তা ফুরিয়ে গেলেই কিন্তু তাকে প্রাণ হারাতে হবে।

বিড়াল। (কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া) চল হে, আমরা খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি…

কুকুর। না, না; আমি ওখানে আর যাব না!…আমি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে থাকব!…তা হলে আমি সর্ব্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পাব!

বিড়াল। আহাম্মক কোথাকার!

দরজায় পুনঃ পুনঃ ঘা পড়িতে লাগিল।

রুটী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি

মরতে পারব না!...আমি কড়াই-এর মধ্যে ফিরে যাব...সেখানে ঠাসাঠাসি করে থাকি সেও ভাল...

আগুন। (এতক্ষণ পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া রাগে গস্ গস্ করিতেছিল) আমি আমার চিমনি খুঁজে পাচ্ছি না!

জল। (নলের ভিতর প্রবেশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল) আমি যে নলের ভেতর ঢুকতে পারছি না!

পরী। এরা সব কি মূর্খ!...যেমন মূর্খ, তেমনি ভীরু!...দেখ সকলে...তা হলে তোমরা জঘন্য খাঁচার মধ্যে, বাক্সের মধ্যে, নলের মধ্যে থাকতে চাও! অথচ এই দুটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যেতে রাজী নও?

সকলে। (কুকুর এবং আলো ব্যতীত) না, না; আমরা কেউ যাব না...আমরা আমাদের সাবেক জায়গায় ফিরে যেতে চাই!

পরী। (আলোর প্রতি) আর আলো!...তুমি কি বল?

আলো। আমি এঁদের দুজনেরই সঙ্গে যাব...

কুকুর। (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া) আমিও...আমিও যাব!

পরী। বেশ কথা...তা ছাড়া এখন খুব দেরী হয়ে গেছে...তোমাদের সাবেক জায়গায় ফিরে যাবার পথও বন্ধ; ...কাজেই তোমাদের সকলকে এদের সঙ্গে যেতে হবে...কিন্তু আগুন, তুমি সাবধান, কারো কাছে ঘেঁসে এসো না। কুকুর, তুমি বিড়ালটাকে বিরক্ত করো না। আর জল, তুমি নিজেকে একটু ঠাণ্ডা-মেজাজে রেখো।...যে-সে জায়গার উপর দিয়ে যেন দৌড় দিয়ো না...

এবার দরজায় খুব জোরে ধাক্কা পড়িতে লাগিল।

তিলতিল। বাবা আবার উঠেছে! এবার নিশ্চয় আসছে; হ্যাঁ, ঐ যে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

পরী। চল, আমরা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তোমাদের সকলকেই আমার বাড়ীতে আগে যেতে হবে; কেন না, জানোয়ারগুলিকে আর জিনিষগুলিকে বেশ ভাল সাজ-গোজ পরাতে হবে ত। (রুটীর প্রতি) রুটী, তুমি খাঁচাটা নাও; এর ভিতরেই নীল পাখীকে রাখতে হবে। এটা তোমারই জিম্মায় রইল। নাও, শীগ্‌গির নাও; আর সময় নষ্ট করা যায় না।

হঠাৎ জানালাটা খুলিয়া গেল—তখন সকলে বাহির হইয়া পড়িল। জানালা আপনা-আপনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার রুদ্ধ হইল। ঘর আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিলের বিছানায় দুইটা ছায়া ঘনীভূত হইয়া রহিল। ডান দিকের দরজা খুলিয়া তিলতিলের মাতা ও পিতা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইলেন।

পিতা। না, কিছু না—শুধু ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো কিচ্‌মিচ্ করছে।

মাতা। তিলতিল আর মিতিলকে দেখতে পাচ্ছি না ত!

পিতা। বাঃ, ওই যে ওরা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে।

মাতা। হ্যাঁ, নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!

দরজা পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

# বংশানুক্রমের গোড়ার কথা

পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে * বলিয়াছি যে, পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয়। কেবল যে দৈহিক গুণই সংক্রামিত হয়, তাহা নহে, মানসিক গুণও সংক্রামিত হয়। যে নিয়মে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী এইরূপে সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহাকেই বলে বংশানুক্রম ( Heredity )। এখন আমরা একটু তলাইয়া এই বংশানুক্রমের মূলরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মোটামুটি এ কথা বলা হইয়াছে যে, দুইটি পিতৃমাতৃকোষের সহযোগে একটি মূলকোষের উৎপত্তি হয়, আর ঐ মূলকোষই গর্ভস্থ ভ্রূণের আদি। পিতৃকোষে (sperm-cell) পিতার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নিহিত থাকে;—আর মাতৃকোষে (Ovum) মাতার গুণাবলী নিহিত থাকে;—এবং মূলকোষে (Stem-cell) এই উভয়প্রকার গুণাবলীই একত্র সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের ফলে সন্তানের মধ্যে কি-ভাবে পিতা মাতার গুণ প্রকাশ পায়, তাহা বিশেষ ভাবে এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে কোথায় এই গুণাবলীর মূল-আশ্রয় ও কি উপায়ে তাহারা নূতন জীবের দেহে সংক্রামিত হয়, সেই সব কথা বলাই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে cell বা জীবকোষের গঠন-প্রণালী আলোচনা করা যাক্। অধিকাংশ জীবের মধ্যে cell দুই প্রকারের। পুং-কোষ (sperm-cell) ও স্ত্রী-কোষ (Ovum)। এই স্ত্রী-কোষ প্রথমাবস্থায় সাধারণত গোলাকার থাকে। ইহার প্রাণময় অংশকে (active constituents) দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

( ১ )—ক্ষুদ্রতর ও অন্তরতর অংশ,—ইহাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বা কেন্দ্রাংশ; ( ২ ) বৃহত্তর বাহিরের অংশ, যাহা নিউক্লিয়াসকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় বাহ্যাংশ cell-body বা cytosoma,। এই উভয় অংশই যে কোমল প্রাণময় বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার রাসায়নিক গঠন অতীব বিচিত্র। সেই প্রাণময় বস্তুকেই বলা হয় জীববস্তু (Protoplasm)। জীবকোষে এই জীববস্তু ছাড়া আর এক-প্রকারের নিষ্ক্রিয় বস্তু (passive portion) থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত পরে তৈরী হয়। কোষের নানারূপ পর্দ্দা ও ভিতরকার রস প্রভৃতি এই নিষ্ক্রিয় বস্তু দ্বারা গঠিত। বলা বাহুল্য জীববস্তুই (Protoplasm) প্রাণের মূল ও তাহাই জীবদেহকে গঠন করে ও জীবনের নানা বিচিত্র কর্ম্মকে চালাইয়া থাকে।

পুংকোষ স্ত্রীকোষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ ইহা লাঙ্গুলবিশিষ্ট লম্বা রকমের, মুণ্ডটা ঈষৎ স্থূঁচল। ইহার আয়তন স্ত্রী-কোষের

---

* বৈজ্ঞানিক অনুষ্টবাদ,—ভারতী, ১৩২৩

তুলনায় যার-পর-নাই ক্ষুদ্র। পূর্ব্বে ইহাকে cell বলা হইত না। কিন্তু অধুনা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা আসলে cell ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার শুঁচল মুণ্ডভাগেই অতি ক্ষুদ্র Nucleus বা কেন্দ্রাংশ আছে ও তাহার চারিদিকে cell-body বা বাহ্যাংশও আছে।

এখন কেন্দ্রাংশ ও বাহ্যাংশ জীব-কোষের এই দুই অংশের মধ্যে কোনটী বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান? কেন্দ্রাংশ না বাহ্যাংশ? আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কেন্দ্রাংশই বংশানুক্রমের মূলআশ্রয়। গর্ভাধানের সময় পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রাংশ মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায়।

কিন্তু শুধু এইটুকু বলিয়াই থামিয়া থাকা যায় না। জীবকোষের এই কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার কি আছে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার জালের মত তন্তুময় একপ্রকার পদার্থ আছে; তাহা কয়েকটী বিশিষ্ট বর্ণ দ্বারা বেশ রঞ্জিত হইতে পারে। এই জালের মত পদার্থকে বলে chromatin। খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ দিয়া এই chromatinকে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার পদার্থ আছে। তাহাকে বলা হইয়াছে chromosomes। 'ক্রমোসোম' সম্বন্ধে একটী প্রধান ব্যাপার এই জানা গিয়াছে যে, এক-একটী বিশিষ্ট জীববর্গের (species) অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীর দেহস্থ জীবকোষে ইহাদের সংখ্যা সমান। হাঙ্গরের জীবকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৩৬; একজাতীয় ইঁদুরের মধ্যে ২৪; ষাঁড়, গিনিপিগ, শূকর ও মানুষের মধ্যে ১৬ ইত্যাদি। আবার আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ গর্ভাধানে একত্র মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে এই 'ক্রমোসোমের' সংখ্যা দেহস্থ অন্য সাধারণ কোষের (Body-cell বা somatic cell) 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার অর্দ্ধেক দেখা যায়। পিতৃমাতৃ-কোষ যখন পরস্পর মিলিয়া মূলকোষে পরিণত হয়, তখন তাহাদের মধ্যস্থ ক্রোমোসোমও পরস্পর মিলিয়া যায় ও দ্বিগুণ হয়; আর এইরূপে দেহস্থ অন্য সাধারণ কোষগুলির 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা সমান হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সকল পুংকোষ বা স্ত্রীকোষ সঞ্চিত হয়, তাহাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নিশ্চয়ই কোন একসময়ে কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায় ও গর্ভাধানের সময় ঐ দুইয়ে মিলিয়া দ্বিগুণিত হইয়া, আবার স্বাভাবিক সংখ্যায় দাঁড়ায়।

এই সকল আবিষ্কারের ফল আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা আজকাল বলিতেছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ঐ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই প্রধানতঃ বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। বংশানুক্রমিক গুণগুলি উহারাই বহন করে ও জীবদেহের মধ্যে বিকাশ করিয়া তোলে।

এখন অনেকটা বুঝা গেল যে, প্রধানতঃ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। কিন্তু কিরূপে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণ পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে—বিশেষ করিয়া

ক্রোমোসোমের মধ্যে—সঞ্চিত হয়, কি করিয়াই বা তাহারা ঐগুলি বহন করে এবং কি উপায়েই বা তাহারা এক জীব-দেহ হইতে অন্য নূতন জীবদেহে সেগুলি সংক্রামিত করিয়া দেয়? এই রহস্যময় ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু না জানিতে পারিলে মনের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু জীবদেহের এই নিগূঢ় রহস্যটী প্রকৃতি এ-পর্য্যন্ত এমনই সংগোপনে রাখিয়াছেন যে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই বলিলেই হয়। তবে প্রতিভাশালী পণ্ডিতেরা এ-সম্বন্ধে নানা অনুমান করিতে ছাড়েন নাই। তাহাদের মধ্যে প্রধান দুই-একটীর পরিচয় দিলে বোধ হয় মনের ক্ষুধা কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে।

পণ্ডিতপ্রবর স্পেন্সার জীবদেহের মধ্যে একপ্রকার 'দৈহিক অণুর' (physiological units) কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন এই 'দৈহিক অণু'গুলি দেহের রাসায়নিক অণু (chemical units) ও জীবকোষের মাঝামাঝি রকমের। ইহারা শরীরের সকল অঙ্গের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে এবং নানাপ্রকার গুণের বীজ ইহারাই বহন করিতেছে। এক-একটী অঙ্গ যে বিশিষ্টভাবে গড়িয়া উঠে, এই সকল 'দৈহিক অণু'র গঠন-বৈচিত্র্য ও মিলন-বৈচিত্র্যই তাহার কারণ। ইহারাই সকলে মিলিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক করিয়া দেয়। আবার, ইহারা সকলে মিলিয়া যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও আবার ইহাদের উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

জীবদেহের পরিণতির সময়ে এই সকল 'দৈহিক অণুর'ই কতকগুলি যাইয়া পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। নূতন জীবগঠনের সময়ে Stem-cell বা মূলকোষের মধ্যে ইহারা সংক্রামিত হয়। সেখানে নূতন জীবের বিকাশের পক্ষে ইহারা সাহায্য করিতে থাকে ও তাহার মধ্যে তাহার সাধারণ ও বিশিষ্ট গুণাবলী ফুটাইয়া তোলে।

স্পেন্সারের মতে কেবল যে জীবের প্রকৃতিগত গুণই ইহারা বহন করে তাহা নহে; কর্ম্মগত পরিবর্ত্তনাদিও (modifications) ইহারা এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে বহন করে। কর্ম্মের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্ত্তন হয়, আর সেই পরিবর্ত্তনের ফল 'দৈহিক অণু'গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে; দৈহিক অণুগুলি আবার নূতন জীবদেহে সেই প্রভাবের ফল সংক্রামিত করিয়া দেয়।

মনস্বী ডারুইন প্রায় ইহারই অনুরূপ এক মত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে স্পেন্সারের physiological unitsএর স্থানে তিনি gemmules নামে আর একরকম বস্তুর কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

(১) জীবদেহের প্রত্যেক কোষ—একপ্রকার gemmules বা 'বীজ' নিক্ষেপ করে। gemmulesগুলি ঐ কোষের বিশিষ্ট গুণ বা লক্ষণগুলি বহন করিয়া থাকে।

(২) এই সকল gemmules খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু নিজেদের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হারায় না।

(৩) জীবদেহের জননেন্দ্রিয় স্থলেই এই gemmulesগুলি বিশেষরূপে সঞ্চিত হইতে থাকে ও তাহা হইতে নূতন জীব-দেহে সংক্রামিত হয়।

(৪) জীববিকাশের সময় gemmules-গুলি পরস্পর-মিলিত হইয়া তাহাদের আদি কোষের (যে কোষ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে) অনুরূপ কোষ গঠন করিয়া তোলে, কখন বা অজ্ঞাত কারণ বশতঃ লুপ্ত অবস্থায়ও থাকিয়া যায়। এই রূপে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে গুণের সাদৃশ্য বা পার্থক্য—এককথায় বংশানুক্রমের রহস্যময় ব্যাপার—এই সকল gemmulesদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্পেন্‌সার ও ডারুইনের এই সকল অনুমান আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎগণ মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন। কেননা,—তাঁহারা 'দৈহিক অণু' ও gemmulesদের উপর এত-বেশী ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছেন, যে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিসমান (Weisman) একটী নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সেই মতের নাম Theory of Germinal Continuity। তিনি বলেন, জীবদেহের যে মূলবস্তু—যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়,—তাহার নাম দেওয়া যায় —Germ-plasm বা প্রাণবস্তু। Germ-cell বা জীবকোষের মধ্যে এই প্রাণবস্তু থাকে। নূতন জীবদেহ পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যস্থ এই প্রাণবস্তু হইতেই গঠিত হয়। কিন্তু সমস্ত প্রাণবস্তুটাই সাধারণ দৈহিক গঠন-ব্যাপারে নিঃশেষে ব্যয়িত হয় না। কতকটা জননেন্দ্রিয় স্থলে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যে যাইয়া সঞ্চিত থাকে ও পুনর্ব্বার নবজীবদেহ গঠনের সময় কাজে লাগে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এই 'আদিভূত' প্রাণবস্তু হইতে নব নব জীবের বিকাশ হইতেছে, কিন্তু আসল জিনিষটা একেবারে খরচ হইতেছে না;—কিছু পরিমাণে বরাবর সঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহার ফলে কেবল যে পিতামাতার গুণই তাহাদের অব্যবহিত সন্তানে সংক্রামিত হইতেছে তাহা নহে, বহু বহু পূর্ব্বপুরুষদের গুণ ধারাবাহিক ভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রাণবস্তুর সহযোগে অধস্তন পুরুষদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম Germinal Continuity বা প্রাণবস্তুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ('অবিচ্ছিন্ন প্রাণের ধারা')।

এই প্রাণবস্তুর মূল আশ্রয়স্থান জীবকোষের কেন্দ্রাংশ; আরও বিশেষ-ভাবে Chromatin; তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে বলিতে গেলে Chromcscmes। বিসমান আরও একটু সূক্ষ্মতর কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে এই ক্রমোসোমের মধ্যে আবার সূক্ষ্মতর Ids বা Idants আছে। তাহারা প্রত্যেকটী স্বসম্পূর্ণ—জীবদেহের যাবতীয় গুণের কেন্দ্রস্থল তাহাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজস্বরূপ। নবজীব-গঠনে, এই Ids বা Idants দ্বারাই পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী সন্তানে বিকশিত হইয়া উঠে।

এইরূপে বিসমানের মতে জীব-জগতে বংশানুক্রমের এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে। আদিকাল হইতে একই মূলবস্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষদের গুণাবলী বহন করিয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে ও এক-এক প্রকার বিশিষ্ট জীববর্গের (Species) সাধারণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ-গুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এক হিসাবে জীবকে নূতন বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। সে এই 'জাতীয় গুণাবলীর' 'ট্রাষ্টি' স্বরূপ। পুরুষানুক্রমে এই গুলিকেই যথা-যথ বিতরণ করিয়া সে অনাদি জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দার্শনিক কর্ম্মবাদের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদের খুব সাদৃশ্য আছে। কর্ম্মবাদের মতে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের 'সংস্কার' নব নব জন্মে জীবের মধ্য দিয়া সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে ও সেই সকল 'সংস্কার'ই জীবের কর্ম্মফলরূপে দেখা দিতেছে,—তাহার স্বভাব ও পরিণামকে বিকাশ করিয়া তুলিতেছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদেও পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষদের গুণাবলী (প্রকারান্তরে 'সংস্কার' বলিলেও বলা যায়) অধস্তন পুরুষে প্রাণবস্তুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে এবং জীবের স্বভাব ও পরিণাম নির্ণয় করিয়া দিতেছে। †

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

# পূজা

যেদিন হাসি ছিল বন্ধু, ছিল যেদিন গান,
তোমার চোখে, আলোক মম করেছিলেম দান,
মৃদু হাসে মধুর ভাষে প্রাণের কল তানে
অজস্র ভরিয়া ছিনু তোমার পরাণে।

আজকে শুধু অশ্রুজল, নাইত কিছু আর
দুঃখ এ যে, চিরমৌন, কোথায় ভাষা তার?
নিশীথের স্তব্ধ স্তুতি, মেঘের তলে তারা,
তন্ত্রীহীন বীণার বুকে গীতি-বাক্য-হারা!

এ যে পূজা দিবারাতের এ চির বেদন,
মূকের বুকভরা ব্যথা, আঁখির আবেদন!
শিশির চেনে নিশার পায়ে ঊষা আলো চাওয়া,
চোখের দেখা বিরল হ'লে মনের মাঝে চাওয়া!

নত নয়ন, মৌন মুখ, রুদ্ধ হিয়া আর,
হ'ল এবার চিরদিনের পূজার উপচার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

† এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে প্রধানতঃ Thomson's "Heredity", Haeckels' "Evolution of Man" ও Karl Pearson's "Science of National Eugenics" হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

লেখক।

# আলেয়ার আলো

## পনেরো

### সরমার কথা

সেদিন মোহনবাবুর পিসিমা যে কথাগুলি বললেন,—কেন জানিনা, আমার মনে হোল—তার মধ্যে সমবেদনার চেয়ে বিষের ঝাঁঝটাই যেন কিছু বেশী পরিমাণে ছিল। তিনি যে সুধু আমাকে আমার ভাঙ্গা কপালের কথাটাই মনে করিয়ে দিলেন—তা-নয়; যেন তারও অতিরিক্ত কোন-একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করলেন। নইলে, যে প্রসঙ্গ মোটেই আমার প্রীতিকর নয়, প্রথমদিনেই একেবারে সে কথা তোলা কেন,—অকারণে আমাকে সাবধান করে দেওয়াই-বা কেন? কী আমি করেছি, সাবধান হব কিসের জন্যে? কিছুই স্পষ্ট বুঝলুম না—অথচ মনে-মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে রইল।

কিন্তু, দু-চারদিন পরেই যেন একটু আঁচ পাওয়া গেল।

বামী-ঝী একদিন আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললে, "দিদিমণি, তোমাকে নিয়ে পাড়ার দশজনে দশ কথা বলছে।"

পাড়ার দশজনের একজনকেও আমি চিনি-না, চিনতেও চাইনা; কিন্তু দশকথা কি যে বলছে সেটা জানতে আগ্রহ হোল। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি বলছে?"

বামী রান্নাঘরের মেঝেতে ন্যাতা বুলুতে-বুলুতে বললে, "যত সব ছাই কথা মা, যত সব ছাই কথা! সে আমি বলতে পারব না।"

—"যদি বলতেই পারবি-নি, তবে কথাটা তুললিই-বা কেন?"

বামী নিজের মনেই বকে যেতে লাগল, "আর এও বলি বাপু, কার ঘরে কি হচ্চে না হচ্চে, তোদের সে খোঁজে দরকার কি! কথায় আছে দিদিমণি, 'ভাত দেবার কেউ নন কিল মারবার গোঁসাই'—এরা হচ্চে তাই! উনুনমুখীদের মুখে আগুন লাগেনা গা? ওমা, যাব কোথা! বলে কিনা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার নাকি--"

সবটা শোনবার আগেই বুঝে নিলুম। ধমকে বললুম, "চুপ কর্ বামী, তোর এ-সব কথায় দরকার কি?"

বামী থতমত খেয়ে বললে, "তা মা, যা বলেছ! আমরা দাসী-বাঁদী, বড়লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি! তবে, কি জান দিদিমণি, তোমাদের জন্যে আমাদের শুনতে হয়, কাজেই বলতেও হয়!"

—"শুনতে হয় শুনিস্, কিন্তু আমার কাছে আর বলতে হবে না! ফের্ যদি তোকে কেউ কিছু শোনাতে আসে, তাহলে বলিস্ যে আমি বলেছি, আমরা কি কারুর আটচালায় ঘর বেঁধে বাস করি যে লোকের কথার ধার ধারব?"—এই বলে আমি উপরে উঠে এলুম।

দশজনের দশ কথা শোনা, আমার জীবনে এই নতুন নয়। বাবা আমাকে একাদশী করতেও দেন না, থান কাপড় পরতেও দেন না। বলেন, আমাকে বিধবার বেশে দেখলে তাঁর বুকে শেল বাজবে। দেশে থাকতে এই নিয়ে কি ঘোঁটটাই না হয়েছে! সুধু কি তাই—যত সব কুৎসিত কাণাকাণি, ইতর কথা, অন্যায় ইঙ্গিত!—বিধবাকে একটু বাগে পেলে কেউ ছেড়ে কথা কয় না, যা মুখে আসে তাই বলে—ও-সব সয়ে সয়ে বুক আমার দরাজ হয়ে গেছে,—দশজনের দশ-কথার দাম যে কত,—তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

তবে, এ কাণাকাণি বাবা যদি শোনেন, তাহলে কাতর হয়ে পড়বেন বটে। বাবা আমার মজার মানুষ। তিনি দশজনকে চটিয়ে কাজ করতে বেজায় মজবুৎ, অথচ দশকথা সইতে হলে একেবারে কাবু! আবার আরো মজা এই যে, তিনি এ-সব শুনলে কাহিল হন বটে, কিন্তু তবু, এক-বার যে পথে চলেন, দশজনের সঙ্গে বনিবনাও করে' সে পথ ছেড়ে ফিরতেও আর রাজি হন না!

কিন্তু মোহনবাবু কোন্ দলের লোক, সেটা ত জানা নেই! এ-রকম কুৎসা শুনলে তিনি সব তুচ্ছ করবেন, না, গ্রাহ্য করবেন? আমার ত পাড়ার মন্থরাদের মুখনাড়ায় একটুও মাথাব্যথা হয় না—কিন্তু পল্লীবাসী দুর্মুখদের উচ্চভাষকে তিনিও সুবুদ্ধির মত হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন ত?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে ধীরে-ধীরে প্রসন্ন হয়ে উঠছে। বাগানের এককোণে গোটা-তিনেক তাল-গাছ এ-ওর মাথা-ঠোকাঠুকি-করে' দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বাতাসে-দোদুল বাকলে বাকলে শুভ্র-চিকণ জ্যোৎস্না এসে দেদার আলোর ফিন্‌কি ফোটাচ্ছে; দেখে মনে হচ্ছে, যেন তিনটে আকাশমুখো মস্ত ফুলঝুরি থেকে-থেকে ঝিক্‌মিকে আলোর টুক্‌রো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছে!

চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান আর ফুলের গন্ধ আজ আমার চোখ-কাণ-মনকে বিভোর করে' তুললে! বিধবার মানস-চোখে লোকে জোর-করে' যে ঠুলি বসিয়ে দেয়, এমন রাতে এমনসময়ে সে ঠুলি আপনি খসে পড়ে—মনের অন্ধতা আপনি ছুটে যায়,—তোমাদের ও দেশাচার, লোকাচার, বিচার-অবিচারের কোন ধার না ধেরেই!

আমরাও যে মানুষ!... ... ...

আস্তে-আস্তে এস্রাজটিকে কোলে তুলে নিলুম। বারোঁয়ার করুণ রাগিণী আমার প্রাণের মাঝ থেকে বেরিয়ে ধীরে-ধীরে এস্রাজের তারে-তারে সুরের জোয়ার বহিয়ে দিলে। সে সুরের সঙ্গে আমার উদাসী প্রাণও যেন ঐ আলোভরা তারাভরা নীলে-ভরা অনন্ত আকাশের দিকে—উপরে, উপরে,—আরো-উপরে উঠে যেতে লাগল—স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য, অসীমের জন্য!

হৃদয়ে আজ অকালে বসন্তের সাড়া পেয়েছি—এস্রাজ আমার এমন-করে' অনেক দিন কথা কয়-নি!

একই রাগিণী অনেকক্ষণ ধরে, অনেক বার আলাপ করলুম। যখন থামলুম, তখন রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে চাঁদের আলো আরো ফুটফুটে হয়ে উঠেছে, ফুলের গন্ধ আরো ঘন হয়ে উঠেছে, পাপিয়ার 'পিউ-কাহা' আরো মধুর হয়ে উঠেছে! এস্রাজের তারে-তারে রাগিণীর শেষ প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না যেতেই পিছন থেকে শুনলুম—"থামলে কেন, সরমা, ফের বাজাও!"

সচকিতে ফিরে দেখি, ছাদের উপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে মোহনবাবু দাঁড়িয়ে!

মাথার কাপড় খসে কাঁধের উপর এসে পড়েছিল;—তাড়াতাড়ি এস্রাজকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে, ত্রস্তভাবে মাথায় কাপড় তুলে দিলুম।—মাগো, মোহনবাবু যেন কী!

—"সরমা, তোমার নরম হাত থেকে খসে মাটির উপরে পড়ে এস্রাজের তারগুলো কী কান্নার সুরে ঝন্‌ঝন্ করে' উঠল, শোন! তুমি কি আর বাজাবে না?"

—"না।"

..."কেন?"

—"এটা হোল চুরি-করে' গান-শোনার সাজা।"

—"তোমার বাজনা কি মিষ্টি!"

—"সেটা বোধহয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রকাশ্য-উক্তি। স্বগত-উক্তিতে নিশ্চয় 'থামলে বাঁচি'! কি বলেন?"

—"সরমা, দিন-কে-দিন বাজনায় তোমার হাত বেশী খুলছে, কি কথায় তোমার মুখ বেশী খুলছে—সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

—"যা বুঝতে পারছেন না, তা বেশী বোঝবার চেষ্টা করা মিছে সময়-নষ্ট মাত্র,—এটা ত অবশ্যই বুঝতে পারছেন?"

—"বাজনা বন্ধ করে' যখন কথাই সুরু করলে,—তখন অগত্যা বসে বসে তাই শোনা যাক্; কেননা, প্রবাদ বিধান দিয়েছে, মধু দুর্লভ হলে গুড় খাওয়াই প্রশস্ত!"—এই বলে মোহনবাবু ছাদের উপর বসে পড়লেন।

আমি বললুম, "মোহনবাবু, মেয়েমানুষের কথা আর কি শুনবেন বলুন! আপনারা পুরুষমানুষ, আমাদের কথা আপনাদের ভাল লাগবে কেন?"

—"সরমা, রমণীর সঙ্গে যখন পুরুষের কথা হয়,—কথার মধ্যে তখন যেমন বৈচিত্র্য আর মাধুর্য্য আসে, এমন আর কখনো নয়। আমার ত মনে হয়, একঘরে যদি দশজন পুরুষও কথা কয়, তবে সেই দশজনের কথাই যেন একটিমাত্র লোকেরই স্বগত-উক্তির মত শোনাবে!"

—"কিন্তু, তবু ত আমাদের কথাকে আপনারা মেয়েলী কথা বলে ঘৃণা করতেও ছাড়েন না!"

—"এর কারণ, আমাদের মেয়েরা কথার মত কথা কইতে জানেন না। আমরা সাধ করে' আমাদের মেয়েদের অবস্থা এমন ভয়ানক করে' রেখেছি যে, মেয়েরাও শিক্ষিত পুরুষদের কথা বুঝতে পারেন না আর শিক্ষিত পুরুষরাও অশিক্ষিত মেয়েদের কথা শোনবার যোগ্য বলে ভাবেন না। নারীদের অজ্ঞ রেখে আমরা নিজেরাই যে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এটা এখনো

আমাদের মাথায় ঢোকে-নি—এ বড় আশ্চর্য্য! মেয়েদের কথা বলবার যে একটি বিশেষ ভঙ্গি আর স্বাভাবিক শক্তি আছে, শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হলে তা যে কতটা মধুর, কতটা সরস হয়ে উঠতে পারে, আমাদের সে ধারণা নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমাদের অন্তঃপুর আনন্দের আস্তানা হয়ে উঠত। স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাবে পুরুষদের আলাপের সঙ্গে বাঙ্গালী মহিলারাও যোগ দিতে পারেন না,—আমাদের জীবনও তাই দিন-কে-দিন একঘেয়ে, নীরস হয়ে পড়ছে। নারী-প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল। পুরুষের কঠোরতার সঙ্গে নারীর এই কোমলতা যদি মিশতে পারে, তাহলে জীবনটা কি বিচিত্র হয়ে ওঠে!"

…"মোহনবাবু, নারীকে আপনি যে এতটা উচ্চাসন দেন, আমি ত তা জানতুম না!"

—"উচ্চাসন দেব না? এ যে নারীর প্রাপ্য! নারীকে আমরা আমাদের কর্ম্মের মন্ত্রী, অবসরের সাথী, সুখে-দুঃখে জীবনের সহচরী করতে পারছি না বলেই ত তাদের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের একটা নীচসম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। ছায়া যেমন আলো-কে কোমল করে, সুন্দর করে, মধুর করে, নারীও তেমনি দুরন্ত পুরুষ-প্রকৃতিকে শান্ত, স্নিগ্ধ, সুশ্রী করে' আনে। পুরুষ আর নারী,—এরা দুজনেই যদি দুজনকে জীবনের সকলদিক দিয়ে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে ভগবানের সৃষ্টিই যে অসার্থক হয়ে যাবে। এদের দুজনেরই স্বাভাবিক গতি দুজনের দিকে,—যা-কিছু এই গতিকে এই মিলন-স্পৃহাকে বাধা দিতে চায়, তাই-ই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, অশোভন! সরমা, যে দেশে নারীর সাহায্য পুরুষ প্রত্যাখ্যান করে, সে দেশের অশেষ দুর্ভাগ্য!"

কিছুক্ষণ ধরে আমরা দুজনেই নীরবে বসে-বসে বাহিরের সৌন্দর্য্যকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করলুম। তারপর, আমার খোঁপায় যে গুটিকয় চাঁপাফুল গোঁজা ছিল, তারই গন্ধ বোধহয় বাতাসে মোহনবাবুর নাকে গেল; কারণ, হঠাৎ তিনি দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে উঠলেন, "আঃ! চাঁপার কি মিঠে গন্ধ আসছে!"

আমি একটু জড়সড় হয়ে চুপ-করে'ই রইলুম। গন্ধটার উৎপত্তি যে কোথায়, সেটা আর প্রকাশ করে' বললুম না।

মোহনবাবু একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার চোখও তাঁর দিকে গেল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি চোখ নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন—আমিও মাথা হেঁট করলুম।

হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আড়ালে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেল। চারিদিকের তরল অন্ধকার পৃথিবীকে যেন আরো ছোট আরো নিরিবিলি করে' তুললে! আমরা দুজনেই দুজনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। আমার মনে হোল, সে নিশ্বাস যেন লুকানো আত্মার অস্ফুট ভাষা,—যে ভাষা মুখে ফোটে না, বুকে জেগে ওঠে!

আচম্‌কা একটা দমকা বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় কি-যেন কাণাকাণির আন্দোলন

জাগিয়ে দিয়ে গেল! আমরা এমন বিভোর হয়ে ভাবছিলুম যে, সে শব্দে তুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম!

দেখলুম, মোহনবাবু ফিরে বসে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। সেই অল্প আঁধারের ভিতরে তাঁর তুটি চোখ তুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ-শিখার মত আমার মুখের 'পরে স্থির হয়ে রইল!

আমার বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল!

মোহনবাবু খুব-আস্তে—শোনা-যায়-কি-না-যায় এমনি স্বরে—ডাকলেন, "সরমা!"—তাঁর স্বর কাঁপছিল!

সে স্বর শুনে আমার ভয় হোল, তাড়াতাড়ি বললুম, "মোহনবাবু, অনেক রাত হয়েছে—চলুন, আজ যাই!"

মোহনবাবু কোমলস্বরে বললেন, "সরমা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

এমনসময় একরাশ ভাঙ্গা-ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ফুটে উঠে, নীল-জলে পদ্মের পাপড়ির মত নীলাকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোহনবাবুর কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি বললুম, "আঃ, বাঁচলুম! আচ্ছা মোহনবাবু, আপনি কি ভালবাসেন—আলো, না অন্ধকার?"

—"আমার তুই-ই ভাল লাগে। কখনো আলো ভালবাসি—কখনো অন্ধকার।"

—"আমারও তাই, মোহনবাবু! কখনো আলোতে বেরিয়ে আসতে চাই, কখনো চাই অন্ধকারে বসে থাকতে!"

—"সরমা!"

—আবার সেই স্বর! তেমনি কোমল, মৃত্তু, কম্পিত!—আমি আর পারলুম না, জোর-করে' দাঁড়িয়ে উঠলুম। শুষ্ককণ্ঠে বললুম, "কি বলছেন মোহনবাবু?"

—"সরমা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শুনবে?"

আমি খানিকক্ষণ চুপ-করে' রইলুম। তারপর ছাদের উপর থেকে এস্রাজটি তুলে নিয়ে তুরু-তুরু বুকে বললুম,—"কি, বলুন!"

মোহনবাবু একবার আমার মুখের পানে চেয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, থাক্! আজ অনেক রাত হয়ে গেছে—আর-একদিন শুন তখন"—এই-বলেই ছাদের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।…

ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে আমি বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লুম! বুকের তুফান আর বাগ্ না মেনে চোখের কানায়-কানায় উপছে পড়তে লাগল।

খোঁপার চাঁপার গন্ধ কি বিশ্রী! দূর করে' ফুলগুলো টেনে ফেলে দিলুম… … অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডুকরে বলে উঠলুম—"মা গো!"

## ষোলো

## হরেন্দ্রের কথা

মোহন এসে আমাকে মস্ত মুরুব্বি পাকড়াও করেছে! অর্থাৎ, তার অভিপ্রায় এই যে, আমি মুরারিবাবুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে সরমার বিবাহের প্রস্তাব করি!

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কাল কিছু শুনলুম না, আর আজ হঠাৎ উদ্বাহ-

বন্ধনে বন্দী হতে তোমার এতটা আগ্রহ কেন হে? একদিনেই প্রেমের এতটা পরিণতি—প্রেমের পাঠশালায় তুমি যে দেখছি ডবল-প্রমোশন পাচ্ছ! ধন্য সখা, ধন্য!"

—"ভাই, পাড়ার ছুঁচোগুলোকে জান ত! তাদের মুখ এইবেলা বন্ধ করতে হবে!"

—"কেন, তারা কি বলতে চায়?"

—"যত-সব অভদ্র কথা! তাদের স্বভাব ত জানই, অনুমান করে' নাও না!"

—"বেশ, তা-যেন বুঝলুম। তবু এখানে একটা কিন্তু আছে। সরমা কুমারী হোলে কোন কথাই ছিল না, সে বিধবা বলে একটা বিষয় আগেই জেনে নেওয়ার দরকার।"

—"কি?"

—"এ বিবাহে তার কি মত? সেদিকে কিছু সুবিধে-টুবিধে করতে পেরেছ?"

—"ভাই, এতদিনেও সরমার মন ত বুঝতে পারলুম না।"

—"পুরুষের কাছে রমণী দুর্ব্বোধ, আবার রমণীর কাছেও পুরুষের হৃদয় একটি মস্ত গোলকধাঁধা! কিন্তু যখন হৃদয়ে হৃদয়ে যুদ্ধ বাধে, তখন এক হৃদয়ের উচিত হচ্ছে, অন্য হৃদয়ের গুপ্তকথা যতটা-পারে সমঝে নেওয়া! যে পক্ষ অন্য পক্ষের ভিতরের কথা যত-বেশী জানতে পারে, যুদ্ধে তারই জিৎ হয়। তুমি কি কিছুই বুঝতে পার-নি মোহন?"

—"একবার মনে হচ্ছে বুঝেছি, আবার মনে হয়, বুঝি-নি। এ বড় মুস্কিল ভাই, তাকে ধরি-ধরি করে'ও যেন ধরতে পারি না।"

—"রমণী হচ্ছে ছায়ার মত; তাকে যদি অনুসরণ কর, সে তোমার নাগালের বাইরে-বাইরে ছুটবে; তাকে ছেড়ে যদি সরে আস, সে তোমার পিছনে-পিছনে ফিরে আসবে! সুতরাং একটু মাথা-খাটানো চাই। কিন্তু মোহন, আমার বিশ্বাস, তোমার মত দুর্ব্বল জীবের পক্ষে রণক্ষেত্রে নামাটা উচিত হয়-নি!—তুমি শুধু দুর্ব্বল নও, তুমি অন্ধ! যদি কেউ প্রেমের ইতিহাস লেখেন, তাহলে তিনি প্রণয়যুদ্ধে ওস্তাদ অনেক নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁদের অনেকের চেহারা হয় ত কুৎসিত, চরিত্রও তেমন লোভনীয় নয়, তবু অন্যপক্ষের হাল-চালটা শীঘ্র বুঝে নেবার শক্তি ছিল বলেই তাঁরা বড় বড় যুদ্ধে সহজেই কেল্লা ফতে করেছেন। কিন্তু হে মোহন, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে তোমার উপরে আমি দোষারোপ করতেও পারি না। কেননা, মদন হচ্ছেন সেই মায়াবী,—যাঁর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করলে রাজাই বল আর ভিখারীই বল, সকলেরই বুদ্ধিসুদ্ধি কর্পূরের মত উবে যায়! বাস্তবিক বন্ধু, তোমার এ-হেন সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বভাব,—তার ওপরে বিদ্যা ও অর্থে তুমি এতটা ভাগ্যবান—"

—"হরেন, তুমি কি Mutual Admiration Society খুলতে চাও?"

—"উঁহু, একেবারেই না। আমি বলতে

চাই, তোমার সব আছে, কিন্তু তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। জগতে সকলেরই পার আছে, কিন্তু নির্ব্বোধের কোন গতি নেই।"

—"তবে হেঁয়ালি ছেড়ে, তুমিই আমার খেয়ার কাণ্ডারী হও।"

—"আমি যা বললুম, তা মোটেই হেঁয়ালি নয়। কিন্তু যাদের কাণ কিঞ্চিৎ লম্বা, তাদের কাছে দুনিয়ার অনেক জিনিষই ছাঁকা-হেঁয়ালি। আর দেখ মোহনলাল, আমার কথাকে হেঁয়ালি ছাড়া আর-কিছু বলতে তুমি নিতান্তই যদি নারাজ হও, তাহলে জেনে রেখ যে, সমাজে অনেক কথা হেঁয়ালি দিয়ে প্রকাশ করাই ভাল; কেননা সরল কথা অনেক সময়ে চক্ষু-লজ্জা উপস্থিত করে, আবার প্রীতিকর না হোয়ে ভীতিকর হোতেও পারে।"

—"অতএব, হেঁয়ালিরই জয়! কিন্তু উপস্থিত তোমার দার্শনিক গবেষণা একটু স্থগিত রাখলেই ভাল হয় না কি?"

—"এমন সাদাসিধে কথাকে যে গবেষণা বলে ভ্রম করে, তার পক্ষে বাঙ্গলা মাসিক-পত্র পড়াই হচ্ছে প্রশস্ত।"

—"ভাই, তোমাকে মুরুব্বি ধরে আমি দেখছি, জ্বলন্ত আগুণ থেকে গরম কড়ায় এসে পড়েছি। অতএব, তুমি নিরাপদে তোমার গবেষণায় নিবৃত্ত থাক, আমি চললুম।"

—"কিছুতেই নিবৃত্তচিত্ত হওয়া আমার স্বভাব নয়, সুতরাং আমিও চললুম।"

—"কোথায়?"

—"মুরারিবাবুর বাড়ীতে।"

—"কেন?"

—"গর্দ্দভের জন্যে দড়ি সংগ্রহ করতে।"

—"গর্দ্দভ যেন আমি! কিন্তু দড়ি খুজতে সেখানে কেন?"

—"আমার প্রিয়তম গর্দ্দভকে সেই দড়ি দিয়ে উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধব বলে।"

মোহন কৃতজ্ঞভাবে আমার হাত চেপে ধরলে!

মুরারিবাবুর বাড়ীতে হাজির হয়ে দেখি, তাঁর বৈঠকখানাটি বেজায় সরগরম হয়ে উঠেছে। বাহির থেকেই দেখতে পেলুম, পাড়ার যত-সব মাতব্বর এসে সেখানে আসর জম্‌কে বসেছেন। ব্যাপার কি? মুরারিবাবু ত কারুর সঙ্গে মেশামেশি করেন না, তবে অকস্মাৎ এতগুলি মহাত্মা আজ এখানে পদধূলি দিয়েছেন কেন? দেখতে হোল।

একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকলুম না,—কারণ 'ষণ্ডামার্ক' ও 'গোঁয়ার' বলে পাড়ায় আমার সুনাম হয়েছে অনেকদিন। আমাকে এঁরা পছন্দও করেন না, ভালও বাসেন না,—হঠাৎ আমার আবির্ভাব হলে, এখনি এঁরা আঁৎকে উঠতে পারেন। অতএব, বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘরের মধ্যে উকি-ঝুঁকি মারতে লাগলুম।

যিনি কথা কইছিলেন, তিনি হচ্ছেন পাড়ার বিশুখুড়ো। তিনি হুকোয়-লাগানো একটি কলাপাতার নলে টান দিতে-দিতে বলছেন, "মুরারিবাবু, বাস্তবিক আমরা আপনার জন্যে দুঃখিত!"

বিশুখুড়ো দুঃখিত? তবে ত ব্যাপার বড় সঙ্গিন! তিনি যখনি দুঃখিত হন, তখনি কারুকে জবাই করবার আয়োজন করেন, এ আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

বিশুখুড়ো বললেন, "দেখুন, সমাজে থাকতে গেলেই আর-পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে' থাকতে হয়।"

আর একজন খুড়োকে তারিফ করে' বলে উঠলেন, "যা বলেছ! খুড়ো, তোমার এ-কথা লাখটাকার এক কথা!"—ইনি হচ্ছেন, ঘোঁট-পাকাবার ওস্তাদ পাড়ার একচক্ষু দুর্লভ বাঁড়ুয্যে!

দুর্লভ বাঁড়ুয্যেকে সমর্থন করে' আর-সকলে তারস্বরে বলে উঠল, "অবিশ্যি, অবিশ্যি!"

বেচারী মুরারিবাবু! তিনি এই মাতব্বরদের পাল্লায় পড়ে দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন! কিছুই বুঝতে না-পেরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনারা এতক্ষণ ধরে খালি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ছেন কেন? মশাইদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, পরিষ্কার করে' বললে বাধিত হব!"

বিশুখুড়ো গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, "কি-জানেন মুরারিবাবু, আপনি যখন এ পাড়ায় এসে বসবাস করছেন, তখন আমাদের কাছ থেকে—ওর-নাম-কি—দুটো ভাল-মন্দ শুনতে হবে বৈকি! তা যদি না শোনেন, তাহলে আমরা বড়ই দুঃখিত হব। কি বল হে দুর্লভ?"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ কুঁচকে বললেন, "তা দুঃখিত হব না আর—এ যে বড় নিন্দের কথা!"

আর-সকলে বললে, "তা বৈকি—তা বৈকি!"

মুরারিবাবু বললেন, "আপনারা সকলেই যে আমার জন্যে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত, সে ত বেশ বুঝতেই পারছি। কিন্তু মুস্কিল এই, আমার দুঃখটা যে কোথায় সেইটেই খালি বুঝতে পারছি না। সুতরাং—"

বিশুখুড়ো বললেন, "মুরারিবাবু, আমরা আপনার কাছে আজ যে ক্যানো এসেছি, অতঃপর মন দিয়ে তা শুনুন। আপনার একটি—ওর-নাম-কি—বিধবা মেয়ে আছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আহা, দুঃখের কথা! কার কপালে যে কি আছে, তা কে বলতে পারে? হরি হে, তুমিই সত্য!"

—"তা কি বলতে চান, বলুন!"

—"হ্যাঁ, বলচি-কি—আপনার মেয়েটি নাকি গান গায়, বাজনা বাজায়?"

—"হ্যাঁ, সে গান-বাজনা জানে বটে।"

—"সে নাকি পরপুরুষের সামনে বেরোয়, যার তার সঙ্গে একলা বসে কথা কয়?"

—"পরপুরুষটা কে মশাই?"

—"এই ধরুন, আমাদের মোহনলাল!"

—"মোহন, সে ত আমার বাড়ীর ছেলের মত! সুতরাং—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সুধু আপনার ক্যানো, মোহন আমাদেরও বাড়ীর ছেলের মত। তা-বলে ত আমরা আমাদের বাড়ীর বিধবা বৌ-ঝীর সঙ্গে তাকে চোখের আড়ালে মিশতে বা গান-বাজনা করতে দিতে পারি না! কি বল হে দুর্লভ?"

দুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যে শামুকের খোল থেকে খুব বড় একটিপ নস্য নিয়ে, একচক্ষু কুঁচকে নাকের মধ্যে গুঁজ্‌তে-গুঁজ্‌তে বললেন, "তা বটেই-ত, তা বটেই-ত !"

বিশুখুড়ো হুকোয় খুব-একটা জোর-টান লাগিয়ে বললেন, "আপনার মেয়েটিকে সাবধান করুন,—তার সম্বন্ধে আমরা আরো অনেক কাণাঘুষো শুনছি।"

মুরারিবাবু এতক্ষণে সমস্ত বুঝে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বললেন, "ও সব মিথ্যেকথা—মিথ্যেকথা !"

দুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ নেড়ে মুরুব্বি-আনা চালে বললেন, "আজ্ঞে, না-জেনে আমরা কিছু বলতে আসি-নি। যেখানে মিথ্যে—জানবেন, দুর্ল্লভ শর্ম্মা সেখানে নেই ! আর, আমাদের কথা যদি না কাণে তোলেন, আপনাকে তাহলে একঘরে হোতে হবে—এটা যেন ভুলে যাবেন না !"

মুরারিবাবু অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে, কাতর ভাবে সকলকার মুখের পানে তাকাতে লাগলেন,—কিন্তু সেখানে এমন মুখ একটিও দেখলেন না, যাতে একটুও মায়ামমতার ভাব মাখানো আছে !

বিশুখুড়ো চোরা কটাক্ষে দুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি বাঁকা হাসি হাসলেন। সে হাসিটার মানে এই যে, এতক্ষণে চারে মাছ এসেছে !

দুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যে অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে আর একটিপ নস্য নাকে পূরে বললেন, "মুরারিবাবু, সেইজন্যেই আপনাকে আগে থাকতে আমরা সাবধান করে' দিতে এসেছি। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করতে হবে ত !"

মুরারিবাবু বললেন, "আমি আপনাদেরই আশ্রিত। সুতরাং—"

ফকির ভট্‌চায্যি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে ঘাড়-নুইয়ে বসে আফিমের নেশায় ঝিমুচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর স্তিমিত চোখ-দুটি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে' আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে বললেন, "ও আশ্রিত-অনাশ্রিত বাছতে গেলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করা কি চলে মশয় ?"

আমি দেখলুম, আর আড়ালে থাকা চলে না, মুরারিবাবু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন !

—"কাদের কাছে আপনি আশ্রয় চাচ্ছেন মুরারিবাবু ?"—এই বলে আমি ঘরের সেই শৃগাল-সভার মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

মুরারিবাবু আমাকে দেখে যেন হাত-বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আসুন, হরেনবাবু আসুন !"

আমি অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে মুরারিবাবুকে বললুম, "আপনি কাদের কাছ থেকে আশ্রয় চাচ্ছিলেন ?"

—"এই যে, এঁদের কাছ থেকে !"

—"এ ঘরে মানুষ আছে নাকি ? বটে, তা ত জানতুম না ! আরে কেও, বিশুখুড়ো ! এদিকে এটি কে ? দুর্ল্লভ বাবু ! ওদিকে ভট্‌চায-মশায় বুঝি ? বেশ, বেশ, এ যে দেখছি, নরক গুলজার ! —মুরারিবাবু, আপনি এরি মধ্যে এত গুলি মহাত্মার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন ? সাধু, সাধু !"—আড়্‌চোখে

একবার সকলকার মুখ দেখে নিয়ে, ঠিক মাঝখানে গিয়ে আমি বসে পড়লুম।

আমাকে দেখবামাত্র বিশুখুড়োর মুখ থেকে হুকোর কলাপাতার নল খসে পড়ল, ফকির ভট্চায্যির নেশা বিল্‌কুল ছুটে গেল, একচক্ষু দুর্লভ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ উদাসভাবে উর্দ্ধমুখে কড়িকাঠ গুণতে সুরু করলেন এবং মজা জম্‌তে-জম্‌তে জমল-না দেখে আর-আর সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

এঁদের আকস্মিক ভাবান্তর দেখে মুরারি-বাবু একেবারে অবাক!

কোনরকমে হাসি চেপে আমি বললুম, "কি বিশুখুড়ো, হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষার কাজ আজ-কাল কেমন চল্‌ছে? খবর সব ভাল ত? আর কজন লোক একঘরে হোল, ক-জন পাপিষ্ঠ জাতিচ্যুত হোল?"

খুড়ো এদিক-ওদিক চেয়ে আচম্‌কা গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "বাবা হরেন, আজ আমাদের হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভার অধিবেশন আছে। আমি ত আর থাকতে পারছি-না।"

দুর্ল্ভ বাঁড়ুয্যেও শামুকের খোলটি ট্যাঁকে গুঁজে টপাস্ করে' উঠে পড়ে বললেন, "ওহো, ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে! আমাকেও সেখানে যেতে হবে যে!"

বিশুখুড়ো আর দুর্ল্ভ বাঁড়ুয্যে চৌকাঠ পার না-হতেই ফকির ভটচায্যিও প্রমাদ গুণে ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও খুড়ো, ও দুর্লভ! আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে তোমরা চললে কোথায়! দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব!" বলতে-বলতে বৃন্দাবনী নামাবলী-খানি তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে ভট্চায্যিও চট্‌পট্ সরে পড়লেন। বলাবাহুল্য, ঘরের মধ্যে আর-আর যাঁরা ছিলেন, মহা-জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁরাও কিছু-মাত্র বিলম্ব করলেন না!

মুরারিবাবু বললেন, "এঁরা দেখছি আপনাকে ভালচোখে দেখেন না।"

—"ভালচোখে দেখবেন কি, এঁরা আমাকে যমের মত ভয় করেন। কারণ, এঁদের প্রত্যেকের নাড়ীর খবর আমার জানা আছে! ঐ যে বিশুখুড়ো, উনি 'হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভা'র পরম বৈষ্ণব সম্পাদক—ওঁর মাথার চুল হাত্‌ড়ালে পাবেন লম্বা টিকি, আর উদর হাত্‌ড়ালে পাবেন মুরগীর কাট্‌লেট! আমি একদিন একটা হোটেলে ওঁকে হাতে-নাতে পাক্‌ড়ে অত্যন্ত নির্দ্দয়ের মত ওঁকে টিকিহীন করে' দিয়েছিলুম। ঐ দুর্ল্ভ বাঁড়ুয্যেটিরও যোড়া মেলা দুর্ল্ভ। উনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করতে চান, কিন্তু নিজে দুটি অভাগিনীকে কুলের বাহির করেছেন। আর ঐ যে ফকির ভট্চায্যি, জাল করে' উনি একবার জেল বেড়িয়ে এসেছেন! এঁরাই আজকাল আমাদের সমাজপতি! এঁরা মনুষ্য-ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, অথচ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করবার স্পর্দ্ধা রাখেন! এঁদের এখানে আসবার উদ্দেশ্য আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি —সুতরাং আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। তবে একটি কথা আপনাকে বলে রাখি। এঁদের কাছে কখনো নরম

হরেন না, তাহলে দ্বীপবাসী বৃদ্ধ যেমন সিন্দবাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, এঁরাও তেমনি আর আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হবেন না। এঁরা হচ্ছেন গরমের গোলাম আর নরমের যম!”

মুরারিবাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, “মানুষ কি এত নীচ হতে পারে!”

—“মানুষের ভিতরে বেশীর ভাগই নীচ, ভালর ভাগ খুব কম। আর কম বলেই, রাস্তায়-ঘাটে ভাল'র ছড়াছড়ি নেই বলেই, ভালকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। দুনিয়ায় যা দুর্লভ, তারই ত আদর অধিক!”

—“কিন্তু হরেনবাবু, এঁরা যে-সব ভয়ানক কথা বলে গেলেন, তাতে আমি বড় আঘাত পেয়েছি। সরমার নামে চারদিকে নানান কথা রটেছে।”

—“রটুক। মনে যে খাঁটি, নিন্দুকের কলঙ্ক-রটনায় তার কাণ পাতবার দরকার নেই।”

—“হরেনবাবু, অমন-যে সবল-চরিত্র রামচন্দ্র, নিন্দুকের জিহ্বাকে তিনিও ত অবহেলা করতে পারেন-নি!”

—“তার ফলটা কি হয়েছিল, তাও ভেবে দেখুন! নিন্দুকের মন রাখতে গিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়েছিলেন, সতীর অপমান করেছিলেন।”

মুরারিবাবু চুপ-করে' বসে রইলেন। আমি একটু ইতস্তত করে' বললুম, “আপনি যদি এই কুৎসিত কাণাকাণি বন্ধ করতে চান, তাহলে একটি উপায় আছে।”

—“কি?”

—“আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।”

—“হরেনবাবু, আপনি কল্পনায় কাজটি যত সহজ মনে করছেন, আসলে এটি তত সোজা নয়।”

—“কেন?”

—“প্রথমে ত ভালপাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। ভালপাত্র পাওয়া গেলেও সে হয়ত বিধবা-বিবাহে রাজি হবে না। তারপর, এ-বিষয়ে সরমার মত জানতে হবে।”

—“ভালপাত্রের সন্ধান আমি এখনি দিতে পারি মুরারিবাবু, কিন্তু আপনার মত হবে কিনা, জানিনা।”

—“ভালপাত্র? কোথায়?”

—“আমার বন্ধু মোহন।”

—“কি বললেন? কে?”

—“মোহন আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে সম্মত আছে।”

—“কি আশ্চর্য্য! আপনি কি পরিহাস করছেন? মোহন? মোহন সরমাকে বিবাহ করতে রাজি! এ কি সম্ভব?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, মোহন নিজের মুখে এ কথা বলেছে। আপনি কি তার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবেন?”

—“বলেন-কি! মোহন আমার জামাই হতে চায়, এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না! আমার কি এত সৌভাগ্য হবে?”

—“আপনার মেয়ের মত কি, আপনি আজ সেটা জেনে রাখবেন। আমি কাল এসে সব শুনব-অখন”—এই বলে সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

আসতে-আসতে শুনলুম, ঘরের ভিতরে মুরারিবাবু আপনমনে বলছেন, "কি আশ্চর্য্য, মোহন? সে আমার সরমাকে চায়? এতবড় আশা আমি ত একদিনও করি-নি! সুতরাং—"

## সতেরো

## সরমার কথা

ওগো, আমার এ ব্যর্থ জীবনকে কোন্ মন্ত্রে তুমি সার্থক করতে চাও, আমার এ শূন্য বুককে কি-দিয়ে তুমি পূর্ণ করতে চাও! ঝরা পাপ্‌ড়ি কুড়িয়ে ফুল-ফুটানো যায়না গো যায় না,—যে ঝরতে চায়, ঝরে পড়েছে, তাকে ঝরতে দাও, সে ঝরে মরুক্…মরে সে বাঁচুক্!

আমার মনের গোপন শয়নে নারীর নারীত্বটুকু ঘুমিয়ে ছিল এতদিন, কে তুমি সোণার কাঠি হাতে করে' তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছ? আজ সকালের অরুণ-আলোয় তরুণ ললাট তোমার অপূর্ব্ব মহিমায় জ্বল্-জ্বল্ করছে—অবাক হয়ে তোমার মুখপানে চেয়ে আছি, আমি চেয়ে আছি! তুমি কি ভাবছ, তোমার ঐ হাসির তাপ দিয়ে আমার এই কান্নার শীতলতাকে তপ্ত করে' তুলতে পারবে?

কাঁদতে-কাঁদতে চিঠিখানি আমার চোখের সামনে তুলে ধরলুম—আবার পড়তে লাগলুম।

"সরমা,

সেদিন ছাদের উপর তোমাকে যে কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি-নি, আজ এই চিঠিতে আমি সেই কথা বলব।

বলব, কিন্তু তুমি শুনবে কি? তোমার শোনার উপরেই আমার জীবন, আমার সুখ, আমার শান্তি,—সমস্ত নির্ভর করছে। তুমি শোনো সরমা, তুমি বধির হোয়ো না—পাষাণী মূর্ত্তির মত মৌনমুখে দাঁড়িয়ে থেক না!

হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া রত্নের মত প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেইদিন থেকেই তুমি আমার আপনার হয়ে আছ, সেইদিন থেকেই আমি আলোক-রাজ্যে বাস করছি। আমার বিশ্ব এখন তোমাময়, আমার ভিতরে তুমি, বাহিরে তুমি,—আমার জীবন-পথ আলো-করে' আছে যে ধ্রুবতারা, সে তুমি, তুমি!

'আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃত-সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!'

সরমা, তোমার এই আনন্দময়ী মূরতি কি আমার নিরানন্দ গৃহকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে' তুলতে পারবে না?

তুমি আমার হবে?

তোমার বাবার মত জানতে আমি আমার বন্ধুকে পাঠিয়েছি, আর তোমার মত জানবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখলুম।

আমার ভবিষ্যৎ এখন তোমার হাতে।

ইতি মোহন।"

মত? আমার মত? কি মত দেব, কি বলব?

তখনও বসে-বসে ভাবছি আর ভাবছি।…

এমনসময় এককোলে নন্নুয়া, আর এককোলে মেন্নুয়াকে নিয়ে বাবা এলেন।

মনের কথা মনেই চেপে বাবাকে বললুম, "হ্যাঁ বাবা, নীচে অত গোলমাল হচ্ছিল কিসের?"

বাবা বললেন, "গোলমাল বিশেষ-কিছু নয় মা, পাড়ার জনকত ভদ্রলোক এসে-ছিলেন।"

—"ভদ্রলোক! মাগো, আমি ভাবলুম বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়েছে!"

বাবা হো-হো-করে' হেসে উঠে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! ডাকাত ভেবেছিলি বুঝি?"

—"এস বাবা, তোমার পাকাচুল তুলে দি, তোমার মাথায় পাকাচুল বড় বেড়ে উঠেছে, বাবা!"

—"বয়সও বাড়ছে মা, পাকাচুলও বাড়ছে! ফলে পাক্ ধরে গাছ থেকে খসে পড়বার জন্যে, তা জানিস্ ত?"

—"চুপ কর বাবা, ও-সব বললে তোমার সঙ্গে আমি আড়ি করে' দেব কিন্তু!"

—"তোর আড়িতে আমি ভয় পাই-না। রোজই ত তুই আমার সঙ্গে আড়ি করে' ফের্ সেধে ভাব করতে আসিস্!"

—"তবে যাও! আমি আর তোমার পাকাচুল তুলে দেব না!"

—"না মা, তোকে আর চুল তুলতে হবে না। তুই আমার সুমুখে এসে বোস্ দেখি! তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

বাবার গলার স্বরেই বুঝলুম, কি কথা! আমার এমনি লজ্জা করতে লাগল!

বাবা একটু চুপ-করে' থেকে বললেন, "মা, সেদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মনে আছে? তোর বিয়ের কথা?"

আমি কিছু বললুম না—নীরবে নন্নুয়ার মাথায় হাত-বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

বাবা বললেন, "আজ আবার বাধ্য হয়ে তোর কাছে সেই কথাই তুলতে হচ্ছে। মোহন বলে পাঠিয়েছে, সে যদি তোকে বিবাহ করতে চায়, তাতে আমার মত আছে কি না।"

আমি ঘাড় হেঁট করে', যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বসে রইলুম।

বাবা বলতে লাগলেন, "মোহন যে আমার জামাই হতে চাইবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর! রূপে-গুণে এমন ছেলে হাজারে একটিও হয় না। আমি বড় সমস্যায় পড়েছি মা! এ বিবাহে তোর মত আছে কি না তা-ত আমি জানিনা! অথচ, তোর অমতে মোহনকে কিছু বলতেও পারছি না! কি করি, বল্ত সরো?"

আমি কি বলব? এর কি উত্তর দেওয়া যায়? আমি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলুম।

"কি আশ্চর্য্য! চুপ-করে' রইলি যে? লজ্জা হচ্ছে বুঝি! আ আমার বোকা মেয়ে, এখন কি লজ্জার সময়?"

কিন্তু, মুখ তবু ফোটে ফোটে ফোটে না!

"বল্, বল্, কথা ক! আমার যে আর উপায় নেই! তা-নইলে তোকে কি এমন-করে' লজ্জা দি!"

অনেক কষ্টে মুখ তুলে বললুম, "বাবা!"

—"বল্ মা, বল্! এ বিবাহে তোর মত আছে?"

প্রাণপণে বললুম, "হ্যাঁ!"—বলেই আমি বাবার কোলের ভিতরে মুখ-গুঁজে আনন্দে, লজ্জায় কেঁদে ফেললুম!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# সাহিত্যের গণ্ডগোল

সাময়িক সাহিত্যের আসরে আজকাল সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে বেশ-একটা লড়াই বেধে গেছে। সমাজ-সংস্কারকের দল বলছেন, সমাজের উপর সাহিত্য ভারি অত্যাচার সুরু করেছে, অতএব—; অতএব যে কি, তা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, সনাতন সমাজের উপর এই রকম বিষম অত্যাচার চলেছে দেখে গুটিকয়েক লোক মিলে একটা Band of mercyর দল গঠন করেছেন। তাঁরা এই নিয়ে শশব্যস্ত যে, হঠাৎ কোনো ফাঁকে কেউ যেন কলমের খোঁচা মেরে সমাজকে কাবু করে না ফেলে।

সমাজবৈবর্ত্ত-পুরাণে নাকি লিখিত আছে, কলমাঘাতে সমাজ-দেহে মারাত্মক বিষ প্রবিষ্ট হয়ে সমাজকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যায়। সেইজন্য এই mercyর দল বিষম ক্ষিপ্ত এবং দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমত ছুটি-একটি, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে এই দলে জুটছেন, কারণ তাঁরা নাকি সন্ধান পেয়েছেন এই দলের পিছনে বেশ হৃষ্টপুষ্ট পৃষ্ঠপোষক বর্ত্তমান। কাজেই তাঁরা সময় বুঝে যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে লজ্জিত হবেন না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

সাহিত্যের সুড়ঙ্গ দিয়ে কে কোথায় সমাজকে ঘাল করছে তা অনুসন্ধান করতে করতে সাহিত্য-কোটালরা বিশেষ-করে রবীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তর, তবে প্রমাণাভাবে কতক ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি তাঁকে এক অভিযোগেই বিশেষভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অভিযোগটি এই যে "তিনি হিন্দু-সমাজের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, অতি বর্ব্বরের ন্যায় হিন্দু-আদর্শের পর্ব্বত-বৎ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" তাঁদের মতে, এই চেষ্টা অবশ্য তাঁর রচিত উপন্যাস থেকেই প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তাঁর রচনায় সমাজ যে কোন্ স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হ'ল সেটি অনুমান করা সকলকার বুদ্ধির পক্ষে সমান সহজ বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন, তিনি উপন্যাসের ভিতর দিয়ে মানুষের মনের ভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, আবহাওয়া মানুষের মনের উপর কেমন-করে আধিপত্য বিস্তার করে, প্রলোভন সামনে পড়লে মানুষের মন কেমন-করে সেদিকে ছুটে যায়; তারপর কোথাও সে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে,

কোথাও-বা ভেঙে পড়ে, তারি ছবি তিনি এঁকেছেন। উপন্যাস তার নিজের তাগাদায় আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সমাজ-সমস্যার কোনো জটিলতা এসে পড়লে তার বিকাশের মুখে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে সে তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে। সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার চলে না। সমাজ যা চায় সাহিত্যের নিজের বিকাশের জন্যে হয়ত সেটার প্রয়োজন হল না; কিম্বা তার উল্টোটা দরকার হল, কিন্তু সেখানে সে যদি সমাজকে মেনে চলে এবং নিজের স্বাভাবিক গতিকে না মানে তাহলে সমাজ হয় ত রক্ষা পেতে পারে কিন্তু উপন্যাস রক্ষা পায় না। উপন্যাস লিখতে হলে কতকগুলো লোক, স্থান আর অবস্থার অবতারণা করা দরকার, এটা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না। এর মধ্যকার কোনো কোনো মানুষ নিতান্তই যদি সমাজের চক্ষে বেয়াড়া বোধ হয় কিম্বা তাদের অবস্থা যদি সমাজের ঠিক মনের মত না হয়, তাহলে আর কি করা যাবে? সমাজের মধ্যেও তেমন বদ্ মানুষের অসদ্ভাব নেই এবং সমাজ তাদের যেমন-করে সহ্য করে, উপন্যাসেও ঠিক তেমনি-করে তাদের সহ্য করা যেতে পারে। সমাজ থেকে যখন বেয়াড়া মানুষ তাড়াতে পার-নি তখন উপন্যাস থেকেও পারবে না। তবে কেউ-কেউ বলতে পারেন, উপন্যাসের মধ্যে অমন মানুষ রাখবার দরকার কি? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যিনি দরকার মনে করবেন না তিনি তা রাখবেন না; যিনি দরকার বুঝবেন তাঁকে রাখতেই হবে। দরকার নেই এ-কথা যতক্ষণ না প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ দরকারকে অস্বীকার করি কি করে? কিন্তু এ-সব তর্ক নিয়ে উপন্যাসের বিচার নয়—উপন্যাসের বিচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। যাঁরা উপন্যাসকে উপন্যাসের দিক দিয়ে দেখেন না সমাজের দিক দিয়ে দেখেন, তাঁরা সমাজের হিতকারী হলেও সাহিত্যের পক্ষে যে অপকারী সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

* *
*

যাঁরা এই-সব উপন্যাসের কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন তাঁদের যুক্তিটা কি-রকম, একবার যাচাই-করে দেখা যাক্। "রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস" নামে একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি একখানি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে; লেখক বলছেন, "আজকাল স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেছেন—তাহা ভাল কি মন্দ বলিব না—এখানে তাহা আলোচনার বিষয়ও নহে। বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত উপন্যাসাদি তাঁহারাই পাঠ করেন। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে যে গরল আনিলেন তাহাতে নিজের কোন স্নেহ-ভাজনের নাকি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল।" বিষবৃক্ষ পড়ে যদি কোনো মহিলা বিষপান করে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি ভগবানের কিছু অনুগ্রহ-দৃষ্টি আছে বলতে হবে; কারণ বিষবৃক্ষ পড়বার আগে কিংবা পরে অন্য কোনও পুস্তক-বর্ণিত বর্ণনা পড়ে তিনি যদি আর কোন পন্থা অবলম্বন করতেন, তাহলে সমাজকে বিষপান অপেক্ষা অধিকতর গুরু আঘাত ভোগ করতে হ'ত, সন্দেহ নেই। পূর্ব্বোক্ত

প্রবন্ধ-লেখক আবার বঙ্কিমের হয়ে সাফাই গেয়েছেন—"বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই দেবী-চৌধুরাণীতে বঙ্কিমবাবু সপত্নী ঘরেও নিষ্কাম ভাবে কিরূপে থাকা যায় সেই চিত্র দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।" তা যদি সত্য হয় তবে বঙ্কিম স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর পদসেবা, গৃহস্থ-কন্যার ডাকাতি-ব্যবসা প্রভৃতি সংখ্যাতীত ব্যাপার সংঘটিত হতে দিলেন কেমন করে, এ বোঝা শক্ত। বঙ্কিম যে অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন-নি তার অনেক প্রমাণ তাঁর সীতারাম থেকেই দেওয়া যেতে পারে। আর সত্যই যদি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করবার মতলব হ'ত তাহলে তাঁর বিষবৃক্ষের গায়ে আগুন দিয়ে তার অস্তিত্বও তিনি নিশ্চয় লোপ করে যেতেন। যাঁরা এইভাবে বঙ্কিমকে বিচার করেন, বঙ্কিমের রচনার প্রতি তাঁদের যে কতদূর শ্রদ্ধা তা তাঁদের উক্তি থেকেই ধরা পড়ে। এই ভাবে বিচার করলে শুধু বঙ্কিম বা রবীন্দ্র কেন, জগতের সমস্ত সাহিত্যকে তুষানলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। কারণ, কোনো বইই নীতি বিশারদদের মাপকাটিতে মেপে দেখলে, নিখুঁত হবে না। এঁদের যুক্তি যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে এই কথা বলতে হয় যে, পৃথিবীতে আর মানুষ নেই, সমাজ নেই। কারণ মানুষ কিম্বা সমাজের অস্তিত্ব লোপ করবার যতগুলি অস্ত্র আছে অর্থাৎ খুন, আত্মহত্যা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি, এ-সমস্তই পুস্তকে পড়ে পড়ে, মানুষ তারই দ্বারা এতদিনে নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো দুর্ব্বল-হৃদয় কি দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক পাঠক-পাঠিকা যদি বই পড়ে কোনো অপকর্ম্ম করে বসে, তার জন্য কি বই লেখা বন্ধ করতে হবে? দুর্ব্বল পাঠকের অপকর্ম্মের জন্য দায়ী বই নয়,—তার নিজেরই দুর্ব্বলতা। সাহিত্যকাররা যখন চিকিৎসক নন, তখন তাঁরা পাঠকের হৃদয়-পরীক্ষা করে তাঁদের উপযোগী পুঁথি তৈরি করতে অপারগ, এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

সমাজে আঘাত লাগছে বলে আজ এই যে তারস্বরে চীৎকার উঠেছে, এটা সত্য কি-না সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত মতে আঘাত লাগলেই জনকতক লোক হৈ-হৈ করে ওঠেন, —হায়, সমাজ একেবারে গেল! সমাজের হয়ে তাঁরা যে-সব যুক্তি খাড়া করেন সেগুলিও নিতান্ত ছেলেমানুষী। সমাজের শাসন মেনে যদি সাহিত্যকে চল্‌তে হ'ত, তাহলে শিশুশিক্ষার প্রথম নীতি "সদা সত্য কথা বলিবে" ও "চুরি করা মহাপাপে"র উপর সাহিত্য কোন কালেই এক ইঞ্চিও উঠতে পারত না; কেবল নীতি ও ধর্ম্ম ইত্যাদির আগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলে সাহিত্য কখনও বড় হ'তে পারে না। সাহিত্যই সমাজকে পথ দেখায় ও উন্নতির পথে টেনে নিয়ে যায়। কোন সামাজিক রীতি যখন সাহিত্যকে বলতে থাকে, তোমার অত্যাচারে আমার তিষ্ঠানো দায় হয়েছে তখন সাহিত্য বলে যে, তোমাকে তাড়ানোই আমার উদ্দেশ্য —সুতরাং তুমি এখন মানে মানে পথ দেখতে পার। Oscar Wildeএর একটা বচন আছে, "যে রচনা সমাজের লজ্জার কথা প্রকাশ করে সমাজ সেই রচনাকে গালাগালি দেয়।"

*

* *

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের উপন্যাস, যা সাহিত্যের পরম সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে, তাকে অশ্লীল, সমাজ-বিদ্রোহী বলে ঠেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য-হিসাবে অতি নগণ্য এবং অশ্লীলতায় ও দুর্নীতিতে একেবারে জঘন্য এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্য ছেয়ে ফেললেও তাদের প্রতি সমাজের এই-সমস্ত নীতিবিশারদদের দৃষ্টি পড়ছে না! সাহিত্যের দ্বারা সমাজের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে ত এই সব বইয়ের দ্বারাই তা হয়েছে। অস্ত্র আঘাত করতে হয় ত, এদের প্রতিই তা করা উচিত। কারণ, ও-সব বই শুধু সমাজ নয়, সাহিত্যেরও রীতি-মত অনিষ্ট করচে। এর উপরে আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই সমাজের ধার ধারতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের কোনোই ধার ধারেন না—কারণ, তাঁদের যে সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা আছে কিম্বা তাঁরা যে সাহিত্য-রসের রসিক, এ পরিচয় এখনো দেন-নি। বেরসিক এবং অসাহিত্যিকের গণ্ডগোলে বেচারা রস-পিপাসুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে।

মানুষের মন যে জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সমাজ লক্ষ ফাঁদ পেতেও সেখানকার একটা খবরও ধরতে পারে না, অথচ সমাজকে আঘাত করবার বড় বড় অস্ত্র সেইখানকার কারখানাতেই তৈরি হয়। মানুষের কাজকর্ম্মের অবকাশ দিয়ে সেইখানকার এক-আধটা তীর এসে সমাজের গায়ে লাগলেই, খোঁচার চোটে সমাজ প্রথমটা তুড়িলাফ খেতে থাকে। ক্রমে তার এমনি হাল হয়ে ওঠে যে, সমাজ আর সে-রকম আঘাতকে আঘাত বলেই মানে না। চিন্তা-রাজ্যের স্বরূপ-মূর্ত্তিকে ধরে আনতে পারে, এক সাহিত্য। কবির চিন্তা যখন সাহিত্যে মূর্ত্তি ধরে সমাজের সামনে এসে দাঁড়ায়, সমাজ তখন মোটামুটি তাকে দু-রকমে উপভোগ করে; একদল, যারা রচনাটা পড়েই আনন্দ পায়, তার ভিতরকার অর্থ গ্রহণ করতে তারা চায় না,—এরা হচ্ছে একরকম নির্ব্বিরোধী, একটু আনন্দ পেলেই বর্ত্তে গেল। এ আনন্দের উৎপত্তি কোথায়, অত খুঁটিনাটির ভিতর তারা ঢুকতে চায় না। আর একদল আছে,—যারা কবির মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করে, সেই কাব্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে অনুভব করে, এবং তাতে যে আনন্দ পায় সে আনন্দের উৎস কোথায়, সেটাও তারা খুঁজে বার করে। এ-শ্রেণীর পাঠকরাই সমালোচক হবার উপযুক্ত। আমাদের সমাজ এখন এমন-একটা তে-মাথার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যেখানটাতে পথ দেখাবার লোক নেই অথচ কোন-একটা পথে চলতে গেলে পথ রোধ কর্ব্বার লোকেরও অভাব নেই। এমন একটা সাহিত্যের এখন নিতান্ত প্রয়োজন, যে আলো হাতে করে আমাদের জাতীয় সমাজকে তার এই জীবন-সঙ্কটে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কানে যে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছেন,

সেটাকে হেতু ও যুক্তি দিয়ে তার ভ্রম প্রতিপন্ন করে' যদি কেউ অন্য পথ দেখিয়ে দিতে পারেন ত তিনি অগ্রসর হোন, তাতে বরং একটা সমস্যার সমাধান হবে; কিন্তু যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হন তাঁরা প্রথমে নামমাত্র সমালোচনা করে' তারপর তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। সমালোচনার এমন উদ্ভট পদ্ধতি সাহিত্য-সঙ্গত ত নয়ই, উল্টে এটা সমাজ-বিরুদ্ধ অভদ্রতা। রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দেওয়াই যদি এই সব সমালোচনার উদ্দেশ্য হয় তবে সমাজ-শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তার পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে এমন বাণ বর্ষণ করবার দরকার কি! গালাগালি-পূর্ণ হ্যাণ্ডবিল রাস্তায় বিলি করলে এর চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে বোধ হয়।)

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

---

# স্বপ্ন-সুন্দরী

( ওয়াসিংটন আরভিং হইতে )

ক

ফরাসী-বিপ্লব তখন পুরাদমে চলিতেছে। নিঝুম রাত্রি—চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়া হাঁকিয়া-হাঁকিয়া ফিরিতেছে! আকাশের কালো বুকে অগ্নিময়ী সর্পীর মত বিদ্যুতের লীলা! এবং ঘন-ঘন বজ্রনাদে বৃষ্টিধৌত সহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী-রাস্তা ঝন্‌ঝন্‌ বাজিয়া উঠিতেছে।

এমন বিষম ঝড়-জল মাথায় করিয়া একটি যুবা প্যারীর নির্জ্জন পথে বাড়ী ফিরিতেছে। এই যুবকের বিষয়ে আগে কিছু বলা দরকার।

এর নাম উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ—জাতিতে জার্মান। বিপ্লবের শেষমুখে সে প্যারী-সহরে আসিয়া একটি বাসা ভাড়া করিয়া আছে।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের লেখাপড়ার বাতিক ছিল বড়ই বেশী। প্যারীর বড়বড় পুস্তকালয়ে, সেকেলে লেখকদের লেখা পুরানো পুঁথিরাশির মধ্যে সারাদিন সে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকে। এই পড়ার বাতিক ছাড়া সংসার-সমাজের আর কোন-কিছুর ধার সে ধারিত না। সে নির্জ্জনতা ভালবাসিত, লোকজনের সঙ্গে তেমন মেলা-মেশাও করিতে পারিত না।

আপনার চারিদিকে এই যুবক ছাত্রটি এক কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল। কেন জানিনা, কেমন-করিয়া তাহার মাথায় একটা ধারণা গাড়িয়া গিয়াছিল যে, কোন কু-আত্মার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে,—তাহার কবল হইতে মুক্তির কোনই উপায় নাই! এই উদ্ভট ধারণা তাহার নিঃসঙ্গ জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলিয়াছিল। স্থান-পরিবর্ত্তনে হয়ত কোন উপকার দর্শিতে পারে—বন্ধুদের এই পরামর্শে দেশ ছাড়িয়া সে প্যারীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে।... ...

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ মুখচোরা ও অমিশুক হইলেও, রমণী-রূপের তারিফ করিতে জানিত। আপনার নির্জ্জন ঘরে বসিয়া সে কল্পনার রঙ্গিন নেশায় মস্‌গুল হইয়া থাকিত,—তাহার চোখের সুমুখ দিয়া চেনা-অচেনা কত সুশ্রী মুখের ছবি একে-একে ভাসিয়া যাইত! তাহার কল্পনার রূপরসে সে মুখগুলির আদর্শ এতটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাস্তব তাহার কাছে কোথায় লাগে! তাহার মনের যখন এমনি গতিক, তখন হঠাৎ একদিন সে স্বপ্নে দেখিল, এক পরমা সুন্দরী তরুণীকে! এই স্বপ্নদৃষ্ট রূপসীর রূপ ছিল এমনি অপূর্ব্ব, যে জাগরণেও সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিল না!... ...দিনের পর দিন যায়, কিন্তু শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে সেই সুন্দরীর সুশ্রী মুখের স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না—সে মুখের মোহ যেন ক্রমেই তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল!... ... ...

সেদিন ঝড়ের রাতে বিজন পথের পথিক হইয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখনো তাহার মন সেই স্বপ্ন-সুন্দরীর সৌন্দর্য্যেই বিভোর হইয়া ছিল!

খ

চলিতে-চলিতে উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ সহরের যে-দিকটাতে আসিয়া পড়িল, সেদিকটাতে কয়েদীদের প্রাণদণ্ড হয়।

নিকষে সোণার কষের মত, আঁধার ফুঁড়িয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝকিয়া উঠিল—সেই ক্ষণপ্রভায় উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ সভয়ে দেখিল, সামনেই বধমঞ্চের উপরে, মানুষের মাথা-কাটিবার যন্ত্র—গিলোটিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বিপ্লব তখন চরমে উঠিয়াছে এবং এই প্রাণঘাতী ভয়ানক যন্ত্র তখন প্রতিদিন শত-শত অভাগাকে গ্রোগ্রাসে গ্রাস করিতেছে! সেইদিনেই এই বধমঞ্চের উপর দিয়া মানুষের রক্তধারা স্রোতের মত অবাধে বহিয়া গিয়াছে! দিনের আলোর সঙ্গে আবার কখন্ নূতন বলি আসিবে, যেন সেই আশাতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, এই ঘুমন্ত সহরের মাঝখানে রক্ত-তৃষিত গিলোটিনগুলো স্তব্ধভাবে সার বাঁধিয়া হা-করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের প্রাণ যেন হৃদয়ের ভিতরে বসিয়া গেল! শিহরিয়া, তাড়াতাড়ি সে অন্য-মুখে ফিরিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, বধমঞ্চের সিঁড়ির উপরে জড়োসড়ো হইয়া ছায়ার মত একটি দেহ বসিয়া রহিয়াছে!

বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল! যে বসিয়া আছে, সে রমণী—পরণে কালোরঙের কাপড়। সামনে ঝুঁকিয়া দুইহাতের ভিতরে সে মুখ ঢাকিয়াছে—তাহার দীর্ঘ, এলমেলো চুলগুলো বৃষ্টির জলে স্যাঁতাইয়া মাটির 'পরে লুটাইতেছে।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হয়ত এ অভাগীর কোন প্রাণের আত্মীয় আজ এখানে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়াছে, তাই এই ঝড়-বৃষ্টির অশান্ত রাতেও সে শোকের আবেগে এই ভয়ানক স্থানে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়াছে! এ-সময়ে অনেক রমণীর রমণীয় মুখও যে গিলোটিনের দাঁতের চাপে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সে কথাও তাহার অজানা ছিল না।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ দু-পা আগাইয়া গিয়া কোমল স্বরে আস্তে-আস্তে স্ত্রীলোকটিকে ডাকিল।

সচমকে মুখ তুলিয়া, রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল,—সে দৃষ্টি শূন্য, কিন্তু কী তীব্র!

এ কি! বিদ্যুতের আলোকে এ যে তাহার সেই স্বপ্নসুন্দরীর মুখ জাগিয়া উঠিল! হ্যাঁ,—ঠিক সেই মুখ! উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল!… …

সেই পাণ্ডুর, বিষণ্ণ—অথচ অসীমসুন্দর মুখের দিকে স্থিরচোখে তাকাইয়া উল্‌ফ্‌-গ্যাঙ্গ আবার বলিল, "এমন ঝড়-বাদলে, এত রাতে আপনি এখানে কেন?"

তরুণী নীরবে গিলোটিনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

—"চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করে' আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।"

—"আপন বলতে আমার কেউ নেই!"

—"কিন্তু আপনার বাড়ী আছে ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোথায়?"

—"কবরে!"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের প্রাণ সে অভাগীর দুঃখে যেন গলিয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, "আমি অচেনা বলে আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে বন্ধুর মত আমার বাড়ীতে আসুন। আমি এ সংসারে একলা বিদেশী।"

সেই গৃহহীনা সুন্দরী উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের সরল মুখ দেখিয়া বোধহয় তাহাকে বিশ্বাস করিল। কারণ, সে তখনি উঠিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গ

তরুণীকে সঙ্গে-করিয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহার বাসাবাড়ীর ঘরের ভিতরে লইয়া আসিল। তাহার ঘরখানি সাদাসিধে—সাজগোছের জাঁকজমক তাহাতে একেবারেই ছিল না।

ঘরে আলো জ্বালা হইলে পর, উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহার সঙ্গিনীকে ভাল-করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। বাস্তবিক, তেমন রূপ সহজে চোখে পড়ে না! কাপড়ের ভিতর হইতেও তাহার সুডৌল গড়নটি ফুটিয়া উঠিতেছিল। তরুণীর চোখদুটি উজ্জ্বল ও ডাগর,—তবে দৃষ্টিতে এমনি-একটা আশ্চর্য্য প্রখরতা আছে, যা দেখিলে মনটা কেমন দমিয়া যায়! তাহার সারাদেহে আর কোন গয়না ছিল না… …গলার হীরাবসানো, চওড়া ও কালোরঙের বন্ধনীটি ছাড়া।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ এখন এই-বড় মুস্কিলে পড়িল যে, এত রাত্রে যুবতীকে সে কোথায় শুইতে দিবে! শেষটা ঠিক করিল, যুবতীর জন্য তার নিজের বিছানা ছাড়িয়া দিয়া, আজকের রাতটা সে অন্য-কোথাও গিয়া কাটাইবে। কিন্তু যাই-যাই করিয়াও যাইতে তাহার পা উঠিতেছিল না, এই আশ্রয়হীনা অপরিচিতা সুন্দরীর রূপের কুহকে সে একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

যুবতীর ভাব-ভঙ্গীতেও একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। গিলোটিনের কোন প্রসঙ্গই সে আর তুলিল না—তাহার মুখের উপর হইতে শোকের ছায়াও সরিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া যুবক-ছাত্রটি যেমন মুগ্ধ,

যুবককে দেখিয়া সেও যেন তেমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে! উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহাকে যে আদর-যত্ন করিতেছিল, যুবতী যেন প্রাণমন দিয়া তাহা উপভোগ করিতেছিল!

মনের আবেগ যখন আর কোনমতে বাগ্‌ মানিল না, উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তখন আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যুবতীকে সে তাহার বিচিত্র স্বপ্ন-দেখার কথা বলিল এবং জানাইল যে, চোখে দেখিবার আগে, স্বপ্নেই সে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে!

যুবতী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "কেন জানিনা, আপনাকে দেখে আমারও মন যেন কেমন হয়ে গেছে!"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তবে আর আমাদের মিলনের বাধা কি? জীবনে-মরণে আমি তোমার!"

যুবতী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,

"জীবনে-মরণে?"

—"জীবনে-মরণে!"

—"তবে, আমিও তোমার"—বলিতে-বলিতে যুবতী তাহার বুকে ঢলিয়া পড়িল। আবেগে তাহার দুইচোখ ঢুলিয়া আসিল।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ যুবতীকে চেয়ারের উপরে বসাইয়া তাহার মুখে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর যুবতীকে বিশ্রামের সুযোগ দিবার জন্য অধীর আনন্দে ঘর-ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

সারারাত সুখের উত্তেজনায় মাতিয়া সহরের পথে-পথে সে আনমনে ঘুরিয়া বেড়াইল; তারপর, উষার প্রথম আলোকে আকাশ যখন হাসিয়া উঠিল, তখন আবার বাড়ীর পথে ফিরিল।

এর মধ্যে তাহার একবারও মনে হইল না যে, প্রথম আলাপেই এই অপরিচিতা যুবতী যে-ভাবে তাহার কাছে প্রেমস্বীকার করিয়াছে, তাহা কতটা অস্বাভাবিক!

ঘ

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ দেখিল, চেয়ারের উপরে একখানি হাত রাখিয়া, যুবতী উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। তাহাকে জাগাইয়া দিতে উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আস্তে-আস্তে যুবতীর একখানি হাত ধরিল;... ...কিন্তু ধরিয়াই, বিদ্যুতাহতের মত সে হাত ছাড়িয়া দিল!

এ কি! এ যে মড়ার হাত! সে সভয়ে দেখিল, যুবতীর মুখ মলিন ও রক্ত-হীন! তাহার দেহে প্রাণ নাই!

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আঁৎকাইয়া পিছনে হঠিয়া আসিল। তারপর চীৎকার করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া তখনি সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি পুলিসও ডাকিয়া আনা হইল।

পুলিস-দারোগা ঘরে ঢুকিয়া লাশ দেখিয়াই কেমন-যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিস্ফারিত চোখে শবের দিকে চাহিয়া সে আশ্চর্য্য স্বরে বলিল, "এ কি ব্যাপার! এ লাশ এখানে এল কি-করে'?"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এঁকে চেনেন?"

—"বল কি, এ স্ত্রীলোকটিকে যে কাল গিলোটিনে কেটে ফেলা হয়েছিল!"—এই-বলিয়া দারোগা সামনের দিকে দু পা আগাইয়া আসিল। তারপর, যুবতীর হীরা-বসানো গলাবন্ধটি টান-মারিয়া খুলিয়া দিল—শবদেহের মাথাটি অমনি ভাঁটার মত একদিকে গড়াইয়া গেল।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ পাগলের মত বিকটস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "পেত্নী! আমার ঘাড়ে পেত্নী চেপেছে! আর আমি বাঁচব না!"

সকলে মিছাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল—কিছুতেই সে প্রবোধ মানিল না; তাহার দৃঢ় ধারণা হইল, কোনো প্রেতাত্মা ঐ যুবতীর মৃতদেহে ঢুকিয়া, তাহার কাছে আসিয়াছিল।... ... ...

কিছুদিন পরে পাগলা-গারদে তাহার মৃত্যু হইল।

শ্রীমতী রেণু রায়।

# হিন্দোল-বিলাস

প্রাণে মনে হিল্লোল
বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙের বোল্ মৃদু-মন্থর;
শ্রাবণেরি ছন্দে
কদমেরি গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল! চির-সুন্দর!
নিশাসে কি সৌরভ!
কালো চুলে মেঘ সব!
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্ গো;
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোনোখানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুই স্বর্গ!
আরো কাছে আয় তুই
কালো চোখে চোখ থুই
ভুলে থাকি দিন-দুই দুনিয়ার সব,
শুধু হাসি আর গান
শুধু সারঙের তান
ভালোবাসাময় প্রাণ—শুধু উৎসব।

কে গেছে কে যায় আর
অতশত ভাব্‌নার
ফুরসুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু!
তুমি আছ এই খুব
ধ্যানে ধ'রে ওই রূপ
ভরপুর চিত্তের সব তন্তু।
এ মিলনে, অশ্রুর
মেশে যদি খাদ্ সুর
কি হবে তা'? হয় বা কি ভেবে বিস্তর?
কেয়া গুঁড়ি তবে মাথ্
তুলে নে রে লাখে লাখ্
জুঁই ফুল বিলকুল চুলে তুই পর।
আমি দেখি তন্ময়
চেয়ে চেয়ে মন্ময়
শত তারা যাক্ হেসে লাখ্ ইন্দু;—
যদিও এ বাদ্‌লায়
ঝিঁকি-ডাকা কাজ্‌লায়
নেই চাঁদ জ্যোস্নার নেই বিন্দু।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

# কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অম্নি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতই শিরোধার্য্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে; তখন পরমাণু-তত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মত মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগ-বখ্‌রা লইয়া সরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্ণি তার দিন গণিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন-এক বিপর্য্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারিকরে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল—আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার রাগেণ, যতিতালাভাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে ট্রাম-লাইনের মেরামতও সুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন-কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাৎটা এই, আমাদের সয় ওদের সয়

না। যদি চৌরঙ্গী রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজ-গমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামৎ হইবে না?"

"হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন—"সে কি সম্ভব?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে, এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্ব্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাৎরার মত সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড় জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইলনা যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা-ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্য্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সাম্‌নে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্ত্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড় কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের

সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন—"তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয় স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব না-পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জ্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না-হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্ত্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্ত্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তখন খাল-খন্দর মধ্য দিয়া চাকা-তুটোর আর্ত্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইত না। পার্ল্যামেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষবাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জ্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদ-ওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন-এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ার্লণ্ড ও আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্ত্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্য্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে-অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই হাত দেখা যায়। এ সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারো মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্ত্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্ত্তে ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছ-মোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্ম-কর্ত্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড় হয়। কেবল পল্লীসমাজে, বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড় পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক

মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্ব্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড় অমঙ্গল। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অতএব ভুল-চুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি না-ছোড়বান্দা হইয়া কোনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে interned হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্ত্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, "তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য্য করিবার জন্যই আমাদের নত-শিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড় অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্ত্তা তখনি সামাজিক internment-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝট্‌পট্‌ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা, নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গীর তফাৎ। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গী বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত-দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গী এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘর-গড়া কুণো নিয়মকেই সব চেয়ে বড় মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ, সমৃদ্ধিলাভ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিৎ। ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড় মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। সেই কর্ত্তাটিকে,—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা, মনসা, ওলাবিবি, দক্ষিণরায়, শনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু,—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুক্‌রা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজী পাঠক বলিবেন—আমরা ত এসব মানিনা! আমরা ত বসন্তর টীকা লই; ওলাউঠো হইলে নুনের জলের পিচ্‌কিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশা-বাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজো আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি;—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জ্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলি বলে, কি জানি, কাজ কি! ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনোএকটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্ম্মকেই ভুলিয়া যায়,—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড় মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেইত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিম্বা ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোট চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—"কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম"—এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে থামকা একটা-না-একটা কর্ত্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার এক-মাত্র কারণ, যে-দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্ত্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার

চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্তোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মান' তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক্ পূজনীয়, ধর্ম্মতন্ত্র বলে যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাশ-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এখন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—"আপনার মুখে পান!" গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথী মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, "সারথী যেই হোক্ মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্ম্মবুদ্ধিতে বা কর্ম্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না থাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই-ভাবেই দেখেন একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই

দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানৎ-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশ-পরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কাণা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড় যে-সম্পদ দিয়াছেন —ত্যাগ স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাজে খরচ। আজ তারই নিকাস আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দ্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই ত ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্ব্বনেশে। যে-অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবুত সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মত যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর

উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরী দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব। তারা ভাবিল পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরী জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি!" সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দ্দশা, এর কারণ,—গ্রামের যা-কিছু পূর্ত্তকার্য্য তা এ পর্য্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাৎ হয় বিধাতার পরে নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্ম্মকর্ম্ম ভালোমন্দ শোওয়া-বসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারিনা, কেননা, বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারত-বর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব্ব—বলেন, ওটা বড় উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না, বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড় শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যত-গুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচার বুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স্ শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলআনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক্ হইলেই এত দুর্জ্জয় কানমলা; সমস্ত গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক্, "পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক্" বলিয়াই যখন আশীর্ব্বাদ করা হইল

তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, "মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও!" যতরাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্ত্তের ঘড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না!

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত যে দুঃখ দারিদ্র্য তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই, রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারী বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগ্‌জামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ্‌ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্ম্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভাল কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ কর।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে, যে ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্ত্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্ তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ কর!"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল, উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের

দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্ম্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই—তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই,—অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপ্‌সোস্‌ করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্বের মধ্যেই নিহিত এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্ব্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই ;—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, ম.র্ল সাহেব ভারতসচিব হইলে হয় ত আমাদের সুদিন হইবে নয় ত আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,—এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড় সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহঙ্কার সমস্তরই লীলা চলিতেছে, কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্রলোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়, -সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভীতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুইপক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের

অধঃপতনের গর্ত্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্ব্বলের পক্ষে যতবড় শত্রু, দুর্ব্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম-বড় শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বল পুলিস তোমাদের পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না কিন্তু তোমরা ত তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি কর একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াইত গায়ের জোরে নয়, সে ত তেজের লড়াই, সে তেজ কর্ত্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য এক-দল লোকের ত বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারী ষ্টীমার, আর গরীব ফরিয়াদীকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর। এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেষ্টিজ্! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ ত কর্ত্তা, ঐ ত আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐত বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম্ম সকলের উপরে ওকেই ত পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই ত অবিদ্যা, ইহাই ত মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী —সেই বল আমারও বল। ইংরেজ গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেষ্টিজ্ দেবতা নর-বলি দাবী করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়ত প্রেস্ এক্টের মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম পন্থা!"

হাঁ, "বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে

কিম্বা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।"

"এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক! তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়! গবর্মেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড় দাবীই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড় দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবী টিঁকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্ব্বল; কিন্তু সকল বড় দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি— যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন— "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"— অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়, ভীতিকে নয়! ধর্ম্ম আছে, অতএব মরা পর্য্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে কর ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জ্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড় কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মত বিষম ঝাড়াঝুড়ি সুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব,—"দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে! আমি ডাক্তার যাই করিনা তাই ডাক্তারি!" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে-ডাক্তারি তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড় বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য!"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড় জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে, নিজেকে তার চেয়ে বেশী মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা

নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালীর নাই এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেল্‌জিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্ত্তা, তখন সমুদ্রের পূর্ব্বপারে এমন নীতি কি একদিনো খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ দুঃখে বাঙালীর কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? একথা কি নিশ্চয় জানিনা যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক্ অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড় দলিল করিয়া চলিব,—এ কথা তাকে কখনই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাছ কাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ, বিজ্ঞান, এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজশাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্ত্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুইপক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্ত্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" একথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে

সুরু করিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্ত্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্ত্তৃত্বের চর্চ্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া-হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্ত্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর-কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে তু'পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক্ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড় আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক্ করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা ত থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বালাইবার দাবী নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে-সল্‌তে দিয়াই হোক্ আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার নামে সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরীবের বেলায় তার ব্যবহার উল্টা—এটা ত সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উঁহাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধার-করা বার্দ্ধক্যের মুখস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাস-বৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মত মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি! আপনাকে জান।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল-জরা-জর্জ্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্দ্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহাসত লাঞ্ছিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু

শতাব্দীর আবর্জ্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতনযুগের প্রভাতসূর্য্যকে ম্লান করিল, নব-নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরুক, চির সন্ধান-রত, যে বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতি-রালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশেদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাক আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# গান

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী;
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব, তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্যবাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
আত্মঅবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে,
ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে—
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বিরূপবজ্র *

যে দু-তিনটি প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রদ্যোতে বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পকুঞ্জ প্রোজ্জ্বল, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদেরই মধ্যে এক-জন; সুতরাং বাঙ্গলা আর্টের খবর যাঁহারা একটু-আধটুও রাখিয়া থাকেন, গগনেন্দ্রনাথের রেখাকাব্যের সঙ্গে তাঁহারা যে পরিচিত, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

চিত্রমাত্রই হয় বর্ণকাব্য, নয় রেখাকাব্য; অনেকের ছবিতে রঙের লীলা যতটা বেশী দেখা যায়, রেখার খেলা ততটা নয়; রং সেখানে রেখাকে প্রায় পুরোপূরি গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের একটা আসল গুণ এই যে, তাঁহার নিপুণ হাতে তুলির মুখে রং আর রেখা সমান অবলীলায় খেলিতে পারে; বেশীরভাগ, ধরিতে গেলে—তাঁহার অনেক ছবিই একেবারে রেখা-প্রধান। ছবির সূত্রপাত যে রেখায়, চিত্রশিল্পের এই মূল নিয়মটি তাঁহার আলেখ্যের মধ্যে বেশ জাজ্বল্যমান।

প্রতীচ্যের আর্ট বর্ণপ্রধান, আর প্রাচ্য আর্ট রেখাসর্ব্বস্ব না হইলেও বিশেষ করিয়া রেখার ভক্ত বটে। য়ুরোপের অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের পট হইতে যদি রং মুছিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার 'চিত্রত্বের' অস্তিত্ব বোধ হয় কিছুমাত্র থাকে না; কিন্তু ভারতীয় চিত্র হইতে অনেকসময়ে বর্ণকে বাদ দিলেও চিত্রিত বিষয়টি পরিস্ফুট থাকে এবং ছবির মূর্ত্তিও তাহাতে মরিয়া যায় না;—কেননা, বর্ণ এখানে রেখাকে ফাঁকি দিয়া আড়ালে রাখিয়া সমস্ত বাহাদুরিটা নিজের ভাগেই টানিতে চায় না—রেখা আর বর্ণ দুইই এখানে ছবির বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। অবশ্য, এ নিয়ম যে সব-জায়গাতেই সমানভাবে খাটে, তা-নয়; তবে এটিকে সাধারণ নিয়ম বলা চলে।

রেখাপাতে গগনেন্দ্রনাথের কায়দা-কৌশল চমৎকার! তাঁহার ছবির প্রত্যেক রেখাটিতে জীবনের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে অবাক মানিতে হয়; পরন্তু, ছন্দে, সামঞ্জস্যে, অনায়াস গতিতে ও অনাহত ভঙ্গীতে এবং বিচিত্র কোমলতায় তাঁহার রেখাগুলি অপূর্ব্ব। তাঁহার হাতের এমন রেখা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা,—যাহা দুর্ব্বল বা আড়ষ্ট বা বেখাপ্পা। অনেকসময়ে এক-একটি তুলিকাঘাতে, সলীল রেখার এক-একটি টানে তিনি একেবারে একটি আস্ত মুখ বা দেহ আঁকিয়া তুলিয়াছেন—একালে, রেখা-পাতে এতটা দক্ষতা বড়ই দুর্ল্ভ। যাহাদের সামান্য চিত্রবোধ আছে, তাঁহারা গগনেন্দ্রনাথের অনেক ছবি দেখিলে সমগ্র চিত্রের ভাবের ঐশ্বর্য্য বা বর্ণের সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া, কেবল তাহার একাংশের একটি মাত্র জীবন্ত রেখার টান লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিবেন। তাহার উপর, তিনি কথনো অকারণ রেখা-বাহুল্যের পক্ষপাতী

---

* ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

নন; একটি ভাব বা ছবি ফুটাইতে তিনি যত-পারেন তত-কম রেখাপাত করেন; বাহুল্য যে আর্টের মস্ত শত্রু, এ তিনি কখনো ভুলেন নাই।

গগনেন্দ্রনাথের আর-একটি বিশেষত্ব, তাঁহার অঙ্কিত অনেক চিত্রে কবিতা যেন শরীরিণী। সে-সব ছবি যেন রেখা-বর্ণের মধুর লিরিক,—তাহাদের ভিতরকার সুরের লীলা, ছন্দের নাচ ও তালের মাত্রা প্রাণের কাণে যেন শোনা যায়! চিত্রকে এমনি কাব্যের মত বিচিত্র করিয়া গগনেন্দ্রনাথ দর্শকের চিত্তকে কল্পনার মায়াপুরীতে উধাও উড়াইয়া লইয়া যান।

সংপ্রতি গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্র-প্রতিভাকে একটি নূতন পথে লইয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে, আমরা তাঁহার অঙ্কিত "বিরূপবজ্র" নামে ব্যঙ্গচিত্রাবলীর বইখানি পাইয়াছি। প্রথমেই শিল্পীর যে গুণ ও বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি, এই ব্যঙ্গচিত্রাবলীও ঐ-সকল গুণে ও বিশেষত্বে বিশেষরূপে বিশিষ্ট।

য়ুরোপীয় চারুশিল্পে ব্যঙ্গচিত্র একটি প্রধান অঙ্গ। 'কার্টুন' আঁকিয়া সেখানকার অনেক আর্টিষ্ট সুধু যে সুনাম কিনিয়াছেন, তা নয়;—অমর হইয়া গিয়াছেন। সাহেবদের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলেই এই ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে যে কতটা লালায়িত, "পাঞ্চ" ও "পাক্" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রেভরা কাগজের দেশযোড়া নাম-ডাক্ ও অগুন্তি কাট্‌তিই তাহার প্রমাণ। বাক্য-বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ না করিয়া ব্যঙ্গচিত্রকারীরা প্রতীচ্যের রাজনীতি ও সমাজনীতির বড় বড় গলদ এবং তরল দিকটি চোখে আঙ্গুল দিয়া সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যঙ্গচিত্রের শিল্পীরা সেখানে এত-বেশী শক্তিশালী যে, সময়ে-সময়ে এক-একখানি একরত্তি ছবি অত-বড় য়ুরোপকেও রীতিমত নাড়া দিয়া সাড়া তুলিয়াছে। যাঁহাদের নামের ডাকে গগন ফাটে, দেশে বা সমাজে যাঁহারা মোড়ল ও খয়ের-খাঁ, একটি আঙ্গুল হেলাইলে যাঁহারা অনেককে ধনে-প্রাণে মজাইতে পারেন, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের বেপরোয়া তুলিকে তাঁহারাও ভয়ে-ভয়ে দস্তুরমত সমঝাইয়া চলেন; কেননা, য়ুরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের নায়ক প্রভৃতি সকলকার মাথার উপরেই ব্যঙ্গ-চিত্রের এই অমোঘ বজ্র অষ্টপ্রহর উদ্যত হইয়া আছে;—একটু ভুল-চুক হইলেই, একবার পা ফস্কাইলেই আর মুখ রাখা দায়! সেখানে এমন নামজাদা লোক বোধহয় একজনও নাই, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীরা যাঁহাকে মানে-মানে রেহাই দিয়াছেন। ব্যঙ্গচিত্র বড় নির্দ্দয়;—এ কথা কয় না, গৌরচন্দ্রিকা করে না, গোলে-হরিবোল দেয় না, সুধু নীরবে দশের সামনে হাটের মধ্যিখানে গাধার গা থেকে সিংহের চামড়া খুলিয়া তাহার লম্বা কাণ জাহির করিয়া দেয়! দুর্জ্জনদলনে এ হচ্ছে অব্যর্থ পাশুপত অস্ত্র!

বাঙ্গলাদেশে ব্যঙ্গচিত্র এতদিন ছিল না বলিলেই চলে। দেশী খবরের কাগজে রাশি-রাশি যে-সব ছবি পত্রস্থ হয়, সেগুলি নামেই ব্যঙ্গচিত্র, গুণে অষ্টরম্ভা! সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতি হিংসুকুটের গরলোদ্গার, ব্যক্তি-গত ঝগড়ার ঝাল-ঝাড়া, তাহার ভিতরে না-আছে সার্ব্বজনীনতা, না আছে কলাকুশলতা,




শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত।

না-আছে রসিকতা বা ভাবুকতা! অবনীন্দ্রনাথের দেশীয় চিত্রে ও কালিঘাটের পটে যতটা তফাৎ, গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে ঐ-সব কাগুজে হিজিবিজির প্রভেদ ঠিক ততটাই! এখানে তুলনার কথা তুলিলাম এইজন্য যে, গগনেন্দ্রনাথের "বিরূপবজ্রে"র স্বরূপ বুঝিতে কেউ যেন দেশী কাগজের কুরূপ "কার্টুন"গুলোকে বুঝিয়া না বসেন!—

খবরের কাগজের এই-সব 'কাকের ছানা বকের ছানা"র কথা ছাড়িয়া দিলে, বঙ্গদেশে ব্যঙ্গচিত্রের রঙ্গভঙ্গ আর-কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল ওস্তাদ-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দিনকতক আগে একবার ব্যঙ্গ-রসে তুলি ডুবাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের মত এ-রকম বিশেষভাবে এদিকে তিনিও ঝোঁক দেন নাই।

অল্পদিনের ভিতরেই গগনেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন অনেক। বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন, অঙ্কন-নৈপুণ্যেও সেগুলি যে তেমনি উপভোগ্য, এ-কথা বলা বাহুল্য। দেশের, সমাজের, সাহিত্যের ও ধর্ম্মের কৃত্রিম ও বিকৃত নানান্ মূর্ত্তি এই সব ছবিতে সারি-সারি সাজানো। এগুলির ভিতরে কলা-কৌশলের সঙ্গে শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, পর্য্যবেক্ষণ-পটুতা, রসগ্রাহিতা ও চিন্তাশীলতাও যথেষ্ট রূপে বিকাশপ্রাপ্ত। দেশের ও দশের জন্য গগনেন্দ্রনাথের বুকে যে ব্যথা বাজে, ভণ্ডের ভণ্ডামি যে তাঁহার চক্ষুশূল, এই চিত্রাবলীতে সে পরিচয়ও তিনি ভাল-করিয়াই দিয়াছেন।

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"When deformities grow unchecked but are cherished by blind habit it becomes the duty of an artist to show that they are ugly and vulgar and therefore abnormal." বাস্তবিক্, ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া এ ছবিগুলিকে যিনি হাল্কা ভাবে দেখিবেন, তিনি ভুল করিবেন। যাঁহারা ভাবুক, গগনেন্দ্রনাথের এই বিচিত্র তুলির লিখনে তাঁহারা ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে দু-চারিটি কথা বলিয়া লইতে চাই। গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে, তিনি নাকি সমাজ-বিশেষকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই ছবি আঁকিতেছেন। এ নালিশ তাহা মিথ্যা। কারণ, কোন-একটি বিশেষ সমাজকে তিনি ছবির মডেল করেন নাই বা কোন সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আছে বলিয়াও তুলি ধরেন নাই। ইহার প্রমাণ "বিরূপবজ্রে"র ভিতরে জ্বলন্ত। তাঁহার আঁকা দু-একখানি মাত্র ছবি দেখিয়াই একটা বিরোধী মত খাড়া করিয়া নেওয়া বিবেচনার কাজ নয়। যিনিই গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যঙ্গচিত্র দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঙ্গলা দেশের পুরাণো ও নূতন সমাজের এবং ছোট-বড় সকল সম্প্রদায়েরই অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি শিল্পী স্পষ্টভাবে ও নির্ব্বিচারে জাহির করিয়া দিয়াছেন। গগনেন্দ্রনাথ গগনের মতই পরম উদার,—ভণ্ডামি ও নষ্টামির উপরেই তিনি কঠোর হইয়া ঘা মারিয়াছেন—সে-সব ভণ্ড প্রাচীন কি নব্যসমাজের লোক, ধর্ম্মে তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম—এমন বাচবিচার কোথাও রাখেন নাই। বিশেষ, কোন সমাজেরই যথার্থ গুণের উপরে খোঁচা মারিয়া তিনি অভদ্রতা ও কুরুচির প্রমাণ দেন নাই, পরন্তু, পাকা ডাক্তারের মত কেবল রোগদুষ্ট স্থানেই অস্ত্র চালাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য, রোগী কখনো চুপ-মারিয়া বসিয়া-বসিয়া নিজের গায়ে ডাক্তারকে ছুরি খোঁচাইতে দেয় না। হয়ত, গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমরা যে-সব অভিযোগ ও গোলোযোগ শুনিতেছি, সে হচ্ছে পীড়িত সমাজপতিদের ভীত আর্ত্তনাদ!

গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলি ঝক্‌ঝকে আয়নার মত—এ আয়নায় অনেক বাঁদর, অনেক গাধা ও অনেক গরুই আপনাদের কুৎসিত মুখ দেখিয়া, নিজের-নিজের জাতিসুলভ স্বরে চেঁচামেচি সুরু করিবে। যে-সকল অপূর্ণতা সত্যই ব্যঙ্গযোগ্য, সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া তিনি অনেক অবিকল Type তৈরি করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের দোষ তাঁহার লক্ষ্য নয়—এক-এক সম্প্রদায়ের অনেক লোকের ভিতরে যে-সব দোষ আক্‌চার নজরে পড়ে, তাঁহার লক্ষ্য সেই দিকেই। তাঁহার অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রের মানুষ-গুলি তাই Typical হইতে পারিয়াছে; এবং এই ছবিগুলি দেখিলে তাই প্রত্যেক দোষীই ঠাওরাইয়া লইবে,'আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ ছবিখানা নিশ্চয় আঁকা হইয়াছে!' আমাদের ভরসা আছে যে, 'ঠাকুরঘরে কে?' বলিলে যাহারা চটপট্ কদলী-ভক্ষণের বিরুদ্ধে যাচিয়া সাফাই দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই দলের বোকা দোষীদের অনেকেই এই ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়া হাটের মাঝে নিজের হাঁড়ি নিজেই ভাঙ্গিয়া বসিবে!

গগনেন্দ্রনাথের চোখ আসল ব্যঙ্গবস্তু চিনিতে জানে। যাহা ব্যঙ্গের অযোগ্য, তাহাকে উপভোগ্য করিবার জন্য কোথাও তিনি কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেন নাই। তাহার উপরে, ব্যঙ্গচিত্রকারীর আর-একটি যে মস্ত গুণ—তীক্ষ্নতা, সেটিও তাঁহার প্রত্যেক ছবিতে বিলক্ষণ আছে। ব্যঙ্গ যদি ভোঁতা হয়, তবে একেবারে অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ শাণ-দেওয়া ছোরার মত ধারালো—ভণ্ডের শক্ত চর্ম্মে ঠেকিয়া তাহা ফেরে না—মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়া একেবারে মর্ম্মান্তিক জ্বালায় তাহাকে জ্বলাইয়া মারে।

"বিরূপবজ্রে" গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হয় নাই; বর্ত্তমান সংগ্রহে তেরখানি নানাশ্রেণীর ছবি ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই তেরখানি ছবিতেই চিত্রকারীর সমস্ত বিশেষত্ব ও নিজস্বের পরিচয় আছে। গভীর ভাবব্যঞ্জক ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য-রসের চিত্র আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ এতদিন উঁচুদরের ভাবুক শিল্পী বলিয়া রসিক-সমাজে বিখ্যাত ছিলেন; সংপ্রতি রঙ্গব্যঙ্গের এবং কৌতুক রসের যৌতুক হাতে-করিয়া তিনি অবসর-আসর জমাইতে আসিয়াছেন; এই নূতন রসবিকাশেও তিনি যে কত-বড় একজন ওস্তাদ, "বিরূপবজ্রে"র প্রত্যেক চিত্রই তাহা প্রমাণিত করিবে।

সর্ব্বশেষে, "বিরূপবজ্রে"র ছবিগুলির যৎসামান্য পরিচয় দিয়া আমরা বিদায় লইব।

১। ব্যঙ্গ—[অর্থাৎ বঙ্গের ইংরেজী কায়দায় (Banga) উচ্চারণ]। চিত্রকর কল্পনা করিয়াছেন, একটি টবের ভিতরে গাছের বদলে এক ভূঁইফোড় ও দ্বিজাতীয় পোষাক-পরা অদ্ভুত জীব দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বামঅঙ্গে মনোক্ল, কলার, নেকটাই, সার্ট, কোট, পেন্টুলেন ও স্যু এবং দক্ষিণ অঙ্গে চাদর, পাঞ্জাবী, ধুতি, ছড়ি ও নাগ্‌রা। ইনি হচ্ছেন একালের অনেক দ্বিজাতীয় বাঙ্গালীর নিখুঁত আদর্শ; হরি-হরের মত ইঁহাতে আধা-সাহেবী ও আধা-দেশীয় ঢংএর মিলন হইয়াছে। রুডিয়ার্ড

কিপ্‌লিং কবিতায় বলিয়াছিলেন, প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মিলন অসম্ভব ; এ নক্‌সাখানি দেখিলে অমন কথা কি তিনি ভ্রমেও মুখে আনিতেন ?

২। দেশীলোকের উদ্যানে ভোজের দৃশ্য। নব্যবঙ্গের ফেরঙ্গ ধরণ-ধারণ, এ ছবিতে ঠিক্‌ঠাক্‌ ফুটিয়াছে। নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিতরা সবাই যে এদেশী,—চিত্রকর যদি নিজেই সে পরিচয়টা না দিয়া দিতেন, তবে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। কারণ, বাবুদের সাবানকে-হার-মানানো কাকক্লষ্ণ বর্ণ ছাড়া, চেহারায় দেশীয়ত্বের আর-কোন ল্যাঠা নাই। তাঁহাদের হাব-ভাব সাহেবী, পোষাক সাহেবী, খানাপিনাও সাহেবী। অনেকের হস্তধৃত পাত্রে আবার মহিমময়ী ঢলঢলায়মানা বোতলেশ্বরী সগৌরবে অবতীর্ণা। এই অবাক-ভোজ দেখিয়া, নব্যবঙ্গের নিকটে রসিক চিত্রকর একটি সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন,ইহাদের মধ্যে দেশী লোক কোন্‌টি ? এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া দেখি, সভার ঠিক মাঝখানে একটিমাত্র দেশীলোক খাড়া আছে—সে বাবু-সাহেবদের খানসামা ! এই একটিমাত্র খানাসামার দেশী পোষাকের পাশে আর-সকলকার ফেরঙ্গ বেশ কী বিসদৃশ দেখাইতেছে ! অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসেই বোধকরি এই কালো সাহেবদের তুচ্ছ ভৃত্যের গাত্রবর্ণও গৌর হইয়া উঠিয়াছে !

৩। বিদ্যার কারখানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার খোলা ; দলে-দলে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসুন্দর যুবক ছাত্র ভিতরে ঢুকিতেছে —তাহারাই বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ! ভিতরে বিদ্যার বিরাট কারখানা—উপরে কর্ত্তৃপক্ষরা পাহারায় নিযুক্ত। চিমনি দিয়া ধূম বাহির হইতেছে—প্রকাণ্ড গ্রন্থ-যন্ত্র পূরাদমে চলিতেছে এবং তাহারই কঠোর চাপে আষ্টেপৃষ্ঠে থেঁৎলাইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ শিবরাত্রির সল্‌তেরা যখন বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন তাহাদের আর সে জোরালো গড়ন ও সুশ্রী চেহারা নাই ; বিদ্যাযন্ত্রের পেষণে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া তাহারা তালপাতার সেপাই হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাহারও দেহে ধুতি-চাদর—বোধ হয় কেরাণী ; কাহারও পরোণে চোগা-চাপকান-সামলা—নিশ্চয় উকিল ; কেহ হাত-পা ছড়াইয়া পপাত ধরণীতলে—সম্ভবত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ; কেহ মাটিতে বসিয়া —হয়ত দাঁড়াইতে পারে না ; কেহ লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—বুঝি চলিতে পারে না ! আর একদিকে কাতারে-কাতারে কলেজ-আউট ছোকরা একটা স্তম্ভের তলায় জমায়েৎ হইয়া বেজায় হৈ-চৈ সুরু করিয়াছে ; —ব্যাপার কি ? উপরপানে চাহিয়া দেখি, থামের মাথায় মস্ত-এক টোপর—তার তলায় আঁকা সোনার চাঁদ ও একটি তারার গায়ে লেখা বি-এ ( বিয়ে ? ) ! তখন বুঝিলাম, বিদ্যাযন্ত্রের চাপ্‌ ও ছাপ্‌ খাইয়া বাহির হইয়াই এতগুলো বামন ঐ সোনার চাঁদ ধরিবার ফিকিরেই ওখানে গিয়া লাফালাফি করিতেছে !

৪। স্বদেশীর সম্মান বা পরভৃতের কাকলী। রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা। দরজা যুড়িয়া এক লম্বসার্ট-কোট-প্যাণ্ট-পরিধৃত হোঁৎকা বাবু-সাহেব ;

—তাঁহার মাথায় সাড়ে-পনেরো আনা-আধআনা ফ্যাসানে ছাঁটা চুল, ডানহাত সাহেবীধরণে পকেটস্থ, বাঁ-হাঁতে বংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মত সধূম্র চুরোট এবং এক-পা আগে-বাড়ানো—নূতন আরোহী যাহাতে গাড়ীতে উঠিতে না পারে। বেঞ্চের তলায় একটি চামড়ার কেশ—তাহার উপর এই ইঙ্গ-বঙ্গ পুরুষ-পুঙ্গবের পরিচয়, ইংরেজীতে লেখা—মিঃ এ, বি, সি :—তোতাপাখী-ক্লাবের মেম্বর!··· ··· ···ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-পরা একজন প্রৌঢ়বয়স্ক খাঁটি বাঙ্গালী গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত; তোতা-পাখী-ক্লাবের মেম্বর এই কালা-আদমীকে দেখিয়াই হাঁ-হাঁ করিয়া ধমকাইয়া উঠিতেছেন "Not here Baboo !" স্বদেশী বাবু এই বিলাতী বাবুর উত্তরে কি বলিলেন, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু তাঁহার চোখের বাঁকা চাহনি ও কৌতুকমাখা ওষ্ঠাধরের ভঙ্গী চিত্রকর সুকৌশলে দেখাইতে ভুলেন নাই। দেশী বাবুর হাতে একখানি বই,—তাহার নামটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাহা Burgson প্রণীত Laughter !

৫। পুচ্ছ-পরিবর্ত্তন বা বা-রে লাইব্রেরী! ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে চেয়ারে আসীন এক জীব, যাহার মুখ পক্ষীজাতীয়—তীব্রচঞ্চুবিশিষ্ট, পশ্চাতে যাহার ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সেই পুচ্ছে-তৈয়ারি কলম, পরিধানে বিলাতি কোট, সার্ট, কলার এবং লম্বা সাদা টাই। তাহার সুমুখে, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন এক তরুণ যুবক; দেশী সজ্জায়। দেয়ালে নোটিশ-বোর্ডে লেখা আছে—"Indian Dress not admitted!"

৬। দেবীদর্শন বা 'মহিলাদের সম্মান?' যে দেশে ঘরে-বাহিরে সীতা-সাবিত্রীর নামের দোহাই শুনি, সেই দেশেরই এক রেল-ষ্টেশনে গিয়া চিত্রকর মহিলাদের প্রতি সম্মানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন! ট্রেনের প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্য ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে হরেক-রকমের পাগড়ীওয়ালা, টেড়িওয়ালা ও গোঁফ-ওয়ালা মুখ চঞ্চল এবং উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে;—সেই অগণ্য মুখের অসংখ্য দৃষ্টির কোনটি বিস্ফারিত—কোনটি তৃষিত; কোনটি লালসায় প্রদীপ্ত—কোনটি অপাঙ্গে নিক্ষিপ্ত; কোনটি ঢুলঢুলে, মুগ্ধ—কোনটি-বা কট্‌মটে, লুব্ধ! সেই শত-শত ক্ষুধাভরা চোখের সামনে লজ্জাবতী-লতার মত ভাঙ্গিয়া-পড়িয়া দুটি ভদ্রমহিলা নতশিরে ত্রস্ত চরণে চলিয়াছেন—তাঁহাদের পদতলে তখন ধরণী দ্বিধা হইলেই তাঁহারা যেন বর্ত্তাইয়া যান! গাড়ীর ভিতর হইতে কোন-কোন অসভ্য আবার তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মহিলা-সম্মানের চরমে উঠিয়াছে! তাহাদের চোখ এড়াইবার জন্য মহিলাদুটি যে অন্যদিকে ফিরিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, সে পথেও কাঁটা; কেননা, অন্যদিকেও তাঁহাদের সম্মুখে রূপের নেশায় মস্‌গুল আর দুই মহাপুরুষ লোলুপ-চোখে হাঁ-করিয়া পথ-যুড়িয়া অচল ভাবে বিরাজমান!

৭। সহধর্ম্মিণীর সম্মান বা অসহ-ধর্ম্মী। স্থান—রেলষ্টেশন, বাঙ্গলা। কাল—বর্ষা, ঝুপঝুপ জল পড়িতেছে। আপাদকণ্ঠ 'বর্ষাতি' জড়াইয়া ছাতি-মাথায় বাঙ্গলার ফোতো বাবু সিগারেট ধরাইয়া পরম

আরামে দেহটা গরম করিতে-করিতে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে তাঁহার সহধর্ম্মিনী বর্ষার অজস্র ধারা মাথায় করিয়া, কোলের শিশুকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে বুকের মাঝে ঢাকিয়া, হেঁটমুখে স্বামীর গভীর প্রেমের কথা ভাবিতেছেন! ছাতির তলায় আশ্রয় লইবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই! কারণ, ছাতির তলায় স্বামীর পাশে তাঁহার ব্যাগ এবং স্ত্রীর চেয়েও মূল্যবান সখের কুকুরটি বাকি জায়গাটুকু দখল করিয়া আছে, আর তিল-ধারণের ঠাঁইটুকুও নাই—স্ত্রী ত কোন্ ছার!

৮। বাহবা বেশ! চিত্রকর এখানে নিপুণ তুলিকাপাতে বাঙ্গলার দুটি অদ্ভুত-চমৎকার এবং কিম্ভূতকিমাকার বিপরীত দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন। রঙ্গভূমির একদিকে আমাদের সোনার বাঙ্গলার সহজ সরল স্নিগ্ধশ্যাম পল্লী-শ্রী'র মধ্য দিয়া, বুড়ো-শিবের মন্দির-সোপানে আল্পনা আঁকিয়া গ্রামপ্রান্ত-বাহিনী নদীর স্রোতধারাটি খেয়াতরী বুকে-করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এদিকে সামনেই দুটি যুবক-যুবতী—তাঁহাদের আকৃতি মধুর ও কোমল, তাঁহাদের পরোণে, ভাঁজে-ভাঁজে ফুলের-মত ছড়াইয়া-পড়া, খাঁটি বাঙ্গালীর সরল-সুন্দর কাপড়-জামা-চাদর। ... ... ...পিছনে আলোকপ্রাপ্ত বাঙ্গলার কল-কারখানা, চিমনির ধোঁয়া, সারি-সারি ইটের কোটর, সহুরে ও সভ্য ইঙ্গ-বঙ্গ এবং তাঁহাদের ভব্য নকলকারীর দল;—তাঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতার দেহে দেশী-বিলাতী পোষাকী খিচুড়ী! পোষাকী জগতের ক্রমবিকাশের অপরূপ নমুনা এবং বিচিত্র বাহার এ ছবিতে কী সুন্দর ফুটিয়াছে!

৯। দেবতার ফুল। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে উপবীত, বাহুতে চন্দনলেখা লইয়া এবং মালকোঁচা মারিয়া এক পুষ্পিতটিকি ব্রাহ্মণ মড়্‌মড়্‌-শব্দে গাছের ডালকে-ডাল ভাঙ্গিয়া সাবাড় করিয়া সোৎসাহে কোমল পুষ্পচয়নে নিযুক্ত,—ঠাকুরের পূজায় লাগিবে বলিয়া। কিন্তু নম্র দেবসেবকের মত তাহার চেহারা নহে—চেহারা তাহার গুণ্ডার মত, চক্ষুদুটো লাল-করমচার মত। "দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়!"

১০। নীতিরক্ষা। একটি নবীন ছোক্‌রা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, কোথা হইতে নীতিবাগীশ 'হাঁ হাঁ, কর-কি হে, কর-কি' বলিয়া ভীষণ চীৎকারে আসিয়া প্রাণ-পণে ছোকরাটির চোখ-কাণ টিপিয়া ধরিয়াছেন! কেননা, সুমুখেই যত-সব ভয়ঙ্কর দুর্নীতির স্মৃতি! যথা, বকুল-তমাল-কদম্ব প্রভৃতি বিখ্যাত অশ্লীল বৃক্ষ এবং পেশোয়াজ, বাঁশী ও তবলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অশ্লীল পদার্থ! ঝড়ের উপর বজ্রাঘাত—গাছের ডালে বসিয়া আবার একটা দুষ্ট কোকিলও ডাকিতেছে যে! নীতিবাগীশ তাঁহার বিরাট বুটের তলায় ক্রোধভরে একটি কদম-ফুল পেৎলাইয়া আছেন!

১১। বাংলা চুলের কেতা। বাঙ্গলা-দেশে যে কতরকম ফ্যাসানে চুল আঁচড়ানো হয়, তার নমুনা। ব্যাখ্যায় এ ছবির রস বুঝানো যাইবে না।

১২। চোর। একহাতে দুটি হাড়-জির্‌জিরে ও ভয়ে-আধ্‌মরা অপোগণ্ড শিশু-

চোরকে পাকড়াইয়া বুকে-ছাতি-বাঁধা বিরাটবপু পাহারাওয়ালা বিপুল গর্ব্বে দিগ্বিজয়ী বীরের মত চলিয়াছে। অবোধ বালকদুটির অপরাধ, ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া তাহারা গোটাদুয়েক কাঁচা আম চুরি করিয়াছে। আমদুটি এখন পাহারাওয়ালারই কবলগত—দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ।

১৩। আপনি-চলা লেকচার তৈরি-করা কল বা 'বাক্‌যন্ত্র'। বক্তৃতায় অক্ষম মহারাজা, জমিদার ও কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতির পক্ষে মহা সুযোগ! অনেক টাকা মাহিনা দিয়া বক্তৃতা রচনা করিবার জন্য আর কাহাকেও প্রাইভেট সেক্রেটারী পুষিতে হইবে না; যতবড় লম্বা-চওড়া এবং যে-কোন বিষয়ের বক্তৃতাই হউক না কেন, বাঙ্গলার এডিসনের উদ্ভাবিত এই আশ্চর্য্য বাক্‌যন্ত্রের দ্বারাই সে কার্য্য জলের মত সহজে সিদ্ধ হইবে। এই বাক্‌-যন্ত্রে অনেক মজার জিনিষ আছে; যাঁহারা উদ্‌গ্রীব, ছবিখানি দেখিয়া তাঁহারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করুন!

এ ছাড়া মলাটে আর-একখানি ছবি আছে,—পাষাণের উপর অশ্রুপাত এবং অরণ্যে রোদন দেখিয়া এক গলা-ফোলা কোলা ব্যাঙ প্রাণের মায়া ছাড়িয়া পেটফাটা হাসির গান সুরু করিয়া দিয়াছে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# মিসরবাসীর পূর্ব্বপুরুষ

প্রাচীন মিশর আধুনিক জগতে একটা মূর্ত্তিমান রহস্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আমাদিগকে বিস্ময়মূক করিয়া দেয়, কিন্তু যাহাদের নিপুণ হস্ত সে অতুল সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের অনেক কথাই আজ অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রাথমিক যুগেই মিশরের সভ্যতা অধিক-সম্পূর্ণ ছিল—অন্যান্য অনেক দেশের সভ্যতার মত তাহার মধ্যে ক্রমোন্নতির নিয়মটা তেমন খাটে নাই। প্রাচীন যুগ হইতে মিশর যতই আধুনিক যুগের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, তাহার সভ্যতা ততই অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং এ সভ্যতা যে মিশরেই সর্ব্বপ্রথমে অঙ্কুরিত হয় নাই, পরন্তু অন্য-কোন দেশ হইতে পরিপুষ্ট অবস্থাতেই তাহার আগমন হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, মিশরের সভ্যতা কোথা হইতে আসিয়াছিল? যে জাতি পিরামিড গড়িয়াছে, তাহার আদিবাস কোথায়? মিশর-সভ্যতায় যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিরুত্তর হইয়া থাকেন।

কোন্ জাতি মিশরকে এই সভ্যতার শিক্ষা দিয়াছিল আজ-পর্য্যন্ত কেহই তাহা ঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। The Greater Exodus নামক পুস্তকে জে, এফ, লী, বলিতেছেন, এইসকল জাতির গায়ের রং ছিল লাল। ইহাদের মুখে দাড়ী কি গোঁফ গজাইত না, পুরাতন Peruvian-ধরণের একরকম টুপি ইহারা ব্যবহার করিত।" মিশরে দ্বিতীয় রামেসিসের যে মমি পাওয়া গিয়াছে, তার মুখের গড়ন—বিশেষ-করিয়া তাহার নাক ও গণ্ডাস্থি আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মত; এইজন্য মনে হয় যে, মিশরবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষ আমেরিকা হইতেই প্রথমে আগমন করিয়াছিল।



দ্বিতীয় রামেসিসের মমি

মেক্সিকোর ইউকেটানে এই রহস্যময় ব্যাপারের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সে দেশে জঙ্গলের ভিতর কয়েকটি ধ্বংস-স্তূপে এ-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রদেশে এক জাতি বাস করিত; ইহারা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও সুকুমার শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহাদের স্থাপত্যশিল্পের আদর্শ মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন শিল্পীরা গ্রহণ করিয়াছিল।

Dr. Augustus le Plongeon এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই ইউকেটান প্রদেশে আসিয়া প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার-কার্য্যে তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাহার ও অনাহার প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল; এমন-কি, অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের হস্তে অনেকসময়ে তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইবারও সম্ভাবনা ছিল! Dr. Plongeon মায়া (Maya) ভাষা এবং Hieroglyphic অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছিলেন; যাঁহারা তাঁহার Queen Mao and the Egyptian Sphinx কিম্বা Sacred Mystries among the Mayas and Quinches নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কি গভীর অধ্যবসায়ের সহিত তিনি ইহার চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু Dr. Plongeon এই জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে



ইউকেটানের ধ্বংসাবশেষের একাংশ

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশবাসীর উপহাস এবং ঘৃণা! উক্ত অনুসন্ধানে তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল; এমন-কি, মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থের অভাবে এবং দেশবাসীর এই নির্ম্মম ব্যবহারে তিনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন তাঁহার কার্য্যের মর্য্যাদা সকলেই বুঝিতে পারিবে। Chichen-Itzaতে Chaacmol অথবা Prince Chorর সমাধি-আবিষ্কারের পর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস জানিতে পারা গিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের সময় Dr. Plongeonএর সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং কতকগুলি নিরক্ষর লোক ব্যতীত অন্য কেহই সহায় ছিল না।

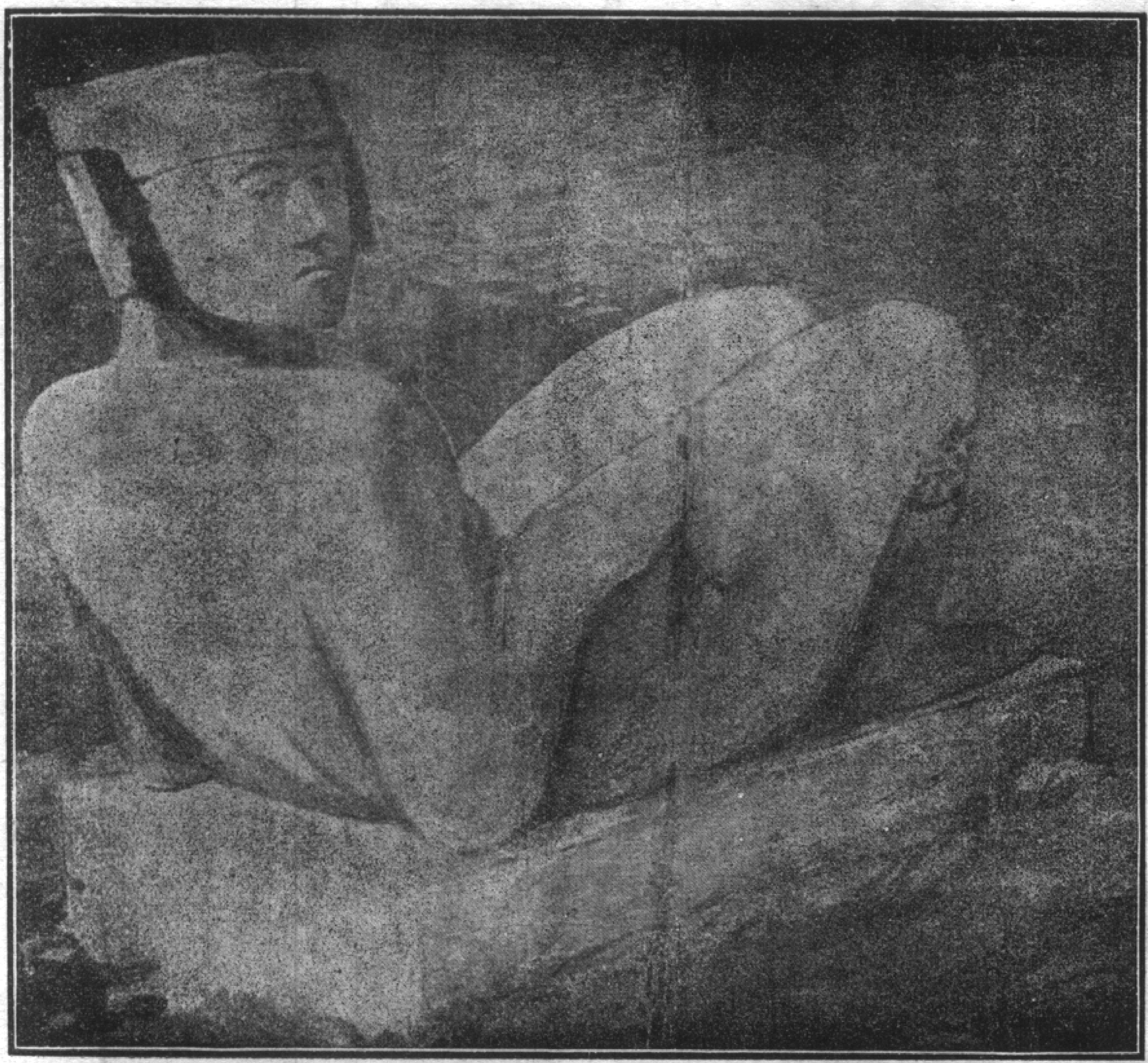
সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-আমেরিকায় যে নানা অজ্ঞাত জাতির অস্তিত্ব ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। অধুনা-

আবিষ্কৃত কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে শিল্পে ও কারুকার্য্যে এই সকল জাতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। Chichen প্রদেশের এই স্তূপগুলি আজিও তাহাদের গঠনকারীর অতীত জাতীয় গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এগুলি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, আসীরিয়া, ব্যাবিলন এবং মিশরের সাবেক বাসিন্দারা যখন নগ্নাবস্থায় বনে-বনে বিচরণ করিত, তখন Chichen-প্রদেশবাসীরা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

এই প্রদেশে দুইটি ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রথমটিতে ছোটবড় নয়টি প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এখানকার অনেক পাথরের গায়েও রকমারি মূর্ত্তি ও অক্ষর ক্ষোদা আছে। দ্বিতীয়টিতে সাতটি ক্ষোদিত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য, এ-দেশের এখনকার অধিবাসীরা এগুলির কোন সন্ধান রাখে না। দ্বিতীয় স্তূপে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ও গৃহগুলির গায়ে নানাপ্রকার Hieroglyphic লিপি আছে। Dr. Plongeonএর পূর্ব্বে এই সকল প্রাচীন ও ইঙ্গিতপ্রধান লিপির পাঠোদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া প্রাচীন মিশরীয় লিপিরও অক্ষর পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই শিক্ষা তাঁহাকে এ-দেশীয় লিপির পাঠোদ্ধারে অনেক সাহায্য করিয়াছে। কারণ, প্রাচীন "মায়া"-ভাষায় অনেক মিশরীয় অক্ষরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপটি এ-প্রদেশে "সন্ন্যাসিনীর মঠ" বলিয়া বিখ্যাত। আগেই বলিয়াছি, এই "সন্ন্যাসিনীর মঠে" অনেক ক্ষোদিত প্রস্তর ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলিতে সৃষ্টিরহস্য-সম্বন্ধে কয়েকটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। Mrs. Plongeon বলেন, এই সৃষ্টিরহস্য ব্যাপারটি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার প্রস্তরে-লিখিত অক্ষরগুলি অধিকাংশ স্থলেই পুরাতন মিশরীয় অক্ষর ব্যতীত আর-কিছুই নহে। এই "সন্ন্যাসিনীর মঠে"র দক্ষিণদিকে চল্লিশ-ধাপের একটি সুন্দর সোপান আছে; তাহা পঞ্চাশফুট চওড়া। এই সোপান বাহিয়া নামিয়া গেলে আর-একটি অট্টালিকা দেখা যায়; তাহাতে সাতটি কামরা। ঘরগুলির গায়ে হরেক-রকমের ছবি আঁকা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটি চিত্রও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। Chichenএর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আর-একটি রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাহার নাম দিয়াছে, "কুনা"। "কুনার" অর্থ, ভগবানের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দরজা পশ্চিমমুখী, ভিতরে একটি-মাত্র বৃহৎ ঘর। দেওয়াল নানাবিধ ছবিতে ভরা, ছাদ ক্ষোদাই-করা পাথরে তৈয়ারি। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সকল পাথর ছাদে লাগাইবার পূর্ব্বেই ক্ষোদাই করা হইয়াছিল। ঘরের ছবিগুলিতে অনেক ভীষণাকার জীবের মূর্ত্তি আছে; এই সকল জীবের অস্তিত্ব আজিও প্রমাণিত হয় নাই; বরং সেগুলি কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। সকল দেশের মত এদেশের লোকেরাও



ইউকেটানে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি

অনেক কাল্পনিক জীবকে বিশেষ ভয় ও ভক্তি করিত। জীবগুলির নামও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা 'মায়া'-ভাষায় লিখিত। এ-দেশের Prince Cohএর প্রেমের কাহিনী এবং মিশরের আইসিস ও ওসিরিসের প্রচলিত গল্প প্রায় একই ধরণের। আবার, এই গল্পটি প্রায় সকল দেশেই কোন-না কোন আকারে চলিত আছে, এমন-কি, বাইবেলে পর্য্যন্ত এইরূপ একটি গল্পের আভাস পাওয়া যায়।

Prince Cohর কবর খনন করিবার সময় একটি বৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি বাহির হয়। মূর্ত্তিটির ওজন প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড। এখন সেটি মেক্সিকোর যাদুঘরে রক্ষিত। এই মূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে দুইটি ভস্মাধারও পাওয়া গিয়াছে,—একটির ভিতরে কিছু ছাই আছে এবং অপরটিতে একটি অঙ্গারীভূত মনুষ্য-হৃদয় ( human heart )। রাসায়নিক বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হইয়াছে, উহা মনুষ্য-হৃদয় ছাড়া অন্য-কিছুই নহে। মিশরেও এমনি মনুষ্য-হৃদয় রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। Prince Cohর সমাধি ছাড়া এখানে আরও একটি সমাধি খোড়া হইয়াছে। তাহা হইতেও আর-



মেক্সিকোর আর-একটি প্রাচীন মূর্ত্তি

একটি মূর্ত্তি এবং একটি ভস্মাধার পাওয়া গিয়াছে। এই পাত্রটি এত বড় যে, ইহার উপরের ঢাক্‌নীটি সরাইতে চার-পাঁচজন লোকের দরকার হয়। এই পাত্রটির ভিতর ছাই এবং কতকগুলি গহনা ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মিশরীয় ভাষার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দ মায়া-ভাষা হইতে গৃহীত। আরও একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রীক-ভাষার অনেক কথার সহিত এই মায়া-ভাষার অনেক কথার মিল আছে এবং কতকগুলির মূল যে একমাত্র মায়া-ভাষা, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। মিশরে, দেশকে অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীলনদে কুমারী-বিসর্জ্জন দিবার প্রথা ছিল, Chichen প্রদেশেও এমনি এক প্রথার

চলন ছিল। তবে এ-ক্ষেত্রে নদীতে বিসর্জন না দিয়া কুমারীদের কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। চলতি দেব-দেবীর পূজা ছাড়া, দুই দেশেরই প্রাচীনজাতি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের স্তবগান করিত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইহাদের নববর্ষও একইসময়ে আরম্ভ হইত। মিসরের রামেসিসের যে মমিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মুখের আদর্শের সঙ্গে যে আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মুখের ছাঁচ আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়, এ-কথাও আগে বলিয়াছি। তাছাড়া এখানকার ভাস্কর্য্যকলার সঙ্গে—মিসরীয় ভাস্কর্য্যের আদর্শ-সাদৃশ্যও সকলকার লক্ষ্যের বিষয়। পরন্তু, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাজ-সজ্জা, পশুপালন-চিকিৎসা এবং গার্হস্থ্য কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতিতেও মিশরীয়দের এবং মায়া-ভাষা-ভাষীদের মধ্যে অত্যধিক ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাই ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই মায়া-ভাষা-ভাষীরাই কোন কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

শ্রীঃ—

---

# মাসকাবারি

## রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

### (১)

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ লেখক হেন্‌রিক ভন্ ট্রিট্‌স্কের "পলিটিক্‌স্" গ্রন্থ দুই ভল্যুমে তর্জ্জমা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং জুন মাসের "লিটারেরি ডাইজেষ্ট" পত্রে তার সমালোচনাও বাহির হইয়াছে।

নব্য জর্ম্মাণির world politik বা বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ভিত্ পত্তন করেন নিট্‌শে। নিট্‌শের "overman" বা অতিমানবে নবীন জর্ম্মাণ আপনারই প্রতিচ্ছবি দেখে। তারপর বার্ন্‌হার্ডি সেই অতিমানবের অভ্যুদয় ব্যাপারটা যে অনতিদূরে, সেটা সাব্যস্ত করেন,—তিনি ইমারতের প্ল্যানটা আঁকিয়া দেখান। নয়ম্যান্ তার উপরে গড়িয়া তুলিলেন এই যে—অষ্ট্রোহাঙ্গেরির সঙ্গে জর্ম্মাণির জোট বাঁধিলে তবেই জর্ম্মাণ-অতিমানবের কাছে বিশ্বমানব পরাভব মানিতে বাধ্য। সবশেষে ট্রিট্‌স্কে রাষ্ট্রতত্ত্বের এক বিশাল গম্বুজ তৈরি করিয়া এই তিনজনের গাঁথ্‌নিটাকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

ট্রিট্‌স্কের মতে রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা—রাষ্ট্রের বাড়া আর কিছু নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার অনুকূল হোক্ বা প্রতিকূল হোক্, সেই ইচ্ছাই সর্ব্বজয়ী হইবে—কেননা ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধীন, রাষ্ট্র ব্যক্তির অধীন নয়। কোন রকম আন্তর্জাতিক বিচার-সভার দ্বারা এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, ইতিহাসের শেষ পর্য্যন্ত লড়াইয়ের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হইবে। অতএব ট্রিট্‌স্কে বলেন যে, রাষ্ট্র যত বড় হয় ও যত স্ফীত হয় ততই তার

গৌরব—বড় রাষ্ট্র ছোট রাষ্ট্রকে আত্মসাৎ করিয়া বড় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

* * * * *

"লিটারেরি ডাইজেষ্ট" পত্র ট্রিট্স্কের এই রাষ্ট্রনীতিকে নিন্দা করিয়াছেন। ইংরাজি অনেক কাগজেই ইহার কড়া জবাব বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ রাষ্ট্রনীতিকে একমাত্র নব্য জর্ম্মাণির রাষ্ট্রনীতি বলার কোন অর্থ নাই। ইউরোপের সকল দেশেই আজ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি মানুষের আর আর সকল বড়দিক্ সকল মহৎবৃত্তিকে ছাড়াইয়া ও চাপা দিয়া একরাট্ ও স্বয়ম্ভু হইয়া উঠিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। একটা জাতির শিল্পজীবন, সাহিত্যজীবন, ধর্ম্মজীবন, দর্শন-জীবন, শ্রম-জীবন, বাণিজ্য-জীবন, প্রভৃতি জীবনের নানা বিচিত্র দিক্ আছে এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে সে সকল বিচিত্রতার স্থান রাষ্ট্রনীতির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। অতএব, মানুষের সমূহ-চৈতন্যের ( mass-consciousness ) একটা বিশেষ দিকের একটা বড় রকমের প্রকাশ যদি রাষ্ট্র হয়, তবে সেই সমূহ-চৈতন্যের অন্যান্য দিক্ গুলির প্রকাশের জন্য ঐ এক ধরণের পলিটিক্স-সর্ব্বস্ব তথৈব ভেদ-নীতি-দণ্ডনীতি-কূটনীতি-সর্ব্বস্ব রাষ্ট্রে যখন কুলাইবে না, তখন নানা আধার—নানা রাষ্ট্র—নানা কেন্দ্র কেন না তৈরি হইবে? কোন মানুষ দুইটা, কোন মানুষ পাঁচটা কেন্দ্রের সহিত যোগ রাখিবে—যার যেমন শক্তি ও ইচ্ছা সে ততগুলি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে। ঐ একটা কেন্দ্রের মধ্যেই মানুষের সব interests সব সৃষ্টিশক্তির স্থান হইতেই পারে না; সেই কারণে দেখা যায় যে, এখনকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র-নীতির একচেটিয়া আধিপত্যে মানুষের অন্যান্য সৃষ্টিশক্তিগুলা ব্যষ্টিগত ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে—জাতিগত ভাবে—স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। এ আক্ষেপ রাস্কিন্ করিয়াছেন, কার্লাইল করিয়াছেন, সম্প্রতি বার্ট্রেণ্ড রাসেল্ আরো স্ফুটতর ভাবে করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর "নেশন" প্রবন্ধে সেই পুরাণো আক্ষেপটাকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। অতএব ট্রিট্স্কেকে ঘা দিতে গেলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিটাকেই ঘা দিতে হয়, কারণ ট্রিট্স্কের ষ্টেট-স্বয়ম্ভুত্বের আদর্শটা শুধু নব্য জর্ম্মাণির নয়, সেটা সমস্ত ইউরোপেরই। কোথাও প্রবল কোথাও দুর্ব্বল আকারে সেই আদর্শ ইউরোপের দেশে দেশে জাগ্রত।

* * *

"নেশন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া মারিতেছে, সুতরাং তিনি চান্ যে রাষ্ট্র-কুহক হইতে ব্যক্তি পূর্ণভাবে মুক্ত হয়, ব্যক্তি আপন স্বরূপে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমষ্টি-চৈতন্য যাহাতে প্রতি ব্যক্তির চৈতন্য হয়, ব্যক্তি যাহাতে সর্ব্বানুভূ হয়, একক্ষেত্রে সমূহানুভূ হয়, সেই জন্যইতো রাষ্ট্রের উদ্ভব, নেশনের উৎপত্তি। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় এ উৎপত্তির কারণটুকুকে অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারও নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্র বা নেশনের দ্বারা সমষ্টি-চৈতন্যের

একটা ক্ষুদ্র আংশিক দিক্ মাত্র প্রতি-ব্যক্তির চৈতন্যে অনুস্যূত হইয়াছে,—কেবল ঐ পলিটিক্সের দিক্‌টা। সেই সঙ্গে অন্যান্য দিক্‌গুলিও যদি প্রতি ব্যক্তির চৈতন্যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিত, তবে পলিটিক্স্ তার ন্যায্য স্থান ও অধিকারকে ছাড়াইয়া এমন একান্ত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত না। ব্যক্তি তাহা হইলে বৃহৎ হইত, ব্রহ্ম হইত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ ভঞ্জন হইত।

আসলে মানুষের চৈতন্য বহুকেন্দ্রিক; সুতরাং চৈতন্যের প্রকাশও একটিমাত্র কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে পারে না। তার জন্য নানা কেন্দ্র চাই, নানা রাষ্ট্রতন্ত্র চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকাও চাই। অতএব, monistic state অর্থাৎ, অদ্বৈত এক ষ্টেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ, আবার pluralistic state অর্থাৎ, অসংখ্য ষ্টেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ। একমাত্র স্বয়ম্ভু ষ্টেট যে মানুষের আর আর সকল দিক্‌কে চাপিয়া বড় হইবে তাও ঠিক্ নয় এবং বহু বিচিত্র unions বা সমবায় যদি দাঁড়ায়, তবে তাদেরও কোথাও ঐক্য না থাকিলে তাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য হইবে না। ট্রিটস্কের "পলিটিক্স্"কে এই দিক্ হইতে সমালোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু নব্য জর্ম্মাণির দানবীয় উৎপাতের সঙ্গে ট্রিটস্কের রাষ্ট্রতন্ত্রের ঐকান্তিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া সে রাষ্ট্রতন্ত্র বিশেষভাবে জর্ম্মাণ—একথা বলিলে, অর্দ্ধসত্য বলা হয় মাত্র।

(২)

জর্জ্জ রাসেল (যিনি কবি এ, ই, নামে খ্যাত) ট্রিটস্কের রাষ্ট্রের আইডিয়াকে অন্য একভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ইনি আইরিশ এবং আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতাকামী, সুতরাং এ বিষয়ে ইঁহার কথাটা প্রণিধান-যোগ্য।

"Imaginations and Reveries" নামক তাঁর নবপ্রকাশিত প্রবন্ধপুস্তকে "The spiritual conflict"-প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর আলোচনার মোট কথাটা এই: তিনি বলেন, প্রত্যেক যুদ্ধের ভিতরেই একটা বড় আইডিয়া নিহিত থাকে। ফরাসী বিপ্লবের কালে গণতন্ত্রের আইডিয়াটা সকলের চেয়ে বড় আইডিয়া ছিল, তাই মানুষের মনে মনে তার রূপের অসংখ্য প্রতিরূপ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মের মত একটা আইডিয়া পৃথিবীতে যেমনি বড় হইয়া ওঠে, অমনি তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয় এবং তার উল্টা আইডিয়াটা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। তাই ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রের আইডিয়ার পরিবর্ত্তে এখন উঠিয়াছে নব্য জর্ম্মাণির যন্ত্রবদ্ধ বিপুলায়তন ষ্টেট্-আইডিয়া। আগে ছিল এইকথা যে, ষ্টেট্ আছে ব্যক্তির জন্য, ষ্টেট্ ব্যক্তির অধীন। এখন কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, ব্যক্তি আছে ষ্টেটের জন্য, ব্যক্তি ষ্টেটের অধীন।

ফরাসী আইডিয়াকে যেমন বাহির হইতে সমস্ত ইউরোপ এবং ভিতর হইতে নেপোলিয়নের মত প্রবলশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি

পরাভূত করিতে পারেন নাই, তেমনি জর্ম্মাণির আইডিয়ার বিরুদ্ধে অর্দ্ধেকখানি সভ্যজগৎ দাঁড়াইলেও সে আইডিয়া সহজে পরাস্ত হইবার নয়। এখনই তার প্রভাবের লক্ষণ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। অন্যান্য সকল দেশের রাষ্ট্রই অজ্ঞাতসারে জর্ম্মাণ ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে—ক্রমশঃ আরো গড়িয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে ইউরোপের সকল দেশে ষ্টেট্ই যে সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহা এখন হইতেই দিব্য বুঝা যাইতেছে।

রাসেল মনে করেন যে, তখন সাহিত্যেরও বদল হইবে। গণতন্ত্রের প্রভাবে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে বেশিমাত্রায়—সে সাহিত্যের কাব্য ব্যক্তিত্বের কাব্য, একটি মাত্র ব্যক্তির হৃদয়ের কথা এবং সে সাহিত্যের উপন্যাস ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচিত্র সম্বন্ধকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখায়। ভাবী ষ্টেট্‌তন্ত্রের প্রভাবে যে সাহিত্য জন্মলাভ করিবে, তাতে বহুব্যক্তিত্বের সমষ্টিগত রূপ ফুটিবে বলিয়া মনে হয়, সাহিত্য সেই অখণ্ড সমষ্টিকে, সেই সমষ্টি-চৈতন্যকে তার কাব্যে উপন্যাসে প্রকাশ করিতে থাকিবে।

তার মানে দুই বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যে দোলকের (Pendulum) মত বিশ্বমানব যুগযুগান্তর ধরিয়া দুলিতেছে—একবার ব্যক্তি-তন্ত্র হইতে সমষ্টিতন্ত্রে, একবার সমষ্টিতন্ত্র হইতে ব্যক্তিতন্ত্রে। মধ্যযুগের ইউরোপে সমষ্টিতন্ত্র ছিল ধর্ম্মে, চর্চ্চ ছিল সমষ্টিতন্ত্রের রূপ। সেটা ভাঙিয়া হইল অসংখ্য অগণ্য ব্যক্তিতন্ত্র। আবার এখন একটা বৃহত্তর সমষ্টিতন্ত্র রচনার প্রয়াস দেখিতেছি। কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্রই বলি আর সমষ্টিতন্ত্রই বলি, এ সমস্তই কি আত্মার লীলার এক একটা রূপ মাত্র নয়? সেই লীলাই ব্যষ্টিসমষ্টির সমাধান এমনি করিয়াই তো স্থির করিতেছে। ব্যষ্টিকে সমষ্টি গ্রাস করিয়া দাঁড়ায় এও সে চায় না, আবার ব্যষ্টিই সর্ব্বগ্রাসী হইয়া ওঠে, এও সে চায়না। অতএব এই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিতন্ত্র ও সমষ্টিতন্ত্রের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, ইহার দ্বারা আমাদের অধ্যাত্মজীবন পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই।

রাসেলের কথা শেষ করিলাম। এই ধরণের লীলাতত্ত্বের একটা মুস্কিল এই যে, তাহা ভালমন্দের পার্থক্যকে অনেক সময় লুপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ আরাম পায়। যদি এটা সত্য হয় যে, জর্ম্মাণ ষ্টেটতন্ত্র ব্যক্তিকে মারিয়া, ব্যক্তির অসীম মূল্য ও অবাধ স্ফূর্ত্তি ও সম্প্রসারণকে খর্ব্ব করিয়া তবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তবে ঐখানেই যে মস্ত বড় একটা গলদ থাকিয়া গেল! রবীন্দ্রনাথ দেখাইতেছেন যে, ঐখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিনাশ-বীজ নিহিত রহিয়াছে। ষ্টেট সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে পলিটিক্স কাঁটাগাছের মত মানুষের ভাবজীবনের অন্যান্য সকল পুষ্পবিকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া একান্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। তার আভাস এখনই যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং তার আরো ভবিষ্যৎ বিকাশ দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই ষ্টেট-স্বয়ম্ভূত্বকে আত্মার বিগ্রহ মনে করা আত্মার জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কিনা,

তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কেননা এর মধ্যে স্পষ্টই যে অন্যায় ও অকল্যাণ রহিয়াছে। এই যুদ্ধটাই সেই অন্যায় ও অকল্যাণের পুঞ্জীভূত রূপ, সেই অন্যায়ের সুনিশ্চিত পরিণাম। সুতরাং ভবিষ্যতে ষ্টেটতন্ত্র যদি সর্ব্বগ্রাসী হয়, তবে তাহা মানুষের কল্যাণের আকর হইবে না, সুতরাং মানুষ তাকে সহ্য করিতেও পারিবে না। তাকে ভাঙিয়া মানুষকে নিজের মুক্তির রাস্তাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইতেই হইবে।

ষ্টেট্-স্বয়ম্ভূত্বের আদর্শের মধ্যে আত্মার দর্শকের লীলা যেমনি স্ফূর্ত্তি পাক, মানুষের বিচিত্র সৃজন-লীলাকে তাহা পীড়িত ও ব্যাহত করে বলিয়াই সে আদর্শকে পরিহার করিতে মানুষ বাধ্য। অবশ্য বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতেই আমরা সত্য আদর্শের পরিচয় পাই—এ হিসাবে বিরুদ্ধ আদর্শ আসা শ্রেয়স্কর, এ কথা মানিতে কারো আপত্তি হইতে পারে না।

## আর্টের আদর্শ

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর বৈশাখের উপাসনায় "বাংলার ভাবী সাহিত্য" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তার উপ-সংহারে আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে এই ক'টি কথা আছে :—

{ "পুরাতন আর্ট }

"আর্ট শুধু আর্টের জন্য। আর্ট নিরাসক্ত। জীবনের অসুন্দর মিথ্যা ও অকল্যাণের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই।

{ "ভাবী আর্ট }

"আর্ট দায়িত্বজ্ঞানে জীবনকে সংশোভন ও কল্যাণময় করিবে, আর্ট জীবনের শিক্ষক।"

ভবিষ্যৎ আর্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার অধিকার রাধাকমল বাবুর আছে কিনা তাহা জানিনা। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর্টের কথা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি থাক্। উপস্থিত বর্ত্তমান আর্টের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এটা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি যে, এক দল লোক সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিক হইতে আর্টের বিচার করেন এবং অন্য দল বলেন আর্টের কাজ কেবলমাত্র আনন্দ দান করা,—সামাজিক শুভাশুভের সঙ্গে তার একান্ত সম্বন্ধ নাই। ঐ "উপাসনা" কাগজে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই পড়া যায় যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গল্প-উপন্যাসগুলি সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, অতএব হিন্দুসমাজের সীতাসাবিত্রীরূপিণী কুলবধূদের ঐ সকল উপন্যাস পড়া একে-বারেই উচিত নয়। পরপুরুষের সঙ্গে কোন বিবাহিতা রমণীর অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার যদি কোন উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু হয়, তবে সে কাহিনী যতই বস্তুতন্ত্র হোক্ এবং তার পরিণামটা যেমনি সুন্দর ও মহৎ হোক্ না কেন, দেখিতেছি যে, সমাজের অভিভাবকের দল শুধু সেই উপন্যাসকে গালি দিয়া ক্ষান্ত হন্ না, উপন্যাস-রচয়িতার চরিত্র সম্বন্ধেও অভদ্রভাবে কটাক্ষপাত করিতে লজ্জা বোধ করেন না। কাজেই তখন অন্যপক্ষ আর্টের দোহাই মানিয়া বলেন যে, সমাজের দিক্ হইতে কোন্ জিনিসটা ইষ্টকর বা অনিষ্টকর আর্টের সে জন্য কোন মাথাব্যথা নাই। গল্প বা উপন্যাসের বিষয় যেমনি হোক্ না কেন, রচনাটা কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ ও

রসযুক্ত হইয়াছে কিনা সেইটেই বিচারের বিষয়।

আসলে তর্কটা আর্টের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ লইয়া দাঁড়ায় না—আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ বিচার লইয়াই এই তর্ক। অর্থাৎ ওয়াল্টার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড্ প্রভৃতির সঙ্গে আর রাস্কিনের আর্টের আদর্শের যে ভেদ, বাংলা সাহিত্যে যাঁরা আর্ট সম্বন্ধে বাদানুবাদে লাগিয়াছেন তাঁদের দুই দলের মধ্যেও সেই ভেদ দেখা যাইতেছে। তর্কটা সেই পুরাণো তর্ক, বাংলা দেশের মাটীতে নূতন করিয়া গজাইতেছে মাত্র।

অস্কার ওয়াইল্ডের The Picture of Dorian Gray নামক উপন্যাস যখন প্রথম বাহির হইল, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক গুলি সংবাদপত্রের কিছুকাল ধরিয়া তুমুল মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। তখন ওয়াইল্ড্ বলেন, আর্টের সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। আমি কেন অমনতর উপন্যাস লিখিয়াছি, তার একমাত্র জবাব, আমার খুসী। তাই তিনি, পেটার ও সিমন্স্ প্রভৃতি এই মত ঘোষণা করিলেন যে, আর্ট আর্টের জন্য, আর্টের দিক্ হইতেই আর্টের বিচার করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে রাস্কিন তাঁর সমস্ত আর্ট—সমালোচনায় এই মতটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, আর্টের সঙ্গে নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন উচ্চদরের আর্ট একেবারেই সম্ভব হইতে পারে না। রাস্কিনের Lectures on Art, The Two Paths, প্রভৃতি সর্ব্বজনবোধ্য রচনাগুলি পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাস্কিন প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যখন কোন জাতির নৈতিক অবনতি ঘটে তখন কখনো কখনো তার আর্টের আপাতঃ উৎকর্ষ দেখা গেলেও সেটা আসল উৎকর্ষ নয়, বরং সেটা অপকর্ষ। কারণ আর্ট যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহজে যোগযুক্ত, যখন সেই বিশ্বপ্রকৃতির অনুকরণ করা নয়, ব্যাখ্যা করাই ( interpret ) আর্টের কাজ, তখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি বলিষ্ঠ সতেজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে। আর নানাকারণে যখন মানুষের সমাজে নৈতিক বিকার দেখা দিতে থাকে, যখন বিলাসিতার ঘুণ সমাজকে ভিতর হইতে জীর্ণ করিতে থাকে, তখন যে সৌখীন আর্ট জন্মায়, তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ থাকে না। সে আর্ট অপকৃষ্ট আর্ট।

রাস্কিন বা অস্কার ওয়াইল্ড্ এঁদের কারো মতকেই আধুনিক রসজ্ঞেরা পাকা মত মনে করেন নাই। আর্টের মধ্যে সব ক্ষেত্রেই নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণার সন্ধান করিতে গিয়া রাস্কিন্ যে সব সময়ে আর্ট সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। একটা অত্যন্ত স্পষ্ট উদাহরণ আমার মনে পড়িতেছে। The Two Paths গ্রন্থে "Conventional Art" সম্বন্ধে যখন রাস্কিন বক্তৃতা দেন, তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং সিপাহীদের নৃশংসতার অতিরঞ্জিত খবর সমুদ্রপারে ইংলণ্ডে পৌঁছিতেছিল। রাস্কিন তাঁর সেই বক্তৃতায় বলিলেন যে, ভারতবর্ষের কলাসামগ্রীর সৌষ্ঠববৈচিত্র্য ও বর্ণের বাহার অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের লোক যখন

নীতিতে এত দুর্ব্বল, এমন সব লোমহর্ষণ কাণ্ড যখন তারা অনায়াসে করিতে পারে—তখন তাদের আর্টের মধ্যেও নিশ্চয় দুর্ব্বলতা আছে। নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আর্টকে অতিমাত্রায় জড়াইবার চেষ্টা করিলে এম্নিতর ভুল সমালোচনার আশঙ্কা থাকে।

এইজন্য হুইস্‌লার আর্টকে পুনরায় নীতির আধিপত্য হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য একালে একথা কেহ বলেন না যে, আর্টের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নাই, বরং এই কথাই সর্ব্বত্র শোনা যায় যে আর্টই জীবনের প্রকাশক, আর্টই জীবনের উদ্ঘাটক। তবু আর্টের বিচার যে ধর্ম্মনীতির দিক্ হইতে বা চারিত্রের দিক্ হইতে হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে বোধ করি কারো দ্বিমত নাই।

কারণ, ঐ রকমের কোন একটা থিওরি খাড়া করার একটা প্রধান মুস্কিল এই যে, তারপর হইতে সেই থিওরির সঙ্গে আর্টের সব ছাঁদগুলাকে মানান্‌সই করিবার জন্য মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা প্রবল তাগিদ্ জাগিয়া উঠে। যেটা বেমানান্, সেটা তখনি তখনি বাতিল হইয়া যায়। এবং অবশেষে দেখা যায় যে, কোন থিওরিই এমন সম্পূর্ণ নয় যে আর্টের সব ছাঁদগুলো তার আওতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লইতে পারে। রাস্কিনের থিওরির জন্য পোপ তাঁর কাছে ইংরাজ কবিদের মধ্যে একজন উঁচুদরের কবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। টল্‌স্টয়ের থিওরির জন্য আধুনিক পনেরো আনা সাহিত্য তাঁর What is Art গ্রন্থে সাহিত্যের এলাকা হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড পাইয়াছে। থিওরিওয়ালারা এই কথাটাই ভুলিয়া যান যে, কলাস্রষ্টা যখন কোন শিল্পবস্তু সৃজন করেন, তখন তিনি আপনার অন্তরের আদর্শকেই অনুসরণ করেন এবং যে পরিমাণে তিনি আপনার ভাবনিগূঢ় ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ছাপটি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন, সেই পরিমাণেই কলাস্রষ্টা হিসাবে তাঁর সার্থকতা। বাহিরের কোন থিওরি বা মানদণ্ড বা মডেল যদি তাঁর কল্পনাকে কিছুমাত্র অভিভূত করে, তবে সেইখানেই তাঁর কাজ খারাপ হইয়া যাইতে বাধ্য। সেইজন্য কোন আর্টসৃষ্টি নৈতিক কি অনৈতিক সেটা বিচারের বিষয় নয়। কেননা এটা সত্য যে, আর্টিষ্ট যে-পরিমাণে মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি রাখেন, সেই পরিমাণে তাঁর রচনার মধ্যে মহত্ত্ব আপনিই অজ্ঞাতসারে স্ফূর্ত্ত হইবে। এবং যদি বা কোন নৈতিক আদর্শ তাঁর রচনাতে নাও পাওয়া যায়, তবু এমন কিছু পাওয়া যাইবেই যা মলিনতাকে শ্রীহীনতাকে লজ্জা দেয়, যা মঙ্গলে সুন্দরে অবিচ্ছেদ্য যোগকে প্রকাশ করে। সুতরাং আর্ট-স্রষ্টার রসানুভূতির প্রসার ও গভীরতা কতখানি, তার উপরেই আর্টের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করে। সেইজন্যই আর্টিষ্ট মানবের শিক্ষক হইতে পারেন না; কারণ, আর্ট হইতে আমরা যে শিক্ষা পাই সেটাকে গৌণ শিক্ষা বলিতে পারি—ধর্ম্মনীতি বা সমাজ-নীতির শিক্ষার মত সে শিক্ষা মুখ্য শিক্ষা নয়। আর্ট আমাদের রসানুভূতিকেই গভীর, প্রসারিত, সুমার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম করিয়া তোলে, এই হিসাবে তাহা শিক্ষা দেয়

যদি বল, তবে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সে শিক্ষা বিশ্বের সকল সুন্দর পদার্থই দিয়া থাকে, সে শিক্ষা আকাশও দেয়, চাঁদও দেয়, গাছপালাও দেয়। সুতরাং তাকে শিক্ষা নাম দেওয়ার দরকার কি? থিওরি হইতে যেমন আর্টের জন্ম হয় না, আর্ট নিজেও তেমি কোন থিওরির জন্মদাতা নয়।

কিন্তু কোন থিওরি না হইলে আর্টের বিচার কেমন করিয়া হইবে? আর্টের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্টিষ্ট তাঁর ভিতরকার কোন্ vision বা কোন্ রস-ভাব তাঁর কলাসৃষ্টিতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আর্ট-রসিকের কল্পনাপটে বা মানসপটে সেই প্রকাশ কি পরিমাণে আপনার ছাপ স্থায়ীভাবে রাখিয়া যাইতে পারিল, তারও খবর লইতে হইবে। কেননা কবির সব চেয়ে বড় কবিতা কাব্যরসিক, চিত্রকরের সব চেয়ে বড় চিত্র চিত্রের সমজ্‌দার। শিল্পীর চিত্তের সঙ্গে রসিকের চিত্তের যোগ হয়—শিল্পের ভিতর দিয়া। বিশ্বের রসকে শিল্পরসিক চাখেন শিল্পীর রসরচনায়, আবার শিল্পরসিকের রসালো ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া শিল্পীর রচনার রসকে গৌড়জনেরা চাখিয়া থাকেন। এই জন্য কবির চেয়ে কাব্যরসিক ন্যূন নন্, শিল্পীর চেয়ে শিল্পরসজ্ঞ খাটো নন্। টার্ণার বা মিলেট বা করট্‌ বা রসেটিকে বুঝিতে হইলে সাধারণ ব্যক্তিকে শিল্পরসিকেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সেখান হইতে রসোদ্রেক হইলে পর হয়ত সেই ব্যক্তি ঐ সকল চিত্রকরদের চিত্রে বড় বড় শিল্প-রসজ্ঞও যাহা দেখেন নাই, এমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন—হয়ত সম্পূর্ণ নূতন দিক্ হইতে ঐ সকল চিত্রকরের চিত্রের রসব্যাখ্যা করিতে পারেন। শিল্পসৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির মত চিরকাল নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়াই শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট থিওরি খাড়া করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা থিওরি লইয়া মারামারি করেন, তাঁদের রচনায় রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের ক্ষমতার গন্ধ পর্য্যন্ত পাই না। কবি রাসেল তাঁর একটা লেখায় গল্প করিয়াছেন যে, একজন আইরিশ ক্রিটিক্ সমস্ত সন্ধ্যাবেলা Constable Monet প্রভৃতির চিত্রে সুসজ্জিত এক ঘরে বসিয়া আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গেলেন অথচ একবার ছবি-গুলির দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। আর্টের আদর্শ এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন একটা আর্টের সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলে আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং বাংলার পাঠকবর্গেরও কাণ জুড়ায়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



তন্দ্রাভিভূতা

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত

# ভারতী

৪১শ বর্ষ ] আশ্বিন, ১৩২৪ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা


## ব্যায়োগ

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, ব্যায়োগ তাহার অন্যতম। 'ব্যায়োগ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—"যাহাতে বহু পুরুষ-চরিত্রের যোজনা হয় তাহাই ব্যায়োগ।" ("ব্যাযুজ্যন্তে অস্মিন্ বহবঃ পুরুষা ইতি ব্যায়োগঃ") এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ব্যায়োগ-শ্রেণীর নাট্যে স্ত্রী-চরিত্র অল্প ও পুরুষ-চরিত্রই অধিক থাকে। এই প্রধান লক্ষণ ভিন্ন ব্যায়োগের অন্য লক্ষণও আছে। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে নিম্নলিখিত রূপে সেগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্শাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৈশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ॥
রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ॥"

[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩১-২৩৩ শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ ৩৩৬ পৃষ্ঠা ]

"ব্যায়োগ যে ইতিবৃত্ত লইয়া রচিত তাহা বিখ্যাত হওয়া চাই। ইহাতে স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অল্পই থাকিবে; গর্ভ ও বিমর্শ ব্যায়োগে থাকিবে না। ইহাতে বহু পুরুষ-চরিত্র থাকিবে। এক অঙ্কে ব্যায়োগ সমাপ্ত হইবে। ইহাতে যে যুদ্ধ থাকিবে, তাহা স্ত্রীনিমিত্ত হইবে না। ব্যায়োগে কৈশিকী বৃত্তি প্রযুক্ত হইবে না। দিব্য পাত্র অথবা রাজর্ষি ব্যায়োগের নায়ক হইবে। নায়কের ধীরোদ্ধত পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া চাই। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্ত ভিন্ন অন্য যে কোন রস ব্যায়োগের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে।"

সংস্কৃত নাট্যে পঞ্চসন্ধি প্রযুক্ত হয়। প্রথমে নাটকের মূলীভূত ঘটনার কারণ প্রদর্শিত হয়; ইহা মুখ-সন্ধি। পরে ঈষৎ-রূপে উক্ত বীজ-স্বরূপ কারণ প্রকাশ করা হয়; ইহার নাম প্রতিমুখ-সন্ধি। তাহার পর এই বীজ অধিক প্রকাশ পাইলে অন্য কারণাদির দ্বারা তাহা হ্রাস বা অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই গর্ভ-সন্ধি। গর্ভ-সন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকাশ বা অন্তরায় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কোচ যদি পরে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে তাহা বিমর্শ-সন্ধি আখ্যা লাভ করে। আর যেখানে মুখ্য ঘটনা অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ঘটনার সহিত উপসংহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্ব্বহণ-সন্ধি-রূপে কথিত হইয়া থাকে। (১)

ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে পঞ্চাঙ্ক নাটকে এক এক অঙ্কে এইরূপ সন্ধির প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃত নাটকে কয়টি অঙ্ক থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, অঙ্ক ধরিয়া এইরূপ বিভাগ দেখান অসম্ভব। কিন্তু এটা স্থির যে সকল দেশের নাটকেই এইরূপ সন্ধি দেখান যাইতে পারে। মূল ঘটনার অবতারণা (মুখ-সন্ধি), তাহার ঈষদ্বিকাশ (প্রতিমুখ-সন্ধি) অন্যান্য বিরোধী ও অনুকূল ঘটনার সহিত সংঘর্ষ (গর্ভ-সন্ধি), এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি (বিমর্শ-সন্ধি) ও পরিশেষে সমাপ্তি (নির্ব্বহণ-সন্ধি) ইহা প্রায় সকল নাট্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত বলিয়া ইহাতে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি থাকে না। অর্থাৎ বৃহদবয়ব নাটকে মূল ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে অনুকূল বা প্রতিকূল অন্যান্য বিবিধ ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া যে আলোড়ন দেখান হইয়া থাকে, ব্যায়োগে তাহা হইবার উপায় নাই। মূল ঘটনাটি অবতারিত হইয়া (মুখ-সন্ধি) তাহার ঈষদ্বিকাশের পরেই (প্রতিমুখ-সন্ধি), একেবারে উপসংহার (নির্ব্বহণ-সন্ধি) প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যায়োগের অবয়বের অল্পতা হেতুই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাই বিশ্বনাথ

---

(১) "মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শ উপ-সংহৃতিঃ।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে ॥
যত্র বীজ-সমুৎপত্তির্নানার্থরস-সম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ ॥
যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥
বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্ব্বহণং হি তৎ ॥"

[সাহিত্য-দর্পণম্। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। বোম্বাই সংস্করণ, ২৮৩,২৮৪ পৃঃ]

ব্যায়োগের লক্ষণে লিখিয়াছেন, ব্যায়োগে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি নাই।

ব্যায়োগের ঘটনা কাল্পনিক হইবে না। পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়াই ব্যায়োগ রচিত হইবে। ব্যায়োগে যখন স্ত্রী-চরিত্র অল্প ও পুরুষ-চরিত্র অধিক তখন স্ত্রীনিমিত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ইহার অঙ্গীভূত হয় না। পুরুষ-চরিত্রগণের মধ্যে অন্যান্য কারণে যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্যায়োগে কৈশিকীবৃত্তি থাকিবে না। শৃঙ্গার রসেই কৈশিকীবৃত্তি প্রযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র বেশভূষাযুক্ত, নৃত্যগীত-বহুল স্ত্রীজনসঙ্কুল, মনোহর বিলাসযুক্ত ও শৃঙ্গারের অঙ্গপূর্ণ বৃত্তিই কৈশিকী বৃত্তি। (২) ব্যায়োগ নাটকে হাস্য, শৃঙ্গার বা শান্তরস অঙ্গীভূত হইতে পারে না। বহু নারী-চরিত্রও ইহাতে থাকে না। কাজেই কৈশিকী বৃত্তিও ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ব্যায়োগের নায়ক দেবতা, নররূপধারী দেবতা (রামচন্দ্রাদি) অথবা রাজর্ষি হইবে। এই নায়ক আবার ধীরোদ্ধত পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া চাই। প্রচণ্ড, চপল, অহংকারী, দর্পী, আত্মশ্লাঘানিরত, মায়াবী নায়ককে ধীরোদ্ধত বলা হইয়া থাকে। ভীমসেন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। (৩)

ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এক 'ব্যায়োগ' নামের ব্যুৎপত্তি হইতে অধিকাংশ লক্ষণগুলিই একে একে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ "বহু পুরুষ যাহাতে প্রযুক্ত হয় তাহাই ব্যায়োগ" এই ব্যুৎপত্তি হইতে ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের অল্পতা ও পুরুষ-চরিত্রের বাহুল্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার স্ত্রী-চরিত্রের অল্পতা হেতু শৃঙ্গার-রস ব্যায়োগের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। হাস্য শৃঙ্গার-রসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং এ রসের প্রয়োগও ব্যায়োগে বিরল। শৃঙ্গার-রস না থাকাতে তদুপযোগী কৈশিকী বৃত্তিও অপ্রযুজ্য। স্ত্রীজনের অল্পতাবশতই ব্যায়োগে যুদ্ধবিগ্রহাদি স্ত্রী-নিমিত্ত হইতে পারে না। বহু পুরুষ-চরিত্র থাকাতে বীর-রস প্রয়োগ করা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দেখানই সুবিধা; এবং ধীরোদ্ধত পাত্রই ইহার উপযোগী।

সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ ব্যায়োগের উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন, যথা "সৌগন্ধিকাহরণম্।"

নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে কাব্যমালার ৭৪ সংখ্যায় বিশ্বনাথ কবি-বিরচিত সৌগন্ধিকাহরণ নামক ব্যায়োগ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি হইতে কবির পরিচয় বিশেষ-কিছু জানা যায় না। কেবল বিশ্বনাথ কবি

---

(২) "যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষ-চিত্রা
স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।
কামোপভোগা প্রভবোপচারা
সা কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা॥" ] সা দ। ৬ প।

(৩) "মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহংকারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্বীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥" যথা ভীমসেনাদিঃ। [ সা দ। ৩ প ]

তাঁহার মাতুল অগস্ত্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এইটুকু মাত্র জানিতে পারা যায়। সূত্রধারের মুখে যে শ্লোক দুইটিতে কবি ও তাঁহার মাতুলের পরিচয় আছে, তাহা এই—

"বিশ্বনাথ ইতি খ্যাতঃ কবিরস্তি যদুক্তয়ঃ।
অকাঞ্চনমরত্নঞ্চ বিদুষাং কর্ণভূষণম্ ॥

অথবা

বাচস্তস্য কবেরুদারমধুরা ইত্যত্র চিত্রং কিমু
প্রখ্যাতঃ সকলাসু দিক্ষু গুণিষু শ্রেয়ানগস্ত্যঃ সুধীঃ।
বেধশ্চন্দ্রমুখীকরাঙ্গুলিদলাসঙ্গক্বণদ্বল্লকী
বাচো যুক্তিসহোক্তিদর্শিতসুধাজন্মা স যন্মাতুলঃ ॥

তেন কবিনা প্রণীতমভিনবং সৌগন্ধিকাহরণং নাম প্রেক্ষণকমস্মাবভিনীতপূর্ব্বমাস্তে। তদিদানীং প্রযুঞ্জানঃ সামাজিকমনাংস্যাবর্জ্জয়ামি।"

নাট্যখানির প্রথমে রাজা প্রতাপরুদ্রের নামোল্লেখ আছে। প্রতাপরুদ্রের সভাসদ্‌গণের সমক্ষে নাট্যখানি অভিনীত হইয়াছিল। সূত্রধার বলিতেছে—

"রাজ্ঞা প্রতাপরুদ্রেণ সংভাবিতৈরশেষবিদ্যাবিশেষ সারসার্ব্বজ্ঞধৌরেয়মতিভিঃ সভাসদ্ভিরাহূয় সবহুমানমাদিষ্টোঽস্মি।"

এই প্রতাপরুদ্র যে কে, তাহা নাট্যখানি হইতে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তাঁহার নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত "বেলাবনাবলীবিশ্রান্তনিজবশতুরঙ্গখুরমৃদঙ্গনিনদমিশ্রিতজলধিতরঙ্গনির্ঘোষণদুরবলিপুদমনবীরভদ্রেণ" এই বিশেষণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার অধিপতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রতাপরুদ্ররূপে কল্পনা করিলে বড় বেশীরকম অনুমানের সাহায্য লওয়া হয়।

সৌগন্ধিকাহরণের নায়ক ভীমসেন। ইনি ধীরোদ্ধত নায়ক। বীর ও অদ্ভুত রস নাট্যখানির অঙ্গীভূত। নাট্যকার স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (৪) নাট্যখানির ঘটনা এই—

প্রথমে ভীমসেন প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহার স্কন্ধে ধনু লম্বিত ও হস্তে গদা।

"সৌগন্ধিকং কিমপি গন্ধবহোপনীত-
মালোক্য কৌতুকবতা হৃদয়েন কৃষ্ণা।
অন্যানি যাচিতবতী কিল তাদৃশানি
সজ্জস্তদা হৃতিবিধে মম বাহুরেষঃ ॥"

"বায়ুদ্বারা বাহিত একটি সৌগন্ধিক (কহ্লার বা শ্বেতপদ্ম) দর্শন করিয়া দ্রৌপদী কৌতূহলবশে আরও সেইপ্রকার পুষ্প প্রার্থনা করায়, আমার এই বাহু সেই পুষ্প আহরণে উদ্যত হইয়াছে।"

ভীমসেনের এই সর্ব্বপ্রথম উক্তি হইতেই নাট্যের নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। সৌগন্ধিক বা শ্বেত-পদ্মের আহরণ অর্থে সৌগন্ধিকাহরণ নামকরণ হইয়াছে। নাম হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ও সূচিত হইতেছে।

ভীমকে পাঠাইবার সময় দ্রৌপদীর চিত্ত আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। ভীম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যাত্রা করেন। পরিক্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদী-প্রার্থিত সেই

---

(৪) "বৃত্তির্গিরামুক্তি বিশেষহৃদ্যা ধীরোদ্ধতং নেতৃবিচেষ্টিতঞ্চ।
বীরাদ্ভুতৌ যত্র রসৌ চ দীপ্তৌ প্রত্যেকমেতানি হরন্তি চেতঃ ॥"
"অস্ত প্রৌঢ়পরাক্রমাদ্ভুতনিধির্ধীরোদ্ধতঃ নায়কঃ।"
[ প্রস্তাবনা ]

পুষ্পের সৌরভ ভীমের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ভীম বলিলেন—

"স্বৈরং জুগুপ্সিতবনদ্রুমপুষ্পগন্ধে-
রগ্রে মধুব্রতকুলৈরুপভুজ্যমানঃ।
সৌগন্ধিকস্য কথয়ত্যুপযানমার্গং
কোঽপ্যেষ সৌরভময়ো বহলঃ প্রবাহঃ॥"

সেই গন্ধের অনুসরণ করিতে করিতে ভীম বনভূমি লঙ্ঘন করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। হনুমান সর্ব্বদা সেই শৈলে বাস করিয়া থাকেন—

"তেনার্য্যেণ হনুমতা ননু সদা শৈলোঽয়মধ্যাস্যতে॥"

হনুমান এই সময় প্রবেশ করিলেন। কিন্নরগণ কর্তৃক গীত রামচরিত শ্রবণ করিয়া বহুদিন তিনি এই শৈলে কালযাপন করিতে ছিলেন। তাঁহার প্রতি সীতার স্নেহ স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন—

"সীতাবিমার্গণবিধৌ মম চক্ষুষোঽস্য
স্পন্দঃ পরীক্ষিতশুভাগম এব জাতঃ।
সম্প্রত্যপি স্ফুরতি হন্ত তদেব ভূয়—
স্তৎ কিং নু তদ্ভ্রমনুভাবয়িতা জনোঽয়ম্?"

"পূর্ব্বে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে যখনই আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়াছিল, তখনই সীতাদেবীকে পাইয়াছিলাম। দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দনে যে শুভ হয় তাহা আমার পরীক্ষিত। আজ আবার এখন তাহা স্পন্দিত হইতেছে। কোনও পুরুষ কি আমার শুভ করিতে আসিল?"

ভীম এদিকে অরণ্যবাসী জন্তুদিগকে ত্রাসিত করিবার জন্য সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ হইতে ময়ূর উড়িয়া পড়িল, হরিণ-হরিণী নিকটে থাকিয়াও উদ্বিগ্ন চিত্তে পরস্পরকে খুঁজিতে লাগিল, হস্তী দৌড়িতে দৌড়িতে মুখ ফিরাইয়া হস্তিনীকে দেখিতে লাগিল, নিদ্রাভঙ্গে সিংহ অর্দ্ধোত্থিত হইল। হনুমান তখন ভীমসেনকে দেখিলেন। ভীমসেন সদর্পে নিজ পরিচয় ঘোষণা করিয়া কুবেরের সরোবরের পথ দেখিতে চাহিলেন। হনুমান ইহার আকৃতি দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, "নিজ-রূপ গোপন করিয়া কিছুকাল ইহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য ইহার পথ রোধ করি।"

"অচিরাদপ্রকল্পিতরূপ এবাহং
কঞ্চিৎকালমমুনা সহ বিনোদ—
সম্পাদনার্থমাগমনমার্গং ধিতিষ্ঠামি।"

এই বলিয়া শাখামৃগের রূপ ধরিয়া হনুমান পথ রোধ করিয়া শয়ন করিলেন। ভীম তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমায় দেখিয়া এই অরণ্যের প্রাণীগণকে ত্রস্ত ব্যাকুল দেখিয়াও নির্ভীক হৃদয়ে বানর স্বভাবজাত চপলতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গুল বক্রভাবে বিস্তার করিয়া পথে শয়ন করিয়া আছে,—কি আশ্চর্য্য!"

"মদ্দর্শনাচ্চকিতবিদ্রুতধীরসত্বং
পশ্যন্নরণ্যমিদমপ্যবিবদ্ধভীতিঃ।
উৎসৃজ্য জাত্যমপি চাপলমেষ ধৈর্য্যা
ত্তির্য্যক্ প্রসার্য্য পথি বালধিযষ্টিমাস্তে॥"

হনুমান্ ভীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এই বনের সকল জন্তুকে ত্রাসিত করিতেছ?"

ভীম বলিলেন, "তাহাতে তোমার কি?"

হনুমান্ বলিলেন, "পরের উপর অত্যাচার আমি সহ্য করিব না।"

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে?"

হনুমান বলিলেন, "আমি তোমায় নিবারণ করিব।"

ভীমসেন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "কি! বানর বীরকে নিবারণ করিবে?"

হনুমান হাসিয়া বলিলেন, "নীতি-উপদেশ দিয়াই নিবারণ করিব। এই নিরীহ অরণ্যচর প্রাণীদের ভীত করিয়া তোমার কি বীর্য্য প্রকাশ পাইবে?"

ভীম এ কথা শুনিয়া শান্ত হইলেন। হনুমান তখন ভীমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম নিজ পরিচয়-প্রদানচ্ছলে বলিলেন, "অজাতশত্রুকে জান কি?" হনুমান জানিয়াও উত্তর করিলেন, "না।" ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! যুধিষ্ঠিরকে জান না?" হনুমান তখন বলিলেন, "যে শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছে, সেই না কি?" ভীম সখেদে নিজ বীর্য্যে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "এইটুকুই কি যুধিষ্ঠিরের পরিচয়?" হনুমান বলিলেন, "পাণ্ডবদের প্রতি তোমার এত পক্ষপাত কেন?" তখন ভীম আত্মপ্রকাশ করিলেন।

"প্রমাথবিস্তাধিগমায় রক্ষসা-
মধত্ত যস্তাক্ষরশিক্ষণং করঃ।
হিড়িম্ববক্ষঃস্থলকে মহাবলঃ
স এব ভীমোঽস্মি যুধিষ্ঠিরানুজঃ॥"

তাহার পর ভীমের মনে পড়িল, কথায় কাল অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনি হনুমানকে বলিলেন, "পথ হইতে লাঙ্গুল সরাইয়া লও, নহিলে হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তেমনি আমিও তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।"

"মহাতিকালঃ কিমিবাতিপাত্যতে
বিরুধ্যতাং বালধিরধ্বনস্ত্বয়া।
বিলঙ্ঘ্য গচ্ছাম্যধুনা জবাদহং
পুরা হনুমানিব রাশিরম্ভসাম্।"

"হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন" এই উপমা শুনিয়া ছলক্রমে হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হনুমান কে?" তখন ভীম হনুমানের পরিচয় দিলেন। কুমারসম্ভবে যেরূপ ছদ্মবেশী শিব কর্ত্তৃক নিজ নিন্দা ও পার্ব্বতীর শিব-প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও হনুমান কর্ত্তৃক সেইরূপ নিজ নিন্দা ও ভীম কর্ত্তৃক হনুমানের প্রশংসা বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল। হনুমান শেষে প্রীত হইয়া নিজরূপ ধারণ করিলে ভীম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজকৃত চাপল্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হনুমান তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিয়া বলিলেন, "কমল-সহিত সরোবরই তোমার নিকট আনিয়া দিতেছি।" ভীম বলিলেন, "আমিই আনিব।" তখন হনুমান বলিলেন, "সেই সরোবর কুবেরের। যক্ষেরা তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। মায়াবশতঃ সে সরোবর তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। যক্ষেরাও মায়াবী। সুতরাং সরোবর যাহাতে দেখিতে পাও সেজন্য ও যক্ষদের জয় করার জন্য একটি বিদ্যা তোমায় দিই, গ্রহণ কর।" ভীমের তাহা লইবার ইচ্ছা না থাকিলেও হনুমান অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া তিনি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। হনুমান বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর ভীমসেন হনুমান কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথে পরিক্রমণ করিতে করিতে কদলীবন অতিক্রম করিয়া তমালবনের মধ্যস্থিত পথ দিয়া চলিয়া সরোবরের নিকট

উপনীত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ উঠিল, "ওহে যক্ষবীরগণ, না বলিয়া কে এই বনে মরিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছে?" ভীম সোৎসাহে গদা ধরিয়া কমল লইবার জন্য সরোবরে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিলেন। নেপথ্য হইতে শুনা গেল, "ওরে দুরাত্মন্! নামিস্ না। নামিস্ না।" তখন বাক্-কলহের পর ভীমের সহিত যক্ষবীরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীম রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

কঞ্চুকী ও কুবের ইহার অল্প পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন হইতে ভীমের সহিত যক্ষ-গণের তুমুল যুদ্ধের কথা বুঝিতে পারা গেল। যক্ষগণ শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ভীম তখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কুবের সাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলে ভীম বিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন; কুবের তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে ভীম বলিলেন, "আমার বিনয়ের ব্যতিক্রম ক্ষমা করুন।" কুবের বলিলেন, "মানীদের ইহাই স্বভাব। তাঁহারা পরের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারেন না। মেঘের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সিংহ কি গুহায় লুকাইয়া থাকে?"

"ননু মানরুচেরয়ং গুণঃ
সহতেঽসৌ পরগর্জ্জিতং ন যৎ।
নিশময্য ঘনাঘনধ্বনিং
নিভৃতস্তিষ্ঠতি কিং নু কেশরী?"

এই সময় যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেব ভীমকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থলে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির উৎকণ্ঠিত ও দ্রৌপদী ভীত হইয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ভীমের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের আশ্বাস দিতে-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলের মিলন হইল। কুবেরকে সকলে প্রণাম করিলেন। কুবেরের আজ্ঞায় কঞ্চুকী শ্বেত কমল আহরণ করিয়া আনিলে ভীমসেন তাহা দিয়া দ্রৌপদীর অঞ্জলি ভরিয়া দিলেন। কুবের দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রুপদ-রাজনন্দিনি! ভীমসেন তোমার আর কি অভিলাষ পূরণ করিবে?"

দ্রৌপদী সলজ্জভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি প্রার্থনীয়? তথাপি ইহা হউক—" এই কথার পর চিরন্তন প্রথামত নিম্নলিখিত ভরতবাক্যে নাট্যখানির সমাপ্তি হইয়াছে।

"রাজানঃ পরিপালয়ন্তু সততং ন্যায্যেন গাং বর্ত্মনা
মর্য্যাদানতিলঙ্ঘিনশ্চ সুচিরং দীব্যন্তু বর্ণাশ্রমাঃ
কিঞ্চান্যৎ প্রতিভাপ্রকাশসুলভা সানন্দসংবিন্ময়ী
স্বৈরং বক্ত্রসরোরুহেষু বিদুষাং বাগ্দেবতা বর্ত্ততাম্॥"

এ-যাবৎ সৌগন্ধিকাহরণের বঙ্গানুবাদ হয় নাই। এই ব্যায়োগখানি ব্যতীত আমরা আরও দুইখানি ব্যায়োগের সন্ধান পাইয়াছি। একখানি ভাস-রচিত মধ্যম-ব্যায়োগ, অপরখানি কাঞ্চনাচার্য্য রচিত ধনঞ্জয়-বিজয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক "মধ্যম-ব্যায়োগে"র বঙ্গানুবাদ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ধনঞ্জয়-বিজয়ের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের অনন্তশয়ন গ্রন্থা-

বলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া মধ্যম ব্যায়োগের মূল ও নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যমালার ৫৪ সংখ্যায় ধনঞ্জয়-বিজয়ের মূল প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যম ব্যায়োগ নাট্যের নাম হইতেই ইহা যে ব্যায়োগ তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহার নায়কও ভীমসেন। কুরুজাঙ্গলে যূপ-গ্রামবাসী কেশবদাস নামক ব্রাহ্মণ স্বীয় মাতুল যজ্ঞবসুর পুত্রের উপনয়নে নিমন্ত্রিত হইয়া পত্নী ও তিন পুত্র সহ মাতুলালয়ে যাইতেছিলেন। যে বনে পাণ্ডবদের আশ্রম ছিল, তথায় রাক্ষসের উপদ্রব নাই শুনিয়া তাহার মধ্য দিয়াই যাইতেছিলেন। এক ভীম ব্যতীত অন্য পাণ্ডবেরা কেহ তখন আশ্রমে ছিলেন না; শতকুম্ভ নামক যজ্ঞ করিবার জন্য মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে গিয়াছিলেন। হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ আসিয়া কেশবদাসের পথরোধ করিল। হিড়িম্বা উপবাসের পারণের জন্য পুত্রকে একটি মনুষ্য আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ জানিয়াও ঘটোৎকচ মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ব্রাহ্মণের পথরোধ করিল। শেষে ব্রাহ্মণের অনুনয়ে ঘটোৎকচ বলিল, "যদি তোমার এক পুত্রকে ছাড়িয়া দাও—তাহা হইলে তোমাদের রক্ষা।" কেশবদাসের পত্নী নিজ শরীর দিতে চাহিলেন—স্ত্রীলোক বলিয়া ঘটোৎকচ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেশবদাস নিজ দেহ দিতে চাহিলেন—বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহাকেও ঘটোৎকচ লইতে চাহিলেন না। তিন পুত্রের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ দেহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেশবদাস জ্যেষ্ঠ ও কেশবদাস-পত্নী কনিষ্ঠকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। সানন্দে মধ্যম পুত্র তখন অগ্রসর হইয়া নিজ দেহ দান করিতে গেলেন। ঘটোৎকচ তাঁহার এই আত্মত্যাগে চমৎকৃত হইল। মধ্যম পুত্র ঘটোৎকচকে বলিলেন, "আমি ঐ জলাশয় হইতে পিপাসার শান্তি করিয়া আসি।" ঘটোৎকচ বলিল, "যাও।"

ব্রাহ্মণ খেদ করিতেছেন, মধ্যম পুত্রের আসিতে বিলম্ব হইতেছে, এমন সময় ঘটোৎকচ "মধ্যম" "মধ্যম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ব্যায়াম করিতেছিলেন। তিনি সেই ডাক শুনিয়া তাঁহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া দ্রুত তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কেশবদাস তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ভীম ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া নিজ শরীর বিনিময়ে তাহার পুত্রের শরীর ঘটোৎকচের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি ভীমকে নিষেধ করিলেন। ভীম বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের শরীর আমার শরীর দিয়া রক্ষা করিব।" ঘটোৎকচ ভীমকে বলিল, "এস।" ভীম বলিলেন, "সাধ্য থাকে, আমায় লইয়া চল।" ঘটোৎকচ বলিল, "জানিস্, আমি কে?" ভীম বলিলেন, "জানি। আমার পুত্র।" ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হইলে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধের পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, শৈলশৃঙ্গ উন্মূলন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিল। তাহাতেও ভীমের কিছু হইল না দেখিয়া

মায়াপাশে তাহাকে বদ্ধ করিল। ভীম মায়াপাশ হইতেও নিজেকে অবলীলাক্রমে মোচন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ বলিল, "তুমি ত ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিনিময়ে নিজ শরীর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। সেই প্রতিশ্রুতি-অনুসারে আমার অনুসরণ কর।" তখন ভীম তাহার অনুসরণ করিলেন। হিড়িম্বার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা পুত্রকে বলিলেন, "এ কাহাকে আনিয়াছ?" ঘটোৎকচ বলিল, "কেন! মানুষ আনিয়াছি।" হিড়িম্বা তখন বলিলেন, "এ কি মানুষ! এ যে দেবতা।" তখন ঘটোৎকচ পিতৃ-পরিচয় পাইল; পিতাকে অভিবাদন করিয়া নিজ চপলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভীম ও ঘটোৎকচ পুত্র ও পত্নীসহ কেশবদাসকে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মধ্যম ব্যায়োগের ঘটনা এইরূপ। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র মধ্যম তপস্বী ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই উভয়ের নাম মধ্যম হওয়াতে নাট্যখানির সন্ধিস্থলে ঘটনার পুষ্টি হইয়াছে। ইহা সূচনার জন্যই ইহার নাম মধ্যম ব্যায়োগ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

ধনঞ্জয়-বিজয় কাঞ্চনাচার্য্য রচিত। নাট্যারম্ভে সূত্রধারকে একজন পুরুষ এক পত্র আনিয়া দিল। জয়দেব সেই পত্রে রঙ্গমণ্ডন নামক নটকে (৫) আজ্ঞা করিতেছেন, "বীররসযুক্ত অদ্ভুত কোনও রূপক অভিনয় করিয়া গদাধর (৬) প্রভৃতি আমার পারিষদবর্গকে অভিনন্দিত কর।"

"অস্তি প্রশস্তিসহিতঃ শ্রীমাঞ্জয়দেবঃ। ... স চ প্রসাদেন রঙ্গমণ্ডনং নাম নটং সমাদিশতি। ... তদিদানীং ভবতা বীররসাদ্ভুতং রূপকমভিনীয় গদাধর প্রমুখাস্মৎ—পরিষদানন্দনীয়া ইতি।"

এই জয়দেব কে তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কি না বলা দুষ্কর।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন, "এই ব্যায়োগ নাটকখানি ... গঙ্গাধর মিশ্র প্রভৃতির চিত্তবিনোদনার্থ শরৎকালে অভিনীত হয়। ... গঙ্গাধর মিশ্রও একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাত।" এই উক্তি ভিত্তিহীন। পূর্ব্বোদ্ধৃত সংস্কৃত পংক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে 'গদাধর' প্রমুখ পারিষদ-গণের চিত্তরঞ্জনার্থ ধনঞ্জয়-বিজয় অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু নিজেও ঐ অংশের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "আপনি বীররসাদ্ভুত কোন রূপক অভিনয় ক'রে গদাধর প্রমুখ আমাদের পরিষদ্ মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করুন।" অথচ, ভূমিকায় গদাধর স্থলে তিনি কেন যে গঙ্গাধর মিশ্র লিখিলেন, ও গঙ্গাধর মিশ্র নামক সুলেখকের সহিত তুলনা করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। সম্ভবতঃ অনবধানতার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

(৫) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদে 'নটকে' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'নাটকে' এই মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে।

(৬) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদের ভূমিকায় "গঙ্গাধর মিশ্র" এই ভুল আছে।

ধনঞ্জয়-বিজয়ের রচয়িতা কাঞ্চনাচার্য্য। তিনি বাদীশ্বর উপাধি-ধারী নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

"তত্রাভবদুপাধ্যায়ো নারায়ণ-সমাহ্বয়ঃ.
জিতবাদিসহস্রৌঘঃ প্রাপ বাদীশ্বরাভিধাম্‌॥...
তৎসূনুঃ কাঞ্চনো নাম সমস্তগুণবল্লভঃ।
গোষ্ঠীশালেব বিদ্যানাং যস্য জিহ্বা বিরাজতে॥"

বিরাট নৃপতির গোধন-হরণে প্রবৃত্ত দুর্য্যোধন প্রভৃতির অর্জ্জুন-হস্তে পরাজয় বৃত্তান্ত লইয়া ধনঞ্জয়-বিজয় রচিত। ধনঞ্জয়ই এ নাট্যের নায়ক। প্রথমে ধনঞ্জয় ও অমাত্য প্রবেশ করিলেন। নগরের উপকণ্ঠ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনিবার জন্য বিরাট-পুত্রকে পাঠান হইয়াছে—বিরাট-পুত্র সারথি হইতে স্বীকৃত। যুদ্ধ-সম্ভাবনায় অর্জ্জুন অতিশয় উৎসাহিত। এই সময় বিরাট-পুত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিল, অর্জ্জুন সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ করিলেন। অর্জ্জুনের আদেশে অমাত্য উদ্বিগ্ন পৌরজন-গণকে আশ্বস্ত করিতে গেলেন, অর্জ্জুনের রথ বেগে কৌরবদের অভিমুখে ধাবিত হইল। কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, দুর্য্যোধন সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন, দ্রোণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া উত্তরকে তাঁহাদের পরিচয় দিলেন এবং দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণকে চিনাইলেন।

এই সময় বিদ্যাধর ও প্রতীহারীর সহিত ইন্দ্রদেব প্রবেশ করিলেন। ইহাদের কথোপ-কথনেই অর্জ্জুনের সহিত কৌরবদের তুমুল যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। রথারোহণে দুর্য্যোধন প্রবেশ করিলে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। পরে উভয়ে যুদ্ধার্থ সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার জন্য রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্র, প্রতিহারী ও বিদ্যাধর তখন যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরে কুরুসৈন্য বিচঞ্চল ও ক্ষত-বিক্ষত হইল। রাক্ষস, পিশাচ, যোগিনীরা সানন্দে রণক্ষেত্রে রক্ত পান করিতে লাগিল। ভীম অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলে অর্জ্জুন বরুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। কর্ণ ভুজঙ্গাস্ত্র প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দ্রোণ বারণ-বাণ প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন সিংহ-বাণে তাহাতে বাধা দিলেন। ভীমের অশ্ব ও দ্রোণের সারথি নিহত হইল—কর্ণের রথ ভগ্ন, কৃপ সংজ্ঞাহীন, অশ্বত্থামার ধনুঃ ছিন্ন। কুরুসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের রত্নমুকুট বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন; পরে প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রে কুরুদের সকলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন তখন এক ভীষ্ম ব্যতীত অপর সকলের বসন অপহরণ করিলেন ও উত্তরকে অক্ষত শরীর দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর রথারোহণে বিরাট-রাজের রাজধানী-অভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনের বিজয় দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন ও উত্তর যাইতেছেন এমন সময় যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও সপরিবারে বিরাটরাজ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পরস্পরকে অভিনন্দন করিলেন। বিরাটরাজ অর্জ্জুনকে

বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীর অবমাননার শোধ লইলে।" ভীম বলিলেন, "তার প্রতিশোধ আমি লইব।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি সৌগন্ধিক বনের (৭) [ কমল বনের ] লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছ। হেলায় হিড়িম্বকে বধ করিয়াছ। তোমার বিক্রম কে রোধ করিবে ?" পরস্পর সম্বর্দ্ধনার পর নাট্য শেষ হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "ব্যায়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর অন্য সকল রচনাই বিলুপ্ত কিম্বা দুষ্প্রাপ্য ; কেবল এই ব্যায়োগখানি ( ধনঞ্জয়-বিজয় ) এখনও পর্য্যন্ত কালকবলে পতিত হয় নাই।" ভাসের মধ্যম ব্যায়োগ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। "সৌগন্ধিকাহরণ"ও সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর চোখে পড়ে নাই। এই তিনখানি নাট্য স্পষ্টতঃই ব্যায়োগ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই তিনখানি ছাড়া লক্ষণ দেখিয়া অন্য কোনও নাট্যকে ব্যায়োগ বলা যায় কি না তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।

যে তিনখানি ব্যায়োগের আমরা আলোচনা করিলাম, বীররস তাহাদের সকল গুলিরই অঙ্গীভূত। সৌগন্ধিকাহরণে বীর-রস ব্যতীত অদ্ভুত রসও আছে। হনূমানের শাখামৃগ রূপধারণ, উজ্জ্বল বিদ্যার আবির্ভাব প্রভৃতি অদ্ভুত রসের উদ্রেক করে। তিনখানির মধ্যে দুইখানিতে ধীরোদ্ধত নায়ক ভীম ও একখানিতে ধনঞ্জয়। পুষ্পাহরণের জন্য সৌগন্ধিকাহরণে, ব্রাহ্মণের পুত্র-রক্ষার জন্য মধ্যম ব্যায়োগে ও গোধন-উদ্ধারের জন্য ধনঞ্জয়-বিজয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণিত, ইহাদের মধ্যে একটি যুদ্ধও স্ত্রী-নিমিত্ত নহে। সৌগন্ধিকাহরণে একমাত্র স্ত্রী-চরিত্র দ্রৌপদী এবং মধ্যম ব্যায়োগে কেশবদাসের পত্নী ও হিড়িম্বা। ধনঞ্জয়-বিজয়ে স্ত্রীচরিত্র আদৌ নাই। একদিকে যেমন এই স্ত্রীচরিত্রের অল্পতা, অন্যদিকে তেমনি পুরুষ-চরিত্রের বাহুল্য সবগুলিতেই লক্ষিত হয়। সৌগন্ধিকাহরণে ভীম, হনূমান, কুবের, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ; মধ্যম ব্যায়োগে কেশবদাস, কেশব দাসের তিন পুত্র, ঘটোৎকচ ও ভীম ; ধনঞ্জয়-বিজয়ে অর্জ্জুন, উত্তর, ইন্দ্র, বিদ্যাধর, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাটরাজ প্রভৃতি চরিত্র বিদ্যমান। শৃঙ্গার, শান্ত বা হাস্যরস কোনটিতেই নাই। নৃত্য-গীত-বাহুল্য, নারীগণের হাবভাব-বিলাসযুক্ত কৈশিকীবৃত্তিও কোথাও প্রযুক্ত হয় নাই। একাঙ্কেই নাট্যগুলি সমাপ্ত। একটি মূল ঘটনাই ঈষদ্বিকশিত হইয়া উপসংহৃত হইয়াছে ; অন্যান্য ঘটনা-পরম্পরার দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং গর্ভ ও বিমর্শ-সন্ধির প্রয়োগ কোনখানিতেই দেখা যায় না।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নাট্যগুলিতে বিশ্বনাথ নির্দ্দিষ্ট ব্যায়োগের লক্ষণ বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র নাট্য অল্প পরিসরের মধ্যে

(৭) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদে "সৌগন্ধিকরণ শ্রী" এইরূপ আছে। ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ ; 'সৌগন্ধিকবনশ্রী' হইবে। মূল শ্লোকটি এই :—

"লীলোন্মূলিতকৌবেরসৌগন্ধিকবনশ্রিয়ঃ।
লীলাহতহিড়িম্বস্য বিক্রমং তে রুণদ্ধি কঃ॥"

এক একটি ঘটনা সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মধ্যম ব্যায়োগে ঘটনাটি বর্ণনা-বাহুল্যে বা কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টায় ভারাক্রান্ত হয় নাই। প্রাচীন কবি ভাসের সময়ে এরূপ বাহুল্য ও প্রয়াস ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সৌগন্ধিকাহরণ ও ধনঞ্জয়-বিজয়ে বাহুল্য-বর্ণনা ও কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকত্ব হিসাবেও মধ্যম ব্যায়োগের স্থান অপর ব্যায়োগ দুইখানির উপরে।

ব্যায়োগের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া রচিত নাট্যের উদাহরণ অন্য দেশের নাট্য সাহিত্যে বিরল। প্রহসন প্রভৃতি ও নৃত্য-গীতপূর্ণ অপেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। আর এ-শ্রেণীর নাট্য সংস্কৃত-সাহিত্যেও আছে। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্র নাট্যগুলি নাট্যানুরাগীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। আজকাল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ অভিনয়-স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই শ্রেণীর নাট্য তাহাদের অভিনয়ের সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এ গুলিতে আদিরসের প্রসঙ্গ আদৌ নাই; স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অতি অল্প, কোথাও বা একেবারেই নাই। বৃহদাকার নাটক অপেক্ষা এ-গুলির অভিনয়-শিক্ষা বা সাজ-সজ্জাদি-সংগ্রহও অতি অল্প আয়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিবে। সংস্কৃত নাট্য যাঁহারা অভিনয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

---

# নীলপাখী

## দ্বিতীয় অঙ্ক

| | | |
|---|---|---|
| তিলতিল—ভাই | কুকুর | |
| মিতিল—বোন | জল | |
| বেরীলুন—পরী | রুটী | |
| আলো | ঠাকুর্দ্দা | মৃত |
| বিড়াল | ঠাকুমা | মৃত |
| চিনি | তিলতিলের | মৃত |
| আগুন | ভাইবোন | মৃত |

### প্রথম দৃশ্য

### পরীর গৃহে

পরী। বেরীলুনের শ্বেতমর্ম্মর-রচিত সুদীর্ঘ সুসজ্জিত গৃহ। গৃহের উচ্চ ছাদ, থাম এবং দেওয়াল স্বর্ণ রৌপ্য-খচিত এবং চাকচিক্যময়।

বিড়াল, আগুন এবং চিনি খুব জমকালো পোষাক পরিয়া একটী উজ্জ্বল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিড়াল রঙচঙে পোষাক পরিয়া এক জোড়া বুটজুতা পায়ে দিয়াছিল। আগুন রঙিন জামা গায়ে দিয়া তাহার উপর একটা সিঁদুরে রঙের আল্‌খাল্লা পরিয়াছিল। চিনি একটা চমৎকার রেশমি পোষাক পরিয়াছিল।

বিড়াল। এইদিকে। আমি এ বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি সব জানি। দেড়ে-দাদা এই বাড়ীটা বেরীলুন্‌কে দিয়ে গেছেন···সে অনেক কথা...পরীর ছোট মেয়েটীর সঙ্গে তিলতিল আলাপ কচ্ছে, আমরাও ততক্ষণ একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে নি, এস।...দাসত্বের ফাঁসি গলায় পরতে আর বড় দেরি নেই...

দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। কি ভয়ানক অবস্থায় আমরা পড়েছি তা বুঝতে পারছ কি?…এখানে আমরা সকলেই রয়েছি ত?

চিনি। সাবধান!… টাইলো পোষাকের ঘর থেকে বেরুচ্ছে।

আগুন। সংসারে ওর থাকবার দরকার কি?

বিড়াল। একটা পদাতিকের পোষাক পরেছে দেখ্ছি…ঠিকই হয়েছে…খোসামুদে চাকর ছাড়া ও আর বেশী কিছুই নয়।… আমরা থামের আড়ালে লুকোই, এস ওকে ভারি অবিশ্বাস করি আমি,… যে সব কথা তোমাদের বলব, তা ওর না শোনাই ভাল।

চিনি। এখন আর লুকোনো মিছে… ও আমাদের দেখতে পেয়েছে…ঐ দেখ, পোষাকের ঘর থেকে জলও বেরিয়ে আসছে। আহাহা, কি চমৎকারই মানিয়েছে!

কুকুর এবং জল আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল।

কুকুর। (আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে) দেখ, দেখ, আমি কি সুন্দর পোষাক পরেছি!…এর ফিতেগুলির কি বাহার!… আর সোনালি কাগজগুলিই বা কি সুন্দর! …এ সব সোনা, খাঁটি সোনা!

বিড়াল। তা বেশ; কিন্তু এ সব বাজে কথার চেয়ে আমাদের ঢের দরকারি কথা আছে…রুটী কোথায় গেল?… তার জন্যই অপেক্ষা করছি যে…কোথায় সে?

কুকুর। এখনও সে পোষাকের ঘরে… তার রকম যদি দেখতে!…কোন্ পোষাকটা পরবে, তা ঠিক করতে পারছে না।

আগুন। ঠিক হয়েছে; যেমন তার চেহারাখানি!…প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, দেখলেই মনে হয়, নিরেট আহাম্মক!

কুকুর। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর একটা মুসলমানি পোষাক তার পছন্দ হল…পোষাকটী কিন্তু বেশ দামী, মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো। একটা পাগড়ী আর একখানা তলোয়ারও সে পছন্দ করেছে…

বিড়াল। ওই যে সে আসছে!…এ ত দেখ্ছি দেড়ে-দাদার ভাল পোষাকটীই সে পরেছে…

সুসজ্জিত হইয়া রুটী প্রবেশ করিল। একটা রেশমি গাউন তাহার বৃহৎ উদরের উপর ঝুলিতেছিল; মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী; এক হাতে তলোয়ার, অপর হাতে নীলপাখীর জন্য সেই খাঁচা।

রুটী। (সদম্ভে পদক্ষেপ করিতে করিতে) কেমন?…এবার আমায় কি রকম দেখাচ্ছে?

কুকুর। (রুটীর চারিদিকে লাফাইতে লাফাইতে) আহা, চমৎকার! যেন নিরেট বোকা! সুন্দর! বা রে বোকা!

বিড়াল। তিলতিল আর মিতিলের পোষাক পরা হয়েছে?

রুটী। হাঁ। তিলতিল পরেছে নীল কোট আর লাল পা-জামা। মিতিল পরেছে ভারি চমৎকার একটী ঘাগ্‌রা। কিন্তু যত মুস্কিল আমাদের এই আলো-ঠাকরুণকে নিয়ে…

বিড়াল। কেন?

রুটী। পরী-ঠাকরুণ তাকে এতই

সুন্দর দেখলেন যে কোন পোষাকই তাকে পরিয়ে তাঁর পছন্দ হয় না। আমি দেখলুম, মস্ত বিপদ। আমি তখন তাঁকে বল্লুম যে আলো যদি কিছু না পরে, তাহলে কিন্তু তাকে নিয়ে আমি একসঙ্গে দেখা দিতে পারব না...

আগুন। তাকে একটা ঢাকনি পরিয়ে দিতে হয়!

বিড়াল। পরী তাতে কি বল্লেন?

রুটী। আমার কথায় ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে আমার পেটে দু-ঘা ছড়ি বসিয়ে দিলেন।

বিড়াল। তার পর?

রুটী। আমি চুপ্ করে গেলুম। কিন্তু শেষকালে আলোর মনে কি হল, সে জ্যোছ্‌নার পোষাক পরতে রাজী হল।

বিড়াল। থাক্; ও কথায় কাজ নেই ...আমাদের শীগ্‌গির একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে···কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ বড় সুবিধের নয়...তোমরা শুনেছ, পরী বলেছেন যে রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রাণ শেষ হয়ে যাবে...তা হলে এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, খুব দেরি করা, আর যে কোন উপায়ে হোক্ রাস্তাটাকে বাড়ানো।··· আমাদের নিজেদের জাতের স্বার্থ দেখতে হবে ত!...কিন্তু তাতে ছেলে-মেয়ে-দুটীর অদৃষ্টে কি ঘটবে, সেটাও ভাবা চাই।

রুটী। হাঁ, হাঁ; শোন, শোন, বেড়াল-মশাই ন্যায্য কথাই বলেছেন!

বিড়াল। থাম, ব্যস্ত হয়ো না!··· আমাদের যে আত্মা আছে অর্থাৎ আমরা জানোয়ার আর জিনিষ-পত্তর হলেও যে কথা কইতে পারি, আমাদের বোধ-শোধ আছে, মানুষ এখনও তা টের পায়-নি। আর টের পায়-নি বলেই এখনও আমাদের একটু-আধটু স্বাধীনতা তবু আছে। কিন্তু, যে দিন সে নীলপাখীর সন্ধান পাবে, সেদিন সমস্তই জানতে পারবে; আর আমাদেরও চিরকালের জন্য তাদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে।··· এ কথা আমি এতদিন জানতুম না। আমার প্রিয় বন্ধু রাত্রি, জীবন-রহস্যের সে একজন প্রহরী কি না, সে-ই আমাকে একটু-আগে এ সব বাত্‌লে দিলে। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, নীলপাখীর সন্ধানে সাধ্যমত বাধা দেওয়া; এতে যদি তিল-তিল আর মিতিলের প্রাণ যায়, তবে তাতেও আমাদের হঠলে চলবে না।

কুকুর। (সক্রোধে)। কি!...বলছিস্ কি তুই!···আবার বল্ ত শুনি...বল্ না... চুপ করে গেলি কেন? বল্, বল্!

রুটী। চুপ্, চুপ, চুপ কর। তোমার ত কথা কইবার পালা নয়!···আমি হচ্ছি এই সভার সভাপতি, আমি বারণ করছি, চুপ কর।

আগুন। কারা তোমায় সভাপতি করেছে?

জল। (আগুনের প্রতি) চুপ কর, বলছি!...মিছে কেন বক্ বক্ করছ?

আগুন। আমার যা খুসী তাই বলব, তুমি বাধা দেবার কে?

চিনি। মাপ করবেন মশাইরা...এখন ঝগড়া করবার সময় নয়।...বিষয়টী গুরু-

তর...কি উপায় করা যাবে, সেটা এখনি ঠিক করে ফেলা দরকার।

রুটী। চিনি আর বেড়াল-মশাই যা বল্লেন, আমি তা খুব অনুমোদন করি।

কুকুর। আমি করি না...এ রকম কথাকে বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।...মানুষ যখন আছে, তখন সবই ত আছে!...এর উপর আবার কি চাই?...আমরা তাকে মান্য করে চলব, সে যা বলবে, তাই শুনব—তা হলেই ত সব হল!...আমি ত তাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না!...মানুষই চিরকাল থাকুক। জীবনে মানুষ, মরণে মানুষ, সব রকমে—সব অবস্থায় মানুষ!...মানুষই ভগবান!

রুটী। ঠিক বলেছ তুমি। আমারও এই মত।

বিড়াল। (কুকুরের প্রতি) কিন্তু তোমার এ সব কথার যুক্তি দেখাও।

কুকুর। যুক্তি!...যুক্তি আবার কিসের! আমি মানুষকে ভালবাসি এই-ই যথেষ্ট! ...তোমায় বলে রাখছি টাইলেট্, মানুষের বিরুদ্ধে যদি সামান্য কিছু করতে যাও, তাহলে আগে তোমার টুঁটি টিপে ধরবো, তারপর তখনই গিয়ে তাকে আমি সব বলে দেব।

চিনি। (ধীরভাবে বাধা দিয়া) আমায় মাফ করবেন। এ রকম কটূ-কাটব্য করাটা আমি ঠিক মনে করি না। কোন কোন বিষয়ে আপনারা দুজনেই ঠিক বলছেন। আপনাদের দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

রুটী। চিনি ঠিক বলেছে। দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

বিড়াল। আমরা সকলেই কি অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করছি না?...আমরা সকলেই—জল, আগুন—রুটী, চিনি তোমরাও, টাইলো তুমিও—বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, সকলেই কি আমরা মানুষের ক্রীতদাস হয়ে পড়িনি?...মনে কর দেখি, সেই সময়ের কথা, যখন মানুষের এতখানি দম্ভ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না—তখন আমরা পৃথিবীতে কি রকম অবাধে, স্বেচ্ছামত ঘুরে বেড়াতুম!...আগুন আর জল তখন জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, এখন তাদের দুর্দ্দশা দেখ।...আমাদের অবস্থাটাও ভাবো!... দুর্দ্দান্ত বন্য পশুর বংশধর আমরা, আমাদের ...এই চুপ, চুপ, ওরা আসছে...সাবধান হয়ে যাও...দেখাও যে আমরা কিছুই করছি না...আলো আর পরী এদিকে আসছে, আলো মানুষের সঙ্গ নিয়েছে...আলো হল আমাদের চির-শত্রু।...এই যে ওরা এসে পড়ল।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বেশে পরী এবং পশ্চাতে আলো এবং তিলতিল ও মিতিল প্রবেশ করিল।

পরী। কি হচ্ছে সব?...ওই কোণটীতে বসে তোমরা কি সব গুজ্ গুজ্ করছ?... দেখে মনে হচ্ছে, কোন ফন্দী আঁটছ!... ওঠো সব, এখনই তোমাদের বেরুতে হবে। ...আমি ঠিক করলুম যে আলো তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।...আমায় তোমরা যে-রকম মান্য কর, তাকেও সেই রকম করো। আমি আমার ছড়ি-গাছটী তাকে

দিচ্ছি। তিলতিল-মিতিল আজ সন্ধ্যাবেলায় তাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।...তোমরা পিছনে থেকো।... তারা আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কাটাবে, সেই সময় তোমরা কালকের জন্য সব যোগাড়-যন্ত্র করে নিয়ো, কাল অনেক পথ হাঁটতে হবে। ...এস, আর বসে থেকো না, এখন যে যার কাজে তৎপর হও।

বিড়াল। (ভণ্ডামির সহিত) মা-ঠাকরুণ, ঠিক এই কথাটাই আমি এদের এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম।...নিজেদের প্রত্যেক কাজটী বেশ বিবেচনা-মত নির্ভয়ে করে যাবার জন্য এদের আমি উৎসাহ দিচ্ছিলুম; কিন্তু আপশোষ এই যে কুকুর কেবল আমার কথায় বাধা দিচ্ছিল, আর...

বিড়ালের ঘাড়ে কুকুর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তিলতিল পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ধমক দিয়া নিবৃত্ত করিল।

কুকুর। কি? কি বলছিস্ তুই?... আচ্ছা,...

তিলতিল। খবরদার টাইলো!...ধরলে আর রক্ষে রাখবো না!

কুকুর। তুমি জান না; ও নিজেই...

তিলতিল। (ধমক দিয়া) চুপ, কোন কথা শুনতে চাই না।

পরী। ব্যস্, হয়েছে।...তিলতিল, আজকের মত তুমি খাঁচাটা রুটীর কাছ থেকে নাও। অতীতের মধ্যে অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দ্দার ওখানে হয়ত নীলপাখীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।.. সেখানে যখন যেতেই হল, তখন হুঁসিয়ার থাকা ভাল।...আচ্ছা, আমরা সব এই দিকে যাব এবার।... (তিলতিলের প্রতি) তোমরা ওই দিক দিয়ে যাও।

তিলতিল। (উদ্বিগ্নভাবে) আমরা দুটী ভাই-বোনেই শুধু যাব তাহলে?

মিতিল। আমার খিদে পেয়েছে।

তিলতিল। আমারও পেয়েছে।

রুটী তলোয়ার বাহির করিয়া নিজ পাকস্থলী হইতে দুইটা টুক্‌রা কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে প্রদান করিল।

চিনি। (অগ্রসর হইয়া) আমিও এই সঙ্গে চিনির দু-এক টুকরো তোমাদের দিচ্ছি।

সে তৎক্ষণাৎ নিজ বামহস্তের পাঁচটী আঙ্গুল কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে উপহার প্রদান করিল।

মিতিল। দেখ, দেখ, কি করলে! ও নিজের সব আঙ্গুলগুলো কেটে ফেল্লে!

চিনি। খেয়ে দেখ, ভারী চমৎকার।... এগুলি খাঁটি চিনির তৈরী।

মিতিল। (একটী খাইয়া) সত্যি, বড্ড চমৎকার!...এ রকম কি তোমার অনেক আছে?

চিনি। (নম্রভাবে) আছে। আমি যত ইচ্ছে পেতে পারি।

মিতিল। যখন কেটে ফেলো, তখন কি তোমার বড্ড লাগে?

চিনি। একটুও না; কেটে ফেল্লে বরং লাভ আছে; তখনি আবার নতুন আঙ্গুল গজিয়ে ওঠে; এতে আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার নতুন আঙ্গুল পাই।

পরী। বেশী খেয়ো না।...মনে থাকে

যেন তোমাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যা বেলায় খেতে হবে।

তিলতিল। তাঁরা কি এখানেই আছেন?

পরী। এখনি তাঁদের দেখবে।

তিলতিল। তাঁরা ত মরে গেছেন, তবে তাঁদের দেখব কি করে?

পরী। তোমাদের স্মৃতির মধ্যে যখন তাঁরা রয়েছেন, তখন মরতে পারেন না। মানুষের জ্ঞান এত অল্প যে এই রহস্যটুকু তারা বোঝে না। যাই হোক্, হীরেটুকুর গুণে তোমরা দেখবে যে তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, যাঁদের কথা তোমাদের মনে আছে, তাঁরা সবাই তোমাদেরই মত সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছেন।

তিলতিল। আলো কি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

পরী। না, তোমরা কেবল দুজনেই যাবে।...অচেনা কারও সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। আমিও এখানে থাকব। তোমাদের দুজনকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা যেতে বলেন নি।

তিলতিল। কোন্ দিকে আমরা যাব?

পরী। এই দিকে!...তোমরা এখন স্মৃতির দেশের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছ।···হীরেটা ঘুরিয়ে দিলেই সামনে দেখবে, একটা মস্ত গাছ, তাতে একখানা তক্তা ঝুলানো রয়েছে।···সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে তোমরা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছ; কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে ন' টার আগে তোমাদের দুজনকেই ফিরতে হবে।...যদি ঠিক সময়ে ফিরতে না পার, যদি একটু দেরী হয়ে যায়, তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে।...ন' টার আগে ফেরা চাই, বুঝলে,—এ কথা যেন ভুলো না।.. আচ্ছা, এখন তবে এসো।···(বিড়াল, কুকুর, আলো প্রভৃতিকে ডাকিয়া লইয়া) তোমরা সব আমার সঙ্গে এস... ওরা ওদিকে যাবে।···

আলো ও জানোয়ার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরী ডান দিকে চলিয়া গেল; তিলতিল ও মিতিল ডান দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## স্মৃতির দেশ

ঘন কুজঝটিকায় স্থানটী আচ্ছন্ন। সম্মুখে এক সুবৃহৎ গাছ, তাহাতে একখানি তক্তা ঝুলানো রহিয়াছে। ক্ষীণ, শুভ্র আলোকচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। তিলতিল ও মিতিল বৃক্ষতলে দণ্ডয়মান।

তিলতিল। এই সেই গাছ।

মিতিল। ঐ যে তক্তা ঝুলোনো রয়েছে।

তিলতিল। কি লেখা আছে—পড়া যাচ্ছে না; থাম, গাছে উঠি ..এইবার হয়েছে; লেখা আছে, "স্মৃতির দেশ"।

মিতিল। ঠাকুমা আর ঠাকুর্দ্দা কোথায়?

তিলতিল। ঐ পিছনে, যেখানে কুয়াশা নেই; এখনি দেখতে পাব।

মিতিল। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।...উহুহু কি শীত! আমি আর হাঁটতে পারবো না, বাড়ী ফিরে যাই।

তিলতিল। থাম। কচিখুকীর মত প্যান্ প্যান্ করে কান্না ভাল দেখায় না।...এত বড় ধাড়ী মেয়ে, লজ্জাও করে না কাঁদতে?...ওই দেখ, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে; পিছনে কি আছে, এখনি দেখতে পাব।

কুজ্ঝটিকা নড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে পাতলা ও হালকা হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল; আলো ক্রমশ স্বচ্ছ তীব্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, এবং অদূরে মনোরম লতাকুঞ্জের মধ্যে একটী সুদৃশ্য কুটীর দেখা গেল। কুটীরের দরজা এবং জানালা খোলা ছিল। জানালার পার্শ্বে পুষ্পাধার সজ্জিত ছিল, দেওয়ালের গায়ে একটী মধুচক্রে মক্ষিকার দল গুন্ গুন্ করিতেছিল। খাঁচার মধ্যে একটী কালো রঙের পাখী ঘুমাইতেছিল। দরজার পাশে একখানি চৌকির উপর একটী বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার পত্নী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ইহারাই তিলতিলের পিতামহ ও পিতামহী।

তিলতিল। (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে চিনিতে পারিয়া) ওই যে ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমা।

মিতিল। (আনন্দে করতালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, ওই যে তাঁরা, ওই যে!

তিলতিল। (এখনও তাহার সন্দেহ দূর হয় নাই) থামো, ব্যস্ত হয়ো না। এখনও ঠিক বলা যায় না, তাঁরা নড়তে পারেন কি না! আমরা গাছের নীচে দাঁড়াই এস।

ঠাকুমা চোখ চাহিলেন, মাথা তুলিলেন, অবশেষে উঠিয়া বসিলেন; একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধও ধীরে ধীরে জাগিয়া বসিলেন।

ঠাকুমা। আমার নাতি-নাত্নি যারা বেঁচে আছে,—আমার কেমন মনে হচ্ছে,—আজ তারা আমাদের দেখতে আসবে।

ঠাকুর্দ্দা। তারা আমাদের কথা ভাবছে বৈকি; কারণ আমার পায়ের তলা চুলকুচ্ছে।

ঠাকুমা। আমার মনে হয়, তারা খুব কাছেই আছে; কেননা, আনন্দে আমার চোখে জল ভরে উঠছে।

ঠাকুর্দ্দা। না, না; তারা এখনও অনেক দূরে রয়েছে।...আমি এখনও কাহিল বোধ করছি!

ঠাকুমা। কখ্খনো না।...আমি বলছি, তারা খুব কাছে আছে; আমার বেশ আমোদ হচ্ছে।

তিলতিল ও মিতিল। (বৃক্ষের পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) এই যে আমরা এসেছি, এই যে—ঠাকুর্দ্দা, অ ঠাকুমা, আমরা এসেছি গো, এসেছি!

ঠাকুর্দ্দা। দেখেছ গিন্নি, ঠিক বলেছি কি না, যে, আজ আমার নাতি-নাতনি নিশ্চয় আসবে।

ঠাকুমা। তিলতিল? মিতিল? এস ভাই, এস দিদি। (উঠিয়া তাহাদের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিয়া) দেখ, আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না, এখনও সেই বাতে ভুগ্‌চি।

ঠাকুর্দ্দা। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করিয়া) আমারও সেই দশা।...কাঠের পা নিয়ে আমিও তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। সেই যে গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে কাঠের পা পরেছিলুম, সে পা এখনও তেমনি আছে।

ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা এবং নাতি-নাতনি পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

ঠাকুমা। তিলতিল, বা ভাই, তুমি ত বেশ বড়-সড়টী হয়েছ!

ঠাকুর্দ্দা। (মিতিলের চুল ধরিয়া টানিয়া)

আর মিতিল ?...মিতিলের দিকে চেয়ে দেখ, দিদির চুলগুলি কি চমৎকার হয়েছে! চোখদুটীও ভারী সুন্দর!

ঠাকুমা। এস, কোলে এস, একটা চুমো দাও।

ঠাকুর্দ্দা। আর আমায়—

ঠাকুমা। তুমি একটু থামোনা!... আমার কাছে আগে এস।...তোমাদের বাবা আর মা ভাল আছে?

তিলতিল। বেশ ভাল আছে ঠাকুমা। আমরা যখন আসি, তখন তাঁরা ঘুমুচ্ছিলেন।

ঠাকুমা। (ভাল করিয়া দেখিয়া এবং আহ্লাদে তিলতিল-মিতিলকে জড়াইয়া ধরি।) কি সুন্দর তোরা হয়েছিস্। হাঁারে, তোদের এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজ পরিয়ে দিলে কে? মা বুঝি?...তোরা হামেশা কেন এখানে আসিস না? তোদের দেখলে যে কত খুসী হই!...মাসের পর মাস কেটে গেছে, একবারও ত কই আমাদের মনে করিস নি!...এতদিন যে আমরা কাউকে দেখতে পাইনি, ভাই!

তিলতিল। আসতে পারিনি ঠাকুমা; আর আসবই বা কি করে? আজ যে এসেছি, সে কেবল পরীর দয়ায়।

ঠাকুমা। আমরা এই জায়গাটী থেকে কোথাও নড়িনে; কিন্তু দেখা ত কই কারো সঙ্গে হয় না!...কালে-ভদ্রে কেউ হয়ত এসে পড়ে...এই তোরাই এলি কদ্দিন পরে, বল্ দেখি।...সেই এক দিন এসেছিলি, মনে পড়ে?...সেই যে দিন গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজছিল, সে আজ এক বচ্ছরের কথা না?

তিলতিল। সে দিন ত কই আমরা বাড়ীর বার হইনি, ঠাকুমা।...আমাদের দুজনেরই যে সেদিন বড্ড সর্দ্দি লেগেছিল।

ঠাকুমা। বাড়ীর বার হস্নি, কিন্তু সেদিন আমাদের মনে করেছিলি যে ভাই।

তিলতিল। হাঁা, তা মনে করেছিলুম বটে।

ঠাকুমা। তা হলেই হল। যতবার তোরা আমাদের কথা ভাবিস্ ততবারই আমরা জেগে উঠি আর তোদের দেখতে পাই।

তিলতিল। তোমরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে থাক?

ঠাকুর্দ্দা। হাঁা, ভাই ঘুমটা আমাদের বড্ড বেশী বটে; কিন্তু যাদের প্রাণ আছে, তারা আমাদের মনে কল্লেই আমরা জেগে উঠি।.. প্রাণ শেষ হয়ে গেলে ঘুমটাই সব চেয়ে ভাল লাগে কি না! তবে মাঝে মাঝে জেগে থাকাও বেশ।

তিলতিল। তা হলে তোমরা সত্যি মরনি?

ঠাকুর্দ্দা। অ্যাঁ, কি বল্লি?...ও গিন্নি, এরা আবার ও সব কি বলছে?...এর মানে কি?...এমন একটা কথা বল্লে, যা আগে কখনও শুনিনি।

তিলতিল। সে কি? "মরণ" কথা শোন নি?

ঠাকুর্দ্দা। হাঁা, হ্যাঁ, ঐ কথাই বটে! তা ও কথাটার মানে কি ভাই?

তিলতিল। এর মানে যে যখন দেহে আর প্রাণ থাকে না।

ঠাকুর্দ্দা। তোমরা দেখছি, নেহাৎ

আহাম্মক। ও একটা কথাই নয়!... নাঃ, কিচ্ছুই বোঝ না...ভারী আহাম্মক!

তিলতিল। (বিস্মিতভাবে ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমাকে দেখিতে লাগিল) ঠাকুর্দ্দা, তুমি ঠিক তেমনিটিই আছ; একটুও বদলাও নি—একটুও না; ঠাকুমা, তুমিও সেই আছ। তোমাদের চেহারায় বরং আরো জলুস্ হয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা। হ্যাঁ, আমরা বেশ ভালই আছি···আমাদের বয়স আর বাড়বে না, আমরা আর বুড়োও হব না; কিন্তু তুমি যে মস্ত ঢেঙা হয়ে উঠেছ, ভাই।

তিলতিল। (কৌতূহলের সহিত চারিদিকে চাহিয়া) কিছুই বদলায় নি ত, বাঃ! যে যেমন ছিল, সে ঠিক তেমনিটীই আছে; কেবল আগেকার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে।

মিতিল। তিলতিল, দেখ, ওই সেই বুড়ো কালো পাখীটা!···বাহবা! ও কি এখনও গান করতে পারে?

কালো পাখীটি জাগিয়া উঠিয়া উচ্চ স্বরে গান ধরিয়া দিল।

ঠাকুমা। দেখলে ত!···ওর কথা মনে করেছ কি ও অমনি জেগে বসেছে!

তিলতিল। (পাখীটিকে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, সেটি একেবারে নীলরঙের) এ ত দেখছি একেবারে নীল। বা রে! এই পাখীটাই ত আমরা চাই, এইটীই ত পরীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এত খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এটা এখানে রয়েছে, তোমরা আমাদের বলনি? বেশ পাখী, আগাগোড়াই নীল, কি চমৎকার! (আব্দারের সুরে) ও ঠাকুমা, ঠাকুর্দ্দা, এটী আমায় দেবে?

ঠাকুর্দ্দা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। কি বল গো গিন্নি?

ঠাকুমা। অবিশ্যি! এ আর বেশী কথা কি? ওটা রেখেই বা আর কি হবে? কেবলি ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়; গান করতে ত একদিনও শুনলুম না।

তিলতিল। আমি ওকে আমার খাঁচায় পূরে নিয়ে যাব...আচ্ছা, সে খাঁচাটা কোথায়?···ও, মনে পড়েছে, গাছতলায় রেখে এসেছি...দাঁড়াও, নিয়ে আসি। (সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া খাঁচা লইয়া আসিল এবং তাহার ভিতর পাখীটিকে বন্ধ করিল) তা হলে ঠাকুমা, সত্যি এটা আমায় দিলে ত? আলো আর পরী দুজনে দেখে কত খুসীই যে হবে এখন!

ঠাকুর্দ্দা। বেশ, নিয়ে যাও; কিন্তু এর বিষয় কিছু বলতে চাই না; তবে আমার ভয় হয়, সে দেশে গিয়ে ও বেশী দিন টিঁকতে পারবে না। বসন্তের হাওয়া এই দিক পানে বইবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ফিরে আসবে।

তিলতিল। আচ্ছা, আমার ছোট বোনগুলি কোথায়? তারাও কি এখানে আছে?

মিতিল। আর ছোট ভাইগুলি?

কুটীরের ভিতর হইতে সাতটী ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।

ঠাকুমা। এই যে তারা, এই যে! মনে করতে না করতেই বাছারা সব এসে হাজির হয়েছে!

তিলতিল ও মিতিল ছুটিয়া গিয়া তাহাদের জড়াইয়া ধরিল এবং হাত ধরাধরি করিয়া আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ-কলরবে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

তিলতিল। কিরে পীরোট, কেমন আছিস?...আগে যেমন আমরা লড়ালড়ি করতুম, তেমনি করি, আয়। ও রবার্ট, ও জিন্, তোদের পুতুল কোথায় রে? ও পলিন, ও রিকেট্!

মিতিল। এই যে পিরীট, এই যে মাদ্‌লিন।...ও খুকী, তুই যে এখনও হামা টানছিস্?

ঠাকুমা। ও অমনিটিই থাকবে, আর ত বাড়বে না।

তিলতিল। পলিনের নাকের উপর এখনও সেই মাংসর ঢিবিটা রয়েছে!

ঠাকুমা। ওটা অমনিই থাকবে, সারবে না।

তিলতিল। এরা সব কেমন মোটা-সোটা, কেমন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়েছে! ...গালগুলি কেমন লাল টুকটুকে!... ঠাকুমা, এরা বোধ হয় ভাল খেতে-দেতে পায়, না?

ঠাকুমা। যেদিন থেকে ওরা এখানে এসেছে, সেদিন থেকে সব খুব ভালই আছে। শরীরে অসুখ নেই, কিছুরই ভয় নেই, কোন রকম ভাবনা নেই...

কুটীরের মধ্যে বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।

ঠাকুমা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ও কিসের আওয়াজ?

ঠাকুর্দ্দা। তাইত!...ওটা ঘড়ি না?

ঠাকুমা। হতেই পারে না; এদ্দিন ত কই বাজে নি!

ঠাকুর্দ্দা। তা বাজবে কেন! আমরা কখনও সময়ের কথা যে মনেও করি নি।... আচ্ছা, তোমরা কি কেউ এখন সময়ের কথা মনে কচ্ছিলে?

তিলতিল। হ্যাঁ, আমি মনে কচ্ছিলুম। এখন সময় কত ঠাকুর্দ্দা?

ঠাকুর্দ্দা। কি জানি! আমার কোন ধারণা নেই। আটবার ওটা বাজলো; তাইতে মনে হচ্ছে এই সময়টাকে তোমরা আট-টা বল।

তিলতিল। আলো আর পরী আমার জন্যে বসে রয়েছে; ন'টার আগে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হতে হবে, বড় জরুরি কাজ আছে।...আমি তবে এখন চল্লুম!

ঠাকুমা। থাম্, থাম্, পাগলা! অমন করে কি চলে যেতে আছে!...খাবার তৈরি, খেয়ে যা। চল, সব বাইরে গিয়ে খেতে বসি। খুব চমৎকার কপির ঝোল আর কুলের চাটনি তৈরি আছে।

সকলে ধরাধরি করিয়া টেবিলটা বাহিরে আনিয়া থালা-বাসন, চামচ প্রভৃতি সাজাইতে লাগিল।

তিলতিল। সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, এর ভিতর একদিনও কপির ঝোল খেতে পাই নি। নীলপাখী ত পাওয়া গেল, এখন আমি নিশ্চিন্তি। আজ পেট ভরে কপির ঝোল খাব। কি বল ঠাকুমা?

ঠাকুমা। আচ্ছা, যত পারিস, খা, ভাই। ...বসে যা না রে সব তোরা।...তাড়াতাড়ি যদি যেতে হয় ত আর দেরি করছিস্ কেন?

আলোটা উস্‌কাইয়া দেওয়া হইল। ঝোল পরিবেষণ করা হইল। ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমা নাতি-নাতনিদের লইয়া আহারে বসিলেন। ছেলেরা উল্লাসে চেঁচাইতে লাগিল—খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি ঘুসা-ঘুসি আরম্ভ করিয়া দিল।

তিলতিল। (পেটুকের মত গিলিতে লাগিল) ভারী চমৎকার, ঠাকুমা, ভারী চমৎকার!...আরো খাব, ঠাকুমা, আর-একটু দাও।

চামচ হাতে করিয়া অস্থিরভাবে নাড়িতে লাগিল এবং থালার উপর খুব জোরে ঠুকিতে লাগিল।

ঠাকুর্দ্দা। আরে থাম্, থাম্। অত ব্যস্ত কেন?...তুই যেমন দুষ্ট ছিলি, তেমনিই আছিস, দেখছি। থালাটা ভেঙ্গে ফেলবি না কি?

তিলতিল। (টুলের উপর উঁচু হইয়া) আমায় আরো দাও, আরো, আরো। (ঝোলের থালাটা শুদ্ধ ধরিয়া নিজের দিকে টানিতে লাগিল। আর অমনি গরম ঝোল গড়াইয়া তাহার হাঁটুতে পড়িল। সে যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল)

ঠাকুমা। বেশ হয়েছে; যে-রকম ব্যস্ত-বাগীশ!

ঠাকুর্দ্দা। (তিলতিলের গালে খুব জোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন) কেমন, এবার হয়েছে!

তিলতিল। (প্রথমটা চমকিয়া উঠিল; তারপর গালে হাত বুলাইয়া ভারি খুসী হইয়া) ঠিক এই রকম চড় তুমি মারতে, যখন তুমি বেঁচেছিলে, ঠাকুর্দ্দা। দেখ, আমার ভারি মজা লাগছে।...এর জন্যে তোমায় একটা চুমো দেব।

ঠাকুর্দ্দা। সত্যি না কি! তবে আরও এক ঘা চাস নাকি?

(ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল)

তিলতিল। ওই যাঃ, সাড়ে আটটা বেজে গেল! মিতিল, চল, চল, আর সময় নেই!

ঠাকুমা। একটু থাম্। আর দু-চার মিনিট। কদ্দিন পরে তোরা এলি, অমন তাড়াতাড়ি চলে যাবি!

তিলতিল। না, না, আর থাকতে পারি না। আলো আমাদের জন্যে বসে রয়েছে... আমি তাকে কথা দিয়েছি। মিতিল, এস।

ঠাকুর্দ্দা। হা ভগবান! এরা কাজ-কর্ম্ম নিয়ে কি কষ্টই না ভোগ করে!... একটুও কি এদের সোয়াস্তি নেই?

মিতিল। (খাঁচা হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া) ঠাকুর্দ্দা, তবে চললুম। ঠাকুমা, আসি, ভাই সব, বোনগুলি, এখন তবে চললুম। কিছু মনে করো না। আমার থাকবার যো নেই। কেঁদোনা ঠাকুমা, আমি আবার আসব— এমন থেকে হামেশাই আসব।

ঠাকুমা। হাঁ দিদি, রোজ আসিস্।

তিলতিল। আচ্ছা ঠাকুমা, তাই হবে। যতবার পারি, আসব।

ঠাকুমা। তোরা যে মাঝে মাঝে আমাদের মনে করিস্, এইটুকুতেই আমাদের যা-কিছু সোয়াস্তি!

ঠাকুর্দ্দা। এ ছাড়া আর কোন রকম আমোদ আমাদের নেই।

তিলতিল। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির। আমার খাঁচা কোথায়—পাখী?

ঠাকুর্দা। ( খাঁচাটী তিলতিলের হাতে দিয়া ) এই নাও। কিন্তু আমি বলতে পারলুম না, এর রঙটা ঠিক নীল কি না!

তিলতিল। আমরা তবে চললুম।

ছেলে-মেয়েগুলি সকলে। এসো, মিতিল, এসো, তিলতিল, আমাদের মনে রেখো; আবার এখানে এসো।

তিলতিল ও মিতিল চলিয়া গেল। সকলে তাহাদিগকে রুমাল নাড়িয়া বিদায় দিল। স্থানটী আবার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিল পুনরায় বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিলতিল। এই রাস্তা ত?

মিতিল। হ্যাঁ, আলো কোথায় গেল?

তিলতিল। কি জানি? ( খাঁচার দিকে চাহিয়া ) কি আশ্চর্য্যি! পাখীটা ত নীল রঙের নয়, এ যে মিশ্‌ কালো!

মিতিল। আমার হাত ধর ভাই; বড্ড শীত করছে—আমার ভারী ভয় পাচ্ছে।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

---

# সামাজিক পরিবর্ত্তন

( ক্রপটকিন হইতে )

আমাদের প্রার্থিত এই বিদ্রোহ যদি সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, তবে আগেকার অন্যান্য বিদ্রোহের সঙ্গে এর কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের প্রভেদ হবে না, উপায়েরও যথেষ্ট প্রভেদ থাকবে। নূতন উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে নূতন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

গত একশ' বছরের মধ্যে ফ্রান্সে যে তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে উপায় ও উদ্দেশ্যের নানা-রকম তফাৎ থাকলেও একদিকে যথেষ্ট ঐক্য ছিল। প্রতিবারেই দেশের জন-সাধারণ পুরাণো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্যে লড়াই করে' বুকের রক্ত দিয়েছে এবং কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধের আঘাত-চিহ্ন ধারণ করে সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেছে। প্রতিবারেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত কার্য্যকরী সমিতি ধর্ম্মতন্ত্র আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিতরকার বহুদিনের আবর্জ্জনা দূর করবার চেষ্টায় যে পরিমাণ সময় ও শক্তি ব্যয় করেছে, জন-সাধারণের, যুদ্ধরত কর্ম্মীর অভাব-অভিযোগের দিকে সেই পরিমাণ অমনোযোগী হয়েছে। মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের বিজ্ঞতার ফলে রাষ্ট্রনীতির তর্ক হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু খাদ্যসংস্থানের কথাটা সেই গোলেমালে চাপা পড়ে' গেছে।

সেই বিদ্রোহে, মানবসভ্যতার সেই অরুণোদয়ে এমন-সব বড় কথা এবং মহৎ ভাব জন্মলাভ করেছে, যার জন্যে আজও জগৎময় সাড়া জেগে আছে। এক শতাব্দীর ব্যবধানকে তুচ্ছ করে' সেই-সব কথা এখনও আমাদের প্রাণে নতুন প্রেরণা

এনে দিচ্ছে, কিন্তু সে-সব বড় কথা কর্ম্মীজনের কোন উপকারেই আসে-নি। বিফলমনোরথ হয়ে তারা দুর্গন্ধ ও নোংরা কুটীরে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অনাহারে অসহায় হয়ে মরেছে; কারণ, বড় কথায় মন ভরতে পারে, পেট ভরে না।

বিদ্রোহের সময় কল-কারখানা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন ও বিস্তার বন্ধ হয়ে গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য স্থগিত হল, আর মূলধন ধনীর সিন্দুকের মধ্যে ডালা-চাপা হয়ে রইল। তাতে-করে' খনির মালিক বা কলের মালিকের অবশ্য কোন অভাব হলো না। গরীবের রক্ত শুষে তিনি যা সঞ্চয় করেছেন, তা শুধু উদর-পূর্ত্তি কেন,—বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করবার পক্ষেও যথেষ্ট। কিন্তু অসহায়ে মরলো কর্ম্মী-সম্প্রদায়—অভাবের কষাঘাতে তাদের জীর্ণ প্রাণ ভেঙ্গে পড়ল—দুর্ভিক্ষ করাল মূর্ত্তিতে দেশের বুকে মরণ ছড়িয়ে ফিরতে লাগলো—তেমন বুঝি আর-কখনও হয়-নি।

জনসাধারণ মনে করলে, মধ্যবিত্ত দল তাদের অনাহারে মারছে; অনাহারে যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত কর্ম্মীদল তাদের ফাঁকি দিলে এবং নিজেদের মধ্যে থেকে দল গড়ে' তাদের হাতে কর্ম্মভার তুলে দিলে। কিন্তু জন-সাধারণের অভাব কমাবার কোন চেষ্টাই সফল হল না।

জনসাধারণের মধ্যে অবসাদের লক্ষণ দেখা দিলে। রাজপন্থী দল এবার সুবিধা বুঝে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো; এক-দিকে যেমন কর্ম্মীদের অভাব ও কষ্ট বাড়লো, অন্যদিকে তেমনি ধনীদের সাহসও বাড়তে লাগলো। তারা গুপ্তস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এল; প্রজার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন ও মৃত্যুর মাঝখানে বিত্ত-বিলাসে গর্ব্বিত রাজশক্তির আনন্দকোলাহল আকাশ বিদীর্ণ করে' তুললে। ক্ষিন্নমনে অবসন্ন দেহে বিদ্রোহীদল ব্যর্থকাম হয়ে তাদের কুটীরে ফিরে সুচির দুঃখের অপেক্ষায় বসে' রইল। রাজশক্তির পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার মারামারি কাটাকাটি চল্‌লো—অজস্র রক্তপাতে স্বাধীনতার ভূমি মলিন ও কলঙ্কিত হয়ে উঠলো। কর্ম্মীজনের অভাব কিন্তু কোন-দিনই ঘুচলো না—মাঝ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে অকারণে পৃথিবী থেকে চির-নির্ব্বাসনে চলে গেল। এমনি-করে' বারে বারে বিদ্রোহীদল স্বার্থত্যাগ করে' ও যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েও যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা কাজে লাগাব—আমরা প্রথম থেকেই যথেষ্ট সাবধান হয়ে চলবো। আমাদের বিদ্রোহ আর-কিছু চায় না—সকলের জন্যে পর্য্যাপ্ত আহার পেলেই সে সন্তুষ্ট হবে। রাজশক্তির পরিত্যক্ত গিল্টির সিংহাসন ও শিরোপার উচ্ছিষ্ট দরবারী কায়দা ও বড় কথার তর্ক যারা করতে চায় তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কাজ নেই। বিদ্রোহের আরম্ভ থেকেই আমাদের দেখতে হবে, যাতে দলভুক্ত একজনও অনাহারে না থাকে—দেশের একজন স্ত্রীলোক বা শিশুও অন্নাভাবে কাতর না হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বড় বড় কথা নিয়ে চিরকালই মাথা ঘামায়। কিন্তু সে-সব নিতান্ত অসার কল্পনা বৈ আর

কিছু নয়। সাধারণের যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা সকলের আহার-সংস্থানে ব্যয়িত হবে। আমরা জোর-গলায় প্রচার করব যে, অন্নের অধিকার সকলেরই আছে এবং সকলের পর্য্যাপ্ত অন্নেরও কোনদিন অভাব হবে না। পর্য্যাপ্ত অন্নের স্বচ্ছলতাই আমাদের এই পরিবর্ত্তনের মূলমন্ত্র।

বিদ্রোহীর দলভুক্ত সকলকেই শয়ন, অশন ও বসনের অভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। দৈনিক অভাবের দায় থেকে ছুটি পেলে তারা খুসী মনে কাজে যোগ দিতে পারবে এবং এগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় তবে পরিবর্ত্তনও ঠিক পথে চলবে। কাজেই অন্য তর্ক ও রাজ্য-মীমাংসা ছেড়ে সাধারণের অভাব অভিযোগের কথাই সবার আগে বিচার্য্য। এই অন্নের অধিকার বিচার করতে গেলে সাম্যকে ভিত্তি করতে হবে; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা হাত-ধরাধরি করে'ই চলে—এদের একটিকে ছেড়ে অপরের প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়।

দেশ-জুড়ে যদি এই বিদ্রোহ জাগে, তবে দেশের কল-কারখানা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে হাজার হাজার লোক সপরিবারে কর্ম্মহীন হয়ে অনাহার ভোগ করবে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দেশের সমস্ত ফসল ও খাদ্যসামগ্রী অধিকার, তার হিসাব রাখা ও সেই সঞ্চিত খাদ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকের অভাবানুসারে বিতরণ। কলকারখানার কর্ম্মীদের সঙ্গে চুক্তি করে' তাদের কাজ করবার অবকাশ ও সুবিধা দিতে হবে। তারপর দেশের পতিত জমিতে যাতে সুন্দর আবাদ হয় তার চেষ্টাও করতে হবে। এ-ছাড়া অন্য-কিছু উপায় ত আমরা দেখছি না; এবং দরকার পড়লে কেউ যে এ উপায়-মত কাজ করতে পশ্চাৎপদ হবেন, তাও মনে করি না।

মধ্যবিত্ত দলের ধারণা, কর্ম্মীসম্প্রদায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার যোগানোর মানে, দেশের সর্ব্বনাশ করা; কারণ, সমস্ত শক্তি তাদের হস্তগত হলে তাদের আর বাধা দেবার কোন উপায়ই থাকবে না। জনসাধারণকে যারা একপাল অসভ্য, নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর বলে' মনে করে, তারা হচ্ছে কুসংস্কারের তকমা-আঁটা ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইতিহাসে এ-সব কথার কোন প্রমাণ আমরা পাই-না। কিন্তু উপরওয়ালাদের এ-সব কথা কোনমতেই বোঝানো যাবে না। কারণ, যারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের কোনদিন দেখে-নি, নিজেদের সংস্কারের মোহে কেবল অবজ্ঞাই করেছে, তারা বিশ্বাস করতে পারে না—কতখানি সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়নিষ্ঠার বিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ করে! তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে না মিশলে, তাদের জীবনের সঙ্গে সহানুভূতি না থাকলে বোঝাই যাবে না যে, তাদের প্রাণ কত উদার, কত মহৎ! রোগীর, বৃদ্ধের, শিশুর ও নাচারের জন্যে অতখানি যত্ন ও স্বার্থত্যাগ সভ্য সমাজের আর-কোথায় পাওয়া যাবে না। এই যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান, এ তাদেরই একটি বিশেষ কীর্ত্তি এবং বর্ত্তমানের অন্যায় অত্যাচারের ও অভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই সঙ্ঘের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,—যেখানে সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন। এ

বিপদ থেকে উদ্ধারের আর-কোন উপায় আমরা জানি না।

মধ্যবিত্তদের কথা যদি সত্য হয়, যদি পর্য্যাপ্ত আহারে জনসাধারণের সাহস বেড়ে যায়, তবে তাতে ভাবনার ত কিছু দেখিনা। খাবারের দোকান ও হাটবাজার লুট না করে'ও তারা দেশের খাদ্য একজায়গায় জড়ো করবে—আপনাদের স্বার্থ-চেষ্টায় লোকের অনিষ্ট তারা যে করবে না, এটা সুনিশ্চিত। অধিকার-চ্যুতি এই পরিবর্ত্তনের প্রধান অস্ত্র এবং জনসাধারণই এ-কাজে প্রধান কর্ম্মী। দশকে ঠকিয়ে দেশকে ভুগিয়ে ধনীরা যা সঞ্চয় করেছেন, জনসাধারণ সেই সম্পদ দেশের কাজে ব্যয় করবে। শিক্ষিত লোকেরা সেই-সব আহৃত খাদ্যের তালিকা করবেন এবং সেই তালিকা মুদ্রিত অবস্থায় সকলের মধ্যে বিতরিত হবে। লোকে সহজেই জানবে, দেশে খাদ্য কত, কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি উপায়ে বিতরিত হবে।

নগরের প্রতি বিভাগে, প্রতি রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি গঠিত হবে—তারা প্রত্যেক দলের সঙ্গের যোগ রেখে কাজ করবে। জনসাধারণ যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পায়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই অন্নসংগ্রহ ও বিতরণ কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হবে। আমরা স্বীকার করি যে, হয়ত দিন-পনের বা মাস-খানেক একটু গোলযোগ, একটু কষ্ট হবে; কিন্তু তাতে এসে যায় কি ?—অধীনতা থেকে মুক্তিই সে কষ্ট পূরণ করবে, দশের সুবিধার জন্যে নিজের কষ্টস্বীকার আনন্দ বলে' মনে হবে; বিদ্রোহের সময় বিলাসের আশা কেউ নিশ্চয়ই রাখে না।

কষ্ট হোক বা না হোক, এটা সকলেরই বোঝা উচিত, সভার পর সভায় তর্ক করে' চারটে দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় বাস করে' 'থিওরী'-প্রেমিক যা তৈরি করেন, তার চেয়ে অভাব থেকে যা ব্যবস্থা হয় সেটা শতগুণে ভালো। মধ্যবিত্তদের ছেড়ে জনসাধারণের হাতে কাজের ভার দেবার এটাও একটা বিশেষ কারণ।

খাদ্যসংস্থান থেকে আরম্ভ করে' দৈনিক ব্যবহার্য্য সব জিনিষই সঙ্ঘের অধিকারভুক্ত করতে হবে এবং সেটা যত-শীঘ্র হয় ততই ভালো; কারণ তা হলে দুঃখও কমবে এবং সংঘাতও কমবে। সকলেই যাতে অধিকার পায় এবং সে অধিকার সবায়ের পক্ষে সমান হয় এ ব্যবস্থা করতে হলে সমাজকে কোন প্রতিষ্ঠান-ভুমির উপর দাঁড় করাতে হবে; জোড়াতাড়া দিয়ে কিছু খাড়া করলে তাতে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রায় সব সভ্যদেশে অতি পূর্ব্বকাল থেকে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ সঙ্ঘের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে। সবায়ের অধিকার বজায় রেখে সমাজ-ব্যবস্থা করতে হলে সেই সঙ্ঘকে আমাদের আদর্শ বলে মেনে নিতে হবে এবং দেশ জুড়ে তারই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এককথায় ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই, যে জিনিষ সঙ্ঘের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত, তা সকলেই বিনাবাধায় ইচ্ছা-মত ব্যবহার করতে পারবে এবং যা-কিছু কম বা কম হবার সম্ভাবনা আছে, তা সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে' দেওয়া হবে। নগরে নগরে জল-সরবরাহের যে বন্দোবস্ত আছে, তা এই ব্যবস্থারই একটি অংশ।

আমরা বিশ্বাস করি, এ ব্যবস্থায় সকলেই দরকার-মত জিনিষ-পত্র ব্যবহার করে,—দশের অসুবিধা ঘটিয়ে অপব্যয় করে না। সাধারণ জীবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে যারা খালি 'থিওরী' তৈরি করে' জীবন কাটিয়ে দেয়, তারাই কেবল এ-সমস্তকে অবিশ্বাস করতে পারে।

বিদ্রোহের প্রারম্ভে খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, খাদ্যের অধিকার-লাভ করবে কারা? প্রতি নগরে, বিদ্রোহের প্রতি কেন্দ্রে এ প্রশ্নের সমাধান হবে। যতদিন-না কাজকর্ম্ম ঠিকভাবে চলছে, ততদিন বোঝা যাবে না, কারা যথার্থ কর্ম্মী আর কারাই বা নিষ্কর্ম্মা, সেইজন্যে আহৃত খাদ্য সকলের পক্ষে সমান ভাগ হবে। যারা নতুন দলের বিরুদ্ধে, দাসত্ব যাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গেছে, নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে যে-যার পথে সরে' পড়বে। কিন্তু তারা যাক্ বা থাক, জনসাধারণ তাদের অন্ন সবায়ের সাথে ভাগ করে' নেবে—জেতা-বিজিতের প্রভেদ তারা কোনদিন করে-নি, করবেও না। এই মৈত্রী ও সহানুভূতির ফলে বিদ্রোহের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না—কাজ আরম্ভ হলে, যারা বিরোধী তারাই আবার ভাই বলে' কাছে এসে কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলে দশের কাজে আনন্দে যোগ দেবে। স্বাধীন সমাজে অলসদের কাছ থেকে ভয় পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সবাইকে পেট পূরে খেতে দিলে খাবার যে মাস-খানেকের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে; বেশ ত! ইতিহাসে এই প্রথম সবাই পর্য্যাপ্ত আহারের অধিকার ত আগে পাক্—নূতন খাদ্যসংস্থানের কথা পরে হবে।

কেবল যে এক দেশেই এই বিদ্রোহ জেগে উঠবে, এ পরিবর্ত্তন সাধিত হবে, এমনও ত বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্য, সব দেশ যে একসঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করবে, এমন কোন কথা নেই। তবে এটা বেশ বুঝতে পারি, কোন দেশের এক নগরে এ পরিবর্ত্তন হলে আর পাঁচটা নগর ক্রমে সেই ব্যবস্থায় চলতে পারে এবং ক্রমে সমস্ত দেশটা সেই নূতন ব্যবস্থাকে আদর করে' গ্রহণ করতে পারে। এটা একদিনে, না-হয় একবছরে হবে। যে-সব দেশ শিক্ষায় ও শক্তিতে এগিয়ে গেছে পিছিয়ে-পড়া দেশের সঙ্গে একত্র হওয়ার আশায় তারাও ত আর পিছিয়ে আসতে পারে না; অলসদের পশ্চাদ্বর্ত্তীদের জন্য ইতিহাস কোন দিন অপেক্ষা করে-নি। যারা এগিয়ে চলেছে, তাদের স্বাধীনতা, শান্তি ও শক্তি দেখেই অন্য দেশ তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। অবশ্য সব দেশে যে একই ব্যবস্থা হবে, তাও নয়; লক্ষ্য এক হলেও দেশের অবস্থা-মত ব্যবস্থা হবে।

কোন নগরে বিদ্রোহ আরম্ভ হলে দেশের কর্ম্মীজন কৃষি ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতির উপযোগী যন্ত্র তৈরি করবে। সাধারণের কাজ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী পোষাক তৈরি করবার জন্যেও গতর খাটাতে হবে; অন্য দেশের সঙ্গে পরিবর্ত্ত বন্দোবস্ত না করে' দেশের সকল অভাব দেশের লোকের পরিশ্রমেই মিটবে। সহরে উৎপন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার গ্রামে উৎপন্ন খাদ্য প্রভৃতির সঙ্গে বদলাবদলি করা হবে। চাষা

তার দরকার-মত ফসল রেখে বাকি সব সহরে পাঠিয়ে দেবে; কারণ সে বুঝবে সহরবাসী কর্ম্মী তার ভাই, তার বন্ধু,—জবরদস্ত উপর-ওয়ালা নয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা না হলে কেবল যে অন্নাভাব হবে, তা নয়, বেশীর ভাগ, বিরোধীদল আমাদের ভুলের সুবিধা পেয়ে শক্তিলাভ করবে এবং আমাদের সকল চেষ্টা অবসাদ ও অপমানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বড় বড় সহরে খাদ্যসংগ্রহের জন্যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। পরিবর্ত্তন সাধিত হলে আমরা যথাসম্ভব কম-নির্ভর করবার চেষ্টা করবো।

বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি, গরীবের পরিশ্রমের ফল জোর করে' কেড়ে-নেওয়ার উপর। আমরা এই অত্যাচার বন্ধ করব। গ্রাম উচ্ছন্ন দিয়ে বড় বড় সহরে খাদ্য-সরবরাহও বন্ধ করতে হবে। বিদ্রোহের ফলে অত্যাচার-পীড়িত দেশ এই সম্পদ লাভ করবে যে, সে আর-কারও অধীন থাকবে না। কোন্ দেশে ঠিক কি ব্যবস্থা হবে, তা বলা কঠিন। পরের দাসত্ব করে' সেলাম বাজিয়ে আর মাটি চষে' যারা পিঠের দাঁড়া নুইয়েছে, বিদ্রোহের ফলে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি দুইই পাবে। পরের জন্যে, পরের অধীনে অর্দ্ধাহারে চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা কাজ না করে' যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করবার তার পূর্ণ-অধিকার থাকবে। এতে দেশের ফসল কমবে না। যে-দিন তারা বুঝবে, তারা ধনীর স্ফীতোদর আরও স্ফীত করবার জন্যে খেটে মরছে না—দেশের ও দশের জন্যেই পরিশ্রম করছে সে-দিন দেশের ফসল স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে উঠবে। দেশে দেশে যখন নূতন ভূমি কর্ষণোপযোগী করে' নূতন যন্ত্র-সাহায্যে চাষ হবে, তখন ফসলের অভাব ত হবেই না, বরং সকলের পক্ষে যথেষ্টই হবে।

এটা খুব সত্য কথা যে, অন্যদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হলে প্রথম প্রথম খাদ্য-সংস্থানের পক্ষে বিশেষ গোল হবে। এ গোল মেটাবার একমাত্র উপায়, সহরে যে-সমস্ত লোক আফিস-আদালত প্রভৃতিতে বাজে কাজ করে' পরের পরিশ্রম অপব্যয় করছে,—যারা অন্য দেশের বড়লোকের জন্য ফ্যাসান তৈরি করছে, তারা সবাইকে কাজে লেগে যেতে হবে; তাহলেই দেশে ভূমির অভাব হবে না। উষর ভূমি বলে' কোন স্থান নেই, মানুষের শক্তিই মাটির শক্তি; —বর্ত্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানের এইটে সব-চেয়ে বড় কথা। অবশ্য, কেবল মুখে শক্তির আস্ফালন করলেই চলবে না—হাতেনাতে কাজ না করলে কোন জমিতেই সোনা ফলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির কাজ আরম্ভ হলে, কৃষক-সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পেলে, দেশের জন্যে কাজ-করা উৎসব বলে মনে হবে। এবং শারীরিক স্বাস্থ্যে ও মানসিক স্ফূর্ত্তিতে মানব-জীবন পুষ্পের মত স্বত-বিকশিত হয়ে উঠবে। কৃষি ও শিল্প,—দুয়ের সমাবেশে জীবন-যাত্রা সরল, সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাম্য পরিবর্ত্তনের সব-চেয়ে বড় কথা।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

# দোশালা

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয়; —একখানা জরদ্-কালো-সবুজ-আর-লাল রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি পোরে ষ্টীমারের ফার্ষ্ট-ক্লাসের বেঞ্চিতে এসে যে বসলো তার চেহারাটা মোটেই সেই কাশ্মীরী শালের উপযুক্ত ছিল না;—খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা কিট্‌কিটে ময়লা পাগড়িতে ঢাকা, গালের হাড়দুটো উঁচু আর তারি কোটরে শুক্‌নো আঙুরের রং দুটো বিশ্রী চোখ! অবিনের দস্তুর, নতুন লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক কট্‌মট্ করে না-তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেদিনও বেঞ্চিখানার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসলো। তার পর এ-ঘাট ও-ঘাট সে-ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে জাহাজ লোকে লোকে ভর্ত্তি হতে হতে যখন আমাদের ঘাটে এসে পৌছল, সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন—"আপনার শালখানা এখনি হাওয়ায় উড়ে গঙ্গায় পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।" আমরা দুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম সেই চার-রঙা চারবাগ শালের রুমালটা জাহাজের রেলিং থেকে ঝুল্‌ছে, সে মানুষটা নেই!

শালখানা যার সে নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-হত্যা করেনি। সুতরাং আমরা দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে হাত-ধরাধরি করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসি —"বাবু শাল আপনার।" বলেই তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা গলিয়ে সেই শালখানা অবিনের কোলের উপর ফেলে দিয়ে চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসিকে ডাকতে যাই, অবিন বল্লে—"থাক্‌না, কাল ফিরিয়ে দিলেই চলবে।" বন্ধু-বান্ধবের টুপি ইত্যাদির মতো টুকিটাকি জিনিষ হলে আমার আপত্তি ছিল না; কেননা সেগুলো অবিন প্রায়ই ধার নেয় এবং আজ বাদে কাল, নয়তো পরশু, সুদশুদ্ধ সেগুলো ফিরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করে না; কিন্তু এই শাল-খানা যার সে নিশ্চয়ই অবিনকে সেখানা বখশিস কিম্বা একরাত্রের মতো ভাড়া দেবার মতলবে ষ্টিমার পর্য্যন্ত তাড়া-করে আসেনি সেটা ঠিক; এবং সে যে পুলিশে খবর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়; কাজেই পোর্ট-কমিশনারের হারানো মালের আফিস-ঘরের দিকেই গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ করে অনুরোধ কল্লেম; কিন্তু সব বৃথা! বাঘের থাবা শিকারের উপরে যেমন, তেমনি অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা কোণ সেই যে চেপে রইল আহিরিটোলার বাড়িতে পৌছন পর্য্যন্ত সে মুঠো আর কিছুতে শিথিল হল না। তারপর ঘরে

ঢুকে অবিন যখন সেই শালখানা মেঝের উপরে বিছিয়ে দিলে তখন দেখলেম, কি আশ্চর্য্য সোণা-রূপো-রেশমের তার দিয়েই সেটা বোনা! ষ্টীমারে শালখানার সবটা আমার চোখে পড়েনি, এখন বাতির আলোতে যেন একখানা নন্দন-কানন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদয় হল। এরি উল্টো পিঠে দেখলেম বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো-কুৎসিত ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ি। পরের জিনিষকে ঠিক লোষ্ট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয়নি কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে প্রাণের টান সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অমূল্য শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

কিন্তু অবিনকে আমি চিন্‌তেম, কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাঙ্গামার পূর্ব্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ী এলেম। তার পর দুদিন আমি জাহাজে যাওয়া কামাই দিলেম। না যাওয়ার কারণ নানা; তার মধ্যে প্রধান কারণ লালপাগড়ি আর ষ্টীমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

তৃতীয় দিনের সকালে সাতটা-দশের ষ্টীমার আমাকে একলা নিয়ে বড়বাজার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাটার জল আর জলের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিজে কাদা মাজা-কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, তারি উপরে অনেক-গুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস কাঠের পুতুলের মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাঁচিলে-ঘেরা শ্মশানের মধ্যে দিয়ে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরি উপরে দেখতে পাচ্ছি লাল সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ীর চিলের ছাদে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে; আর ঠিক তারি পিছনে আলোর গায়ে একটি মস্‌জিদের তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা ফুলের মত নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে সেই কোণটায় দূর থেকে তার বিশাল বুকের মাঝে চিরবসন্তের সিগ্‌নেলের আলোর মতো বড় লাল গোলাপ-ফুলটার সন্ধানে আমার চোখ আজ দৌড়ে গিয়ে দেখছে অবিনের জায়গায় একটা রবাব কাঁধে একজন পেশোয়ারি—কালো লুঙ্গি, ঢিলে কোর্ত্তা, বড় পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোকড়ানো চুল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে!

একটা বয়া প্রদক্ষিণ করে ষ্টীমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়লো। অবিনকে না দেখে সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদিনের ছুটি এবং কামাই দুয়েরই কারণ এবং পুলিশ-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে যেয়ে হাজরি দিতে হচ্ছে ওটা আমি একরকম স্থির করেই নিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুঁথির সঙ্গে দু-ঘণ্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলুম।

ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা গাধাবোটের রগ ঘেঁসে পাট-বোঝাই একখানা কিস্তিকে সজোরে ধাক্কা মেরে বাগবাজারের লোহার পোল ডাইনে রেখে সোজা কাশিপুরের দিকে চল্লো।

খড়-বোঝাই হোলাগুলো আদিম যুগের লোমশ কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার খুব কাছাকাছি কাদা-জলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার যেন আর-একটা শক্ত খোলায় মোড়া বিকটাকার গুটিপোকার মতো আস্তে আস্তে চলেছে। দূর থেকে কাশিপুরের জেটিটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে—জলের নীলের উপরে সোজা বিশাল স্থির নিবাত নিষ্কম্পমিব। তার কাঁধ থেকে সেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ঝুলে পড়েছে সুন্দর ভঙ্গীতে। আমি গুন্‌গুন্ করে সুরু করেছি—

"হুয়া জব ইস্ক মস্তানা
কহেঁ সব লোগ দিওয়ানা।"

রবাবটায় একটা মস্ত ঝঙ্কার দিয়ে পিছন থেকে সেই পেশোয়ারীটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসলো—

"জিসে লাগি সোঙ্গি জানা
কহেসে দর্দ ক্যা মানা॥"

পন্টুন থেকে অবিন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"আগা-সাহেব, কাবুলী গীত ফরমাইয়ে, নেহিতো দোশালা ছোড়েগা নেহি।" এর পরেই জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই অবিন ঝুপ করে সেই শালখানা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে ষ্টীমারে উঠে এল। আগা-সাহেব তাকে একটা মস্ত সেলাম-বাজি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলী গান আরম্ভ করলে—

সুমিওসী পমঙ্গল সুমিওসী
পদম্‌কেনা পমঙ্গল সুমিওসী-ঈ-ঈ—

সুরও যেমন কথাও তেমনি বিদ্‌ঘুটে! পমঙ্গল পমঙ্গল যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলি ভন্ ভন্ করছে আর মাঝে মাঝে সুমিওসী সে-গুলোকে ফুঁ-দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে অবিন বেশ মসগুল হয়ে এই ভন্‌ভনানির মাঝে সুখে বসে রয়েছে। কানে কম্ফরটার এবং তার উপর সাতপুরু চাদর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে—এর কম্ফরটার ছাড়াবার জন্যে আমি তাকে রোজ ধমকাতে ছাড়িনে কিন্তু আজ তাকে দিব্য হাস্যমুখে সাম্‌নের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কি হিংসেই না হচ্ছিল! শ্রবণের দরজায় আগল টেনে ছোকরা আজ কি সুখেই আছে—সুর-বেসুর সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্দরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা-গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে তাই রবাবের সুরটা বালির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল—কাবুলী গানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। অমনি হুস্ করে একটা হাওয়ায় চারিদিক থেকে শোনা গেল—বস্! অবিন একটা মিলিটারি রকম সেলাম দিয়ে আগা-সাহেবকে বল্লে—"তাগা তো টুটা, অব্?" "অব্ শুনিয়ে" বলেই আগা-সাহেব আরম্ভ কল্লেন পোস্ত উর্দ্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি।

একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প—সেই শালখানার আদ্যন্ত কাহিনী। গল্পটা খুব গুরুপাক করেই আগা-সাহেব আমাদের উপহার দিলেন—ভাষায় প্যাঁজ রসুন আর হিং তিনেরই বুক্‌নি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবিন গল্পটার খুব তারিফ করলেও আমি সেটা থেকে বড়-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলেম না। মাথা তথনো আমার কাবুলীর সেই বেসুরো গান আর রবাবের ঝন্‌ঝনানিতে বিগড়ে ছিল সুতরাং গল্পের সঙ্গে গল্পকর্ত্তাকেও জাহান্নামে পাঠাতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ কল্লেম না—কিন্তু মনে মনে! কারণ কাবুলী-মাত্রেরই যেটা চিরসহচর মোটা সেই লাঠি তার সামনে মুখ-ফুটে কিছু বলা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিষ্কার পটখানির উপর হিজিবিজির মতো এই লোকটার গল্প আর গান! সেটা শেষ করে সে যখন কটা দাড়ির আড়াল থেকে বত্রিশপাটি দাঁত বের করে বল্লে—"বাবু, শাল দেও অব হাম চলে।"—তখন অবিন খুসির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখান দিয়ে দের দেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলুম না, ঝাঁ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বল্লেম—"তুমি কেমন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা জোচ্চোর মিথ্যে বকরবকর করে ফাঁকি দিয়ে এই দামি শালটা নিয়ে যাবে এ হতেই পারে না।"

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। কাবুলীটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—"ক্যা বাবু, হাম জুয়াচোর হ্যায়।" আমার রাগ তখন সপ্তমে, সুতরাং গলাটাও সেই সুরে বল্লে—"যেন কাবুলের আমীর রে! যাঃ যাঃ আর শাল পরতে হবে না, এটা আমার শাল হ্যায়, জানতা এখনি তোম্‌কো পুলিশকা হাতে জিম্মে করে দেগা!" রাগের মাথায় বিদ্যেসাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়গড় করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলুম। কে জানে চলতি ভাষার একসেন্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লালপাগড়ীর জীবন্ত একসেন্টাকে দেখেই হোক কাবুলীটা তার গেলাপ-মোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চোঁ-চোঁ চম্পট দিলে—সোজা পন্টুন বেয়ে লেলুয়ার মুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার জায়গায় স্থির হয়ে বসলুম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠাণ্ডা হতে আমার বেশীক্ষণ লাগলো না। অবিন দেখলেম দুইচোখ নিমীলিত করে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। গাল খেয়ে কাবুলীটা আমায় যদি খুনও করে যেতো তবু তার চোখ খুলতো কি না সন্দেহ। এমনি খুব চেপে দুইচোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গণ্ডগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ যখন খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতেম। আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে শালখানি আস্তে আস্তে তার পাশে রেখে পাশ-কাটিয়ে একটু দূরে বসলেম—যেন প্রথম চোখ খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পায়—পোড়ে তো শালখানাই পুড়ুক, আমি কেন মরি! যা ভেবেছিলেম তাই।

শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সজোরে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বসন্তের ফুলে-ফুলে-বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব্ব শালটি উড়তে উড়তে গিয়ে জলে পড়ল—দিকবিদিক যেন আলো করে। আমি বল্লেম—"ওহে কল্লে কি ?" —"পরের জিনিষ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ কল্লেম। যার জিনিষ তাকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পূরে।"—বলেই অবিন আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণে বুঝলেম শালখানা কাবুলীকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলঙ্কটা কাবুলী পর্য্যন্তই থাকতো, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগতো না। অবিন পুলিশ কাবুলী এবং বাটপাড়ির কলঙ্ক তিনটে থেকে বেঁচে গেল, ধরা পড়লুম আমি—জয়মিত্রের ঘাটটার ঠিক আড় পারে!

তারপর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারের টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি আর সেই শালের উল্টো পিঠে লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের ঢেউটাই গঙ্গার নির্ম্মল স্রোতকে ঘোলা করে দিয়েছে দেখছি! পাকা ধানের সোনায়, কচি ঘাসের সবুজে, দিনের উদয়-অস্তের রক্তে, রাত্রির ঘুমের অন্ধকারে ছোপানো চারবাগ শাল-খানা ফুলের ভেলাখানির মতো ভাস্‌তে ভাস্‌তে আর-কোনোদিন যদি নতুন করে আমার চোখে পড়ে তবেই আবার তার কথাটা তুলবো, না হলে এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# 'আঁধারে-আলোকে'

জাহাজ ছাড়ল। আজ অনেক আরোহী। আকাশ পরিষ্কার সুন্দর, বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে মহিমাময়; প্রতিকূল স্রোত, অনুকূল বাতাস; যাত্রা আরম্ভ হল। দুধারের দৃশ্য অধিকদূর পর্য্যন্ত আর নাছোড়-বান্দার মত সঙ্গ রাখতে পারলে না। কেননা যে নদী বেয়ে আমরা চলেছি, তার মত স্বৈর, সরীসৃপ-গতি—প্রবাহ আর-কোথাও আছে কিনা জানিনে। দণ্ডে দণ্ডে পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এঁকেবেঁকে, প্রবল বলে জল কেটে দু-ভাগ করে, জোয়ারের জোরাল গতিতেও অপ্রতিহত হয়ে, আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া, চারিদিকের নিস্তব্ধতা, জলের কল্লোল-সঙ্গীত, সমস্ত মনের মধ্যে উদাস প্রশান্তির সঞ্চার করলে।

রাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। মেঘ ভেদ করে পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিল। আকাশে আলোকের প্লাবন; জলের উপর রজত-আলো পড়ে আকাশের নীহারিকামালার মত একটি ছায়াপথ সৃজন করেছে। জাহাজের গতি-অনুসারে সে বাষ্প-শুভ্র পথ কখনো আমাদের সম্মুখে, আবার কখনো বা পিছনে পড়ে আছে। দুধারের সঞ্চরমান দৃশ্যের উপর চাঁদের আলো পড়ে সবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জলের উপর আলোর পথ উভয়-তীরকে সংযুক্ত করছে।

* *
*

আজ যখন চেয়ে দেখলাম তখন সূর্য্যোদয় হয়েছে। সোণার আলোর উচ্ছ্বাসে আকাশের নীলিমার গায়ে, প্রবালের অশোক-রাঙা আভা দেখা যাচ্ছে—সাদা মেঘের উপর সোণার কিরণ পড়ে, তাকে নারাঙির রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। আমার ঘর পশ্চিম-মুখো, তাই সূর্য্যোদয়ের আলোকের অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে, পশ্চিমের আকাশের মুখে তারি যে প্রতিভা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তাই আমি দেখি। সবুজ গাছপালা, দুর্ব্বায় ঢাকা মাঠ, আকাশের খণ্ডিত নীলের ব্যবধান পূর্ণ করে, দীপ্ত আলোক দ্রবিত স্বর্ণের মত ঝলমল করতে থাকে। সাদা আর ধূসর মেঘের মুখে, গেরুয়া আর হাল্কা বেগুনি কিম্বা হরিতাভ নীলের ঝালর ঝুলে পড়ে, ডালপালা দোলে, অসংখ্য পত্রাবলি বিচলিত হয়ে কত জল্পনাই করতে থাকে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—নূতন দিনের আবাহন, শুনতে পাই—সচেতন-করা আলোকে ঊষাকালের উদ্বোধন-মন্ত্র।

* *
*

আজ সকালে সোণালি আলোতে চোখ মেলে জেগে ওঠা হয়-নি, ভোরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। ধোঁয়াটে নিবিড় ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, বৃষ্টি ঝরে ঝরে ক্রমে হাল্কা হয়ে এল। মনে হচ্ছিল আকাশ আড়াল করে অনেকগুলি ভিজে কাপড় টাঙান ছিল, এক-একখানি করে কেউ যেন সরিয়ে নিলে, আর সুনীল আকাশখানি প্রকাশ হয়ে পড়ল! এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না, আকাশ চুপচাপ, শ্রান্ত চোখে চেয়ে আছে। নীরব বর্ষণ আমায় বড় কাতর করে, মনে হয় সে যেন বড়ই দুঃখের কান্না!

* *
*

কি সুন্দর সোণার আলোয় ঝলমল-করা এই সকালবেলা! খোলা জানালা দিয়ে দেখছি নীল আকাশের এই গলানো সোণার ধারা দূরে নিমগাছের হাল্কা-হলুদ পাতাগুলির স্তবকের উপর গড়িয়ে ঝরছে। দেখি আর ভাবি এই সোণার আলোয় হৃদয় আমার ভরে নিতে হবে। সত্যের প্রকাশে, মিথ্যার মরণে সব অন্ধকার চিরদিনের মত অন্তর্ধান হয়ে যাবে। সম্মুখের আলো-ভরা পথেই আমি চলব, —দিনের কিরণ সর্ব্বাঙ্গে বহন, আর দুটি অবারিত নেত্রপুটে ধারণ করে অচঞ্চল চিত্তেই চলব। রাত্রিও আমার কাছে অন্ধকারের বিভীষিকা আনতে পারবে না,—তার আরত্রিক পাত্রে অনির্ব্বাণ অগণ্য তারকার দীপ্তি, অনন্তের পথে অভিনন্দন করে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সম্মুখেই চল্‌ব—পিছু ফিরে আর চাইব না; তার পর যেদিন স্নিগ্ধ ছায়ায় গোধূলির শুভ মুহূর্ত্তে তুমি আমায় তোমার মন্দিরে স্থান দেবে সেদিন সমস্ত জ্বালাই নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

* *
*

আলো দিয়ে তুমি যা লিখে দিয়েছ অন্ধকারে বসে-বসে তাই আমি পড়ছি।

সে যে তোমার তারার আখরের লেখা অনির্ব্বাণ, অনির্ব্বাণ!

* *
*

ক-দিন ধরে কেবলি বৃষ্টি ঝরে ঝরে আকাশের মেঘ অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে, তবু সম্পূর্ণ সরে যায়-নি! এই বাষ্পাকুল আকাশে আজ একটু রোদও দেখা দিয়েছে, তবে এ শরতের জলজলে সোণার আলো নয়, এর দীপ্তিও ম্লান, চোখের জলে ভরা দৃষ্টির উপর একটু হাসির চেষ্টার মত। তবু যে অনিবার ধারাবর্ষণের ঈষৎ বিশ্রামও হয়েছে, আর্দ্র আর্ত্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে আছে, এই সংযত অবসরটুকু,—আলোর মুখে দরজা-জানালা খুলে দিয়ে একটু ভাববার সুযোগ যে পাওয়া গেল, এও পরম লাভ মনে হচ্ছে। বাদলা দিনে অন্ধকার ঘরে স্তব্ধ হয়ে আর কত বসে থাকা যায়! মনও যে রুদ্ধ হয়ে আসে, কোনোখান হতে কোনো আলো সংগ্রহ করে আন্‌তে পারে না। মনের সেই অসাড় পাষাণ-ভার বড় দুর্ব্বহ!

ক-দিনের অবিরাম ধূসর মেঘ আর অনিবার বৃষ্টির পর আকাশে স্বচ্ছ-নীলের অবসর এক-একটি আশার আলোক-দ্বীপের মত দেখা দিয়েছে। আমারও অন্ধকার মনের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা জেগেছে,—নিকষপটে সোণার লিখন কেটে বসবে,—শুধু অবান্তর কথা নয়, প্রমাদ-গ্রস্তের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়, ছন্দোবন্ধে, যতিতে সম্পূর্ণ, শোভন সংযত শ্লোক ফুটে উঠবে—করুণায় যার জন্ম, জ্ঞানে যার স্থিতি!

উদ্দাম বর্ষার আক্রোশ দূর হয়েছে আকাশ স্বচ্ছ-নীল, চারিদিকে নির্ম্মল সূর্য্যালোক, পর্য্যাপ্ত প্রচুর পল্লব;—তরুশ্রেণীর নিবিড় হরিত-সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গে এই সূর্য্যালোকের দীপ্তি স্নিগ্ধ-করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে! আকাশ-জোড়া আলো নিয়ে তুমি আমার সম্মুখে এসেছিলে, আমি চোখের সম্মুখে পর্দ্দা খাটিয়ে, আঁধার রচনা করে বসে-বসে ভাবছিলাম, তুমি কোথাও নাই! হাওয়ার মুখে পর্দ্দা খসে গেছে, তোমার চোখ-ধাঁধিয়ে-দেওয়া আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! কি অশোভনতার মধ্যে, কি আবর্জ্জনা-স্তূপের পাশে, জীবন যাপন করছিলাম তা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। এখন বাঁচতে হলে উঠে-পড়ে লেগে বাসস্থানটি সংস্কার করতে হবেই! নইলে বাঁচাই দুঃসাধ্য হবে যে! বাঁচব বলেই যে সঙ্কল্প করেছি! অবসাদের দিন অবসান হয়ে গেছে! সকাল-বেলাকার এই মন আমি রাতে কোথায় হারিয়ে ফেলি,—অন্ধকারের অস্পষ্টতায়, ছায়ার নিরুদ্দেশ পথে, আর অগণ্য নক্ষত্র-লোকের গহনের মধ্যে! তখন যে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাই থাকে না। আমি একটা খেয়ালের মত, ক্ষীণপ্রাণ লঘু বাষ্পের মত কোথায় ভেসে চলি, দেহবোধ চলে যায়, স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধতন্দ্রায় একটি চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে! আমি যে কেবল একটি আত্মা, এই দেহসম্বন্ধে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত, এই অনুভূতিই ক্ষণে ক্ষণে পরিপুষ্টি লাভ

করে! আমি যে মানুষ, নাম সংজ্ঞাধারিণী নারী, আমি যে সমাজ, আত্মীয়তা জাতীয়তা প্রভৃতির মধ্যেকার কেউ—এই ধারণা আমার চেতনার মধ্যে স্থান পায় না! আমি শুধু প্রাণ, এই কথাই মনে হয়, এবং এই প্রাণ যেন কোনো সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার জালে বাঁধা পড়ে প্রতিহত নয়। মনে হয় আমি বাতাসের মত মুক্ত, আকাশের মত ব্যাপ্ত, জলের মত নির্ম্মল, আলোকের মত দীপ্তিমান আর পৃথিবীর মত সুন্দর—চিরসুন্দর! একটা অসীমতা, বাধাহীনতার অব্যাহত শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করি, কেমন আনন্দ আবার কেমন-যেন ভয়ও হয়। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

* *
*

আজ ভোরে উঠে যেম্নি জানালা খুলে দিলাম, অমনি শুভ্র-সুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রভাত আমায় স্বাগত জানালে। এমন পরিপূর্ণ নির্ম্মল সকালবেলাটি আলোয়-আলোয় গানে-গানে ভরা, এ কি শুধু আমার হৃদয়-দ্বার হতে তার বারতা না জানিয়ে ফিরে যাবে? আকাশের আলো নীলিমাকে আরো সুন্দর করেছে, ধূসর মেঘকে শুভ্র করেছে; গাছের পাতায় সোণার দীপ্তি, মাঠের ঘাসে শিশিরের বুকে হীরেমাণিক ছড়িয়ে দিয়েছে—আমার চোখে আর আমার বুকে তার প্রসাদ-আনন্দ এনে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে! আজ নয়ত কাল, নয়ত আরো দুদিন বাদে, সে তার নিখিল-মন্থন-করা অমৃতের অভিষেক, অন্ধকার-নির্ম্মূল-করা আনন্দের মন্ত্র পাঠ করে যাবেই, তার সন্দেহ নেই;—মন অবারিত, শ্রবণপথ উন্মুক্ত, নেত্র উৎসুক হয়ে থাকুক, সার্থকতা আসবেই।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

# আলেয়ার আলো

## আঠারো

## মোহনের কথা

আমার সমস্ত মন বলছে সরমা আমার! ছেলেবেলায় রূপকথার রাজকন্যাকে যেমন দুর্লভ মনে হোত, এতদিন আমার কাছে সরমা ছিল ঠিক তেমনি। রূপকথার স্বর্ণস্বপ্ন আমার জীবনে আজ সত্য হয়ে দাঁড়ালো!

আমার প্রাণে আজ আনন্দের যে ছোপ ধরেছে, তারই রঙ্গে-রঙ্গে সারা বিশ্ব যেন রঙ্গিন হয়ে উঠলো। আকাশের ঐ অসীম নীলিমা যেন একটি নিস্তব্ধ সঙ্গীতের মত সুন্দর, আর, এ নিখিল যেন তারই সুরে, ঝঙ্কারে, ছন্দে ও তালে পরিপূর্ণ হয়ে আত্মহারা! বিশ্ববীণার মূর্চ্ছনার মত সমীরের এই কলগুঞ্জন আজ আমার মূর্চ্ছিত হৃদয়কে সজাগ করে' তুলেছে,—যৌবনের নবীনতা যে কি, সফল প্রেমের অমৃতরসে সরস হয়ে আমার এ প্রাণ আজ তা প্রথম অনুভব করলে।

আজ সকালে সরমা যখন বাগানে ফুল তুলতে এল, আমি পা টিপে-টিপে ঠিক তার পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালুম।

চুপিচুপি ডাকলুম, "সরমা!"

গলাটি মধুরভাবে হেলিয়ে, সরমা চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়াল! তার সেই বড়-বড় ঢুলে-পড়া চোখে আমার দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখেই, লজ্জিতভাবে সে মুখ-খানি নীচু করে' রইল।

তার মাথার উপর একটি পুষ্পিত শাখা নত হয়ে রয়েছে। সেটি ধরে আমি ধীরে-ধীরে নাড়া দিলুম,—একরাশ শিউলি ফুল তার মুখে-কাঁধে-বুকে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে পড়্‌ল।

ভুরুদুখানি বেঁকিয়ে সরমা বললে, "যাও! অমন করলে আমি রাগ করব!"

—"তুমি রাগ কর সরমা! শুনেছি, রূপসীর রাগ বড় সুন্দর!"

সরমা হেসে ফেললে। বললে, "পথ ছাড়ুন, আমি যাই।"

আমি পথ-আগ্‌লে দাঁড়িয়ে দু-হাতে তার একখানি হাত চেপে ধরলুম! সরমা স্থির-দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইল,—ক্রমে-ক্রমে আমার মুষ্টির মধ্যে তার সেই কোমল বাহুখানি নিসাড়-নিস্পন্দ হয়ে নেতিয়ে পড়ল। সেই নিভৃত তরুতলে, সঙ্গোপনে আমরা দুটি প্রাণী পরস্পরের দিকে বিভোর হয়ে চেয়ে-চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, অনেক—অনেকক্ষণ!

কি-এক অজানা মোহে জগৎ ভুলে আমাদের দুজনের মুখ দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে, ধীরে, ধীরে! সরমার ঘন-ঘন তপ্তশ্বাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।……সে কি নিশ্বাস,—না, বসন্ত-বায়ুর প্রথম উচ্ছ্বাস?

সরমার থরথর ওষ্ঠাধরের উপর আমার তৃষিত ওষ্ঠ নত হোল—কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে না-করতেই আমার হাত-ছিনিয়ে চকিতে সরমা পিছনে সরে গেল; তারপর তীব্রস্বরে তিরস্কার করে' উঠল, "মোহনবাবু! আমি এখনো আপনার স্ত্রী নই!"

এ কি কঠোর সত্য! আমি যেন হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। আমার নিজের প্রতি নিজের একটা ধিক্কার মনের উপর বারংবার ঘা দিতে লাগল। অনুতপ্ত হয়ে কাতর স্বরে আমি বললুম, "মাফ্‌ কর, আমায় মাফ্‌ কর!"

কোন উত্তর না দিয়ে, সরমা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল,—স্পর্শাতীত, দহন-ভরা, তীব্র এক বিদ্যুতের মত!

এদিকে আমার বিবাহের কথা নিয়ে পাড়াময় বিষম ঘোঁটের ধূম পড়ে গেছে।

পিসিমা কেঁদে চোখ রাঙ্গা করে' আমার কাছে এসে বললেন, "বাবা মোহন, একি সর্ব্বনেশে কথা শুনছি! তুই কি তোর নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিতে চাস্?"

আমি বললুম, "কুলে কালি দিতে চাই কি-রকম?"

—"তুই নাকি বিধবা-বিয়ে করবি?"

—"তা করবই ত! বিধবাকে বিয়ে করলে কুলে কালি দেওয়া হয় নাকি?"

—"তা হয় না? সত্য ত্রেতা দ্বাপর

যুগে কেউ যা করে-নি, তুই কি তাই করতে চাস্?”

—“এটা যে কলিকাল, পিসিমা! এখন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে! আর তাও যদি ধর, তাহলে ত্রেতাযুগে সুগ্রীব আর বিভীষণ বিধবা বিয়ে করেছিলেন, কথক-ঠাকুরের মুখে তাও কি শোন-নি?”

—“আমি ও-সব কিছু বুঝি-নি বাবা, এ বিয়ে কিছুতেই হোতে পারে না।”

—“কেন, এযে শাস্ত্রের বিধান! পণ্ডিতরাও এতে মত দিয়েছেন!”

—“অমন শাস্ত্রের মুখে ছাই, অমন পণ্ডিতের মুখে আগুণ!”

—“অত গোল কোরো না, তোমাদের কোন কথা আমি শুনব না। এ বিয়ে আমি করবই!”

—“তবে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে; আমার এখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এতবড় ম্লেচ্ছ ব্যাপারটা প্রাণ থাকতে আমি দেখতে পারব না!”

—“তোমার পূজো হয়েছে?”

—“না, এ-সব কথা শুনে পূজো-টুজো আমার ঘুরে গেছে!”

—“তবে এইবেলা মানে-মানে সরে পড় পিসিমা, মানে-মানে সরে পড়! এই কাপড়ে আমি চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি আর মুরগীর ডিম খেয়েছি, এখনি তোমাকে ছুঁয়ে দেব!”

—“দুর্গা, দুর্গা! সরে যা গোঁয়ার-গোবিন্দ—সরে যা!”

—“এখনো গেলে না? এই দিলুম ছুঁয়ে!”

—“অ মোহন, ছুঁস্‌নে বাবা—অ মোহন, ছুঁস্‌নে বাবা”—বলতে-বলতে পিসিমা পিছু হট্‌তে-হট্‌তে সরে পড়লেন!

পিসিমার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নীচে নেমে দেখি, পাড়ার বিশুখুড়ো, দুর্লভ বাঁড়ুযো ও ফকির ভট্টচার্য্যি আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে একেবারে রীতিমত তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন।

বিশুখুড়ো আমাকে দেখবামাত্র কিছুমাত্র ভূমিকা না-করে'ই বলে উঠলেন, “মোহন, এমন কার্য্য কোরো না! তাহলে আমি দুঃখিত হব!”

—“কি করব-না বিশুখুড়ো?”

ফকির ভট্টচার্য্যি বললেন, “ঐ ম্লেচ্ছ মুরারিটার বিধবা-মেয়েকে তুমি বিয়ে কোরো না বাবা!”

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে তাঁর একচক্ষে যতটা দুঃখের ভাব জাহির করা যায় তা জাহির করে' বললেন, “তাহলে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাবে।”

—“আপনারা এইজন্যেই আমাকে বুঝি সাবধান করতে এসেছেন?”

বিশুখুড়ো উৎসাহিত হয়ে বললেন, “হ্যাঁ বাবা, আমরা তাই এসেছি। মনে কর, আজ তোমার পিতা জীবিত থাকলে এমন অধর্ম্মের কাজ তোমাকে কিছুতেই করতে দিতেন না। আজ তিনি পরলোকে, তুমি ছেলে 'হয়ে তাঁর নাম ডুবিও না।”

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে বললেন, “সুধু তাই নয়, তাহলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হবে।”

আমি শান্তভাবেই বললুম, "দুর্লভবাবু, আপনাদের মতন মহাপুরুষদের লীলাখেলা যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করছে, তখন আমার এই বিধবা-বিবাহে তার পায়ে কুশাঙ্কুর-বেঁধার ব্যথাও লাগবে না।"

বিশুখুড়ো থতমত খেয়ে বললেন, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, তোমার এ কথার অর্থ কি মোহন?"

—"অর্থ খুব স্পষ্ট। বাড়ীতে গিয়ে বুঝে দেখবেন। আসল কথা কি জানেন, দেশ আর আপনাদের চায়না—আপনাদের ধাপ্পাবাজিতে, ভুয়ো ভড়ং দেখে দেশের লোক আর ভুলবে না। আপনারা বিধবা-বিবাহ করবেন না, অথচ বিধবা অপহরণ করলে এ মিথ্যা সমাজ-বিধিতে কেউ পতিত হবে না। আপনারা যে ভেজাল-মেশানো নকল সমাজকে হিন্দুসমাজ বলে খাড়া করতে চান, সে ত জগন্নাথের মন্দিরের মত! বাইরে তার দ্বারে দ্বারে বিশ্বের আলো কেঁদে মরে, অথচ ভিতরে দরজা বন্ধ করে' সযত্নে অন্ধকার ধরা আছে; বাইরে সে প্রশস্ত, অটল, উচ্চ—কিন্তু ভিতরে সঙ্কীর্ণ, ফোপ্‌রা, নীচু! এ কি সত্য হিন্দুসমাজ? তা নয় মশাই, তা নয়! সত্য হিন্দুসমাজ আছে,—আপনারা তার খবর রাখেন না! আপনারা যাকে সমাজ সাজিয়ে প্রণামী আদায় করতে চান, সে হচ্ছে ভণ্ডামির আখ্‌ড়া, জোচ্চোরের আস্তানা, মুখ্যুমির আড্ডা।"

আমার কথা শুনে পাড়ার মুরুব্বিদের আক্কেল একেবারে গুড়ুম হয়ে গেল! তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন-নি যে, আমি তাঁদের মুখের উপর এমন-করে' অপ্রিয় সত্য বলতে পারব!

অনেকক্ষণ পরে বিশুখুড়ো মুখ খুলে বললেন, "দেখ মোহনলাল, এ ভাল হচ্ছে না কিন্তু! এর ফল হাতে-হাতে তোমাকে ভুগতে হবে!"

আমি উচ্চস্বরে তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে বললুম, "কি হবে শুনি? আমাকে এক-ঘরে করবেন, না জাতে ঠেলবেন?"

ফকির ভটচাষ্যি বললেন, "সে দেখতেই পাবে তখন! আমাদের অপমান, অ্যাঁ!"

আমি বললুম, "ভটচায্, বাড়ী যাও, তোমার আফিম খাবার সময় হোল, মৌতাত চটে যাবে! তোমরা সকলকে একঘরে কর, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কি, দেশে এখন তোমরাই সাধ করে' একঘরে হোতে বসেছ! তোমাদের ভণ্ডামিকে বাদ দিয়ে দেশে এখন এক যথার্থ হিন্দুসমাজ গড়ে উঠছে—এ নির্ম্মল, উদার, অটল; এ তোমাদেরও গ্রহণ করবে, কিন্তু তোমাদের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেবে না!"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, "তোমার এ মুখসাবাসি কতক্ষণ ট্যাকে, দেখা যাবে!"

এদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা বৃথা। এদের তড়্‌পানি বন্ধ করতে হোলে আরো কঠিন হোতে হবে। অতএব হাঁক্ দিলুম, "গুট্টা সিং!"

"হুজুর!"—বলে আমার দ্বারবান গুট্টা সিং এসে, তার লম্বায়-চওড়ায় বিশাল শরীরে দরজা প্রায় ঢেকে, সিধে হয়ে দাঁড়াল।

তিনমূর্ত্তির দিকে ফিরে বললুম,

"আপনারা বোধহয় জানেন না যে, আমার দ্বারবান গুট্টা সিং আমার চেয়েও ঢের-বেশী পাষণ্ড! আমি যদি হুকুম দি, তাহলে ও এখনি অম্লানবদনে আপনাদের টিকিগুলি একসঙ্গে বিউনি করে' বেঁধে, তিনজনকেই রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। এমন-কি, আপত্তি করলে হয়ত চটে চড়-চাপড়টাও বসিয়ে দিতে পারে! অতএব,—"

আমার 'অতএবে'র মর্ম্ম বুঝতে তাঁদের একটুও দেরি লাগল না! কারণ, "সনাতন হিন্দুধর্ম্মে'র কথা বেবাক্ ভুলে গিয়ে সেই তিনমূর্ত্তিই এত তাড়াতাড়ি পাত্তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়লেন যে, দেখে আমিও অবাক মানলুম। কবি ঠিক বলেছেন, "তর্কের সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো!"

আমার বিধবাবিবাহের ঘোঁট্ নিয়ে, পাড়ার মোড়লরা যখন বেজায় ধুমধাড়াক্কা বাধিয়ে তুলেছেন, তখন হঠাৎ একদিন মুরারিবাবু নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাআশ্রয় করলেন। প্রথমে আমরা ততটা গা করি-নি, কিন্তু দু-একদিন যেতে-না-যেতেই বোঝা গেল, মুরারিবাবুর অসুখ বড় যে-সে অসুখ নয়।

আমি আর হরেন পালা করে' মুরারিবাবুর সেবার ভার গ্রহণ করলুম। সহরের ভাল-ভাল ডাক্তার দিয়ে রোগীর চিকিৎসা চলতে লাগল।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সাংঘাতিক হয়ে উঠল। মুরারিবাবুর নিশ্বাসে দুর্গন্ধ পেয়ে বুঝলুম, তাঁর ফুস্‌ফুসে 'গ্যাঙ্গ্রিণ' হয়েছে। আমরা তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলুম।

সরমাকে আমরা কিছু খুলে না-বললেও তার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। তার মুখ দেখে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগল। বাপ ছাড়া এ সংসারে আপন বলতে তার আর কেউ ছিল না! শৈশবে মা-হারা হয়ে সে বাপের কোলেই মানুষ হয়েছিল; বালিকা-বয়সে বিধবা হয়ে আবার সেই স্নেহময় পিতার বুকেই আশ্রয় পেয়ে কোনরকমে সে আপনার তিক্ত জীবনকে ভুলে ছিল। আজ সেই পিতাই তাকে একলা ফেলে কোন্ অজানা দেশে জন্মের মত চলে যাচ্ছেন—তার এ দুঃখ যে বোবার স্বপ্ন-দেখার মত; সে ত কথায় প্রকাশ করা যায় না!

সরমা যেন কেমনধারা হয়ে গেল! সে কাঁদে না, কথা কয় না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, সুধু বাপের শিয়রের কাছে চুপ-করে' উদাসচোখে পাথরের মূর্ত্তির মত বসে থাকে,—কিবা রাত, কিবা দিন! রাত্রে যখন রোগীর ছট্‌ফটানি বেড়ে ওঠে, অসহ তৃষায় তিনি ক্রমাগত 'জল জল' বলে চেঁচাতে থাকেন, নিশ্বাস ফেলতে তাঁর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়—সরমা তখনো পিতাকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে না, রোগীর কষ্ট দেখে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না, তার মুখে উদ্বেগের রেখামাত্র দেখা যায় না! সেই মরণের ভরে-ভরা ঘরে অন্তিম শয্যার পাশে বসে, জীবন-মৃত্যুর অশ্রান্ত যুঝা-যুঝি দেখতে-দেখতে মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পড়ছে, তখন থম্‌থমে

নিশুতি রাত্রে, নিবুনিবু দীপের স্তিমিত আলোকে, সরমার সেই স্তব্ধ, স্থির, পাণ্ডু মুখ বারংবার চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি আর বুকের কাছটা কেমন ছম্‌ছম্ করে' উঠ্‌ছে! উঃ, সরমার সেই মৌন-অচল মূর্ত্তি, নিঝুম রাতের সেই দুঃসহ নীরবতা আর তারই মাঝে মরণাহত রোগীর বিকৃত স্বরে চীৎকার,—এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে আলো-আঁধারে ঐ যে দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া থেকে-থেকে চুপি-চুপি নড়ে-নড়ে বেড়াচ্ছে, আমার মনের গতিক্ এমনি হোল যে, ও-গুলোকে দেখেও আমি আচ্ছন্ন প্রাণে শিউরে-শিউরে উঠ্‌তে লাগলুম!

রাত তখন পাঁচটা, পূর্ব্ব-আকাশে অল্পে-অল্পে ভোরের জলন্ত ছবি ফুটে উঠছে।

মুরারিবাবু হঠাৎ জড়িত স্বরে বললেন, "মোহন!"

আমার একটু-একটু তন্দ্রার ঘোর আসছিল, মুরারিবাবুর গলার আওয়াজে সে ঘোর ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে গিয়ে বললুম, "কি বলছেন?"

মুরারিবাবু নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের যা করবার, তা তোমরা করেছ,—আর করবার কিছু নেই। আমি বুঝতে পারছি, আমার সময় হয়ে এসেছে। সুতরাং—"

—"মুরারিবাবু, আপনি ও-সব কথা ভাববেন না।"

মুরারিবাবু অল্প হেসে বললেন, "কি আশ্চর্য্য, আর ভাবব কেন বাবা? আমি এখন সেই দেশে যাচ্ছি, ভাবনা যেখানে নেই। উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু জল দাও ত মোহন!"

জলপান করে' বললেন, "সরমার জন্যে আমার বড় ভয় ছিল, সে ভয় তুমি ঘুচিয়েছ। দেখ বাবা, সরো আমার জন্ম-দুঃখী—ও যেন সুখে থাকে। ভুলে যদি কোনদিন কিছু অপরাধ করে, ক্ষমা-ঘৃণা কোরে সে দোষ নিও না। বড় সাধ ছিল তোমাদের দুটিকে পাশাপাশি দেখে যাই, কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হোল না! সরো, দেখি মা, তোর চাঁদ-মুখখানি এক-বার দেখেনি!"

সরমা বাপের বুকের উপর আপনার মুখখানি নিয়ে গেল। মুরারিবাবু অনেক-ক্ষণ ধরে নিষ্পলক নেত্রে মেয়ের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। অন্তিমের সে তৃষিত শেষদৃষ্টি কি মর্ম্মস্পর্শী! স্নেহব্যাকুল পিতার সমস্ত প্রাণটি যেন তখন সে অতৃপ্ত চাহনির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুরারিবাবু বললেন, "মা, তোর কোন ভয় নেই, মোহন তোকে দেখবে। আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী-পুত্র নিয়ে চিরজীবিনী হয়ে থাক্।"

আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাবা, একটা মার নামগান কর ত!"

আমি মৃদুস্বরে গাইলুম,

"কেবল আসার আশা ভবে আসা আসামাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রহিলো।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে' ছল,
ওমা! মিঠার লোভে তিতমুখে সারাদিনটা গেল।
মা, খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতল,
এখন সন্ধ্যেবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

মুরারিবাবু গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন, "তোমাদের পৃথিবীতে আজ প্রভাত হচ্ছে, কিন্তু, আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে —এখনি সব আঁধার হয়ে যাবে—আঁধার! ঠিক কথা, আবার গাও মোহন, আবার গাও—'এখন সন্ধ্যেবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল'। নিয়ে চল্ মা, ঘরে নিয়ে চল্!"

আমি আবার গাইলুম। মুরারিবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, "মোহন, আমার মাথাটা একটু উঁচু করে' তুলে দাও। জানলাটা খুলে দাও। চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসছে,—যতক্ষণ দেখতে পাই, পৃথিবীর নূতন সূর্য্য, নূতন আলো প্রাণভরে দেখে-নি!"

* * * *

সব শেষ! সদানন্দ মুরারিবাবুর প্রসন্ন মুখ এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না। তাঁর সেই শীতল ও অসাড় দেহ যেখানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিশয্যায় শুইয়ে দিয়েছিলুম, এখন সেখানে সুধু কয়মুঠো তপ্ত ছাই পড়ে আছে।

দাহ শেষ করে' ফিরে দেখলুম, ঘাটের কিনারায় সরমা গালে হাত দিয়ে স্তম্ভিতভাবে বসে আছে,—তার শূন্যদৃষ্টি গঙ্গার চঞ্চল স্রোত পেরিয়ে, ওপারের সবুজগাছের সার ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে, কে জানে!

আস্তে-আস্তে কাছে গিয়ে ডাকলুম, "সরমা!"

সরমা কোন সাড়া দিলে না, ভাবহীন মুখে আমার দিকে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইল।

"সরমা, স্নান করবে চল।"

সরমা কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। একবার শ্মশানের দিকে ফিরে দেখলে;—মুরারিবাবুর নিবন্ত চিতা থেকে তখনো অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে এবং তারই পাশে একটা উপুড়-করা মেটে কলসীর উপরে হরেন নীরবে মাথা হেঁট করে' বসে আপনমনে কি ভাবছে।... ... ...

হরেনের সামনেই আর-একটা নূতন চিতা সাজানো,—তার উপরে একটি পরমসুন্দর যুবকের শব—মরণ তার হিম-হাতে ছুঁয়েও যুবকের শ্রী কিছুমাত্র মলিন করতে পারে-নি! যুবার দেহ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এক তরুণী রমণী চিতার উপরে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে আছে—জনকত লোক অনেক টানাটানি করে'ও তাকে সরিয়ে আনতে পারছে না—সকলে তাকে যতই বোঝাচ্ছে, সে অভাগী ততই আর্ত্তনাদ করে' বলে উঠছে, "ওগো, আমাকেও ওঁর সঙ্গে পুড়িয়ে ফেল—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এ পোড়ারমুখও পুড়িয়ে দাও গো, পুড়িয়ে দাও!"

আঃ, এ কী দৃশ্য! হরেনের দিকে চেয়ে দেখলুম, দু-হাতে সে মুখ ঢেকে ফেলেছে, আমিও আর সইতে না পেরে আবার বললুম, "সরমা, স্নান করবে চল।"

কোন কথা না বলে সরমা ধীরে-ধীরে আমার সঙ্গে গঙ্গার জলে গিয়ে নামল। তার এই নির্ব্বাক, উদাস ভাব দেখে আমার ভারি ভাবনা হোল।

ঠিক তেমনি ভাবেই আবার সে আমার সঙ্গে এসে গাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

কিন্তু যেম্‌নি আমি গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে’ দিলুম, সরমা অত্যন্ত চমকে উঠে বললে, “অ্যাঁ! বাবা কৈ! তিনি এলেন না যে!”—তার মুখ দেখে মনে হোল, সে যেন এইমাত্র একটা দীর্ঘ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল!

—“সরমা, এ কি বলছ? স্থির হও!”

—“কেন মোহনবাবু, আমি ত স্থির হয়েছি!” বলে সে অতিশয় শুষ্ক হাসি হাসলে,—সে হাসিতে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল! সরমা হাসছে? এখন,—এই অবস্থায়!... ... ...

আমি তার হাত চেপে ধরে আকুল-ভাবে বললুম, “সরমা, সরমা!”

সরমা পলকহীন নয়নে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ছল্-ছলে হয়ে এল। অবশেষে স্থিরতার বালির বাঁধ ভেঙ্গে হঠাৎ সে “ওগো বাবা, বাবা গো” বলে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে, দু-হাতে আমার দু-হাঁটু জড়িয়ে ধরে, আমার কোলের ভিতরে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি লুকিয়ে ফেললে!

## উনিশ

## সরমার কথা

মনে হচ্ছে, এ পৃথিবীটা সুধু মস্তবড় একটা ফাঁক্! এ ফাঁক্ আর-কি কখনো ভরে উঠবে? ঐ আকাশ বাতাস আলো সবই আজ বাইরে পড়ে আছে, আমার ভিতরে তারা আসতে পারছে না, আমাকে অভিভূত করতে পারছে না, আমাকে আমার হতভাগ্যের কথা ভোলাতে পারছে না। আমি একলা, আমি একলা!

বাবা—বাবা!... ...

ঘরের দেওয়ালে বাবার এস্রাজ, বেহালা—যেমন-করে’ তিনি শেষবার টাঙ্গিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই—টাঙ্গানো রয়েছে। কত স্নেহে কত যত্নে ওদের গায়ে হাত-বুলিয়ে, ওদের সঙ্গে তিনি সকাল-সন্ধ্যায় প্রাণের কথা কইতেন, তাঁর সুখ-দুঃখের প্রতিধ্বনি নিয়ে ওরা কত হেসেছে, ওরা কত কেঁদেছে! তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গেসঙ্গে ওদেরও আজ সকল হাসি-কান্নার অবসান। ওরাও আজ অনাথ—ওরাও আজ মরেছে!...

বাবার বড় আদরের নন্নুয়া মেনুয়া মুখ চুণ করে’ ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ঘরে-ঘরে তাঁর খোঁজ করছে। এ দু-রাত তারা কী করুণ-স্বরে কেঁদেছিল! এক-একবার তারা আমার কাছে এসে, বিমর্ষ চোখে আমার মুখপানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আহা, অবোলা জীব! কিছু ত বলতে পারে না—কিন্তু তাদের সে কাতর চাহনি যেন বলতে চায়, ‘ওগো, তিনি কোথা গেলেন—তিনি?” নন্নুয়া বাবার খাটের তলায়, বিছানার উপরে,—এমন-কি, লেপের ভিতরে পর্য্যন্ত আঁতিপাঁতি করে’ খুঁজেছে,—কিন্তু কোথাও তাঁকে না-পেয়ে শেষটা কুঁই-কুঁই করে’ কেঁদে মরেছে, মানুষের মতই তার দু-চোখে ধারা বয়ে গেছে! সে খেতে চায় না, খাবার দিলে মুখ ফিরিয়ে

বসে থাকে, আর ম্রিয়মান হয়ে কি-যেন ভাবে।

নির্জ্জন বাড়ীতে একলা বসে-বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি। মোহনবাবু আর হরেনবাবু মাঝেমাঝে এসে সান্ত্বনা দিয়ে যান।

বিপদে-আপদে আমার লজ্জা-সরম দূরে গেছে; হরেনবাবু আমাকে দিদি বলে ডাকেন, আমিও তাঁকে দাদা বলি,—এতদিন তাঁর সঙ্গে কথা কইতুম না, কিন্তু এত মেশামিশির পর আর লজ্জা করা চলে না। আমার বড় সাধ, বাবার শেষ কাজটা ভাল করে'ই করব—এতে তাঁরাই আমার যা-কিছু আশা-ভরসা।

কাল সকালে এ-পাড়ায় যিনি পুরুতের কাজ করেন, তিনি এসেছিলেন। লোকটিকে দেখে আমার আদোপেই ভাল লাগল না। তিনি আমাকে মা-বলে কথা কইছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের ভাব এমনি বিশ্রী যে, আমি মাথার কাপড়টা আরো একটু টেনে না দিয়ে থাক্‌তে পারলুম না। এ-সব মানুষকে দিয়ে পবিত্র কাজ করাতে আমার মন সরে না! কিন্তু কি করব, উপায় নেই,—যারা চণ্ডালের চেয়েও নীচু, সমাজে সুধু পৈতে দেখিয়েই তারা সকলের মাথার উপরে পা দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে।

পুরুতঠাকুর এসে বললেন, "মা, একটা কথা বলতে এলুম।"

—"বলুন।"

—"তোমার পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী পুরুষ কেউ ত নেই?"

—"না।"

—"তাহলে তোমাকেই চতুর্থী করতে হবে ত?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"বেশ, তাহলে এইবেলা থেকে আয়োজন করো মা! আমিই এ-পাড়ার পুরোহিত।"

—"আমি ত তা জানি না!"

—"তুমি না জানতে পার, কিন্তু ফকির ভট্‌চায্যিকে পাড়ার কে না চেনে? তোমার পিতার সঙ্গেও আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় ছিল; আহা, তাঁর মত পুণ্যবান একালে আর দুটি দেখা যাবে না। এই সেদিন তিনি 'ভট্‌চায্যি মশাই, ভট্‌চায্যি-মশাই' বলে কত গল্পই বললেন, আর এর-মধ্যেই এই ব্যাপার! হরি হে, তোমার মহিমা বোঝা ভার! যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি! তুমি মা, পিতার উপযুক্ত কন্যা, কার্য্যটা কি-রকমে সম্পন্ন হবে, শুনি।"

আমি যা করতে চাই তাঁকে সব বললুম। তিনি অত্যন্ত আনন্দের ভাব দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, একেই বলি বাপের মত মেয়ে! হবে না কেন! শুনে বড় সুখী হলুম মা, পরকালে বেশ বুঝছি, তোমার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে! তা মা, করতে হলে এখনি থেকে বন্দোবস্ত করতে হয়।"

—"ঠাকুর, বন্দোবস্ত যা করতে হবে, তা মোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে' ত বলতে পারছি না!"

ভটচার্য্যি-মশায়ের মুখ যেন শুকিয়ে

এতটুকু হয়ে গেল। একটু থতমত খেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে' বললেন, "মোহনবাবু? কেন মা, তুমি থাকৃতে মোহন কেন?"

—"তিনিই এখন আমাদের একরকম অভিভাবক। তাঁর মত্‌ না নিয়ে ত কিছু করতে পারি না!"

ভট্‌চার্য্যি-মশাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিছু-ক্ষণ ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ভাল মা, তাই ভাল। যাই, একবার মোহনের কাছেই যাই!"

আমি একটু আশ্চর্য্য হলুম। পুরুত-ঠাকুর হঠাৎ এতটা ভেবড়ে গেলেন কেন?

কিন্তু একটু পরে মোহনবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হোল, পুরুত-ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন অনেক কথাই শুনলুম। ঠাকুরটি যে ভাল লোক নন, তা তাঁর মুখ দেখেই কতকটা ঠাওর করেছিলুম; কিন্তু তাঁর স্বভাব যে এতটা জঘন্য, তা কল্পনা করি-নি।

মোহনবাবু বললেন, "ফকির ভট্‌চায আমার কাছে কাকুতিমিনতি করতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে ওকে দিয়ে তোমার বাবার কাজ করানো হয়।"

আমি বললুম, "আহা, এতটা আশা করে' যখন এসেছে, তখন আশায় নিরাশ করা কি ভালো? হাজার হোক্ ব্রাহ্মণ ত! আর, বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, অতি-বড় শত্রুকেও তিনি শত্রু বলে ভাবতে পারতেন না। এখন তাঁর শেষ কাজের সময় বিরোধটাকেই বড় করে' দেখতে কিছুতেই আমার মন সরছে না!"

—"তবে তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক! কিন্তু তুমি জাননা সরমা, উপকার করলে এদের শত্রুতা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে। মানুষ-রূপে যারা সয়তান, অপকারীকে তারা ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে দু-পা দিয়ে থ্যাঁত্‌লায়!"

বাবার কাজ ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়ে গেল; এ জীবনে তাঁর নামে পবিত্র এত বড় দিন আর-কখনো আসবে না—এই মনে করে' আমার প্রাণ-মন হুহু করতে লাগল।

চতুর্থীর পরদিন সকালে উঠে নন্নুয়াকে দেখতে পেলুম না। তারপর একে-একে সাত-আটদিন কেটে গেল, নন্নুয়া আর ফিরে এল না—অনেক সন্ধানেও তার কোন উদ্দেশ মিলল না। যে-রাস্তা থেকে বাবা তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, রাস্তার কুকুর আবার সেই রাস্তাতেই হারিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, নন্নুয়া কি বাবাকে খুঁজতে গেল? মানুষের মায়া মানুষে ভুলে যায়, কিন্তু পশু হয়েও নন্নুয়া ত তা ভুলে থাকতে পারলে না,—মায়ার ডাকে সে ঘর ছেড়ে, সুখ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল দুঃখকে আপন করে'!

বাবা যখন-তখন একটা কথা বলতেন মনে পড়ল, 'কুকুর অনেকসময়ে মানুষের চেয়েও ঢের বড়'!

বাবার মৃত্যুর পর দেখতে-দেখতে

মাসখানেক কেটে গেল। বাবাকে হারিয়ে যে জীবনের কথা ভেবে আমাতে আর আমি ছিলুম না, সেই শূন্য জীবনই ধীরে-ধীরে আবার স্বাভাবিক ও পূর্ণ হয়ে আসছে। জীবনের সুমুখে আজ আবার নূতন ভাবে জেগে উঠছে—নূতন পথ, নূতন আশা, নূতন আলো! বিচিত্র মানুষের প্রাণ!

এর-মধ্যেই আর-এক ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন দুপুরে একলাটি বসে-বসে বই পড়ছি, হঠাৎ মোহনবাবুদের বাড়ীর ঝী এসে বললে, "মা-ঠাকরুণ আপনাকে একবার ডেকেছেন!"

বুঝলুম, আমায় ডেকেছেন মোহনবাবুর পিসিমা। একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

সে বললে, "জানিনে বাছা, তাঁর নাকি কি কথা আছে। আসবেন কি?"

আমার সঙ্গে কথা! কি কথা? কিছুই ঠাওরাতে না-পেরে বই মুড়ে উঠে বললুম, "চল, তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

ঝীয়ের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে মোহন-বাবুদের বাড়ীতে গেলুম।

দরদালানে পাড়ার একদঙ্গল মেয়ে বসে জটলা করছে—তার মধ্যে বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই আছে।

আমাকে দেখবামাত্র হৈচৈ বন্ধ হোল—সকলের মুখ দিয়ে কেমন-যেন একটা চাপা টিট্‌কিরির ভাব খেলে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো বাঁকা চোখের খরদৃষ্টি আমার মুখের সামনে যেন ধারালো ছোরার মত জ্বল্‌তে লাগল। দুরু দুরু বুকে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চোরের মত আমি একটি পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

চোখ দিয়ে যতটা বেঁধা যায়, ততটা বিঁধে, কে-একজন মুখ খুলে বললেন, "হ্যাঁগো মোহনের পিসি, মোহন কি একেই বিয়ে করতে চায়?"

—"হ্যাঁ বাছা, আমার অদেষ্ট! কপালে আরো কি আছে, দীনবন্ধুই জানেন!"

এককোণে বসে চুপিচুপি—অথচ আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়েই কে যেন কাকে বললে, "আ মরণ, ধিঙ্গির মত পোড়ারমুখ নিয়ে এখানে আসতে লজ্জা করল না, ভাই?"

আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এল, কোন মতে অস্ফুট স্বরে বললুম, "আমাকে কেন ডেকেছেন?"

মোহনবাবুর পিসী বললেন, "তুমি বাছা স্বামীকে খেয়ে আবার আমার মাথা খেতে বসেছ কেন বল দেখি?"

এ কী নিদারুণ কথা! আমার মাথার উপ্‌রে এ যেন বাজ্ ভেঙ্গে পড়ল!

—"দেশের মেয়ে দেশে যাও,—বিধবা হয়েছ বিধবার মত থাক, তা নয়,—যত সব ম্লেচ্ছ ব্যাভার! তোমাকে কেন ডেকেছি জান? আমার মোহনের যাতে সর্ব্বনাশ না হয়, তাই বলতে! এ অনাছিষ্টি অনাচারে তারও কুলে কালি পড়বে, তোমারও ধর্ম্মে সইবে না,—কি বল তিনুর মা?"

তিনুর মা বোধকরি এতক্ষণ কিছু বলতে না-পেয়ে পেটফুলে হাঁপিয়ে উঠছিলেন! কেননা, মোহনবাবুর পিসীর মুখের কথা মুখে থাকতে-থাকতেই তিনি চোখ-পাকিয়ে

বলে উঠলেন, "ওমা, তা নয় মা, তা নয়? ধর্ম্মে কি সইল? এই ত অমন জলজ্যান্ত বাপটা পট্ করে' মরে গেল!"

আর-একজন—চক্র ধরে সাপ যেমন দোলে—মাথা তুলে তেমনি দুল্‌তে-দুলতে ফোঁশ করে' উঠলেন, "মরে যাবে না! ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে!"

আর-একজন বৃদ্ধা দুই ভুরু কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বললেন, "মা, মা, মা! বিধবার বিয়ে? একালের ছুঁড়িগুলো হোল কি! মুখে আগুন, মুখে আগুন!"

—"গলায় দড়ি! দেশ থেকে এসেছেন পুরুষ মজাতে!"

—"ও যে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে!"

যাঁর যা মনে আসে, তিনি তাই বলতে লাগলেন, নেকড়ে দলে আমি যেন অসহায় এক হরিণ! এতগুলো মানুষের ভিতরে এমন কি কেউ নেই, যিনি এ অভাগীকে এদের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন? দেয়ালের গা ধরে আমি বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম,—দুঃখে কষ্টে অপমানে আমার দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।

কে-একজন কাঁসরের মত খন্‌খনে গলায় বললেন, "জানো মোহনের পিসি, কর্ত্তা বলছিলেন যে, ছুঁড়ীর বাপের শ্রাদ্ধে গিয়ে তিনি ভারি অন্যায় করেছেন!"

হঠাৎ নতুন গলায় আর-একজন কে তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "থাম পুরুত-গিন্নি, থাম! শ্রাদ্ধে গিয়ে মোটা প্রণামী আদায় করবার সময়ে ফকির ভট্‌চায্যির ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী'! তোমার কর্ত্তাটি বেশ লোক দেখছি!"

মোহনবাবুর পিসী বিরক্ত স্বরে বললেন, "যমুনা, বামুনের মেয়েকে তুই মন্দ কথা বলছিস্ কোন্ মুখে?"

—"পিসিমা, তুমি থাম বল্‌চি—আমাকে রাগিও না! বুড়ো-বয়সে তোমার ভীমরতি হয়েছে! এ বেচারী সবে বাপকে হারিয়েছে, আর তুমি কিনা একপাড়া লোক ডাকিয়ে ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ! তুমি এই করতেই আমাকে বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে আনিয়েছ? আর তোমাদেরও বলি বাছা, তোমাদের কারুর প্রাণে কি দয়া-ধর্ম্মের লেশ নেই, একটা ঘোট্ পেলেই কি এমনি ধেই-ধেই করে' নেচে উঠতে হয়?"

একজন টিপে-টিপে বিনিয়ে-বিনিয়ে বললেন, "কিলো যমুনা, বড় যে ক্যাট্‌ক্যাট্ করে' শুনিয়ে দিচ্ছিস্, তোর আবার এত মুখ ফুটলো কবে লো?"

আর-একজন বললেন, "সেদিনকার মেয়ে, উনি আবার আমাদের দয়া-ধর্ম্মের দোহাই দিচ্ছেন।"

—"ও-সব ভঙ্গিমা করে' কথা আমার সঙ্গে চলবে না, যমুনা কারুর খাতির রেখে কথা কয়-না! তোমাদের সকলকার হাঁড়ির খবরই ত জানি,—যদি মান বাঁচাতে চাও মুখটি বুজে চুপটি করে' বসে থাক; নয় ত যে যার পথ দেখ।"

কে এসে আমার হাত ধরলে; চোখের জল মুছে ভাল্ করে' চেয়ে দেখি, একটি

পরমসুন্দরী যুবতী! এঁরই নাম কি যমুনা?

তিনি কোমল স্বরে স্নেহভরে আমাকে বললেন, "লক্ষ্মীটি, কেঁদ না ভাই! দাদা বাড়ী নেই বলে এরা যো পেয়ে তোমাকে চেপে ধরেছে! এতটা হবে জানলে আমি তোমাকে আনতে দিতুম না। কিছু মনে কোরো না ভাই, বাড়ী যাও!"

বাড়ীতে এসে যখন নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, তখন আমার প্রাণ যেন বুকের মাঝে ছট্‌ফট্‌ করছে!

জীবনে দুঃখ পেয়েছি ঢের, কিন্তু এত লজ্জা এত অপমান আর-কখনো আমাকে সইতে হয়-নি। বাবার স্নেহ-আদরে এতদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে ছিলুম, বাইরের ঝড়-ঝাপটা আমাকে স্পর্শ করতেও পারে-নি। আজ বাবা যেই সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, নির্দ্দয় সংসার অমনি তার সকল কদর্য্যতা নিয়ে বিষাক্ত নিশ্বাসে আমাকে জর্জ্জরিত করে' তুলতে চায়! এইজন্তই তিনি ভয় পেতেন যে, তিনি গেলে আমার কি হবে! বুঝেছি, বুঝেছি!

আজ যা শুনলুম, এ যে ভয়ানক কথা! এরা কি ভেবেছে, মোহনবাবুকে আমি প্রেতিনীর মত পেয়ে বসেছি? এমন কথাও শুনতে হোল—মাগো!

এর পরেও আর ত আমার এ-পাড়ায় থাকা চলে না! থাকা ত চলে না কিন্তু যাব কোথা? যার মা নেই, বাপ নেই, স্বামী নেই, আপন বলতে তার আছে সুধু যম। হঁা, যম—যম .. ...একলা নারীর মরণ ভাল!

আজকের এই প্রথম লাঞ্ছনা এইখানেই থেমে যাবে না, দিনে-দিনে বাড়তে থাকবে। লোকের রসনা নিত্য-নূতন রটনা রটাবে—যে-সব বাক্যযন্ত্রণায় কানে আঙ্গুল দিতে হবে। একলা পেয়ে অবলা পেয়ে সমাজ আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে —আমার অসহায় জীবনকে ভারবহ করে' তুলবে।

আমার পক্ষ নিয়ে কে তখন এগিয়ে আসবে? মোহনবাবু?... ...হ্যাঁ, তিনি আসবেন, কিন্তু আমার জন্যে কেন তিনি আত্মীয়কে পর করবেন, সমাজকে শত্রু করবেন? আর আমাকে বাঁচাতে গিয়ে কেনই বা তিনি বিপন্ন হবেন? এতে আমিও সুখী হব না, তিনিও হবেন না —এ যে আরো ভয়ের কথা!

জীবনের সামনে যত সোনার স্বপন ফুটে উঠছিল, ভবিষ্যতের অকূল পাথারে আবার তা ডুবে গেল। আজ বুঝছি আমার এ দুঃখ মরুভূমির মত অপার,—এর-মধ্যে যাবজ্জীবন জ্বলন্ত আগুনে বুক পুড়িয়ে হা-হা করে' ছুটে মরে লাভ কি? তার চেয়ে মরা ভাল, মরা ভাল!

দু-হাতে বুক চেপে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলুম, "বাবা-গো, আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# একতারা *

( ১ )

বাংলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কবিতা অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। হালের অনেক কবি তরুণ বয়সে শঙ্করাচার্য্যের মতে "তরুণীরক্ত" না হইয়া পরমার্থ চিন্তায় মন দিতে সুরু করিয়াছেন দেখিয়া এক এক সময়ে আশঙ্কা হয় যে, বাংলাদেশে বুঝি যৌবন আর নাই। এখানে প্রকৃতি যখন শীতাপগমে নব মল্লিকার মালা কেশে পরিয়া এবং চূতমঞ্জরী কাণে কর্ণাভরণ করিয়া অভিসারিকার বেশে বাহির হন্, তখন তরুণ কবির দল 'শান্তিশতক' আওড়াইতে থাকেন —তাঁদের মনের কোন কোণায় বসন্তের আমেজ যে লাগিয়াছে, মোহের রং যে ধরিয়াছে, তার লক্ষণটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

যৌবন যে শুধুই বসিয়া বসিয়া 'ঋতুসংহার' বা 'অমরুশতক' কিংবা 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিবে—যৌবনের ধর্ম্মই যে লালসা —যৌবনকে এত ছোট করিয়া দেখিয়া তাকে আমি অপমানিত করিতে পারি না। অবশ্য লালসার দীপ্ত অগ্নিবর্ণকে কাব্যে ফুটাইয়া তোলাও শক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এ-দেশে বায়রন, কি হাইনে, কি থিওফিল গোতিয়ের মত কবি যদি একজনও জন্মিত, তবে বাংলাদেশটার মধ্যে একটা জীবনবেগ আছে, ইহা বিশ্বাস করিতাম। বাংলা কাব্যে বাসনার উত্তাপ ও দীপ্তি কোথায়? যে প্রবল বাসনার অগ্নিবর্ণে গ্রীক ট্রাজেডি, শেক্‌স্‌পীয়রের অমর নাট্যগুলি রঞ্জিত, যে দুর্দ্দান্ত বাসনার ছন্দোময় রূপ বায়রণের কাব্যে বিভ্রাজমান—বাসনার সেই প্রদীপ্ত বিভাস বাংলার কাব্যে কোথাও নাই। তবু সেই দীপ্ত বাসনাবেগকেই যৌবনের সারসর্ব্বস্ব বস্তু মনে করিতে পারি না। Romanticism বলিতে যাহা বোঝায়, যৌবনই তার উদ্বোধক, তার প্রবর্ত্তক। একালের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা (Realism) স্বভাবতন্ত্রতা (naturalism) ব্যক্তিতন্ত্রতা (individualism) এবং বিশ্বতন্ত্রতা (humanism) যে শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত ও প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তারই নাম যৌবন। আর রোমান্টিক সাহিত্য বলিতে ঐ সব আদর্শগুলিরই সমবায় বুঝায়; অর্থাৎ ঐ সব আদর্শের সমবায়েতেই রোমান্টিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এখানেও যৌবন-ধর্ম্মের ক্ষান্তি হয় না। যৌবন, সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত জীবনের নানা জটিল সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতজনিত একটা ঝঞ্ঝাময় আলোড়ন আনিয়া ফেলে। সেই ঝঞ্ঝাময় ("storm and stress") সাহিত্যও যৌবনেরি সৃষ্টি।

অতএব, বাংলা সাহিত্যে যৌবন তার

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পারিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

কাজ করিতে পারিতেছে না বলিয়া যখন আক্ষেপ করা হয়, তখন সাহিত্য এতগুলি দিক্ হইতে পূর্ণ ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে না বলিয়াই সেই আক্ষেপ। কেননা, কাব্য-সাহিত্য বলিতে যাঁরা পদাবলী সাহিত্য বা আউল বাউল সাহিত্য বুঝিয়া বসিয়া আছেন, কাব্য-সাহিত্যের সেই "রূপান্তর" ঘটাইয়া যাঁরা যুগান্তর উপস্থিত করিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁদের আমরা বলি যে, ও-সব অধ্যাত্ম-রসাত্মক কাব্যসাহিত্য উঁচুদরের জিনিস হইলেও পুরোদস্তুর সাহিত্য নয়। এবং ঐ-সব সাহিত্য বাদে, বাংলা সাহিত্যে, মোপাসাঁ-ফ্লোবেয়ারের গল্পের একটু আধটু ফিকে গোচের নকল চলিতেছে অথবা মধ্য-ভিক্টোরীয় Idyll-রচয়িতা টেনিসন-রোসেটি-হুগো'র অনুকরণে বাংলা পল্লীসৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কণ চলিতেছে বলিয়াই বাংলা-সাহিত্য ফরাসীস্ বা ইংরাজী সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এমন কথা মনে করা যায় না। একা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব রসের আধার, সব আদর্শেরই উদ্বোধক হইয়া আছেন। তিনি নিজেই এক মহা সাহিত্য। তাঁর মধ্যে সাহিত্যের সব বিভাগেরই কিছু কিছু রূপ মেলে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় যাহা তিনি ছুঁইয়া গেছেন মাত্র, অন্যান্য আর্টিষ্টদের তাহাই বিচিত্র করিয়া সাহিত্যের আসরকে জমাট্ করিয়া তোলা দরকার। বাংলা সাহিত্যে সেই কাজের অপেক্ষা আছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চির "এক-তারা" কাব্যটি পড়িয়া এইজন্য অত্যন্ত আনন্দবোধ করিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'চিত্রায়' যুগল প্রেমের বিচিত্র উপলব্ধির যে একটুখানি আভাস পাওয়া যায় এবং যে-জায়গায় ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজী সাহিত্যের টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেটি, সুইনবর্ণ এবং ফরাসী সাহিত্যের ভিক্তর হুগো, সাঁত্‌বাভ্ অগস্ত ব্রিজো, থিওফিল গোতিয়ে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য ও সারূপ্য পাওয়া যায়—যুগল প্রেমের সেই বিচিত্র উপলব্ধির দিক্‌টা, সেই বিচিত্র মানস-রসলীলার দিক্‌টা, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কাব্যে নূতন রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য; রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট। কিন্তু তাঁর উপলব্ধির নবীনতায় ও সরসতায় তাঁর কাব্য উজ্জ্বল ও নবীন। এই জন্য আমি তাঁর এই কাব্যটিকে সাহিত্যের সভায় সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

ভিক্টোরীয় যুগের যে সকল কবির নাম করা গেল, তাঁরা সকলেই যুগলের দ্বৈতকে যুগলতত্ত্বের শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁদের প্রদর্শিত মার্গ দ্বৈত-মার্গ, যুগল প্রেমের মার্গ, ব্রাউনিংয়ের ভাষায় "love-way"। সেখানে নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের বাঞ্ছিতকে নানা পরীক্ষা ও ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া খুঁজিতেছে। শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন' যুগলের সেই অন্বেষণের কাব্য। কিন্তু যখন পরস্পর পরস্পরকে বাঞ্ছিত বলিয়া চিনিল, তখনও এই অন্বেষণের বিরাম নাই—এ অন্বেষণ চিরন্তন অন্বেষণ—কেননা, এক যে অন্যের মধ্যে আপনার "শত জনমের চির সফলতা"

মাগিতেছে। ব্রাউনিংয়ের "Love in a life" যুগলের সেই চিরঅন্বেষণের কাব্য —সে অন্বেষণ জীবনব্যাপী অন্বেষণ। কারণ, যুগল প্রেম দ্বৈতের প্রেম বলিয়া এ প্রেমে মিলনেও বিরহ—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এবং বিরহেও মিলন—যে জন্য মৃত প্রিয়তমা এভিলিন্ হোপের দিকে চাহিয়া তার প্রণয়ী বলিতেছে—"I claim you still, for my own love's sake"—"আমারি প্রেমের জন্য আমি এখনও তোমার পরে দাবী রাখি। হয়ত আরো অনেক জীবনের ভিতর দিয়া আমাদের মিলন বিলম্বিত হইবে, বিচিত্র জগতের পথে হয়ত আমাকে চলিতে হইবে —তবু একদিন তোমাকে পাইবার সময় আসিবেই।" তাই, এই যুগল প্রেম দ্বন্দ্বাত্মক বলিয়াই ভোগের জন্য যখন দেহ মন ব্যাকুল—'প্রতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ তরে'—তখন ভোগের মধ্যেও জাগে ভোগ-বিরতি, জাগে বৈরাগ্যের সুর। আবার সেই ভোগ-বিরতির অবস্থায় অপূর্ব্ব মানস সম্ভোগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য যুগল প্রেমের কবিরা যুগলের এই দ্বৈত, যুগলের এই দ্বন্দ্বের লীলা ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুরটার সকল পর্দ্দাই তাঁদের কাব্যে পূর্ণস্ফুট—এ সুরের কোন গমক বা কোন মূর্চ্ছনা তাঁরা বাদ্ দেন নাই। দ্বৈতের এই সুর কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'একতারা'তেও দিব্য বাজিয়াছে। কিন্তু সেই খানেই তাঁর নূতনত্ব নয়, তাঁর বিশেষত্বও নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল যুগল প্রেমের কবি গান গাহিতেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের একটা জায়গায় পার্থক্য দেখিতে পাই। তাঁরা যুগলের দ্বৈততত্ত্বকেই চরম বলিয়া মনে করেন না। দুয়ের মধ্যেই দুয়ের শেষ তাঁরা দেখেন না। আমি এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, জর্জ্জ উইলিয়াম রাসেল ( এ, ই, ), ল্যাসেলিস্ এবারক্রম্বি প্রভৃতি অত্যন্ত আধুনিক কবিদের কথা বলিতেছি। তাঁরা যুগল প্রেমের দ্বন্দ্বাত্মক লীলার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পান্ অদ্বৈত প্রেমে বা একের অনুভূতিতে। যুগল প্রেমের সমস্ত সীমাবদ্ধ বাসনা, কামনা, বিরহ, মিলন, তৃপ্তি, অতৃপ্তি,—সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই অনন্তের মধ্যেই চির-পরিণাম খোঁজে।

হঠাৎ মনে হইতে পারে, যাহাকে সেই এক, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অনন্ত বলা যাইতেছে, তিনি বুঝি ঈশ্বর। একেবারেই না। যুগল প্রেম যে এক-প্রেমের মধ্যে আপনার উপলব্ধির চরমতাকে খোঁজে, সে এক—যুগলেরই এক। সে এক—দুই মিলিয়া এক। দুয়ের কেন্দ্রগত এক। দুয়ের পরিণত এক। যে ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিনা কেন, দুয়ের মধ্যেই সেই একের রহস্য বিরাজিত। তাকে পাইলেই দ্বৈতের দ্বৈত মেটে, নহিলে দ্বৈতের চক্রে কখনো তৃপ্তিতে কখনো অতৃপ্তিতে, কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো মিলনের মধুরতায় কখনো বিচ্ছেদের বেদনায়, ঘুরিয়া মরাই সার হয়। দ্বৈত প্রেমে ব্রাউনিংয়ের ভাষায় —"Infinite passion and the pain

of finite hearts that yearn"—সীমাবদ্ধ বাসনাশীল হৃদয়ের কেবলি অনন্ত ব্যাকুলতা এবং কেবলি অনন্ত যাতনা। কিন্তু সেই একে যখন দ্বৈত মেটে, তখন সে এক তুরীয় বা স্থিতিশীল এক থাকে না। সে একও বিচিত্র গতিশীল এক ( dynamic unity )। তাহা "বিশ্বচেতন প্রেম"। তাহা দুইকে এক করিয়া, এককে আবার বহুর দিকে লইয়া যায়। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, সে একের তুরীয় অদ্বৈত স্বরূপ ( statical Absolutism ) থাকে না, সে একের স্বরূপ গতিশীল বহু ( dynamical Pluralism) হইয়া উঠে। কবি দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণের মধ্যে আধুনিক কবিতার এই গতিশীল একের সুরও পাইয়াছি বলিয়াই তাঁর 'একতারা'কে যুগল প্রেমের এক পরমাশ্চর্য্য, পরম রহস্যময় ইতিহাস বলিয়া আদর করিতেছি। যুগল প্রেমের স্বরসপ্তকের কোন গ্রামই তাঁর কাব্যে রণিত হইতে বিরত হয় নাই। তাঁর কাব্যে ভিক্টোরীয় যুগের সুরও যেমন আছে, তাঁর কাব্যে আধুনিক যুগেরও সুর তেম্নিই আছে। তাঁর কাব্যের আরম্ভটা সে যুগে এবং সমাপ্তিটা এ যুগে।

( ২ )

প্রথমে তাঁর কাব্যের পুরাণো সুরটারই আলাপ শোনা যাক্,—অবশ্য তাঁর অনুভূতিতে সে সুরও নবীন হইয়া উঠিয়াছে। যুগলের পরস্পরের রহস্যের অন্বেষণের দিক্‌টা তাঁর কাব্যের আরম্ভভাগে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কাব্যহিসাবে এ হচ্চে পূর্ব্বরাগের কথা। আমরা ইহাকে পথের কথা বলিতে পারি। পরস্পর পরস্পরকে দুইটা নবাবিষ্কৃত জগতের মত পাইয়া তার নানা রহস্য উদ্ঘাটন করিতে লাগিয়াছে। এখানে জানিয়া যেটুকু তৃপ্তি আসে, না-জানার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি অতৃপ্তি জাগে। আবার জানার মধ্যে কত লুকোচুরি, কত ছদ্মবেশ, কত আত্মপ্রতারণা—সেগুলিও জানিতে হয় এবং সেগুলিকে জয় করিয়া ও অতিক্রম করিয়া তার চেয়ে সত্য-তর নিত্যতর জানাকেও জানিতে হয়। এই যে একটা মনুষ্য-হৃদয়ের অজানা জগতের গিরি-নদী-হ্রদ-অরণ্য-সমুদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে যাত্রা, এইটেই যুগল প্রেমের পথের কথা, এই হচ্চে যুগল প্রেমের পূর্ব্বরাগের কথা।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ যৌবন বয়স পার হইয়া তারপর প্রেমের কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া তাঁর এই পূর্ব্ব-রাগের কথা, বা পথের কথা স্মৃতির কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মৃতিটা বেশ তাজা আছে স্বীকার করি, তবু ত সেটা স্মৃতি। তাঁর যৌবনটা তাই মানস যৌবন। তাঁর "যৌবন-চোর"-প্রেম যৌবনের সব আবেশ, সব রং, সব মাধুরীকে, সেই মানস-বনে চিরপুষ্পিত করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া সেইখানে সেই অমর যৌবনকে অনুভব করিয়া কবি প্রেমের নূতন অন্বেষণে চলিতেছেন।

"দোঁহাকার এক প্রেম দুটি যৌবনের পাথে
উড়ে যে সুদূরে,
বাসনার স্বর্গ সেই নহে কিগো দোঁহাকারি
অন্তরের পুরে ?"

তাই দেখিতেছি, কবি তাঁর "জীবন-যাত্রা"র অনেকটা পথই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর এ জীবনযাত্রার সবটাই সামনের দিকের যাত্রা নয়, এর অনেকটাই পিছনের দিকে বিলম্বিত।

"তোমার মনোবনের পথে জীবনযাত্রা মোর
ঝিল্লিমন্ত্রে ঘনায় মোহ নিবিড় নিশি ঘোর।"

এই অজানা আঁধার দেশের ভিতর দিয়া 'জীবনযাত্রায়' একটি মাত্র আশ্বাস এই যে:—

"আঁধার পথের পথিক আমি
যাব যেথায় হঠাৎ থামি
দেখবো বিপুল দেউল শিরে সোণার
আলো রাজে"

এবং তথায়—

"কোন্ দেবতা সিংহাসনে?
তুমিই সে যে তুমি!"

সমস্ত জীবনব্যাপী প্রেমের অন্বেষণের পর যাকে অন্বেষণ করা যাইতেছে তার সন্ধান মিলিবেই, এই ভরসা না থাকিলে কে এত খোঁজাখুঁজি করিত!

এই কবিতাটি ব্রাউনিংএর 'Love in a life' কবিতাটি স্মরণ করায়; যদিচ তার উপমা এবং ধরণ ধারণ একেবারেই স্বতন্ত্র। সেখানে উপমাটা এই যে, একজন প্রণয়ী একটা বাড়ীর ঘরের পর ঘরে প্রিয়াকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছে না। কোন্ ঘরে তার চুলের সুবাস পায়, মুকুরে তার নিশ্বাস-চিহ্ন দেখা যায়—যেন মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে সেখানে ছিল! কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসে, তবু খোঁজ মিলে না। সে ভরসাও ছাড়ে না, দরজার পর দরজা তার কাছে কেবলি খুলিয়া যাইতেছে এবং সেই প্রেমের নিভৃত গোপন ভবনের সব রহস্যই সে দেখিয়া লইতেছে।

তার চেয়েও এ কবিতাটা সাঁতবাভের 'Oh Desert of the Heart' কবিতাটি মনে আনিয়া দেয়।

সে কবিতাটির ভাব এই:—প্রেমের পথ যখন মরুভূমি হইয়া গেছে এবং হিহি করিতেছে, তার উপর শীতের বাতাস, যখন কোথাও আশ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই —তখন মন এই কথাই বলে যে এ সব পার হইয়া এমন কোন একটি শীতল কুঞ্জে পৌছান যাইবে যেখানে নির্ঝর সতত উচ্ছ্বসিত হইতেছে, যেখানে শুধু ঊসর ধূসর মরুবালুকার অন্তহীন পাণ্ডুর বিস্তার আর নাই।

কিন্তু প্রেমের এই যে ব্যাকুল বিষাদ-পূর্ণ অন্বেষণ, এই যে সুদীর্ঘ অভিসার যাত্রা —ইহার ভিতরে ঐ প্রাপ্তির আশ্বাস বা ভরসা জাগিতেই পারিত না, যদি প্রেমটাই বিশুদ্ধ প্রেম না হইত। প্রেমের ছদ্মবেশ অনেক রকমের আছে, সেগুলি যখন দেখা দেয় বা ধরা পড়ে, তখন ঐ খোঁজা আরো বিলম্বিত হয়, পথ দীর্ঘতর হইয়া ওঠে। আমাদের প্রকৃতির ভিতরকার সেই ছদ্মবেশগুলো যে কি ভীষণ তারই ছবি আঁকিয়াছেন আধুনিক রুশ নাট্যকার এন্‌ড্রিফ তাঁর "Black Maskers"—"কালো মুখোসওয়ালা"-নামক নাট্যে। ভিতরকার সেই কঠিন বাধাগুলা যে কত বিরূপ আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে

পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা ব্রাউনিংএর "Childe Roland to the Dark Tower Came" কাব্য পড়িলেই আশ্চর্য্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ এই পথের বাধার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছেন—তার নাম 'ছদ্মপ্রেম'।

"তোমায় ভালবাসার ছলে সেদিন আমি শুধু
কেবল ভালোবাসিনু আপনারে ;
তোমার গলে পরানু মালা, আপনি হ'য়ে চোর
আড়াল হ'তে করিনু চুরি তারে।"

কিন্তু এই কবিতাটিতে ছদ্মতার ইঙ্গিত মাত্র আছে, ছদ্মতার সব রূপ এখানে ফোটে নাই। বরং তার পরের কবিতা "দেবতার আবির্ভাবে" ভিতরকার বেদনার হাহাকারময় চির-জ্বালাময় প্রাণের একটা গোপন কালো অংশ একটুখানি খুলিয়া আসিয়াছে। কবিতাটি অপূর্ব্ব। তার ভাব এই যে, প্রিয়তমার পায়ে কবি তাঁর সাত মহালা পুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কবিপ্রিয়ার মন ভরিল না। কারণ, এখনও কবি দেখান্ নাই একটি 'জীর্ণঘর রুদ্ধ চিরতরে,' যেখানে—'যুগান্তের ধূলিরাশি তাঁরে ফেলিয়াছে ঢাকি'। তিনি প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'এত রত্ন এত ফুলহার' ফেলিয়া সেই আঁধারের বক্ষ জুড়িয়া যেখানে 'অনাদি দুঃখ' বিরাজিত, সেখানে তুমি যাইতে চাও কেন? সেই ঘরের দরজা তো যুগযুগান্তর ধরিয়া কেহই খোলে নাই—সেই দরজা আজ তুমি খুলিতে চাও কেন? কিন্তু সেই কালো ঘরটাই তো প্রেমের সব চেয়ে কামনার বস্তু: সেই ঘরের দরজাই যদি বন্ধ থাকে তবে প্রেম আর করিল কি?

জন্ মেইস্‌ফিল্ডের 'Death Rooms,' 'মৃত্যুর ঘর' নামক একটি কবিতা আছে। সেই কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন যে, 'আমার আত্মার অনেকগুলি পুরাণো জীর্ণ ঘর আছে, সেই সব ঘর মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত। কিন্তু আমার প্রিয়া সেগুলি কখনো দেখিবে না, তার চরণ সেখানে কখনই পড়িবে না।' দ্বিজেন্দ্রনারায়ণও সেই Death Roomsএর কথাই বলিয়াছেন; শুধু তাঁর মুখে এই জোরের কথা মিলিল যে, আমার প্রিয়া সেগুলি না দেখিয়া ছাড়িবে না, তারই চরণ সেখানে সর্ব্বাগ্রে পড়া দরকার। নহিলে আমার উদ্ধার কোথায়?

এমন একটা আশ্চর্য্য প্রেমের কবিতা আমি বাংলা কাব্যসাহিত্যে পড়ি নাই। সকল কবিতার মধ্যেই এই একটি গভীর সুরের সাড়া পাই—ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কবির কাছে প্রেমের বাস্তবতা কতখানি সত্য! 'প্রেম ও যৌবন' কবিতাটিতে তিনি যৌবনের চঞ্চল ভোগপূর্ণ প্রেমের ছবিটা বেশ ভাল করিয়াই আঁকিয়াছেন, অথচ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, সে জিনিস চিরন্তন নয়, সে ক্ষণিক। 'ভোগবতীর চপল লীলা কোন্ মরুতে হয় যে হারা'। কিন্তু 'মন্দাকিনীর অমল ধারা' তো আর হারাইয়া যাইবার নয়।

অগস্ত ব্রিজো'র একটা কবিতা আছে 'In praise of women'—তাতে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্রিয়ার রূপ বর্ণনা দিয়া

শুরু করিয়াছেন। কিন্তু একদিন যখন বিষাদে তাঁর হৃদয় ভগ্নপ্রায়, যখন কোথাও কোন সান্ত্বনা নাই,—'Then woke thy hid beauty in the midst of my sorrow'—তখন সেই বিষাদের মধ্যে প্রিয়ার গোপন সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইল। তাই কবিতার শেষের দিকে তিনি বলিয়াছেন যে নারীর দুই রকমের সৌন্দর্য্য—'a visible beauty and a beauty unseen'—এক দৃশ্য রূপ আর এক অদৃশ্য রূপ। দৃশ্য রূপ ভোগের বস্তু, অদৃশ্য রূপ পূজার বস্তু।

সেই অদৃশ্য রূপ চোখে পড়ে না বলিয়াই কবি তাঁর অন্বেষণের পালায় প্রেমকেই 'অস্বীকার' করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে 'লোকের মুখের শোনা কথার আল্‌গা জানায় জানবো না'। আমি শেষ পর্য্যন্ত জানিব, নহিলে তোমাকেই অস্বীকার। 'অল্প সুখের লোভে আমি দুয়ারে কর হান্‌বো না।'

( ৩ )

অন্বেষণের যে সুর, উপলব্ধিরও সেই সুর। দ্বৈত প্রেমের উপলব্ধি প্রেমের সকল দ্বৈত বা দ্বন্দ্বভাবের সমাধানের জন্য ব্যাকুল। প্রেমের একটা দিক্ দূরের, অন্যদিক নিকটের; একটা দিকে তাহা ব্যাপ্ত হইতে চায়, অন্যদিকে তাহা একটিমাত্র আধারে আপন উপভোগকে নিবিড় করিতে চায়। তার একটা দিক দেহের, অন্য দিক্ দেহাতীতের। একদিকে তার সীমার রূপ, অন্যদিকে অসীম রূপ। তার ত্যাগে ভোগ, ভোগে ত্যাগ; মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন; দেশকাল নহিলে তার নয় অথচ দেশকালহীনের জন্যও তার ব্যাকুলতা। উপলব্ধির এই বৈচিত্র্যের সুরগুলি কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের অনেক গুলি কবিতার মধ্যে পাই। কয়েকটি কবিতার নমুনা দিই।

"বিরহ ও মিলন" কবিতাটিতে কবি মিলনের পরম মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছেন যে, তাঁর বিরহের প্রিয়াকে দূরে ফেলিয়া আসিয়া তিনি নিকটের প্রিয়ার মিলন সম্ভোগ করিতেছেন। তাই বিরহের বেদনা মিলনের আনন্দকে ম্লান করিয়া দিতেছে।

"আকাঙ্ক্ষিত মিলনের মাঝে
প্রাণে ব্যথা বাজে,
মরমের গোপন গভীরে
কোন্ ভৈরবীর ব্যথা কেঁদে কেঁদে ফিরে
উদাস বিষাদে ভরে মিলনের গান।

* * *

"ওগো প্রিয়া—হে অন্তর-রাণী,
আপনারে ছাড়াইয়া কেমনে না জানি
মিশে গেছ নীলাভ্রের সর্ব্ব প্রান্ত-শেষে,
কোন্ আলিঙ্গন মোর যাবে সেই দেশে ?"

প্রেমের দূর ও নিকটকে এক সুরে গাঁথিতে না পারিলে তার আর শান্তি নাই। সেইজন্য "মিলন" কবিতাটিতে কবি, প্রিয়ার সহিত তাঁর মিলন আর বিশ্বের সহিত তাঁর মিলন, এই দুই মিলনকেই—এক পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়াছেন।

"এ মিলন কি মিলন তব শুধু আমার সনে ?
ঐ যে উহার বুকের তলে
সব গগনের তারা জ্বলে,
সব কাননের ফুলের গন্ধ ভাসচে সমীরণে।"

*   *   *

"এ মিলন যে তীর্থ পরম নিখিল ভুবনের"

*   *   *

"তোমার আমার প্রেমের ডোরে
নিখিল ভুবন বাঁধা"।

তারপর প্রেমের মিলনে শুধু তো দুটি আত্মার মিলন হয় না, দেহের মিলনও সেখানে আত্মার মিলনের চেয়ে কম নয়। মিলনের পরিপূর্ণতায় দেহ বড় কি আত্মা বড়, এ প্রশ্নের কোন স্থানই থাকে না—কেননা শুধু আত্মাতেও মিলনের পূর্ণতা নাই, শুধু দেহেতেও নাই। ব্রাউনিং এ তত্ত্ব খুবই বুঝিয়াছিলেন, তাই 'র‍্যাবি বেন্ এজ্‌রা' কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন—'nor soul helps flesh more now than flesh helps soul'—আত্মা যে দেহকে বেশি সাহায্য করে কি দেহ আত্মাকে বেশি সাহায্য করে তা বলা যায় না। 'ফেরিস্তাজ্ ফ্যান্‌সিস্' নামক তাঁর কাব্যে—'Not with thy soul, O Love' একটি গীতি-কবিতায় তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আত্মা দিয়া ভালবাসিয়া আমার সব তৃপ্তি হয় না, আমাকে দেহ দিয়াও নিবিড় করিয়া ভাল-বাসিতে দাও। তখন—"Sense quenching soul"—দেহ আত্মার সব ক্ষুধার শান্তি করিয়া দিবে।

সেই দেহ ও আত্মার পরিপূর্ণ মিলনকে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ "পরম মিলন" নাম দিয়া আর একটি পরম সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন।

"দেহের দ্বারে প্রাণের নিতি
আর্ত্ত আকুল হানাহানি,
সেদিন লাজে হান্‌ত হিয়া,
বুঝেছি আজ—কি সেই বাণী!
তোমার আমার দেহে জাগে
অনু কত লক্ষ কোটি,
উপবাসী সবাই যে তার
পরশ লভি ধন্য ক'টি।"

এমনি করিয়া যে-প্রেম সব দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে করিতে চলে, তার কাছে মৃত্যুভয়টা কিছুই নয়।

"ভয় তো শুধু আপন মাঝে—
আপন পরে অবিশ্বাস,
ভয় যে শুধু মূঢ় প্রাণের প্রেমের
প্রতি পরিহাস।
"তুমি আমায় যা পেয়েছো সে পাওয়া
কি অমনি পাওয়া
সে যে আমার তোমার মাঝে তত
খানিই হ'য়ে যাওয়া।

*   *   *

"নিত্য-মুখর ঊর্ম্মি চপল কল্লোলিত
প্রাণ-সাগরে,
ঝাঁপিয়ে আমি পড়েছিলাম তিলেক তরে
ভয় না ক'রে;
তাইতো তোমায় পেয়েছিগো রবি
শশীর আলোর দেশে,
যেটুকু তোমার প্রাণের লীলার ঢেউয়ে
ঢেউয়ে বেড়ায় ভেসে।
তেমনি আবার তোমায় পাবো,
পাবো তোমায় অচঞ্চলে,
পাবো তোমায় স্তব্ধ গভীর ওই
মরণের সিন্ধুতলে।"

এই কবিতাটি ব্রাউনিংয়ের "Never the time & the place" নামক মৃত্যুঞ্জয়ী

প্রেমের কবিতাটি মনে পড়াইয়া দেয়। ব্রাউনিং সেখানে জোরের সহিত বলিতেছেন :—

"Do I hold the past
Thus firm & fast
Yet doubt if the future
hold I can ?"

আমি যদি অতীত সম্বন্ধে এমন নিশ্চিত ও সুদৃঢ়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ করিবার কারণ কি থাকিতে পারে ?

"This path so soft to pace shall lead
Thro' the magic of May to herself
indeed !"

এই কোমল সুন্দর পথ বসন্তের সকল মোহন ইন্দ্রজালের ভিতর দিয়া আমায় আমার হারানো প্রিয়ার কাছেই লইয়া যাইবে।

( ৪ )

এ পর্য্যন্ত গেল পুরানো সুর। বইখানির শেষের দিকে নূতন সুর ফুটিয়াছে—সেইখানেই আধুনিক যুগের কবিতার সঙ্গে ইহার নাড়ীর যোগ দেখিতে পাই। এ যুগের কবিদের কাছে সব চেয়ে বড় রহস্য যৌন সম্বন্ধের রহস্য ( sex-mystery )। পতিপত্নী, নায়ক-নায়িকা, এ-সব লৌকিক সম্বন্ধের আবরণ খসাইয়া শুধু স্ত্রী এবং শুধু পুরুষকে তাদের অনাদি সম্বন্ধের চির রহস্যে নিমগ্ন করিয়া তাঁরা উপলব্ধি করিতে চান্। আবার যৌন সম্বন্ধের প্রধান আধার যে দেহ—তারও আবরণ ঘুচাইয়া কেবলমাত্র অনাদি যুগলের রহস্যকে—চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারীর সম্বন্ধ-রহস্যকে—অনুভব করিতে চান্। এ যুগল কোথা হইতে আসিল, এ যুগলের রহস্যের শেষ কোথায় ? এই প্রশ্নই আধুনিক কবির সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

"দেশকালাতীত" কবিতায় কবি বলিতেছেন "পতি নহে পত্নী নহে, কেবল তুমি আমি"—"দুই চেতনা দোঁহে মিশে ছুটছে দিশাহারা দিশে"। "তুমি আমি" কবিতায় লিখিতেছেন যে, এক নিমেষে তোমার আমার জন্ম হইয়াছিল। তার আগে তুমি স্বপ্ন ছিলে, আমার চেতনাও অস্ফুট ছিল। দুজনের মিলনে মায়া মিলাইয়া গেল, দুজন দুজনকে দেখিলাম। আমি ভিন্ন তুমি নাই, তুমি ভিন্ন আমি নাই। "দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে।" কবিতার নাম যদিও তিনি দিতেছেন "আমি তুমি," কিন্তু এ আমিও আমি নয় এবং এ তুমিও তুমি নয়। কে আমি, কে তুমি, তাহা নির্ণয় করিবে কে ?

ইংরেজ কবি স্যামুয়েল ওয়াডিংটনের একটা কবিতায় আছে যে, প্রেম যখন প্রেমের দ্বারে আসিয়া ঘা দিল, তখন ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে তুমি ? বাহির হইতে প্রেম উত্তর দিল 'আমি'। কিন্তু ভিতরের প্রেম দরজা খুলিল না। আবার প্রেম আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। এবারও ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে তুমি ? তোমার নাম কি ? বাহির হইতে প্রেম উত্তর দিল, "আমি তুমি"। তখনি দরজা খুলিয়া গেল, "and love's mystery told"—প্রেমের রহস্য বর্ণিত হইল।

"ব্যবধান" নামক আর একটি পরমাশ্চর্য্য

কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তুমি-আমি'র মধ্যে এতটুকু ব্যবধানের ভার সহ্য হয় না; 'চিরযুগের প্রীতি'র স্মৃতির ভার সহ্য হয় না; জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতির আবরণ সহ্য হয় না; এমন কি দেহের ব্যবধানও সহ্য হয় না।

কবিতাটি পড়িয়াই মনে হইল যুগল রহস্যের এমন কবিতা আর কোথায় পড়িয়াছি? ল্যাসিলিস্ এবারক্রম্‌বি'র "Emblems of love" কবিতাটি মনে পড়িল। সেই কাব্যে অনাদি "He" পুরুষ এবং অনাদি "She" নারী নিজেদের যৌন আকর্ষণের রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত। তারা বুঝিতেছে যে এক অখণ্ড আনন্দ "আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ"—সেই অদ্বৈতেরই তারা দ্বৈত, পুনরায় সেই অদ্বৈত হইবার জন্য তাদের ভিতর হইতে তাগিদ্ জাগিতেছে। "contrived joy is sex in life"।

( ৫ )

কিন্তু এই রহস্যের মেঘলোকেই এ কাব্যের সমাপ্তি হয় নাই। সর্ব্বাবরণমুক্ত যুগলের অপূর্ব্ব রহস্য-উপলব্ধিতেই কবির যুগল প্রেমের গান শেষ হয় নাই। সেই মেঘলোক হইতে তাঁর প্রেমকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করাইয়া তাকে সফল করা দরকার। দুই দিক্ হইতে 'সফল প্রেমে'র কথা তিনি বলিয়াছেন। এক সফলতা—সন্তান সন্ততির মধ্যে। প্রেম সেইখানে চির-অমর। 'মোদের ছেলে মেয়ের মাঝে মোদের জীবন ধারা বহে।' কিন্তু তার চেয়েও বড় সফলতা যখন প্রেম "বিশ্ব-চেতন প্রেম" হয়—যখন প্রেম এই কথা বুঝে যে সর্ব্বমুক্তি বিনা কারো একলার মুক্তি নাই। জগতের যত বন্ধন, যত বেদনা, যত অশান্তি, যত ক্ষুধা, যত হাহাকার —সেই সমস্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে তবেই যুগল, দ্বৈত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে। দ্বৈত হইতে মুক্তি পাইতে গেলে প্রথমে দুয়ের মধ্যে এককে অনুভব করিতে হয়। কিন্তু এককে অনুভব করার পর সেই একের মধ্যে বহুর অনুভূতি আসে। সেই বহুর অনুভূতির কথাই 'বিশ্বচেতন প্রেম' কবিতাটিতে জাগিয়াছে।

"তোমায় আমি বাসবো ভালো  
বাস্‌বে তুমি মোরে  
এইতো ছিল কথা—  
কোথা হ'তে পড়লো এসে  
হায়গো কেমন ক'রে  
সব জগতের ব্যথা।"

* * *

"পরম অভিষেক যে প্রেমের সবার আঁখিজলে  
নিখিল হৃদয়পুরে।"

এই বহুর চেতনাতেই যুগল প্রেমের কাব্য সমাপ্ত। অতএব আমিও এইখানেই এ কাব্যের পরিচয়ের কথা শেষ করিতে পারি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

# ভারত-রমণীর অবস্থার উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

## ( সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা )

ভারত-রমণীগণের এই প্রকার অবস্থা। পার্সী-রমণী ব্যতীত, অধিকাংশ রমণীই কুসংস্কারাপন্না, অজ্ঞ। পুরুষরা প্রায়ই তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে, তাহারা প্রায়ই হতভাগ্য ও অ-সুখী।

নারীর অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা খুব উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন।

দৈহিক অবস্থা।—এই সম্বন্ধে, লেডি ডফরীনের কাজটাই সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোনও ডাক্তার, মুসলমান মহিলা অথবা হিন্দু-মহিলার নিকটে যাইতে পারে না বলিয়া, লেডি ডফরীন ভারতের বড়-বড় নগরে, নারীদিগের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন, একটি ডাক্তারণী-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই সকল ডাক্তারণী হাসপাতালে কাজ করেন, অন্তঃপুরে রোগী দেখিতে যান। ( ১ )

মানসিক অবস্থা।—রমণীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য, কতকগুলি য়ুরোপীয় ও কতকগুলি হিন্দু মহিলা অন্তঃপুরে বা অন্দরমহলে যাতায়াত করেন। কতক-

---

( ১ ) রোগগ্রস্তা ভারত-রমণীরা,—গাছ-গাছড়া বিক্রেতা ও ওঝাদিগের শরণাপন্ন হয়; ধাত্রীরা "ধাই" নামে অভিহিত হইয়া থাকে : বলা বহুল্য, উহারা চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই কারণেই, অন্তঃপুরের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী। তাই সদ্যপ্রসবা রমণীদের মধ্যে সূতিকা-জ্বর প্রায়ই হইয়া থাকে। শিশুহত্যা প্রচলিত :—একজন বৃদ্ধা ধাই শত শত নবজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া কবুল করিয়াছিল।

লেডি ডফারীণের কাজটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, লাহোর, আগ্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, উদয়পুর, অল্‌ওয়ার, দ্বারভাঙ্গা, নাগপুর, রেঙ্গুন, মহীশূর, হইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের কার্য্য "ভারতরমণীর চিকিৎসার সাহায্যার্থ জাতীয় সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। যাহারা রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা করে তাহারা কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত যথা :—ডাক্তারণী ( ইংলণ্ডের বা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ); সহকারিণী ডাক্তার (assistant surgeon এবং হাসপাতালের সহকারিণী ( hospital assistant )।

১৮৯১ অব্দে ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭,৬৬২ ; সাক্ষর রমণী ৫৪৩,৪৯৫ ; নিরক্ষর রমণী ১২৭,৭২৬,৭৬৮। ১৯০০-০১ অব্দে, স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা, ব্রহ্মদেশে ( ৩৮,৪৪৩ ); আসামে ( ৮,৭৬৯ ); বঙ্গদেশে ( ১০৩, ৬৬১ ), সম্মিলিত প্রদেশে ( ২১,৩১৪ ); পঞ্জাবে ( ২৩,৬৭০ ); বোম্বাইএ ( ৮৯,৭৪৫ ); মধ্যপ্রদেশে ( ১১,২০৮ ) মাদ্রাজে ( ১২৮,০৭৩ )। স্কুলে-যাওয়া বালিকা ও বালকের অনুপাত :—য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গি-দের মধ্যে ( ১ হইতে ১০৭ ); নেটিভ খৃষ্টানদের মধ্যে ( ১ হইতে ১,৬৯ ); পার্শীদের মধ্যে ( ১ হইতে ১,৯৫ ) হিন্দুদের মধ্যে ( ১ হইতে ১০,৪৭ ), মুসলমানদিগের মধ্যে ( ১ হইতে ১১,১২ ); বঙ্গ-মুসল-মানদিগের মধ্যে ( ১ হইতে ২০,৯৯ )।

গুলি ভারতবাসী তাঁহাদের মেয়েদিগকে স্কুল কিংবা কালেজেও পাঠাইয়া থাকেন। অবশ্য শিক্ষার কাজ খুব মন্থর গতিতেই চলিতেছে। ১৮৯১ অব্দে শতকরা ১০০ জন হিসাবে ৯৯, ৫২ জন একেবারেই নিরক্ষর। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ৪২৫, ৭৬৯ জন বালিকা সরকারী কিংবা বে-সরকারী স্কুলে গমন করে; ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪২৯, ৬৪৫ জন। সেই বৎসরেই ৪৪, ৬৩৬ জন বালিকা মাধ্যমিক শিক্ষা, ১৭১জন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। পক্ষান্তরে কতকগুলি ভারত-মহিলা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (২) অনেকগুলি সংবাদ-পত্র কেবল রমণীর দ্বারা পরিচালিত, তন্মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য "বাঙ্গালী" *

সামাজিক অবস্থা।—শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে, অবরোধ ততটা কড়াকড় ভাবে রক্ষিত হয় না। রমণীরা থিয়েটারে গিয়া গরাদে-ঘেরা "বাক্স"-আসনে উপবেসন করে; উহাদিগকে রাস্তায় দেখা যায়, দোকানে দেখা যায়, সরকারী উদ্যানে দেখা যায়, প্রদর্শনীতে দেখা যায়। উচ্চবর্ণের রমণীরা যে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে তাহা ততটা লম্বা নহে, ততটা মোটা নহে। পার্শী-রমণীরা বোম্বাই-নগরে একটা ক্লব স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় কতকগুলি হিন্দু-মহিলা গাড়ী হাঁকান, ঘোড়ায় চড়েন, হোটেলে আহার করেন, বড়লাটের অভ্যর্থনা-সভায় গমন করেন।

* * *

রক্ষণশীল দলের লোকেরা এই য়ুরোপীয় রীতি-নীতির অনুকরণ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি মাদ্রাজের কোন-এক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল (১৮৯৩):—

এই যুবকবৃন্দ ফ্যাশানের ভক্ত, লঘু আমোদ-প্রমোদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা এমন ভাবে নিজ পত্নীদের শিক্ষা দেয় যাহাতে তাহারা তাহাদের যোগ্য সঙ্গী হইতে পারে। তাহারা স্ত্রীর সহিত একসঙ্গে উপন্যাস নাটকাদি পাঠ করে এবং এইরূপ ধরণের উপন্যাস ও নাটক যাহাতে অতীব হীনচরিত্র নায়কের প্রেমলীলা অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে; নির্দোষ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের রুচি কলুষিত করিবার ইহা অপেক্ষা উত্তম উপায় আর কি-হইতে পারে? ইহাই সব নহে। তাহারা আপন স্ত্রী-দিগকে য়ুরোপীয় বেশ-ভূষায় ভূষিত করে,

(২) "হিন্দুযুবকদের শিক্ষাকল্পে কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট নারী-সমিতি," ১৮২১ (২০০ ছাত্র ১৮৩৪ অব্দে "চর্চ্চ-মিশনারি সোসাইটির স্কুল" এবং "লণ্ডন-মিশনারি সভা"। Drinkwater Bethune কর্তৃক বেথুন-স্কুলের প্রতিষ্ঠা (১৮৪৯); ১৮৫৭ অব্দে এই স্কুল সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। হিন্দু-সভ্যতার দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১১৫) M. Bose কতকগুলি হিন্দুমহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যথা:—অহল্যাবাই, যিনি মধ্যভারতের এক রাজ্য শাসন করিতেন; নাটোর-রাজ্যের রাণী ভবানী, ইত্যাদি Calcutta Review Vol LX. P. 56 এবং LVI, P P. 10-27 দ্রষ্টব্য)।

* এ সংবাদটা আমাদের নিকট ত খুবই নূতন—সুরেন্দ্রবাবু এ সংবাদ রাখেন কি?—অনুবাদক।

এবং একসঙ্গে বিদেশী খাদ্য ভোজন করে —এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আমাদের এই তথাকথিত অগ্রসর যুবকেরা তাঁহাদের নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত পত্নীদিগকে অতিমাত্র প্রশ্রয় দেন ঃ সুতরাং তাঁহাদের পত্নীরাও পরিবারের অন্তর্গত অন্য আত্মীয়দিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা রান্না এবং অন্যান্য ঘরকন্নার কাজকে মজুরের কাজ মনে করেন। তাঁহারা কতকগুলি সহচরীর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া নব্য কেতার সাজগোজে আপনাদিগকে বিভূষিত করিয়াই কালযাপন করেন। ঐখানেই কখন তাশ-পাশা খেলিয়া, কখন বা গল্পের বই পড়িয়া সময় কাটান্। কাজে-লাগিবার মত যদি কোন কাজ কখন করেন তো সে পশমী টুপি ও গলাবন্দ শেলাই করা ;—তাও আমোদের হিসাবে করেন, প্রয়োজনের হিসাবে নহে। এই সকল জিনিষ পরিবার-মণ্ডলীর মধ্যে প্রায় কখনই ব্যবহার হয় না। ঐ সকল জিনিষ উপহারস্বরূপ বন্ধুবর্গকে বিতরণ করা হয়।

এই তথাকথিত "জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত" মহিলাদিগের আচরণ গিন্নিদিগের চোখে বড়ই খারাপ ঠেকে এবং এইরূপে গৃহের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। পরিবারের অন্তর্গত অন্য রমণী, যাঁহারা "আলোকপ্রাপ্ত" ধাঁচার লোক নহেন তাঁহারা কেবল ঘরকন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং কেতা-দুরস্ত মহিলারা যে-সব কাজে হাত না দেন সেই-সব কাজ অগত্যা গিন্নীদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে···

যে-সব গুণের জন্য হিন্দু-রমণীরা প্রসিদ্ধ তাহা একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। যেখানে আত্মীয়দের প্রতি, পাড়া-প্রতি-বাসীদের প্রতি মমতা ছিল, সেই মমতার স্থান স্বার্থপরতা আসিয়া অধিকার করিয়াছে ; গুরুজনের প্রতি যেখানে ভক্তি ছিল, সেখানে ঔদ্ধত্য আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের যে পরিচ্ছদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী ছিল, তাহার স্থান, বিলাতি বেশভূষা আসিয়া দখল করিয়াছে।"

প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুরা এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে প্রাচীন মতে শিক্ষিতা ও পরিবর্দ্ধিতা রমণীগণের প্রতিকূলতা যতটা প্রবল, পুরুষদিগের প্রতিকূলতা ততটা প্রবল নহে।

উন্নতির পথে অগ্রসর কোন এক সংবাদপত্র এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন ঃ—

"নারীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা যে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা শুধু য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে নহে, পরন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু নিজের অল্পস্বল্প সমাজসংস্কার-চেষ্টার অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকের পথে যে ভীষণ প্রতিবন্ধক আছে তাহা জ্ঞানান্ধ শাস্ত্রের আদেশ কিম্বা জাতের খাম-খেয়ালী শাসন-নিয়ম ততটা নহে যতটা আমাদের রমণী-দিগের অজ্ঞতা। শিক্ষিত পুরুষেরা, কি শাস্ত্র, কি জাত দুইয়ের কোনটাতেই আবদ্ধ নহে ; সমাজ-সংস্কারের জন্য তাঁহারা উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু গার্হস্থ্য সুখের বিনিময়ে স্বকীয় প্রীতি-ভাজন ও ভক্তিভাজন আত্মীয়াদের শুভকামনা ও সাহচর্য্যের বিনিময়ে, নূতন-কিছু

প্রবর্ত্তিত করা,—খুব বেশী আত্মবলিদানের কাজ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; বস্তুত তাঁহারা মনে করেন, ঐরূপ নূতন-কিছু করায় কোন ফল হইবে না। শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষিতা রমণীরাও সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে কেন না পারিবেন—না বুঝিবার কোন হেতু নাই। কেবল যদি আমরা ভারত-রমণীদের শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করি, তাহা হইলে অন্য বাধা-বিঘ্ন আমাদের পথ হইতে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। হিন্দু-সমাজ—একটা প্রকাণ্ড প্রাণশূন্য জড়পিণ্ড; উহাকে নড়াইতে হইলে, অনেকটা জায়গা লইয়া খুব একটা ঠেলা দেওয়া আবশ্যক। যতই সাহসী ও উৎসাহী হউন না কেন, দুই-একজন লোকের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না; সুবিধাবোধ বা ব্যক্তিগত গর্ব্বও আমাদের সমাজকে নড়াইতে পারে না। সমাজের মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইবে; সমাজের মধ্যে প্রাণ-শক্তি আবার ফিরিয়া আসা চাই। কিন্তু যতদিন না রমণীরা সংস্কার ও উন্নতির পথে পুরুষদিগের সহিত একত্র চলিয়া পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিবেন, ততদিন ইহা কখনই ঘটিবে না" (Hindu 1889)।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে, নব্য হিন্দুদিগের সংস্কার-চেষ্টার মর্ম্মভাবটা আরো ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, "পজিটিভিষ্ট"-সম্প্রদায়ের নেতা M. Ghoseর গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই কথাটা উপেক্ষা করিলে চলিবে না যে, আমাদের অতীত ইতিহাসের বৈধ পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। এবং আমাদের চিন্তা আমাদের অবস্থার ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলেও, যদি সেই সকল চিন্তা ও উচ্চস্পৃহা আমাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের নিকট আমরা খাঁটি থাকিতে পারিব না। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, সমস্ত জগতের আশীর্ব্বাদস্বরূপ যে "পজিটিভিজম্‌" সেই "পজিটিভিজমের" খাতিরে আমরা সেই সব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না যাঁহাদের মধ্যে অতীতকাল, বর্ত্তমানেও সজীব ও সচল রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের দেশের সেই সব অধিকাংশ লোক—যাঁহাদের নিকট য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিচিতই থাকিবে। নিজেকে আমরা আপন সমাজ হইতে এইরূপ পৃথক্‌ হইয়া থাকিতে দিব না। শুধু তাহা নহে,—বরং চারিকোটি লোক যাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, আমাদের নিজের ভাষায় যাহারা কথা কহে—সেই সব লোকের উপর আমাদের সমস্ত স্নেহমমতা কেন্দ্রীভূত করিব। আমাদের বিবেচনায় আমাদের এই স্বদেশবাসীরা যতই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হউক না কেন, পজিটিভিজম আসিয়া আমাদের জমাট্‌ ঐক্যটাকে যে বিচলিত করিয়া তুলিবে তাহার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের সহিত জমাট্‌

ঐক্য স্থাপনের অনিশ্চিত ও সংশয়াত্মক লাভের জন্য, আমাদের নিজের জমাট্ ঐক্যকে বিচলিত করা আমরা আবশ্যক মনে করি না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত আমাদের সংস্পর্শটাই আমাদের সেই শক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে যে শক্তির দ্বারা আমরা—কোঁৎ যাহাকে বলেন "সহজাত প্রবণতা", আমাদের স্বদেশবাসীর সেই সহজ প্রবণতা-সমূহের উচিত মূল্য ও মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ঐ প্রবণতাগুলির মধ্যে একটা কষাকষির টান অনুভব করিয়া, আমরা তাহাদিগের হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। তাই পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যতীত ঐ সকল প্রবণতা স্বাধীন ভাবে কিরূপে পজিটিজমে আসিয়া মিলিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি এরূপ আমাদের অবস্থা নহে ; তাহাদের দ্রুত উন্নতিসাধনকল্পে আমরা কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, সে বিষয়ে কোন কিছু স্থির করাও আমাদের পক্ষে আরো দুঃসাধ্য।

সে যাই হোক্—যদি আমরা মনে করি, আপাতত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আচরণের মধ্যেই আমাদের কাজটাকে বদ্ধ রাখিব, তাহা হইলে দেখিব এই সমস্যায় জটিলতার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কারণ, আমরা যে সমাজ ও গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, সেই সমাজ ও গবর্ণমেন্টের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া, যদি আমরা প্রত্যেকে, প্রকৃত পজিটিভিষ্টের মত জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকের নিকট এই সমস্যা-প্রশ্নের একটা ভাল-রকম উত্তর দেওয়া হইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও পজিটিভিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় দুই অতি বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমাদের জীবনে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সুন্দর মিলন স্থাপিত হইয়া বেশ একটা কাজ হইবে।" (কটনের New India গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ-১৭০)

* *
*

এক্ষণে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। এই পরিবর্ত্তনের দুইটি স্পষ্ট কারণ দেখা যায়ঃ—এই সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ; এবং ইংলণ্ডের ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব।

যতই জটিল হউক না কেন, এই পরিবর্ত্তনের উপর একটি তথ্যের আধিপত্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—প্রাচীন সমাজের ঐক্যতত্ত্ব যে "পরিবারতন্ত্র" সেই পরিবারতন্ত্রের স্থান, অর্ব্বাচীন সমাজের ঐক্যতত্ত্ব যে "ব্যক্তিতন্ত্র" সেই ব্যক্তিতন্ত্র আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

পরিবার বা বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের পদমর্য্যাদাক্রম বজায় রাখিবার জন্য, বর্ণভেদ পদ্ধতি কতকগুলি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল। খুব প্রাচীনপন্থীদিগের নিকট এই সকল নিয়ম, আজিকার দিনে, অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, নব্য হিন্দুদের চক্ষে ঘৃণিত ও হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়। বংশের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য, বংশের

মর্ম্মভাব রক্ষা করিবার জন্য পিতৃপ্রভুত্ব, অ-বিভক্ত স্বত্বাধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আজিকার দিনে, ভায়ে-ভায়ে পৃথক্ হইতেছে, পিতা-পুত্রে পৃথক্ হইতেছে। একসঙ্গে বাস করিলেও, এই সম্মিলন তাহাদের নিকট ভারবহ বলিয়া মনে হয়। একসঙ্গে থাকা সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করেন; উহাতে করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্যম-চেষ্টা অসাড় হইয়া পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ-গুণ বা শক্তি-সামর্থ্য বিলুপ্ত হয়। এতাবৎকাল কৌলিক রীতিনীতি, কৌলিক পূজা-পদ্ধতি বজায় রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, উহার নিকট ব্যক্তি-বিশেষের গুণ ও প্রতিভা নগণ্য ছিল।

কিন্তু আজকাল নারীর কাজসম্বন্ধে সমাজসংস্কারকদের যেরূপ মতামত, তাহার মধ্যে এই সকল নূতন ভাবের চিত্র আরও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখা যায়।

অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ হয়—ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কি জন্য এই ব্যবস্থা? কারণ, বেশী বয়সে তাহারা নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবে, তাহা হইতে অযোগ্য মিলন সংঘটিত হইবে, এবং এই অযোগ্য মিলনের ফলে, বর্ণভেদ-পদ্ধতি বিনষ্ট হইবে।

শাস্ত্রে বহুবিবাহ অনুমোদিত। কেন অনুমোদিত? কারণ, কৌলিক ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্রের অধিষ্ঠান একান্তই আবশ্যক; প্রথম বিবাহে পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পরিবারের কর্ত্তা অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। কি জন্য নিষিদ্ধ? কারণ, বিবাহ দশসংস্কারের মধ্যে একটা সংস্কার,—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র অনুষ্ঠান। বিবাহের দ্বারা কন্যা, স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে, গৃহদেবতা হইতে, গোত্র হইতে তফাৎ হইয়া পড়ে; সে নূতন ধর্ম্ম, নূতন গৃহ-দেবতা, নূতন গোত্র প্রাপ্ত হয়। এবং এই একই বিবাহিতা কন্যা, যে-গম্ভীর অনুষ্ঠানের দ্বারা সতিবংশের সহিত বিবাহবন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়াছিল সে-সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আজ কিনা সে অন্য গৃহের দেবতাকে বরণ করিবে?

কিন্তু নারী এই তিন নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এইরূপ সমাজ-সংস্কারকেরা ঘোষণা করেন। কাহার নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন?—স্বাধীনতার নামে, মানব-গৌরবের নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন। মালাবারি আরও এই কথা বলেন:—নারীগণের সুখী হইবার যে-অধিকার আছে সেই অধিকারের নামে, তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন।

বংশের উদ্দেশে, সমস্ত সমাজ-পদ্ধতির উদ্দেশে, নারীকে যেরূপ বলিদান করা হয়, তাহা অনেক ভারতবাসী এক্ষণে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া মনে করে। (৩)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(৩) কোঁতের "পজিটিভ্ ফিলজফি" হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত আলোচনাটা শেষ করিব। (পঞ্চমখণ্ড পৃষ্ঠা ১৮৩)

"এই সার্ব্বভৌমিকতা ন্যূনাধিক পরিমাণে স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত এবং জাতের পদ্ধতিটাও দৃঢ়রূপে ও গভীররূপে বদ্ধমূল; ইহা হইতে আমাদের এইরূপ ভাবা উচিত যে, উহার অসুবিধা যতই হউক না

# খ্যাতি

( গল্প )

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মিতিয়া কুল্দরফ দ্রুত আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মা জানালার ধারে বসিয়াছিল—এতখানি রাত্রি হইয়াছে, ছেলের এখনও দেখা নাই! এক অনিশ্চিত ভয়ে মার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বাপ বিছানায় অন্য ছেলেদের লইয়া শুইয়াছিল; বোন্ কিটী একখানা

---

কেন, জাতের অভ্যুদয়কালে, মানবজাতির প্রধান প্রয়োজনগুলির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য ছিল। ফলত ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, কি সামাজিক, কি মানসিক সকল বিষয়ের মুলগত ক্রমবিকাশের একটা সূত্রপাত আবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ স্পষ্টই দেখা যায়, উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত; কারণ, আদিম কালে ইহাই খুব স্বাভাবিক যে, ব্যবসায়ের মৌলিকতা গার্হস্থ্য অনুকরণের দ্বারা, শিক্ষার একটা সহজ ও প্রবল উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। তখনকার কালে এই উপায়টিই সুসাধ্য ছিল।

আবার শ্রুতির দ্বারাই তখন সমস্ত ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইত...

দ্বিতীয়তঃ এই স্বতঃস্ফূর্ত্তি ব্যতীত এই আদিম পদ্ধতির যে কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, তাহাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে। বিচার ও আচারের মধ্যে ঐ পদ্ধতি একটা-যে চিরস্থায়ী সর্ব্বোচ্চ বিভাগ স্থাপন করিয়াছিল, মানসিক ক্রমবিকাশ তাহার নিকট চিরঋণী। একটি চিন্তাশীল 'জাত' একটা বিশেষ প্রকারের উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই সময় মানসিক ক্রমবিকাশের সূত্রপাত করিয়াছিল। কাজের পূর্ণতা ও ধারাবাহিকতা সম্পাদনের জন্য যে পদমর্য্যাদা ও অবসর আবশ্যক, উক্ত জাত স্বভাবতই সেই পদমর্য্যাদা ও অবসর লাভ করিয়াছিল।

সামাজিক দৃষ্টিভূমি হইতে দেখিতে গেলে, আদিমকালে এইরূপ পদ্ধতির সুবিধাও কম পরিস্ফুট নহে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে, স্থায়িত্বই উহার প্রধান ধর্ম্ম স্পষ্টই দেখা যায়। কি আভ্যন্তরীণ, কি বাহ্য সকল প্রকার ভীষণ আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে বা সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যত প্রকার সতর্কতার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তৎসমস্তই যথাসম্ভব প্রভূত উদ্যম সহকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অভ্যন্তরে, বিভিন্ন খণ্ড-জাতগুলা আসলে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন,—পুরোহিত-জাতের অধীনেই, তাহারা একটা সাধারণ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কারণ তাহারা সকলেই নানাপ্রকার অভাব অনুভব করিত, এবং একমাত্র পুরোহিত জাত হইতেই তাহাদের দৈনন্দিন অভাব মোচন হইত; পুরোহিত জাত হইতেই তাহারা প্রতিদিন জ্ঞানের আলোক ও কর্ম্মের উদ্দীপনা লাভ করিত. সকল বিষয়েই পুরোহিত জাতের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের একদণ্ডও চলিত না। পরে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতের মধ্যে যেরূপ গভীর ভাবে ও তীব্রভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই শ্রেষ্ঠ জাতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত পুরোহিত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, শুধু পুরোহিত ও নগরপালের কাজ করিত না, পরন্তু পণ্ডিত, কলাবিৎ, শিল্পী ও চিকিৎসকের কাজও করিত।

এই সকল উচ্চগুণসত্ত্বেও ইহা নিশ্চিত,—এই পৌরোহিতিক পদ্ধতি, সকল বিষয়েই মানব-ক্রমবিকাশের একটা সূত্রপাত করিয়া দিয়া,—পরে উহাই আবার চরম উন্নতির,—মানসিক বা সামাজিক উন্নতির বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। অতিমাত্র স্থায়িত্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত এই পদ্ধতি ক্রমশ একগুঁয়ে ধরণের অ-চলিষ্ণুতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। উন্নতির নূতন নূতন বিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের যে আবশ্যকতা আছে তাহা উহার ধারণায় আসিল না।

নভেলের শেষ পৃষ্ঠাকয়খানার উপর সমস্ত মনটুকুকে ঢালিয়া দিয়াছিল।

মিতিয়া আসিয়া ডাকিল, "মা।"

মা চমকিয়া মিতিয়ার পানে চাহিল। মিতিয়ার মুখ উত্তেজনায় ভরা; চুলগুলা রুক্ষ, স্বর কম্পিত। মা বলিল, "কি রে, ব্যাপার কি? এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায়, বল্ দেখি?"

"ছিলুম কোথায়!" মিতিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য! কিছুই জান না? কোন খবর পাওনি! বল কি,—সারা র‍্যশিয়াতে এ খবর রটে গেল, আর তুমি, আমার মা, তুমি সে খবর জানো না!"

বিস্ময়ে মা মিতিয়ার পানে চাহিয়া রহিল। কিটী নভেল ফেলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বাপও মশারি তুলিয়া মুখ বাড়াইয়া ছেলের দিকে চাহিল।

কিটী বলিল, "হয়েছে কি দাদা? তোমার চেহারা যে ভূতের মত দেখাচ্ছে!"

"ভূতের মত!"

মা বলিল, "তা না ত কি! চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, মুখের সে শ্রী নেই! ব্যাপার কি, বল্ ত!"

মিতিয়া বলিল, "বংশের মুখ আজ আমি উজ্জ্বল করেছি, মা। বড় সৌভাগ্য আমার। সারা র‍্যশিয়া আজ আমার নাম জেনেছে। কে জান্‌ত র‍্যশিয়ার কোন্ কোণে কোথায় দিমিত্রি কুল্‌দরফ বলে কেউ থাকে কি না! কিন্তু এখন রশিয়া আমার নাম জানে, ঠিকানা জানে, সব জানে। ওঃ—"

মিতিয়ার উচ্চহাস্যে ছোট ভাইগুলির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা বিচিত্র কলরব জুড়িয়া দিল। বাপ বিছানা ছাড়িয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, সব খুলে বল্ দেখি!"

"কি হয়েছে—! পৃথিবীর খবর তোমরা কোনদিন রাখলে না ত! জানবে কি, কি হয়েছে! আর এই কিটী, রাজ্যের বাজে নভেল পড়ছে শুধু, খবরের কাগজ কোনদিন ত একখানা পড়লে না! দেশ-বিদেশের যত বড়বড় খবর তাতে বেরুচ্ছে! যেখানে যে মস্ত ঘটনা ঘটছে, খবরের কাগজওলারা অমনি তা ছেপে দিচ্ছে, আর পৃথিবীময় সে খবর নিমেষে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুই আর কোথাও চাপা থাকছে না। যত বড় বড় লোকের খুঁটিনাটি খবর ছেপে বেরুচ্ছে আর দিক্-বিদিকে সে খবর রটে যাচ্ছে—"

বাপ বিরক্ত স্বরে কহিল, "নে, পাগলামি করতে হবে না আর, রাত হয়েছে, শুগে যা। সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আবার পাগলের মত বক্‌ছিস্, লজ্জা করছে না?"

"লজ্জা! এই দেখ তবে পড়ে। কি লিখেছে, পড়। সমস্ত র‍্যশিয়া এ কথা জানে, আর তোমরা জানো না! নাও, পড়—পড়ে কাগজখানা তুলে রেখো, রোজ একবার করে সকলে পড়ব। মিতিয়া কুল্‌দরফ্ কত বড়লোক তা এ খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে পারবে।"

মিতিয়া একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া বাপের সম্মুখে ধরিল—একটা জায়গা দেখাইয়া কহিল, "এই যে এইখানাটায় লিখেছে। পড়, চেঁচিয়ে পড়। আচ্ছা, কিটী, তুইই পড়্, বাবা মাকে শুনিয়ে পড়ে দে।"

কিটী পড়িতে লাগিল, "২৭এ ডিসেম্বর রাত্রি এগারটার সময় দিমিত্রি কুল্‌দরফ নামে এক তরুণ যুবা—"

বাধা দিয়া মিতিয়া কহিল, "দিমিত্রি কুল্‌দরফ—শুনছ? দেখছ ত—হাঁ, দিমিত্রি কুল্‌দরফ—তরুণ যুবা—কিরকম মিলে যাচ্ছে, দেখ—"

কিটী আবার পড়িতে লাগিল,—"দিমিত্রি কুল্‌দরফ্ নামে এক তরুণ যুবা একটা সরাই হইতে বাহির হইয়া আসে। মদ খাইয়া মত্ত অবস্থায়—"

"এখানটায় একটু রং ফলিয়েছে তবে আসলে ঠিক আছে। সরাই বটে, মদও বটে,—তবে সিমন আমার সঙ্গে ছিল, সে জানে, তেমন মত্ত অবস্থা নয়—পড়ে যা, কিটী, পড়ে যা—"

"—আসিতে আসিতে দুবরার সাঁকোর কাছে পৌঁছিলে হঠাৎ কেমন বেটক্করে তাহার পা পিছলাইয়া যায়। সাঁকোর উপর দিয়া তখন একখানা ঠিকা গাড়ী আসিতেছিল। পা পিছলাইয়া কুল্‌দরফ্ একেবারে সেই গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের তলায় গিয়া পড়ে। গাড়ীর গাড়োয়ান অতিকষ্টে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইবার চেষ্টা করে! ঘোড়া কেমন ভড়কাইয়া কুল্‌দরফকে লাথি মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী লইয়া ছুটিতে থাকে—পুলিশ অনেক কষ্টে সে গাড়ী থামায়। পরে কুল্‌দরফের কাছে আসিয়া পুলিশ দেখে, বেচারা ঘোড়ার চাট্ খাইয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে। তখন পুলিশ কোন মতে কুল্‌দরফের দেহটাকে টানিয়া তুলিয়া নিকটে এক ডিস্পেন্সারীতে লইয়া যায় এবং ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, ঘোড়া কুল্‌দরফের ঘাড়ের নীচে একটা চাট্ মারিয়াছে—"

কিটী সহসা থামিয়া মিতিয়ার দিকে চাহিল। মা সস্নেহে কুল্‌দরফের ঘাড়ে হাত রাখিলেন। কুল্‌দরফ সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার ঘাড় দেখতে হবে না—ঘাড়ে কি পাবে কিছু? খবরের কাগজেই সব খবর পাবে'খন। পড়্ কিটী, পড়্—"

কিটী পড়িতে লাগিল,"—আঘাত সামান্যই। কুল্‌দরফের তেমন চোট্ লাগে নাই। বেচারা খুব রক্ষা পাইয়াছে। চাট্ যদি আর একটু সরিয়া লাগিত তবে বেচারার মাথার খুলি কিছুতেই রক্ষা পাইত না, ফাটিয়া যাইত।"

"হাঃ, হাঃ হাঃ!" উচ্চহাস্য করিয়া মিতিয়া বলিল, "বুঝলে মা, আমার ঘাড়ে ডাক্তার বরফ লাগিয়ে ছিল! শুনলে ত, দেখলে ত সব? কি ভাবছ? বংশের মুখ উজ্জ্বল করিনি? খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে গেছে। আর চাও কি? সারা র‍্যাশিয়া আমার নাম জেনে ফেলেছে! আর আমার কিসের ভাবনা! হাঃ হাঃ হাঃ, দিমিত্রি কুলদরফ্ এখন সকলের জানা, সকলের চেনা লোক। দে, দে, কিটী, কাগজখানা পাকাস্ নি, নষ্ট হয়ে যাবে, —কাগজখানা দে। মাকারফদের পড়িয়ে আনিগে—তবে আইভালফকে এখনো দেখানো হয় নি। নাতালিয়া বসে আছে—তাকে বলে এসেছি, শীগগির আসছি, মস্ত খবর আছে! সে হয়ত শুতেও যায় নি—

আলাসিস শুতে যাচ্ছিল—এ কথা শুনে সেও নাতালিয়ার সঙ্গে বসে আছে।”

কোনমতে কথার ঝড় বহাইয়া কিটীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিবার অবসরমাত্র না দিয়া মিতিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। *

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

# ভাস্কর্য্য

শিল্পকলার অমৃত-রসের সন্ধানে মানুষ চিরদিন সাধনা করে আসছে। কোনো শিল্পী সে-পথের বহুদূর এগিয়েছেন, কেউ-বা পিছিয়ে আছেন, আবার কেউ-বা মোটেই অগ্রসর হতে পারেন নি। আমাদের দেশেও বহু প্রাচীন কাল থেকে কলাবিস্তার এই সাধনা চলে এসেছে। মাঝেমাঝে কোন কোন যুগের শিল্পের পুরোপূরি সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এখনো ভাঙাচোরা টুক্‌রো-টুকরো মূর্ত্তি বা চিত্র যা ভারতবর্ষের নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে তার মধ্যেই ঐ সাধনার ইতিহাস বাঁধা পড়ে আছে। শিল্পের এই সাধনার পরিচয় বিশেষ-করে আমরা পাই ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ভিতরে। ভারতীয় চিত্রের খবর প্রাচীন কালের মধ্যে যা-কিছু পাওয়া যায় তা অজন্তা, বাঘ ও রামগড়ের দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবিগুলি থেকে। ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু ছড়িয়ে আছে, এক-নিঃশ্বাসে সেগুলির নাম করা শক্ত। এই ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি অবিকৃত অবস্থায় না থাকলেও এগুলিতে শিল্পীদের রসবোধ ও কলাকৌশলের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

মোটামুটি দেখতে গেলে দেখা যায় আমাদের দেশের ভাস্কর্য্য একটা convention বা একটা বাঁধি প্রথার দ্বারা শাসিত। আর্টকে কখনও একটা প্রথা দিয়ে বাঁধা চলে না সত্য, কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, আর্টের বিকাশের পক্ষে এই প্রথা একটু সহায়তা করে। আর্ট সেখানে এই বাঁধা প্রথার চাকর নয়, এই বাঁধি প্রথাই তার তাঁবে। শিল্পের এই বাঁধি প্রথার মত Symbol বা রূপক-চিহ্নকে আর্টিষ্ট অনেক সময় বাদ দিতে পারেন না। কেননা এই রূপক-চিহ্ন শিল্পীর ভাব-প্রকাশের অনেক সহায় হয়। অনেকস্থলে শিল্পীরা সেটার ওজনমত ব্যবহার করে ভাবের চাবি খুলে দিয়ে থাকেন। তাই দেখা যায় কবিকেও এই রূপকচিহ্নের আশ্রয় নিতে হয়েচে। কবি যেমন বেণু, বীণা, তরী, তুফান, আলো ও আঁধার প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহারের দ্বারা সেগুলির প্রচলিত অর্থকে

* আস্তন্ শেকভ রচিত গল্প হইতে।



এলিফেণ্টার ত্রিমূর্ত্তি

ধাঁচায় বাঁধা পড়লেও সেগুলি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রস্ফুটিত করবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেচে। কিন্তু বাঁধি প্রথা যখন আবার আর্টের পায়ের বেড়ির মত হয়ে পড়ে, তখন তার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হয়। তার সাক্ষী আমাদের দেশের মৃন্ময় প্রতিমাগুলি। সেগুলি আবহমান কাল একই ছাঁদে দেখা দিচ্চে এবং পুরোহিতেরা তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেও প্রাণের কিছুমাত্র পরিচয় দিচ্চে না। আবার, আমরা প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যেও যখন সিংহলের কপিল ও কোন তামিল সাধুর মূর্ত্তি পাথরের গায়ে খোদাই করা দেখতে পাই, তখন দেখি এই

অতিক্রম করে তাঁর ভাবেরই অভিব্যক্তি জাগিয়ে তোলেন, তেমনি শিল্পীরাও পদ্ম, শঙ্খ, বজ্র প্রভৃতি এবং বিশেষ বিশেষ মুদ্রার সংকেতে অনেক কথাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আমাদের দেশের মূর্ত্তিমান Conventional শিল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্যানী বুদ্ধের যে-কোন প্রতিমূর্ত্তি দেখলে, দেখা যাবে যে সেগুলি করি-কটি, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ ইত্যাদি বাঁধা ছাঁদে বা

বাঁধি প্রথার মায়া-জাল কাটিয়ে শিল্পীরা কত-বড় জিনিষ দেখাতে পেরেচেন। যেখানে বাঁধা প্রথা ছন্দের মত তালেতালে চলে, সেখানে তার সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু যখন সে বিধিবদ্ধ হয়ে পায়ের বেড়ির মত হয়ে পড়ে তখন সে আর্টকে বিষম ভারাক্রান্ত করে তোলে।

নবীন সাহিত্যের উপর আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি



দাক্ষিণাত্যের নটরাজ

যেমন, প্রাচীন শিল্পকলারও তেমনি নবীন শিল্পের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। নবীন শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পীদের সাধনা-প্রসূত ফলগুলি নিজের মত করে নিয়ে যখন আবার স্বাধীনভাবে ভারতেও নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে থাকবেন, তখন শাস্ত্রের শাসনের কথা কারো মনেও আসবেনা, তখন শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শিল্পে প্রকাশ পাবে। যেখানে Individuality makes an artist—সেখানে শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি কোনমতেই টিঁকে থাকতে পারবে না। তাই আমরা বাঁধাবাঁধি দেবমূর্ত্তি ছাড়াও কপিল প্রভৃতির মত স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত মূর্ত্তিও গড়ব। শিল্পী যখন স্বাধীন চিন্তার



সিংহলের কোন তামিল সাধু

দ্বারা ভাবপ্রকাশের জন্যে বিশেষ রেখা বা ছন্দ আবিষ্কার করেন, তখন সেটা তাঁর চলবার পথের মত হয়—তা বেড়ার মত বাধা দেয় না। কিন্তু যখন পরবর্ত্তী কোন শিল্পী পূর্ব্ব-শিল্পীর সেই বিশেষ বিশেষ রেখা বা ছন্দকে দস্তুর বলে মেনে নিয়ে তার অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর আর অগ্রসর হওয়া হয় না, ঘানির পাকে ঘুরে মরা হয়।

কবিদের মনে যেমন বর্ষার ঝর ঝর শব্দে, পাতার মরমর শব্দে অস্ফুট ভাবের উদয় করে তেমনি শিল্পীরা যা কিছু চোখে দেখেন তার ভিতর থেকে রূপ ও রস পেয়ে থাকেন। আবার কবিরা যেমন মনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার প্রকাশ করেন, কোন কোন শিল্পী সেইরূপ নিজেদের মনের ভাব চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে ফুটিয়ে তোলেন। এই আত্ম-শক্তির প্রকাশই শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণ।

ভাস্কর্য্য একটি জমাট জিনিষ, তাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় আবার তাকে স্পর্শও করা চলে। সে নিজের বিশেষ একটা অংশ খালি দেখায় না, তাকে চারিদিক দিয়েই আমরা নেড়েচেড়ে দেখতে পারি। নানান কারণে ভাস্কর্য্যকে খুবই সাধাসিধে এবং স্পষ্ট হতে হয়েচে—সে শিল্পীর হাতে যখন যেখানে এসে শেষ হবে তখন তার উপর কারো—এমন কি শিল্পীর নিজের কলমও চলবেনা। তাতে কিছু যোগ করাও চলবে না বা বাদও চলবে না। এই হিসাবে ভাস্কর্য্য চিত্রের চেয়ে বড় জিনিষ। ছবিতে একটা সুবিধে এই আছে যে, তার আনুষঙ্গিক নানান জিনিষ, রং, গাছপালা ও আসবাবপত্র প্রভৃতির সামঞ্জস্যে তার মোট ভাবটিকে দানা বাঁধাতে পারে, কিন্তু ভাস্কর্য্যকে তার আশে-



কপিল

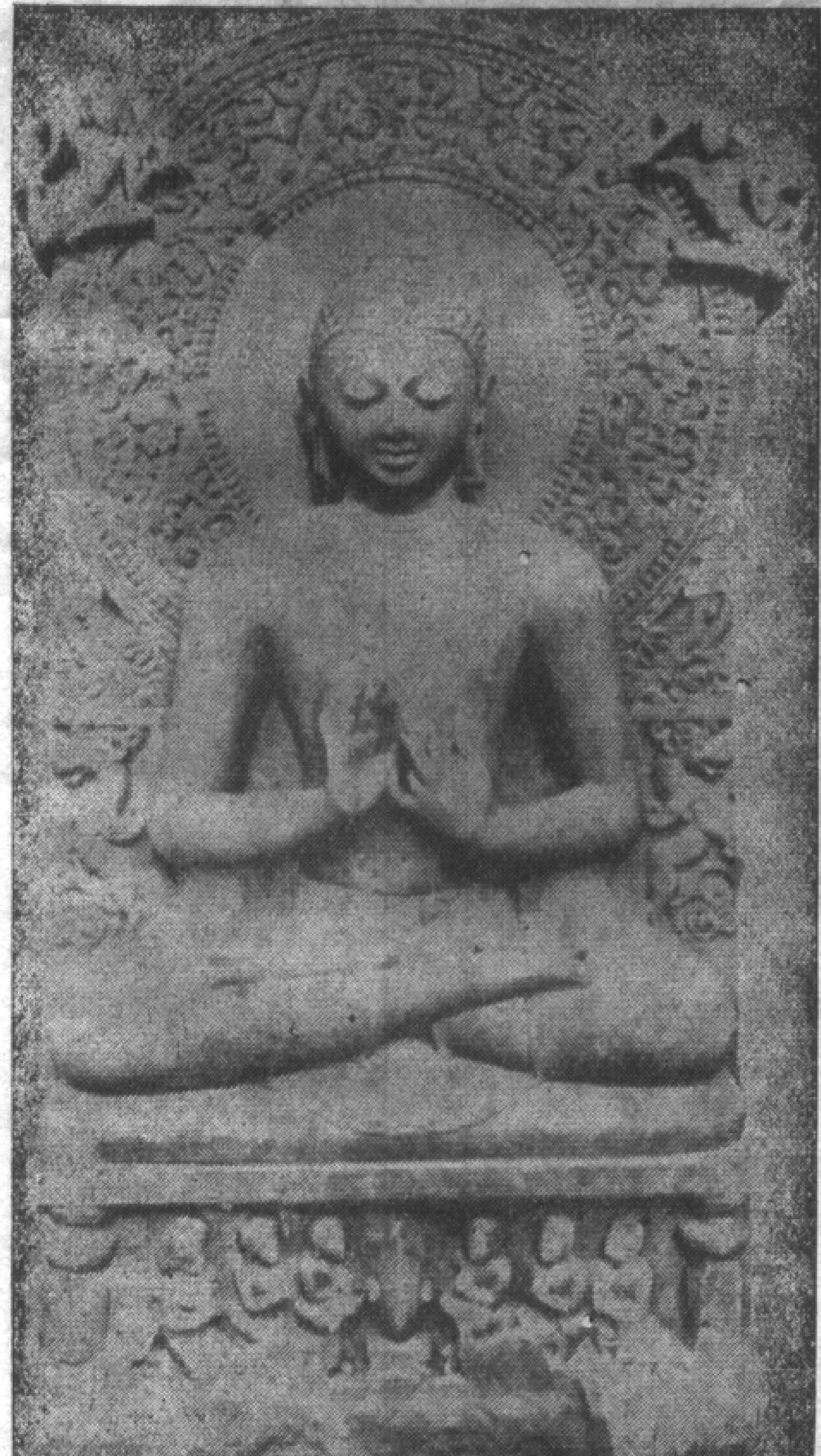
পাশের সব জিনিষকে ছাড়িয়ে নিজে নিজেই সম্পূর্ণ হতে হয়। একটি পাথরের প্রতিমূর্ত্তি তার নিজেরই কথা ব্যক্ত করবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু চিত্রে তার আশেপাশের অনেক জিনিষের সামঞ্জস্যে ভাবপ্রকাশের সুবিধে হয়। ভাস্করকে এই কারণে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর ভাস্কর্য্যে খুবই স্পষ্ট করে দেখাতে হয়, কিন্তু চিত্রকরেরা সেটাকে রেখার ও রঙের কৌশলের মধ্যে—কতকটা কল্পনার রাজ্যে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। পৃথিবীতে এই কারণে বোধ হয় ভাল চিত্রের চেয়ে ভাস্কর্য্যের এত অভাব।

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের খবর আমরা অবশ্য খুবই কম পাই; তার মধ্যে সেদিন কোন-একজন এমেরিকাবাসী ভাস্করের তৈরি মূর্ত্তির একখানি ছবি চোখে পড়েছিল। প্রথমে ছবিখানি দেখে নিতান্তই হতাশ হতে হয়, কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তে—যখন একটি মূর্ত্তিমান দুঃখের গভীর বেদনার ভাব এই একটি সহজ ও সাধাসিধে ভাস্কর্য্যের ভিতর দেখতে পেলুম, তখন অবাক হতে হল। আর-কিছু নেই—একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ে হেঁট হয়ে বসে আছে; তার ঘোমটার মধ্যে মুখের ও বুকের আকৃতির চিহ্নমাত্র নেই—তার বদলে কেবল পুঞ্জীভূত ঘননীল অন্ধকার; বুকের ভিতরটা যেন কেবলি শূন্য হাহাকার করচে। এই বেদনার ছবিটিতে শিল্পী বিশেষ কিছুই দেন-নি—অথচ সবই দিয়েছেন। এই ভাস্কর্য্যের যা-কিছু অসম্পূর্ণতা তা ইচ্ছাকৃত; সেটার উপর কলম চালালে কখনই এই দুঃখের প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হতে পারতো না। এটি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ হলেও, এটির মত সম্পূর্ণ ভাস্কর্য্য আর-কিছুই হতে পারে না।

প্রায় দেখা যায় আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্করেরা কাপড়ের texture, দেহের অস্থিচর্ম্ম প্রভৃতি আনুষঙ্গিক জিনিষগুলির উপর এত বেশী নজর দিয়েচেন যে, তাঁর

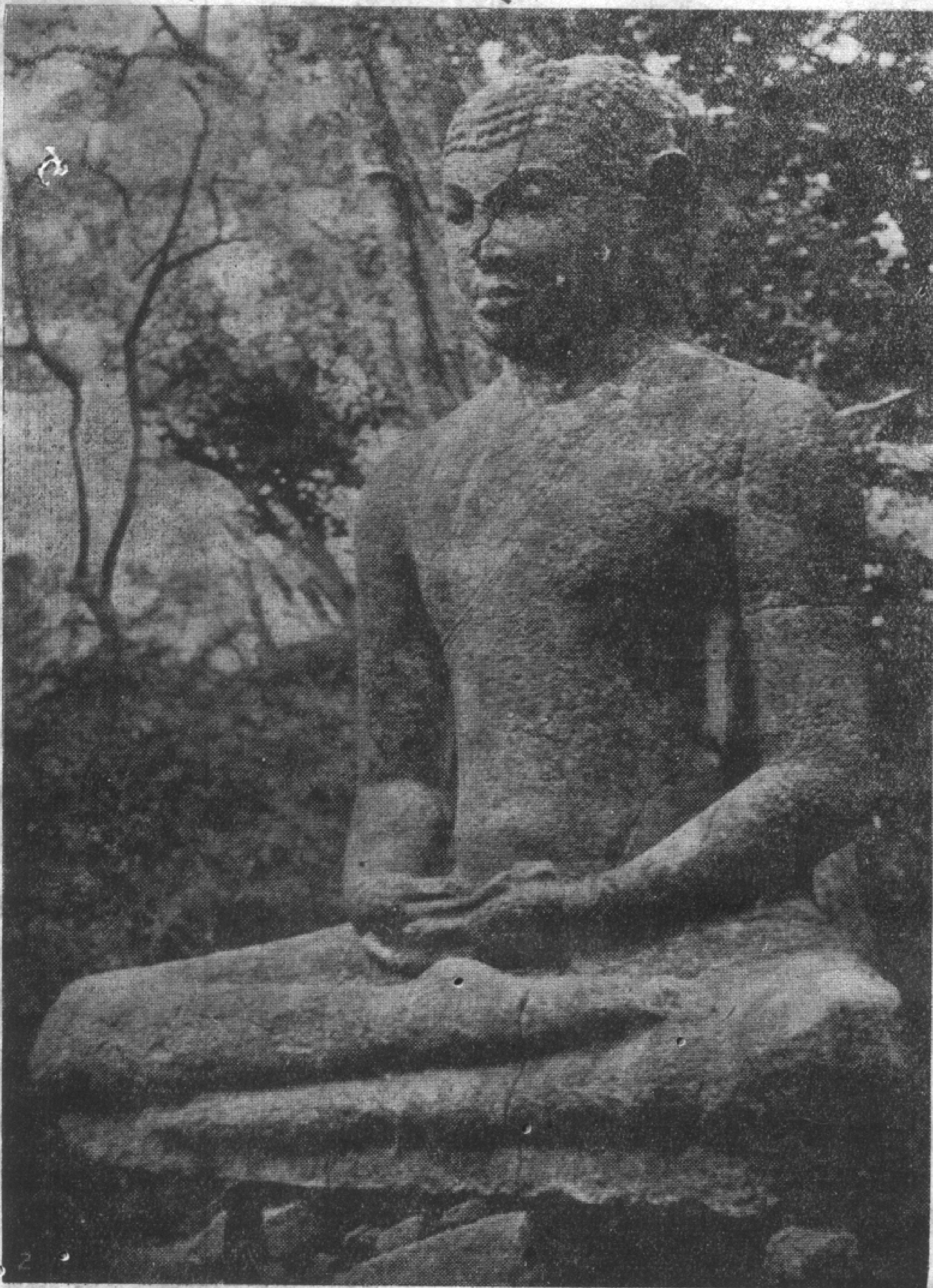
ভিতর নানান কৌশল থাকলেও শিল্প-কলার প্রাণের বিশেষ অভাব দেখা যায়। এখন তাঁরা ভাস্কর্য্যের সম্পূর্ণতার রসের চেয়ে, খুঁটিনাটির উপর বিশেষ নজর দেন, যেমন—কোন মূর্ত্তিতে সিল্কের কাপড় পরান হলে সিল্কের মত দেখতে হচ্ছে কিনা, সুতির কাপড় পরান হলে সুতোর ভাবটি পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেও ধরা পড়চে কিনা।

আমাদের দেশের বৌদ্ধযুগের এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ে যে-সব ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাই সেগুলির মধ্যে সিংহলের বুদ্ধমূর্ত্তি,



সারনাথের বুদ্ধ

যবদ্বীপের প্রজ্ঞাপারমিতা, ইলোরার সূর্য্যমূর্ত্তি, দাক্ষিণাত্যের নটরাজ ও এলিফেন্টার ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। সিংহলের নিবাতনিস্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ধ্যানী বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মুর্ত্তিটির এমন একটি গভীরতা আছে যে, এটির কাছে দাঁড়ালে তার আশেপাশের সমস্তই ভুলে যেতে হয়—তার গভীর ভাব দর্শককে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। ভারতের অপরাপর বুদ্ধমূর্ত্তি-গুলিতে ভাবের অভাব না ঘটলেও সেগুলি এত-বেশী অলঙ্কারপ্রধান হয়ে পড়েছে যে, তার মোট ভাবটি ফুটতে অনেক বাধা পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সারনাথের ধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ করতে পারি। সারনাথের এই মূর্ত্তিটিতে যে অলঙ্কারপ্রধান কারুকার্য্য সিংহাসন ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলীটিতে আছে, সেইটেই ভাবপ্রকাশের বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর সারনাথের এই মূর্ত্তিটি ছাড়া অন্যান্য বুদ্ধ-মূর্ত্তিকেও অনেক স্থলে অলঙ্কার-প্রধান শিল্প এই ভাবে চাপা দেবার জোগাড় করেছে। মোটভাবটিকে সংক্ষেপে সুসংযত ভাবে ফোটাতে হলে যে অসুবিধে আছে, তা আমাদের ভাস্করেরা বেশ জানতেন এবং তাই আমরা দেখি, রূপক-চিহ্নকে আশ্রয় করে তাঁরা অনেক বড় বড় কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন, আমাদের এলিফেন্টার ত্রি-মূর্ত্তি। এই ত্রি-মূর্ত্তিটিকে যদিও ভাস্কর পূরোপূরি প্রকাশ করেন-নি, তার কোমর থেকে পায়ের



সিংহলের বুদ্ধমূর্ত্তি

দিকটা মাটির তলায় অদৃশ্যই রেখে গেছেন, তবুও তাঁর বক্তব্য মোটেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়-নি। এইখানে ত্রি-মূর্ত্তির ভাবপ্রকাশের সহায় হয়েছে তাঁর হাতের শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি চিহ্ন।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ভাস্কর্য্য যেখানে মন্দির প্রভৃতির গায়ে অলঙ্কারের মত খুব ঘন ঘন সাজানো আছে, সেখানে তার সম্পূর্ণতা এক-একটি খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না—সেখানে সে কতকটা ছবির মত, আশেপাশের সব জিনিষকে নিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে মন্দিরটিই এই ভাস্কর্য্যের স্থূল প্রতিরূপ। এই হিসাবে প্রাচীন কালের বরবোদর, কোনারক, ইলোরা এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

# ফিলিপাইনে শিক্ষাবিস্তার

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উনিশ বৎসর হইল মার্কিন রাজ্যের হস্তগত হয়। পূর্ব্বে দ্বীপগুলি স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল। এই কয় বৎসরের ভিতরে সেখানে অসভ্য দেশবাসীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার সহিত শ্রমজীবী-শিক্ষার ব্যবস্থায় কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে আজকাল-কার দিনে বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। ক্যাপিটাল নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উপস্থিত প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ফিলিপাইনের অধিকাংশ লোকই বিশেষ-রূপ বর্ব্বর ছিল। তাহাদের চালচলন মোটেই সভ্যসমাজের উপযোগী ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহে তাহারা বিশেষ পটু ছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের সভ্যতার প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষাবিস্তারই সভ্যতা-প্রসারের প্রধান সহায়; প্রথম হইতেই অল্পখরচে বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া ছাত্রেরাই নিজহাতে অনেক বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চাষবাসের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষ তৈয়ারির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে চাষের কাজ শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা ঘরে আসিয়া বাপ-দাদার অপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন করিতেছে। এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রের অভাব হয় না। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য রান্না, কাপড়-বোনা, কাপড়ে কেয়ারির কাজ, লেস-তৈয়ারি ইত্যাদি ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। যে সকল জিনিষ বিদ্যালয়ে তৈয়ারি হয় তাহার বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত আছে। ঝুড়ি, চুবড়ি, বেতের নানারকম আসবাব, কেয়ারির কাজ, লেস, মাদুর, পাপস ও দড়ির গালিচা ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা প্রস্তুত করে। নিয়মিতরূপে সকল বিদ্যালয়ের উৎপন্ন সকল সামগ্রীর বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সুকঠিন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হইতেছে। ১৯১৬ জুন মাস হইতে ১৯১৬ জানুয়ারি মাসের মধ্যে ১৮টি প্রদেশের মধ্যে ১৩০টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকম জিনিষ তৈয়ারি করিয়া বিক্রয়ার্থ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই কার্য্যে ২২৬৬ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ১৩০টি আড্ডায় যত মাল তৈয়ারি হয়, তাহা ছাড়া ৪০০০ বিদ্যালয়ে আন্দাজ ছয় লক্ষ ছাত্র যত মাল উৎপন্ন করে, সেই সমস্ত বিক্রয়ের জন্য একটি সাধারণ বিক্রয়-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে শ্রমজীবী-শিক্ষার যে অনুষ্ঠান, তাহাকে একটি প্রকাণ্ড কারখানার সহিত

তুলনা করা যাইতে পারে। প্রভেদ এই মাত্র যে, কারখানা কোন-এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার এই বিভাগ ১,২৭০০০ বর্গমাইল ব্যাপৃত। শিক্ষার এই বিভাগের আর-একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল উৎপন্ন দ্রব্যই হাতে তৈয়ারি, কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে নয়; আর, সকল জিনিষই সাদাসিধা রকমের, এবং অতি সহজ ও সরলভাবে তৈয়ারি।

এই সকল বন্দোবস্ত দাঁড় করাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। প্রথমে শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল জিনিষের অধিক প্রয়োজন, যাহার মালমশলা দেশের মধ্যেই আছে এবং যাহা সহজে তৈয়ারি করা যায়, সেই সকল জিনিষ তৈয়ারির বন্দোবস্ত প্রথমেই করা হয়। ক্রমে ক্রমে সেই সকল জিনিষের উন্নতি করা হইয়াছে। এবং উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে, প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দড়ির গালিচার কথা বলা যাইতে পারে। পাঁচ বৎসর হইল এই কার্য্য আরম্ভ হয়; তখন দড়ি-তৈয়ারি ভাল হইত না এবং দড়ির উপাদান বা ডাঁটার আঁস,—যাহাতে দড়ি-তৈয়ারি হয় তাহা ভাল করিয়া প্রস্তুত হইত না। Panama Pacific প্রদর্শনীতে এই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে সুতা তৈয়ারি করিবার ও বুনিবার ভালরকম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক প্রকার নমুনা স্থির করিয়া তাহারই অনুযায়ী মাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট নমুনা-মাফিক সমস্ত মাল সকল বিদ্যালয়ে ও সকল আড্ডাতেই হইতেছে। এবং যতরকম মাল তৈয়ারি হয় তাহার এক-এক জাতের জিনিষের যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহারও তালিকা আছে। মালঘরে ও প্রদর্শনীতে এই সকল মালের নমুনা রাখা হইয়াছে। এই সকল নমুনা দেখিয়া কোন ক্রেতা যদি কোন জিনিষ পাইতে চান, তবে ঠিক নমুনা-মতই জিনিষ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়-সমূহে সকলরকম কাজ তদারক করিবার বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে কোন মাল খেলো না হয় এবং নিখুত রকমে করা হয় তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক জিনিষ উৎপন্ন করিতে কি খরচা পড়িল তাহা খতান হয় এবং প্রধানত তাহার দর ধার্য্য হয়। তা-ছাড়া কোথায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাল পাঠান হইতেছে বা কি পাওয়া যাইতেছে তাহারও হিসাব, রাখা হয় এবং হিসাবের সঙ্গে মাল মিলাইয়া দেখা হয়। সকল ব্যবস্থার মধ্যে এমনি রকম-রকম বাঁধুনি আছে। কোনস্থান হইতে বিশেষ কোন-রকম মাল যোগাইবার হুকুম আসিলে ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট কাহাকেও সেই হুকুম তামিল করিবার ভার দেওয়া হয়। তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গে অন্য ছাত্রদেরও দেওয়া হয়। যে জিনিষ সরবরাহ করিবার হুকুম আসে তাহার সহিত একটা নক্সা থাকে, তাহা সর্দ্দার-ছাত্রকে দেওয়া হয়। সে তাহার অনুরূপ জিনিষ তৈয়ারি করাইবার জন্য দায়ী হয়। তাহাকে ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পরিমাণে

উপকরণ সব দেওয়া হয়। এইরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানের সহিত ছেলেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়; ফলে, তাহারা পরে যে কাজেই পড়ুক তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে পারগ হয়। ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে এইরূপ দায়িত্ব-শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী।

শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সকল ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে ছয়হাত ফিরিয়া জিনিষ বাজারে আসিত; তাহাতে যে-সকল লোক জিনিষ প্রস্তুত করিত, তাহাদের লাভের অংশ অনেক কমিয়া যাইত। বাজারে পাইকারি হিসাবে যে দরে জিনিষ বিক্রয় হইত নির্ম্মাতারা তাহার অর্দ্ধেকও পাইত কিনা সন্দেহ। শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্তে এখন কেবল দুই হাত ফিরিয়া বাজারে জিনিষ পৌঁছায়। প্রথম, প্রত্যেক প্রদেশের শ্রমজীবী-বিভাগ; দ্বিতীয়, বিশেষ বিশেষ আড্ডার (Centre) কর্ত্তা। ইহাদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে সকল জিনিষ তৈয়ারি হয়। এই সকল কর্ম্মচারীর নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই; যত পরিমাণ মাল বিক্রয় হয়, তাহার উপর ইহারা একটা কমিসন পাইয়া থাকে। কতকগুলি বেতনভোগী শিক্ষক আছে, তাহারা স্থানে স্থানে কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহার তদারক করিয়া বেড়ায়।

ফিলিপাইনে এইরূপ কার্য্য-শিক্ষার সহিত বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এতদিনের পরীক্ষায় এই প্রণালীর উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রমজীবী-শিক্ষা অতি সহজ উপায়ে লোকেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থানীয় মাল-মসলা লইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয় ছাড়ার পরও নিজের ঘরে বসিয়া কাজ চালাইতে পারে। কাজ যাহাতে না খারাপ হয়, তাহার তত্ত্বাবধান থাকার দরুণ প্রস্তুত কোন দ্রব্য খেলো হইতে পায় না। আমাদের দেশের ন্যায় ফিলিপাইনে স্বাভাবিক সুবিধা অনেক-রকম আছে। মেয়েরা বুদ্ধিমান ও সাহসী এবং জাতিভেদ ও ভাষার বৈচিত্র্য না থাকার দরুণ তাহাদের উন্নতির পথে কোন বাধা হয় না। এ দেশে শিক্ষকদের সামাজিক স্তর উন্নত। তাহারা বেশি খাতির পাইয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে ছুটির সময় নানা আমোদ-প্রমোদের সহিত শিক্ষকরা যাহাতে একত্র হইয়া শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা করেন, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যালয়ে যতরকম কার্য্য শিখান হয়, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লেখা হইলঃ—চাষ-বাস, মাছ-ধরা, গৃহপালিত জন্তু-পোষা, মাটির বাসন, ঝুড়ি, বেতের আসবাব ইত্যাদি তৈয়ারি, লোহা গালাইয়া চাষের যন্ত্র-তৈয়ারি, মদ, চামড়া, টুপি ও বুনিয়া জুতা তৈরি করা, তুলা, রেসম, আনারসের ছালের সুতায় বুনিয়া তাহাতে কাপড় তৈরি, এবং কাপড়ে কেয়ারি কাজ প্রভৃতি। ফিলিপাইন ক্রাফ্‌টসমান নামক এক মাসিকপত্রে এই সকল কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের প্রধান সম্পাদক শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। এই কাগজে বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কেহ আলোচনার অধিকারী নন বলিয়া ইহাতে যে সকল লেখা বাহির হয়, তাহাতে সাধারণের অনেক উপকার হয়।

শ্রীম—।

# তেলুগু গান

### সন্ধ্যা-প্রদীপ

সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে নত করি শির,
সন্ধ্যা-প্রদীপ প্রভু! তব মন্দির!
প্রদীপে যে আলো জ্বলে সে জ্যোতি তোমার,—
সে জ্যোতিতে পাপ-তাপ পোড়ে যে সবার;
দীপের কনক-শিখা দেউল রুচির,
দেব-দেব! সে দেউলে তুমি হাস থির!
ওরে ও সাঁঝের দীপ তোর তুলা নাই,
সন্ধ্যাদীপের আমি বন্দনা গাই।

### মন্দির-দ্বারে।

জাগো জাগো মনোহর! খাবে ননী ক্ষীর সর!
জাগো, জাগো, নাড়ুয়া-গোপাল!
জাগো পুলকের ধন! গোলোকের হে রাজন্!
জাগো, জাগো, হয়েছে সকাল।

জাগো হে দুয়ার খোলো, মন্দিরে ভিড় হ'লো,
চেয়ে দ্যাখো রাতি নাই আর;
বালক, বনিতা, বুড়া, ভিড়ে দ্যাখো হ'লো গুঁড়া,
দুখ তুমি ঘুচাও সবার।

তোমার আরতি তরে ধ'রে আছি শিরোপরে
মনোহর মালতীর মাল,
জাগো হরি! জাগো হরি! খোলো দ্বার কৃপা করি'
সুন্দর! নন্দ-দুলাল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

# মাসকাবারি

### শক্তির ধর্ম্ম ও আনন্দের ধর্ম্ম

আষাঢ়ের "নারায়ণে" "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বলেন যে "রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন—যাহা আনন্দপূর্ণ, স্বস্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, বৈপরীত্য নাই"। "রবীন্দ্রনাথ যে দিক্‌টি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি—বীর্য্য, তেজ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, ধূলি, ঘনঘটা, ঝঞ্ঝা, রুদ্রের বিভূতি।" এ দিক্‌টা নিট্‌শে দেখিয়াছেন বলিয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে, কারণ নিট্‌শের মন্ত্র—"will to power"। কিন্তু লেখক বলেন যে নিট্‌শে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তারই অভিব্যঞ্জনায় জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শক্তির যে সকল বিকৃতি, যথা মদ মাৎসর্য্য ক্রূরতা ইত্যাদি,—তাদেরও নিত্যবস্তু করিয়া লইয়াছেন।

লেখক মনে করেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত বর্ত্তমান যুগে অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই

বর্ত্তমান জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধ, মত্ততা, ত্রস্ততা "যতই কুৎসিত হউক্ না কেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে —জগৎকে তীব্রতর ভাবে স্পষ্টতর ভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস।" রবীন্দ্রনাথ যে কখনও কোন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন্ নাই একথা বলা লেখকের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের তত্ত্বে দ্বন্দ্বের অব্যর্থতার যে স্থান নাই, ইহা বলাই তাঁর অভিপ্রায়। এমন কি তিনি বলেন যে রসভোগাত্মক কর্ম্ম ভিন্ন দ্বন্দ্বাত্মক কর্ম্মেরও কোন স্থান রবীন্দ্র-নাথের তত্ত্বে নাই।

এই সুচিন্তিত লেখাটি আমাদের চোখে পড়ার পূর্ব্বে বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ লিখিত "God, The Invisible King" ঈশ্বর অদৃশ্য রাজা নামক নবপ্রকাশিত বইটি পড়িতে-ছিলাম। আধুনিক মানুষের ধর্ম্মটা প্রকৃত প্রস্তাবে কি হইতে পারে, তারই কতক কতক আভাস ওয়েল্‌স্ সাহেব তাঁর নূতন গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন খৃষ্টধর্ম্মের ট্রিনিটি বা তিন ঈশ্বরের তত্ত্ব একালে কেউ মানেনা, এখনকার কালের মানুষের যিনি ঈশ্বর তিনি একমাত্র সসীম ঈশ্বর। ওয়েল্‌স্ তাঁকে সসীম এই অর্থে বলিয়াছেন যে, যে ঈশ্বরকে লইয়া মানুষের কারবার, যাঁকে মানুষের প্রয়োজন আছে, তাঁকে সীমাবদ্ধ একজন পুরুষ হইতেই হইবে —কেননা পুরুষের সঙ্গেই পুরুষের যোগ ঘটিতে পারে, অসীম অনন্ত একটা শক্তি বা সত্ত্বা মাত্রের সঙ্গে মানুষের কোন সম্বন্ধই দাঁড়াইতে পারে না। অনন্ত শক্তি মানুষ ধারণা করিতেই পারে না; লোকলোকান্তরব্যাপিনী কোন শক্তি যদি কোন সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তবে ওয়েল্‌সের ভাষায় সে একটা Veiled Being মাত্র, অবগুণ্ঠিত সত্ত্বা মাত্র। হয়ত কোনকালে বিজ্ঞান তার ঘোমটা খসাইতেও পারে, নাও পারে—কিন্তু তাকে যখন জানিনা, তখন তাকে পূজা করিতেও পারি না।

অনন্ত দেশকাল হইতে যেমন ঈশ্বরকে ওয়েল্‌স্ তফাৎ করিলেন, তেমনি প্রকৃতির রঙ্গভূমি হইতেও তাঁকে তিনি বিদায় দিয়াছেন। যে প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে ক্রমা-গতই দ্বন্দ্ববিরোধ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, সেই হানাহানি কাড়াকাড়ির ক্ষেত্রেও ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর আছেন শুধু আমাদের জীবনের মধ্যে। মানুষের জীবনে, মানবলোকে, মানবের অধিনায়ক রূপেই তাঁকে আমরা দেখিতে পাই। মানুষের জীবনের ভিতরে থাকিয়া তিনি সেই জীবনের ভাঙাগড়া উত্থান পতনের লীলার ভিতর দিয়া তাঁর অভিপ্রায়কে ক্রমশঃ জয়যুক্ত করিতে করিতে চলিয়াছেন। মানুষের তিনি সহযাত্রী, সহ-কর্ম্মী। তিনি যখন মানুষের জীবনে আবির্ভূত হন্ তখনই মানুষের জীবন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়।

সুতরাং ওয়েল্‌সের মতে ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা বীরের স্বরূপ, শূরের স্বরূপ। তিনি বলেন যে, প্রাচীন-কালে ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল বৃদ্ধ পিতা বা পিতামহের স্বরূপ; একালের ঈশ্বর তরুণ যুবা। তাঁর দৃষ্টি অতীতের দিকে নয়,

ভবিষ্যতের দিকে। তিনি তরবারি হস্তে যাত্রা করিয়াছেন তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এইজন্য যে বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী তাঁকে সংশয় করে, সে তাঁকে সব চেয়ে বেশি মানে; যে জড়বাদী সেও না জানিয়া এই নবীন ঈশ্বরেরই অর্চ্চনার আয়োজন করিয়াছে—"The Religion of Atheists" অধ্যায়ে ওয়েল্‌স্‌ তাহা সুন্দর রূপেই দেখাইয়াছেন।

নারায়ণের লেখক ওয়েল্‌সের সসীম ঈশ্বরবাদ মানেন কিনা জানিনা, তবে পূর্ণ জীবনে সকল রকমের বিভূতির যে একটা স্থান আছে, "রাক্ষস পিশাচ পশু অসুর" প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, একথা তিনি বলিয়াছেন। ওয়েল্‌স্‌ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতির বিভূতির স্থান মানেন না; তিনি ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মানব মনে করেন এবং মানবের সকল চিদ্বিভূতি যে ঈশ্বরের মধ্যে আছে তাহা স্বীকার করেন। শুধু এই জায়গায় ওয়েল্‌সের সঙ্গে নারায়ণের লেখকের ভাবের মিল আছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেদান্ততত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরকে যদি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও নিত্য-স্বভাববান মনে করা যায়, এবং কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া একথাও সেই সঙ্গে বলা যায় যে, মানুষের অশুদ্ধিকে শোধন করিবার জন্যই ঈশ্বর শুদ্ধ, মানুষের ভ্রমকে নিরাকরণ করিবার জন্য, তিনি বুদ্ধ, মানুষের সকল বন্ধনকে মোচন করিয়া মানুষের মধ্যে "কৃতকৃত্য" হইবার জন্যই তাঁর মুক্তস্বরূপ এবং আমরাও যে পরিমাণে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হই, সেই পরিমাণে ঐ-দিক্ হইতেই আমাদেরও মুক্তির সার্থকতা—তবে তো ঈশ্বরকে সসীম বলার কোন দরকারই থাকে না। কেননা, তখন ঈশ্বরের স্বরূপ অসীম হইলেও তাঁর প্রকাশ সীমায়। সুতরাং যেখানে তাঁর প্রকাশ, সেখানে এক হিসাবে তাঁকে সসীম বলাও তো চলে। অথচ তাঁকে শুধু সসীম বলিলে তাঁর সৃজনের লীলার কোন অনির্ব্বচনীয় রহস্য থাকেনা। যেমন পরিপ্রেক্ষণ (Perspective) ভিন্ন ছবির রস ফোটেনা, তেম্নি অনন্তত্ব ভিন্ন সীমার সৌন্দর্য্য ও রহস্য প্রকাশ পায় না। তাছাড়া তাঁর সসীমত্বটা সত্যও নয়। কেননা, অনন্ত দেশ কাল হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া লইয়া যদি কেবলমাত্র মানুষের জীবনের অধিপতি করিয়াই তাঁকে জানি, তবে সেই মানুষের চৈতন্যেই তিনি তাঁর সীমা ছাড়াইয়া যাইবেনই। সে চৈতন্য যে চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিয়া বিশ্বচৈতন্য—অনন্তচৈতন্য—হইয়া উঠিবে। অভিব্যক্তির নিয়মে চৈতন্যের পরিধির কি ক্রমশঃ বিস্তার ঘটে নাই? এবং আরও উত্তরোত্তর বিস্তার ঘটিবে না?

সেই জন্য, সীমার দিক্ হইতে যাহা সংগ্রাম সংঘর্ষ বলিয়া প্রতীত হয়, অসীমতার দিক্ হইতে তাই শান্তি ও স্বস্তি, তাই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের দেবতা "সীমার মাঝে অসীম"। তাঁর দেবতা রুদ্রও বটেন, দক্ষিণও বটেন। "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করচে চাষা চাষ"। অন্য ক্ষেত্রে তিনিই "উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ঐযে তিনি ঐ বাহির পথে"। "দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে, অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে"। "সমর ঘাতে-

অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেইত তোমার স্নেহ"। "জয় তব ভীষণ সব কলুষনাশন রুদ্রতা"। এই গেল এক দিক্। অন্য দিকে "সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে"। "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে।"

## জাতীয়তার আদর্শ

ভারতবর্ষের স্বাজাত্য বা জাতীয় ভাবের উপাদান উপকরণ কি ও আদর্শ কি এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় ভাবের উপাদান উপকরণ ও আদর্শের সঙ্গে তার মূলগত কোন ঐক্য অথবা অনৈক্য আছে কিনা, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আধুনিককালে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। তার প্রধান কারণ, আমরা একটা যুগসন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতা, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, যন্ত্রতন্ত্র, বিজ্ঞান, সমস্তই আমাদের এই বহু প্রাচীনকালের সমাজের উপর হঠাৎ আসিয়া পড়াতে আমাদের সমাজে স্বভাবের নিয়মে নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিতে সুরু করিয়াছে। অথচ সমাজ তার চিরাগত প্রকৃতি ও আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া এই নবাগত আকস্মিক সভ্যতার ছাঁচে আপনাকে আমূল বদল করিতে রাজি নয়। সেইজন্য অনেক দিন হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টায় কেউবা পুরাতনের পক্ষপাতী, কেউ বা নূতনের। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে এ সকল বিষয়ে সামাজিক আদর্শের তারতম্য নির্ণয়ের ভেদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় আধুনিক সাহিত্যে, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-প্রসূত সমাজ-গঠনের আদর্শের আলোচনা-গুলি পরখ করার মত ঔৎসুক্য-জনক ব্যাপার আর কিছুই নাই।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাত, ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব এবং ভারতীয় জাতীয়তার বিশিষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক মতবৈচিত্র্য আছে। তাঁদের প্রকৃতির ভিন্নতা ত আছেই; তাছাড়া তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও যথেষ্ট ভিন্নতা আছে। যেমন ধরুন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সভ্যতা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল; সুতরাং কোন্ সভ্যতাটার কোন্ দিকে উৎকর্ষ, কোন্ সমাজের কোন্ কোন্ দিকে শক্তির স্ফূর্ত্তি, তাহা তিনি যেমন পরিষ্কার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন ভূদেব কি চন্দ্রনাথ পান্ নাই। আবার তখনকার কালে ওগস্ত কঁতের দর্শন পড়িয়া সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূদেব বা বঙ্কিম যতখানি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে নানাদেশের ইতিহাস পড়িয়া ভূদেব যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে পরিমাণ জ্ঞান চন্দ্রনাথ কিংবা রাজনারায়ণের ছিল না, যদিচ অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। কাল্চারের এই সব ভিন্নতা, কালের ভিন্নতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতা—এসমস্ত হিসাব করিয়াই তবে এক এক জনের আদর্শের বিচার

হইবে এবং কে কতটা সম্যগ্‌দর্শী তাহারও নির্ণয় হইবে।

অতএব আমরা মাসে মাসেই জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে এই সকল মনীষীর আলোচনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিব। তাঁদের কালের হিসাবে তাঁদের আলোচনার মূল্য এবং তারপর উত্তর কালের ক্রমবিকাশমান ধারায় তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মূল্য আমাদিগকে বেশ করিয়া যাচাই করিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। কেননা, কালের হিসাবে অনেক কথার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বকালের হিসাবে সে মূল্য টেঁকেনা।

প্রথমে ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" সম্বন্ধেই আলোচনাটা তোলা যাক্। কিন্তু "সামাজিক প্রবন্ধ" যে সময়ে রচিত হয়, তার পূর্ব্বে দেশে অনেকগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়া গেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সেই আন্দোলনগুলির ধারা দেখিয়া গেলে তবে 'সামাজিকপ্রবন্ধ' যে কালের রচনা, তার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কাল্‌চার ও সভ্যতার ত্রিধারার একটা প্রশস্ত মোহানায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মনের সঙ্গে তাঁর মনের আশ্চর্য্য সাযুজ্য ও সারূপ্য ছিল—ইংরেজ ডীইষ্ট, হিউম্, গিবন প্রভৃতি সংশয়বাদী, ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট এবং ভল্‌টেয়ার, ভল্‌নি প্রভৃতি ফরাসী থিয়োফিলান্‌থ্রপিষ্টদের একেবারে সগোত্র মন ছিল রামমোহন রায়ের। সেই কারণে কোন রকমের অন্ধ সংস্কার তাঁর মনকে বাঁধিতে পারে নাই; তিনি সহজেই সকল ধর্ম্মের ও সকল সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিশ্বভৌমিক সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়াই তার আসল সত্যগুলি কি, তার বিশ্বসত্যগুলি কি, তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর হইতেই টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের এই Cosmopolite এই বিশ্বভৌমিক দিক্‌টাই তাঁর একমাত্র দিক্ নয়; তাঁর আর একটি বড়দিক্ তাঁর স্বাজাতিক দিক্। সেখানে তিনি শাস্ত্রমীমাংসক, সমাজ-সংস্কারক, বিধিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাতারূপেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর 'বেদান্তভাষ্য,' 'বেদান্তসার', তাঁর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার লেখা গুলি, তাঁর 'চারি প্রশ্নের উত্তর', তিনি যে ভিত্তির উপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের অশেষ শাস্ত্রের ধর্ম্মবিধি ও কর্ম্মবিধির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ঐক্যসূত্রটিকে অর্থাৎ তার মুক্তিতত্ত্বটিকে এমন আশ্চর্য্য এমন উদারভাবে রাজা রামমোহনের মত আর কেহই ধরিতে পারেন নাই। সকল রকমের সাধন ও মার্গ, সকল রকমের সম্প্রদায় ও বিভাগের মধ্যেই যে মানুষের সর্ব্বাবরণ, সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্তির একটা উদার পথ ভারতবর্ষ উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বমার্গের বিশিষ্ট ও নিবিষ্ট আলোচনার দ্বারা রাজা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

মুক্তির আদর্শকে তিনি নিজের জাতির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্ব-জাতির মধ্যেও তাকে দেখিতে তিনি বাধা পান্ নাই। সেইজন্য বেদান্তের পাশাপাশি এই ব্রাহ্মণ-তনয় সাহস করিয়া Precepts of Jesus'ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন; আবার বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় humanitarianism অথবা লোকশ্রেয়ঃবাদকেও খাপ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জাতীয়তার আদর্শ সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই ছিল যে, ভারতবর্ষকে জাতীয় ভাবে সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বজনীন ভাবেই জাতীয় হইতে হইবে।

রামমোহন যে সূত্রটি ধরাইয়া দিয়া গেলেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে দুইটি ধারা দেখা দিয়াছিল। এক, অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের ধারা, আর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'থিজ্‌ম্' ও ভক্তিবাদের ধারা। দুটি ধারাই বিশ্বভৌমিকতার অভিমুখী ছিল। দুজনেই রামমোহনের যেন দুই অংশ পাইয়াছিলেন। অথচ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার এক হিসাবে জন্মদাতা ছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর উন্নত ধর্ম্মের আদর্শে দেশীয় সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে শোধিত সংস্কৃত করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। Conservative Reformer—রক্ষণশীল সংস্কারকের আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি যতটা পারেন দেশীয় ভাব ও রূপ রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতি-সাধনে মন দিলেন। মানুষের ধর্ম্ম-বোধ উন্নত হইলেই সমাজ আপনিই উন্নত হইবে, ইহাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই তিনি দেশীয় ভাবেই উন্নত করিবার জন্য চিরজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ধর্ম্মতত্ত্বে এবং সামাজিক ব্যবহারেও তিনি অনেক জিনিস পশ্চিমের সভ্যতার ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলিকে এমনি বেমালুম দেশীয় আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাদের বৈদেশিকতা কোথাও সহজে ধরা পড়িতে চায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নব্য দল যখন সমাজ সংস্কারের তুমুল আন্দোলন তুলিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে অগ্রসর ও অনগ্রসর দুইদলের মধ্যে ভেদ হইয়া সেই ভেদ ক্রমে বিচ্ছেদ উপস্থিত করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন না; কিন্তু তিনি জাতীয়ভাবে ও ধীর ভাবে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জাতীয়তার আদর্শ লইয়াই তাঁর সঙ্গে নব্যদলের বিরোধ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিবাহ বিধির আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়াই ঘোষণা করিলেন, অপরপক্ষ অহিন্দু স্বীকারোক্তি আশ্রয় করিয়া তিন আইনের বিবাহকে মানিয়া লইলেন। তার পর হইতেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।" নবগোপাল মিত্রের "হিন্দুমেলা" জমিয়া উঠিল; ঐ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেই মহর্ষির সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'

সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন; ঐ খৃষ্টাব্দেই বঙ্কিমের প্রতিভার নবরবি "বঙ্গদর্শনের" ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। দেবেন্দ্রনাথ ও আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেশী পরিমাণে হিন্দুসমাজ-ঘ্যাঁষা হইয়া পড়িলেন; এবং তখন হইতেই স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, থিয়সফির আন্দোলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এক নূতন ধর্ম্মসমন্বয়, জনসেবা ও কর্ম্মসন্ন্যাসের আন্দোলন,—এই সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তেরই ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে খর্ব্ব নয়, চাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।

এই প্রতিক্রিয়ার মুখেই ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" লেখা হয়। "সামাজিক প্রবন্ধ" আলোচনা করিতে গেলে সকলের গোড়ায় এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনের মধ্যে দূষ্য জিনিস যেমন অনেক থাকে, তেম্নি ভালও অনেক জিনিস থাকে। ঐকান্তিক ভাবে জাতীয়তাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া ১৮৭২ হইতে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন পর্য্যন্ত, দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, ধর্ম্মনীতি, প্রাচীন সাহিত্য, প্রভৃতি সকল বিষয়ে যতটা ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই। মনে রাখা দরকার যে, স্বদেশী আন্দোলন একটা ভুঁইফোড় আন্দোলন নয়—দেশ সম্বন্ধে এতকাল ধরিয়া এত বিচিত্র ভাবে অনুসন্ধান ও সাধনার ফলে আমাদের জাতীয় মনে যে প্রবল স্বদেশানুরাগ ও স্বাভিমান জন্মিয়াছে, সেটা অন্তঃসলিলা ঝরণার মত অগোচরেই প্রবাহিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়া তাহা প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য এক দিকে যেমন ঐকান্তিক জাতীয়তা কতগুলি গোঁড়ামি, অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তাহা জাতির অন্তর্নিগূঢ় নানা মূল্যবান সম্পদ্‌কে উদ্ঘাটিত ও আবিষ্কৃত করে—সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

"সামাজিক প্রবন্ধে" ভূদেব যে জাতীয়তার আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঐকান্তিক জাতীয়তার আদর্শ। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন:—"হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, প্রভৃতি শান্তিময় ঋষিচর্য্যা শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রকৃতি—শান্তি।"..."প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী, অনাসক্তচিত্ত।... ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খৃষ্টধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্স।" "আমরা

জানি যে, মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত, অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না।...আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক দেশবাসী এবং এক ভাষাভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পান ভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীর স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া এক সমাজসম্বদ্ধ, এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে।" ..."জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই আত্মগৌরব রক্ষা করে।" "সকলেই মূলতঃ এক, কর্ম্ম-ভেদে পৃথকভূত।"

এখানে তিনি তিনটি বড় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন (১) হিন্দুসমাজের অন্তঃশাসনের কথা (২) হিন্দুর প্রাক্তনে বিশ্বাস এবং সেই দিক হইতে পৃথিবীতে বৈষম্যের সমস্যার নিষ্পত্তি। (৩) বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা ও বৃত্তি-ভেদের ব্যবস্থার জন্য হিন্দু সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন শান্তিনিষ্ঠা। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি আলোচনা করিলে তার সামাজিক ইতিহাস ও দর্শনের দিক্ হইতে এই তিনটি মূলতত্ত্বকে চোখের সামনে রাখিতেই হইবে। কর্ম্মফলবাদী হিন্দু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে পৃথিবীতে নানা বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে একথা বিশ্বাস করে বলিয়া তার মধ্যে ঐহিক শক্তিলাভের জন্য ঠেলাঠেলি ও কাড়াকাড়ির ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তারপর আবার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত কর্ম্মের ফল আছে, সেই ফলের চাপকেও এড়াইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিয়াছে, যে বংশের যে বৃত্তি, সে ব্যক্তি সেই বংশের ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া সেই বংশের বৃত্তিকে অনুশীলন করিয়া চলিবে—সুতরাং অন্য বংশের লোকের প্রতি বা অন্য অন্য বৃত্তির প্রতি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিতে পায় না। তারপর আবার এই বর্ণবৃত্তিভেদমূলক শান্তিনিষ্ঠ সমাজের অন্তঃশাসনের ভার রাজার উপর নয়, ব্রাহ্মণের উপর। Legislative function—বিধি প্রণয়নের ভার ব্রাহ্মণের, কতক পরিমাণে Judicial function বিচারের ভারও ব্রাহ্মণের। রাজা শুধু executive head শাসনরক্ষণের কর্ত্তা এবং কতক পরিমাণে বিচারকর্ত্তাও বটেন। "বিবিধ প্রবন্ধে"—দ্বিতীয়ভাগে—"বঙ্গসমাজে অন্তঃশাসন" শীর্ষক অধ্যায়ে ভূদেব এই অন্তঃশাসনের ইতিহাস ও প্রণালীটি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—"হিন্দুসমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ এই শাসনের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ যাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভূত নহে।...আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না"। সেই কারণেই ব্রাহ্মণেরা 'সমাজপতি' হইয়া দেশের অন্তঃশাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনের কথা ঐ প্রবন্ধে গোড়ায় উল্লিখিত আছে বলিয়া কাহারও কাহারও

এমন অদ্ভুত ধারণা হয় যে ভূদেব 'অন্তঃশাসন' বলিতে সকল প্রকার হিতকর্ম্মে বাংলার জনসাধারণের আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার বুঝিয়াছেন। জনসমূহের সর্ব্ব বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্বের কোন কথাই ভূদেব কোথাও বলেন নাই—তাঁর জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে সে কথার কোথাও কোন স্থান হইতে পারেনা।

সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের প্রাচীন তন্ত্রের স্বরূপকে ভূদেব theocracy অথবা ধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বরূপ বলিয়াছেন এবং সেই স্বরূপকেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার শাসন দুই ভাগে বিভক্ত—বহিঃশাসন রাজার; অন্তঃশাসন ব্রাহ্মণের। ইহার ব্যবস্থা জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদমূলক ব্যবস্থা। এরূপ শাসনে এবং ব্যবস্থায় অশান্তির বা বৈষম্যের অঙ্কুর পর্য্যন্ত কোথাও উদগত হইতে পারে না। কারণ, অশান্তি বা বৈষম্যের মূল পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

## আর্টের তত্ত্ব

### (বেনেডেটো ক্রোচের মত)

আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যে কার্হচি (Carducci), ডানান্‌জিয়ো (D'Annunzio) এবং প্যাস্‌কোলি (Pascoli) ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বছর কতক হইতে বেনেডেটো ক্রোচেও একজন তত্ত্ববিদ্ ও কলারসিক হিসাবে গুণীগণসমাজে আদর পাইতেছেন। তত্ত্বের সঙ্গে রসের মিলন প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় না; কিন্তু ক্রোচের রচনা যে কেউ পড়িয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে তাঁর মধ্যে সে মিলন ঘটিয়াছে। বিশ্লেষণ ও বিচারের শক্তিতে তিনি কোন তত্ত্ববিদের চেয়ে কম নন্, আবার অখণ্ড রসানুভূতিতে তিনি কোন কলা-রসিকের কাছেও হটিয়া যান্‌না। সুতরাং আর্টের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত বাঙালী পাঠকের প্রণিধানযোগ্য।

গতবারে আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা রাস্কিন্ ও অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের মত আলোচনা করিয়া দুজনেরই আর্টের আদর্শের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছিলাম এবং আমরা আর্টের কোন্ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তার আভাসও দিয়াছিলাম। ক্রোচের মতের সঙ্গে সেই আলোচনার যোগ আছে বলিয়া আমাদেরি বক্তব্য কথার পরিস্ফুটনের উদ্দেশে ক্রোচের মত উদ্ধার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'Intuition' শব্দটার বাংলা করিয়াছেন 'বোধি' শব্দের দ্বারা। তিনি বলেন, Intellectকে আমরা বলি বুদ্ধি; Intuitionকে বলা যাইতে পারে—বোধি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর Intuition এর প্রতিশব্দরূপে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা ব্যবহার করিতেন। আমরা যুক্তির দ্বারা যাহা বুঝি তাহা বুদ্ধি; সহজ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝি তাহা বোধি বা সহজ জ্ঞান। আমার বোধ হয় 'বোধি' কথাটার চেয়ে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা 'Intuition'-এর ঠিক অর্থটা বেশী জ্ঞাপন করে।

ক্রোচে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জীবন-যাত্রায় আমাদের প্রায় বারো আনার উপর ভর ঐ সহজজ্ঞানের উপর। সে

ব্যক্তির দেশের আসল অবস্থা সম্বন্ধে একটা সহজ বোধ নাই, যে শুধু তত্ত্ব লইয়া তর্ক করে, কোন রাষ্ট্রনৈতিক তাকে আমল দেয় না। আর্টের সমালোচক কোন থিওরির দ্বারা আর্টের রসবিচারে প্রবৃত্ত হয় না, আর্ট সম্বন্ধে তার সহজ বোধের দ্বারাই সে রসকে উপলব্ধি করে এবং রসকে উদ্ঘাটিত করে।

অবশ্য ক্রোচে ইন্দ্রিয়বোধ, কল্পনা এবং ঐন্দ্রিয় ও কল্পনাসৃষ্ট সকল রূপ ও ভাব-সঙ্গতি, এ সমস্তই সহজ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। কেবল যে গুলি Concept বা বুদ্ধির বিষয়, সেই গুলিকে তিনি ইহার সীমানার বাহিরে ঠেলেন। সেইজন্য সহজ জ্ঞান এবং প্রকাশ ("Intuition and expression") এই দুয়ের মধ্যে কোন ভেদ তিনি দেখিতে পান্ না। কেননা, প্রকাশ ভিন্ন সহজ জ্ঞান দাঁড়াইতেই পারে না বলিয়া তাঁর ধারণা। অতএব, যে জিনিসটা প্রকাশে বাস্তব হইয়া উঠে না, তাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের বিষয় অথবা কল্পনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু সহজ জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ। যদি বলি যে এক্‌টা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণের সহজজ্ঞান আমার আছে, তবে তার ছবিটা নিশ্চয়ই আমার মনে এম্‌নি সুস্পষ্ট যে, আমি তাকে তখনি তখনি আঁকিতে পারি। তেমনি ভিতরকার যে কোন ভাব বা রস যখনি সহজজ্ঞানের বিষয় হয়, তখনি তার প্রকাশ হইয়া বসিয়া আছে।

সুতরাং সাধারণতঃ লোকের যে ধারণা যে, তাদের অনেক বিষয়েই বোধ আছে কিন্তু কবি বা চিত্রকরের মত প্রকাশের শক্তি নাই, ক্রোচে এই ধারণাটা একেবারেই ভুয়ো বলিয়া উড়াইয়া দেন্। তিনি বলেন, সাধারণ লোকের সব বিষয়েই যে বোধ থাকে, সেটা অত্যন্ত আব্‌ছায়া ও ভাসা-ভাসা, সেইজন্যই তাহা প্রকাশে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় কিছু পরিমাণ প্রকাশ অবশ্যই দরকার করে—কিন্তু সে কতটুকু প্রকাশ? যেমন বই না পড়িয়া সূচী ও নির্ঘণ্ট পড়া—সাধারণ লোকে ঐ নির্ঘণ্ট পড়িয়াই কাজ চালায়, তাদের বই পড়ার আর দরকার হয় না। সেইজন্য তাদের মধ্যে কবি বা শিল্পীর প্রকাশশক্তি নিতান্ত কণা পরিমাণে আছে, কেননা তাহা যদি না থাকিত তবে কবি বা শিল্পীকে বুঝিবার শক্তি তাদের থাকিত না। সুতরাং ক্রোচের মতে সাধারণ লোক এবং প্রতিভাশালী আর্টিষ্টের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নাই, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা পরিমাণগত ("Quantitative")। এক আধটুকু সহজ বোধের প্রকাশ সবলোকের পক্ষেই করা সম্ভব; কিন্তু নানা ভাবের সহজবোধের বিচিত্র জটিলতার প্রকাশ বড় আর্টিষ্ট ভিন্ন আর কারো দ্বারাই সম্ভাবনীয় নয়।

আর্টের তত্ত্বে একটা চিরকেলে তর্ক আছে যে, আর্টের বিষয় বড় না রূপ বড়? 'Content' বড় না 'Form' বড়? না, দুয়ের সমবায়েই আর্ট হয়? ক্রোচে বলেন যে, আর্টের রূপটাই বড়, আর্ট রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে সহজ জ্ঞান

ও প্রকাশের মধ্যে যখন কোন ভেদ নাই, তখন আর্টকে প্রকাশ বই আর কি বলা যাইতে পারে?

অতএব, সহজ জ্ঞানই আর্টের একমাত্র বিষয় এবং সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ—ক্রোচের এই মত মানিলে এ কথা বলার উপায় থাকে না যে, কেবলমাত্র অনুভূতি আর্টের বিষয়, কেননা অনুভূতিটা সহজ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এবং এই মতে, এ থিওরিও টেঁকে না যে, মানুষের কতগুলি বিশেষ বিশেষ রসবোধ বা "Æsthetic senses" আছে এবং সেইগুলিই আর্টকে সৃষ্টি করে। কারণ, ক্রোচের মতে সকল রকমের বোধেরই স্থান আর্টে আছে, শুধু সৌন্দর্য্য-বোধের ত নয়।

ক্রোচে বলেন যে আর্টের ক্রিয়া সমস্ত রকমের সহজ বোধকে বা "impressions"-কে একটা অখণ্ডরূপ দান করে; সেই জন্য আর্টের প্রত্যেক প্রকাশই আশ্চর্য্য-রূপে স্বতন্ত্র। আর্ট বহুকে এক করে, বিচিত্রকে সচিত্র করে। আর্টের রূপ বা প্রকাশ অখণ্ড রূপ বা প্রকাশ বলিয়াই আমরা যখন কবিতাকে বিশ্লেষণ করিতে যাই বা ছবির খুঁটিনাটিগুলা আলাদা করিয়া দেখিতে যাই, তখন সেই দেখিবার প্রণালীটা একেবারেই ভুল প্রণালী হইয়া পড়ে। মানুষের শরীরটাকে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু, মাংসপেশী প্রভৃতিতে খণ্ডিত করিয়া দেখিতে গেলে যেমন মড়াকেই দেখা যাইতে পারে, জীবন্ত মানুষকে নয়—তেম্‌নি আর্টের প্রকাশকেও অখণ্ড ভাবেই দেখিতে হইবে, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাকে দেখা সম্ভব নয়।

অবশ্য তাই বলিয়া কি তার বৈচিত্র্য দেখিব না? সব প্রকাশই কি সাদাসিধা, জটিল প্রকাশ কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেমন কটাহের মধ্যে ধাতুর টুকরা-গুলাকে গলাইয়া লইয়া ভাস্কর তারপরে তার অখণ্ড মূর্ত্তিকে তৈরি করিয়া তোলে, তেমনই সমস্ত সহজ সহজ বোধগুলিকে গলাইয়া তবে আর্টের রূপ তৈরি হইয়া উঠে। সে রূপ অখণ্ড স্বতন্ত্র রূপ। এইজন্য আর্টে, কোন রূপের সঙ্গেই কোন রূপের সম্পূর্ণ সারূপ্য নাই।

আর্টে এই বিচিত্রতা অখণ্ডতা হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই, আর্টে মানুষ আপনার মুক্তিকে অনুভব করিতেছে। আপনার ভিতরকার সমস্ত বোধকে যখনি বাস্তব-রূপে আপনার বাহিরে আর্টের মধ্যে মানুষ অখণ্ড করিয়া দেখে, তখনি সে আপনার পাশ হইতেই আপনি মুক্ত হয়। এইজন্য আর্টিষ্টদের মধ্যে যেমন হৃদয়-রাগ বা "passion"এর প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করা যায়, তেম্‌নিই বিরতি ও শান্তি বা "serenity"র পরিপূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়। passion'-এর কটাহে বিচিত্র বোধ দ্রবীভূত হইতে থাকে, এবং মুক্তির শান্তির মধ্যে আর্টের অখণ্ড রূপ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ক্রোচের মত সংক্ষেপে বলিলাম। ক্রোচের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল এইখানে যে, আর্টের প্রধান বিষয় 'Intuitioh' বা সহজজ্ঞান হইলেও, তাহাই আর্টের একমাত্র বিষয় নয়। আর্টের বিষয় রস, আর্ট মানেই রস। এই রস জিনিসটি জ্ঞান নয়—একটি অখণ্ড অনুভূতি আমাদের মনে,

যন্ত্রের রস যেমন বাহিরের বস্তুকে শারীর বস্তু করিয়া তোলে, আমাদের হৃদয়ের রস-বোধও তেমনি বাহিরের জগৎটাকে এবং জ্ঞানের জগৎটাকেও অন্তরঙ্গ আনন্দ-লীলার জগৎ ও রসের জগতে পরিণত করে। আর্টের এই রসজগৎ একটা জগৎ, তাহা বিচ্ছিন্ন কুয়াশাপূর্ণ কতকগুলি সহজবোধের সমষ্টি মাত্র নয়। এই জন্য শুধু ইনটুই-শনের দ্বারা একটা সুছন্দিত সুবিন্যস্ত সুন্দর জগৎ গড়িয়া ওঠে না, একটা জগদাভাস পাওয়া যাইতে পারে বটে। তার দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় লোক তৈরি হয় না, মধ্যে মধ্যে আলোকের ঝলক পাওয়া যায় মাত্র। বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা গড়ি অ-মূর্ত্ত concept'এর জগৎ, সাহিত্যে আর্টে আমরা গড়ি স-মূর্ত্ত রসের জগৎ। অবশ্য ক্রোচের এই কথাটা খুবই মানি যে প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই এই রস-জগৎ বিশিষ্ট ও বিভিন্ন। অথচ সেই সঙ্গে এই কথাও বলিব যে, সে ভিন্নতা যেন পৃথিবী হইতে শুক্র বা বৃহস্পতি গ্রহের ভিন্নতার মত—পৃথিবী, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি যেমন এক সৌরজগতের অন্তর্গত, তেমনি প্রতি আর্টিষ্টের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রসগোলক আবার এক পরিপূর্ণ বিশ্বমানব-জগতের অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, অসংখ্যও যেমন সত্য, অদ্বৈতও তেমনি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

# সমালোচনা

কাব্যসুধা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি সমালোচনা-গ্রন্থ; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। তবে এ সমালোচনার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরণের। —লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির এক-একটি গার্হস্থ্য সম্পর্ক ধরিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সাহিত্যে, ঐ শ্রেণীর যে-সকল চিত্র আছে প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলির সহিতও উক্ত চরিত্রগুলির তিনি তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সমালোচনা-কালে সুন্দর আদর্শ সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার স্বতন্ত্রতা ও মৌলিকতাও দেখানো হইয়াছে। এই গ্রন্থে "ননদ-ভাজ", "বোনে-বোনে", "শাশুড়ী-বৌ" ও "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক চারিটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী ও সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্য হইতে এই সকল গার্হস্থ্য-সম্পর্ক কেমন মধুর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে, তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইহারই আদর্শ কি-ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, লেখক তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বেশ দক্ষ এবং লিপি-চাতুর্য্যের গুণে তাহা উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের অনুশীলন-শক্তির ছাপ সর্ব্বত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। সমালোচনা-বিভাগে এই গ্রন্থখানি নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক ও পারিবারিক আদর্শ-সন্ধানীর তুল্য আদরের সামগ্রী হইয়াছে। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভাল—উপহার দিবার মত।

**পাগলা ঝোরা।** শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এই গ্রন্থে "তামাকু তত্ব," "মশক সঙ্কট" প্রভৃতি সতেরোটি সরস সহাস ও "কাশীবাস" নামে একটি অশ্রু-সজল সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। কৌতুক সন্দর্ভগুলিতে বহুস্থলে লেখক সহজ সত্যের সহিত সরস শুভ্র হাস্যধারা মিশাইয়া দিয়াছেন। কোথাও অশ্লীলতার পাঁক নাই। গ্রন্থকারের ফোয়ারার ন্যায় "পাগলা ঝোরাও" বাঙ্গালী পাঠকের অবসরটুকুকে প্রমোদ-হাস্যে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল করিবে। এ বহিখানিরও ছাপা কাগজ বাঁধাই বেশ মনোরম হইয়াছে।

**ধূলামাটি।** শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বাণী-ভূষণ প্রণীত। কাকিনা শাহাবিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীনিখিল মোহন সেন, প্যারী-নিবাস, কাকিনা। মূল্য দুই আনা। এই ছোট পুস্তিকায় লেখক অল্প পরিসরে অনেক গুরুগম্ভীর তত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য সাধকগণের বাণী সমূহ হইতে এই সকল কথার ভাব ও উপাদান সংগৃহীত। সাধারণ লোকে আসল ছাড়িয়া নকল কতখানি গ্রহণ করিবে, তাহা বিবেচ্য।

**ইলিয়াড্।** শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটি ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি ছেলেদের বহি। এ বহিখানিতে বেশ সহজ ভাষায় ইলিয়াডের কাহিনীটুকু বিবৃত হইয়াছে। রচনায় ভঙ্গী সরল, বর্ণনায় কোনরূপ আড়ম্বর বা আস্ফালন নাই। লেখার গুণে কৌতুহল আপনা হইতেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। ছেলেরা এ বহিখানি পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইবে। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে।

**পড়াশুনা।** শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত। প্রকাশক, ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ ১০০ গড়পার রোড কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য—"শিশুদিগকে বর্ণ ও শব্দের ততটুকু জ্ঞান দেওয়া, যতটুকু হইলে তাহারা যুক্তাক্ষর ভিন্ন সহজ সরল ভাষায় লিখিত বাংলা পড়িতে পারে।" লেখিকার উদ্দেশ্য এ গ্রন্থে সিদ্ধ হইবে। এ গ্রন্থে নানাবিধ নক্সার সহিত শিশুকে বর্ণ পরিচয় করাই-বার উপদেশ আছে। নারীই শিশুকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্রী—শিশুর চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া সহজ সরস ভাবে নারী যেমন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, পুরুষ কখনই তেমনটি পারেন না। সেই জন্যই এ গ্রন্থে মহিলা লেখিকা শিশুকে বর্ণ পরিচয় দিবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুধুই অভিনব নহে, তাহা সহজ হইয়াছে এবং কাজের হইয়াছে। গ্রন্থখানি বহু চিত্রে মণ্ডিত —এবং সমস্ত চিত্রগুলিই শিশুদের চিত্তে প্রচুর আনন্দ ও কৌতুহল জাগাইয়া তুলিবে। এ গ্রন্থ হাতে পাইলে পড়াশুনাকে বিভীষিকার মত না ভাবিয়া ছেলেরা খুব লোভনীয় বলিয়াই বুঝিবে।

**মুরজ-মুরলী।** শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বা-ধিকারী প্রণীত। লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ।

**শুভকর্ম্মে গদ্য-পদ্য।** শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক "শুভকর্ম্মে গদ্য পদ্য লিখিবার কয়েকটি মোটামুটি নিয়ম" বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং নিজের লেখা "বিবাহের গদ্যপদ্য" সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।